কিশোর সমগ্র

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

— একশ টাকা —

প্রচ্ছদপট ও পুস্তকের সম্পূর্ণ অলঙ্করণ
ইন্দ্রনীল ঘোষ

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ন্যাশনাল হাফটোন

KISHORE SAMAGRA
collection of novels & short stories for the juveniles by Gajendrakumar Mitra. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd., 10 Shyama Charan Dey Street, Calcutta-700 073

Price Rs. 100/-

ISBN : 81-7293-534-X

শব্দগ্রন্থন : পাইকা ফটোসেটার্স
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড,
কলিকাতা-৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

ছোটদের জন্য গল্প বলার একটি বিশেষ শিল্পরীতি আছে। তাদের সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না। গল্পের পুরো মালমশলা ঠিক ঠিক দেওয়া চাই। অল্পে বা সস্তায় বাজিমাত করার সুযোগ-সুবিধে সেখানে নেই। আর এই শিল্পরীতি যাঁদের অনায়াস-আয়ত্তাধীন তাঁদের মধ্যে গজেন্দ্রকুমার মিত্র অন্যতম। গজেন্দ্রকুমার ছোটদের জন্য নানানধরণের লেখা লিখেছেন। অ্যাডভেঞ্চার ঐতিহাসিক গোয়েন্দাকাহিনী কোন ক্ষেত্রই বাদ রাখেন নি। এর আগে গজেন্দ্রকুমারের কিশোরসাহিত্যের একাধিক সংকলন বেরোলেও বর্তমান গ্রন্থটির মত প্রতিনিধিত্ব মূলক সংকলন এই প্রথম। কিশোর কিশোরী এবং তাদের অভিভাবকদেয় মন-ভরানোর মত এরকম একটি সংকলন এপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

কিশোর সমগ্র

সাহসের নেশা

কিশোর সমগ্র গজেন্দ্রকুমার মিত্র—১

'সাহসের নেশা' লেখকের কৈশোর কালের রচনা। স্কুলে পড়ার সময়ই—নিচের ক্লাসের হাতে-লেখা মাসিকের প্রয়োজনে লেখা শুরু হয়েছিল। পরে ছাপার সময় আবার নতুন ক'রে লেখা হলেও সেই আগেকার কাঠামোটাই থেকে গিয়েছে। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় সম্ভবত ১৯৩৭ সালে। তারপর দীর্ঘকাল ছাপা ছিল না। এখন সেই প্রথম ছাপা বই থেকেই অবিকল ছাপা হ'ল আবার।

প্রকাশক

সেদিনের কথাটা আমার বেশ মনে আছে। হেড্‌মাস্টার মশাই আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, এই ছেলেটি আজ তোমাদের ক্লাসে ভর্তি হ'ল। কাশী থেকে এসেছে, লেখাপড়ায় তোমাদের সকলের চেয়ে বেশি এগিয়ে গেছে ব'লে মনে করি। একে প্রথম বেঞ্চিতে বসতে দেবে রোজ, তুমি মণিটার ব'লেই তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম।

কৌতূহল হ'ল খুবই। হেড্‌মাস্টার মশায়ের কাছ থেকে লেখাপড়ায় সুখ্যাতি লাভ করা যে কি কঠিন ব্যাপার তা আমার খুবই জানা ছিল। সুতরাং নতুন বন্ধুটির দিকে ভাল করেই তাকিয়ে দেখলুম। কালো চক্‌চকে রং। চেহারাটি বেশ বলিষ্ঠ, হঠাৎ দেখলে কালোপাথরের দেহ ব'লে মনে হয়। মাথার চুলগুলো কোঁকড়ানো, চোখ যদি ছোট হ'ত ত নিগ্রো ব'লে মনে হ'ত। কিন্তু চোখ দুটি বেশ ডাগর, আর অত্যন্ত ভালমানুষের মত তার চাউনি। মাথাটি হেঁট ক'রে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

কে জানে কেন, তাকে দেখেই কেমন ভাল লাগল, তার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে হ'ল। ভাবলুম ভালই হ'ল, আমিও ত রোজ ফার্স্ট বেঞ্চিতে বসি, আমারই পাশে যখন বসবে, তখন আলাপ করার আর কোন অসুবিধা হবে না। খুশী হয়ে ঘাড় নেড়ে হেড্‌মাস্টার মশাইকে নমস্কার জানিয়ে চলে যাচ্ছি, তিনি বললেন, তাহ'লে বিনয় তুমি এর সঙ্গে ক্লাসে যাও, আজ থেকেই পড়া শুরু কর না!

বিনয় অর্থাৎ সেই নতুন ছেলেটি তার বাবার দিকে ফিরে বললে, তাহ'লে যাই বাবা আমি?

ওর বাবা জবাব দিলেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ক্লাসে যাবে তাতে আর কি হয়েছে? আচ্ছা আসি মাস্টার মশাই, নমস্কার!... দেখবেন ছেলেটাকে একটু... লেখাপড়ায় ত ভালই, বড্ড দুরন্ত, এই যা!

হেড্‌মাস্টার মশাই অভয় দিয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন। বিনয়ও আমার সঙ্গে গিয়ে ক্লাসে ঢুকল। কিন্তু প্রথমেই খানিকটা গোলমাল হ'ল, কারণ যারা প্রথম থেকে ফার্স্ট বেঞ্চিতে বস্‌ছে তারা কেউই ফার্স্ট বেঞ্চির দাবি ছাড়তে রাজী হ'ল না। এমন কি হেড্‌মাস্টার মশাইয়ের হুকুম জানবার পরও না। নিরুপায় হয়ে অঙ্কের মাস্টার অভয়বাবুকে বিপদটা জানালুম (তখন তাঁরই ক্লাস চলছিল)। অভয়বাবু বেচারী একটু ভালমানুষ গোছের লোক, তাঁর আজ্ঞায় যখন ঐ বেঞ্চের বাকি চারটি ছেলেই তারস্বরে প্রশ্ন করলে তাহ'লে, কে যাবে স্যার, তখন তিনি বিষম বিব্রত হয়ে পড়লেন। এ বিপদ থেকে কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে বাঁচালে বিনয় নিজেই। সহসা সে মুখ তুলে বললে, তোমরা লটারী ক'রে নাও না!

আমরা সকলেই অবাক।

একে নতুন ছেলে, তায় এইমাত্র ক্লাসে প্রথম ঢুক্‌ল। সে কথা বল্‌বে এইটেই ত আশ্চর্য। বুঝলুম যে যতটা ভালমানুষ একে দেখাচ্ছে ততটা সে নয়। কিন্তু অভয়বাবু দারুণ খুশী হয়ে উঠলেন, বললেন, তাই কর।

এই ব'লে চার টুক্‌রো কাগজে চারটে নাম লিখে সেগুলো পাকিয়ে গোল ক'রে তিনি আমাকেই বললেন, একটা তুলে নাও ত অতুল!

যে কাগজটা তোলা হ'ল সেটার পাক খুলে দেখা গেল লেখা রয়েছে, 'প্রভাত'। প্রভাত বিনয়ের দিকে একটা কোপ-কটাক্ষ হেনে উঠে গিয়ে আর একটা বেঞ্চিতে বস্‌ল। বিনয় আর বিনা বাক্যব্যয়ে প্রভাতটার জায়গায় বসে পড়ল। অভয়বাবুও আবার বোর্ডে গিয়ে জিওমেট্রির প্রব্‌লেমে মন দিলেন।

তখন ঘণ্টা বাজার বেশি দেরি ছিল না। অল্পক্ষণ পরেই অভয়বাবু চলে গেলেন, এবার হেড্‌পণ্ডিতের পালা; কিন্তু হেড্ পণ্ডিত মশাইয়ের মিনিট-কতক আসতে দেরি হ'ল। ইত্যবসরে বিনয় করলে কি, আমার কাছ থেকে রাফখাতার একটা কাগজ চেয়ে নিয়ে ফট্‌ফট্ ক'রে কতকগুলো কি লিখলে, (সেদিন সে কাগজ-খাতা কিছুই আনেনি কিনা) তারপর সেটা আমার হাতে দিয়ে বললে, ভাই অতুল, এইটি 'পাস্' ক'রে দাও ত সবাইকে।

অবাক হয়ে চেয়ে দেখি তাতে লেখা রয়েছে—

(১) আমার নাম বিনয় ভাদুড়ী।

(২) কাশী থেকে এসেছি।

(৩) সেখানে গত পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিলুম।

(৪) বাবা এখানে নতুন চাকরি পেয়ে এসেছেন ব'লে আমায় চলে আসতে হ'ল।

(৫) ফুটবল খেল্‌তে জানি না। হকি খেল্‌তে পারি, তবে তোমরা কেউ জান না ব'লে দেখাতে পারব না!

জিজ্ঞাসা করলুম, এ কি হবে?

সে জবাব দিলে, এখুনি সবাই ত জনে জনে জিজ্ঞাসা করবে, তার চেয়ে এই ভাল—দাও না 'পাস' করে।

বলা বাহুল্য আমাকে আর বেশি বলতে হ'ল না। উপস্থিত সকলেই ঝুঁকে পড়ল। কাগজখানা হাতে হাতে ঘুরে ময়লা হয়ে এল, কিন্তু তবুও ছেলেদের বিস্ময় আর কৌতূহল কম্‌ল না।

হেড্‌পণ্ডিত মশাই ক্লাসে ঢুকতে সকলে বাধ্য হয়ে নিজের নিজের জায়গায় বসল বটে, কিন্তু একটা চাপা হাসি আর অস্ফুট গুঞ্জন তখনও চলতে লাগল। কিন্তু বিনয় নির্বিকার। যেন পৃথিবীতে কারো বিস্মিত হবার, কি বিস্ময় প্রকাশ করবার কোন কারণ ঘটেনি।

হেড্‌পণ্ডিত মশায়ের ক্লাস শেষ হবার পর অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট হেড্‌মাস্টার মশায়ের ক্লাস, স্বভাবতই তিনি একটু দেরি ক'রে ক্লাসে আসতেন, সেদিন আবার অত্যন্ত দেরি হ'তে লাগল। বিনয় করলে কি, মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা ক'রেই হঠাৎ বেঞ্চি ছেড়ে উঠে চেয়ারের সামনের খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল এবং পকেট থেকে একটা লাট্টু বার ক'রে দড়ি সহযোগে যথারীতি তাকে ঘোরাতে লাগল।

আমরা সবাই স্তম্ভিত। ছেলেটা পাগল না বকাটে? এই ছেলেকে হেড্‌মাস্টার মশাই

ফার্স্ট বেঞ্চে বসাতে বললেন? প্রভাত ত এমনভাবে ওর দিকে আর বেঞ্চিটার দিকে চাইতে লাগল যে, উঠে আসে আর কি!

কিন্তু ক্লাসের অতগুলি ছেলের বিস্মিত দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে বিনয় লাট্টু ঘুরিয়েই যেতে লাগল। ফলে আমরা যা আশঙ্কা করছিলুম তাই ঘটল, এক সময় পেছন থেকে প্রফুল্লবাবু ঘরে এসে পড়লেন। বিনয় অনেকক্ষণ তাঁকে দেখতেই পেলে না, শেষে চুপি চুপি সকলে মিলে সতর্ক করার দরুণ, আমাদের হিস্ হিস্ শব্দে চকিত হয়ে চেয়ে দেখে, প্রশান্ত গম্ভীর মুখে লাট্টু কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পুরে বিনয় তখন নিজের সীটে এসে বসল, যেন বিশেষ কিছুই ঘটেনি।

প্রফুল্লবাবু তার এই ধৃষ্টতায় রাগে একেবারে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ পরে ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, ওটা কি হচ্ছিল বাপু?

বিনয় উঠে দাঁড়িয়ে বেশ বিনীতভাবেই একটা নমস্কার ক'রে বললে, লাট্টু ঘোরাচ্ছিলুম স্যার, পৃথিবী নাকি ঐ রকম ক'রেই ঘোরে!

প্রফুল্লবাবু গর্জন ক'রে উঠলেন, আবার ডেঁপোমি?... কেন লাট্টু ঘোরাচ্ছিলে? এটা ক্লাস না?

বিনয় কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে জবাব দিলে, হেড্‌পণ্ডিত মশাই চলে যাবার পর অনেকক্ষণ কেউ না আসাতে আমি মনে করেছিলুম বুঝি এখন এটা টিফিন, তাই একটু খেলা করছিলুম। আমি নতুন কিনা স্যার, আপনাদের নিয়মকানুনগুলো আমার জানা নেই। মাপ করবেন।

প্রফুল্লবাবু বোধ হয় এতবড় জবাবটা আশা করেন নি; কিন্তু উত্তর দিতে পারলেন না। সত্যিই ত, তিনি প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট কাটিয়ে ক্লাসে এসেছেন। তিনি অগ্নিদৃষ্টিতে একবার ওর দিকে চেয়ে শুধু বললেন, হুঁ।... কিন্তু আর কখনও যেন এমন না দেখি...

প্রফুল্লবাবুর রাগ যে পড়ল না তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে তিনি অনুভব করতে লাগলেন যে ক্লাস-সুদ্ধ ছেলে ব্যাপারটি বেশ উপভোগ করছে। তিনি হিস্ট্রির বইটা খুলে বললেন, তারপর, বলি ইতিহাসটা কিছু পড়া আছে, না চিরকাল ফাজ্‌লামি ক'রেই বেড়িয়েছ? এটা মেড়োর দেশ নয়, এখানে পড়াশুনা করতে হবে, বুঝেছ বাপু? ফাঁকি চল্‌বে না।

বিনয় খুব বিনীতভাবেই জবাব দিলে, আমারও তাই মনে হচ্ছে স্যার!

কথাটা পরিহাস কিনা ঠিক বুঝতে না পেরে প্রফুল্লবাবু আরও চটে গেলেন। বললেন, তুমি দাঁড়াও ত বাপু, দেখি কতদূর হিস্ট্রি পড়া আছে? আচ্ছা, আওরংজেব সম্বন্ধে কি জান বল দেখি?

বিনয় ধীরভাবে উঠে দাঁড়াল। একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে, তারপর সোজা প্রফুল্লবাবুর চোখের দিকে চেয়ে শুরু করলে তার উত্তর। কিন্তু এ কি! ছেলেরা সকলেই, এমন কি, আমি নিজেও আশা করছিলুম যে তাকে এইবার অপ্রস্তুত হ'তে দেখব—কিন্তু এর নাম কি অপ্রস্তুত? সে শান্ত ও স্পষ্টভাবে আওরংজেবের জন্ম থেকে শুরু ক'রে তাঁর

মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাস, তাঁর চরিত্র এবং তাঁরই জন্য কেন মোগলবংশের ক্ষমতা হ্রাস হয়ে এল, তারই বিবরণ অত্যন্ত সহজভাবে অবলীলাক্রমে ব'লে গেল। এমন অনেক কথা সে বললে যা আমাদের পাঠ্য-পুস্তকে ছিল না, এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ ক'রে যেতে লাগল কোন্‌টা সে সার যদুনাথ সরকারের বইতে পেয়েছে এবং কোন্‌টা পেয়েছে সে পাঠ্য-পুস্তকে।

তার উত্তর চল্‌তে চল্‌তেই ঘণ্টা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপই ছিল না, সমস্ত ছেলেরা বাইরে টিফিনের ছুটি পেয়ে হৈ-চৈ করছে তাও যেন আমরা শুনতে পেলুম না। খালি ওর বলা যখন শেষ হয়ে গেল, তখন প্রফুল্লবাবু প্লাটফর্ম থেকে নেমে এসে ওকে বুকে চেপে ধরলেন। আবেগে তাঁর গলার আওয়াজ ভারি হয়ে এসেছিল, বললেন, আমাকে মাপ করিস্‌ বাপ, তোরই লাট্টু ঘোরানো শোভা পায়।... আশ্চর্য, বাইরের বই এত পড়েছিস্‌—আর মনে ক'রে রেখেছিস্‌? একটাও ভুল গেল না!

বিনয় তৎক্ষণাৎ হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে।

ব্যাস—সেইদিন থেকেই আমাদের ক্লাসে বিনয়ের রীতিমত প্রতিষ্ঠা লাভ হ'ল। নতুন ছেলেদের প্রথমটা দেখা হয় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে, হয়ত তার সঙ্গে কিছু কৌতূহলও থাকে। পরিচিত এবং বিশেষ ক'রে প্রীতি বা শ্রদ্ধার পাত্র হ'তে বহু বিলম্ব হয়। কিন্তু এই ছেলেটি প্রথম দিন থেকেই অনায়াসে সকলের শ্রদ্ধা ও স্নেহ টেনে নিলে। আমরা সকলেই বুঝলুম এই ছেলেটিকে অবহেলা করা কিছুতেই চলবে না, এ আমাদের সকলের উর্ধ্বে। এতে আমার একটু ঈর্ষা হবারই কথা, কারণ এতদিন পর্যন্ত প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থানটি আমিই দখল ক'রে আস্‌ছি; কিন্তু ওর স্বভাবটা এতই অমায়িক আর আমুদে ছিল যে কিছুতেই তাকে ভাল না বেসে থাকা গেল না। মনে হ'ল এর কাছে ছোট হ'লেও লাভ আছে।

আর ক্লাসের সব ছেলের সঙ্গেই সে সমানভাবে মিশতে পারত, কারুর সঙ্গে ব্যবহারে তার আন্তরিকতার এতটুকু অভাব ছিল না। খেলাধুলোয়, দুষ্টুমিতে ক্লাস-সুদ্ধ ছেলের সে-ই হয়ে উঠল দলপতি। ক্লাসের সব ছেলে মিলে একটি অখণ্ড দল গড়ে উঠ্‌ল।

বিনয়ের কিন্তু জিদও কম ছিল না। একদিন ঠিক ওর পিছনের বেঞ্চিতেই কারা দুজন বসে গল্প করছিল। তখন হেড্‌পণ্ডিতের ক্লাস, কি কারণে তাঁর মেজাজটাও ছিল খারাপ, তিনি মনে করলেন যে বিনয়ই গোলমাল করছে, তাই আর কথাটি না ব'লে ছুটে এসে তাঁর ভাঙা ছাতাটা তুলে (এই ছাতাটি ভরসা ক'রে তিনি আফিসে রেখে আসতে পারতেন না, এটি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ক্লাসে ঘুরত) বসিয়ে দিলেন বিনয়ের মাথায় এক ঘা।

আমরা ত স্তম্ভিত! কিন্তু বিনয় মুহূর্ত-মধ্যেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বিদ্যুৎগতিতে ছাতাটি পণ্ডিতমশাইয়ের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সেইখান থেকেই ছুঁড়ে ফেলে দিলে, খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে সেটা একেবারে ডালিমতলায় গিয়ে পড়ল।

বিপ্রদাসবাবু অর্থাৎ পণ্ডিতমশাই রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গিয়ে হেড্‌মাস্টার মশাইকে ডেকে আনলেন। বললেন, বিনয় আমাকে অপমান করেছে, এর শাস্তি হওয়া দরকার।

হেড্‌মাস্টার মশাই একটু বিস্মিত হয়েই এলেন। হবারও কথা, কারণ তিনি জানতেন যে বিনয় যত দুষ্টুমিই করুক, প্রত্যেক শিক্ষককে সে যথেষ্ট সম্মান ক'রে চলে। তিনি এসে বললেন, বিনয়, কি হয়েছে?

বিনয় ইতিমধ্যে নিশ্চিন্ত মনে বসে বসে পাশের ছেলের সঙ্গে কাটাকুটি খেলছিল, সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, পণ্ডিতমশাইকেই জিজ্ঞাসা করুন স্যার।

বিপ্রদাসবাবু ত তাই চান। তিনি সদম্ভে শুরু করলেন, এসে পর্যন্ত বিনয় বসে বসে গল্প করছিল, তাতে ক'রে আমার পড়ানো অসম্ভব হয়ে উঠেছিল, তাই আমি রাগ সামলাতে না পেরে—

বিনয় বাধা দিয়ে প্রশান্তকণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল, মিছে কথা স্যার। পণ্ডিতমশাই আসার পর থেকে তখনও পর্যন্ত একটি কথাও আমি কইনি। আমার পেছনের বেঞ্চে বসে রমেশ আর জয়নারায়ণ কী একটা কথা নিয়ে চুপি চুপি তর্ক করছিল—তারই শব্দটা উনি শুনেছেন। জিজ্ঞাসা করুন স্যার রমেশদের, আমার বন্ধুরা কেউ মিছে কথা কয় না।

হেড্‌মাস্টার মশাই কোন প্রশ্ন করার আগেই রমেশ আর জয়নারায়ণ উঠে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

বিপ্রদাসবাবুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। হেড্‌মাস্টার মশাই দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে বিনয়কেই বললেন, কিন্তু তোমার ওভাবে ছাতাটা ছুঁড়ে ফেলা উচিত হয়নি বিনয়, ওটা তুমি কুড়িয়ে এনে দাও।

বিনয়ের চরিত্রের সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল এই যে, কখনই কোন ব্যাপারে তাকে ইতস্ততঃ করতে দেখা যায় নি। তার মন সে এক মুহূর্তেই স্থির ক'রে ফেল্‌ত। সেদিনও সে একটুখানি দ্বিধা না ক'রে স্পষ্টকণ্ঠে বললে, না স্যার, সে আমি পারব না। উনি বিনাদোষে আমাকে শাস্তি দিয়েছেন এবং আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগমাত্র না দিয়ে। উনি আমার শিক্ষক, আমি ওঁর ছাত্র, ওঁর উচিত আমার অপরাধ মার্জনা করা, বিনাদোষে শাস্তি দেওয়া নয়।

হেড্‌মাস্টার মশাই দু'পক্ষকে আর একটি কথাও না ব'লে বাইরে গিয়ে নিজেই ছাতাটি কুড়িয়ে নিলেন এবং বিপ্রদাসবাবুকে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

বলা বাহুল্য যে, এ ব্যাপারের পর পড়া আর ভাল জম্‌ল না। বিনয় বসে রইল মাথা হেঁট ক'রে সমস্তক্ষণ, আর বিপ্রদাসবাবুর গলা কেঁপে যেতে লাগল বারবার। অবশেষে ঘণ্টা পড়তে তিনি যেন আঁধারে কূল পেলেন। কিন্তু তিনি যেমন ডায়াসের ওপর থেকে নেমে দোরের কাছাকাছি এসেছেন, বিনয় হঠাৎ উঠে এক লাফে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর মাথা হেঁট ক'রেই বল্‌লে, আমি আপনাকে আর হেড্‌মাস্টার মশাইকে দু'জনকেই অপমান করেছি স্যার, আমাকে মাপ করুন। আমি আগে বুঝতে পারিনি।

বিনয়ের এই দিক্‌টার কথা আমরা একেবারেই জানতুম না, সে মিছে কথা কখনও বলত না বটে, কিন্তু একঘর ছেলের মধ্যে দাঁড়িয়ে অযাচিত ভাবে দোষ স্বীকার করার মত সত্যনিষ্ঠা যে তার আছে তা আমরা কোনদিন কল্পনা পর্যন্ত করতে পারিনি। আমরা স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে চেয়ে বসে রইলুম। এবং যেসব ছেলেরা 'বিপ্রদাসবাবু বেড়ে জব্দ হয়েছেন' ভেবে মনে মনে উল্লাস প্রকাশ করছিল, তাদের মুখ হয়ে উঠ্‌ল বিবর্ণ।

বিপ্রদাসবাবু এতক্ষণ ঐ নিদারুণ অপমান মুখ বুজে সহ্য করতে করতে বোধ করি

ভেতরে ভেতরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েছিলেন, এইবার আর তাঁর চোখের জল বাধা মান্‌ল না। তিনি একেবারে কেঁদে ফেললেন, তারপর চাদরের খুঁটে চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, বাবা বিনয়, আমারই অন্যায় হয়েছিল, বুড়ো মানুষ, মাথার ঠিক রাখতে পারিনি—

বিনয় মাথা নেড়ে বললে, না, আপনি গুরুজন, আপনার কাজের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার আমাদের কাছে নয়—আমারই অপরাধ হয়েছে স্যার।

বিপ্রদাসবাবুর তখন মুখে হাসি, চোখে জল, তিনি বিনয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে শুধু বললেন, বেঁচে থাক্ বাবা, তোর ভাল হবে।

তিনি চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের মধ্যে উঠল একটা গুঞ্জন, বিস্ময় ও কৌতূহলে সবাই তখন ফেটে পড়ছে। কিন্তু বিনয় ফিরে এসে তার বেঞ্চে বসল একেবারে নির্বিকারভাবে। যে অন্যায় তাকে মনে মনে পীড়া দিচ্ছিল তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রে এসে বরং সে যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। আমি তার পাশে বসে চুপি চুপি বললুম, কি ক'রে বললি তুই বিনয়, আমি ত মরে গেলেও মাপ চাইতে পারতুম না!

বিনয় বড়-একটা পীড়াদায়ক কথা কাউকে বল্‌ত না, কিন্তু সে সেদিন বিদ্রূপের দৃষ্টি মেলে আমার দিকে চেয়ে বললে, তুই কি ছাতাটাই ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতিস্? কাজেই মাপ চাইবার কোন দিন তোর দরকারই হ'ত না।

॥ ২ ॥

এই ঘটনার পর শিক্ষক-মহল যেমন বিনয়ের ওপর আরও প্রসন্ন হয়ে উঠলেন, ছেলেরা কিন্তু ঠিক ততটা হ'তে পারল না। অধিকাংশ ছেলেই তার প্রতি অপ্রসন্ন হ'ল ঈর্ষায়, অর্থাৎ বিনয় যা কিছু করে তাই নিয়েই মাস্টারেরা বাড়াবাড়ি করেন এই হ'ল তাদের বিশ্বাস। আর একদল ছেলে প্রকাশ্যেই ব'লে বেড়াতে লাগল যে, ওটা কাপুরুষ, আমাদের মানইজ্জৎ সব-কিছু ওর জন্য যেতে বসেছে। মজা হচ্ছে এই যে—এই বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে সব চেয়ে নিরাসক্তভাবে ছিল বিনয় নিজেই। আমরা, মানে ওর ভক্তরা, উত্তেজিত হয়ে কোন কথার জবাব দিতে গেলে বিনয়ই আমাদের থামিয়ে বলত, তোরা কি পাগল, এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়!

মাথা অবশ্য ঘামাতে হ'ল না বেশি দিন, ইতিমধ্যেই আর একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল।

আমাদের স্কুলের ছেলেদের একটি করে সোস্যাল গ্যাদারিং হ'ত প্রত্যেক বছর চৈত্রসংক্রান্তির দিন। তাতে ছেলেরাই গানবাজনা করত, আবৃত্তি করত, অভিনয় করত—এবং ছেলেরাই শুনত। শিক্ষকরাও এসে শুনতেন নিমন্ত্রিত হয়ে, কিন্তু সে খুব কম। এই উপলক্ষে অল্প একটু খাওয়া-দাওয়া হ'ত; তার চাঁদা ছেলেরাই তুলত, খালি হেড্‌মাস্টার মশাই একটা মোটা টাকা দিতেন আর ইস্কুল থেকে পাঁচটি টাকা দেওয়া হ'ত।

এতদিন এ ব্যবস্থা ঠিকই চলেছিল, হঠাৎ সেই বছরে নতুন সেক্রেটারী ব'লে বসলেন যে, ছেলেদের ঐ সব পাগলামীর জন্যে স্কুলের টাকা খরচ করা উচিত নয়। আমরা সংক্রান্তির আগের দিন আফিস ঘরে টাকা নিতে গিয়ে শুনলুম কথাটা, হেড্‌মাস্টার মশাই একটু অপ্রস্তুতভাবে কথাটা বললেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব'লে দিলেন তার জন্যে তোমাদের ভাবনা নেই, আমি যে টাকা দিতুম তার ওপরেও পাঁচটা টাকা ধরে দেব!

কি চাই?

আমরা ছিলুম পিছনদিকে আর ফার্স্টক্লাসের ছেলেরা ছিল সামনে। তাদেরই হয়ত প্রতিবাদ করা উচিত ছিল, কিন্তু আপাতত কোন আর্থিক ক্ষতি হ'ল না ব'লে বোধ হয় তারা কোন প্রতিবাদ করলে না। তারা করল না বটে, কিন্তু বিনয় পিছন থেকে এগিয়ে এসে স্পষ্টকণ্ঠে বললে, সে আমরা পারব না স্যার।

হেড্‌মাস্টার বললেন, কিন্তু তোমাদের টাকা কুলোবে ত?

বিনয় শান্ত-দৃঢ় কণ্ঠে বললে, টাকা সেক্রেটারীই দেবেন।

হেড্‌মাস্টার ঘাড় নেড়ে বললেন, তাঁকে চেন না বিনয়, সে বড় কঠিন ঠাঁই!

বিনয় বললে, তাঁকেই দিতে হবে, গ্যাদারিং বন্ধ রাখতে হয় সেও ভাল। আমাদের এত বড় অপমান করতে দেব না তাঁকে।

ছেলেরা চিরদিনই গোলমাল করতে ভালবাসে, বিনয়ের কথাতে সকলে তেতে উঠল। সবাই বললে, নিশ্চয়। নইলে গ্যাদারিং বন্ধ রাখব।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে, কে যাবে সেক্রেটারীর কাছে! কাজের সময়ে সকলে একটু পিছিয়ে পড়ল। বিনয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে আমাকে বললে, আমিই যাব, তুই শুধু আমার সঙ্গে আয় কেষ্ট।

অগত্যা আমিই তার সঙ্গী হলুম। বলা বাহুল্য সাহস খুব বেশি ছিল না, কিন্তু তখন আর পিছিয়ে দাঁড়ানো যায় না।

সেক্রেটারী মশাই তখন তাঁর বাড়ীর বাইরের ঘরে বসে কি লেখাপড়া করছিলেন, মুখ তুলে আমাদের দেখে খুব রূঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কি চাই?

ভারি রাশভারি লোক! আমার তখন ভয়ে গলা শুকিয়ে এসেছে, কিন্তু বিনয় দমে না গিয়ে জবাব দিলে, কাল আমাদের বাৎসরিক সোস্যাল গ্যাদারিং, সেই উপলক্ষে আমরা ইস্কুল-ফাণ্ড থেকে বরাবর পাঁচটা ক'রে টাকা পেয়ে আসছি। এবার শুনছি আপনি সেটা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন, তাই আপনার কাছে এলুম।

সেক্রেটারী মুখ খিঁচিয়ে উঠে প্রশ্ন করলেন, তা কি হয়েছে তাতে? তোমাদের ঐ সব বাঁদরনাচের জন্য ইস্কুল কেন টাকা দেবে হে ছোকরা?

বিনয় তার আশ্চর্য শান্ত-দৃষ্টি তাঁর মুখের দিকে নিক্ষেপ ক'রে জবাব দিলে, আপনি বোধ হয় জানেন না, আমাদের উৎসবের সময় মাস্টারমশাইরা সকলেই উপস্থিত থাকেন। তাঁরা কি বাঁদর-নাচ দেখতেই যান? তাছাড়া আপনারা তাহ'লে কি আমাদের এতদিন ধরে বাঁদর ক'রেই তৈরি করেছেন?

সেক্রেটারী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমার সাহস ত কম নয় দেখছি! আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা কথা কইছ!

বিনয় বললে, একথা আমি যে কোন গুরুজনের সামনে বলতে পারতুম, আপনি নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশি সম্মান আমার কাছে দাবি করতে পারেন না।

চীৎকার ক'রে তিনি বললেন, যত সব ডেঁপো ফাজিল ছোক্‌রার আমদানি হয়েছে! যাও বলছি সব ইস্কুলে ফিরে। আমি টাকা দেব না, আমার খুশী।

বিনয় বললে, ও টাকা না নিয়ে আমরা যাব না। টাকা মাত্র পাঁচটা, আর সেটা হেড মাস্টার মশাই-ই দিতে চেয়েছিলেন বটে কিন্তু ঐ টাকাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে আপনি আমাদের সকলকে যে অপমান করেছেন, সেটা আমরা করতে দেব না কিছুতেই।

দাঁত কিড়মিড় ক'রে সেক্রেটারী জবাব দিলেন, অসভ্য জানোয়ার!... ভাইস চ্যান্সেলার এলেন আমার!... দেব না!... যাও বলছি—বেরিয়ে যাও এখনি!

বিনাবাক্যে বিনয় বেরিয়ে এল, কিন্তু একেবারে নয়। ইঙ্গিতে আমাকে চুপ ক'রে থাকতে বলে সে বাইরে বারান্দায় একটা বেঞ্চি ছিল তাইতে এসে বস্‌ল।

অনেকক্ষণ এইভাবে চুপচাপ বসে রইলুম। সেক্রেটারী মশায়ের কাজ সারা হ'তে তিনি ঘরের বাইরে এসে চমকে উঠলেন, বললেন, এ কি, এখনও যাওনি তোমরা?

বিনয় উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে বললে, আমাদের যাবার উপায় নেই স্যার। আমি তাদের ব'লে এসেছি যে টাকার হুকুম না নিয়ে ফিরে যাব না।

সেক্রেটারী তার স্পর্ধায় স্তম্ভিত হয়ে বললেন, তোমার কি বিশ্বাস, বসে থাকলেই তোমরা টাকা পাবে?

বিনয় বললে, আমাদের বিশ্বাস, আপনার অন্যায় আপনি নিজেই একটু পরে বুঝতে পারবেন। সেই জন্যেই অপেক্ষা করছি।

সেক্রেটারী নির্বাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কিন্তু আমি যদি কিছুতেই না দিই?

বিনয় বললে, আমাদের তা হ'লে একটু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

তিনি বললেন, যদি তোমাদের জোর ক'রে বার ক'রে দিই?

সেক্রেটারীর কণ্ঠস্বর কিন্তু তখন খুব নরম। আশ্চর্য!

বিনয় স্থিরভাবে জবাব দিলে, তা আপনি কিছুতেই পারবেন না স্যার। সেটা যে কত বড় অন্যায় তা আপনার চেয়ে বেশি আর কে জানে?

সেক্রেটারী মিনিটখানেক তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তোমার নাম কি?

সে বললে, বিনয়কুমার ভাদুড়ী।

সেক্রেটারী বললেন শুধু, হুঁ!

তারপরে ঘরে গিয়ে একটা স্লিপ কাগজের ওপর দু'লাইন কি খস্ খস্ ক'রে লিখে এনে বললেন, এই নাও, হেড্‌মাস্টার মশাইকে দেখিও, টাকা দেবেন তিনি।

বিনয় কোন কথা না ব'লে তাঁকে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে এল। সে ফিরে চাইলে না, কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে আমি পেছন ফিরে দেখলুম, সেক্রেটারী তখনও আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

॥ ৩ ॥

গরমের ছুটি এসে গেল। কিন্তু তার আগেই সেবার হ'ল আমাদের প্রাইজ দেবার ব্যবস্থা। সকলেই জানত বিনয় নতুন এসেছে, সুতরাং তার প্রাইজ পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ তখনও তার একবারও পরীক্ষা দেবার সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু হঠাৎ আমাদের হেড্‌পণ্ডিত মশাই আমাদের অভিভাবকদের নামে নিমন্ত্রণ চিঠি দেবার সময় বিনয়কে ব'লে দিলেন, তুইও আসিস্ বাবা বিনয়, সেক্রেটারী তোকে বিশেষ ক'রে আসতে ব'লে দিয়েছেন।

বিনয় একটু বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করলে, কেন স্যার?

আমরাও উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলুম উত্তরের জন্য, কারণ এই ছেলেটি সম্বন্ধে নব নব বিস্ময়ের আমাদের আজও শেষ হয়নি, আমাদের কেমন একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, এর দ্বারা সবই সম্ভব। কিন্তু সে কৌতূহল আমাদের মিট্‌ল না, হেড্‌পণ্ডিত মশাই ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন, তা জানি না; তিনি ব'লে দিয়েছেন শুধু।

আমরা কৌতূহলী হয়ে গিয়ে হেড্‌মাস্টার মশাইকে ধরেছিলুম, কিন্তু তিনিও কোন দুত্তর দিতে পারলেন না।

প্রাইজের দিন সভাপতি হয়েছিলেন স্বর্গীয় সার আশুতোষ স্বয়ং—সুতরাং শুধু তাঁকে দেখবার জন্যও অন্ততঃ ভিড় হয়েছিল খুব।

যথানিয়মে প্রাইজ দেওয়া শুরু হ'ল। একটু পরেই আমাদের ক্লাসের ডাক পড়ল। আমার গোটাদুই প্রাইজ ছিল, নিয়ে এলুম; আরও যাদের পাবার কথা ছিল সকলকে ডাকা হ'ল, কিন্তু তার মধ্যে বিনয়ের নাম কোথাও ছিল না, আর থাকবার কথাও নয়। তাকে সেক্রেটারীর কি দরকার জানবার জন্য উৎসুক হয়ে ছিলুম, কিন্তু যথানিয়মে অন্য ক্লাসের ছেলেদের নাম ডাকা শুরু হওয়ায় আমরা ভাবলুম যে, নিশ্চয়ই পণ্ডিতমশাই-এর ভুল হয়েছে, বিনয়কে বিশেষ ক'রে আসবার কথা সেক্রেটারী কিছুই বলেননি।

সর্বশেষ নামটিও ডাকা যখন শেষ হয়ে গেল, তখন অকস্মাৎ সেক্রেটারী ডাকলেন, বিনয়কুমার ভাদুড়ী...

কোন্ ক্লাস, কোন্ বিনয়, কিছুই বলবার দরকার হ'ল না, কারণ আমরা সকলেই জানতুম কোন্ বিনয়কে দরকার তাঁর। অন্য ক্লাসের ছেলেদের মধ্যেও বিনয় তখন দস্তুরমত বিখ্যাত হয়ে গেছে। আমাদের শত শত উৎসুক চোখের মধ্যে দিয়ে বিনয় উঠে গিয়ে সভাপতির সামনে দাঁড়াল। মুখ তার নির্বিকার, প্রসন্ন শান্ত তার চোখের দৃষ্টি, যেন সে ঐ বয়সেই কৌতূহল আর বিস্ময় দুইয়েরই বাইরে চলে গেছে।

সেক্রেটারী নাকে চশমা লাগিয়ে একবার তার দিকে চাইলেন, তারপর আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে গলা ঝেড়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, তোমাদের এই বন্ধুটি তোমাদের মধ্যে নতুন এসেছে, খুবই সম্প্রতি এই স্কুলে ও ভর্তি হয়েছে, সুতরাং ওর মেধা দেখিয়ে পুরস্কার নেবার সময় এখনও যে আসেনি তা তোমরা সবাই জানো। কিন্তু তবুও ওকে আমি একটি পুরস্কার দেবো স্থির করেছি, কেন তা জান?

সকলেই চুপ ক'রে রইল। সেই নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি আবার বলতে লাগলেন, কিছু দিন আগে আমি ইস্কুলের একটি বহুদিনের প্রচলিত প্রথা বন্ধ ক'রে দিতে চেয়েছিলাম। বলা বাহুল্য, ছেলেদের দিক থেকে সেটা অন্যায়ই হয়েছিল, কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যে কেউ আমাকে সে কথা বলতে সাহস করেন নি। ছেলেদের মধ্যেও, আমি যতদূর শুনেছি, হয়ত কেউই আমার মুখের ওপর সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সাহস করত না, যদি নবাগত এই ছাত্রটি ভরসা ক'রে এগিয়ে না আসত। কিন্তু সেইটেই ওর বড় কৃতিত্ব নয়, ও আমার মুখের ওপরই শুধু আমার অন্যায়ের কথাটা ধরিয়ে দেয়নি, এই বয়সেই ও কেমন ক'রে নিঃসংশয়ে জেনেছে যে, অন্যায় যে করে সে খবরটা সবাইকার আগে তার কাছেই পৌঁছোয় এবং সেই জ্ঞানের ওপর ভরসা ক'রেই ও নিশ্চিত হয়ে বসে অপেক্ষা করছিল আমার মত পরিবর্তনের।... আজ ওকে পুরস্কৃত ক'রে আমি তোমাদের এই শিক্ষাই দিতে চাই যে, অন্যায় তা যেখান থেকেই আসুক, যত বড় লোকের কাছ থেকেই আসুক না কেন, তোমরা

যেন কোন দিন তাকে মেনে না নাও। তোমরা সদাসর্বদা স্মরণ রাখবে, অন্যায় করাটা ঠিক যতখানি পাপ, ঠিক ততখানি পাপ অন্যায় সহ্য করাটা।

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।"

সেক্রেটারীমশাই থামতেই সভাপতি উঠে দাঁড়িয়ে একটি ছোট্ট রূপোর মেডেল বিনয়ের গলায় পরিয়ে দিলেন, বিনয় অন্য ছেলের মত হাত তুলে নমস্কার না ক'রে সভাপতি সেক্রেটারী ও হেড্‌মাস্টার মশাইকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে চলে এল

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে তুমুল গোলযোগ উঠ্‌ল—কতক হর্ষধ্বনি, কতক বা ঈর্ষার। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা যারা তার জয়ধ্বনিই করছিলুম, সেই আমাদের মধ্যেও ঈর্ষা কম ছিল না, সকলেই ভাবছিলুম যে, খুব ফাঁকি দিয়ে বিনয় বাহাদুরীটা নিলে। আমার এক একবার মনে হচ্ছিল যে, সেক্রেটারীর অন্ততঃ আমার নামটা করাও উচিত ছিল, আমিও তো ওর সঙ্গে ছিলুম! অবশ্য আজ বুঝতে পারছি যে, আমার থাকাটা ছিল নিতান্ত বাধ্য হয়েই, আর সে-কথাটা সেক্রেটারীর মত প্রবীণ ও বিচক্ষণ লোকের চোখে চাপা থাকেনি যাই হোক্‌, বিনয় আমাদের এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, সেদিন একটু ঈর্ষার বিষ মনের মধ্যে জমা হ'লেও তাকে নিয়ে আনন্দ করতে বাধেনি।

এত কথা এখানে বললুম তার কারণ এই যে, যে-কাহিনী এইবার বল্‌ব তার নায়ক বিনয়কে চিনতে তোমাদের অসুবিধা না হয়। যে ঘটনা তার জীবনের প্রথম পর্বেই ঘটেছিল এবং সে সেই বিপদে যে অসাধারণ মনের জোর, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল, তা যে তার কাছে মোটেই অস্বাভাবিক নয় বরং খুবই স্বাভাবিক, সেইটে ভালো ক'রে বোঝাবার জন্যই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের বিবরণটি এত বিশদ ক'রে বললুম।

এইবার আসল কাহিনী শুরু করব।

॥ ৪ ॥

অতি কষ্টে গোলমাল থামিয়ে সেক্রেটারী তাঁর সভার বাকি কাজটুকু সেরে নিলেন। তারপর পুরস্কার বিতরণীর পর্ব শেষ হ'ল।

সভার পর ছেলেদের একটু জলখাবারের ব্যবস্থাও ছিল। আমরা সকলে গিয়ে সেখানে জড় হলুম। সেখানে তখন মহা হৈ-চৈ, কে জিতেনবাবুকে (ভারপ্রাপ্ত মাস্টারমশাই) ফাঁকি দিয়ে তিনবার চারবার খাবারের ডিশ নিতে পারে তখন তারই কম্পিটিশান্ চলেছে। আমরা আমাদের ডিশ নিয়ে অপেক্ষাকৃত একটু দূরে সরে গিয়ে খেতে আরম্ভ করলুম এবং সকৌতুকে সেখানকার ব্যাপার দেখতে লাগলুম। ওর মধ্যে ক্লাস সেভেনের সনতের বাহাদুরীটাই বেশি। সে একবারও নিজের চেহারাটি না দেখিয়ে শুধু আড়াল থেকে হাত

বাড়িয়ে একটি ক'রে ডিশ নিচ্ছে—আবার খানিক পরে হাত বাড়াচ্ছে। তার নিজের খাবার জন্যে তার ঐ লোভ নয়, কারণ সে ডিশ নেওয়া মাত্রই অপরকে বিলিয়ে দিচ্ছে, শুধু বাহাদুরীটাই তার পুরস্কার!

সেই দিকে চেয়ে আছি, হঠাৎ বিনয় প্রশ্ন করলে, গরমের ছুটিতে তোরা কে কোথায় যাবি স্থির করলি?

প্রশ্নটা এতই অপ্রত্যাশিত এবং আমাদের কাছে অপরিচিত যে, আমরা খানিকটা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম, জবাব দিতে পারলুম না।

নীহার শুধু বললে, তার মানে?

বিনয় অবাক হয়ে বললে, মাথায় তোদের কি সব গোবর ভরা নাকি? সহজ কথার মানে বুঝতে পারিস না? গরমের ছুটিতে কেউ কোথাও বেড়াতে যাবি, না এইখানেই থাকবি সব?

বেচারী আমরা! গরমের ছুটিতে যে আবার কেউ কোথাও বেড়াতে যায় একথা আমাদের কল্পনারও অগোচর। আমাদের মধ্যে আনন্দই ছিল একমাত্র বড়লোকের ছেলে, আর সেই প্রত্যেক বৎসর গরমের ছুটিতে দার্জিলিং যেত। সেটা, আমরা সবাই ধরে নিয়েছিলুম যে, একমাত্র তার পক্ষেই স্বাভাবিক ঘটনা। তাই তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। সুতরাং বিনয়ের প্রশ্নে বেশ একটু অবাকই হলুম। অনেক কষ্টে আমিই ঢোঁক গিলে সত্যি কথাটা ব'লে ফেললুম, কি জানি ভাই, গরমের ছুটিতে আমরা চিরকাল এইখানেই থাকি। গরমে হাঁস্-ফাঁস্ করি আর দুপুরবেলা ঘুমুই—অনেকদিন আগে একবার বাবা বড়দিনের ছুটিতে আমাদের নিয়ে কাশী গিয়েছিলেন, সেই যা একবার রেলগাড়ী চড়েছি।

বিনয় অবাক্ হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে থেকে বললে, তা তোদের কারুর দেশ কি নেই? দেশে যাস্ না কেন?

আমি জবাব দিলুম, আমাদের কোনও দেশ আছে কিনা তাও জানি না। আমাদের এখানের যে বাড়ী তা শুনেছি আমার ঠাকুর্দার বাবার, তার আগে কোথাও দেশ ছিল হয়ত, কিন্তু তার খবর জানি না।

প্রবোধ বললে, আমার দেশ ত ভাই হালিসহর, তা সেখানে না যাওয়াই ভাল, গেলেই ম্যালেরিয়া। প্রতুলের বাবা ত জমিদার শুনেছি, তোর দেশ কোথায় রে?

প্রতুল একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, হ্যাঁ, জমিদার না ছাই!... দেশ আমাদের সুন্দরবনের মধ্যে বললেই চলে, মৌপুর বলে জায়গাটাকে, শুনেছি ক্যানিং স্টেশনে নেমে নৌকা ক'রে যেতে হয়।

বিনয় বললে, শুনেছি মানে? যাস্নি কখনো?

প্রতুল ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, যাবার যো নেই। সেখানে কেউ থাকতে পারে না, বাড়ী-ঘর সব জঙ্গল হয়ে গেছে। কেউ থাকে না।

আমরা প্রায় এক-যোগেই প্রশ্ন করলুম, তার মানে?

প্রতুল বিমর্ষভাবে বললে, কী জানি, আমার বাবা যখন দু'বছরের, সেই সময় নাকি

এমন ভূতের উপদ্রব হ'ল যে, ঠাকুর্দা সকলকে নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। তারপর আরও দু-একবার তিনি যাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই ভূতের দৌরাত্ম্যিতে তাঁকে পালিয়ে আস্‌তে হয়েছে।

অকস্মাৎ বিনয়ের হাত থেকে মাটির ডিশটি পড়ে দু'টুকরো হয়ে গেল, একটা পান্তুয়া তখনও বেচারার খেতে বাকি ছিল, সেটাও গড়িয়ে গিয়ে মাটিতে মাখামাখি হয়ে গেল। কিন্তু সেদিকে আমাদের তখন নজর দেবার অবসর ছিল না, কারণ ততক্ষণে দু'হাতে পেট চেপে ধরে বিনয় মাটিতে বসে পড়েছে।

আমরা ব্যস্ত হয়ে সবাই ঝুঁকে পড়লুম, কি হ'লো রে? অমন কচ্ছিস্ কেন?

কিন্তু তারপরে দেখি সে হাস্‌ছে। হাসির চোটে তার সর্বাঙ্গ থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছে, চোখে জল, আর হাসির বেগ সামলাবার জন্যই সে পেট চেপে ধরেছে।

হো-হো-হা-হা-হি-হি!! উঃ—কী ব্যাপার!

হাসির নানা রকম শব্দ।

প্রতুলের মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল। সে একটু রুক্ষস্বরেই জিজ্ঞাসা করলে, হাসছিস যে?

বিনয়ের ততক্ষণে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। অতিকষ্টে হাসি সামলে নিয়ে বললে, ভূত কি বল্!

আবার [illegible]। হি-হি-হো-হো-হা-হা!

বাস্তবিকপক্ষে এত হাসবার মত কথা যে কি হ'ল তা আমরাও বুঝতে পারছিলুম না। প্রতুল চটে লাল, সে মুখ লাল ক'রে বললে, আমি কি মিছে কথা কইছি, না ঠাট্টা করছি ব'লে মনে করছিস্?

বিনয় এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হয়েছে। সে বললে, এখনো ঐগুলো তোরা সিরিয়াস্‌লি বলিস্? তোরা এখনও ভূতের মোহ কাটাতে পারলি না?

প্রতুল বললে, আমার ঠাকুর্দা নিজে চোখে দেখেছেন, তা জানিস্!

বিনয় বললে, যা তিনি দেখেছেন তা ভূত নয়—ভূতের ভয়!

প্রতুল এবার রীতিমত চটে উঠল। সে বললে, আমার ঠাকুর্দা [illegible] ছুরি হাতে মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মেরেছিলেন, সুন্দরবনের বাঘ! তিনি আমাদের মত ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যেতেন না!

বিনয় বললে, আহা-হা, আমি কি তাঁর সম্বন্ধে কিছু বল্‌ছি? তিনি কি করবেন! ছেলেবেলা থেকে যে তাঁর ভূতের সংস্কার রয়ে গেছে! কত পুরুষ ধরে ভূতের ভয় চলে আসছে তার কি ইয়ত্তা আছে! তাঁর দোষ কি?

প্রতুল বললে, আজ্ঞে না মশাই, দিনেদুপুরে একঘর লোক খেতে বসেছে, দেওয়ালের ওপর থেকে ঘড়িটা শূন্যে উঠে যেখানে লোক খাচ্ছিল তাদের মাথার ওপর পড়ল। সে তো আর শুধু ঠাকুর্দা নন্।

বিনয় বললে, তাঁরা যদি সেটাকে ভৌতিক ব্যাপার মনে না ক'রে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে তার কারণটা ভাবতেন তা হ'লেই দেখতে পেতেন যে, সেটা প্রেতলোকের কার্য নয়, নিতান্ত

বদমাইস লোকের ফন্দী। ভূত আছে কিনা তা নিয়ে আমি তর্ক করছি না, থাকে থাক, না থাকে ত আপত্তি নেই, কিন্তু তারা খামোকা তোর ঠাকুর্দার সঙ্গে লাগবে কেন বল্? একটা আঙুল কেটে গেলে মানুষ সে হাত দিয়ে কাজ করতে পারে না, আর যাদের দেহটাই নেই, তারা ছুঁড়বে ঘড়ি?

মনতোষ তখনও পান্তুয়া চালাচ্ছিল, সে ঝপ্ ক'রে বলে উঠল, জানিস সাহেবরা সুদ্ধ ভূত বিশ্বাস করে?

বিনয় জবাব দিলে, তাতে কি? সাহেবরা ত মানতেই পারে। তারা ত সেদিন পর্যন্ত জংলী ছিল। আমাদের দেশের লোকেরা যখন বীজগণিতে অঙ্ক কষছে তারা তখন পাহাড়ের গুহায় কাঁচা মাংস খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, তারা যে এখনও ভূত বিশ্বাস করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, আমরা এখনও করব কেন?

প্রতুলের বোধকরি আর সহ্য হ'ল না, সে বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওসব বড় বড় কথা ঢের শুনেছি, ঘরে বসে বসে বাঘ সবাই মারতে পারে!

অকস্মাৎ বিনয় ফিরে দাঁড়িয়ে এক হাতে প্রতুলের একটা হাত আর এক হাতে আমার কাঁধটা চেপে ধরে বললে, চল্ আমরা গরমের ছুটিটা তোদের দেশের বাড়ীতে কাটিয়ে আসি! কেমন ভূত একবার আলাপ পরিচয় ক'রে আসা যাক্—

এইবার যেন মনে হ'ল প্রতুল একটু দমে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, আমরাও এতটা আশা করিনি। প্রতুল খানিকটা হাঁ ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, সেখানে যাবি? সে বাড়ী যে জঙ্গল হয়ে গেছে, বলতে গেলে সমস্ত গাঁ'টাই বন হয়ে গেছে, রীতিমত বাঘ বেড়ায়। সে বাড়ীর কি আর কিছু আছে?

বিনয় বললে, তা হোক্। আমরা সেই বনেই যাব। গরমের ছুটিটা এখানে বসে খাবি-খাওয়ার থেকে একটু অ্যাড্‌ভেঞ্চার ক'রে কাটিয়ে আসা যাক্।

প্রতুল বললে, সে হয় না ভাই, বাবাকে বলতে গেলে বাবা আমাকে চাব্‌কে ঠাণ্ডা ক'রে দেবে।

আমিও প্রতুলের কথায় সায় দিয়ে বললুম, নিশ্চয়। আমরা এই ক-টা ছেলে মিলে সুন্দরবনে যাব ভূত দেখতে, একথা বললে তাঁরা পাগল ভেবে ঘরে তালা চাবি দিয়ে রাখবেন, একথা কখনো তাঁদের বলা যায়?

বিনয় তখন আর কোন কথা বললে না। কিন্তু কেমন যেন গুম্ হয়ে গেল। সারাক্ষণ অন্যমনস্ক হয়েই রইল।

॥ ৫ ॥

ছুটির প্রথম দিনই দুপুরবেলা অকস্মাৎ বিনয় এসে হাজির হ'ল। ইতিমধ্যে আমার বাড়ীর সকলের সঙ্গেই তার আলাপ হয়ে গিয়েছিল, আমার মুখে তার গল্প শুনে সকলে তাকে ভালও বাসত। কাজেই সে একেবারে আমার শোবার ঘরে উপস্থিত হয়ে আমাকে ঘুম ভাঙিয়ে টেনে তুললে। আমি উঠে বস্‌তে সে বললে, চল্ একবার প্রতুলদের বাড়ী ঘুরে আসি।

আমি অবাক্ হয়ে বললুম, সে কি, এই দুপুর রোদে প্রতুলের বাড়ী কি হবে? আর সে তো অনেক দূর!

বিনয় ঠাট্টা ক'রে বল্‌লে, ইস্ ননীর দেহ একেবারে, রোদে গলে যাবে! আর দূরই বা কত শুনি, বড় জোর এক মাইল—এই ত? বেশ যাওয়া যাবে, তুই ওঠ্ দিকিনি।

অগত্যা উঠতে হ'ল। রাস্তায় বেরিয়ে তাকে প্রশ্ন করলুম, কী ব্যাপার বল্ দেখি?

বিনয় জবাব দিলে, প্রতুলের দেশের ঠিকানাটা জেনে নেব, আমি যাব ওদের দেশে।

রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে জবাব দিলুম, তার মানে? তুই কি পাগল হয়ে গেলি? তুই সেখানে যাবি কি ক'রে?—একলা ছেলেমানুষ?

সে আমার হাত ধরে টেনে আবার চল্‌তে শুরু ক'রে বললে, কেউ যদি না যায় ত একলাই যাই কি ক'রে? কিন্তু যাব আমি নিশ্চয়ই।

আমি বললুম, কিন্তু সেখানে পৌঁছবার আগেই ত তোকে ভূতে না হোক্ বাঘ-ভালুকে খেয়ে ফেলবে। তাদের ত দেহ আছে, দাঁতও আছে। তারা ত আর অশরীরী নয়।

বিনয় বললে, না, না, সেখানে গ্রাম আছে, এখনও সেখান থেকে প্রতুলের বাবা খাজনা পান রীতিমত; সেটা সুন্দরবন নয়, সুন্দরবন সেখান থেকে ঢের দূরে, আমি ভাল ক'রেই খবর নিয়েছি।

আমি তার হাত দুটো ধরে বললুম, পাগলামি করিস নি বিনয়। সে হানাবাড়ী, সাপখোপ কি আছে না আছে, একলা কখনও সেখানে যাওয়া যায়? তাছাড়া যদি ভূত থাকে?

সে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললে, না—নেই। ও আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না।

আমি আর কিছু না ব'লে নীরবে পথ চলতে লাগলাম, আর প্রাণপণে একটা উপায় খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগলুম ওকে বাধা দেবার। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বিনয় আমার ভুল ভেঙে দিলে। সে মুচকি হেসে বললে, তুই ভাবছিস যে, বাবাকে ব'লে সাবধান ক'রে দিবি? তিনি জানেন।

আমি অবাক হয়ে বললুম, তিনি জানেন! বলিস্ কি? তিনি জেনেশুনে তোকে যেতে দিচ্ছেন?

বিনয় বললে, বাবা জানেন যে, যতটা সাবধানে থাকা দরকার তা আমি নিশ্চয়ই থাক্‌ব,

আর যখন কোন অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছি না, তখন তিনি কেন বাধা দেবেন? এই ত ঘণ্টা দেড়েকের পথ—আর বড়জোর দু-তিন দিন থাকব।

ততক্ষণে আমরা প্রতুলের বাড়ী পৌঁছে গেছি। প্রতুলও আমাদের দেখে অবাক বড় কম হ'ল না, আরও হ'ল যখন আমাদের আসার কারণটা শুনলে। সে প্রথমটা মনে করেছিল ঠাট্টা, তারপর ব্যাকুল হয়ে বিনয়কে বললে, আমার ঘাট হয়েছিল তোকে বলা, দোহাই তোর, অমন গোঁয়ারতুমি করিসনি।

কিন্তু বিনয় অটল। সে বললে, আমি যাবই, আর তুই অতই বা ভয় পাচ্ছিস্ কেন? না হয়, ভূত যদি থাকেই, ত দেখেশুনে চলে আসব। ষোল বছর বয়স হ'ল—এখনও কি এইটুকু পথ বেড়িয়ে আসবার উপযুক্ত হইনি!

বিনয়ের জেদে অগত্যা প্রতুল চুপ করলে। কিছুক্ষণ পরে সে শুধু প্রশ্ন করলে, তুই কবে যাবি?

বিনয় বললে, পরশুদিন, দশটার ট্রেনে ক্যানিং যাব। এই শিয়ালদারই বেলেঘাটা স্টেশন থেকে ক্যানিং লাইনের গাড়ী ছাড়ে আমি খবর নিয়েছি।

প্রতুল আরও খানিকটা চুপ ক'রে বসে রইল। তার মুখে রাজ্যের ভয় আর ভাবনার ছাপ ফুটে উঠেছিল। তার মনের কথাটা আমিও বুঝতে পারছিলুম, কারণ আমারও মনের তখন প্রায় ঐ অবস্থা।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ সে ব'লে উঠ্‌ল, আমিও তাহ'লে তোর সঙ্গেই যাব বিনয়।

আমরা ত স্তম্ভিত। সামনে বাজ পড়লেও অত অবাক্ হতুম কিনা সন্দেহ।

বিনয় বললে, সেকি রে! তোর বাবা রাজী হবেন?

সে মাথা নেড়ে বললে, নিশ্চয়ই হবেন না। তবে ঐখানেই আমার এক পিসীমার বাড়ী আছে। ব'লেকয়ে পিসীমার বাড়ী যাব ব'লে আমি বাবাকে রাজী করাব। মিছে কথা বলাও হবে না, পিসীমার বাড়ীও যাব একদিনের জন্যে না হয়।

বিনয় বললে, কিন্তু যদি সত্যি কিছু বিপদআপদ হয় তখন ত তোর বাবা আমাকে দোষ দেবেন।

বেশ নিশ্চিন্তভাবেই প্রতুল বললে, দেবেন বৈকি। কিন্তু সে কথা ত তোর বেলাতেও খাটে বিনয়, তোরও যদি কিছু হয় তাহ'লে আমিই বা মুখ দেখাব কি ক'রে? আমি সেদিন ভূতের কথা না বললে ত আর তোর এ গোঁ চাপ্‌ত না। তার চেয়ে যা হবার একসঙ্গেই হবে। তুই এখন যা, আমি সব ঠিক ক'রে সন্ধ্যেনাগাদ তোর বাড়ী যাব।

অগত্যা আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লুম। আমার যে তখন কী অবস্থা তা বোঝাবার নয়। ভয়ে আর উত্তেজনায়, আশঙ্কায় ও লোভে আমার দেহ থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছে তখন। নিঃশব্দে খানিকটা পথ চলবার পর কথাটা ব'লেই ফেললুম, বললুম, বিনয়, আমিও তোদের সঙ্গে যাব।

এবার আর বিনয় বিস্মিত হ'ল না, শান্তকণ্ঠে শুধু বললে, কিন্তু তোর বাবা কি রাজী হবেন?

বাবাকে বললে যে তিনি রাজী হবেন না তা আমি ভাল ক'রেই জানতুম, সুতরাং না ব'লেই যাব ঠিক করেছিলুম। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, বিনয় মিথ্যা কথা বলা বা গুরুজনকে গোপন ক'রে কোন কাজ করার ওপর ভয়ানক চটা ছিল ব'লে সে কথা আর সাহস ক'রে বলতে পারলুম না, শুধু বললুম, দেখা যাক্। যেমন ক'রেই হোক রাজী করাব।

বিনয় বললে, তাহ'লে চল্। সে ত ভালই হবে। একসঙ্গে গেলে আনন্দ ক'রেই যাওয়া যাবে।

সন্ধ্যার আগেই প্রতুল এসে জুট্‌ল। সে ইতিমধ্যেই তার বাবাকে রাজী করিয়েছে। পিসীমাকে এমন কি চিঠি লিখেও দেওয়া হয়ে গেছে। সঙ্গে তিনি লোক দিতেও চেয়েছিলেন, অনেক কষ্টে বিনয়ের সঙ্গে যাবে এই ভরসা দিয়ে সে বাবাকে নিরস্ত করিয়েছে।

কি কি সঙ্গে নেওয়া হবে স্থির হয়ে গেল তখনই। আমি বললুম, আমি সুটকেস নিতে পারব না। তখন স্থির হ'ল যে, আমার কাপড় জামা, হাফ্‌প্যাণ্ট ইত্যাদি বিনয়ের বাক্সে দিয়ে দেবো। প্রতুল তার কাপড় জামা এবং এক বাক্স বিস্কুট তার একটি ছোট্ট সুটকেসে ভরে নেবে এবং বাকি যা দরকার বিনয়ই গুছিয়ে নেবে এই ব্যবস্থা ঠিক হয়ে রইল।

সেদিন সারারাত আমি উত্তেজনায় ঘুমুতে পারলুম না। শেষরাত্রে যদিবা ঘুম এল ত স্বপ্ন দেখলুম যে একটা মস্ত বড় সাপ আমাকে বনের মধ্যে তাড়া করেছে, সেখানে আমি একা, আর কেউ নেই।

পরের দিনও আমার আশা আর আশঙ্কার মধ্য দিয়েই কাট্‌ল, নতুন অ্যাড্‌ভেঞ্চারের আশা এবং অজানা বিপদের আশঙ্কা। কোনমতে বাবা ও মাকে লুকিয়ে আমি কাপড়জামা সরিয়ে ফেললুম, কিন্তু দিন যত রাতের দিকে গাঁড়িয়ে যেতে লাগল ভয়ও তত বাড়তে লাগল! মনে হ'ল যে, এ বাহাদুরী না করলেই হ'ত! সেখানেই বা কি বিপদ ঘটতে পারে আর এখানে ফিরে এলেই বা কি রকম অভ্যর্থনা হবে ভেবে মন ভারী খারাপ হয়ে গেল। সারারাত একবারও চোখ বুজতে পারলুম না।

॥ ৬ ॥

পরের দিন সকালে উঠে মা প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁরে তোর মুখ অত শুক্‌নো কেন, অসুখ-বিসুখ করেনি ত? কাছে আয় দেখি, তোর গা-টা একবার দেখি।

অগত্যা কাছে গেলুম এবং শুক্‌নো মুখে প্রতিবাদ ক'রে বললুম, না না, অসুখ করবে কেন? এম্‌নি যা গরম পড়েছে!

মা গায়ে হাত দিয়ে কিছুই পেলেন না, তবু [illegible] কণ্ঠে বললেন, গলার আওয়াজও ভারী, আজ আর কোথাও বেরুস্‌নি, সকাল ক'রে খেয়ে শুয়ে পড়।

মায়ের এই স্নেহকাতর কণ্ঠ আরও মন খারাপ ক'রে তুলল। তাঁরা না জানি কত

ভাববেন কত ব্যাকুল হবেন! অথচ তখন 'যাব না' বলবারও সাহস ছিল না, বিনয়, প্রতুল ওরা কি ভাববে?

খানিকটা এম্‌নি ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মনে হ'ল যে, টাকাও ত কিছু দরকার! সে কথাটা ত আগে মনে হয়নি!

কিন্তু টাকা এখন কোথায় পাব?

মনে পড়ল যে, মাসিমা ঈস্টারের ছুটিতে বেড়াতে এসে আমাকে একটা ফাউণ্টেন পেন কেনবার জন্য দশটা টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা এখনও দিদির বাক্সে আছে। দিদিকে গিয়ে তখনই বললুম, টাকাটা দিতে। বললুম, আজই কলম কিন্‌ব।

দিদি তাড়া দিয়ে বললেন, তুই কি কিন্‌বি কলম! বাবা কিনে দেবেন এখন।

আমি বললুম, হ্যাঁ, বাবা এই ছ'মাস ধরে যা কিনে দিচ্ছেন তা-ত দেখতেই পাচ্ছি। আজ না কিনলে কিছুতেই চলবে না। আমি ঠিক দেখেশুনে কিন্‌ব, তুমি দাও ত।

অগত্যা তাঁকে টাকাটা বার ক'রে দিতে হ'ল। আমি সেদিন সুবোধ ছেলের মত দশটা বাজতেই চান ক'রে খেয়ে নিলুম, তারপর বাবার আদালত যাবার সময় এক ফাঁকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লুম। বেরুলুম বটে, কিন্তু আজ আর বলতে লজ্জা নেই, তখন আমার ঠিক কান্না পাচ্ছিল...

বেলেঘাটা স্টেশনে পৌঁছে দেখি ওরা দুজনেই এসে গেছে। প্রতুলের মুখ একটু শুকনো, কিন্তু বিনয় নির্বিকার। আমাকে দেখে সে শুধু বললে, গাড়ীর আর মোটে এক মিনিট দেরি আছে, চল্ তাড়াতাড়ি—টিকিট আমি কিনেই রেখেছি।

একটা বড় ফাঁকা গাড়ী দেখে আমরা উঠে পড়লুম, সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী দিলে ছেড়ে। আমি জিজ্ঞেস করলুম শুধু, টাকাপয়সার ত দরকার হবে বিনু!

বিনয় বললে, আমি বাবার কাছ থেকে বারটি টাকা চেয়ে এনেছি, তাতেই আমাদের চলে যাবে। প্রতুল বললে, আমিও বাবার কাছ থেকে দশটা টাকা চেয়ে এনেছি, এই নে বিনয়, তোর কাছে রেখে দে।

আমিও নোটটা বার ক'রে বললুম, আমার টাকাটাও রেখে দে—

বিনয় ঘাড় নেড়ে বললে, তোরা যখন টাকা এনেছিস্‌ই তখন যে যার কাছেই রেখে দে। একজনের কাছে সব টাকাটা রাখা ভাল নয়। হারালে সবসুদ্ধ যাবে।

আমরা সবাই চুপচাপ। গাড়ী শুধু হু হু ক'রে ছুটে চলেছে আর আমি ভাবছি তিনটে বাজলেই মা ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। অনেকক্ষণ পরে আমি আর থাকতে না পেরে ব'লেই ফেললুম কথাটা, আমার কিন্তু ভাই একেবারেই ভাল লাগছে না!

বিনয় বাইরের দিকে চেয়ে কি ভাবছিল, সে আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, তুই নিশ্চয়ই বাড়ীতে ব'লে আসিস্‌নি কেষ্ট, [illegible] বল দেখি?

অগত্যা স্বীকার করতে হ'ল যে, কিছুই ব'[illegible] আসিনি, শুধু [illegible]না পোস্টকার্ডে ক্যানিং-এ বেড়াতে যাচ্ছি এই কথা লিখে, আসব[illegible] সময় শেয়ালদার ড[illegible] দিয়ে এসেছি। সন্ধ্যেনাগাদ পাবে হয়ত।

বিনয় আমাকে খুবই তিরস্কার করবে আশা করেছিলুম, কিন্তু সে কিছুই বললে না, গম্ভীর হয়ে বসে রইল। শুধু যাদবপুরে গাড়ীটা থামতে সে বললে, তুই না হয় নেমে যা কেষ্ট, এখনও সময় আছে।

আমি প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বললুম, সে আমি পারব না, যা হবার হবে। এখন আর ফিরে যেতে পারব না।

বিনয় আর কিছু বললে না, শুধু বললে, কাজটা কিন্তু ভাল হ'ল না, তাঁরা হয়ত কত ভাববেন, হয়ত বা কান্নাকাটিই করবেন।

প্রতুল বললে, আর যদি ভাল-মন্দই কিছু হয় তা'হলেও তোকে চিরকালের মত দায়ী থাকতে হবে বিনয়।

বিনয় দৃঢ়স্বরে বললে, কোন ভাল-মন্দ, কোন বিপদ হবে না, হ'তে আমি দেব না। নিশ্চয় বল্‌ছি।

কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্য আমি বললুম, সে যাক্ গে, যা হবার হোক্।... তুই কি কি নিলি বিনয়?

বিনয় স্যুটকেস খুলে তার সম্পত্তি সব দেখালে। সে মাত্র এই একদিনের মধ্যে কত জিনিস যে গুছিয়ে নিয়েছে দেখে অবাক হয়ে গেলুম। এক বাক্স বিস্কুট, একটা জেলি, এক কৌটো মাখন চা, চিনি, বিলিতি দুধ, ছোট্ট একটা স্পিরিট স্টোভ, একটা শিশি ক'রে স্পিরিট, ছোট বাতির একটা প্যাকেট, দেশলাই, কাপড়-জামা আরও কত কি। স্যুটকেসটির কলেবর বেশি বড় নয়, কিন্তু তার অভ্যন্তর-ভাগ মালে ঠাসা একেবারে। আরও একটি জিনিস যা সে কাপড়ের তলা থেকে টেনে বার করলে, তা দেখে আমরা দুজনেই চম্‌কে না উঠে পারলুম না। চামড়ার খাপে ঢাকা চক্‌চকে ধারালো একখানা নেপালী কুক্‌রী।

তার শাণিত ঔজ্জ্বল্যের দিকে চেয়ে যে অজানা আতঙ্কের কথা এতক্ষণ ভুলে ছিলুম, তাই আবার নতুন ক'রে মনে পড়ে গা শিউরে উঠ্‌ল। প্রতুল তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌ল, ওটা বন্ধ কর বিনয়, গায়ের মধ্যে কি রকম করে যেন!

বাক্স বন্ধ ক'রে সে পকেট থেকে একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি, একটা টর্চ ও আর একটা দেশলাই বার করলে। দেখে অবাক হয়ে গেলুম যে, কিছুই তার মন এড়ায় নি এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবলুম যে, বিপদের মুখে ঝাঁপ দেবার উপযুক্ত দলপতিই আমরা পেয়েছি। এত জিনিস নেবার কথা আমরা ভাবতেও পারতুম না।

শোবার ব্যবস্থাও বিনয় ক'রে এনেছিল। একটা তুলোর কম্বল পাট ক'রে হাতে ঝুলিয়ে এনেছিল, সেইটে পেতেই আমরা গাড়ীতে বসেছিলুম। বালিশ সে আনেনি, কারণ সে বুঝিয়ে দিলে, আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে ঘুমোনোটা মোটেই অভিপ্রেত নয়।

॥ ৭ ॥

ক্যানিং পৌঁছলুম আমরা বেলা দেড়টা নাগাদ। স্টেশনটা নিতান্তই শ্রীহীন। যেখানে ট্রেন দাঁড়াল সেখান থেকে একটুখানি পথ লাইন প্রভৃতি ডিঙিয়ে যেতেই নদী দেখা গেল। তারই বাঁধের উপর দিয়ে ফুট আষ্টেক চওড়া একটা রাস্তা আর সেই রাস্তার অপর পাশে কতকগুলো চালাঘরে দোকান বাজার প্রভৃতি। পাকাবাড়ী দূরে দু-একটা নজরে পড়ল বটে, কিন্তু সে নিতান্তই সামান্য।

সামনে একটি স্টীম লঞ্চ অপেক্ষা করছিল! শুনলুম সেটা স্যার ডানিয়েল হ্যামিলটনের জমিদারী গোসাবা থেকে যাতায়াত করে, সেইখানকার যাত্রীই নেয় শুধু!

বিনয় জিজ্ঞেস করলে, আমাদের যাবার উপায় কি প্রতুল?

প্রতুল বললে, শুনেছি নৌকোই যায়, ঘণ্টা তিনেকের পথ।

বিনয় তৎক্ষণাৎ নদীর ধারে নেমে গিয়ে দু-একটা যা খালি নৌকো ছিল তাদের সঙ্গে আলাপ শুরু ক'রে দিলে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তারা কেউই মৌপুর যেতে রাজী হ'ল না। কেউ বললে, এখানে মাল নিতে হবে, কেউ বললে, অতদূর যাব না। এবং সকলেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইতে লাগল।

ব্যাপারগতিক দেখে বিনয় একটা বুড়া নৌকোওলাকে ধরে বললে, দেখ বাপু, যদি মনে ক'রে থাক যে আমাদের কাছে টাকা নেই ত সে ভয় ভেঙে দিতে পারি। তোমাদের যা ভাড়া আগাম নাও।

বুড়ো যেন এইবার একটু নরম হ'ল। সে বললে, সেখানে কোথায় যাবে বাবুরা?

বিনয় ইতস্ততঃ করছে দেখে প্রতুল ঝাঁ ক'রে বললে, আমার পিসীমার বাড়ী যাব, দক্ষিণ ইছেপুর।

বুড়ো বললে, তাই বল। তাহ'লে মৌপুর বল্‌ছ কেন? দক্ষিণ ইছেপুর ছাড়িয়ে মৌপুর আরও দেড় কোশ রাস্তা।

সর্বনাশ! প্রতুলের উপস্থিত বুদ্ধিকে আমরা পূর্ব-মুহূর্তেই যে ধন্যবাদ দিচ্ছিলুম সেটা কোন কাজেই এল না দেখছি!

বিনয় তখন সত্যি কথাই তাকে খুলে বললে, দেখ বাপু, আমরা দক্ষিণ ইছেপুর যাব বটে কিন্তু ফেরবার পথে আগে আমরা মৌপুর যাব।

আবার সেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। সে বারকতক আমাদের আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, সেখানে কার বাড়ীতে যাবে আপনারা? ভদ্দরলোক ত সে গাঁয়ে একঘরও নেই!

বিনয় বললে, কেন, রায়েদের বাড়ী!

বুড়ো হা-হা ক'রে হেসে উঠল। বললে, বুড়োমানুষের চোখে ধুলো দেবে আপনি? রায়েদের বাড়ী আজ তিরিশ-চল্লিশ বছরের ওপর বন হয়ে পড়ে আছে, ভূতের উৎপাতে

সে গাঁয়ে মানুষ টিকতে পারে না, সেখানে যাবে আপনারা? কী মতলবটা খুলে কও দেখি! নিশ্চয় পালিয়ে যাচ্ছ আপনারা! কোথায় যাবে ঠিক করনি?

এ আবার এক বিভ্রাট!

বিনয় দৃঢ়স্বরে বললে, তোমার কোন ভয় নেই, আমরা মোটেই পালিয়ে যাচ্ছি না। বাড়ী থেকে না ব'লে এলে কেউ এত জিনিসপত্র নিয়ে আসতে পারে? এমনি আমরা জায়গাটা দেখতে যাব, ইনি রায়বাবুদেরই ছেলে, পৈতৃক দেশটা দেখতে চান। তোমার কোন ভয় নেই, ভাল বক্‌শিশই দেব।

সে তখন একটু আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললে, দেখো বাবু, আমাকে না ফ্যাসাদে পড়তে হয় শেষবেলা! সে ভূতের দেশে তোমাদের নিয়ে ফেলিয়ে যদি কোন ভয়-ভীত পাও তখন আমাদের সব দোষ দেবে না!

এইবার বিনয় অমোঘ মন্ত্র ছাড়লে। পকেট থেকে দুটি টাকা বার ক'রে তার চোখের সামনে বাজাতে বাজাতে বললে, কিছু ভয় নেই তোমার বলছি ত! দেখ যাবে ত চল, নইলে আমি অন্য নৌকাওলা দেখি! টাকা পেলে সবাই যাবে।

বুড়ো আর লোভ সামলাতে পারলে না, বললে, আমিই যাব বাবু, কিন্তু একটু দেরি হবে। এই ক্ষেপ মালটা নাবিয়ে দিয়েই এস্‌তেছি—যাব আর চলে আস্‌ব। আপনারা ততক্ষণ একটু হাওয়া খাও!

অগত্যা আমরা তার ভরসাতেই বসে রইলুম। না থেকে কোন উপায়ও ছিল না। কারণ অন্য নৌকো ত সবগুলোই দেখেছি, কেউই মৌপুর যেতে রাজী হ'ল না।

বুড়ো নৌকো নিয়ে শীগ্‌গিরই অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা ওরই মধ্যে একটু ছায়া দেখে জায়গা ক'রে নিয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলুম, কিন্তু চারপাশের দোকানদার এবং রাহীরা এমন সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে চাইতে লাগল যে, প্রতুল বেচারী ত লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, সে একদৃষ্টে মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল আর ঘাড়ই তুলতে পারলে না। আমারও প্রায় সেই অবস্থা, কিন্তু বিনয় নির্বিকার দৃষ্টিতে তাদের দিকেই পাল্‌টা চেয়ে রইল।

এদিকে কিন্তু বুড়ো আর ফেরে না। দশ মিনিট, পনের মিনিট, আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা হয়ে গেল বুড়োর দেখা নেই। আমরা দস্তুরমত ভীত হয়ে পড়লুম, এমন কি বিনয়েরও মুখ শুকিয়ে উঠল। এত কাণ্ড ক'রে এসে শেষকালে পথে পা দেবার আগেই ফিরে যেতে হবে নাকি? আমার ত বাড়ী ফেরবার কথা মনে হয়ে দস্তুরমত মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়েছি বটে কিন্তু কাজটা যে ভাল করিনি তা গোড়া থেকেই টের পাচ্ছিলুম।

অবশেষে যখন আমরা হতাশ হয়ে ছট্‌ফট্ করতে আরম্ভ করেছি তখন দেখি দূরে বুড়োর নৌকো। বিনয় আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠল, আমরাও হাত-পা নেড়ে বুড়োকে তাড়াতাড়ি আসবার জন্য উৎসাহ দিতে লাগলুম।

বুড়ো এসে কিন্তু গম্ভীরভাবে বললে, বাবু আপনারা অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন কও দেখি? এই ত মোটে দশ মিনিট না পনের মিনিট গেছি!

আমি তাকে সময় সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেব ব'লেই স্থির করেছিলুম কিন্তু বিনয় আমার হাত ধরে এক টান্ মেরে বললে, আয়, আর বাজে বক্‌তে হবে না।

তিনজনেই জিনিসপত্রসুদ্ধ হুড়মুড়িয়ে গিয়ে নৌকোয় চেপে বসলুম। অবশ্য বুড়ো তখনই নৌকো ছাড়লে না, সে সে-পাত্রই নয়! সে মুড়ি কিনলে, ফুলুরি কিনলে, তামাক কিনলে, আরও কত কি নিয়ে বেশ ধীরেসুস্থে নৌকো ছাড়লে। আমাদের সময় সম্বন্ধে তার যে কোন উদ্বেগ নেই তা বেশ ভাল ক'রেই বোঝা গেল।

তারপর নৌকো যদি বা ছাড়ল, বুড়োর হাত-পা যেন নড়েই না। খানিকটা চলবার পর আমরা হিসেব ক'রে দেখলুম যে, এইভাবে চললে দুপুর রাত্রির আগে আমরা পৌঁছতে পারব না। প্রথমটা বিরক্তি, পরে উষ্মা প্রকাশ ক'রেও যখন কোন ফল পাওয়া গেল না, তখন বিনয় এক সময় বুড়োকে সরিয়ে নিজেই দাঁড় দুটো টেনে নিলে। তার যে এ বিদ্যেও জানা ছিল তা আমরা জানতুম না, বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলুম যে, বুড়োর চেয়ে সে ভালই চালাচ্ছে। বিনয় আমাদের বিস্ময়ের উত্তরে শুধু মুখ টিপে হেসে বললে, কাশীতে ছিলুম না! অনেক নৌকো বেয়েছি যে—

বুড়ো কিন্তু দিব্যি সপ্রতিভ। সে এমনভাবে নির্বিকার চিত্তে বসে বসে তামাকে টানতে লাগল যে, এই রকমই যেন বন্দোবস্ত ছিল তার সঙ্গে, এতে ব্যস্ত হবার কিছুই নেই। কিন্তু এতে ক'রে ফল হ'ল এই যে, মৌপুরে আমরা যখন পৌঁছলুম তখন সূর্যদেব আকাশের পশ্চিম প্রান্তে হেলে পড়েছেন, সন্ধ্যার আর বড় বেশি দেরি নেই। অজানা দেশ, জনবিরল ও গৃহবিরল গ্রাম, যতদূর দৃষ্টি যায় অধিকাংশই জঙ্গল, কদাচিৎ দুই-একটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কুটির নজরে পড়ে মাত্র। একে এই বুনো জায়গা, তার উপর যাচ্ছি আমরা ত্রিশ বছর ধরে জঙ্গল হয়ে পড়ে রয়েছে এমন হানাবাড়ীতে ভূতের সন্ধানে। সুতরাং সন্ধ্যা হওয়াটা যে মোটেই এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় নয়, তা বলাই বাহুল্য।

আমরা উদ্বিগ্ন মুখে নৌকো থেকে মালপত্র নিয়ে নামলুম এবং মাঝিকে পরের দিন এই সময়ে হাজির থাকতে ব'লে ভাড়া এবং বক্‌শিশ বাবদ দুটি টাকা চুকিয়ে দিয়ে দুরু-দুরু বক্ষে যাত্রা করলুম প্রতুলদের পিতৃ-পিতামহের বাসভবনের উদ্দেশ্যে।

যেখানে নামলুম সেখানেও কোন লোক দেখতে পেলুম না, ভেতরে এগিয়ে গিয়েও কোন লোক দেখা গেল না। এমন নিস্তব্ধ যে সে গ্রামে কোন লোক বাস করে কিনা তাই-ই বোঝা গেল না। বরং যত ভেতরে যেতে লাগলুম, অর্থাৎ লোকালয়ের শেষ যোগসূত্রস্বরূপ জলপথ থেকে যত দূরে যেতে লাগলুম ততই যেন গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল।

অথচ আশ্চর্য বিনয়ের মনের জোর, সে নির্ভয়ে এবং দ্রুতগতিতে মাঠের পথ ধরে বাঁশঝাড় বাঁচিয়ে এগিয়ে চল্‌ল। ক্রমশ গ্রামের চিহ্ন পর্যন্ত আমাদের বহু পিছনে পড়ে শেষে এক সময়ে মিলিয়ে গেল, মাঠের কোন অস্তিত্বই আর দেখা গেল না, শুধু বন আর বন।

পথও সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর হয়ে এল, যাওয়া কষ্টকর থেকে ক্রমে দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌ল। অবশেষে প্রায় মাইল দেড়েক হাঁটবার পর প্রতুল এক সময় ব'লে উঠ্‌ল—ঐ যে!

চমকিত হয়ে চেয়ে দেখলুম, সত্যিই আমরা সেই অতি বিখ্যাত রায়বাড়ীর সামনে এসে

পড়েছি। সেখানটায় জঙ্গল এত ঘন যে, আমরা সেই বন সরিয়ে পথ ক'রে নিতেই বিব্রত ছিলুম ব'লে এতক্ষণ দেখতে পাইনি, কিন্তু এইবার একেবারে সামনে এসে পড়েছে। প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ী, এককালে হয়ত প্রাসাদই ছিল, কিন্তু এখন তাকে পোড়ো বাড়ী ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সামনের পাঁচিল ভেঙে পড়েছে, ফটকটা বেঁকে কাৎ হয়ে পড়ে রয়েছে উঠানে, যেখানে আগে হয়ত চমৎকার ফুলগাছ ছিল, সেইখানেই এখন বুনো গাছ ও কাঁটাগাছ। সামনে এতই ঘন জঙ্গল যে, কিছুতেই কোন ফাঁকে তার মধ্যে ঢোকা গেল না। তখন বিনয়ের প্রস্তাবমত আমরা আস্তে আস্তে বাড়ীটার পেছনদিকে যেতে লাগলুম—কখনো গাছের ডাল ভেঙে, কখনো অতিকষ্টে দুটি ডালের ফাঁক দিয়ে। প্রতিমুহূর্তে সাপ বা বিছার কামড়ের ভয়, তারপর মনে হ'তে লাগল যে, বাঘ বা অন্য কোন জন্তু থাকাও বিচিত্র নয়। অর্থাৎ তখন আমাদের মনে হচ্ছে যে, ভূতের উপদ্রব থেকে যদি বা বাঁচি, এ বিপদে আর নিস্তার নেই।

কিন্তু এইভাবে খানিকটা অগ্রসর হ'তেই সহসা এক সময় দেখা গেল যে, সুদূর জঙ্গলের দিক থেকে একটি সঙ্কীর্ণ পায়েচলা পথ পাশ দিয়ে ঘুরে বাড়ীর পেছনদিকে খিড়কীর দোর পর্যন্ত গেছে। অবশ্য সেটা যে পায়েচলা পথ তা আমরা আগে বুঝতে পারিনি, বিনয়ই প্রথম আমাদের সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করলে। সেখানটায় ঘন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে হাতখানেক একটা ফাঁক এঁকে-বেঁকে চলে গেছে, আর ঘাস---ঘাসও সেখানে যেন একটু দলিত, তেমন জোর নেই—

প্রতুলের মনে সংশয় ছিল কিন্তু বিনয় জোর ক'রে বললে, এ নিশ্চয়ই মানুষের যাওয়া আসার পথ! নইলে খামোকা এখানটায় ফাঁকা হবে কেন? কিন্তু কে করলে এ পথ? ভূতের ত শুনেছি শরীর নেই!

এই ব'লে বিনয় মুখ টিপে একটু হাসলে। কিন্তু এই ভূতের কথাটাই এতক্ষণ আমরা ভুলেছিলুম, সহসা কথাটা মনে পড়ে যেতে সামনের ঐ প্রকাণ্ড ভাঙা বাড়ীটার দিকে চেয়ে আর একবার গা শিউরে উঠল।

বিনয় ততক্ষণ এগিয়ে চলেছে। আমরাও অগত্যা তার পিছু পিছু এসে বহুকালের অব্যবহৃত ভাঙা খিড়কীর দোর দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলুম! সেটা ঠিক খিড়কীর দোর নয় অর্থাৎ আমরা একেবারে অন্তঃপুরে আসতে পারিনি, প্রথম মহলের ভেতরদিকের উঠোনে এসেছি। যতদূর এক চাউনিতে বোঝা গেল, বাড়ীটা তিনমহল।

বাড়ীর মধ্যের অবস্থাও শোচনীয়। পাকা উঠোনে বহুদিনের আবর্জনা জমে তা থেকে অসংখ্য আগাছা গজিয়েছে। দেওয়ালের ফাটল থেকে বোধ হয় শতাধিক অশথ গাছ উঠেছে। বাড়ীটার জানালা-দরজা অধিকাংশই ভেঙে পড়েছে, অত বড় বাড়ীটার সর্বত্র একটা ভয়াবহ আবছায়া, একটা ছমছমে ভাব।

আমরা উঠোনের মধ্যে এসে কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলোবার পর নজরে পড়ল যে, সামনেই একটা বড় সিঁড়ি ওপরের বারান্দা পর্যন্ত চলে গেছে, এবং সিঁড়িটা ভাঙা হ'লেও তা এখনও ব্যবহার করা যায়। তখন সন্ধ্যার আর মোটেই বিলম্ব ছিল না,

নেহাৎ গরম কাল ব'লেই তখনও আকাশের কোণে কিছু আলো জমে ছিল, সুতরাং অবিলম্বে কোথাও নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নেওয়া দরকার।

বিনয় সিঁড়িটা দেখিয়ে বললে, চল্ আমরা ওপরে উঠে কোথাও একটা রাত কাটাবার মত জায়গা ঠিক ক'রে নিই। আর একটু দিন থাকতে এলেই সুবিধে হ'ত, কিন্তু তা যখন হ'লই না, তখন যত তাড়াতাড়ি হয় একটা আশ্রয় ঠিক করা উচিত।

তখন আমরা ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে ছুঁচো, ইঁদুর, সাপ প্রভৃতি বাঁচিয়ে ওপরে উঠলুম। দালানের সামনেই একখানা মাঝারি সাইজের ঘর দেখে আমরা স্থির করলুম যে, এইখানেই আজ রাত্রিবাস করা যাক্। মন স্থির করা মাত্র বিনয় চট্‌পট্ একটা পুরোনো খবরের কাগজ পকেট থেকে বার ক'রে সেইটেরই সাহায্যে ঘরের মধ্যের অসংখ্য শুক্‌নো পাতা আর ধুলো সরিয়ে একপাশে জড়ো করলে, তারঁপর তারই পাশে কম্বলটা বিছিয়ে ফেলে বসবার জায়গা করলে।

প্রতুল ভয়ে ভয়ে জঞ্জালগুলোর দিকে চেয়ে বললে, ওগুলো বাইরে ফেলে দিই—কি বল?

বিনয় ঘাড় নেড়ে বললে, উঁহু, ও থাক্।... কাজে লাগবে।

কতকগুলো জঞ্জাল কি কাজে লাগবে ঠিক না বুঝলেও আমরা প্রতিবাদ করলুম না, ঝুপ্‌ঝাপ কম্বলের ওপর বসে পড়লুম। তখন যে ঠিক কি ভাবছিলুম কিংবা ঠিক কি রকম মনের অবস্থা তা আজ আর পরিষ্কার ক'রে কিছু বোঝাতে পারব না। তবে এইটুকু বললেই বোধ হয় তোমরা বুঝে নিতে পারবে যে, আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা একরকম বন্ধ ক'রেই বসেছিলুম।

বেচারী বিনয়!

তার ক্লান্তি ত নেই-ই, বিরক্তিও নেই। সে ক্যানিং থেকে তার বড় থার্মোফ্লাস্কে জল ভরে এনেছিল। তারই খানিকটা সে স্পিরিটল্যাম্পের সাহায্যে গরম ক'রে খানিকটা চা প্রস্তুত ক'রে ফেললে এবং বিস্কুট, রুটি, মাখন প্রভৃতি খাবার একখানা কাগজের ওপর ঠিক ক'রে সাজালে। আমি প্রথমে চা খাব না বল্‌ছিলুম কিন্তু বিনয় বললে, রাত্রিতে জেগে থাকতে হবে, আর রাত জাগ্‌বার পক্ষে চা-টা খুব দরকারী। তা ছাড়া এইবেলা একটু কিছু খেয়ে শরীর সুস্থ ক'রে নাও, রাত্তিরে যদি রায়বাড়ীর অতিথিরা উপস্থিত হন্ ত তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য full energy ব্যয় করতে হবে ত!

এটা তার পক্ষে পরিহাস, কিন্তু কথাটা আমার মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল যেন সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল—আমি মনে বল আনবার জন্য সাগ্রহে চায়ের পাত্র মুখে তুললুম।

আহারাদি সেরে বিনয় বাক্স গুছিয়ে ঠিক ক'রে রাখতে রাখতেই বাহিরে দিব্যি অন্ধকার ঘনিয়ে এল। উঃ সে কী জমাট অন্ধকার—কলকাতায় বা শহরে যারা বাস করে তারা সে অন্ধকারের কথা কোনদিন কল্পনা পর্যন্ত করতে পারবে না। বিনয় তার আনা ছোট মোমবাতির একটি জ্বেলে দিলে, তারপর জুৎ ক'রে বসে গল্প শুরু করলে। অর্থাৎ এক কথায় আমরা আমাদের অজানা অতিথিদের প্রতীক্ষায় রইলুম।

বিনয় গল্প করতে পারত ভাল। কথা সে খুব আস্তে আস্তেই বলছিল বটে, কিন্তু তার বিচিত্র সব আখ্যায়িকার মধ্যে এমন উত্তেজনার ব্যাপার ছিল যে, শীগ্‌গিরই আমরা তেতে উঠলুম। ক্ষীণ কম্পমান্ বাতির শিখায় বাইরের অন্ধকার আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল সেদিকে চেয়ে মনের মধ্যে ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলেও মোটের উপর আমরা ভালই ছিলুম। খালি বাড়িতে চুপ ক'রে বসে বসে প্রতিটি ছোট ছোট শব্দ গোনাতেই সাহস যা কিছু তার অর্ধেক চলে যায়। সে দায় থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যই বোধ হয় বিনয় সেদিন একা অত বকে যাচ্ছিল।

তিন আনায় বত্রিশটা যে মোমবাতি পাওয়া যায় সেই বাতি। একটা পুড়ে শেষ হয়ে গেল, আর একটা, তারপর আরও একটা জ্বালা হ'ল। প্রতুলের হাত-ঘড়িতে তখন প্রায় বারটা বাজে অর্থাৎ মধ্যরাত্রি হয়েছে ঠিক। বিনয় তখনও বকে চলেছে! সেই সময় আমাদের অন্যমনস্ক ভাব চম্‌কে দিয়ে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। প্রকাণ্ড একটা থান ইঁট আমাদের কম্বলের অনতিদূরে বিরাট শব্দ ক'রে এসে পড়ল। ঘরের তিনটি জানলা ও একটি দোর কিন্তু সেদিক দিয়ে যে ইঁটটা আসেনি সে বিষয়ে আমাদের মনে কোন সংশয়ই জাগল না পড়েছে যেন ছাদ গলে টুপ্ ক'রে ওপর থেকে!

কিন্তু ছাদে ত কোন গর্ত নেই। ছাদের দিকে চেয়ে দেখে আমরা মুহূর্তকাল যেন পাষাণের মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম, প্রত্যেকেই স্তম্ভিত, প্রত্যেকেই ভয়ার্ত। তারপরই বিনয় ক্ষিপ্রহস্তে এক অসমসাহসিক ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হ'ল। শুকনো পাতাগুলো কেন যে সে ফেলতে দেয়নি তা এতক্ষণে বোঝা গেল। স্পিরিটের শিশিটা থেকে দু'চার ফোঁটা পাতাগুলোর ওপর ঢেলে দিয়ে বাতিটা ঠেকাতেই সেগুলো ধূ-ধূ ক'রে জ্বলে উঠল এবং দেখতে দেখতে প্রচণ্ড অগ্নিশিখায় সমস্ত ঘরটা দিনের মত আলো হয়ে গেল।

সেই আলোতে মুহূর্ত-দুই ছাদের দিকে চেয়ে থেকেই বিনয় খাপ থেকে তার ভোজালিটা টেনে বার করলে। তারপর সেটা ডান হাতে চেপে ধরে বাঁ-হাতে টর্চটা জ্বেলে শুধু বললে তোরা আমার পিছনে পিছনে আয়, ওপরে যেতে হবে এবং পরক্ষণেই সে অন্ধকার দালানের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল।

॥ ৮ ॥

দালানের ওদিক থেকে সিঁড়িটা ওপরে উঠে গিয়েছে, আমরা সকলে সেই দিকেই ছুটলুম বিনয় আমাদের চেয়ে প্রায় গজ তিন চার দূরে এগিয়ে যাচ্ছিল. তার যেন ভয়ডর কিছু নেই এধারে আমাদের তখন ভয়ে পা ভেঙে আসছে, ছুটে যাবার শক্তি পাচ্ছি না। পেছনের ভয় যদি আরও প্রবল না হ'ত তাহ'লে হয়ত আমরা পথের মধ্যেই বসে পড়তুম। কিন্তু এ ভয়ঙ্কর পুরীতে প্রয়োজন আমাদের ঐ ছেলেটিকেই যে সব চেয়ে বেশী।

সিঁড়িটা প্রকাণ্ড, ঘরগুলো যে পরিমাণ উঁচু, সিঁড়ির সংখ্যা তেম্‌নি অসংখ্য তা বলাই বাহুল্য। সেকালের প্রশস্ত সিঁড়ি এবং বাহারী কাজ করা বিচিত্র রেলিং। কিন্তু এ সবই পরে লক্ষ্য করেছিলুম। তখন আমাদের কোনদিকে দৃষ্টি ছিল না, ভয়ার্ত একাগ্রতায় তখন আমরা শুধু ওপরের দিকে ছুটে চলেছি।

অবশেষে একসময় আমরা তেতলায় পৌঁছলুম। ওপরেও নীচের তলার মত চওড়া দালান, তার সাম্‌নে এক সার ঘর। ঠিক যে ঘরটায় আমরা ছিলুম তারই ওপরের ঘরটা ছিল আমাদের লক্ষ্য। দোরের সামনে এসে বিনয় থমকে দাঁড়াল, বোধহয় ঘরের মধ্যে কোন অজ্ঞাত বিপদ অপেক্ষা করছে কিনা তারই আশঙ্কায়—তারপর টর্চ আর ভোজালিটা উদ্যত ক'রে বিনয় ঘরের মধ্যে ঢুকল, আমরাও দুরু-দুরু বক্ষে পিছু পিছু ঢুকলুম। কিন্তু আমাদের এত তোড়জোড় বৃথা হ'ল। ঘরে ঢুকে দেখলুম ঘর একেবারে খালি। অন্ততঃ কোন শরীরী প্রাণী সেস্থানে নেই।

ফলে বলা বাহুল্য, প্রথমটা আমরা একটা অদ্ভুত আতঙ্ক অনুভব করলুম। একটা হিম শৈত্য যেন সর্বাঙ্গ কণ্টকিত ক'রে শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়ে নীচের দিকে নেমে গেল। সেটা যে ভূতের ভয় কিংবা আর কিছুর তা আজ আর বলতে পারব না। কিন্তু সে ভাবটা আমাদের মুহূর্ত কয়েকের বেশী রইল না, তার কারণ ইতিমধ্যেই কী জানি কোন্ বিজয় উল্লাসে বিনয় চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল।

তখন আমরা কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে চোখ খুলে ভাল ক'রে চেয়ে দেখলুম। ঘরের মেঝের মাঝখানটা খুঁড়ে নীচের একটা টালি পর্যন্ত পরিষ্কার ক'রে গর্ত করা রয়েছে। একপাশে সেই সব রাবিশ জড়ো করা রয়েছে আর তার সঙ্গে কতকগুলো থান ইট। এ ছাড়া ঘরের ডানপাশের দেওয়ালে একখানা কাপড় টাঙানো এবং কোণে কতকগুলো হাঁড়ি-কুঁড়ি কাঠ-কুটো আর একটা গুটোনো বিছানা। অর্থাৎ ঘরে যে জীবটি থাকে সে যে আর যাই হোক্ অশরীরী নয় বরং দস্তুরমত শরীরী, তার প্রমাণ জ্বলজ্যান্ত আমাদেরই চোখের সামনে সাজানো রয়েছে। একটা মানুষ নিশ্চয় এখানে বাস করে, রেঁধেবেড়ে খায় এবং ঘুমোয়!

বিনয় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, এ ঘরে ভূত নয়, মানুষই থাকে, দিব্যি রেঁধেবেড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। যে থাকে সে-ই ঐ টালিখানি খুলে গর্ত দিয়ে আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে ইটখানা ছুঁড়েছে।

আমার গা এ কথাটায় বেশ একটু তেতে উঠল। জনহীন পুরীতে ভূতের ভয়ে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন আর একটা মানুষ যে আমাদের কাছে আছে এই কথাটা জানতে পারলেই মনে ভরসা আসে। তা সে শত্রু হ'লেও ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রতুলের তখনও আতঙ্ক ঘোচেনি, সে পাংশুমুখে প্রশ্ন করলে, কিন্তু কে সে মানুষ?

প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও যেন একটা চমক ভাঙল। সত্যিই ত—মানুষ জেনে আমরা লাফাচ্ছি বটে, কিন্তু মানুষটিও ত সাধারণ নয়। এই হানাবাড়ী চারিদিক থেকে নিবিড় জঙ্গলে ঘেরা, জনবসতি থেকে অনেক দূরে এখানে যে একলা বাস করে, আবার

সহায়সম্বলহীন তিনটে ছেলের মাথায় ইট ছুঁড়ে মারে সে কি রকম লোক? কি উদ্দেশ্যে সে এখানে থাকে, কি করে?

তিনজনে শুধু পরস্পরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলুম। কারুর মাথাতেই যেন কোন বুদ্ধি জোগাচ্ছিল না। শেষকালে বিনয়ই কথা কইলে, বললে, চল খুঁজে দেখা যাক্—

প্রতুল সভয়ে বললে, এই রাত্তিরে?

বিনয় বললে, কিন্তু না খুঁজে এই রাত্রে অজানা শত্রুর সঙ্গে রাত্রিবাস করাই কি নিরাপদ হবে? কোথা থেকে কি বিপদ আসবে তার ঠিক কি? তা ছাড়া ক্ষতিই বা কি, আমরা তিনজনে দলবদ্ধ হয়ে যদি একসঙ্গে থাকি তাহ'লে কে কি করতে পারবে আমাদের? ঐ ত ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল লোকটা, পারলে কি? ভূতের ভয়ে আমরা চুপ ক'রে বসে রইলুম না, এখন মানুষের ভয়ে থাক্‌ব?

প্রতুল বিনয়ের মুখের দিকে চেয়ে যেন কিছু ভরসা সঞ্চয় ক'রে নিলে, তারপর বললে, চল, তাই যাই—

ইতিমধ্যে আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারছিলুম না, ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে এক সময় চুপি চুপি প্রশ্ন ক'রে নিলুম, আচ্ছা তুই কি মানুষ সন্দেহ ক'রেই ওপরে উঠেছিলি?

বিনয় ঘাড় নেড়ে বললে, নিশ্চয়। মানুষ ছাড়া কি হ'তে পারে? আমাদের একটা আঙুল কেটে গেলে কোন কাজ করতে পারি না, আর যাদের দেহ-ই নেই তারা ইট ছুঁড়বে কি ক'রে? তা ছাড়া আমি জোর আলোতে টালিটার চিড় খাওয়ার দাগ দেখতে পেয়েছিলুম যে!

ঘরের বাইরে এসে আমাদের প্রধান সমস্যা হ'ল যে, কোথা খুঁজতে শুরু করব? প্রতুল এইবার আমাদের একটা ভাল রকম বুদ্ধি দিলে, সে বললে, আচ্ছা এর ওপরটায় কি আছে দেখে আসি চল। একদিক থেকে সমস্ত বাড়ীটা দেখাই ভাল, তাহ'লে আর লুকোবার জায়গা পাবে না।

এই ব্যবস্থাই যে সমীচীন তা আমরা সকলেই মানতে বাধ্য হলুম। একই সিঁড়ি নীচে থেকে তিনতলার ছাদ বা চারতলা পর্যন্ত উঠে গেছে, সেই সিঁ ধরেই আমরা বরাবর ওপরে উঠতে লাগলুম। হাওয়া মন্দ ছিল না (যদিও ভয়েই হোক বা উত্তেজনাতেই হোক, আমাদের কাপড়জামা ঘামে ভিজে সপ্‌সপ্ করছিল), আর সেই হাওয়াই ভাঙা পোড়োবাড়ীর দোরজানলায় লেগে এমন এক-একটা অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ হচ্ছিল যে, এখনও সে কথা মনে হ'লে বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্ করতে থাকে, তখনকার ত কথাই নেই। তার ওপর আলোও যথেষ্ট নেই, একমাত্র টর্চের আলো, তাতে আলো যতটা হচ্ছিল তার চেয়ে বেশী তার পাশের অন্ধকারটাকে আরও রহস্যময় করে তুলছিল। তবু ভাগ্যিস্ বিনয় বুদ্ধি ক'রে টর্চটা খুব জোর নিয়েছিল।

চারতলায় পৌঁছে দেখলুম সেখানে মাত্র দু'খানি ঘর ওপাশে। বাকি ছাদটা খালি পরে আছে। অন্য মহলের চারতলায় ঘরই নেই। আরও একটা ব্যাপার যা ছাদ থেকে লক্ষ্য করলুম, এক নীচের তলা ছাড়া এক মহল থেকে অন্য মহলে যাবার কোন রাস্তা নেই।

ছাদটায় বহুকাল থেকে আবর্জনা জমবার ফলে সেটা প্রায় জঙ্গল হয়ে আছে। এক হাঁটু ক'রে আবর্জনা আর তারই মধ্যে মধ্যে অসংখ্য আগাছা। অবস্থা দেখে আমি একবার বল্‌লুম, এর মধ্যে ছাদে আর কেউ থাকবে না বিনয়, চল্ ফিরে যাই।

বিনয় ঘাড় নেড়ে বললে, তুই জানিস্ না কেষ্ট, এ বাড়ীতে যারা বাস করে তাদের আর এ জঙ্গলে ভয় কি?

অগত্যা সন্তর্পণে, সেই একটি মাত্র আলোর রেখা ধরে আমরা অগ্রসর হ'তে লাগলুম। খানিকটা যাবার পরই প্রতুলের পাশ দিয়ে খস্ খস্ ক'রে কি একটা সরীসৃপ জাতীয় জীব চলে গেল, হয় সাপ নয় বিছে, কথাটা স্মরণ হওয়া মাত্র যেন সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু আমাদের আগে আগে আর একটা মানুষ, এত নির্ভয়ে এবং নির্বিকারচিত্তে হেঁটে যাচ্ছিল যে, ভয়ের কথাটা মুখে উচ্চারণ করতেও লজ্জা বোধ হ'তে লাগল।

ঘরগুলোর সামনে গিয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এ ঘরের দোরের কপাটগুলো ভাঙা নয়, প্রত্যেকটাই গোটা আর তা বেশ পরিপাটি ভাবে বাইরে থেকে শেকল দিয়ে বন্ধ করা।

আমরা খানিকক্ষণ সকলেই চুপ ক'রে সেই বদ্ধদ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর আমাদের সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করলে প্রতুলই, সেদিন যেন তার মাথাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, সে বললে, ভূতের আস্তানা যে ভাল ছিল কেষ্ট, শেষকালে আমরা ডাকাতের আড্ডায় এসে পড়লুম না ত! আমি হাসবার চেষ্টা করলুম, ঠাট্টা মনে ক'রে কিম্বা ঠাট্টা ব'লে উড়িয়ে দেবার আশাতে—কিন্তু বিনয় গম্ভীর মুখে বললে, কথাটা নেহাৎ মিছে বলিসনি প্রতুল, আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছে।

আরও মুহূর্তকাল আমরা সকলে চুপচাপ, তারপর বিনয় এগিয়ে গিয়ে ঝনাৎ ক'রে একটা দোর খুলে ফেললে। আমরা তারই কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে যা দেখলুম তাতে আমাদের সন্দেহটা আর সন্দেহ রইল না। ঘরের মধ্যে সার সার কতকগুলো বিছানা পড়ে রয়েছে আর তার চারিদিকেই মনুষ্যবাসের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

বিনয় বহুক্ষণ নিঃশব্দে সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমরা ত ভাল ক'রে কিছু ভাবতেও পারছিলুম না। এখন দেখছি যে সত্যি-সত্যিই অশরীরী ভূত আমাদের ছিল ভাল, তার ভয়টা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এতগুলো লোক, খুব সম্ভব চোর-ডাকাত—হয়ত বা সশস্ত্রই হবে—কোথা থেকে আমাদের আক্রমণ করবে তার ঠিক কি?... দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোধ হ'তে লাগল যে পা যেন একটু একটু ক'রে কাঁপছে।

এবারেও ব্যবস্থা দিলে প্রতুল, সে বললে, বিনয়, এতগুলো লোক নিশ্চয়ই এ বাড়ীতে নেই। একটা লোককে বোধ হয় পাহারা দেবার জন্য রেখে গিয়েছিল, সেই লোকটাই আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা ক'রে শেষ পর্যন্ত সরে পড়েছে। যদি সে দলকে খবর দিতে গিয়ে থাকে তাহ'লে আমরা কিন্তু বিষম বিপদে পড়ব,—এই তিনটে ছেলে আমরা, আর ওরা অতগুলো লোক, যদি শুধু হাতে আমাদের মারতে আসে তাহ'লেও পেরে উঠব না।

বিনয় শান্তস্বরে বললে, তাহ'লে তুই কি করতে বলিস্?

প্রতুল বললে, বরং আমরা এখন এখান থেকে চলে যাই, কোনমতে কি আর জঙ্গলে পথ দেখে দেখে পালাতে পারব না! কাল সকালে গ্রামের মধ্যে থানা খোঁজ ক'রে পুলিশে খবর দিলেই হবে। একেবারে পুলিশ-টুলিশসুদ্ধ কাল তখন আসা যাবে।

বিনয় একটুখানি ভেবে নিয়ে বললে, বেশ তাই যাওয়া যাক্। কিন্তু গ্রামে ফিরে গেলে চল্‌বে না বাইরে গিয়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে বসে থেকে দেখব এরা কারা আর কি করে?

আমি সভয়ে বাইরের অন্ধকার অরণ্যের দিকে চেয়ে বললুম, বনের ভিতর বসে থাকা কি উচিত হবে বিনয়, সাপ-খোপ, বাঘ-ভাল্লুক কত কি থাকতে পারে!

বিনয় হেসে বললে, সে ভয় ঐ বনের মধ্যে দিয়ে গ্রামে ফিরতে গেলেই কি থাকবে না? তা ছাড়া এ বনে বাঘ-ভাল্লুক থাকলে এই ভাঙা বাড়ীতে মানুষ বাস করতে পারত না! তবে হ্যাঁ, সাপ থাকতে পারে এবং নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু 'সাপের লেখা' মানে অদৃষ্টে না থাকলে সাপ কামড়ায় না—

আমরা ত মরিয়া হয়েই বেরিয়েছি, এখন আর উপায় কি? আমরা বিনয়ের কথাই মেনে নিলুম, তা'ছাড়া আমাদের তখন ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর এই অবস্থা। বিনয় নামতে নামতে বললে, আমাদের ব্যাগ্‌টা ফেলে রেখে যাওয়া উচিত হবে না, ওটা নিয়েই সরে পড়তে হবে।

আমরা সবাই সে প্রস্তাব অনুমোদন করলুম। অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দে আলোটা নিবিয়ে আমরা নেমে এলুম যদি কারুর কোন খোঁজ পাই এই ভরসায়। কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ পেলুম না। আমরা যে জঞ্জাল আর পাতাগুলোয় আগুন ধরিয়ে গিয়েছিলুম সেগুলো বোধ হয় কিছু কিছু জ্বলছিল, কারণ সে ঘরের দোর দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া বেরুচ্ছে আর আগুন জ্বলার মৃদু ফট্ ফট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আমরা দালানটা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঢুকলুম। কিন্তু ঘরে ঢুকেই আমাদের দেহের রক্ত জল হয়ে গেল। ঘরে কোন মানুষ নেই, আগুনটাও তখনো ধোঁয়াচ্ছে, কিন্তু আমাদের সেই ব্যাগ, কম্বল, বাতির প্যাকেট, বিস্কুটের বাক্স যা কিছু বার করা ছিল তা সমস্তই অন্তর্হিত হয়েছে। শুধু জলের ফ্লাস্কটা কেন কে জানে পড়ে রয়েছে!

মনে হ'ল যে, আজ রাত্রে আমাদের বিস্ময় আর আতঙ্কের বোধ করি শেষ হবে না। এইবার বিনয়ও যেন একটু ভয় পেলে, বহুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। আর বাস্তবিক ভয় পাবারই কথা। কোন মানুষকে দেখতে পাচ্ছি না, কারুর পায়ের শব্দ পর্যন্ত নেই, অথচ সে লোকটি আমাদের চারপাশে অত্যন্ত কাছাকাছি নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়ত সে আড়াল থেকে আমাদের দেখছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সর্বপ্রকার অনুভূতির অগোচর এই মানুষটি আরও কি অনিষ্ট করবে তা কে জানে?

একবার এমনও মনে হল, সত্যিই ভূত নয় ত? সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে কাঁটা দিয়ে উঠল। জোর ক'রে সে চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেললুম, ভূত কখনও বিছানায় শোয়? নিশ্চয়ই মানুষ, মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রতুল প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, আমি ত তখনই বারণ করেছিলুম বিনয়, এসব ঝঞ্ঝাটে কাজ নেই। তা তুই শুনলি না। যা কিছু ছিল সব যে নিয়ে পালাল। এখন উপায় কি হবে?

বিনয়ের যেন ঘুম ভাঙল, সে বললে, আমরা যখন ছাদে গিয়েছিলুম সেই অবসরে লোকটা নেমে এসে আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে আবার কোথায় লুকিয়েছে কিংবা পালিয়েছে। পালালেও কিন্তু বেশি দূর যেতে পারেনি। এই ত সময়, এর ভেতরে কোথায় যাবে? চল আমরা খুঁজে দেখি গে—

তার উৎসাহে আমরাও যেন কিছু প্রাণ ফিরে পেলুম। তখন শুরু হল ওপর নীচে ছুটাছুটি ক'রে খুঁজে দেখা। ভাল হ'ত যদি সিঁড়ির মুখে কাউকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা ওপরটা খুঁজতে পারতুম, কিন্তু বিনয় সে প্রস্তাব করতে আমরা দু'জনেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। অর্থাৎ কারুরই সাহস হ'ল না।

বিনয় প্রতুলের মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুই না হয় আমার কুক্‌রীটা নিয়ে দাঁড়া না, সাহস হবে না?

প্রতুল যে লাল হয়ে উঠল তা দেখতে না পেলেও মনে মনে অনুভব করলুম, সে অস্পষ্ট কণ্ঠে কোনমতে ব'লে ফেললে, সে আমি পারব না ভাই।

বিপন্ন হয়ে বিনয় বললে, তা হ'লে আমি-ই না হয় নীচে দাঁড়াই, তোরা খুঁজে দেখ্—

প্রবলবেগে ঘাড় নেড়ে আমি বললুম, তাতে দরকার নেই বিনয়, যদি তোর কোন বিপদ হয় ত আমরা আর বাঁচব না। তার চেয়ে একসঙ্গেই যাই, যা হবার হবে।

এটা যে আমার কত বড় ভণ্ডামী তা বিনয়ের অন্ততঃ বুঝতে বাকি রইল না। ভয়টা তার জন্য যতটা, আমার নিজের জন্য তার চেয়ে ঢের বেশী। কিন্তু বিনয় একটি কথাও বললে না। একটা তিরস্কার করলে না, একটা ধিক্কার দিলে না, এমন কি জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পর্যন্ত ফেললে না। শুধু খুব ছোট ক'রে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, তবে তাই চল্—

আজ এতদিন পরে আমাদের সেদিনের কাপুরুষতার কথা মনে ক'রে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করে আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে সেই মানুষটিকে বাহবা না দিয়ে পারি না, যে নিঃশব্দে আমাদের সেদিনকার সমস্ত কাপুরুষতার দুর্বার বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিল, সমস্ত অসুবিধা একা সহ্য করেছিল, কিন্তু একটা কথাও তার জন্যে কাউকে বলেনি, বিন্দুমাত্র প্রতিবাদও করেনি।

কিন্তু ফল হ'ল এই যে, ওপর নীচে খোঁজাখুঁজি ক'রেও কোন লোকের পাত্তা পাওয়া গেল না। হয়ত সে সেই সমস্ত সময়টা আমাদের অত্যন্ত কাছে কাছেই বেড়াচ্ছিল এবং আমাদের বৃথা চেষ্টা দেখে উপহাসের হাসি হাসছিল।

কিন্তু উপায় কি?

নীচের তলার অন্ধকার ঘরগুলো খুঁজতে খুঁজতে আমরা মনুষ্যবাসের আরও দু-একটা চিহ্ন পেলুম। একটা ঘরের কোণে দুটো 'জালা', বোধ হয় তাতে পানীয় জলই থাকে কিংবা আর কিছু। তার পাশে কতগুলো হাঁড়িকুঁড়ি জড়ো করা। খুব সম্ভব তাতে রান্নাই হয়, যদিও কাছাকাছি কোথাও উনুন খুঁজে পেলুম না।

আরও একটা জিনিস যা আমাদের নজরে পড়ল তা হচ্ছে একটা ধারালো বর্শা—ঠাকুরদালানের এক কোণে দাঁড় করানো ছিল! দেখামাত্র বিনয় সেটা তুলে নিলে তারপর সেটাকে হাতে ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখে আমার হাতে দিয়ে বললে, এইটে তুই নে কেষ্ট। যাক্—তবু আর একটা হাতিয়ার পাওয়া গেল।

তারপর একটু মুচ্‌কি হেসে বললে, মন্দ হয় না, যদি ওদের হাতিয়ার দিয়ে ওদেরই মারতে পারি।

কথা শুনে যেন বুকটা কেঁপে উঠল, তবুও একটা অস্ত্র হাতে ক'রে মনে যেন অনেকটা বল এল।

গা-মাথা ঝিমঝিম করে উঠল

আমরা সে মহলটা শেষ ক'রে ভেতরের ভয়ঙ্করতর মহলে যাব কিংবা বাইরের মহলটা খুঁজব তাই ভাবছি, এমন সময় সহসা বিনয় আঙুল তুলে আমাদের নিস্তব্ধ হবার ইঙ্গিত করলে! আমরাও চুপ ক'রে কান পেতে ব্যাপারটা শুনতে পেলুম, ওধারের পেছনদিকের মহল থেকে কতকগুলি লোক কথা কইতে কইতে আস্‌ছে। এরা যে ডাকাত মুহূর্তমধ্যে এই কথাটা ভেবে নিয়ে আমরা পাথরের মত নিশ্চল হয়ে গেলুম।

বিনয় কিন্তু একটুখানি মাত্র চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে এক অসমসাহসিক কাজ করলে। হাতের ইঙ্গিতে আমাদের চুপি চুপি পেছনে আসতে ব'লে নিজে এগিয়ে দুটো মহলে প্রবেশদ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সেই আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে আগন্তুকদের যে চেহারা নজরে পড়ল তাতে গা-মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ ক'রে উঠল।

কতকগুলো কালো কালো যমদূতের মত ষণ্ডা লোক, তাদের প্রত্যেকেরই হাতে এক গাছা ক'রে মোটা লাঠি; শুধু একজন লোক, অনুমানে মনে হ'ল সেই দলপতি, তারই ডান হাতে একটা বর্শা আর বাঁ হাতে একটা মশাল জ্বলছে।

সেই লোকটিই কথা কইছিল, সে বললে, ব্যাপার কি ঈশান? আমি তো তোমার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!

ঈশান লোকটি দাড়িগোঁফওলা একটু বুড়ো গোছের, তাকে দেখামাত্র সেই যে আমাদের ওপরের ঘরের বাসিন্দা, বুঝতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হ'ল না। কারণ তারই ঠিক সামনে আমাদের সেই অতি বিখ্যাত ব্যাগটা পড়েছিল।

ঈশান উত্তেজিত হয়ে বললে, বলছি কর্তা, তুমি যদি না বোঝ। তিনটে একরত্তি ছোঁড়া বন ঠেলে এই বাড়ীতে এসে ঢুকেছে। এই দেখ তার সাক্ষী তাদের জিনিসপত্তর।

দলপতির বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি, সে বললে, কী বলছিস্‌ ঈশান? এই ভূতের বাড়ী, চারিদিকে এই জঙ্গল আজ তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে হানা হয়ে পড়ে রয়েছে। এখানে দিনের বেলায় পুলিশ পর্যন্ত ভয়ে আসে না, এইখানে এসেছে একরত্তি তিনটে ছেলে! তুই পাগল হ'লি নাকি? আজ এতদিনের মধ্যে এধারে একটা মানুষ আসেনি, তা জানিস্‌?

ঈশান দুটো হাত নেড়ে বললে, আমিও ত কর্তা প্রথমে ভূত মনে ক'রে ভয় পেয়েছিলুম। কিন্তু এ জিনিসগুলো কোথা থেকে এল কও দেখি! তাছাড়া তারা দিব্যি মানুষের মতই কথা কইছিল যে!

এই অত্যন্ত বিস্ময়কর কথা শুনে তা'রা কিছুক্ষণ সকলেই নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। মশালের আলোতে তাদের যতগুলো মুখ দেখা যাচ্ছিল প্রত্যেকটা মুখেই রীতিমত ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। যাক—ডাকাতরাও ভয় পায় তা'হলে! আর সেও কিনা আমাদের মত তিনটে নিতান্ত নিরীহ বালকের জন্যে! কথাটা ভাবতে সেই ঘোর সঙ্কটের মধ্যেও গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠল।

ঈশান ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু তোমরা এলে কেন কর্তা? আমি ত খবর দিতে পারিনি—

সর্দার বললে, জানলায় আগুন জ্বলতে দেখে আমরা ছুটে এলুম, ভাবলুম যে অমন ক'রে আগুন জ্বেলে তুই আমাদেরই ডাকছিস্‌।

ঈশান বললে, আগুনও ঐ ছোঁড়াগুলো জ্বেলেছিল, আমি ওদের ভয় দেখাবার জন্যে—

এই পর্যন্ত শোনবার পরই বিনয় আমাদের হাত ধরে নিঃশব্দে টেনে বাইরে নিয়ে এল। চুপিচুপি বললে, এইবার ওরা নিশ্চয় একবার গোটা বাড়ীটা খুঁজে দেখবে। বাইরে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকতে না পারলে নিস্তার নেই।

যুক্তিটা যে খুব খাঁটি তা আমরাও মেনে নিলুম। কিন্তু লুকোব কোথায়—বাইরে নিবিড় বন আর অন্ধকার, তার দিকে চাইলেই যে গা শিউরে ওঠে!

বিনয় বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, গাছে চড়তে জানিস্ তোরা?

আমি অল্প অল্প জানতুম, কিন্তু প্রতুল জীবনে কখনও গাছে চড়েনি। অথচ, বিন বুঝিয়ে দিলে, এমনি বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকাও নিরাপদ নয়, যদি ওরা বাইরে এসে খোঁজখবর করে, তা'ছাড়া জন্তু-জানোয়ারের ভয়ও ত থাকতে পারে!

আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লুম। কিন্তু বিনয় সেই অন্ধকারেই খানিকটা ঘুরে এ অবিষ্কার করলে কিছু উঁচুতে একটা অশথ গাছের তিন-চারটে ডাল সিঁড়ির মত উঠে গেছে সে আমাদের হাত ধরে সেইখানে নিয়ে গিয়ে প্রতুলকে কাঁধে ক'রে তুলে ধরলে। প্রথ ডালটাই একটু উঁচু, সেটায় পৌঁছবার পর ওপরে উঠে যেতে প্রতুলের বিশেষ কষ্ট হ' না। সে নিরাপদে পৌঁচেছে দেখে বিনয় আমাকে তার কাঁধে উঠতে বললে। আমি ইতস্তত করছিলুম, কিন্তু তার ধমকে আমিও সেইভাবেই উঠে গেলুম, তখন বিনয় নিজে গাছ বে দুই তিন মুহূর্তের মধ্যে ওপরে উঠে পড়ল।

আমরা সবচেয়ে যে উঁচু ডালে যাওয়া যায়, সেটায় পৌঁছে দেখলুম যে, এখানকার সন্ধা আমাদেরও আগে আর কেউ পেয়েছে, কারণ সেই ডালের গোড়ার দিকে দিব্যি একটা মাচা মত কর: হয়েছে। হয়ত ডাকাতরাই বনান্তের পথে পাহারা বসাবার জন্যে এখানে মা তৈরি করেছিল।

যাই হোক্ আমরা সেই মাচাটা পেয়ে বেঁচে গেলাম। সেখানেই পাশাপাশি আরাম ক' বসা গেল, আর তার চারিদিকে বেশ পাতার ঝোপের মত ছিল বলে নীচে থেকে কারু দেখতে পাবার সম্ভাবনা ছিল না।

আমরা বাড়ীটার দিকে চেয়ে দেখলুম, বিনয়ের অনুমান অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে লোকগুলো মশাল হাতে ক'রে বাড়ীটার ঘরে ঘরে আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে ; ইতিমধ্যে আরও গোটা দুই মশাল জ্বালা হয়েছে. এক এক দল এক একটা মশাল হাতে ক' চারিদিকে একসঙ্গে ছুটোছুটি করছে—কিন্তু পাবে কাকে? আ া তখন তাদেরই অদূ বসে বসে নিঃশব্দে হাসছি।

সমস্ত বাড়ীটা যখন দেখা শেষ হয়ে গেল তখন ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। জনতিনে লোক মশাল নিয়ে যতদূর সম্ভব ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। একজন ত একেবারে গাছে নীচে দিয়ে চলে গেল। উঃ, সেই সময় যা ভয় হয়েছিল আমাদের! সকলে মিলে নিঃশ্বা বন্ধ ক'রে বসেছিলুম, পাছে কোন আওয়াজ পেয়ে ওরা চোখ তুলে দেখে!

যাক্—সে ফাঁড়াটা ভালয় ভালয় কেটে গেল। ছোট ছোট দলগুলি ভেতরে গি আবার একত্র হ'ল। বুঝলুম যে এইবার খুব সম্ভব ওরা আবার নিজেদের কাজে চলে যাবে

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলুম। ইতিমধ্যে বিনয় এক ফাঁকে চুপিচুপি প্রতুলকে প্র করলে, আচ্ছা এই যে আগুন জ্বলল বা মশাল জ্বলছে—এর আলো কি গাঁ থেকে দে যায় না?

প্রতুল বললে, দেখা গেলেই বা কি! গাঁয়ের লোকেরা ভাবছে ভূতেরই ছলনা।

আমরা আবার নীরবে বসে রইলুম। কিন্তু একটুখানি পরেই বিনয় এক কাণ্ড ক'রে সল। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সে 'আসছি' বলে গাছ থেকে নেমে পড়ল। তারপর ামরা কোন রকম বাধা দেবার বা প্রশ্ন করাবার পূর্বেই সে একলা সেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গল।

আমাদের আতঙ্কের অবধি রইল না। এতগুলো লোক এখনও বাড়ীর মধ্যে রয়েছে, তার ধ্যে একলা গিয়ে ও কি করবে! যদি তারা দেখতে পায় তা'হলে বোধ হয় ওর একখানা াড়ও আস্ত থাকবে না। আর তাহ'লে এই নির্বান্ধব জনহীন পুরীতে আমাদেরই বা কি অবস্থা বে ভেবে যেন আমরা জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লুম। প্রতুল বোধকরি কেঁদেই ফেললে।

অতখানি ব্যবধানের জন্য ওপর থেকে কিছুই বোঝা গেল না। আমরা প্রাণপণে চেয়ে থকে ডাকাতদের কিছু কিছু দেখতে পেলেও অতদূর থেকে অন্ধকারে বিনয়ের কোন খবরই পলুম না। শেষকালে ডাকাতদের কোলাহল ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল, তাদের মশালের আলোও গল মিলিয়ে—মনে হ'ল তারা বাড়ী থেকে বেরিয়ে নিজেদের কাজেই চলে গেল। কিন্তু বনয় কোথায়? সে কি আমাদের এখানে ফেলে রেখে একাই পেছনে পেছনে চলে গেল াকি?

এক মিনিট গেল, দু'মিনিট গেল, পাঁচ মিনিট, ছ'মিনিট। শেষে আমাদের এই ভয়ার্ত প্রতীক্ষা আর সহ্য হ'ল না, আমরা গাছ থেকে নেমে পড়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বাড়ীর দারগোড়ায় এসে পৌঁছলুম।

ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় ভেতরে কার পদশব্দ পেয়ে থম্‌কে দাঁড়ালুম। কিন্তু একটু পরেই বোঝা গেল যে এ বিনয়। প্রতুল আনন্দে অস্ফুট একটা শব্দ ক'রে উঠল। আমি দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলুম।

বিনয় বল্‌লে, তোরা ভয় পেয়েছিস বুঝি? ওরা শেষ পর্যন্ত কি পরামর্শ করে আর কোথায় যায় দেখা দরকার বলে নেমে এসেছিলুম। অনর্থক তোদের বিপদের মধ্যে টেনে লাভ নেই ব'লেই তোদের সঙ্গে আনিনি।

প্রতুল প্রশ্ন করলে, তা কি হ'ল ওদের?

বিনয় মলিন মুখে বললে, ঠিক শুনতে পেলুম না ভাই। আমি নেমে এতটা এসে সাবধানে কাছে যেতে-যেতেই ওদের সলাপরামর্শ যা কিছু শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমিও এলুম আর ওরাও চলে গেল। তবে এইটুকু জেনে নিলুম যে, বুড়ো ঈশানও ওদের সঙ্গে গেছে।

আমি বললুম আর কাউকে রেখে যায়নি ত?

বিনয় ঘাড় নেড়ে বললে, তা যেতে পারে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। একটা কথা এখন আমার কি মনে হচ্ছে জানিস কেষ্ট? ওদের যে-আড্ডায় ওরা এখন গেল, সেখানে যাবার রাস্তাটা ঠিক বনের মধ্যে দিয়ে নয়—কোনও গুপ্ত পথ আছে, এই বাড়ীর মধ্যে দিয়েই।

আমরা দুজনেই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম, তার মানে?

সে জবাব দিলে, ওরা চোখের আড়াল হ'তেই আমি চুপিচুপি পেছনে খিড়কীর দো
পর্যন্ত ঘুরে এলুম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, বাইরে বনের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত চো
মেলেও কোথাও ওদের চিহ্নমাত্র দেখতে পেলুম না। অতগুলো লোক মশাল জ্বেলে যাচে
অথচ তাদের চিহ্ন নেই, তারা কি মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে গেল?

সে খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে, আমি কিন্তু ভেবেছি এর শেষ না দেখে যাব ন
ওরা কোথায় গেল, আর কোথা দিয়ে গেল সেটা দেখতেই হবে।

বিপদটা কেটে গেল ভেবে আমরা সবে নিশ্চিন্ত হচ্ছিলুম, কিন্তু বিনয়ের এই কথা
আবার রাজ্যের ভয় এসে জড়ো হ'ল। প্রতুল বললে, কাজ কি বিনয় অত বাহাদুরীতে
আমরা বরং ফিরে গিয়ে পুলিশে খবর দিই!

বিনয় বললে, না, সে হয় না। ওদের ঐ পথটা খুঁজে বার করতে না পারলে পুলি
কিছুই করতে পারবে না। আমার বিশ্বাস প্রতুল, এই ডাকাতের দলই, হয়তো এদে
পূর্বপুরুষরা ঐ গলিপথ দিয়ে এসে ভূত সেজে তোর ঠাকুরদাদাদের দেশছাড়া করেছিল। এ
নির্জন জায়গায় এতবড় বাড়ী, বেশ ভাল আড্ডা নয় কি? ঐ পথটি খুঁজে বার ক'রে আম
আবার নিঃশব্দে ফিরে যাবো, তারপর যা করবার পুলিশ করবে—

অগত্যা আমরা রাজী হলুম, যদিও মন ঠিক সায় দিলে না। মনের মধ্যে কে বলে
লাগল, এটা ঠিক হ'ল না, এটা ঠিক হ'ল না।

॥ ৯ ॥

বিনয় প্রতুলকে জলের ফ্লাস্কটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিতে ব'লে অগ্রসর হ'ল। আমি সকলে
শেষে বর্শাটা হাতে মুঠো ক'রে ধরে যাত্রা করলুম। সত্যি কথা বলতে কি, এবারে বিনয়ে
ওপর একটু রাগই ধরছিল! দরকার কি বাপু, যদি পৈতৃক চামড়াটা এখনও ধড়ে লেগে
আছে ত জোর ক'রে গায়ে পড়ে ডাকাতের গর্তে ঢুকে সেটা খো[illegible]বার দরকার কি? কি
মুস্কিল হয়েছিল এই যে, এই ছেলেটির মুখের ওপর কিছুতেই জানাতে পারলুম না
আমরা ভয়ই পেয়েছি এবং আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে যেতে পারলে খুশী হই!

আমরা বাইরের দুটি মহল ছাড়িয়ে একেবারে শেষের মহলে চলে গেলুম। কিন্তু সেখা
পৌঁছে দেখা গেল যে, এর মধ্যে থেকে কোন গুপ্ত পথ খুঁজে বার করা বড় সহজ কা
নয়। এত আবর্জনা বিশেষ ক'রে এই মহলটাতেই জমেছিল! আশ্চর্য! যত-রাজ্যের রাবি
শুক্‌নো পাতা, ভাঙা ইট আরও কত কি! প্রতি পদক্ষেপেই গতি ব্যাহত হয়, হোঁচট্ খা
মনে হয় চারদিকে বোধ হয় লক্ষ লক্ষ সাপ আর বিছে নিঃশব্দে আমাদের দিকে তাদে
ভয়ঙ্কর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে—সঙ্গে সঙ্গে বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে আসে।

কিন্তু তবু—তবুও আমাদের দলপতির সংকল্পচ্যুতি ঘট্‌ল না। সে তেমনি নিঃশব্দে শা
নতমুখে নির্ভীকভাবে এগিয়ে চলল। দৃষ্টি তার প্রত্যেকটি ঘরের মেঝেতে, প্রত্যেক
আবর্জনার স্তূপের আড়ালে। কোথাও না একটুখানি ফাঁক চোখ এড়িয়ে যায়!

এইভাবে চলতে চলতে দুটো একতলার ঘরের কাছে এসে আমরা অত্যন্ত বিপদে পড়লুম। এ ঘর দুটো বলতে গেলে একেবারেই বাড়ীর বাইরে, রান্নাবাড়ীরও পেছনে। হয়তো এ দুটো চাকরদের রান্নাঘর ছিল কিংবা গোয়াল, কিন্তু গোয়ালের চেয়ে রান্নার ঘর বলেই মনে হয়। যাই হোক্—এই ঘর দুটোর দেওয়াল পাকা ছিল, চালটা গোলপাতার। গোলপাতা আর বাঁশপাতা নীচে স্তূপাকার হয়ে পড়েছে, তার ওপর দোরের কাছে একটা দেওয়ালও ভেঙে পড়ে ভেতরে ঢোকবার পথ একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছে, উঁকি মেরে দেখবারও উপায় নেই, ভেতরে কি আছে!

আমরা চলেই যাচ্ছিলুম, কিন্তু হঠাৎ আমার কি মনে হ'ল, আমি দেওয়ালের একটা ফুটোর মধ্য দিয়ে একবার উঁকি মারলুম। অন্ধকার রাত্রি, স্পষ্ট কিছু বোঝা গেল না বটে, কিন্তু এটুকু বেশ বোঝা গেল যে, ঘর দুটোর মধ্যে চালচলের একটা দোর আছে, আর ওদিকের ঘরটার পেছনের দেওয়াল খানিকটা ভাঙা, সেখানে পথও বেশ প্রশস্ত।

কথাটা বিনয়কে বলতে সে প্রস্তাব করলে, তাহ'লে পেছনটা ঘুরে একবার দেখা যাক ও ঘর-দুটো—

প্রতুল বললে, কি আর হবে ও ভাঙা ঘর দেখে!

বিনয় ততক্ষণ এগিয়ে গেছে, সে যেতে যেতেই বললে, বলা যায় না ভাই—

পেছনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলুম সত্যিই সেখানের খানিকটা জায়গা ভাঙা, আর সে ভাঙা জায়গাটার ইঁটগুলো দুপাশে কে যত্ন করে সরিয়ে রেখেছে। বলা বাহুল্য বিনয় বিনা-দ্বিধায় ভেতরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু সে ঘরের মেঝেতে বিশেষ স্থানও ছিল না, কিছু দেখাও গেল না, চম্‌কে উঠলুম আমরা ভেতরের দরজা দিয়ে পাশের ঘরটায় ঢুকে, যে ঘরটার দোর ইটের আর জঞ্জালের স্তূপে বন্ধ—সেই ঘরটায়!

এ পাশের দেওয়ালের কাছে বড় রকমের গোল একটু জায়গা বেশ পরিষ্কার করা আর সেই স্থানেই একটা ভারী এবং বড় পাথর পড়ে রয়েছে—

বিনয় বিনাবাক্যব্যয়ে আমার হাতে টর্চটা দিয়ে প্রতুলকে বললে, এই ধর ত একটু।

দুজনে মিলে প্রাণপণে ঠেলতেই পাথরটা পাশে পড়ে গেল, তখন দেখা গেল, সেখানটায় সত্যি-সত্যিই একটা প্রকাণ্ড গর্ত রয়েছে, আর সেই গর্তের মধ্য দিয়ে ছোট ছোট সিঁড়ির ধাপ নীচে নেমে গিয়ে কোন্ এক রহস্যময় অজানা অন্ধকার পথের মধ্যে এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বিনয় মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে বললে, এই তাহ'লে ওদের গুপ্ত-পথ!

আমাদের মুখে ত কিছুক্ষণ কথাই সরল না। শেষ পর্যন্ত প্রতুল শুক্‌নো গলায় প্রশ্ন করলে, কি করবি এখন বিনয়?

বিনয় একটুও ইতস্ততঃ না ক'রে বললে, চল্ না দেখি এ পথ কোথায় গেছে—

সে তখনই নামতে প্রস্তুত। প্রতুল ওর একটা হাত ধরে ফেলে বললে, কি দরকার বিনয়, মিছিমিছি বাঘের গর্তে পা দিয়ে লাভ কি? আর ত মোটে ঘণ্টা দুয়েক রাত আছে, কি হয়ত তাও নেই—সকালবেলা গ্রামে গিয়ে লোকজন নিয়ে এলে কি হয়?

বিনয় হঠাৎ প্রতুলকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে, কেন ভয় পাচ্ছিস্ প্রতুল? বিপদটা হয় কাপুরুষের, দেখছিস্ না আমরা সাহস ক'রে এগিয়ে এসেছি বলে আমাদের সব বিপদ কেমন করে কেটে যাচ্ছে! এখনও পর্যন্ত কি কোনও বিপদে পড়েছিস্? অথচ কত বিপদেই আমরা পড়তে পারতুম ত! অন্য লোকের সাহায্য না নিয়েই যদি আমরা ডাকাত ধরতে পারি সেটা কত বড় গৌরবের হবে বল্ দেখি?

বিনয়ের এই স্নেহ-মধুর কণ্ঠস্বরটি আমাদের বরাবরই তার ইচ্ছায় চালিত করত, সেদিনও আমরা আর কোন বাধা, আর কোন যুক্তি দিতে পারলুম না, নীচে নামবার জন্য প্রস্তুত হলুম। শুধু নীচে কেন, সে অমন ক'রে বললে আমরা বোধ হয় সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখেও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতুম!

বিনয়ই আগে নামতে লাগল, তার পেছনে আমি, সব শেষে প্রতুল। সিঁড়িগুলো ছোট, সঙ্কীর্ণ, এত খাড়া যে দুজনে পাশাপাশি যাওয়া বিপজ্জনক ত বটেই, প্রায় অসম্ভব।

অনেকখানি—বোধ হয় গোটাকুড়ি সিঁড়ি ভাঙবার পর আমরা একটা ঘরের মত সমতল জায়গায় এসে পড়লুম। ঘরের মতো কেন সেটা ঘরই। তবে খুব নীচু, আমরা কোনমতে পারলেও প্রতুল বেচারী সোজা হতে পারছিল না এত নীচু। বেশ চার-চৌকো ঘর, ওপর থেকে যেখানে সিঁড়িটা নেমে এসেছে সেইখানটায় একটু খোলা, তা ছাড়া কোথাও জানালা, দরজা, এমন কি একটা ফুটো পর্যন্ত নেই। সেইজন্যই বোধ হয় একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ ছাড়ল।

বিনয় নেমে একটা জিনিস প্রথমেই আমাদের দেখালে, সেটার দিকে এতক্ষণ আমাদের নজর পড়েনি—সিঁড়ি আর নীচের ঘর সবই পাকা। একেবারে ইট আর চুন-সুরকী দিয়ে গাঁথা।

বিনয় প্রশ্ন করলে, এ পথটা কি তাহলে তোদেরই তৈরি করা প্রতুল?

প্রতুল ঘাড় নেড়ে বললে, তা ঠিক জানি না ভাই, অন্ততঃ বাবাকে ত কোন দিন বলতে শুনিনি!

বিনয় আর কিছু বললে না, শুধু ভোজালিটা ভাল ক'রে মুঠিয়ে ধরে এগিয়ে চলল, সিঁড়িটার উল্টোদিকের দেওয়ালের মধ্য দিয়ে যে সরু গলিপথ চলে গেছে সেই দিকে। এ পথটা ত প্রথমে নজরেই পড়েনি, এত নীচু আর এত সরু—কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এটাও পাকা গাঁথুনির—মানে বেশ যত্ন কবেই কেউ তৈরী করেছে।

গলিপথ বেয়ে আমরা ঘাড় নীচু করে এগিয়ে চললুম, এঁকেবেঁকে বহুদূর, কতদূর যে তার হিসেবই নেই। মনে হ'ল বোধ হয় সিকি মাইল পথ আমরা হাঁটলুম, হেঁট হয়ে হয়ে কোমর ঘাড় চড়-চড় করতে লাগল, কিন্তু তবু পথ আর ফুরোয় না।

প্রতুল বেচারীর ত চোখে জল এসে গেল। সে বললে, আর যে পারি না ভাই বিনয়, আমার পিঠ গেল!

বিনয় বললে, তবে আয় মেঝেতে বসে একটু পিঠটা ছাড়িয়ে নিই, ভয় নেই কাদা লাগবে না। ইট বাঁধানো আছে।

আমাদের আর দু'বার বলতে হ'ল না। আমরা হাত-পা মেলে বসে পড়লুম। তখন

আমরা এত ক্লান্ত যে আর কথা কইতেও পারছিলুম না, চুপ ক'রে চোখ বুজে বসে বিশ্রাম করতে লাগলুম।

কিন্তু এই ভূ-গর্ভে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে ও কিসের শব্দ?

সহসা যেন বুকের রক্ত আমাদের হিম হয়ে গেল—মনে হ'ল মৃত্তিকার বক্ষ ভেদ ক'রে অতি চাপা, অতি করুণ কার কান্নার শব্দ ভেসে আসছে!

এ কি—এ কার কান্না?

কিছুক্ষণ স্থির থাকার পর আমরা বুঝতে পারলুম যে, এ শব্দটা সামনে থেকে নয় কিংবা পেছন থেকেও নয়—যতটা মনে হ'ল আসছে পাশ থেকে। কিন্তু পাশে যে নিরেট দেওয়াল—

এ সমস্যারও সমাধান করলে বিনয়ই। সে বললে, নিশ্চয়ই আর কোন পথ আছে বা ঘর আছে, আর সেখান থেকেই আসছে কান্নার সুর। হয়ত কাউকে ধরে এনে পীড়ন করছে রে—না জানি কত কষ্টই পাচ্ছে বেচারী! চল্ যাই খুঁজে দেখি—

আমরাও তখন দস্তুরমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছি, কান্নার আওয়াজও এত ক্ষীণ, যেন গোঙানি বলে মনে হচ্ছে—আহা বেচারা, হয়ত তাকে মেরেই ফেলেছে—

যে পথ দিয়ে এসেছিলুম সেই পথেই খানিকটা ফিরে গেলুম। অতি সাবধানে দু'পাশের দেওয়াল দেখতে দেখতে, খানিকটা চলবার পরই আমাদের চোখে পড়ল একটা ছোট দোর। খুব নীচু ব'লেই যাবার সময় আমাদের নজরে পড়েনি হয়ত।

সৌভাগ্য-বশতঃ দোরে চাবি ছিল না। শুধু একটা শেকল দেওয়া ছিল। বোধ হয় ওরা ভেবেছিল যে, এখানে এসে আর কারুর দোর খোলবার সম্ভাবনা নেই! যাই হোক্—আমরা শেকলটা খুলে ফেলে সাবধানে আলো জ্বেলে দেখলুম যে, কুকুরের ঘরের মত একটা খুপ্‌রীপানা নীচু ঘর, আর তারই মেঝেতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে একটি মানুষ, আরও কাছে গিয়ে দেখলুম সেটি এক সাহেবের ছেলে, বোধ হয় আমাদেরই বয়সী হবে।

এ অবস্থায় আর যাই হোক্ কোন ইংরেজের ছেলেকে দেখবো তা আশা করিনি। কিন্তু তখন আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকারও সময় নেই। আমিই তাকে টেনে সেই গর্ত থেকে বার ক'রে আনাগোনার পথে এনে ফেললুম। বিনয় কুক্‌রীটা দিয়ে চট্‌পট্ ওর বাঁধন ক'টা কেটে দিলে। হাত-পায়ের বাঁধন এত জোরে দেওয়া ছিল যে ওর শুভ্রদেহের ওপর গভীর রক্তবর্ণ কাল্‌সিটে পড়েছে, যন্ত্রণায় ওর মুখ দিয়ে ফেনা কাটছে, কান্নাও বেচারীর যেন আর বেরোচ্ছিল না, প্রায় অজ্ঞান হয়ে এসেছে তখন—

বিনয় বললে, প্রতুল জল ঢাল দেখি মুখে, আহা বেচারী নেতিয়ে পড়েছে—

প্রতুলের কাঁধে ফ্লাস্কটা ছিল, সে তাড়াতাড়ি ওর মুখে চোখে জল ছিটিয়ে দিলে, বিনয় উপুড় হয়ে পড়ে ওর মুখে-কপালে আস্তে আস্তে ফুঁ দিতে লাগল (পায়া ত নেই), আর আমি ওর হাত-পা'গুলো টেনে টেনে দিতেলাগলুম। একটু পরেই ছেলেটির গোঙানি থাম্‌ল, আর খানিকটা পরে সে চোখ মেলে চাইলে। প্রথমটা জোর টর্চের আলো আর তার আবছায়াতে এতগুলো মানুষের মূর্তি বুঝতেই তার বিলম্ব হ'ল, কিন্তু যখন বুঝতে পারলে তখন সে ভয় পেয়ে খানিকটা সরে বসল—

বিনয় তার স্বভাবসিদ্ধ মধুস্বরে বললে, Don't worry, friend! It's all right now.

মনে হ'ল যে, আমাদের মুখে ইংরেজি শুনে সে একটু আশ্বস্ত হ'ল। কোনমতে আস্তে আস্তে বললে, Who—who are you, please?

বিনয় সংক্ষেপে তাকে ইংরেজি ক'রে বুঝিয়ে দিলে যে, আমরা তিনটি ইস্কুলের ছাত্র ভূত দেখবার লোভে হানাবাড়ীতে এসে এখন একদল ডাকাতদের মধ্যে পড়েছি। তাদেরই পিছু পিছু আমরা এই সুড়ঙ্গে এসে পড়েছি, যেতে যেতে ওর কান্না শুনতে পেয়ে আমরা ওকে উদ্ধার করেছি।

ছেলেটি সব শুনে কিছুক্ষণ যেন অভিভূতের মত বসে রইল, তারপর নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই বেচারী কেঁদে ফেললে। তার ভাঙা ভাঙা কথা থেকে যেটুকু সংবাদ উদ্ধার করা গেল তা হচ্ছে এই—

ছেলেটির নাম রবার্ট ম্যাক্‌নীল, ওর বাবা বর্মায় এক বড় কোম্পানির ম্যানেজার, কোম্পানিরই কাজে এসেছিলেন, রবার্ট এসেছিল তাঁর সঙ্গে বেড়াতে। পরশুদিন রাত্রে একটা স্টীম লঞ্চের ওপর থেকেই ডাকাতরা তাকে চুরি ক'রে এনেছে। দুদিন ধরে ওকে হাত-পা বেঁধে একটা 'ছিপ্' নৌকো চালিয়ে এখানে এনে ফেলেছে, তারপর চোখ বেঁধে ওকে কেমন ক'রে যে এই অন্ধকার গুহায় এনে রেখেছে তা ও জানে না। কাল সন্ধ্যাবেলায় ওকে একটু দুধ দিয়েছিল—আজ কিছুই দেয়নি। ওকে জানিয়ে গেছে যে, ওর বাপের কাছে ওর দাম চাওয়া হয়েছে চার হাজার টাকা, যে ক'দিন না সে টাকা পাওয়া যায় সে ক'দিন ওকে খেতেও দেবে না, ছেড়েও দেবে না।

এই কাহিনী বিবৃত ক'রে সে অসহায় করুণভাবে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বললে, এখন কি করব আমি?

বিনয় একটুও দ্বিধা না ক'রে বললে, কি আর করবে, আমাদের সঙ্গে পালাবে, তারপর আমরা তোমাকে পুলিশের জিম্মায় রেখে তোমার বাবাকে একটা তাব ক'রে দেব—কেমন? তুমি পারবে না চল্‌তে? আচ্ছা, আমাকে না হয় ধরো আস্তে আ স্তে—

বিনয় পরম স্নেহে তার হাত ধরলে, রবার্ট একান্ত নির্ভয়ে তার হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তার দেহ তখন খুব দুর্বল, পা ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে, সে নিজেকে সামলাতে না পেরে দু-হাত দিয়ে বিনয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, তাড়াতাড়ি চল ভাই—যদি ওরা এসে পড়ে!

বিনয় ওকে অভয় দিয়ে খুব আদর করলে, তারপর বললে, আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমায়, তোমাকে যখন নদীর ধার থেকে এনে এখানে পুরেছিল তখন কতটা পথ এসেছিলে খেয়াল আছে কি?

একটু ভেবে নিয়ে রবার্ট বললে, বেশি নয়

বিনয় সাগ্রহে বললে, তবে ভাই চল এর শেষটা দেখেই যাই—

রবার্ট একটু ভীত হ'ল, তার মানে সে তখন এই মৃত্যু-গুহা বেরোতে পারলেই বাঁচে—

কিন্তু বিনয় আশ্বাস দিয়ে বললে, ভয় নেই বন্ধু রব্—আমরা তোমাকে নিয়ে ঠিক নিরাপদে ফিরে যেতে পারব, আমার মন বল্ছে—

ইংরেজের ছেলে, তাকে আর বেশি বলতে হ'ল না। আমরা আবার সামনের দিকে এগোলুম। খানিকটা গিয়েই নজরে পড়ল আর একটা এমনি চোরকুঠরি, আগেরটার মত এটাও শেকল দেওয়া। যদিও আমাদের তাড়া ছিল খুব বেশি, তবুও কৌতূহল অসম্বরণীয় হয়ে উঠল, আমরা সে ঘরটা না দেখে আর এগোতে পারলুম না। প্রতুল এগিয়ে গিয়ে ঘরটা খুলে ফেললে আর আমি ফেললুম আলো, কিন্তু যা নজরে পড়ল তাতে চম্‌কে উঠলুম। ঘরটা এমনি প্রায় খালি, খালি এক কোণে কতকগুলো কাঠের বাক্স আর একটা সিন্দুক জড়ো করা রয়েছে, আর রয়েছে মেঝের ওপরে পড়ে আমাদের সেই অদ্বিতীয় স্যুটকেশটা।

প্রতুল আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠল, সে-ই ছুটে গিয়ে সেটা তুলে নিয়ে ভারটা অনুভব ক'রে বললে, এটা ঠিক আছে রে, জিনিসপত্র সবই আছে—

বিনয় বললে, ভালই হ'ল তাহ'লে, ওটা খুলে ফেলে খানকতক বিস্কুট বার কর দেখি, আর দুধের কৌটোটা—রবার্টকে কিছু খাইয়ে দিই—

রব্ মেঝের ওপরে বসে পড়ে বিলিতি দুধ দিয়ে বিস্কুট চিবোতে লাগ্‌ল। বেচারী বল্‌তে গেলে দুদিন উপবাস ক'রে আছে, তার খাওয়ার বেগ দেখে মনে হ'ল যেন সে দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে এসেছে!

ইতিমধ্যে আমি চুপি চুপি প্রশ্ন করলুম, বাক্সগুলোয় কি আছে দেখব কি?

বিনয় ঘাড় নেড়ে বললে, দরকার নেই, মিছিমিছি দেরি হবে। এখানকার বাতাসে যেন দম আটকে আসছে, তাড়াতাড়ি পালাই চল্—

রবের ক্ষুন্নিবৃত্তি হলে পর প্রতুল স্যুটকেশটা ঘাড়ে ক'রে আবার তৈরী হতেই বিনয় বললে, ওটা এখানেই থাক্ না হয়, আবার এই পথেই তো ফিরব!

সে যুক্তি মন্দ নয় ভেবে সেটা সেইখানেই একপাশ ক'রে রেখে দিয়ে আমরা এগিয়ে চললুম। বেশিদূর যেতে হ'ল না এবার, খানিকটা গিয়েই টাট্‌কা বাতাস পাওয়া গেল। এখানে সিঁড়ি নেই, মাটিই একটু একটু ক'রে উঁচু হয়ে গেছে।

আমরা দুরু-দুরু বক্ষে নিঃশব্দে উঠে গেলুম। মাত্র চোখ দুটি মাটির লেভেলে তুলতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা বর্ণানাতীত।

সামনেই বিপুল জলরাশি, সমুদ্র কিংবা নদী ঠিক বোঝা গেল না—আর তার তীরে গোল হয়ে ঘিরে বসে আছে ডাকাতের দল। চারিদিকে কতকগুলো মশাল পোঁতা রয়েছে, তারই পাণ্ডুর আলোতে (অর্থাৎ ভোর হয়ে এসেছে বলেই আলোটা ম্লান দেখাচ্ছিল) বোঝা গেল যে, ওদের কি মন্ত্রণা চলেছে। কতকগুলো খালি মদের বোতল পড়ে রয়েছে আর কতকগুলি এঁটো থালা, খুব সম্ভব পান-ভোজন এইমাত্র শেষ হয়েছে।

একটুখানি দেখেই বিনয় ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, চল্ ফিরি—

আমরা আবার যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে নেমে এলুম। এবার রবেরও চলতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না, কারণ তার গায়ে তখন একটু জোর এসেছে, কাজেই আমরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ বাধা পেলুম সেই কুঠ্‌রিটার কাছে এসে, ব্যাগটা কোথায়?

আগে পেছনে পাতি-পাতি ক'রে খোঁজা হ'ল কিন্তু সে স্যুট্‌কেশের চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না। ভয়ে আমরা কাঠ হয়ে উঠলুম, নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন ভয় হচ্ছে তখন—

তবে কি— ?

বিনয়ও এবার বিবর্ণ হয়ে উঠল। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে সে কোন কথা না বলে, অস্ত্রটা বাগিয়ে ধরে আমাদের পেছনে আসতে বলে রীতিমত ছুটতে আরম্ভ করলে।

আমরা বিনা বাধাতে সেই সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত পৌঁছেই বুঝতে পারলুম আমাদের আশঙ্কা কতদূর সত্য—সিঁড়ির মুখের সেই পাথরটিকে কে আবার টেনে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

আমরা নিঃশব্দে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। শুধু মনে হ'ল বুকের ভেতরে কে হাতুড়ির ঘা মারছে!

॥ ১০ ॥

বহুক্ষণ সকলে চুপ ক'রে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকবার পর সকলকারই বোধ হয় একসঙ্গে মনে পড়ল একটা কিছু এখনই করা দরকার। সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠল—কিন্তু উপায় কি? আমরা পাগলের মত এদিক ওদিক চাইতে লাগলুম, খানিকটা এমনি ঘুরেও এলুম, কিন্তু কোন বুদ্ধিই মাথাতে খেলল না।

কিন্তু কোন বিপদই বিনয়কে বেশীক্ষণ দাবিয়ে রাখতে পারে না, শেষকালে সে-ই বুদ্ধি দিলে। সে বললে, চল রাস্তাটার মাঝামাঝি যাই—

বিস্মিত হয়ে প্রতুল জিজ্ঞাসা করলে, তারপর?

বিনয় বললে, আমরা মাটি ফুঁড়ে উঠব।...অবাক হয়ে চেয়ে রইলি যে? সুড়ঙ্গ কেটে ওপরে উঠে যাবো। খিলেনের ঐ ক'খানা ইট খসাতে পার্‌লেই নরম মাটি, সে কাটা এমন কিছু শক্ত হবে না।

অকস্মাৎ যেন সকলেই কিছু ভরসা পেলুম। তবু আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, কিন্তু অত মাটি কতক্ষণ ধরে কাট্‌বি বিনয়, তার আগেই যদি ওরা কেউ এসে পড়ে?

বিনয় বললে, আসে কী আর কর্‌ব! ওদের সামনে বুক ফ়ুলিয়ে দাঁড়াতেই হবে, উপায় ত নেই। এখনি এসে পড়লেই বা কি করতিস্?...আর তা ছাড়া আমবা ত সিঁড়ি দিয়ে নামলুম, মাটির এমন কিছু নীচে এটা নয়।

সত্যিই তখন আর উপায় কি?

আমরা আন্দাজে আন্দাজে মাঝামাঝি গিয়ে পৌঁছলুম, তারপর শুরু হ'ল সুড়ঙ্গ কাটার

আয়োজন। বিনয় আমাকে আর প্রতুলকে বললে সুড়ঙ্গের দুই মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে, অর্থাৎ অতর্কিতে না কোন বিপদ এসে পড়ে, তারপর রবার্টকে টর্চের আলো ফেলতে ব'লে সে আমার হাত থেকে বর্শাটা নিয়ে তারই সাহায্যে ইট খসাতে লেগে গেল।

কিন্তু কাজটা যত সহজ মনে করা গিয়েছিল, দেখা গেল সেটা অত সহজ নয়। যদিও গাঁথুনি বহুদিনের এবং ইটেও লোনা লাগতে শুরু করেছিল, তবু মাথার ওপরটা খিলেন করা ব'লে সেই জমাট গাঁথুনি খসিয়ে ইট খুলে বার করা প্রথমটা একরকম দুঃসাধ্য ব'লেই মনে হচ্ছিল। অনেকদিন ধরে খিলেনের চাপে সমস্ত ব্যাপারটা যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠেছিল।

অবশ্য বিনয় হাল ছাড়ল না

অবশ্য বিনয় হাল ছাড়লে না। প্রাণপণ চেষ্টায় একটু একটু ক'রে সেই জমাটি মশলা খসাতে লাগল, তিল তিল ক'রে হ'ল ইটের বাঁধন আলগা। সেই আলোবাতাসহীন সুড়ঙ্গপথে দুঃসহ গরমে একেই আমরা আধমরা হয়ে পড়েছিলুম, তার ওপর নিদারুণ একটা আতঙ্ক। বিনয়ের যে-হাত চলছিল, এই ত আশ্চর্য! আহা সে বেচারীর কি অবস্থা, ঘামে তার কাপড়-জামা ভিজে ত গিয়েছিলই, একটু পরে তার গা বেয়ে ঠিক যেমন ক'রে

দেওয়াল বেয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়তে থাকে, তেমনি ঘাম গড়িয়ে মাটিতে পড়তে লাগল—অবিরল ধারায়।

এরই মধ্যে রবার্ট আবার একটা মন্তব্য করলে, তাতেও ভয় আমাদের কম হ'ল না, সে বললে, যে রকম বহুদিন ধরে খিলেনটা জমাট হয়ে আছে, একখানা ইট খসলে হুড়মুড় ক'রে আরও কতকগুলো না আমাদের ওপর খসে পড়ে—

বিনয় সায় দিয়ে বললে, সে সম্ভাবনা ত আছেই, কিন্তু কি আর করা যাবে! আমাদের ত আর কোন উপায় নেই!

ভেঙে পড়তে যেটুকু বাকী ছিল, এই কথাটা শুনেই একেবারে ষোল আনা পূর্ণ হ'ল। আমি সেই ইট বিছানো পথের ওপরই বসে পড়ে বললুম, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না বিনয়, বসেই পাহারা দেব এখন—

প্রতুল বোধ করি 'মহাজনের' পথ দেখানোর অপেক্ষাতে ছিল, সেও ধপাস্ ক'রে বসে পড়ল, তার মুখ চোখ দেখে মনে হ'ল বুঝি অজ্ঞানই হয়ে পড়বে! আর বাস্তবিক একে সে সুন্দর মানুষ, অনবরত কয়েক ঘণ্টা ঘেমে তার হাত-পা যেন পাণ্ডাশবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বিনয়েরও কষ্ট বড় কম হচ্ছিল না, তার অমন নিকষ কালো রং ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মনের জোর তার অসাধারণ ব'লে সে সব কিছু অগ্রাহ্য ক'রে একমনে কাজ ক'রে যেতে লাগল।

এই সময় একখানা ইট আস্তে আস্তে খসে এল। রবার্টের আনন্দধ্বনিতে ফিরে চেয়ে দেখে আমরাও যেন একটু উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। বিনয় এবার বর্শাটা আমার হাতে দিয়ে ভোজালি ধরলে, ভোজালির ডগা দিয়ে মশলাগুলো খসিয়ে বর্শা দিয়ে চাড় দিতে ইটগুলো অপেক্ষাকৃত সহজে খসে আসতে লাগল। তাও প্রথম দু'তিনখানা ইট তুলতে দস্তুরমত বেগ পেতে হয়েছিল।

খানকতক ইট খুলে একটা মানুষ গলবার মত ফাঁক হ'তেই বিনয় ইট খসানো বন্ধ করলে। এইবার শুরু হ'ল মাটি কাটা; মাটি আর খোয়ার জমাট ব্যাপার, সেও খুব সহজ নয়। তার ওপর আর একটা অসুবিধা হ'ল এই যে, ওপরদিকে চেয়ে মাটি খসানো যায় না, তাতে চোখে লাগে, অথচ নীচের দিকে চেয়েই বা কাঁহাতক্ কাজ করা যায়? বিনয় এইবার যেন দস্তুরমত বিব্রত হয়ে পড়ল।

যাই হোক্—এইভাবেই খানিকটা কাজ এগিয়েছে এমন সময় সহসা মাথার ওপর একটা দাপাদাপি শব্দ শোনা গেল। যেন মনে হ'ল বহুলোক ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে।

ডাকাতের দল নয় ত?

ভয়ে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলুম একবার। হয়ত আমাদেরই চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করছে!

প্রতুল একেবারে নার্ভাস্ হয়ে পড়ল, কেঁদে যেন বললে, এইখানে মেরে হয়ত ফেলে রাখবে, বাবা-মা টেরও পাবেন না। পচে গেলে পড়ে থাকব—

কিন্তু একটা জিনিষ আজও আমাদের মনে আছে এবং সেজন্য আজ আমরা সত্যিই

গর্বিত,—অত ভয়ের মধ্যেও আমরা কেউ বিনয়কে একবারও দোষী করিনি। একবারও একথা কেউ বলিনি যে, বিনয় তোর পাল্লায় পড়েই এমন ক'রে বেঘোরে প্রাণ হারাতে বসেছি। এম্‌নিই স্নেহ ছিল আমাদের তার প্রতি।

কিন্তু বিনয়ও তা বুঝত। সে আরও দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগে গেল। তার দায়িত্বই যে সব চেয়ে বেশী একথা তার একবারও ভুল হয়নি। কিন্তু না আছে শাবল, না আছে কিছু, শুধু ভোজালি আর বর্শা দিয়ে সেই বহুদিনের জমাট মাটি কেমন ক'রে সরানো যায়? তবু বিনয় চোখ বুজে উন্মত্তের মত মাটি খুঁড়তে লাগল। রাশি রাশি মাটি পড়তে লাগল তার মুখে মাথায় সর্বাঙ্গে—তার আর রবার্টের—কিন্তু দুজনেরই ভ্রূক্ষেপ নেই। মাটিতে ঘামেতে জড়িত এক অদ্ভুত মূর্তি হ'ল দুজনকারই, জামা-কাপড়গুলোর রং বদ্‌লে কাদার রং দাঁড়াল।

এধারে আর এক নতুন বিপদ দেখা দিলে। গর্ত যত বড় হচ্ছে তত আর হাত পৌঁছতে চায় না। বিনয় ভোজালি দিয়ে খোঁড়বার সময় নেংচে দাঁড়িয়েও আর হাত পাচ্ছিল না। অথচ মাথার ওপর দাপাদাপির বিরাম নেই, এক একবার থেমে যাচ্ছে, এক একবার মনে হচ্ছে যেন দু'একজন মাত্র এদিক ওদিক থেকে চলে যাচ্ছে, আবার হয়ত এক-একদল দুড়-দুড় ক'রে মাথার ওপর দিয়ে এদিক থেকে ওদিকে ছুটে চলে যাচ্ছে। এক একবার মনে হচ্ছিল যেন মাথার ওপরই সবসুদ্ধ ভেঙে পড়ে আর কি!

রবার্ট একবার অবশ্য বললে, আচ্ছা পুলিশ-টুলিশ এসে পড়েনি ত? ওরাই হয়ত প্রাণের ভয়ে ছুটোছুটি কর্‌ছে, পুলিশ করেছে ওদের তাড়া?

কিন্তু মন তখন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে, অমন আশার কথা বিশ্বাস কর্‌তে চাইবে কেন? প্রতুল কাঁদতে কাঁদতেই জবাব দিলে, হ্যাঁ, ঐ সুখেই থাক!...ওরা আমাদের বেশ রীতিমত ক'রে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা কর্‌ছে, হয়ত খুব একটা যন্ত্রণা দিয়েই মারবার আয়োজন চলছে তাই বা কে জানে!

দুঃখের মধ্যেও হাসি।

বিনয় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তেই একবার ব'লে নিলে, দেখ্ প্রতুল, তুই আজকাল বড্ড বেশী বায়স্কোপ দেখছিস্! সেদিন 'মাস্ক অফ ফু মাঞ্চু' দেখতে গিয়েছিলি, জানি আমি।

আমিও ব্যাপারটাকে লঘু ক'রে নেবার জন্যে বললুম, আর যত সব ভূতের গল্প এক চোটে ওর!

কিন্তু এ ত গেল ঠাট্টার কথা। ওধারে কাজও যে এগোচ্ছে না তাও ত ঠিক। কী করা যায়?

রবার্ট হঠাৎ আমার কাঁধে হাত রেখে বাংলা-ইংরিজি মিশিয়ে বললে, ও বেচারীর ওপর আমরা বড্ড অত্যাচার কর্‌ছি, গরজ কি একা ওরই? দেখছ না একটু পরে ও হয়ত অজ্ঞান হয়ে পড়বে! এস আমি তোমাকে কাঁধে ক'রে দাঁড়াই, তুমি ত হাল্কা আছ, তোমাকে কাঁধে করতে পারব এখন—তুমি খানিকটা মাটি খুঁড়ে ও বেচারীকে একটু বিশ্রাম দাও। আমি করতে পারতুম, কিন্তু আমাকে কে বইবে বলো!

আমি সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলুম, কিন্তু তুমিই কি পারবে বইতে আমাকে? একে দুর্বল শরীর!

সে দৃঢ়কণ্ঠে বললে, পারব। আমি এর মধ্যেই বেশ সামলে নিয়েছি।

আমি রাজী হলুম। সত্য কথা বলতে কি, বিনয়ের অমানুষিক পরিশ্রম দেখে মনে মনে লজ্জিত ত হচ্ছিলুমই, কষ্টও হচ্ছিল খুব। বিনয়ের কাছে প্রস্তাবটা করতে সে কিন্তু প্রথমে কিছুতেই রাজী হ'ল না, বললে, তুই পারবিনে কেষ্ট। যদিও মাটি এখন নরম হয়ে এসেছে, তা'হলেও রীতিমত জোর লাগছে কাট্‌তে!

কিন্তু রবার্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সে একরকম জোর ক'রেই বিনয়ের হাত থেকে ভোজালিটা কেড়ে নিলে, তার হাতে টর্চটা দিয়ে হেঁট হয়ে আমাকে বললে, কাঁধে ওঠ, শীগ্‌গির!

অগত্যা তার কাঁধে উঠলুম। অতক্ষণ অনশনের পর রবার্টের পা যে কাঁপছে আমার ভারে, তা বেশ অনুভব করতে লাগলুম, কিন্তু সে অসাধারণ মনের জোরে প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিলে। দু হাত দিয়ে সুড়ঙ্গের দু দিকের দেওয়াল ধরে ঘাড় সোজা ক'রে আমাকে ধরে রইল।

কিন্তু আমি পড়লুম মহাবিপদে। সেই অল্পপরিসর গর্তটুকুর মধ্যে হাত চালানোই মুস্কিল, তার ওপর সেদিকে চেয়ে খোঁড়বার জো নেই। মুখ তুলতেই চোখে মাটি পড়তে থাকে। তা ছাড়া আলোও নেই, নীচে থেকে যে টর্চের আলো পড়ছে, আমারই দেহে আট্‌কে যাচ্ছে, আলোর চেয়ে ছায়ার সৃষ্টিই করছে বেশী।

যাই হোক—অপটু হাতে এলোপাতাড়ি ভোজালি চালিয়ে যেতে লাগলুম। মাটিও কিছু পড়তে লাগল বটে তবে বিনয় যে পরিমাণ কাটছিল তার অর্ধেকও পারলুম না, যদিও সে নীচে থেকে বাহবা দিতে লাগল খুব।

মাটি খুঁড়েই যাচ্ছি, এমন সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল। সহসা আবার সেই দুপ্‌-দাপ্ শব্দ শোনা গেল মাথার ওপরে, শব্দটা ক্রমে আরও কাছে এগিয়ে এল! মনে হ'ল যেন একেবারে আমরই মাথার ওপরে এসে পড়ল—সহসা ওকি!

মনে হ'ল সমস্ত পৃথিবী আমার ঘাড়ে ভেঙে পড়বে, এমনি একটা শব্দ। বিনয় ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল ভাগিস্—সে বিদ্যুৎবেগে আমার হাত ধরে প্রায় আমাকে কোলে ক'রে নামিয়ে নিলে এবং একটানে সরিয়ে নিলে রবার্টকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল শব্দে কতকগুলো মাটি ঘাসের চাপড়াসুদ্ধ একটা গোটা মানুষ গড়গড়িয়ে নীচে এসে পড়ল। যদি এক মুহূর্ত আর দেরি হ'ত তাহ'লে ঐ সবসুদ্ধ আমাদের ঘাড়ের ওপরই এসে পড়ত। ফলে প্রাণসংশয় না হ'লেও গুরুতর রকমের যে জখম হতুম তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রথম বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতে আমাদেরও যতটা সময় লাগল—আগন্তুক লোকটিরও তার চেয়ে কম লাগল না। সে বেচারা সামনে ভূত দেখলেও বোধ হয় অত আশ্চর্য হ'ত না। ঝুরো মাটির ওপর পড়ায় তার বিশেষ চোট্ লাগেনি, পা-টা সামান্য একটু মচ্‌কে গিয়েছিল, এই যা! কিন্তু সে সবকিছু ভুলে বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে আমাদের দিকে ফ্যাল

ফ্যাল ক'রে তাকিয়েই রইল শুধু, হাত-পা নাড়তে পর্যন্ত পারলে না, মনে হ'ল ভয়ে বিস্ময়ে তার দেহের যন্ত্রণা পর্যন্ত সে ভুলে গেছে।

আমরাও লোকটির এই আকস্মিক আবির্ভাবে বিস্মিত বড় কম হইনি। প্রতুল ত ভূতের ব্যাপার মনে ক'রেই বোধ হয় আঁতকে চেঁচিয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা হোক্, তবু আমরাই আগে প্রকৃতিস্থ হলুম। অবশ্য তার কারণও ছিল। লোকটি শুধু কতকগুলো মাটি আর ঘাসের চাপড়া নিয়েই নেমে আসেনি, সঙ্গে ক'রে এনেছিল মুক্তি-দূতের মতই ওপরের সেই মুক্ত সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়ে এক ফালি দিনের আলো আর এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস। সেই পথটুকুর মধ্যে দিয়ে ওপরের নীল আকাশ আর দিনের আলো দেখতে পেয়েই আমরা যেন নবজীবন লাভ করলুম। মনে হ'ল যে অন্ধকারে জীবন্ত সমাধি হয়ত ঠিক ভাগ্যে লেখা নেই, মুক্তির আশা হয়ত এখনও আছে।

আমরা এতে বিস্মিতও বড় কম হইনি, কারণ ইতিমধ্যে যে রোদ উঠেছে, দিন যে এতটা এগিয়ে গেছে তা অন্ততঃ আমি একবারও কল্পনা করিনি। আমি সব বিপদ, সব বিস্ময় ভুলে গিয়ে অবাক হয়ে সেই মুক্তির দিকে চেয়ে রইলুম!

কিন্তু রবার্ট কাজের লোক, সে প্রথম বিস্ময়ের ঘোরটা সামলে নিয়েই লাফিয়ে পড়ল সেই লোকটার ঘাড়ে, তারপর দুটো হাত চেপে ধরে বল্‌লে, ইয়েস্ বিনয়—জল্‌দি!

বিনয় ত্বরিৎগতিতে গিয়ে তার দুটো পা চেপে ধর্‌লে। সে লোকটির ওপর কিন্তু এই অত্যাচারের ফল হ'ল ঠিক বিপরীত! সে তার আকস্মিক পাতালপ্রবেশে এবং কর্দমাক্ত এই সব কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিগুলি চোখে পড়ায় সে ভয়ে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। আমরা তার গায়ে হাত দিতেই সে বুঝতে পারলে যে, আর যাই হোক্ আমরা অশরীরী নই, বরং মানুষ। সে একেবারে ডুক্‌রে কেঁদে উঠে বিনয়ের দিকে চেয়ে বল্‌লে, দোহাই বাবা আমাকে বাঁচাও, পুলিশের হাতে পড়লে কুড়ি বছরের কম রেহাই দেবে না—

কী বল্‌ছে লোকটা?

বিনয় বল্‌লে, পুলিশ কোথায়?

সে লোকটা জবাব দিলে, ঐ যে ওপরে। এক সাহেব একরাশ পুলিশ এনে হাজির করেছে।

রবার্ট চীৎকার ক'রে উঠল, নিশ্চয়ই আমার বাবা। তারপর সে ওকে ছেড়ে দিয়ে তড়াক্ ক'রে ওরই কাঁধে পা দিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠে গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে আমাদের দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেল।

সে লোকটিও চম্‌কে গিয়েছিল, কিন্তু বিনয় সেদিকে দৃকপাত না ক'রে তার পা ছেড়ে হাত দুটো ধরে বল্‌লে, তুমিও তাহ'লে ডাকাত?

সে আবারও কেঁদে ফেল্‌লে, বল্‌লে, হ্যাঁ বাবা ডাকাত। কিন্তু আমার যে ছেলে রয়েছে বাবা, মা-মরা ছেলে, আমাকে যদি ধরে নিয়ে যায় সে মারা যাবে। আমি কিছুতে ডাকাতের দলে আসতে চাইনি বাবা, নেহাৎ দায়ে পড়েই, পেটের জন্যে—

বিনয় তার হাতটা ছেড়ে দিলে। তারপর রবার্টেরই পন্থানুসরণ ক'রে ওর কাঁধে পা

দিয়েই এক লাফে ওপরে উঠে গেল, ওপরে পৌঁছে গর্তের মধ্যে হাত বাড়িয়ে বললে, আয় তোরা—

আমরা একে একে তারই হাত ধরে ওপরে উঠে গেলুম। আর যে লোকটি নীচে ছিল সে আমাদের অনুমতির অপেক্ষা মাত্র না ক'রেই বিদ্যুৎবেগে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রতুল একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, ডাকাত ব্যাটাকে ছেড়ে দিলি বিনয়!

বিনয় যেন অপরাধীর মত বললে, আহা, বেচারীর মা-মরা ছেলে রয়েছে ঘরে—।

প্রতুল জবাব দিলে না, বুঝলাম যে, 'ডাকাত ব্যাটাদের' ওপর রাগ তার কমেনি।

কিন্তু আমি আর বিনয় তখন মুক্তির আনন্দে মশগুল। বাইরের ঝলমলে রোদ আর নীল আকাশ তখন কি ভালই লাগ্‌ছে—কি বল্‌ব! আর চেহারা যা হয়েছিল এক একজনের তা মনে পড়লে হাসি পায়। চুল-টুলের বালাই নেই, সমস্তটা কাদায় বোঝাই, ভগবানদত্ত চামড়া ও পিতৃদত্ত জামা-কাপড় দুই-ই মাটিতে ঢেকে গেছে—সে এক কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার!

আমাদের আর বেশী দূর যেতে হ'ল না, দেখি বনের মধ্যে দিয়ে রবার্ট তার বাবাকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে আস্‌ছে। পিছনে একদল পুলিশ।

রবার্ট তার বাবাকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্‌লে, এরাই তারা বাবা, এরাই আমার প্রাণরক্ষা করেছে।

রবার্টের বাবা, বড়সাহেব ম্যাক্‌লীন মনের আবেগে আমাদের সেই কাদামাখা চেহারাগুলিকেই বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। তাঁর মুখে হাসি, চোখে জল।

আর রবার্ট, ওর বাবা যখন ছাড়লেন তখন রবার্ট বিনয়কে জড়িয়ে ধরলে, বুকে চেপে বার বার ওর সেই কালো আর কাদা মাখা মুখে চুমো খেতে লাগল আর বলতে লাগল, My dearest, my darling boy!

কিন্তু তা হোক্—পুলিশের পেছনে আর একটি লোক কে—আরে ও যে বাবা!

ভুলে গেলুম যে আমি অপরাধী। ভুলে গেলুম আমার সর্বাঙ্গে কাদা মাখা। ছুটে গিয়ে 'বাবা' ব'লে জড়িয়ে ধরলুম। দুশ্চিন্তায় একরাত্রেই বেচারার কী চেহারা হয়ে গেছে দেখে আমার চোখে জল এসে গেল। বাবাও আমাকে বুকে চেপে ধরে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে দেখি ওধারে প্রতুলও তার বাবার কোলের মধ্যে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কী ব্যাপার বাবা? আপনারা কেমন ক'রে খবর পেলেন?

বাবা যা বললেন তার সারাংশ এই—

অনেক দিন আগে বাবার সঙ্গে বিনয়ের বাবার আমারই কল্যাণে একদিন পরিচয় হয়েছিল। কাল দুজনের বাজারে দেখা হ'তে কুশল প্রশ্নের পর বিনয়ের বাবা প্রশ্ন করলেন, কী আপনার ছেলে যে ভূতের বাড়ীতে গেল!

বাবা ত অবাক! তখন প্রশ্ন ক'রে বিনয়ের বাবার মুখে সব শুনে বাবা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছেন প্রতুলের বাবার বাড়ী এবং দুজনে মিলে প্রায় পাগলের মত চলে এসেছেন

ক্যানিং—সেখানে নেমে একেবারে থানায় গিয়ে দু'চারটে কন্‌স্টেবলকে মোটা টাকা বকশিশ দিয়ে, অনেক কষ্টে নৌকো জোগাড় ক'রে রাত্রিবেলা মৌপুর পৌঁছেছেন। তারপর বহুকষ্টে ক্ষত-বিক্ষত দেহে যখন এখানে এসেছেন তখন দেখেন ম্যাকলীন সাহেবও পুলিশের লোক সঙ্গে নিয়ে এসে এখানে পৌঁছেছেন। তাঁরা খোঁজখবর নিয়ে জায়গাটা আন্দাজ করেছিলেন বটে, কিন্তু ঠিক বাড়িটার হদিশ জানতেন না। দু-দলে দেখা হয়ে যেতে সহজেই ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেছে। মানে পুত্রদায়ে বাধ্য হয়ে ওঁরা ভূতের ভয় অগ্রাহ্য ক'রেই বাড়ীতে ঢোকেন এবং ডাকাতদের খোঁজ পান!

তাও হয়ত ধরা যেত না, যদি না যে-লোকটি ছিট্‌কে বেরিয়ে এসে আমাদের পালাবার পথ পাথর দিয়ে বন্ধ করেছিল সে দৈবাৎ ধরা না পড়ত। (পরের মন্দ ক'রেই বেচারী মারা পড়ল।) সেই লোকটিকে ধরে মারের চোটে তার মুখ থেকে বাকি সকলকার খোঁজ পাওয়া গেছে—সকলে ধরা পড়েছে।—খালি একজন ছাড়া।

পুলিশের দারোগাটি বললেন, সে যে কোথায় উপে গেল! কিছুতেই তাকে ধরা গেল না।

বিনয় অপরাধীর মত ঘাড় হেঁট ক'রে বললে, সে পালিয়েছে আমারি দোষে, সেও ধরা পড়েছিল, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।

সে কারণটাও খুলে বললে, সব শুনে দারোগা হো হো ক'রে হেসে উঠলেন, বললেন, আচ্ছা ঠকিয়েছে ও তোমাকে! তার ছেলেপিলে কেউ কোথাও নেই!

বিনয় বেকুব বনে আরও ঘাড় হেঁট করলে। কিন্তু ম্যাকলীন সাহেব ব্যাপারটা শুনে ওর করমর্দন ক'রে বললেন, Still it does you credit ।

* * * *

প্রতুলের বাবা সেই বছরেই নতুন ক'রে গৃহপ্রবেশ করলেন। বাড়ীর নামটা শুধু পাল্‌টে রাখলেন 'বিনয় আবাস'।

তরুণ গুপ্তের বিচিত্র কীর্তিকথা
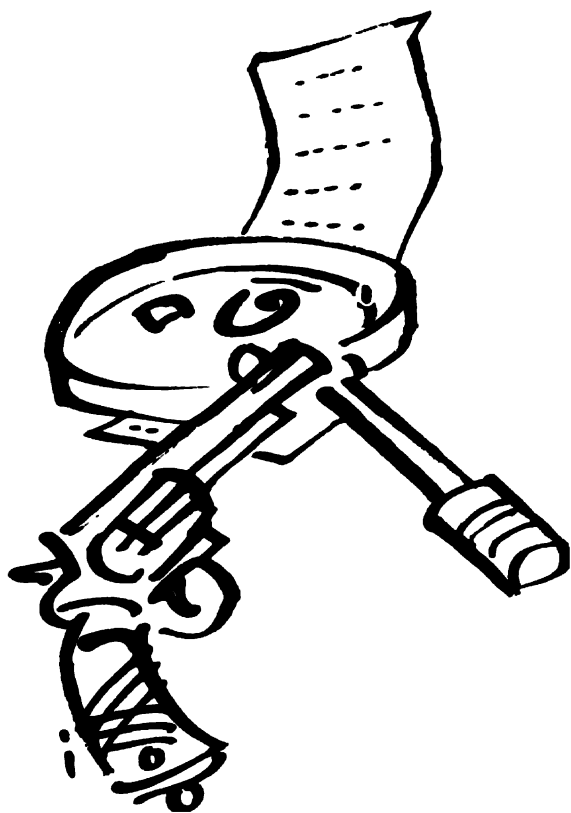
উৎসর্গ

শ্রীমতী দীপালিকা ও
অমরেন্দ্র (চা)র করকমলে-

প্রথম পরিচ্ছেদ

তরুণ গুপ্ত ঢাকুরিয়ায় মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। তা ঐ যে বলে না, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানতে বাধ্য হয়, আমাদের তরুণেরও তাই হ'ল।

বড় মামা সকালে চা খেতে খেতে বললেন—কি কাণ্ড হয়েছে শুনেছিস?

তরুণ তখন দিস্তা-খানেক লুচি নিয়ে বড় ব্যস্ত। ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, না।

—কাল রাত্রে যে গুড্স্ ট্রেনখানা ডায়মণ্ডহারবার থেকে কলকাতায় গেল তার মধ্যে থেকে একখানা গাড়ি চুরি গেছে।

কথাটা শুনে ভাগ্নে যতটা আশ্চর্য হবে মনে করেছিলেন ততটা আশ্চর্য কিন্তু সে হ'ল না। তবুও বলল, গাড়ি চুরি গেল কি রকম?

—কলকাতায় পৌঁছে দেখা গেল মধ্যের একটা ওয়াগন নেই।

—তাহ'লে পেছনে ছিল, কি রকম ক'রে খুলে পিছনে রয়ে গেছে।

—না রে বাপু না। এখানা ঠিক মাঝখানে ছিল, পিছনের গাড়ি যেমন ছিল তেমনিই আছে, প্রথমের গাড়িও তাই—মাঝখান থেকে একখানা গাড়ি নেই।

এইবার তরুণ সত্যই আশ্চর্য হ'ল। এত রকমের চুরির কথা সে শুনেছে কিন্তু ট্রেন চুরি—এ যে বড় অদ্ভুত ব্যাপার! অবাক হয়ে বলল—মাঝখান থেকে গেল কি রকম? তার পরেরগুলো পৌঁচেছে?

—হ্যাঁ। তাইতেই তো এত বেশী অবাক হয়ে গেছে সকলে। গাড়ি সোনারপুর থেকে ছেড়ে একেবারে কলকাতায় গেছে, পথে কোথাও থামে নি। সোনারপুর থেকে যখন ছাড়া হয় তখনও সে গাড়ি দেখা হয়েছে এবং সব গাড়ি গুনে ছাড়া হয়েছে।

—যেখানা চুরি গেছে তাতে কি ছিল?

—তা বেশ দামী জিনিসই ছিল। মজিলপুরের চক্রবর্তীরা কংগ্রেস একজিবিশনে খানকতক গালচে পাঠাচ্ছিল। মুঘলদের আমলের গালচে সব, এ. এক খানার দাম খুব কম ক'রে আট দশ হাজার টাকা হবে। সবসুদ্ধ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হাজার টাকার মাল ছিল ঐ গাড়িখানায়। রেল কোম্পানীর কাছে Consignment insure করা ছিল। যাদবপুর, ঢাকুরে, বালিগঞ্জের স্টেশনস্টাফ মাথায় হাত দিয়ে বসেছে।... চাকরী নিয়ে টানাটানি তো বটেই—জেল খাটতে না হয়!

তরুণ খেতে খেতে উঠে দাঁড়াল। বলল, চলুন দেখি, ব্যাপারটা দেখা যাক্।

মামা হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেন, খেতে খেতে উঠলে কেন, কি মুশকিল! খাওয়া শেষ ক'রে গেলেই হ'ত। এলি দু'দিন্ জিরোতে, তোর ওসব গোলমালে কাজ কি বাপু!

তরুণ হেসে বলল, আর আমি খাব না। ঢের অনেক খেয়েছি।... এই যখন আমার পেশা তখন কি আমি এমন তাজ্জব কাণ্ড শুনেও চুপ ক'রে থাকতে পারি।

বড়মামা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠলেন, বললেন, কোন্ দিকে যাবে? চুরি তো বালিগঞ্জের দিকেও হ'তে পারে, যাদবপুরের দিকেও হ'তে পারে!

তরুণ বলল, তা হয়ত পারে, কিন্তু বালিগঞ্জের থেকে যাদবপুরের দিকে চুরি যাবারই সুবিধা বেশি।

কখনও ডায়মণ্ডহারবার লাইনে যাঁরা যান নি তাঁদের সুবিধার জন্য স্টেশনগুলির অবস্থান একটু বোঝাবার চেষ্টা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কলকাতা (শিয়ালদহ)
বালিগঞ্জ
ঢাকুরিয়া
যাদবপুর*
গড়িয়া
সোনারপুর

কলকাতা থেকে সোজা দক্ষিণদিকে স্টেশনগুলি পরপর চলে গেছে। তার মধ্যে ঢাকুরিয়া ফ্ল্যাগ স্টেশন। অর্থাৎ এখানে নিজস্ব সিগন্যাল রুম বা সাইডিং কিছুই নেই। শুধু প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি যাত্রী নেবার জন্য একবার করে থামে মাত্র।

সুতরাং ঢাকুরিয়ায় কিছু করা সম্ভবপর নয়। হয় গড়িয়া, নয় যাদবপুর, নয় বালিগঞ্জের পর কিছু করা হয়েছে। যেহেতু বালিগঞ্জের দিকে চুরি করবার মতো নির্জন স্থান অল্প সেহেতু সেখানেও কিছু করা কঠিন। সুতরাং তরুণ যাদবপুরের দিকে যাওয়াই স্থির করল।

কিন্তু বেশিদূর যেতে হ'ল না, পথেই ঢাকুরিয়ার স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি বড়মামাকে দেখেই বললেন, মশাই, খালি গাড়িখানা পাওয়া গেছে যাদবপুরের সাইডিং-এ, কিন্তু গালচে একখানাও নেই! সর্বনাশ হয়ে গেল!...

বড়মামা তরুণের সঙ্গে স্টেশনমাস্টারের পরিচয় করিয়ে দিলেন : এটি আমার ভাগ্নে তরুণ, শখ ক'রে গোয়েন্দাগিরি করে, নাম শুনেছেন বোধ হয়?

স্টেশনমাস্টার বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি বৈকি। আমাদের সৌভাগ্য যে এই সময়ে উনি এখানে এসে পড়েছেন। মশাই তরুণবাবু, যদি তাড়াতাড়ি এর একটা কিনারা করতে পারেন তাহ'লে আমরা এই কজন স্টেশনমাস্টার চাঁদা ক'রে আপনি যা চাইবেন তাই দেব।

তরুণ একটু হেসে বলল, চলুন তো দেখা যাক—তারপর আপনাদের বরাত, আর আমার হাতযশ!

তিনজনে লাইন ধরে যাদবপুরের দিকে রওনা হলেন। খানিকটা দূর গিয়েই নজরে পড়ল একখানা খালি মালগাড়ি একটা সাইডিং-এ—এবং সেটা ঘিরে অনেকগুলি লোক জটলা করছে।

ঢাকুরিয়ার স্টেশনমাস্টার যাদবপুরের স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে তরুণের পরিচয় করিয়ে দিলেন। একপালা নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের পর তরুণ কাজ আরম্ভ করল।

* এটা যে সময়ের কথা তখন পার্ক সার্কাস বা বাঘা যতীন স্টেশন হয় নি।
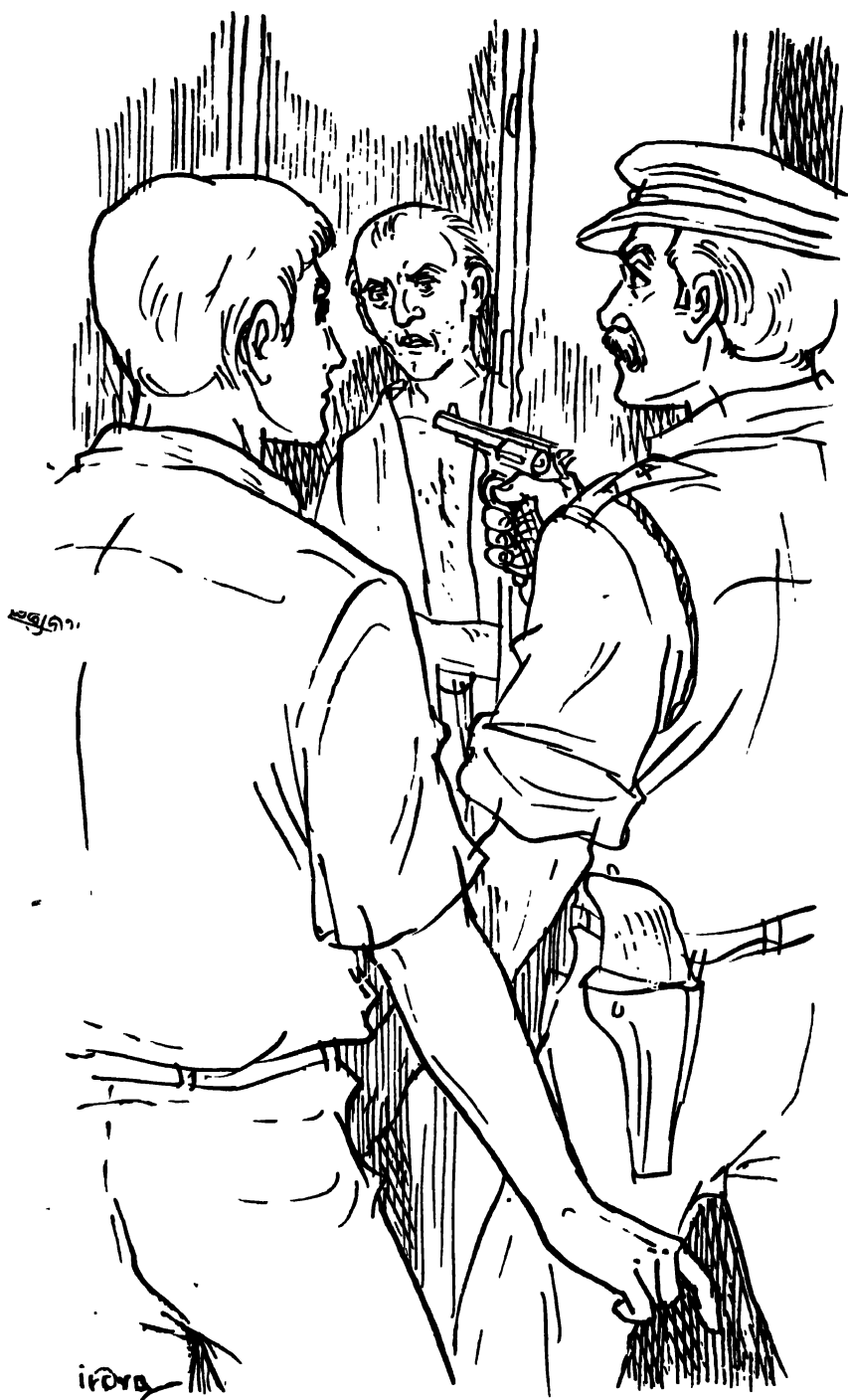
যাদবপুর ছাড়িয়ে এসেই আপ লাইন থেকে যে সাইডিং বেরিয়েছে সেইটিতেই গাড়িখানি কেটে দিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু কেমন করে...?

সাইডিং যেখানে মেন লাইনের সঙ্গে জুড়েছে, সেইখানটা তরুণ বহুক্ষণ পরীক্ষা করল। হাঁটু গেড়ে লাইনে বসে খালি চোখে এবং লেন্সের সাহায্যে সবরকমেই পরীক্ষা করা হ'ল। শেষে উঠে দাঁড়িয়ে তরুণ বলল,—এ সাইডিং কি ব্যবহার করা হয়?

স্টেশনমাস্টার মাথা নেড়ে বললেন, গত তিন বৎসরের মধ্যে একদিনও ব্যবহার হয় নি বোধ হয়—

তরুণ বলল, হুঁ। তাহ'লে এর জয়েন্টের মুখে যে তেল দেওয়া হয়েছে সে নিশ্চয়ই আপনাদের কোন লোক দেয় নি?

—নিশ্চয়ই না। বহুকাল ব্যবহার হয় নি, তা ছাড়া অদূর ভবিষ্যতে ব্যবহার হবার সম্ভাবনাও নেই। শুধু শুধু কর্তব্যের খাতিরে ওরা জয়েন্টের মুখে তেল দিতে যাবে এত ভালো মানুষ আমার পোর্টাররা নয়।

তরুণ বলল, আপনাদের এখানে কাছাকাছি কারুর কাছে ক্যামেরা আছে?

স্টেশনমাস্টারের বড় ছেলেটি লাফিয়ে উঠল। আমার কাছে আছে, নিয়ে আসছি!

সেই জয়েন্টের মুখে লাইনের উপর একটি তৈলসিক্ত ময়লা আঙুলের ছাপ প[illegible] তরুণ সাবধানে ক্যামেরার সাহায্যে তারই ছবি তুলে নিল।

তারপর রেলওয়ে পুলিসের ইন্‌স্পেক্টরকে বলল, এই আঙুলের ছাপটা নিয়ে একবার হেড-অফিসে খোঁজ ক'রে দেখুন দেখি কোনও পুরনো পাপী কিনা! আমার বিশ্বাস যে, এমন কাজ যে করতে পারে [illegible] এই প্রথম কেস্ নয়!

তারপর স্টেশনম[illegible]রের দিকে ফিরে বলল, বহুদিন অব্যবহারে জয়েন্টটা পাছে ঠিকমত কাজ না ক[illegible] এই ভয়ে তেল দিতে গিয়েছিল। আঙুলের ছাপটি উঠে গেছে—আচ্ছা আসি আজ, যদি কোনও খবর পান—আমায় জানাবেন।

* * * * *

পরের দিন ভোর হ'তে না হ'তেই ইন্‌স্পেক্টর এসে হাজির। আঙুলের ছাপের প্রতিলিপি হেড অফিসের দপ্তরে পাওয়া গেছে, লোকটির নাম সীতানাথ, এর আগে ভীষণ ভীষণ চুরি ক'রে ধরা পড়েছে এবং বার দুই জেল খেটেছে। বেঁটে, কৃষ্ণবর্ণ, মাথার মধ্যে ঈষৎ একটু টাক আছে। নাকটা খাঁড়ার মতো সোজা নেমেছে।... কিছুদিন আগে পর্যন্ত জানা গিয়েছিল যে সে যাদবপুর ও ঢাকুরিয়ার মাঝামাঝি গোবিন্দপুরে থাকে।

তরুণ বলল, চলুন, একবার খোঁজ ক'রে দেখা যাক।

দুজনে বেরিয়ে পড়ল। তরুণ কিছুদূর গিয়ে বলল, লোকটাকে শাস্তি দিতে চান, না জিনিসগুলো ফিরে চান?

ইন্‌স্পেক্টর বললেন, জিনিসগুলো আগে চাই—নইলে রেল কোম্পানীকে কত টাকা খেসারৎ দিতে হবে তার ঠিক আছে! ভালয় ভালয় যদি মালগুলো ফেরৎ পাওয়া যায় তাহ'লে ওকে ছেড়ে দিতেও রাজী আছি।

গোবিন্দপুর বেশি দূর নয়। সাতটা বাজবার আগেই দু'জনে পৌঁছলেন। একজন মুসলমান তাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বাড়ি দেখিয়ে দিল। তরুণ ইন্‌স্পেক্টরকে একটু আড়ালে থাকবার অনুরোধ ক'রে খুব জোরে কড়া নাড়তে লাগল। প্রায় মিনিট পাঁচেক কড়া নাড়বার পর ভিতর থেকে মোটা ভারী স্ত্রীকণ্ঠে জবাব এল—কে রে?

তরুণ কোনও কথা না বলে কড়া নেড়েই চলল। তখন কপাটটা ঈষৎ ফাঁক ক'রে একটি স্ত্রীলোক উঁকি মারল। যেমন মোটা তেমনি বেঁটে এবং তেমনি কালো, তার উপর নাকটা থ্যাবড়া। কেশবিরল মাথার গুটিকতক চুল উপর-ঝুঁটি ক'রে বাঁধা।

সে যেন খিঁচিয়ে মারতে এল, কি রকম লোক তুমি বাছা! খালি কড়া নেড়ে চলেছ! জবাব দাও না কেন?

তরুণ সে সব কথা গায়ে না মেখে বলল, সীতানাথ আছে?

স্ত্রীলোকটি যেন লাফিয়ে উঠল, বলল, আছে, কিন্তু সে কারো সঙ্গে দেখা করে না।

বলেই সহসা কপাট বন্ধ ক'রে দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তরুণ তার আগেই ডান পা-টা দরজার মধ্যে বাড়িয়ে দিয়েছে সুতরাং বন্ধ করা গেল না।

সে চেঁচিয়ে উঠল, একি গো, জোর ক'রে ঢুকবে নাকি?

তরুণ ধীরস্বরে বলল, সেই রকমই তো ইচ্ছে আছে। আসুন ইন্‌স্পেক্টর।

ইন্‌স্পেক্টর নামটা শুনবামাত্রই স্ত্রীলোকটি একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য বুঝে তরুণ নিমেষে পাশ কাটিয়ে স্ত্রীলোকটির আগে চলে গেল।

সীতানাথ একটা গোলমাল শুনে বেরোতে যাচ্ছিল—কিন্তু তার পথরোধ ক'রে দাঁড়াল তরুণ এবং তার পিছনে ইন্‌স্পেক্টর হাতে পিস্তল নিয়ে।

সে বিবর্ণমুখে পা-পা ক'রে পিছিয়ে গেল। তরুণ ভিতরে এসে ইন্‌স্পেক্টরকে ভিতরে টেনে নিয়ে দ্বার বন্ধ ক'রে দিল। তারপর গম্ভীরমুখে বলল, তারপর সীতানাথ গাল্‌চেগুলো কোথায় বল দেখি?

সীতানাথ বিস্মিত হবার ভান করে বলল, কি গাল্‌চে, কোথাকার গাল্‌চে?

ইন্‌স্পেক্টর চটে উঠলেন, ন্যাকামি ক'র না, আমরা সব টের পেয়েছি, লাইন-জয়েন্টের মুখে তোমার আঙুলের ছাপ ধরা পড়েছে—চালাকি রাখ, কোথায় আছে বল!

সীতানাথ লোকটা বোকা নয়। সে আর অবাক্ হবার চেষ্টা না ক'রে বলল, আমি বলব না, যা খুশি করুন গে।

তরুণ ইন্‌স্পেক্টরকে চুপ করবার ইঙ্গিত ক'রে বলল, বাপু, ধরা তো পড়েইছ, তুমি কি মনে কর খুঁজে আমরা বের করতে পারব না?

সীতানাথ বলল, না—পারবেন না। সে যেখানে আছে পুলিসের চোদ্দপুরুষের ক্ষমতা নেই যে বার করে!

ইন্‌স্পেক্টর একটা কটূক্তি ক'রে উঠলেন, ভদ্রলোকের মতো কথা বল্।

সীতানাথ বলল, রাগ হ'লে আপনার কথাই প্রায় ভদ্রলোকের মতো থাকে কিনা! আমি তো ছোটলোক বটেই!... তা যাই হোক, সে পাবেন-টাবেন না। জেলে-টেলে যা দেবেন দিন, জেলেও দেবেন আর মালও আমি ছেড়ে দেবো এত কাঁচা ছেলে আমি নই!

—ফিরে এসে তো বেচতে হবে, তখন টের পাবো না আমরা?

সীতানাথ তাতেও দমল না, বলল, আমি জেলে গেলে অন্য লোক তার ব্যবস্থা করবে।

ইন্‌স্পেক্টরের চোখ জ্বলে উঠল, বললেন, সেখানে গিয়ে মারের চোটে কথা আদায় ক'রে নেব।

তরুণ সীতানাথকে মনে মনে অজস্র বাহবা দিতে লাগল। সে নির্বিকার মুখে বলল, আমি পুলিসের সঙ্গে এ বাড়ির বাইরে পা দেবামাত্র তার ব্যবস্থা হবে, তখন আমারও আর বলবার উপায় থাকবে না, ইচ্ছে থাকলেও না।

তরুণ ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চেয়ে কষ্টে হাসি দমন করল। তারপর মোলায়েম কণ্ঠে বলল, যদি না ধরি, যদি ছেড়ে দিই?

সহসা সীতানাথ সামনে ঝুঁকে আগ্রহভরে বলল, দেবেন, দেবেন ছেড়ে?... জেলে দেবেন না?... ছেলেটার বড় অসুখ বাবু—আমি জেলে গেলে দেখবার লোক থাকবে না।

তরুণ বলল, বেশ, আমি কথা দিচ্ছি তুমি গাল্‌চেগুলো ফিরে দিলে আমি আর এবার তোমার কেস উঠতে দেব না। কিন্তু একটা মুচলেকা দিতে হবে।

সীতানাথ একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, একটা লোহার চাদরের বাক্সের মধ্যে পা[illegible] ধারগুলো ঝাল ক'রে পুকুরের মধ্যে ফেলে রেখেছি। জেলে ডেকে জাল ফেলে ওঠাতে হবে, কাছেই আছে।

তরুণ বলল, কিন্তু তুমি চুরি করলে কি ক'রে?

সীতানাথ হেসে বলল, একলা পারি নি বাবু। আর একজন ছিল, তার নাম করব না। যখন সোনারপুর থেকে গাড়ি ছাড়ে তখন একটা ওয়াগনের ওপর লম্বা দড়ি নিয়ে সে লুকিয়ে থাকে। গাড়ি ছাড়বার পরই কাজ আরম্ভ করে। যে গাড়ির মধ্যে গাল্‌চে ছিল তার আগের গাড়ির সঙ্গে তার পরের গাড়ি আগে অনেকখানি ঢিলে ক'রে বাঁধা হয়। ধরুন চুরির গাড়িখানা এক নম্বর, আগেরটা দু'নম্বর আর পরেরটা তিন নম্বর! তিন নম্বরে আর দু'নম্বরে বেঁধে এক নম্বর আর তিন নম্বরের জোড়টা খুলে দেওয়া হয়। লম্বা দড়িটায় আট্‌কে রইল বটে কিন্তু অনেকটা মধ্যে ফাঁক রইল। তারপর দু'নম্বর আর এক নম্বরের বাঁধন হ'ল খোলা, তখন এক নম্বর গাড়িখানা দু'নম্বর আর তিন নম্বরের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলতে লাগল। এধারে আমি যাদবপুরের ঐ সাইডিংটায় তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম। যেমন দু'নম্বর গাড়িটা চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে সাইডিং-এ লাইন জয়েন ক'রে দিলুম, ফলে এক নম্বরটা গড়াতে গড়াতে সাইডিং-এ চলে এল। আমিও সাইডিং-এর সঙ্গে মেন লাইনের জোড়া খুলে দিলুম। তিন নম্বর আর পিছনের গাড়িগুলো আবার মেন লাইনে চলে গেল। তখন দড়িটা খাটো ক'রে ক'রে এনে গাড়ির দুটো ভাগ বেমালুম জুড়ে দেওয়া হ'ল।

তরুণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল, ইন্‌স্পেক্টর শুধু একটা 'স্—স্' শব্দ ক'রে উঠলেন। তারপর একটা মুচলেকা লিখিয়ে নিলেন। তরুণ প্রশ্ন করল, তুমি টের পেলে কি ক'রে গাল্‌চের কথা?

সীতানাথ বলল, আপনাদের ভদ্দর-ঘরের কাণ্ড।... আর একজন জমিদার অনেক ট কব্‌লান, চক্রবর্তীদের ঐ গাল্‌চের ওপর বড় লোভ তাঁর।... তা অত পরিশ্রম বৃথা গে ছেলেটার বড় অসুখ, টাকার দরকার বলেই অমন অসমসাহসিক কাজে লেগেছিলুম।

তরুণ একটু ইতস্ততঃ ক'রে পকেট থেকে একগোছা নোট বার ক'রে হাতে দিয়ে বল এই পঞ্চাশ টাকা দিলুম। আমার সঙ্গে আবার দেখা ক'র। তোমার ব্যবস্থা আমি ক'রে দে এসব কাজ আর ক'র না। এই ঠিকানাটা রেখে দাও।

সীতানাথের চোখ সজল হয়ে উঠল।

বাইরে এসে ইন্‌স্পেক্টর বললেন, একে তো এমনি ছেড়ে দিলেন, তার ওপর আব টাকা!

তরুণ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, যার মাথায় অমন চুরির মতলব আস পারে তার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করে, টাকা তো তুচ্ছ কথা!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমরা কাশ্মীর যাচ্ছিলাম।

কলকাতা থেকে পাঞ্জাব পৌঁছতেই দু দিন লাগে—তারও পরে ওধারে যাত্রা বাকী। এ দীর্ঘ সময় ট্রেনে কি ক'রে কাটানো যায় ভাবতে ভাবতে ঠিক করা গেল যে সকলে নি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে চমকপ্রদ গল্প এক একটি বলতে থাকবে। এতে যাত্রা একঘেয়েমি অনেকটা কাটবার সম্ভাবনা।

প্রথমেই মক্কেল পাকড়ানো গেল তরুণকে। সে গোয়েন্দা মানুষ—অনেক বিস্ময়ক ঘটনার মধ্যে তাকে পড়তে হয়েছে এবং হচ্ছে। তার কাহিনীই সকলের চেয়ে বিচিত্র হবে নিশ্চয়।

তরুণ কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে থেকে বলল, সেবার [illegible]ন থেকে আসবার সময় কি অদ্ভুত উপায়ে একটা চোর ধরেছিলুম আর এক বেচারী ভদ্রলোকের ছেলেকে কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলুম সেই কথাই বলব।

মহামান্য ব্রহ্ম গবর্ণরের একটা সামান্য কাজে রেঙ্গুন গিয়েছিলুম। দিনসাতেক পরে জাপান লাইনের প্রকাণ্ড এক জাহাজে ফিরছি, সেই সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল কিন্তু তার আগে সুন্দরী মা-সিনের কথা কিছু বলা দরকার।

জাহাজে উঠলুম বিকেলবেলা। তার একটু পরে সন্ধ্যের সময় ডিনার খেতে ঢুকেছি খাবার ঘরে, হঠাৎ ঘোষালের সঙ্গে দেখা। ঘোষাল এখন বুঝি রেঙ্গুন ব্যাঙ্কের কি একটা হোমরা-চোমরা হয়েছে। যাই হোক ঘোষাল আমায় দেখেই লাফিয়ে উঠল এবং খুব সকলরবে অভ্যর্থনা করলে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের দু'জনেরই এক টেবিলে সিট পড়েছিল। মনটা খুশীতে ভরে উঠল—হাজার হোক পুরনো বন্ধু, বিশেষতঃ জাহাজে

এত মন খারাপ হয়ে যায় আর এত নিঃসঙ্গ ঠেকে যে, যে কোনও চেনা মুখ দেখলেই মনে আনন্দ হয়।

খেতে খেতে ঘোষাল বললে, ওহে তরুণ, তোমার বাঁ ধারের টেবিলে কে বসে আছে দেখছ?

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি—একটি রূপসী বার্মিজ মেয়ে। তার দু'পাশে দুটি ঐ দেশীয় ছোকরা বসে আছে। তার মধ্যে একটির ওপরেই মেয়েটির কিছু পক্ষপাত, সেইজন্যে আর একজনের ক্ষোভের সীমা নেই। আরও দেখলুম যে ঘরসুদ্ধ সকলকারই দৃষ্টি সেই দিকে।

ঘোষালকে বললুম, কি ব্যাপার? একটি বার্মিজ মেয়ের দিকে ঘরসুদ্ধ সবাই হাঁ ক'রে চেয়ে আছে—এ ছাড়া আর তো কিছু বুঝলুম না!

ঘোষাল অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে, তুমি কি মা-সিন্‌কে চেন না?

আমি বললুম, না। এবং চেনবার জন্য ব্যস্তও নই।

ঘোষাল বললে, বিখ্যাত ধনকুবের স্যার মংফুর একমাত্র কন্যা। সম্প্রতি রেঙ্গুন থেকে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা যাচ্ছে। ভারতের সব বিখ্যাত স্থান দেখবার ইচ্ছে আছে। ওধারের ছোকরাটির নাম চাংফু—ঐ যে যার সঙ্গে ও বেশীর ভাগই হেসে কথা [illegible] আর এধারেরটি হচ্ছে য়িজয় অর্থাৎ আমাদের সোজা বাংলায় যাকে [illegible]। দুটিই বড়লোক, দুটিই মা-সিনের পাণিপ্রার্থী। কিন্তু মা-সিন্ যে কাকে বিয়ে করবে শেষ পর্যন্ত এ নিয়ে বেশ মোটা মোটা বাজী ধরা হচ্ছে জাহাজের ভেতর।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, বল কি! এ নিয়ে আবার জুয়াখেলা হয় নাকি?

ঘোষাল বললে, নিশ্চয়।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমিও কি বাজী ধরেছ?

একটু লজ্জিত হয়ে ঘোষাল বললে, হ্যাঁ। হাজারখানেক টাকা ধরেছি বিজয়ের ওপর।

আমি আর একবার তিনজনের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললুম, বিজয়ের যে কিছু আশা-ভরসা আছে বলে মনে হয় না তো!

ঘোষাল হেসে বললে, তুমি বার্মিজ মেয়েদের চেন না। ও শুধু বিজয়কে একটু উত্ত্যক্ত করার ফন্দী। দেখো শেষ পর্যন্ত আমিই বাজী জিতব।

সেদিন ঐ পর্যন্ত, কিন্তু মনটা ঐখানেই পড়ে ছিল—মা-সিনের দিকে নিজের অজ্ঞাতসারেই বোধ হয় একটু নজর রাখতে শুরু করেছিলুম। দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা উঠে দেখলুম—ঘোষালের কথাই সত্যি, অত সকালে তখনও কেউ ওঠে নি, নিরিবিলি ডেকের ওপর মা-সিন্ আর বিজয় পাশাপাশি বসে আছে।

সেদিন জাহাজের লোকদের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিলে। মা-সিন্ সমস্ত দিন চাংফুর দিকে একবারও নজর দিলে না। যখনই মা-সিন্‌কে দেখা যায় তখনই দেখা যায় বিজয় আছে তার পাশে।

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সেটা হচ্ছে বিজয়ের একটা শারীরিক ত্রুটি—ও একটুখানি খুঁড়িয়ে চলত—খুব সামান্য, তাহ'লেও সেটা নজরে পড়ে।

সেদিন সন্ধ্যে থেকে অকস্মাৎ সমুদ্রের হাওয়া গেল বন্ধ হয়ে। ন'টার পর যদিও শুতে গেলুম কিন্তু কেবিনের মধ্যে থাকতে পারলুম না এবং ঘুমও এল না। ঘণ্টাখানেক পরে বেরিয়ে এলুম ডেকের ওপর। তখন ডেক একেবারেই খালি। ওপরের ডেকে উঠে দেখি জলের ধারে পাশাপাশি দুটি চেয়ার পাতা, তার একটাতে মা-সিন্ বসে আর একটা খালি। বুঝলুম বিজয় ছিল, নেই—কোথাও উঠে গেছে। হয়তো ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়েছে। চারিদিকে চেয়ে দেখলুম—যতদূর নজর চলে জনমানবের সন্ধান নেই, সবাই ঘুমুচ্ছে।

খানিকটা পায়চারি ক'রে ওপরের ডেকের উদ্দেশে চলতে লাগলুম। ফার্স্ট ক্লাস কেবিনগুলোর পাশ দিয়েই যেতে হয়, যেতে যেতে হঠাৎ একটা কেবিনের দোর খুলে বেরিয়ে এল একটি লোক, সামনে আমাকে দেখে কয়েক মুহূর্ত একটু ইতস্ততঃ করলে, তারপর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। স্পষ্ট দেখলুম একটু খোঁড়াচ্ছে। বুঝলুম বিজয়। কেবিনটার দিকে চেয়ে দেখলুম ছ'নম্বর...

পরের দিন ভোরবেলা এসে ঘোষাল কেবিনের দোরে ধাক্কা মারলে, ওহে তরুণ উঠেছ?

—কি ব্যাপার?

ঘোষাল মুখে-চোখে একটা ঘোরতর রহস্যের ভাব এনে বললে, কাল রাত্রে কি একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেছে জান?

মানতে হ'ল যে জানি না।

ঘোষাল বললে, মা-সিনের আড়াই লাখ টাকা দামের মুক্তোর মালা চুরি গেছে। এই জন্মদিনে ওর বাপ ওকে উপহার দিয়েছিল।

চট্ ক'রে কাল রাত্রের কথাটা মনে পড়ে গেল। প্রশ্ন করলুম, মা-সিনের কেবিনের কত নম্বর জান?

—ছ'নম্বর।

ভীষণ একটা সন্দেহ হ'ল—তাহ'লে বিজয় কি?

জিজ্ঞেস করলুম, বিজয়ের কি রকম অবস্থা জান?

—চাংফুর থেকে গরীব। কিন্তু তুমিও কি বিজয়কেই সন্দেহ করছ?

বললুম, তার মানে? 'তুমিও কি' বলছ কেন?

ও বললে, কাল রাত্রে নাকি একজন লোককে ছ'নম্বর কেবিন থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল—সে নাকি একটু খুঁড়িয়ে চলে!

আমি বেশ একটু উত্তেজিতভাবে বললুম, তাই নাকি? তাহ'লে আর বিজয়কে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই।

এইবার ঘোষালের উত্তেজিত হবার পালা। বললে—কেন? কেন?

আমি ঘোষালের চোখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে বললুম, কারণ কাল রাত্রে সে সময় ডেকের ওপর আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না. আমি খুব ভাল ক'রে দেখেছি, সুতরাং একথা রটনা করলে কে? বিজয় নিশ্চয় নিজের কথা নিজে রটনা করে নি। তা ছাড়া আমায় দেখে সে-ই দাঁড়িয়ে যাওয়া, সেটা নিশ্চয় ইচ্ছাকৃত—মানে সাক্ষী রাখা।

ঘোষাল তো অবাক্।

—বল কি হে? কী ব্যাপার?

তখন সব কথাই খুলে বললুম।

ঘোষাল আমার হাত দুখানা চেপে ধরলে, বললে, ভাই দেখ দেখি যদি এর একটা মীমাংসা করতে পার, বিজয়ের ওপর আমার অনেকগুলো টাকা ধরা আছে! আজ সকালেও দেখি চাংফু খুব সান্ত্বনা দিচ্ছে মা-সিনকে। বিজয় দেখা করতে গিয়েছিল, মাথা ধরেছে ব'লে মা-সিন দেখা করে নি।

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললুম, তুমি যাও, ওধারে খোঁজখবর নাওগে—আমি মুখ হাত ধুয়ে যাচ্ছি।

আধ ঘণ্টাখানেক পরে আমি বাইরে আসতেই ঘোষালের সঙ্গে দেখা, বললুম, কি হে, further developments কি?

ঘোষাল বললে, ক্যাপ্টেনের আদেশে বিজয়ের ঘর সার্চ করা হ'ল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, পাওয়া গেল কিছু?

ঘোষাল মাথা নেড়ে বললে, কিচ্ছু না।

আমি বললুম, আমি ডেকের ওপর আছি। তুমি একটু ওদিকে ঘুরে, মানে কাপ্তেনের কাছে গিয়ে যদি জেনে আসতে পার যে তারা এখন কি করবে, তাহ'লে বড় সুবিধা হয়!

ঘোষাল তখনই চলে গেল। আমি ডেকের ওপর বসে আকাশপাতাল ভাবতে লাগলুম। চারপাশের সব লোকেরই মুখে ঐ এক কথা—মা-সিনের মুক্তোর মালা, বিজয় আর চাংফু! যারা চাংফুর ওপর বাজী ধরে দুশ্চিন্তায় মরছিল কাল থেকে, তাদের মুখে আবার হাসি দেখা দিয়েছে। জাহাজময় একটা ভীষণ রকম সাড়া পড়ে গেছে। কেউ বলছে, জাহাজের ওপর চুরি গেছে, ও আর পাবার আশা নেই। কেউ বা আশ্বাস দিচ্ছে, যদি এখনও সে জিনিস জাহাজের ওপর থাকে তাহ'লে ওরা ঠিক খুঁজে বার করবে। ইত্যাদি—

ঘণ্টাখানেক পরে ঘোষাল ফিরে এল, বললে, অনেক কষ্টে, ক্যাপ্টেনকে বিস্তর খোশামুদি ক'রে কথা বার করা গেছে। আজ রাত্রে ন'টার সময় একটা 'ভ্যারাইটি এন্‌টারটেনমেণ্টে'র ব্যবস্থা আছে। আজই জাহাজে শেষ রাত কিনা। সুতরাং আশা করা যায় যে সকলেই সেখানে উপস্থিত থাকবে। সেই অবসরে ওরাও সব কেবিনগুলোয় রীতিমত সার্চ করবে। তাতেও না পাওয়া গেলে ঐখানে উপস্থিত সব লোককে সার্চ করা হবে।

সব কথা শুনে ঘোষালকে বললুম, ওহে তোমার কোনও মহিলা বন্ধু জাহাজের মধ্যে আছেন?

সে জিজ্ঞেস করলে, কেন বল দেখি?

—আমায় একটু 'উল' এনে দিতে পার! এই হাতচারেক হ'লেই হবে!

সে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমি বললুম, 'উল' গো, পশম যাকে বলে!

ঘোষাল আমার মাথার দিকে চাইলে—আমি বললুম, ভয় নেই, পাগল হই নি, তুমি যদি বাজীর টাকার শোকে পাগল না হ'তে চাও তো পত্রপাঠ যা বললুম নিয়ে এসে দাও।

ঘোষাল গেল বটে কিন্তু বেশ বুঝলুম যে আমার মাথা সম্বন্ধে সন্দেহ একটা রইলই তার মনে।

* * *

'ভ্যারাইটি এনটারটেনমেন্টে'র আয়োজন ভালই হয়েছিল। লোকও জাহাজের আর কেউ উপস্থিত হ'তে বাকী ছিল না।

আমি এমন জায়গায় বসেছিলুম যাতে চারদিকে নজর চলে। দেখলুম চাংফু আর মা-সিন্ পাশাপাশি বসে। বিজয় বেচারা একটু দূরে মুখ শুকিয়ে বসে আছে, তার ঘর থেকে জিনিস না পাওয়া গেলেও সন্দেহ এখনও লোকের যায় নি।

প্রথমেই একটি বাঙালীর মেয়ে গান ধরলে,

'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে—।'

গান সবে আরম্ভ হয়েছে, এমন সময়ে চাংফু মা-সিনের কানে কানে কি একটা ব'লে উঠে চলে গেল। ঘোষাল তার জায়গা থেকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল, আমার মুখের দিকে চাইলে কিন্তু আমি গম্ভীর হয়ে বসে রইলুম।

মিনিট তিনেক পরেই চাংফু ফিরে এল। তখন শেষ অন্তরা গাওয়া চলেছে—

'যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া,
নিখিল প্লাবিয়া, ভুবন ব্যাপিয়া,
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া,
তোমার লাগিয়া একেলা জাগে।'

গানটি শেষ হবার পরই দেখলুম প্রোগ্রামে লেখা রয়েছে একটা বিলাতী গান হবে। কিন্তু মেমসাহেবের বদলে বেরিয়ে এলেন কাপ্তেন। তিনি 'নড্' বা অভিবাদন ক'রে ভূমিকা যা শুরু করলেন তার বাংলা তর্জমা করলে এইরকম দাঁড়ায়—

'দেখুন, কাল রাত্রে জাহাজে যে একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটেছে, খুব সম্ভব তা আপনারা অনেকেই জানেন। একজন ফার্স্টক্লাস আরোহীর বহু টাকা দামের একটি মুক্তোর মালা চুরি গেছে... এবং অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে তা এখনও পাওয়া যায় নি। ব্যাপারের গুরুত্ব আপনারা নিশ্চয় উপলব্ধি করবেন এবং আশা করি আমরা যে ব্যবস্থা করেছি তা আপনারা অনুমোদন করবেন। আপনাদের প্রত্যেকের কামরা আপনাদের অনুপস্থিতিতে সার্চ করানো হবে এবং যতক্ষণ সে কাজ না হয়, আমার অনুরোধ আপনারা কেউ বাইরে যাবেন না।'

কাপ্তেনের কথা শেষ হওয়া মাত্র আমি উঠে দাঁড়ালুম, বললুম, আমি একটা কথা বলতে পারি কি?

সকলে নিঃশ্বাস রোধ ক'রে আমার দিকে চেয়ে রইল। কাপ্তেন বললেন, নিশ্চয়।

আরম্ভ করলুম, কাল রাত্রে কোন কারণে ঘুম না হওয়ায় আমি অনেকক্ষণ বাইরে

পায়চারি করছিলুম। যখন ডেকের ওপর থেকে কেবিনে ফিরছিলুম তখন ছ'নম্বর কেবিনের দোর খুলে একটি লোক বেরিয়ে আসে, আমাকে দেখে একটু ইতস্ততঃ করে এবং শেষে ডেকের দিকে হেঁটে চ'লে যায়। আমি লক্ষ্য ক'রে দেখলুম, লোকটি একটু খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে।—

এই পর্যন্ত বলতেই চারিদিকে একটা গুঞ্জন শোনা গেল। চাংফুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আর বিজয় উঠল লাফিয়ে।

—মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, তখন আমি আমার কেবিনেই ছিলুম!

কাপ্তেন বললেন, এই গুজবের ওপর নির্ভর ক'রেই আমি আজ সকালে ওঁর ঘর পরীক্ষা করেছিলুম কিন্তু কিছু পাওয়া যায় নি।

আমি খুব শান্তস্বরে বললুম, একজন লোক এখন পাঠিয়ে দিন, ওঁর ঘর থেকেই বেরোবে।

বিজয়ের চোখ এমন জ্বলছিল যে ভয় হ'তে লাগল লাফিয়ে পড়ে বুঝি আমার ঘাড়ের ওপর—! "সব মিথ্যে কথা! এ সব চক্রান্ত!" এই বলে চেঁচাতে লাগল। এধারে দেখলুম চাংফুর মুখও শুকিয়ে উঠেছে—

কাপ্তেন তখনই একজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। সে লোকটি মিনিট পাঁচ-সাত পরে ফিরে এল, তার হাতে একটি ছোট সরু ভেলভেটের খাপ। বললে, ওর বিছানার উপর ছিল।

কাপ্তেন কেসটা খুলতেই নজর পড়ল, শুভ্র সুন্দর মুক্তার একগাছি মালা।

কাপ্তেন আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কি ক'রে জানলেন?

বিজয়ের মুখ তখন ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে।

আমি কাপ্তেনকে অভিবাদন ক'রে একটু চেঁচিয়ে, যাতে ঘরসুদ্ধ সবাই শুনতে পায় এমন ভাবে বললুম, 'প্রথমেই বলে রাখি আমি একজন গোয়েন্দা।...... কাল যখন প্রথম সে লোকটিকে দেখি তখন মনে করেছিলুম তিনিই মিঃ বিজয়, কিন্তু আজ ভোরে উঠে যখন শুনলুম যে গভীর রাত্রে ছ'নম্বর থেকে তাঁর বেরোবার কথা জাহাজসুদ্ধ সবাই জানে তখনই বুঝলুম যে তিনি আর যেই হোন মিঃ বিজয় নন!'

সকলে দেখি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, বোধ হয় তখন একটা ছুঁচ পড়লেও আওয়াজ পাওয়া যায়। আর সকলের চেয়ে খারাপ অবস্থা বিজয়ের—

'কারণ তখন ডেকে আমি ছাড়া আর কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না এবং যেহেতু আমি সে কথা কাউকে বলি নি তখনও, সেহেতু নিশ্চয় এমন লোক একথা প্রচার করেছে যার মিঃ বিজয়ের নামে কলঙ্ক রটনায় লাভ আছে। তখনই আমার মনে হ'ল যে একটু ইতস্ততঃ ক'রে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্য ও সাক্ষী রাখা। মিঃ বিজয়ের মতো খুঁড়িয়ে চলতে সকলেই পারে। মনে রাখবেন আপনারা, আগে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে, তারপর খুঁড়িয়ে চলে যাওয়া, এর উদ্দেশ্য কত স্পষ্ট!... তারপর মিঃ বিজয়ের কেবিন যখন সার্চ করা হয় তখনও হয়ত ওর ঘরে চোরাই মুক্তার মালা রাখার সুযোগ আসে নি। কিন্তু আমি

ঠিক জানতুম যে আবার সার্চ করা হবে একথা জানলে চোর তার আগেই কোনও সুযোগে মুক্তোর মালা মিঃ বিজয়ের ঘরে রেখে আসবে যাতে তিনি প্রমাণসুদ্ধ ধরা পড়েন! সেই জন্যই আপনাকে বলি ওঁর ঘরে লোক পাঠাতে।'

মা-সিনের দিকে চেয়ে দেখি তার চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর বিজয়? বিজয় বোধ হয় তখন কৃতজ্ঞতায় আমার পা জড়িয়ে ধরতে পারত।

কাপ্তেন হতাশার স্বরে বললেন, কিন্তু চোর যে কে তা তো জানা গেল না!

আমি তখন একটু বিনয় প্রকাশ ক'রে বললুম, 'তার জন্যও একটু ছোটখাট রকমের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলুম বৈকি!'

চাংফু উত্তেজনায় দু-পা এগিয়ে এল। মা-সিন্ উঠে দাঁড়িয়েছিল আগেই, কাপ্তেন সুদ্ধ প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

আমি বললুম, 'আমি জানতুম যে আমরা এ ঘরে সমবেত হ'লে তখনই চোরাই মাল সরাবার চেষ্টা করা হবে। তাই ঠিক এখানে আসবার আগে খানিকটা 'উল' খড়ির গুঁড়ো মাখিয়ে মিঃ বিজয়ের কেবিনের দোরে এ পাশ থেকে ও পাশ পর্যন্ত বেঁধে রেখে এসেছিলুম, মেঝে থেকে ঠিক সাড়ে চার ফুট উঁচুতে! 'উলে'র মতো জিনিস একটু লাগলেই ছিঁড়ে যাবে জানতুম কিন্তু তার আগে চোরের অজ্ঞাতসারে নিজের কাজ করবে তাও জানতুম। ধরুন যদি মিঃ চাংফুর মতো কালো কোট গায়ে দিয়ে সে গিয়ে থাকে, তাহ'লে তার গলার কাছাকাছি কালো কোটের গায়ে সূক্ষ্ম খড়ির গুঁড়োর রেখা স্পষ্ট দেখা যাবে—'

এই বলে নাটকীয়ভাবে আমি চাংফুর গলাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললুম, 'যেমন মিঃ চাংফুর গলার নীচে ঐ দাগ দেখা যাচ্ছে!'

সকলে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে সরু একটি শ্বেত রেখা বাঁ দিক থেকে ডান দিক পর্যন্ত তার কোটের ওপর দিয়ে চলে গেছে। চাংফু দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। মা-সিন্ শুধু বিজয়ের হাত দু'খানা ধরে বললে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

ঘোষাল্ বাজীর টাকা থেকে দিয়েছিল আমায় শ'পাঁচেক টাকা। আর মা-সিন্ হাজার দুই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তরুণের গল্প যখন শেষ হল, তখনই রাত্রি গভীর হয়ে গেছে। কিন্তু তখনও কারও চোখে ঘুমের কোন চিহ্ন নেই। গাড়ি অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হু-হু ক'রে ছুটে চলেছে। ভিতরে আমরা এই কটি লোক। বেশ আরামেই বসে আছি। সুতরাং গল্প শুনবার মতোই তখন মনের অবস্থা, ঘুমের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই।

অগত্যা আমরা আর এক বন্ধুকে ধরে পড়লাম গল্প বল একটা, এমনি জমাট, আর সত্যিকারের।

সে একটু চুপ ক'রে ভেবে নিল, তার পর শুরু করল—

শিশির ভাদুড়ীর 'সীতা' প্লে দেখতে গেছি। সীতার দুঃখে এবং বেশী ক'রে রামের দুঃখে হৃদয় বিগলিত। চোখ তখনও ভিজে, মন ভার, হঠাৎ বেরোবার সময় দোরের কাছে সেই লোকটির সঙ্গে দেখা হ'ল। চার-চোখে চাওয়াচাওয়ি হওয়া মাত্র দুজনেই যেন পাথর হয়ে গেলুম।

আয়নায় বহুবার মুখ দেখেছি—একেবারে হুবহু—সেই নাক মুখ চোখ, ঠিক তেমনি গড়ন, তেমনি রং, শুধু আমার পরনে পাঞ্জাবি—তার পরনে সিল্কের কোট, এই তফাত— নইলে একেবারে একরকম দেখতে।

আশেপাশের লোকও অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে বেরিয়ে পড়লুম। কানে গেল কারা বলাবলি করছে, কী অদ্ভুত সাদৃশ্য!

ঐ পর্যন্ত। তার নামও জানলুম না, পরিচয়ও না, তারপর ভুলেই গেলুম।

* * *

মনে পড়ল আড়াই বছর পরে, অত্যন্ত রূঢ়ভাবে।

লালবাজারে শ্বশুরমহাশয়ের জড়োয়া গয়নার দোকান ছিল। তাঁর জীবদ্দশাতেই আমি ঐ দোকানে চাকরি করতুম। তিনি মরবার সময় পাঁচ আনা শেয়ার লিখে দিয়ে যান। সুতরাং আমি এখন একজন মালিকও বটে। একটিমাত্র শালা, সে-ও আমার ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। সুতরাং কেনা-বেচা দেখা-শোনা সবই করতে হয় আমাকে।

সলোমন ব'লে এক বুড়ো ইহুদী হীরে কেনা-বেচা করত। এই ব্যবসায়ে সে অনেক পয়সা করেছিল। আমার শ্বশুরমশায় অনেকদিন ওর কাছ থেকে কাটা বা আকাটা হীরে কিনেছিলেন, আমিও কিনে থাকি। লোকটার একটা গুণ ছিল এই যে, ভাল হীরে হ'লে আমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে আর কাউকে বেচত না—তার অবশ্য একটা কারণও ছিল, ভাল জিনিস দেখলে আমি আর দর নিয়ে গোলযোগ করি না।

বুড়োর বয়স আটষট্টির কোঠায় পৌঁচেছে। কিন্তু সে আরও আটাশ বছর এই কারবার করার ভরসা রাখে। তা রাখুক, কিন্তু বুড়োকে এত ক'রে বলি চশমা নিতে— তা কিছুতেই নেবে না— আর এই রকম বিভ্রাট বাধাবে।

বিভ্রাটের কথাটাই বলি তাহ'লে—

ভাদ্র মাসের গোড়াতেই একখানা দামী হীরে বাজারে এসে পড়ল। সামনে পূজো, সুতরাং জহুরীদের মধ্যে ঐখানা হস্তগত করবার জন্য সকলেই উঠে পড়ে লাগল। সলোমন সাহেবের কাছেই এসেছিল, সলোমন সাহেব আগেই আমাকে খবর দিলে।

আমি হীরেখানা একদিন দেখতে গেলুম, হীরেখানা নেড়েচেড়ে বুঝলুম যে ভাল ক'রে সেট করতে পারলে এই পূজোর বাজারে বিলক্ষণ দু'পয়সা লাভ করতে পারব।

দাম কত পড়বে জিজ্ঞেস করতে সলোমন বললে, পঁচাত্তর হাজার টাকা ঠিক পড়বে—এক কথা।

পঁ-চা-ত্ত-র হাজার টাকা!

সুতরাং তখনই বলা গেল না। একটু ভেবে দেখে সন্ধ্যের মধ্যেই খবর দেব ব'লে

বেরিয়ে পড়লুম। এসে সম্বন্ধীর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলুম। সম্বন্ধী—"তুমি যা ভাল বোঝ কর" ব'লে সটান বেরিয়ে গেল বায়স্কোপ দেখতে। নিজেই অনেকক্ষণ ভাবলুম। দু-একটা নতুন ডিজাইনের গয়না আঁকবার চেষ্টাও করলুম। যেসব খদ্দের লাখ টাকা দেড় লাখ টাকার গয়না কিনতে পারে তাদের নামগুলোও মনে মনে ভেবে দেখলুম। শেষে স্থির করলুম, ভরসা ক'রে ঝুলে পড়তে পারলে দশ-বার হাজার টাকা লাভ থাকতে পারে। ফোন ক'রে সলোমনকে ডেকে বললুম যে হীরেখানা আমারই নেওয়া স্থির—কাল সকালের দিকে এক সময় গিয়ে নিয়ে আসব।

তার পরের দিন সকালে কাজের ভীড়ে আর বেরোতে পারি নি। এগারোটার সময় মোটর গাড়িতে ক'রে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু সলোমনের বাড়িতে যেতেই দারোয়ানটা যেন একটু আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল। তারপর কার্ড নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

মিনিট তিনেক পরে সলোমন বেরিয়ে এল। সে এসেই জিজ্ঞেস করলে, কী খবর, এখনি আবার এলে যে!

—এখনি মানে? হীরেখানা নিতে এসেছি!

—হীরে! হীরে তো এখনিই নিয়ে গেলে!

—নিয়ে গেলুম! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?... আমি তো এই আসছি!

—সে কি! আমি এইমাত্র, বোধ হয় আধঘণ্টা আগে, তোমার হাতে হীরেখানা দিয়ে দিয়েছি।

আমি একেবারে অবাক। বুড়োর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!

—কি বলছ তুমি? আজ আটটা থেকে দশটা পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত আমি দোকানেই ছিলুম। একথা দোকানের যে কোনও কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা এখানে এসেছি—এখন এই এগারটা পাঁচ!

সলোমন খানিকটা শূন্য দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর তার মুখে একটা ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। সে পাশের একটা দোরের দিকে চেয়ে ডাকল—আইজাক্!

একটু পরেই আইজাক্ বেরিয়ে এল। আইজাক্ বুড়োর কেরানী, তারও বয়স ষাটের কোঠায় পৌঁচেছে—

—আইজাক্, হীরেখানা বার ক'রে এনে তুমি কার কাছে দিয়েছ?

আইজাক্ আঙুল দিয়ে আমার দিকে দেখিয়ে বললে, এঁর কাছে।

আমি বললুম, ভাল ক'রে দেখ দেখি ঠিক আমাকে দিয়েছ কিনা!

আইজাকের মুখে চোখে একটু মূঢ় বিস্ময় ফুটে উঠল। সে খানিকটা বোকার মতো আমার দিকে চেয়ে থেকে বললে, আপনার হাতেই তো দিয়েছি, তখন আপনি সুট পরে এসেছিলেন!

আমি বললুম, আমার দারোয়ান, মিস্ত্রী, কেশিয়ার, সোফেয়ার যাকে জিজ্ঞেস করবেন সে-ই বলবে যে আমি পৌনে এগারোটা পর্যন্ত দোকানে বসে ছিলুম, সেখান থেকে বেরিয়েই এখানে এসেছি এবং বরাবরই আমার পরনে এই ধুতি আর এই কোট ছিল।

আইজাক্ একটা অস্ফুট চিৎকার ক'রে উঠল, তবে কি সে অন্য লোক?

বুড়ো সলোমন দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে পড়ল। বিড়বিড় ক'রে বকতে লাগল, বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি! বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি!

আমি যদিও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম, তবু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবার ছেলে আমি নয়— তখনই নেমে এসে মোটরে বসলুম। আমার বন্ধু তরুণ শখ ক'রে গোয়েন্দাগিরি করে—ভরসা একমাত্র সে-ই।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে এমন সময় মনে পড়ল আড়াই বছর আগেকার এক শনিবার রাত্রের কথা—নাট্যমন্দিরে সীতার অভিনয়—আর সেই মানুষটি।

এ নিশ্চয়ই সে-ই!

তরুণ সৌভাগ্যবশতঃ বাড়িতেই ছিল। সব কথা চুপ ক'রে শুনে সে প্রথম প্রশ্ন করলে, তোমাদের হীরে কেনা-বেচা কি হিসেবে হয়?

আমি বললুম, এক এক জনের সঙ্গে এক এক রকম বন্দোবস্ত। তবে সলোমনের সঙ্গে অনেক দিনের কারবার ব'লে যে হীরেখানা কেনবার সেটা হাতে ক'রেই নিয়ে আসি আর ব্যাঙ্ককে ব'লে দিই যে ওর হিসেবে সেই টাকাটা জমা ক'রে দিতে। কাজেই টাকাকড়ির কথা সলোমন নিশ্চয়ই তুলবে না এ জানা কথা।

তরুণ শুধু একটা ছোট্ট হুঁ বলে উঠে পড়ল। বললে, তোমার সম্বন্ধী মণি সেন এখন দোকানে আছেন?

—আছে। কেন বল দেখি?

—চল না, বলছি।

মণি দোকানেই ছিল। তরুণ প্রশ্ন করলে, বায়স্কোপে আপনি এই হীরে কেনার কথা গল্প করেছিলেন, কেমন কিনা?

মণি একটু ভয়ে ভয়ে বললে, করেছিলুম।

—কী বলেছিলেন?

মণি বললে, দু'একজন ফ্রেণ্ডের কাছে বলেছিলুম যে এ বছরের সেরা হীরে আমরাই কিনছি। তারা তখন জিজ্ঞেস করলে যে কি ক'রে হীরে কেনা-বেচা হয়, তার উত্তরে আমি তাদের সব কথা খুলে বলি—

কথা কেড়ে নিয়ে তরুণ প্রশ্ন করলে, একেবারে হীরে কেনার সব details-ও আলোচনা হ'ল নিশ্চয়!

আরও অপ্রস্তুত হয়ে মণি বললে, হ্যাঁ, তাও হয়েছিল।

তরুণ বাইরের দিকে মিনিট দুই চেয়ে থেকে বললে, সেই সময়ে নিশ্চয় আশপাশের কেউ শুনে নেয় এবং খুব সম্ভব তোমার সেই ডুপ্লিকেটটিও—

তারপর বললে, এখন তার নামধামটা জানা দরকার। থিয়েটারে যখন দেখা হয়েছিল তখন থিয়েটার-যাইয়েদের মধ্যে ঘুরলে হয়ত জানা যাবে।...

ব্যস্, সেই যে তরুণ চলে গেল, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আর দেখা নেই। এধারে বুড়ো সলোমন একেবারে শয্যাগ্রহণ করেছে। আমাদেরও দিন কম দুশ্চিন্তায় কাটছিল না।

দুদিন পরে তরুণ এসে বললে, পেয়েছি হে তার সন্ধান, অশোক দত্ত ওর নাম। এককালে ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েটে চাকরি করত, জুয়া খেলে অতিরিক্ত দেনা ক'রে সিমলে থেকে পালাতে হয়। ঘোড়দৌড়ের মাঠে আনাগোনা আছে। তুলোর খেলা, জলের খেলা কিছু বাদ যায় না। এইখানে একটা মার্চেন্ট অফিসে চাকরি পায়, দিন-কতক পরে তহবিল তছরূপের সন্দেহে তাও খোয়ায়। বিবাহিতা স্ত্রী মারা গেছে কিন্তু সংসার আছে। কি ক'রে সংসার চালায় জানা নেই।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, অ্যারেস্ট করার ব্যবস্থা করা হোক, কি বল?

সে বললে, আস্তে বন্ধু। একমাত্র তার চেহারাটা এক, তা ছাড়া আর কোনও প্রমাণ নেই। তা ছাড়া তাড়াহুড়ো করলে হীরেখানা আর পাওয়া যাবে না—সেইটেই তো আগে!

—তবে উপায়?

—আজ শনিবার। আজ একবার তোমায় মাঠে যেতে হবে। আমিও সঙ্গে যাব অবশ্য—কিন্তু এ পোশাক চলবে না, সুট পরতে হবে।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, সে কি হে, আমার চোদ্দপুরুষ যে কখনও রেসে যায় নি!

—সেই জন্যেই তো যেতে হবে। চল চল, বকিও না বেশি।

অগত্যা রেসে যেতে হ'ল। মাঠে লোকারণ্যের মধ্যে গিয়ে যেন হাঁপ ধরতে লাগল—তার ওপর জুয়াড়ীদের মুখে যে উন্মাদের দৃষ্টি! দেখলে মানুষ জাতটার ওপরই যেন ঘেন্না হয়ে যায়—

তরুণ কিন্তু বেশ নির্বিকার। সে শিখণ্ডীর মতো আমায় আগে রেখে পিছনে একটু দূরে দূরে চলতে লাগল।

হঠাৎ একটা বেঁটে মুসলমান ছেঁড়া ঘেমো সিল্কের পাঞ্জাবি পরে পাশে এসে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি বললে, আসছে শনিবার টাকা শোধ করবে বলে তিন শনিবার দেখা নেই—আজ টাকা আদায় না ক'রে ছাড়ব না! এনেছিস টাকা?

ভয়ে আমার কণ্ঠতালু শুকিয়ে উঠল, এ কি ফ্যাঁসাদ রে বাবা! কিন্তু সেই মুহূর্তে তরুণ পিছন থেকে এসে ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললে, শোন, একটু এদিকে এস তো!

মুসলমানটিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি ফিস্ ফিস্ ক'রে কথাবার্তা হ'ল। তারপর দেখলুম তরুণ ওর হাতে একখানা কার্ড আর দশটা টাকা গুঁজে দিয়ে চলে এল। বললে, এস, বাড়ি যাই।

গাড়িতে উঠে বললে, ওর অন্তরঙ্গ দু'একজনকে পাবার ইচ্ছে ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই তোমাকে রেসের মাঠে নিয়ে আসা। তোমায় অশোক দত্ত ব'লে ভুল ক'রে ওর মাঠের চেনা লোক যদি আলাপ করতে আসে এই ছিল আমার মতলব। যাক—উদ্দেশ্য ভাল ক'রেই সিদ্ধ হয়েছে, ও লোকটার কাছে খবর পেলুম যে রহমৎ আলির সঙ্গে কিছুদিন যাবৎ অশোকের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। রহমৎ আলি বিখ্যাত গুণ্ডা—পুলিসকে বহুবার কলা

দেখিয়েছে সে। শুধু তাই নয়, রহমৎ আলির খবর, অশোকের খবর, আরও কতকগুলো জরুরী খবর লোকটা এনে দেবে বলেছে।

পরের দিন দুপুরবেলা তরুণ এসে হাজির। বললে, ওহে তোমার চেহারাটা বদলাতে হবে।

—সে কি!

—থিয়েটার করেছিলে কখনও? সাজতে জান?

—না। থিয়েটার করাকে চিরদিনই ডরাই—

—তবে আমার বাড়ি চল, সাজিয়ে দেব—

—কী ব্যাপার বল দেখি?

—চুরির পর অশোক চেহারা বদলেছে। তার মতো তোমায় ক'রে তুলতে হবে। তোমার মতো সেজে সে চুরি করেছে, তুমি তার মতো সেজে বাটপাড়ি করবে।

সে নিজের সাজঘরে আমাকে বসিয়েই প্রথমে কচ্ কচ্ ক'রে আমার ঘাড়ের চুল কাটতে শুরু করলে। তারপর খাটো ক'রে ছাঁটা ঘাড়ের ধারে ধারে একটা কি রং লাগিয়ে দিলে। দেখতে দেখতে চুল ধূসর-বর্ণ ধারণ করল। তারপর কালো বনাতের একটা কুঁচি ছোট্ট ক'রে কেটে গালের ধারে লাগিয়ে দিলে, ঠিক আঁচিলের মতো লেগে রইল! তারপর একটা বাদামী রঙের সুট পরিয়ে ছেড়ে দিলে। নিজেরও চেহারাটা সামান্য একটু বদলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বাইরে এসে বললে, আজ অশোকের সঙ্গে রহমতের রাত্রে দিল্লী যাবার কথা। ওর চেনা একজন স্ত্রীলোক মালতী ব'লে, তারই কাছে হীরেটা আছে। কথা আছে, পাঁচটার সময় মালতীর কাছে অশোক যাবে গাড়ি নিয়ে, মালতী হীরেখানা নিয়ে এসে গাড়িতে উঠবে। ওরা ওখান থেকে সোজা হাওড়ায় যাবে। চারটের পরই গাড়ি নিয়ে দোরের কাছে গিয়ে কড়া নাড়বে। মালতী নিশ্চয় দোরের ফাঁক দিয়ে দেখেই গুটিগুটি বেরিয়ে আসবে।

ঠিক তাই হ'ল। সাড়ে চারটে বাজবার পাঁচ মিনিট আগেই দুর্গাচরণ মিত্রের স্ট্রীটের এক বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়তে লাগলুম। অবশ্য অন্যদিকে মুখ ক'রে-

মিনিট খানেক পরেই দোরের ফাঁক দিয়ে চাপা গলায় কে বলে গেল, একটু দাঁড়াও, আসছি।

প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে, কারুর সাড়া নেই। মনে দারুণ সন্দেহ হ'তে লাগল, হয়ত টের পেয়েছে, হয়ত আসবে না! আশা-আশঙ্কায় বুক দুর-দুর করতে লাগল।

পনের মিনিট পরে খুট্ ক'রে দোরটি খুলে বেরিয়ে এল মালতী, একখানা সিল্কের চাদর মুড়ি দিয়ে বেশ ক'রে মুখ ঢেকে, কাজেই তখন ভাল ক'রে দেখবার আর অবসর হ'ল না। আমিও ভালমানুষের মতো ওর সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগলুম।

গাড়ির দোর খুলতেই ওর নজরে পড়ল আর একটা মানুষ রয়েছে, একটু চমকে ফিরে আমার দিকে চাইলে, কিন্তু আমাকে দেখে ঠিক অশোক মনে ক'রে আশ্বস্ত হ'ল, সুড়সুড় ক'রে ভেতরে গিয়ে বসল। তারপর আমি ভেতরে উঠে গাড়ির দোর বেশ ক'রে বন্ধ ক'রে দিলুম।

মালতীর মনে কেমন সন্দেহ হ'ল, বোধ হয় অন্তর্যামী মন কিছু জানতে পেরেছিল। সে আমার দিকে ফিরে বললে, ইনি কে অশোকবাবু, এঁকে তো চিনতে পারছি না।

আমি টপ্ ক'রে ব'লে ফেললুম, ইনিই জহুরী, এঁকে হীরেখানা বিক্রি ক'রে দেব।

মালতী নিমেষের মধ্যে গাড়ির মধ্যেই উঠে দাঁড়াল, আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললে, তুমি—তুমি কে? তুমি তো অশোক নও! তোমার গলার আওয়াজ যে অন্য রকম—এ কি আশ্চর্য!

তার বিহ্বল দৃষ্টি একবার তরুণ আর একবার আমার দিকে চাইতে লাগল। চেহারা একেবারে মিললেও গলার স্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন বোধ হয়—চেনা লোকের চক্ষু এড়াবার নয়।

তরুণ আর তাকে বেশীক্ষণ সন্দেহে থাকতে দিলে না, সে পকেট থেকে একটি ছোট্ট পিস্তল বার ক'রে মালতীকে বললে, হীরেটা দেখি!

মালতী ধপ ক'রে বসে পড়ে বললে, তা হ'লে তুমি অশোক নও?

—না। যে মানুষটিকে জাল ক'রে তোমার অশোক হীরেটা চুরি করেছিল ইনিই সেই মানুষ। ঠিক সেই উপায়ে ইনি বাটপাড়ি করতে এসেছেন। এখন ভাল চাও তো হীরেটা বার কর।

মালতীর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। সে আর কোন কথা না ব'লে কম্পিত হস্তে পেটের মধ্যে থেকে একটা রুমাল বার করলে, তার কোণে ছোট্ট একটি কি জিনিস বাঁধা রয়েছে— সে খুলে বার ক'রে আমার হাতে দিলে। আমি তো হারাধন-প্রাপ্তির আনন্দে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিলুম। তরুণ কিন্তু খপ্ ক'রে ওর হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে গাড়ির পাখীটা ফাঁক ক'রে ওটা ফেলে দিলে একেবারে রাস্তায়।

আমার তো চোখ কপালে ওঠবার উপক্রম! কিন্তু তরুণ অচঞ্চল কণ্ঠে বললে, ওটা নকল, আসলটা বার কর।

মালতী তবুও ইতস্ততঃ করছে দেখে তরুণ বললে, জুতো খোল দেখি!

তখন সে রাগ ক'রে জুতোটা খুলে হীরেখানা বার ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিলে তরুণের গায়ে। তরুণ আমার হাতে দিয়ে বললে, দেখ দেখি আসল কিনা!

আমি পরীক্ষা ক'রে দেখে বললুম, আসলই বটে।

মালতী প্রশ্ন করলে, আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

—থানায়। সেইখানে রহমৎ আর অশোক দুজনেই আছে। এতক্ষণে তাদের নিশ্চয় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তারপর আমার দিকে চেয়ে, আমি যে কৌতূহলে ফেটে মরে যাবার উপক্রম করছি তা বুঝতে পেরে বললে, দিল্লীওয়ালা জহুরী সেজে অনেক কষ্টে রহমতের সঙ্গে মিশে কথা বার করতে হয়েছে। সে সময় আমাকে দেখলে তুমিও চিনতে পারতে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কলিকাতার বিখ্যাত লোহার কারবারী অমরবাবু রোজ সকালে ডাক্তার ঘোষের বাড়িতে চা খেতে আসতেন। অবশ্য তার অনেকগুলো কারণ ছিল। প্রথমতঃ ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়িটা রাসবিহারী এভিনিউর উপর এবং বাড়িটা ভাল। সামনেই বাগান—বৈঠকখানাটিও সুসজ্জিত। দ্বিতীয়তঃ ডাক্তার ঘোষের বাড়িতে দামী চা ব্যবহার করা হত।

অবশ্য অমরবাবুর যে দামী চা কেনবার পয়সা ছিল না তা নয়, তিনি বড়লোকের ছেলে, নিজেও যথেষ্ট পয়সা উপার্জন করেন এবং বিয়ে করেছিলেন এক বিখ্যাত ধনীর একমাত্র কন্যাকে। তবে মন্দ লোকে বদনাম দেয় যে অমরবাবুর স্ত্রী সুরবালার হাতটা সহজে খুলতে চায় না। তা হোক—তাতে অমরবাবু দুঃখিত নন; সুরবালার অনেক গুণ—সে বিদুষী, সুকণ্ঠী এবং মিষ্ট-স্বভাবা। পাড়ার লোকে বলে সতী-সাধ্বী, স্ত্রীলোকেরা তো রীতিমত ঈর্ষাই করে। একটু বেশীমাত্রায় ধর্মনিষ্ঠা ছিল কিন্তু তাতেও অমরবাবুর ক্ষোভের কারণ নাই, কারণ তাঁরও ধর্মনিষ্ঠাকে অবহেলা করবার বয়স চলে গিয়েছে। কানের পাশে ইতিমধ্যেই রজতরেখা দেখা দিয়েছে।

সেদিনও অমরবাবু প্রতিদিনের অভ্যাসমত ডাক্তারবাবুর বাড়িতে চা খেতে গিয়েছিলেন। এক কাপে তাঁর হত না—দু-তিন কাপই লাগত। খবরের কাগজ পড়া, মধ্যে মধ্যে চা-পান ও পাড়ার লোকের কেচ্ছায় সকালে ঘণ্টা-দুই কাটিয়ে প্রায় উঠতে যাবেন, এমন সময় ডাক্তারবাবুর ডাক এল—খানকতক চিঠি, বিলাতী ঔষধের বিজ্ঞাপন এবং একটি রেজেস্ট্রি পার্শেল। ডাক্তারবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, এ আবার কি? পার্শেল কে পাঠালে?

অমরবাবুরও কৌতূহল হ'ল, বললেন, খুলেই দেখ না কোথা থেকে আসছে?

আরও বিস্মিত হয়ে ডাক্তার বললেন, আশু দাস।...কই, আশু দাসকে কোন সন্দেশের অর্ডার তো দিই নি, আর দিলেই বা ডাকে আনাব কেন?...তাদের সঙ্গে আমার এমনও কিছু আলাপ নেই যে অন্য জিনিস পাঠাবে!...দেখি ছুরিটা নিয়ে আয় তো—

যথাসময়ে পার্শেল কেটে দেখা গেল যে সুদৃশ্য একটি কাগজের বাক্সে বিখ্যাত সন্দেশ-ব্যবসায়ী আশুতোষ দাস কয়েকটি সন্দেশই পাঠিয়েছে। সন্দেশের সঙ্গে তাদের ছাপানো ফর্মে একখানি চিঠি, ইংরাজীতে টাইপ করা, একেবারে রীতিমত অফিসের ব্যাপার আর কি। চিঠিতে যা লেখা ছিল তার তর্জমা করলে এই দাঁড়ায়—

মহাশয়,

> আমাদের সন্দেশ আজকাল কিরূপ বিশুদ্ধ উপাদানে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত হইতেছে তাহাই জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য আমরা কয়েকজন বিখ্যাত চিকিৎসকের মত সংগ্রহ করিতেছি। আপনার নিকট আমরা আমাদের বিখ্যাত জলভরা-তালশাঁস সন্দেশ কয়েকটি পাঠাইতেছি। ইহা এমন নূতন প্রণালীতে প্রস্তুত

যে ইহার ভিতরের গোলাপজল আটচল্লিশ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকিবে, সন্দেশের মধ্যে টানিয়া যাইবে না। আপনি এইগুলি নিজে খাইয়া যদি আপনার সত্যকার মতামত আমাদের জানান তাহা হইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। মতামত ডাকে পাঠানোর জন্য এনভেলাপ দেওয়া রহিল। ইতি—

ডাক্তার ঘোষ সক্রোধে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, লোকগুলোর আস্পর্ধা দেখেছ! আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, আমি সন্দেশ খেয়ে তার সার্টিফিকেট দিই! সেই সার্টিফিকেট তাঁরা কাগজে ছাপাবেন, আর দেশের লোক আমার মুখে চুনকালি দিক— ! যত সব হয়েছে,—হুঁ!

অমরবাবু হেসে বললেন, কি আর মন্দটা করেছে ভাই, এক সের সন্দেশ পাঠিয়ে তোমার মতামত জানতে চেয়েছে, এই তো?...মরুক গে, মতামত তুমি না জানাতে চাও জানিও না, এখন তো মজা ক'রে সন্দেশগুলো খাও—

ডাক্তারবাবু বললেন, রাম বল! সন্দেশ আমি একদম খেতে পারি না, কেবল গলায় বাধে। হ্যাঁ রসগোল্লা দাও, রাজি আছি। সন্দেশ ভারি অভদ্র জিনিস।

অমরবাবু বললেন, দেখ হে—তোমার এই সন্দেশ দেখে আমারও সন্দেশের কথা মনে পড়ল। পরশুদিন বৌয়ের সঙ্গে এক সের সন্দেশ বাজী রেখেছিলুম, সেটায় হেরেছি কিন্তু সন্দেশ দেওয়া হয় নি।...সেদিন 'মণিহার' বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিলুম। সে খানিকটা দেখেই চোরের নাম ক'রে দিয়েছিল। আমি বলেছিলুম যে কখনও ঐ লোক চোর নয়—যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ওর কথাটাই ঠিক হ'ল!...বাজী যখন রেখেছিই তখন সন্দেশটা দিয়ে দেওয়াই ভাল, কি বল?

ডাক্তারবাবু বললেন, তা এক কাজ কর না, এই সন্দেশটাই তুমি নিয়ে যাও—আমার আর কি হবে! তুমি তো জান সন্দেশ আমি খাই না!

অমরবাবু প্রথমটা একটু আপত্তি করলেন বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশু দাসের উৎকৃষ্ট সন্দেশের লোভ আর ছাড়তে পারলেন না, সন্দেশের বাক্সটি হাতে ক'রেই বাড়ি ফিরলেন।

অমরবাবু যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন আর দশটা বাজতে বড় বেশি দেরি নেই। সন্দেশের বাক্সটা সুরবালার হাতে দিয়েই স্নান করতে চলে গেলেন, কতকগুলি ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট্‌ সংগ্রহ করতে হবে—সকাল ক'রে অফিসে যাওয়া দরকার।...

বিকেলে অফিস থেকে ফিরেই তিনি স্ত্রীকে প্রথম প্রশ্ন করলেন, সন্দেশগুলো খেয়েছ?

সুরবালা বলল, বা-রে! আমি একলাই সন্দেশগুলো খাব বুঝি? আমি কি রাক্ষস?

অমরবাবু বললেন, তবে নিয়ে এস এখন, চায়ের সঙ্গে দুজনেই খাওয়া যাক—

সুরবালা ঠাকুরকে দু পেয়ালা চা তৈরি করতে বলে একটা প্লেটে গোটা আষ্টেক সন্দেশ বার ক'রে আনল।

অমরবাবু প্রথমেই এক কামড় দিয়ে বললেন, ইস্—সন্দেশে গোলাপজলের সঙ্গে গুচ্ছের গোলাপী আতর দিয়েছে, জিভ যেন রি-রি করে—

সুরবালা বলল, তাই নাকি! কই দেখি—

সন্দেশে সুরবালার লোভ সর্বজনবিদিত। সে এক কামড় খেয়ে বলল, হ্যাঁ, তাই তো বটে! কিন্তু সন্দেশটা তৈরি করেছে বড় খাসা!

অমরবাবু বললেন, খাসা তো তুমি খাও, ওতে আমার দরকার নেই।

সুরবালা এ প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি জানাল। তখন অমরবাবু কোনও রকমে একটা সন্দেশ গলাধঃকরণ ক'রে উঠে পড়লেন এবং সুরবালাকেও বললেন, দেখ গো, আমার কিন্তু এ সন্দেশ যেন কেমন-কেমন লাগছে। তোমার যদি ভাল লাগে খাও, কিন্তু আমার মতে ওগুলো বেশি না খাওয়াই ভাল।

সুরবালা বলল, সে যা হয় করা যাবে এখন।

কিন্তু অমরবাবু বেরিয়ে গেলে সুরবালা একে একে বাকী ছটাই খেয়ে ফেলল। সন্দেশ তার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য।

এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত—

অমরবাবু রোজ ডোভার লেনে যদুবাবু অ্যাটর্নীর বাড়ি তাস খেলতে যেতেন। সেদিনও সাতটা নাগাদ গিয়ে উপস্থিত হলেন, কিন্তু একহাত খেলবার পরই অকস্মাৎ অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়লেন এবং একটু পরেই তাঁর মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠতে শুরু হ'ল। যদুবাবু ও অন্যান্য বন্ধুরা হৈ-চৈ ক'রে উঠলেন। তখনই ডাক্তার ডাকা হ'ল। ডাক্তার এসে তাঁকে একটু সুস্থ করবার চেষ্টা করছেন এমন সময় অমরবাবুর বাড়ি থেকে তাঁর ভৃত্য ছুটে এল, "গিন্নিমা কি রকম করছেন, বাবুর এখনই যাওয়া দরকার—"

সুরবালা সেই রাত্রেই মারা গেল। বহু চেষ্টায় অমরবাবু সেযাত্রা রক্ষা পেলেন বটে, কিন্তু তাঁকেও সপ্তাহ-খানেক হাসপাতালে থাকতে হ'ল।

ইতিমধ্যে অবশ্য পুলিসের কাছে সংবাদ গিয়েছে। ইন্স্পেক্টর তরুণ ও ডেপুটি কমিশনার নিজে সরেজমিন তদন্ত করতে এলেন। সন্দেশের বাক্স নিয়ে প্রথমেই আশু দাসের দোকানে গিয়ে জানলেন যে অমন কোনও পার্শেল তারা কস্মিন্‌কালে পাঠায় নি বা কোনও নতুন ধরনের সন্দেশও তাদের বার হয় নি। এমন কি তিন-চারদিনের মধ্যে জলভরা সন্দেশ কাকেও বিক্রি পর্যন্ত করে নি। অল্প একটু খোঁজখবরেই প্রমাণ হ'ল যে সে চিঠি ও স্বাক্ষর সম্পূর্ণ জাল।

সে চিঠি ও সন্দেশ যে-ই পাঠাক,—ডাক্তার ঘোষের জীবনই যে তার লক্ষ্য ছিল সে বিষয়ে কারও সন্দেহ রইল না, কিন্তু তাঁকে বিস্তর প্রশ্ন ক'রেও এ বিষয়ের কোনও হদিশ হ'ল না। তিনি স্পষ্টই জানালেন যে তাঁর কোনও শত্রু কোথাও আছে বা তাঁর মৃত্যুতে কারও উপকার হবে এমন কোন লোকের কথা তাঁর জানা নেই। পুলিস তদন্তেও প্রকাশ পেল যে ডাক্তার ঘোষের সমস্ত সম্পত্তি দুবার বাঁধা পড়েছে, ইদানীং রেসের মোহে তিনি বিস্তর টাকাই বিসর্জন দিয়েছেন এবং বর্তমানে তাঁর যে একমাত্র উত্তরাধিকারী, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, সে-ও সব জানে। সুতরাং সম্পত্তির লোভে সে যে এমন গর্হিত কাজ করবে, এমন সম্ভাবনা নেই।

পোস্ট-অফিসে খোঁজখবর ক'রেও বিশেষ সুবিধা হ'ল না, কারণ অত ভীড়ের মধ্যে বৌবাজার পোস্ট-অফিসে কে পার্শেল এনেছিল সে কথা স্মরণ ক'রে রাখা পোস্ট-অফিসের বাবুদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সমস্ত তথ্যসুদ্ধ ডেপুটি কমিশনার একদিন সকালে তরুণবাবুর হাতেই এই ব্যাপারের আরও সূক্ষ্ম তদন্তের ভার সমর্পণ করলেন।

কোন্ পথ ধরে চলবে মনে মনে তাই ভাবতে ভাবতে তরুণ যখন বাড়ি ফিরল তখন মধ্যাহ্ন পার হয়ে গিয়েছে। বহুদিন তার সুবিধাজনক কেস হাতে আসে নি—এই খুনের সুরাহা করতে পারলে তার যশ খুবই বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু যেটুকু সূত্র সে পেল, তাতে উন্নতির আশা নেই বলেই মনে হয়।

অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট মুখে ধরা-চূড়া ছাড়ছে, এমন সময় তার গৃহিণী এসে দেখা দিলেন।

—হ্যাঁ গো, আমাদের সুরবালা নাকি বিষ-মাখা সন্দেশ খেয়ে মরেছে?

তরুণ আশ্চর্য হয়ে বলল, তার মানে? সুরবালাকে তুমি চিনতে নাকি?

—হ্যাঁ। ইস্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তুম যে।

তরুণ বলল, কিন্তু কই এতদিন তো কখনও তার নাম শুনি নি!

গৃহিণী বললেন, এতদিন কি আর মনে ছিল, হঠাৎ সেদিন থিয়েটারে দেখে মনে পড়ল। তাও বিশেষ খেয়াল ছিল না—আজ কাগজটা নজরে প'ড়ে যেতে দেখলুম। ছবি পর্যন্ত ছেপেছে কিনা!

খবরের কাগজে সুরবালার মৃত্যুর বিস্তৃত সংবাদ বের হয়েছে, এমন কি সন্দেশ বাজি রাখার কথা পর্যন্ত।

তরুণের স্ত্রী তার তদন্ত সম্বন্ধে কিম্বা তার কেস সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ প্রায় রাখতেন না, গৃহস্থালীর তদ্বিরেই তাঁর সারা দিনরাত কাটত। সেই মানুষ সহসা কাগজ পড়ে তার সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন, তবে কি এর মধ্যে ভগবানের কোনও হাত আছে?

সে সোজা হয়ে বসল, বলল, থিয়েটারে কবে তাঁকে দেখলে, শনিবার?

কথাটার আসল জবাব না দিয়ে, মেয়েদের স্বভাব-মতো তিনি বললেন, তাই তো বলছি গো, সবাই বলে সুরবালা হ'ল সত্যবাদী যুধিষ্ঠির! ছেলেবেলা থেকে নাকি মিথ্যে কথায় তার বড় ঘৃণা!...কিন্তু স্বামীর কাছে অতবড় মিথ্যে কথাটা বলেছিল কি ক'রে?

তরুণ বলল, কি বলেছিল স্বামীর কাছে?

স্বামীর অজ্ঞতায় হতাশ হয়ে গৃহিণী বললে, কিচ্ছু খবর রাখ না বুঝি! ...কেন, স্বামীর কাছে মণিহারের আসল চোর কে বলে দিয়ে বাজী রেখেছিল না? ...তা বলবে না কেন? স্বামী জানে, আর কখনও সে ও-বই দেখে নি, অথচ আগের বুধবার দিনই মেয়ে-ইস্কুলের মাস্টারনী বনলতার সঙ্গে 'মণিহার' দেখতে গিয়েছিল, সেইদিন আমার সঙ্গে দেখা হয়। সামান্য ব্যাপার নিয়ে স্বামীর সঙ্গে মিথ্যে কথা যে বলতে পারে, সে ভারী সত্যিবাদী!... তেমনি হ'ল, ফলও পেলে হাতে হাতে—

গৃহিণী বকেই চললেন, কিন্তু তরুণের সেদিকে কান ছিল না, সে এক পায়ে মোজা পরেই বসে ভাবতে লাগল।

খানিকক্ষণ পর আর একটা কথায় তার চমক ভাঙল। শুনল গৃহিণী বলছেন, ঐ ডাক্তারটাই কি কম পাজী! ওকেও আমি চিনি। কি ক'রে যে ওকে ভদ্দরলোকের বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেয় তাই ভাবি!

আর একটা মোজা পায়ে দিয়ে তরুণ উঠে দাঁড়াল, তারপর আলনা থেকে কোটটা টেনে গায়ে চড়িয়ে বের হ'ল।

—তার মানে? এখনই আবার চললে কোথায়? নেয়ে-খেয়ে নাও!

—এসে খাব।

সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়ে তরুণ একেবারে রাস্তায় বের হয়ে পড়ল।

প্রথমেই সে গেল আশু দাসের দোকানে। সামনেই মালিক বসে ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল কোন্ প্রেসে তাঁরা চিঠির কাগজ ছাপিয়েছেন। ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে সেখান থেকে সোজা গোয়েন্দা-অফিসে গিয়ে একটা ফোটোগ্রাফের তাড়া থেকে একখানা ফোটোগ্রাফ সংগ্রহ করলে, তারপর সেখান থেকে বেলা তিনটে নাগাদ প্রেসে পৌঁছল।

প্রেসের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে ভালমানুষের মতো প্রশ্ন করল, খানকতক চিঠির কাগজ ছাপাতে চাই, তা আপনাদের নতুন রকমের যা কাগজ-টাগজ আজকাল ছাপা হয় একটু দেখাতে পারেন?

সে ভদ্রলোক শশব্যস্তে একটা প্রকাণ্ড মোটা ফাইল বের ক'রে ফেলে দিয়ে বললেন, দেখুন না মশাই, হরেক রকমের নতুন কাগজ পাবেন।

তরুণ বহুক্ষণ ধরে তার পাতা উল্টে বলল, না, খাসা ছেপেছেন, মানতেই হবে। আমার একটি বন্ধু আপনাদের ঠিকানা ব'লে দিয়েছিলেন।... তাঁকে হয়তো আপনারা চেনেন, দেখুন দেখি, ফোটোটা তাঁর আমার পকেটেই রয়ে গেছে—

ফোটোখানা বার করতে ম্যানেজারবাবু বলে উঠলেন, না, চেনা নয় বটে, তবে ইনিও দিন চার-পাঁচ আগে আমাদের নমুনা দেখতে এসেছিলেন। ইনি বুঝি আপনার বন্ধু?

—হ্যাঁ, বিশেষ।... আচ্ছা আজ তাহ'লে আসি। কাল-পরশু নাগাদ এসে অর্ডার দিয়ে যাব। নমস্কার।

প্রেস থেকে বের হয়ে একেবারে হেস্টিংস স্ট্রীট। আজই যে এই সুকঠিন মীমাংসার পথ দেখতে পাবে তা তরুণের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সুতরাং সেই উত্তেজনায় সে আহার-নিদ্রা পর্যন্ত ভুলে গেল, এমন কি এই কাজের জন্য যে গৃহিণী যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হবেন একথা স্মরণ ক'রেও দমল না।

হেস্টিংস স্ট্রীটে সারি সারি যেসব টাইপ-রাইটিং কারখানা আছে, তারা পুরনো মেসিন সুবিধামত কেনা-বেচা করে তা তরুণের জানা ছিল। তাদের প্রত্যেকের কাছেই সে খবর নিতে লাগল যে কে এর মধ্যে চার নম্বরের পুরনো মেসিন বিক্রি করেছে। অনেকগুলো দোকান ঘোরবার পরে একটা দোকানে পাত্তা মিলল। তারা বিক্রি করেছে বটে— দিন চার-পাঁচ আগে।

—সে মেসিনে কি রকম ছাপা হ'ত—কোন নমুনা আছে?

—আছে বৈকি। সেটা আমাদের এখানে অনেকদিন ব্যবহার হয়েছিল, বিস্তর চিঠির নকল আছে।

চিঠির নকল একটি সংগ্রহ ক'রে পকেটে পুরে তরুণ বলল, যিনি কিনেছেন, তিনি কি আপনাদের চেনা লোক?

—না।

—দেখলে চিনতে পারবেন?

—তা বোধ হয় পারব।

—দেখুন দেখি!

তরুণ ফোটোখানা বার ক'রে ধরল, দেখে দোকানদার বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই লোকই তো!

এর পর ক্লাইভ স্ট্রীটে মিনিট পাঁচেক ঘুরতেই সন্ধ্যা হ'ল। সেদিনের মতো কাজ শেষ ক'রে তরুণ বাসায় ফিরল, তার পর লালবাজারে ফোন ক'রে ডেপুটি কমিশনারকে বলল, আপনি দয়া ক'রে লোক পাঠিয়ে একটা খবর নিতে পারেন যে কোন্ ট্যাক্সি সোমবার দিন বেলা দেড়টার সময় ক্লাইভ স্ট্রীটের মোড় থেকে শ্যামবাজারের সওয়ারী নিয়ে গেছে এবং সেখান থেকে বৌবাজার পোস্ট-অফিসেই বা কোন্ ট্যাক্সি সেই সওয়ারী নিয়ে এসেছে? এইটুকু জানলেই কেস আমার প্রায় শেষ হয়ে যায়।

বড়কর্তা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, তার মানে? তুমি কি এর মধ্যেই কিনারা ক'রে আনলে?

—কাল বলব।

ফোন বন্ধ ক'রে তরুণ স্নানাহার করতে গেল।

পরের দিন সকালে উঠে চিনেবাজারের কয়েকটি এসেন্সওয়ালার দোকান ঘুরে তরুণ দশটার সময় ভারত ব্যাঙ্কের হেড অফিসে উপস্থিত হ'ল। সেখানকার ম্যানেজারকে নিজের কার্ডটি দেখিয়ে গুটি দুই হিসাব সম্বন্ধে কতকগুলো তথ্য সংগ্রহ ক'রে নিল, তার পর যখন লালবাজারে উপস্থিত হ'ল তখন জন-পঁচিশ শিখ ট্যাক্সিড্রাইভার বড়কর্তার খাস কামরায় জড়ো হয়েছে।

তরুণ বড়কর্তার দিকে পিছন ফিরে পকেট থেকে ফোটোখানি বার করে সব কটিকেই দেখালে। জন-দুই সন্দেহ প্রকাশ করল, আর জন-দুই জোর করে বলল যে এই লোকই ঐ সময়ে তাদের ট্যাক্সিতে চড়েছে। গোঁফের উপরের বড় আঁচিলটি তাদের ভুল হবার কথা নয়। অর্থাৎ ঐ লোকটি সোমবার দিন বেলা দেড়টার সময় ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে বের হয়ে শ্যামবাজারে পৌঁছেছিল এবং দুটোর সময় বৌবাজার পোস্ট-অফিস থেকে বের হয়ে ডালহাউসি স্কোয়ারের মোড় অবধি এসেছিল।

তাদের বিদায় ক'রে দিয়ে তরুণ বড়কর্তার সামনে এসে জেঁকে বসল। তার পর বলল, অদৃষ্টে আমার উন্নতি আছেই—তাই গৃহিণীই আমার কেস মীমাংসা ক'রে দিলেন।

বড়কর্তা বললেন, লোকটা কে—ফোটোটা দেখি!

তরুণ ফোটোটা ইচ্ছে ক'রেই টেবিলের উপর উপুড় ক'রে রেখে বলল, ব্যাপারটা ভুল ক'রে ঘটেছে এই ধারণা নিয়ে চলেছিলুম ব'লে আমরা সকলেই অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলুম। কিন্তু সে ধারণা যেমন চলে গেল, তখনই ব্যাপারটা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

—তার মানে?

—তার মানে ডাক্তার ঘোষকে মারবার উদ্দেশ্যে কেউ সন্দেশ পাঠায় নি। সন্দেশটা অমরবাবুর স্ত্রীকে খাওয়াবারই উদ্দেশ্য বরাবর ছিল।

—সে কি!... তাহ'লে কি ডাক্তার ঘোষই—?

এ কথার জবাব না দিয়ে তরুণ বলে চলল, লোকটা প্রথম যৌবনে যথেষ্ট উচ্ছৃঙ্খল ছিল, সে রোগটা এ বয়সেও সারে নি, তা ছাড়া রেসে মদে সর্বস্বান্ত হ'তে বসেছে—

ডেপুটি কমিশনার বললেন, ডাক্তার ঘোষ? ডাক্তার হয়ে এমনটা করলেন?

তরুণ বলল, ডাক্তার ঘোষের কথা কে বলছে! অমরবাবু! অমরবাবুই তাঁর স্ত্রী সুরবালাকে খুন করতে চেয়েছিলেন।... আমার গিন্নী কথায় কথায় যখন বললেন যে সুরবালা আগেও মণিহার দেখেছিল তখনই ব্যাপারটা আমার কাছে খোলসা হয়ে এল। সুরবালার সত্যবাদিতার খ্যাতি ছেলেবেলা থেকেই আছে, অথচ সামান্য একটা কারণে সে স্বামীর সঙ্গে মিথ্যে ক'রে বাজী রাখবে? তখনই আমার মনে হ'ল যে এই বাজী রাখার কথাটা সর্বৈব মিথ্যা হ'তে পারে, কারণ অমরবাবুর নিজের কথা ছাড়া এর কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নি। যে এর কথা ঠিক ক'রে বলতে পারত সে সুরবালা পরলোকে এবং তার মুখে একথাও কেউ শোনে নি।

...আমার স্ত্রীর আর একটা কথায় মনে পড়ল যে, অমরবাবুর প্রথম যৌবনের ইতিহাসটা খুব ভাল নয়!

যাই হোক, তখনই বেরিয়ে পড়লুম। খোঁজখবর নিয়ে জানলুম যে অমরবাবুর এককালে এসেন্সের কারবার ছিল, এসেন্স তৈরী করতে যেসব জিনিস লাগে তার মধ্যে নাইট্রোবেনজাইন অন্যতম। ডাক্তাররাও সুরবালাকে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে নাইট্রোবেনজাইন গোলাপী আতরের সঙ্গে মিশিয়ে সন্দেশের ভেতর দেওয়া হয়েছিল। কি ভাবে আশু দাসের চিঠির কাগজ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং কোন্ টাইপ-রাইটিং মেসিনে তা টাইপ করা হয়েছে সে সব তথ্যই যোগাড় করেছি। এই চিঠির নকলটার সঙ্গে ঐ চিঠিখানা মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে একই মেসিন থেকে দুই চিঠি ছাপা হয়েছে—।

ব্যাপারটা আগাগোড়া চমৎকার সাজানো। অমরবাবুর সর্বস্ব ঋণে গেছে, এখন যে টাকায় তিনি হাত দিতে পারেন সে হচ্ছে তাঁর শ্বশুরের—এবং সে টাকা আছে সুরবালার নামে। সুরবালা টাকাকড়ির বিষয়ে খুব শক্ত, সুতরাং সে না মরলে অমরবাবুর সুবিধে হয় না, তা ছাড়া সুরবালার শাসনে অমরবাবুর উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রও হাঁপিয়ে উঠেছিল।

চাকরবাকরদের জেরা করলে আপনি জানতে পারবেন যে, গত ছ মাসের মধ্যে অমরবাবু নিজে সঙ্গে ক'রে কোনও দিন সুরবালাকে থিয়েটারে নিয়ে যান নি, অথচ বুধবার সুরবালা 'মণিহার' দেখেছে জেনেও তাকে নিয়ে শনিবার যাওয়ার কি দরকার পড়ল? শুধু

বাজী রাখার কথাটা বলার সুবিধে হবে ব'লে। প্রেস থেকে চিঠির কাগজ যোগাড় ক'রে পুরনো টাইপ-রাইটিং মেসিনে ছেপে নিয়ে এক বাক্স সন্দেশের সঙ্গে ডাক্তার ঘোষের কাছে পাঠানো এমন কিছু কঠিন কথা নয়। অমরবাবু নিজেই যে দুবার ট্যাক্সি বদল ক'রে বৌবাজারে আসেন, ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের মুখে তা শুনলেন। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ইনি বহুকাল মিশছেন, তিনি যে সন্দেশ খান না অমরবাবু তা বিলক্ষণ জানেন, অথচ সন্দেহটা ভুল-পথে যাওয়ার এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাশ্মীর থেকে ফেরবার পথে তরুণ হঠাৎ কি একটা কাজে লক্ষ্ণৌতে নেমে পড়ল। ফলে তার অভাবটা আমরা বাকী পথটুকু অনবরতই অনুভব করতে লাগলাম। কারণ তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে নানা গল্প শুনিয়ে সে আমাদের সারাটা যাত্রাপথ প্রচুর আনন্দ দিয়েছিল।

গাড়িতে বসে সেই দুঃখই করছি এমন সময় তরুণের বাল্যবন্ধু অনাথ সহসা বলল, কুছ্ পরোয়া নেই, আমি তোমাদের একটা গল্প শোনাচ্ছি, তরুণ গুপ্তেরই গল্প—মন দিয়ে শোন।

বলা বাহুল্য আমরা সঙ্গে সঙ্গে অবহিত হলাম। অনাথ শুরু করল :

শৌখীন গোয়েন্দা তরুণ গুপ্তের সোমবার দার্জিলিং যাবার কথা। সকালবেলা তাই সেদিন একটু আগেই উঠল। কারণ জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়া, চিঠিপত্র দেওয়া, বিষয়-কর্ম ঘরবাড়ির একটা ব্যবস্থা করা—সব কাজই ওকে এই ক'ঘণ্টার মধ্যে করতে হবে। এর মধ্যে একটি কাজও অপরকে দিয়ে হবার উপায় নেই। চাকর রমানাথ যদি একটু মানুষের মতো হ'ত, মানে অন্ততঃ যদি একটু সাধারণ বুদ্ধিও ওর থাকত, তাহ'লে জিনিসপত্র গুছোনোর কাজটাও অন্ততঃ ওকে দিয়ে চলত। কিন্তু যেহেতু ওসব কোনও বালাই-ই রমানাথের নেই সেহেতু ওকে আরও খানিকটা সকাল ক'রে উঠতে হ'ল—সাধারণ ঘুমের থেকেও প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের মায়া ত্যাগ ক'রে। ঘুম থেকে উঠেই অনেকখানি হাঁকডাক ক'রে চাকরকে তুললে—এবং এক গ্লাস শরবৎ তৈরী করতে বলে কলঘরে গেল। সকালে ও চা খেত না, তার বদলে খেত শরবৎ।

শরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে রমানাথকে ডেকে বললে, বুঝলি রমানাথ, আমি আজ দার্জিলিং যাব।

রমানাথ বললে, কেন বাবু?

তরুণ বললে, দূর বেটা গয়লা! কেন কিরে, হাওয়া খেতে যাব।... বাড়িঘর সব আগলাতে পারবি তো?

রমানাথ বললে, এজ্ঞে তা পারব—কিন্তু এমন সময়ে হাওয়া খেতে কেন?

তরুণ মুখটা বিকৃত ক'রে বললে, এখানে শুধু শুধু বসে কি করব? না আছে মক্কেল, না আছে কোনও কাজ!

শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে আরও কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময়ে নিচে দোরের সামনে একখানা গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে দরোয়ানকে কে প্রশ্ন করলে, বাবু বাড়ি আছেন?

তরুণ বললে, দেখ্ দেখি রমানাথ, মক্কেল এল কিনা। যদি মক্কেল হয়, তোকে এক্ষুণি একপেট রসগোল্লা খাইয়ে দেব।

রমানাথকে দেখতে হ'ল না, একটি পশ্চিমে দরোয়ান এসে সেলাম ক'রে একখানা চিঠি হাতে দিলে।

চিঠিটায় লেখা ছিল—

তরুণবাবু—

> কাল রাত্রে আমার বাড়িতে এক ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে। আপনার সাহায্য চাই-ই। গাড়ি পাঠালুম—পত্রপাঠ চলে আসবেন।
>
> শ্রীহরিদাস মিত্র

রায়বাহাদুর হরিদাস মিত্রকে তরুণ ইতিপূর্বে একবার অফিসের একটা গুরুতর বিষয়ে খুব সাহায্য করেছিল। সেই থেকে রায়বাহাদুর ওকে খুবই স্নেহের চোখে দেখেন। তরুণ চিঠি পেয়ে তাড়াতাড়ি জামাটা হাতে গলিয়ে উঠে পড়ল। ভীষণ কাণ্ড কি সে সম্বন্ধে মনে মনে যথেষ্ট কৌতূহল হ'লেও দরোয়ানকে কিছু প্রশ্ন করা সে সঙ্গত বিবেচনা করলে না।

দোরের কাছে রায়বাহাদুর অপেক্ষা করছিলেন। তিনি অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গিয়ে নিজের লাইব্রেরী ঘরে বসালেন এবং দোর বন্ধ ক'রে দিলেন।

তরুণ বললে, ব্যাপার কি বলুন তো! খুনটুন নাকি?

—না না, সে সব কিছু নয়।...আমার বাড়িতে বহুকালের একখানা হীরে ছিল, সেইটেই চুরি গেছে। আমার এক পূর্বপুরুষকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ঐ হীরেখানা দেন। হীরেটার বর্তমান দাম আন্দাজ দেড় লাখ টাকা হবে। একখানা শিরপেঁচক[illegible]ায় বসানো ছিল। বহুকাল ধরেই পড়ে আছে... সিন্দুকে বন্ধ হয়ে... কখনও-সখনও নেড়েচেড়ে দেখা হ'ত বা দেখানো হ'ত—এই পর্যন্ত।

তরুণ প্রশ্ন করলে, শেষ কখন দেখেছেন?

—মাত্র এক সপ্তাহ আগে। মজিলপুর থেকে মনোরঞ্জনবাবু এসেছিলেন। কথায় কথায় ঐ হীরেখানার কথা উঠতে তিনি একবার দেখতে চান, তাইতে তাঁকে বার ক'রে দেখাই। তারপর আমার ভাগ্নী নির্মলা আমার সামনে সিন্দুকে বন্ধ ক'রে রাখে।

—চুরি গেছে জানলেন কি ক'রে?

—আজ ভোরে আমি সিন্দুক খুলি একটা বিশেষ দরকারী দলিল বার করার জন্য। সিন্দুক খুলতেই নজরে পড়ল, হীরেটা যে বাক্সে ছিল সেটা সিন্দুকের মধ্যে খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, কাগজপত্রও সব এলোমেলো। ভেতরে হীরেখানা নেই।

তরুণ বললে, কোন দলিল বা কাগজপত্র কিছু খোয়া গেছে কিনা দেখেছেন?

—দেখেছি। কাগজপত্র সবই আছে, শুধু বোধ হয় নাড়াচাড়াতে একটু ছড়িয়ে পড়েছিল।

—সিন্দুকের চাবি কার কাছে থাকে?

হরিদাসবাবু বললেন, সিন্দুকের চাবি সর্বদা আমার কাছে থাকে। রাত্রে যখন শুই তখন আমার বিছানার নীচে থাকে, মানে আমাকে না তুলে সে চাবি পাবার উপায় নেই—আর দিনের বেলাতেও সর্বদা কাছে থাকে।

—কখনও কারুর কাছে দেন না?

—না।

—তবে যে সেদিন বললেন আপনার ভাগ্নীকে—

হরিদাসবাবু হেসে বললেন, সে আমার চোখের সামনে খুললে এবং চোখেরই সামনে বন্ধ করলে। ডালা পড়বার সময় পর্যন্ত আমি দেখেছি। আর তা ছাড়া আমার ভাগ্নী নির্মলা—above suspicion.

তরুণ কথাটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলে, বাড়িতে আপনারা লোক ক'টি সবসুদ্ধ?

হরিদাসবাবু বললেন, আমি, আমার স্ত্রী, একটি ছেলে, ভাগ্নী নির্মলা আর বামুন চাকর। তার মধ্যে স্ত্রী এখানে নেই, পুরী গেছেন মাস দুই হ'ল আমার মাসিমার সঙ্গে।

তরুণ বললে, মাসিমা এখানে থাকেন?

হরিদাসবাবু বললে, রামচন্দ্র! তিনি হলেন শোভাবাজারের রাজবাড়ির বৌ, তিনি এখানে কেন থাকবেন?

তরুণ বললে, বামুন চাকর ক'টি?

—দুটো বামুন আছে, আর ধরুন ভাঁড়ার দেবার জন্যে একটি বামুনের মেয়ে আছে, একজন ঝি, দুজন চাকর। সবসুদ্ধ ছ'জন। তাছাড়া দরোয়ান আছে একজন।

—এরা সবাই বেশ বিশ্বাসী?

—বামুন দুটো বাপ বেটা, বুড়ো দুর্যোধন আমাদের বাড়ি কাজ করছে আজ ছাব্বিশ বছর হ'ল। ছেলেটাও বছর দশেক কাজে লেগেছে। বামুনের মেয়ে আমার স্ত্রীর বাপেরবাড়ির লোক—বিয়ের সময় থেকে আছে। স্ত্রীকে মানুষ করেছিল। আমার ছেলেও ওর হাতে মানুষ হয়েছে। দরোয়ান বাঁকেবিহারীও প্রায় বছর দশেক কাজ করছে। ঝি সুলোচনা আমার ছেলে হওয়া থেকে এ বাড়িতে আছে। চাকর দুটোই খালি নতুন। তার মধ্যে অর্জুনা প্রায় বছর দুই হ'ল আছে। কেষ্ট একেবারে নতুন—মাত্র মাসখানেক এসেছে।

তরুণ বহুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল, তারপর বললে, সিন্দুকটা একবার দেখতে পারি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কি কথা, দেখবেন বৈকি! আসুন আমার সঙ্গে—

সিন্দুকটি থাকে হরিদাসবাবুর শোবার ঘরে। শোবার ঘরটিতে লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে দিয়ে ঢুকতে হয়। অবশ্য সে ঘরে যাবার অন্য একটা পথ আছে, সেটা হচ্ছে কলঘরের মধ্য দিয়ে। কলঘরের একটা দোর বাইরের বারান্দার দিকে আর একটা দোর ওঁর শোবার ঘরে।

হরিদাসবাবুর স্ত্রীর শোবার ঘরে হরিদাসবাবুর ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তার বাইরে দিয়ে কোনও পথ নেই।

তরুণ বললে, দোরগুলো রাত্রে কি অবস্থায় থাকে বলুন দেখি?

হরিদাসবাবু বললেন, কলঘরের বারান্দার দিকের দোরটা ভেতর থেকে চাবি দেওয়া থাকে। সেই জন্য আমাদের ঘর থেকে কলঘরে যাবার যে পথ সেটা এমনিই শেকল দেওয়া থাকে। লাইব্রেরী ঘরের দোর ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। অবশ্য শোবার ঘরের দোর আর বন্ধ করি না।... সে সব আপনার কোনও ভয় নেই। সিন্দুকে আমার অফিসের কাগজপত্র প্রায়ই থাকে ব'লে রাত্রে আমি বেশি সাবধান হই।

তরুণ আর কোনও কথা না ব'লে জানলার দিকে একবার চাইলে, সুদৃঢ় গরাদে, মজবুত জানলা, স্বয়ং ভীমসেন না এলে সে ভেঙে ঢোকা সহজ নয়।

সিন্দুকটার তালাও বেশ ভাল ক'রে পরীক্ষা করলে। খালি চোখে, লেন্স দিয়ে—কিন্তু কোনও রকম অন্য যন্ত্রপাতি দিয়ে খুললে যে বাইরে আঁচড়ানোর মতো দাগ পড়ে তা কিছু নজরে পড়ল না। তখন চাবিটা নিয়ে একবার ঘুরিয়ে দেখতে গিয়েই সে সোজা উঠে দাঁড়াল। লেন্স দিয়ে দেখে দেখে শেষে পকেট থেকে একটা দেশলাই বার ক'রে একটা কাঠি জ্বেলে ধরলে। আগুনে তেতে উঠতেই চাবির খাঁজে একটু শর্ষে-ভোর জায়গা তৈলাক্ত হয়ে উঠল। সেইটি হাতে ক'রে পরীক্ষা ক'রে তরুণ বললে, আপনার চাবি থেকে মোমের ছাপ নেওয়া হয়েছিল—

হরিদাসবাবু বললেন, বলেন কি মশাই!

তরুণ চাবিটা ওঁর হাতে দিয়ে বললে, এতে মোম এল কি ক'রে?

হরিদাসবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, আস্তে আস্তে বললেন, চাবি তো সব সময়ই আমার কাছে ছিল মশাই, কখন মোমের ছাপ তুললে?... অবশ্য অন্য কোন উপায়েও তো মোম লাগবার সম্ভাবনা নেই!

তরুণ একবার সিন্দুকের ডালাটা খুলে ভিতরটা মিনিটখানেক ধ'রে দেখলে, তারপর বন্ধ ক'রে দিয়ে বললে, ভারি রোদ উঠেছে হরিদাসবাবু, আজ আর এ বেলা বাড়ি যাব না মনে করছি।

ব'লে এক প্রচণ্ড হাই তুললে। হরিদাসবাবু ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ তো, এইখানেই আহারাদি ক'রে একটু বিশ্রাম করুন না!... কিন্তু বাড়ির অন্য ঘরগুলো সার্চ করা দরকার মনে করেন কি?

—কিছু না। কোনও দরকার নেই। ব'লে তরুণ সোজা লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে একখানা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল। একটু পরেই মৃদু চুড়ির আওয়াজে চোখ খুলে দেখলে একটি সতের-আঠারো বছরের তরুণী মেয়ে ঘরে ঢুকছে—একথালা জলখাবার হাতে নিয়ে। সে বুঝলে এই মেয়েটিই নির্মলা।

জলখাবার টেবিলের উপর রেখে নির্মলা নতমুখে বললে, একটু জল খেয়ে নিন।

তরুণ একটু হেসে বললে, এতগুলো খাবার মানুষে খেতে পারে?

নির্মলা বললে, খুব পারে! কতই বা!

তরুণ কথাটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা এই চুরিটা সম্বন্ধে আপনার কাকে সন্দেহ হয়?

নির্মলা ভীষণরকম চমকে উঠল। ওর কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে গিয়েছিল—সে অনেক কষ্টে ঢোঁক গিলে প্রশ্ন করলে, তার মানে?

—মানে—কে নিতে পারে ব'লে মনে করেন?

নির্মলা বিবর্ণ নত মুখে বললে, আমি কি ক'রে বলব বলুন—সবাই বিশ্বাসী লোক, তবে কার ভেতর কি আছে আমি কি ক'রে বলব!

তরুণ একখানা সিঙাড়ায় কামড় দিয়ে বললে, তা বটে। আচ্ছা আপনার মামাত ভাইকে দেখছি না কেন?

নির্মলা বললে, সে বাড়িতেই আছে, পাঠিয়ে দেব?

তরুণের উত্তরে অপেক্ষা মাত্র না ক'রেই নির্মলা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল, যেন পালাতে পারলেই বাঁচে।

তরুণ চিন্তিত মুখে বসে বসে জলখাবারগুলির সদ্ব্যবহার ক'রে যেতে লাগল। একটু পরেই ঘরে ঢুকলো বিশ-বাইশ বছরের একটি সুশ্রী বলিষ্ঠ ছেলে। তরুণ দেখেই হরিদাসবাবুর ছেলে বলে তাকে চিনতে পারলে।

তরুণ ইঙ্গিতে তাকে সামনের চেয়ারটায় বসতে ব'লে প্রশ্ন করলে, আপনার নামই অভয়বাবু বোধ হয়?

অভয় ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ।... আপনি কি আমায় ডেকেছিলেন?

তরুণ বললে, এই চুরির ব্যাপারে আপনার বাড়ির কোনও লোককে সন্দেহ হয় কিনা—তাই জিজ্ঞাসা করব ব'লে খুঁজছিলুম।

তরুণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে ছিল, কিন্তু অভয়ের মুখে কোন বিশেষ পরিবর্তনই হ'ল না। সে বললে, বাড়ির মধ্যে এক কেষ্ট চাকর ছাড়া আর বিশেষ কাউকে সন্দেহ করবার মতো তো দেখছি না। সবাই বিশ্বাসী আর পুরনো লোক।... কিন্তু...

'কিন্তু' কথাটা খুব অস্ফুটস্বরে ব'লেই অভয় থেমে গেল। তরুণ ওকে থামতে দিলে না, বললে, কিন্তু কি বলুন, থামলেন কেন?

—না, থাক। সে বিশেষ কিছু নয়।

তরুণ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, আপনার বোন নির্মলা সম্বন্ধে কোনও কথা কি?

অভয় চমকে উঠল, বললে, আপনি কি ক'রে জানলেন?

—না, ঠিক জানা নয়, অনুমান।

অভয় তখনও ইতস্ততঃ করছে দেখে তরুণ বললে, দেখুন আপনার কর্তব্য!

অভয় বললে, আচ্ছা আমি বলছি, কিন্তু এর সঙ্গে যে সে ঘটনার কোনও যোগ আছে তা আমি মনেও করি নি। পরশু রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় একটু বাইরে যাব ব'লে মনে করছি, এমন সময়ে বাইরে একটা চাপা পায়ের শব্দ শুনতে পাই। সন্দেহ হওয়ায় দোর

একটুখানি ফাঁক ক'রে অন্ধকারেই যতদূর দৃষ্টি যায় বাইরে চেয়ে দেখি, নির্মলা বাবার ঘরের দিক থেকে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে। আমি মনে করলুম, হয়ত কি জন্যে গিছ্‌ল, আমাদের পাছে ঘুম ভেঙে যায় ব'লে অত আস্তে আস্তে যাচ্ছে।

তরুণ প্রশ্ন করলে, আপনার ঘরটা কি আপনার বাবার আর নির্মলার ঘরের মাঝে?

অভয় ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ।

তরুণ বললে, আচ্ছা আপনি যান, আপনার বাবাকে একবার পাঠিয়ে দেবেন।

একটু পরেই হরিদাসবাবু এলেন। সৌজন্য প্রকাশ ক'রে বললেন, জলটল খেয়েছেন তো?

তরুণ বললে, হ্যাঁ, খেয়েছি। আচ্ছা আপনার মনে আছে কি, কাল সকালে উঠে আপনার লাইব্রেরী ঘরের দোর ঠিক বন্ধ দেখেছিলেন কিনা?

হরিদাসবাবু বললেন, সে দোর তো ঠিকই বন্ধ ছিল। কেন বলুন তো?

তরুণ আরও বললে, কলঘরের বাইরের দোরটা সকালে দেখেছিলেন?

হরিদাসবাবু থতমত খেয়ে বললেন, অতটা লক্ষ্য করি নি। রোজ বন্ধ থাকে ব'লে বিশেষ ক'রে কিছু—

—আচ্ছা কাল মেথরকে দোর খুলে দিয়েছিল কে?

—আমার ভাগ্নী নির্মলা।

—আচ্ছা আপনার ঘরে বারান্দার দিকের ঐ জানলাটা কি রাত্রে বন্ধ থাকে?

—প্রায়ই থাকে।

তরুণ মিনিট কতক চুপ ক'রে থেকে বললে, আপনার ভাগ্নীর সঙ্গে আর একবার দেখা করতে চাই।

—বেশ তো, যান না, সে এখন ঐ ঘরে রয়েছে, তার নিজের ঘরে।

তরুণ আর বাক্যব্যয় না ক'রে নির্মলার ঘরের দিকে চলে গেল। হরিদাসবাবু কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে জানলা দিয়ে বাইরের পেয়ারা গাছটার দিকে চে‥ রইলেন।

নির্মলা এ ব্যাপারটার জন্য যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না, তা তার ব্যবহার দেখেই বোঝা গেল। সে বেচারা নিজের বিছানার উপর দু হাতে মুখ ঢেকে বসে ছিল, হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকে মুখ তুলে চাইলে। তার চোখের পাতা তখনও ভিজে—একটু আগেই কাঁদছিল তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তরুণকে দেখেই ওর মুখ সাদা হয়ে গেল, শুকনো মুখে ওর দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়াল। তার সারা মুখে বেশ একটা ভয়ের চিহ্ন—

তরুণ ঘরে ঢুকে দোরটা বন্ধ ক'রে দিয়ে বললে, ভয় নেই, বসুন আপনি, আমি শুধু গোটাকতক কথা কয়েই চলে যাব...

প্রায় পনের মিনিট পরে তরুণ ফিরে এল লাইব্রেরী-ঘরে। হরিদাসবাবুর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললে, আমার পারিশ্রমিকটা তো ঠিক হয় নি হরিদাসবাবু!

হরিদাসবাবু বললেন, আপনি কাজ করুন না, পারিশ্রমিকের জন্য আটকাবে না।

—তবু ঠিক ক'রে বলাই ভাল।

হরিদাসবাবু বললেন, চোর ধরিয়ে দিতে পারলে হাজার দুই টাকা দেব, আর খরচাপত্তর তো বটেই...

তরুণ বললে, তাহ'লে ঐ দু'হাজার টাকার একখানা চেক লিখবেন হরিদাসবাবু...!

হরিদাসবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, আপনি কি চোরের সন্ধান পেয়েছেন?

তরুণ বললে, আপনি লিখুন না, ধরিয়ে দিতে না পারলে দেবেনই বা কেন?

হরিদাসবাবু ডেস্ক থেকে চেকবইটা বার ক'রে একখানা দু'হাজার টাকার চেক লিখলেন, তারপর তরুণের প্রসারিত হাতে সেখানা দিয়ে বললেন, চোর কই?

তরুণ গম্ভীরভাবে বললে, চোর আপনি!

হরিদাসবাবুর মুখ নিমেষে সাদা হয়ে গেল, ঢোঁক গিলে বললেন, তার মানে?

তরুণের গলার শব্দ কঠিন হয়ে এল, সে বললে, তার মানে আপনার পূর্বপুরুষের উইলের শর্ত অনুসারে আপনি ঐ হীরেখানা বিক্রী করতে পারেন না। অথচ গোপনে জুয়া খেলে খেলে আপনি অত্যন্ত ঋণী হয়ে পড়েছিলেন। আর কিছুই ছিল না যা দিয়ে আপনার ঋণ শোধ হয়, তাই লক্ষ্মীবাবুকে আপনি ওটা গোপনে বিক্রী করার কথা বলেন। সেইজন্যই লক্ষ্মীবাবুকে সেদিন হীরেখানা দেখান এবং ইচ্ছে ক'রেই আপনার ভাগ্নী নির্মলাকে দিয়ে চাবি খোলান। তারপর নিজেই মোমের ছাঁচ তোলা প্রভৃতি সব ঠিক ক'রে রাখেন, এমনভাবে ব্যাপারটা সাজিয়ে ফেলেন যাতে নির্মলার ওপরেই সন্দেহ হয়। আমিও প্রথমে মনে করেছিলুম যে, সেদিনই মোমের ছাঁচ তুলে নিয়ে নির্মলাই কোনও রকমে চাবি তৈরি করিয়ে কোনও সুযোগে ওটা চুরি করেছে। বিশেষ ক'রে আপনার ছেলে যখন বললে যে সে নির্মলাকে পা টিপে টিপে আপনার ঘরের দিক থেকে যেতে দেখেছে তখন আরও সন্দেহ বাড়ল। তারপর তার শুকনো মুখ দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সে না নিলেও এর ভেতরের অনেকখানি খবর জানে। কিন্তু সহসা আমার ভুল ভাঙল নির্মলার ঘরের ভেতর ঢুকে, যখন দেখলুম তার হাতে একখানা কাগজের টুক্‌রো—সেটা ব্যাঙ্কে জমা দেবার স্লিপ এবং তাতে কালকের তারিখে এক লক্ষ টাকা জমা দেওয়া হয়েছে।

তখন আন্দাজে ঢিল মেরে নির্মলাকে জেরা করতেই সব কথা খোলসা হ'ল। সে আপনাকে খুব ভালবাসে এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে আপনার ভেতরের সব খবরই জানত—দেনার কথা তো বটেই, তা ছাড়া সে পরশু রাত্রে আপনার ঘরে হঠাৎ আলো দেখতে পেয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে আপনাকে টর্চের আলো জ্বেলে ঐ হীরেটা বার করতে দেখতে পায়। তারপর কাল আপনার পকেট থেকে ব্যাঙ্কের স্লিপটা সরিয়ে ফেলে এবং সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারে।... আপনার জন্যই সে অত মুষড়ে পড়েছিল।

হরিদাসবাবু আর তাকে কথা কইতে না দিয়ে তরুণের হাতটা চেপে ধরলেন, আমায় বাঁচান তরুণবাবু—

তরুণ হেসে বললে, আপনার হীরে আপনি বিক্রী ক'রে ধর্মের চোখে এমন কিছু

অপরাধী হন নি যাতে আমি আপনাকে ধরিয়ে দিতে যাব। কিন্তু নির্মলার প্রতি আপনার যে ব্যবহার সেটার জন্য কি শাস্তি হওয়া আপনার উচিত?

হরিদাসবাবু দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গাড়িখানা দানাপুর স্টেশনে থামতেই একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল।...

...তখনও ভাল ক'রে সকাল হয় নি, ঘুমের ইচ্ছা প্রায় প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারেরই চোখে লেগে রয়েছে। তবুও আমরা সকলেই নেমে পড়লাম। এমন কি জিনিসপত্রের মায়ায় সারারাত্রি যারা ভাল ক'রে ঘুমাতে পারে নি তারাও সে মমতা ত্যাগ ক'রে নেমে পড়ল। প্ল্যাটফর্মের গ্যাসের আলো প্রভাতের আভাসে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, তারই আলোয় দেখলাম একখানি সেকেণ্ড ক্লাস কামরার সামনে ভীষণ ভীড়।

সে ভীড় সরাতে দেরি লাগে। যেসব সৌভাগ্যবান লোকেরা পূর্বে পৌঁছেছেন তাঁদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে মশাই?

তিনি একবার আমার আপাদমস্তক দেখে বললেন, খুন।

—খু—ন!

ভীড় ঠেলে অগ্রসর হলাম। আমার সঙ্গে ছিল তরুণ গুপ্ত, বিখ্যাত বেসরকারী গোয়েন্দা। আমরা দুই বন্ধুতে যাচ্ছিলাম—এলাহাবাদে—আর একটি মক্কেলের কাজে। তরুণের আগ্রহ কিছু বেশি, সে ছিল আমার পিছনে, মুহূর্তের মধ্যে ভীড় সরিয়ে একেবারে সামনে গিয়ে পৌঁছল।

স্টেশন-মাস্টার, গার্ড, পুলিস ও অন্যান্য কর্মচারীতে সে স্থান বোঝাই হয়ে গেছে। সিপাহীরা যতদূর সম্ভব বাজে লোককে তফাতে রাখবার চেষ্টা করছিল কিন্তু তরুণের সাহেবী পোশাকটার জন্যেই বোধ হয় কিছু বলল না। দেখি সেকেণ্ড ক্লাস কামরার দোরের কাছে সাতাশ-আটাশ বৎসরের একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক পড়ে রয়েছে—প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায় তার দেহে প্রাণ নেই।

রেল পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর বাঙালী। তিনি তরুণকে চিনতেন। তাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন, এই যে তরুণবাবু! দেখুন দেখি মশায় কি ফ্যাঁসাদ!

দু'ধারের লোক এবার সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। একেবারে সামনে গেলাম। মেয়েটি শুধু সুন্দরী নয়—সুবেশাও বটে।

বার্থ রিজার্ভ করা ছিল, নাম লেখা রয়েছে দেখলাম—হিরণবালা দাসী।

তরুণ বারকয়েক এদিক ওদিক চেয়ে লাফিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল, তারপর মৃতদেহটিকে পাশ ফেরাতেই আঘাতটা দেখতে পেল। কানের ঠিক উপরে রগের পাশে একটা লৌহদণ্ড কিংবা অনুরূপ কোনও জিনিস দিয়ে কেউ আঘাত করেছে। প্রায় দু ইঞ্চি গর্ত হয়ে গিয়েছে, খানিকটা রক্ত বার হয়ে চুলের সঙ্গে জমাট বেঁধে গেছে।

চারপাশের দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল। তরুণ ডাক্তারকে বলল, আপনি পরীক্ষা করেছেন?

ডাক্তার বললেন, না।

তরুণ নিজেই অল্প কিছুক্ষণ পরীক্ষা ক'রে উঠে দাঁড়াল। সংক্ষেপে বলল, মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে—সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

এইবার গার্ড কথা কইলেন, বললেন, হাওড়া স্টেশনে এই মহিলাটি ওঠবার সময় আমায় ব'লে ওঠেন যে ইনি একলা যাচ্ছেন, সুতরাং আমি যেন মাঝে মাঝে খবর নিই। ... আসানসোল স্টেশনে কিন্তু দেখি এক ভদ্রলোক গাড়িতে ওঁরই বার্থে বসে আছেন এবং চড়া চড়া কথাবার্তা হচ্ছে। আমি অন্য কিছু মনে ক'রে ব্যস্ত হয়ে খবর নিতে মহিলাটি বলেন যে ভদ্রলোকটি তাঁর পরিচিত। আমি ভদ্রলোকটির টিকিট দেখতে চাইতে তিনি বলেন যে পাশের একখানা গাড়িতে তাঁর জিনিস আছে, সেইখানেই তাঁর টিকিট আছে। মোকামাতে আমি নেমে যখন গাড়িটা দেখে যাই তখনও তিনি এই গাড়িতেই ছিলেন এবং দুজনের যে রকম কথাবার্তা হচ্ছিল তাকে ঝগড়াই বলা চলে।

গার্ড এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলে থামলেন। আমাদের কৌতূহল কিন্তু ইতিমধ্যেই জাগ্রত হয়ে উঠেছে। স্টেশন মাস্টার বললেন, সে লোককে আপনি দেখলে চিনতে পারবেন?

গার্ড বললেন, তা পারব বোধ হয়। বলে চারদিকের জনতার উপর একদফা চোখ বুলিয়ে নিলেন। কিন্তু সেখানে বোধ হয় কেউ ছিল না। সহসা দূরে নজর পড়ল—এক ভদ্রলোক খান-দুই গাড়ি পরে আর একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি থেকে নামছেন। গার্ড সেই দিকে চেয়েই লাফিয়ে উঠলেন।

—ঐ যে—!

সকলে একসঙ্গে সেদিকে ঘুরে দাঁড়াল। ভদ্রলোক সেইদিকেই আসছেন। বছর ত্রিশেক বয়স হবে। গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, হাতে হীরার আংটি এবং বেশভূষা দেখে সম্ভ্রান্ত লোক বলেই বোধ হয়। তাঁর চোখে তখনও সদ্যজাগরণের চিহ্ন সুস্পষ্ট!

কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে মশাই? এত ভীড় কেন?

স্টেশন মাস্টার বললেন, একটি মহিলা খুন হয়েছেন—

—খুন!

একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে লাফিয়ে তিনি সামনে এলেন। তার পর মৃতদেহের উপর দৃষ্টি পড়তেই তাঁর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। তিনি কিছুক্ষণ বিহ্বলের মতো এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, কি ক'রে হ'ল মশায়?

তরুণ মৃদু হেসে বলল, সেটা জানতে পারলে তো আমাদের সুবিধেই হয়।

তিনি তখন গাড়িতে উঠে মৃতদেহের উপর ঝুঁকে পড়লেন। আবার একটা অস্ফুট শব্দ।

স্টেশন মাস্টার বললেন, আপনি এঁকে চিনতেন কি?

ভদ্রলোকটি সোজা হয়ে স্টেশন-মাস্টারের দিকে যেন ঈষৎ ভীত দৃষ্টিতে চাইলেন, তারপর বললেন, চিনতুম।

—এঁর সঙ্গে আপনার কি সূত্রে পরিচয় জানতে পারি কি?

ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, ইনি থিয়েটারের একজন অভিনেত্রী। থিয়েটারে আমার যাওয়া-আসায় আলাপ হয়েছিল।

তরুণ বলল, মাপ করবেন। কিন্তু এ সময়ে কিছু গোপন না করাই ভাল, এঁর সঙ্গে কি আপনার পরিচয় ছিল?

ভদ্রলোকটির কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল, তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রায় চার বছর।

—আপনার নামটি জানতে পারি কি?

—আমার নাম শ্রীবিনোদবিহারী মুখুজ্যে।

—কি করেন?

—দেশে অল্পস্বল্প জমিদারীও আছে। তা ছাড়া কলকাতায় লোহা-লক্কড়ের কারবার আছে।

—ইনি কোথায় যাচ্ছিলেন আপনি জানেন?

—সে তো এঁর টিকিট দেখলেই আপনারা জানতে পারতেন। কাশী যাচ্ছিলেন।

তরুণ একটু হেসে বলল, কাশী পর্যন্ত যে যাচ্ছিলেন তা আমরা টিকিট দেখেও জানতে পারতুম, কিন্তু কাশীতে কোথায়? কার কাছে?

—কাশীতে এঁর মা আছেন। তাঁর কাছেই যাচ্ছিলেন। গণেশ মহল্লায় এঁর মা থাকেন।

—একা কেন?

ভদ্রলোক একটু বিপন্ন হয়ে বললেন, এত খবর আমায় জিজ্ঞেস করছেন কেন? এখন তো আর আমার সঙ্গে কোনই সম্পর্ক ছিল না!

তরুণ বলল, তবু কাল রাত পর্যন্ত যখন আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে তখন আপনার জানার সম্ভাবনাই বেশি!

ভদ্রলোক চারদিকে চেয়ে দেখলেন, সমস্ত কৌতূহলী চক্ষু তাঁরই দিকে চেয়ে আছে। তিনি মাথা হেঁট ক'রে জবাব দিলেন, বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি ক'রে যাচ্ছিল মায়ের কাছে।

সব চোখেই একটা বিদ্রূপের ভঙ্গী। মানুষ অপরের বিপদে বেশ মজা অনুভব করে। বিনোদবাবু কিছুতেই মাথা তুলতে পারলেন না।

তরুণ বিনোদবাবুর আরও কাছে গিয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, কাল রাত্রে শেষ যখন এঁকে জীবিত দেখা গেছে তখন ইনি আপনার সঙ্গে বিবাদ করছিলেন। সুতরাং বিবাদের ফলে হত্যা হওয়া যতখানি সহজ ততখানি সহজ আপনাকে হত্যাকারী ব'লে ধরা। অতএব আপনাকে এখন অনেক কথারই জবাবদিহি করতে হবে। প্রথমতঃ আপনার সঙ্গে ঝগড়াটা কিসের হচ্ছিল?

ভদ্রলোক বিষম বিব্রত হয়ে উঠলেন। ইন্‌স্পেক্টর বললেন, এবং এখন আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আপনি এখন যেসব কথা বলবেন, তা আপনার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে।

বিনোদবাবু বললেন, তার মানে? আমায় কি arrest করা হ'ল?

ইন্‌স্পেক্টর একটু হেসে বললেন, প্রায় তাই ধরে নিতে পারেন। আপনার বিরুদ্ধে

ভয়ানক প্রমাণ রয়েছে যে। শেষ আপনাকে ওঁর সঙ্গে দেখা গিয়েছিল এবং সে সময় আপনারা ঝগড়া করছিলেন। আপনারই কি এ ক্ষেত্রে খুন করা স্বাভাবিক নয়? অন্ততঃ যতক্ষণ না অন্যরকম প্রমাণ হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা তাই ধরে নেব।

বিনোদবাবুর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে বললেন, যাই হোক আমি সত্য কথাই বলব। ইনি যে আমার পরিচিতা ছিলেন তা আপনারা শুনেছেন। সেই সময় সত্যই আমি এঁকে স্নেহ করতুম। কতকগুলো চিঠিও সে সময় এঁকে লিখেছিলুম—যা-তা! এবার আমি কর্পোরেশনের ইলেকশনে যখন দাঁড়াবার চেষ্টা করি তখন এঁর একটি বন্ধুর প্ররোচনায় আমায় ভয় দেখান যে আমি ইলেকশনে দাঁড়ালে, আমার সেই পত্রগুলি ইনি প্রকাশ ক'রে দেবেন। আমি বিস্তর টাকা দিতে চাই, তবুও সেগুলি ইনি ফেরত দেন নি। খুব অনুনয়-বিনয় করি, তবুও না। তার জন্য আমার ইলেকশনে দাঁড়ানো হ'ল না। কাল রাত্রিতে হঠাৎ বর্ধমান স্টেশনে নেমে এঁকে দেখতে পেয়ে সেই চেষ্টাই আর একবার করবার জন্যে এই গাড়িতে উঠি। কাল রাত্রেও বিস্তর অনুনয়-বিনয় করলাম, টাকার লোভ দেখালাম, কিন্তু তবুও ইনি রাজী হলেন না। সেই ব্যাপারেই একটু বিবাদের মতো হয়। শেষে মোকামা স্টেশনে আমি নেমে আমার নিজের গাড়িতে চলে যাই। তখনও পর্যন্ত ইনি জীবিতা ছিলেন একথা বলতে পারি, তার পরের খবর আর আমি জানি না।

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব অস্ফুটস্বরে একটা 'ইস্' ক'রে উঠলেন।

তারপর বিনোদবাবুর গায়ে হাত দিয়ে বললেন, আপনার কামরায় কি সব জিনিসপত্র আছে, চলুন দেখে নামিয়ে নেবেন। আপনি আপাততঃ under arrest.

বিনোদবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ইন্‌স্পেক্টরের পিছনে পিছনে চললেন। স্টেশন-মাস্টার ঐ গাড়িখানা সাইডিং-এ দেবার আদেশ দিয়ে চলে গেলেন ভিতরে, আমি আর তরুণ তাঁর সঙ্গে তাঁর আফিস ঘরে গিয়ে বসলাম। মৃতদেহ দুজন কনস্টেবলের জিম্মায় রইল।

একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম, সেটা তরুণের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য। এই ঘটনা যতটা সহজ সবাই মনে করছিল তরুণ ততটা সহজভাবে তখনও নিতে পারে নি।

একটু পরেই ইন্‌স্পেক্টর হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির হলেন, হাতে একটি ছড়ি। —দেখুন তরুণবাবু, ছড়ির তলাটা লোহা দিয়ে বাঁধানো!

আমরা দুজনে একসঙ্গে ছড়িটা পরীক্ষা করলাম—প্রায় দু'ইঞ্চি স্থান লোহা দিয়ে বাঁধানো।

ইন্‌স্পেক্টর বলে চললেন, লোকটা যা জবানবন্দী দিলে, আর কোনও প্রমাণেরও আবশ্যক ছিল না, এখন অস্ত্রটা সুদ্ধ বেরিয়ে গেল, clear case! উঃ—লোকটা কি আহাম্মুক, ঐ রকম statement কেউ দেয়? Blackmailing-এর ব্যাপার, রাগ সামলাতে না পেরে খুন করা খুবই স্বাভাবিক।

তরুণ কোনও জবাব দিল না। শুধু 'হুঁ' বলে প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু গাড়ির কাছে গিয়ে একটা কুলী ডেকে মাল নামাবার আদেশ দিতে আমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম, যাবে না?

—না।... বিনোদবাবু যা বলেছেন তা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। ইন্‌স্পেক্টর বোস যত সহজে ব্যাপারটার মীমাংসা ক'রে ফেললেন ব্যাপার তত সহজ নয়।

স্টেশন-মাস্টারের জিম্মায় মাল রাখতে গেলে তিনিও আশ্চর্য হলেন, আপনি গেলেন না?

—না, রাত্রের ট্রেনে যাব।

ইন্‌স্পেক্টর বোস শুধু মুখটা বিকৃত করলেন। অর্থাৎ এমন অন্ধ লোকও থাকে! সোজাসুজি প্রমাণ, তবু বিশ্বাস করে না!

তরুণ আমাকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বললাম, কোথায় যাবে?

—চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

লাইন ধরে বেরিয়ে পড়লাম। দুজনে চলতে চলতে যখন স্টেশনের সীমা ছেড়ে যাবার উপক্রম করছি, সহসা তরুণ বলল, ওহে দেখ—

দেখি পাশের একটা সাইডিং-এ পশু বোঝাই একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। গরু, ছাগল ইত্যাদি নানাবিধ জন্তু কলরব জুড়ে দিয়েছে।

তরুণ খুব মনোযোগের সঙ্গে প্রত্যেক গাড়িখানি পরীক্ষা করতে করতে চলতে লাগল। একটা গাড়ির সম্মুখে এসে কিন্তু একেবারে স্থির হয়ে গেল। একটা বিরাট পাহাড়ী গাই তার সম্মুখের একটা শিক কি ক'রে বাঁকিয়ে ফেলেছে এবং কোন রকমে তার ফাঁক দিয়ে মাথাটা গলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এখন শত চেষ্টাতেও মাথা ভিতরে নিতে পারছে না,—বিরাট বিরাট শিংগুলি নেড়ে ফোঁস ফোঁস করছে।...

সেইখানেই আপ লাইনটা এমনভাবে বেঁকে এসেছে যে দু'জোড়া লাইনের মধ্যে ঠিক যতটুকু ফাঁক থাকা একান্ত প্রয়োজন তার বেশি একটুও নেই।

একটা খালাসী লাইনে কি কাজ করছিল, তাকে ডেকে তার হাতে নিজের একটি কার্ড দিয়ে বলল, টিশন্ মাস্টার আউর নিস্‌পেক্টার বাবুকে।—

সে লোকটা ইতস্ততঃ করছে দেখে হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে বলল, জল্‌দি!

সে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল।

তারপর কোনও রকমে গাড়িটা বেয়ে উপরে উঠে একবার সেই গরুর শিংটা খুব ভাল ক'রে দেখে নিল।

পাশেই সিগন্যালারের ঘর। স্টেশন-মাস্টারদের আসতে বিলম্ব হবে বুঝে তরুণ সেইখানে উঠে গেল। সিগন্যালারের বিস্মিত চোখকে উপেক্ষা ক'রে বলল, আপ-ট্রেনটাকে কোন্ লাইন দিয়ে পাস করিয়েছিলে? আমরা যে লাইনটা অনুমান করেছিলাম, সিগন্যালারও সেটাই দেখিয়ে দিল। তরুণ সন্তুষ্টমনে শিস দিতে দিতে উপর থেকে নেমে এল।

ততক্ষণে স্টেশন-মাস্টার ও ইন্‌স্পেক্টর বোস এসে পৌঁছেছেন।

—ব্যাপার কী তরুণবাবু?

তরুণ হেসে বলল, বিনোদবাবুর মায়া বোধ হয় আপনাকে ছাড়তে হ'ল ইন্‌স্পেক্টর!

—কেন?

—আপনি খুনীকে চান?

আমরা আগ্রহে চেয়ে রইলাম। তরুণ বলল, হাতকড়ি বার করুন, ধরিয়ে দিচ্ছি। বলে গরুটির দিকে দেখিয়ে বলল, ঐ যে আপনার আসামী!

—আপনি কি পাগল হলেন?

তরুণ সে কথার জবাব না দিয়ে নিজের সবল বাহুতে ইন্‌স্পেক্টরকে উঁচু ক'রে তুলে ধরল—দেখুন দিকি ওর ডানদিকের শিংটা!

ইন্‌স্পেক্টর এতই অবাক হয়েছেন যে মুখে কথা ফোটে না। অস্ফুটস্বরে বললেন, একটু যেন রক্ত লেগে রয়েছে!

তরুণ বলল, আর সামান্য একটু পেণ্ট—মহিলাটির মুখে পেণ্ট ছিল।

ইন্‌স্পেক্টর তরুণের বাহুবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ ক'রে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। তরুণ হেসে লাইনটা দেখিয়ে বলল, এই লাইনটা দিয়ে আপ ট্রেন পাস করেছে, মনে রাখবেন। বিনোদবাবু নেমে যাবার পর মহিলাটি বোধ হয় মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্য মাথা বার ক'রে হাওয়া খাচ্ছিলেন। গরুটিও মাথা বাইরে এনে আর ভেতরে ঢোকাতে পাচ্ছে না, তা তো দেখছেনই। আর এত কাছ দিয়ে ট্রেন গেছে, সুতরাং বুঝতেই পারছেন। আমি ওর রগের গর্তের মধ্যে একটু শিং-ভাঙার গুঁড়ো লক্ষ্য করেছিলুম, কিন্তু আপনারা খুনীকে হাতের কাছে পেয়েছি মনে ক'রে এমনিই উল্লাস করছিলেন যে ওসব আর দেখার অবসর হয় নি! আচ্ছা নমস্কার।

তারপর স্টেশন-মাস্টারকে প্রশ্ন করল, এর পরের ট্রেন কটায়?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চায়ের দোকানে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের রহস্যময় মৃত্যুর কথা আলোচনা হচ্ছিল।

দোকানের মালিক বিমলদা বললেন, আমার মনে হয় আত্মহত্যা।

আমি আর এক কাপ চা ফরমাশ ক'রে বললাম, আত্মহত্যা ব'লে মনে হয় না ঠিক—দুর্ঘটনা ব'লেই বোধ হয়। কোনও রকমে মাথায় ধাক্কাটাক্কা লেগে—

ওপাশে একটি সাতাশ-আটাশ বছরের যুবক বসে চা খাচ্ছিল। শ্যামবর্ণ, ঈষৎ কোঁকড়া চুল, মুখের ভাব কঠিন, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ—সে হঠাৎ চায়ের কাপ ঠেলে দিয়ে বলল, অ্যাক্‌সিডেণ্টও নয়, আত্মহত্যাও নয়, খুন, সোজাসুজি খুন!

কথাটা কারও পছন্দ হ'ল, কারও বা হ'ল না। নিজের নিজের মতামত নিয়ে তর্ক করতে করতে একদল লোক বের হয়ে গেল। দোকান একটু ফাঁকা হতেই আমি সেই ছোকরার কাছে ঘেঁষে বসলাম। সে যেমন জোরের সঙ্গে কথা বলল, শুনে মনে হয় আর যাই হোক, খুব তলিয়ে না বুঝলে এমন ক'রে কেউ কথা বলতে পারে না!

বিমলদাও হাতের কাছে খরিদ্দারের ভীড় না থাকায় সামনের চেয়ারে এসে বসে পড়ে বললেন, কিসে বুঝলেন?

সে বলল, খুনের ব্যাপারটা সব শুনেছেন তো? ঘটনাটা,—সব কিছু?

বিমলদা বললেন, কতক কতক শুনেছি—

বক্তা যুবকটি আর এক কাপ চা দিতে ফরমাশ ক'রে বলল, মরেছে যে বুড়ি তারই বাড়ি ওটা, রাস্তার ধারে একতলার ঘরটায় দোকান আছে, বইয়ের দোকান। ওরই ওপরে যে ঘরটা সেটায় এক ছোকরা আর্টিস্ট ফোটোগ্রাফীর দোকান করেছিল, আর দোতলায় ভেতরের ঘরে বুড়ী থাকত নিজে, ঠিক তারই নিচের ঘরে ওর ভাঁড়ার আর রান্না দুই-ই চলত। ঝি চাকর রাখত না পয়সা খরচের ভয়ে, বাড়ির পাট-ঝাট নিজেই করত। ভয়ানক পয়সার মায়া ছিল, সেই জন্যেই গেরস্ত ভাড়াটে দেয়'নি, ভাড়া কম পাবে ব'লে।...

...পয়সা কিছু জমেও ছিল। কেউ বলে বিশ হাজার, কেউ বলে দশ হাজার, কিন্তু সম্প্রতি পুলিস খবর নিয়ে জেনেছে যে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে ছিল হাজার পাঁচেক টাকা আর পোস্ট অফিস ক্যাশ সার্টিফিকেট ছিল হাজার চারেকের। আত্মীয়স্বজন কেউ কোনও দিন দেখা যায় নি, তিনকুলে কেউ আছে ব'লেও জানা নেই। বত্রিশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল, সেই থেকে এই অবধি ঐ বাড়ি আগলে পড়ে আছে। বাড়ির আয়েই ওর খরচ চলত। মিতব্যয়ী ব'লে ট্যাক্স দিয়ে বাড়ি সারিয়েও টাকা জমাতে ওর অসুবিধা হয় নি। আরও জমানো উচিত ছিল। কিন্তু ও বলত যে কে ওর এক বোনপো আছে, সে-ই মাঝে মাঝে জোর ক'রে কিছু কিছু টাকা নিয়ে যায়।

বিমলদা বললেন, বোনপো! তবে যে বললেন তিনকুলে কেউ নেই?

—কেউ নেই একথা তো বলি নি, কেউ আছে ব'লে জানা নেই তাই বলেছি। ঐ বোনপোকে কেউ দেখে নি, বুড়ীও বিশেষ তার কথা কাউকে বলত না। শুধু আর্টিস্ট ভাড়াটে, ওর কি যেন নাম—সুধাংশু—হ্যাঁ সুধাংশুই পুলিসের কাছে ঐ বোনপোর কথা বলেছে। কিন্তু ওর কথা পুলিস বিশ্বাস করে নি। সুধাংশুই খুনের চার্জে ধরা পড়েছিল কিনা!

আমি বললাম, কেন? বিশেষ ক'রে ওকেই ধরলে কেন?

—বলছি। সুধাংশু ছেলেটি অন্য ভাড়াটের মতো বাইরে বাইরে এসে চলে যেত না, সে বুড়ীর সঙ্গে খুব ভাব ক'রে নিয়েছিল, ওকে মাসিমা ব'লে ডাকত এবং ইদানীং এমন হয়ে গিয়েছিল যে এটা ওটা বাজার থেকে কোন ভাল জিনিস এনে দেওয়া, সঙ্গে ক'রে থিয়েটার বায়স্কোপে নিয়ে যাওয়া, খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতোই ব্যবহার করত। বুড়ীও ওকে খুব ভালবাসত এবং বিশ্বাস করত। ভাল কিছু রাঁধলে বা পিঠে তৈরি করলে সুধাংশুর জন্যে রেখে দিত। খুনের দিনও বিকেলে বুড়ীকে নিয়ে ও থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল—স্টার থিয়েটারে মন্ত্রশক্তি প্লে—ফিরতে রাত একটা কি দেড়টা হয়েছিল। দুটোর সময় ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুধাংশু নিজের বাড়িতে গেছে—এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। ওদেরই পাড়ার বিশ্বপতিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি বাড়িতে স্ত্রীর ব্যথা ওঠায় দাই ডাকতে গিয়েছিলেন বুড়ীর বাড়ির পাশে।

...তার পরের দিন এগারোটায় স্টুডিও খুলতে এসে সুধাংশু ওপরে উঠে গিয়ে বুড়ীর ঘরের দোর ভেজানো দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে ডেকেছে ওকে, কিন্তু সাড়া পায় নি। সদর দোর খোলা, সিঁড়ি উঠান ধোওয়া মোছা সব পরিষ্কার, তার মানে বুড়ী সকালে উঠেছিল নিশ্চয়ই—অসুখ করলে উঠতে পারত না। তবে এমন সময় শুয়ে কেন? তারপর মনে হয়েছে যে আগের দিন রাত জেগেছে ব'লে বোধ হয় সকাল ক'রে রান্না-খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছে। সেইজন্য তখন আর ডাকে নি। নিজের স্টুডিওতে বসে কাজ করতে শুরু ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু চারটে বেজে গেল যখন, তখন একটু আশ্চর্য হয়ে গেল—সাড়ে তিনটের সময় বুড়ী রোজ নিজে চা খেত আর ওকে দিয়ে যেত, আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম হ'তে দেখে একটু বিচলিত হ'ল—এতক্ষণ বুড়ী রাত্রেও ঘুমোয় না—তার উপর দিনের বেলা এত ঘুম!

...সুধাংশু তখন বেরিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ওকে ডেকেছে দু-তিনবার, তাতেও সাড়া না পেয়ে জোরে ডাকে, তাতেও কোন উত্তর না পেয়ে দোর ঠেলেছে, দোর ঠেলতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারে। দক্ষিণের জানলার ধারে মেঝের উপর পড়ে আছে বুড়ী, মুখে মাছি বিড়বিড় করছে। প্রথমে মনে করেছিল অজ্ঞান হয়ে আছে, কিন্তু তারপরই গায়ে হাত দিয়ে গা ঠাণ্ডা দেখে চীৎকার ক'রে ওঠে। বাইরে এসে বইয়ের দোকানের লোকজনকে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর পুলিস এল, ডাক্তার এল। মাথায় একটা কঠিন কিছুর আঘাত পেয়ে খুলি ভেঙে প্রাণ বেরিয়েছে। সে আঘাত পিছন থেকেও কেউ করতে পারে কিম্বা বুড়ী জানলার ধারে মেঝেয় বসে কিছু করতে করতে হঠাৎ মাথা তুলতে গিয়ে কপাটের একটা পাল্লা মাথার পিছনে লেগে যেতেও পারে।

বিমলদা অসহিষ্ণুভাবে বললেন, এক্ষেত্রে তাহ'লে সুধাংশুকে ধরলে কেন?

বক্তা চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে পেয়ালাটি সরিয়ে রেখে বলল, বুড়ী কিছুদিন ধরে নাকি খুব ভয়ের মধ্যে ছিল। ওর সেই বোনপো নাকি বলেছিল যে ওকে হাজার পাঁচেক টাকা না দিলে সে ওকে খুন ক'রে ফেলবে। এ সবই সুধাংশু বলছে অবশ্য। বুড়ীও কিছুদিন যাবৎ কাশীবাস করবে স্থির করেছিল। সেই অনুসারে বুড়ী সুধাংশুর বাপের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে, সে যথাসর্বস্ব সুধাংশুর নামেই লেখাপড়া ক'রে দেবে, ওরাই ওর বাড়িঘর-দোর দেখাশুনা করবে... শুধু বুড়ী যত দিন বাঁচবে, যেখানেই থাক না কেন, ওর সব খরচ এরা পাঠিয়ে দেবে। সুধাংশুর বাপ এটর্নী, তাঁরই অফিসে গিয়ে চুপিচুপি ঘটনার দিনই দলিলে সই ক'রে দিয়ে আসে। কাউকে না জানিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল ওর সেই বোনপোর ভয়ে।...

বিমলদা বললেন, সুধাংশুই তো যথাসর্বস্ব পেত, তবে ও খুন করবে কেন?

—যত তাড়াতাড়ি পায় এই জন্যে।... তা ছাড়া বুড়ীর কাছে পুরনো গয়না, মোহর যা কিছু ছিল তাও সেদিনই ও বেচে আসে, বিদেশ যাবার আগে হাতে নগদ টাকা কিছু করা দরকার ব'লে। প্রায় সাত-আটশো টাকা হবে। সে টাকাটাও পুলিস পায় নি খুঁজে—এবং সে টাকার কথাও সুধাংশু ছাড়া আর বিশেষ কেউ জানত না।

...কিন্তু সুধাংশু আজ মুক্তি পেয়েছে।

আমি ও বিমলদা প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলাম, কি ক'রে?

—হ্যাঁ, আজই রায় বেরিয়েছে। ওর বিরুদ্ধে এমন ভয়ানক সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও ওর বাপের তদ্বিরের ফলে ও মুক্তি পেয়ে গেল। বুড়ীর সামনের বাড়ির লোকেরা সাক্ষী দিয়েছে যে খুন রাত্রি দুটোর সময় নাকি কিছুতেই হ'তে পারে না, যেহেতু তারা আজ সকালে বেলা সাড়ে ছটার সময় ওকে নিয়মিত সদর দোর খুলে ছড়া-ঝাঁট দিতে দেখেছে। যেমন অন্য দিনও একখানা খয়েররঙের গায়ের কাপড় গায়ে দিয়ে প্রথমে সদর দোরে জল দিত, তারপর খ্যাংরা দিয়ে পথটা আর উঠোনটা ধোওয়া মোছা করত, তা করতে দেখেছে। ওরা আর ওদের পাশের বাড়ির লোকেরা সকলেই এই কথা সাক্ষ্য দিয়েছে।

সেদিনই সুধাংশু সকালবেলা ভবানীপুরে আশুবাবুর বাড়িতে ফোটো তুলতে গিয়েছিল এক বর-কনের, একথাও প্রমাণ হয়ে গেল। সেখানে প্রায় সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত ওর দেরি হয়, তারপরই বাড়ি এসেছে, স্নান করেছে, খেয়েছে, ওর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেছে, তারপর স্টুডিওতে এসেছে এগারটার সময়। এ পর্যন্ত ভাল ভাবেই প্রমাণ হয়ে গেছে... কাজেই ডাক্তারেরা যখন একবাক্যে বলেছেন যে যত পরেই মৃত্যু হোক আটটার আগে নিশ্চয়ই হয়েছে, তখন সুধাংশু কি ক'রে খুন করতে পারে? সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত সে আশুবাবুদের বাড়িতেই ছিল।...

...সুতরাং বিচারকেরা অনুমান করলেন যে জানলা থেকে আঘাত লেগেই মৃত্যু হওয়া সম্ভব।

আমি বিজয়গর্বে বললাম, আমিও তাই বলছিলাম।

বিমলদা বললেন, তবে আপনি বলছিলেন 'সোজাসুজি খুন' কেন?

ছোকরা একটা সিগারেট বার করে ধরিয়ে বলল, কিন্তু টাকাগুলো? গয়নাবেচা টাকাগুলোর কি হাত-পা হ'ল? যদি অ্যাক্সিডেণ্টই হয়, টাকাগুলো কোথা যাবে?

বিমলদা এবং আমি উভয়েই দস্তুরমতো দমে গেলাম। বললাম, আপনি কি অনুমান করেন?

—আমার বিশ্বাস সেই বোনপোই খুন করেছে। বুড়ী যে উইল করেছে তা জানতে পারা তার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয় এবং সেদিন গয়না আর মোহর বেচে যে টাকা এনেছে এটাও তার পক্ষে জানা অসম্ভব নয়। এমনি মরে গেলে তো এক পয়সা পাবে না স্থির হয়েই গেল, কাজেই ঐ সাত-আটশো টাকা যদি কোনরকমে হাতছাড়া হয়ে যাবার আগে বাগাতে পারে সেই মতলবই ছিল। ধরুন বাড়ি ঢোকবার সুযোগেরও অভাব হয় নি। ওরা যখন রাত দেড়টার সময় থিয়েটার থেকে এসে দোর খুলে ভেতরে গেছে সেই সময় সে স্বচ্ছন্দে ঢুকে পড়তে পারে। ওপরে সুধাংশু মিনিট দশেক ছিল, একথা সে নিজ মুখেই বলেছে। সেই সময়টা তার পক্ষে নিচে বা ওপরে কোথাও লুকিয়ে থাকা মোটেই অসম্ভব নয়—পায়খানাতেও ঢুকে থাকতে পারে। যাই হোক... তারপর সুধাংশু চলে গেলে বুড়ী হয়তো দোর বন্ধ ক'রে ওপরে এসে খাওয়াদাওয়া সেরে শোবার উদ্যোগ করছিল সেই সময় মনে

indra

করুন সে পেছন দিক থেকে এসে যদি কোনও একটা জিনিস দিয়ে আঘাত ক'রে থাকে... হয়তো তার একেবারে খুন করবার উদ্দেশ্য ছিল না, মনে করেছিল এমনি একটু জখম হবে বা অজ্ঞান হয়ে পড়বে... কিন্তু বুড়ী ঐ এক আঘাতেই শেষ হয়ে গেছে। তারপর টাকাটা খুঁজে নেওয়া তার পক্ষে এমন আর আশ্চর্য কি?

আমি বললাম, কিন্তু সামনের বাড়ির লোকেরা সে সকালে দেখেছে ওকে—

—ওকেই যে দেখেছে তার তো কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। ধরুন সেই খুনী বোনপোই হয়তো টাকা খুঁজতে খুঁজতে ভোর হয়ে গেছে দেখে, সে সময়ে বাড়ি থেকে ওকে বেরোতে দেখলে সন্দেহ হ'তে পারে মনে করেছিল, তাই নিজেই মাসির একটা থান পরে আর গায়ের কাপড় জড়িয়ে ধোওয়া-মোছা বাসনমাজা সব করেছে। মাথা-গা যতদূর সম্ভব ঢাকা ছিল—শীতকাল, কেউ সন্দেহ করে নি—কাজেই ভাল ক'রে কেউ দেখতেও পায় নি, সুতরাং দূর থেকে ওর মাসিকেই মনে করেছে। তারপর বাড়ির মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে ছিল। বেলা হতে, সুধাংশু স্টুডিও খুলতে, যখন বাইরের লোক ভেতরে ঢোকা বা বাইরে যাওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়, সেই সময় এক অবসরে বেরিয়ে গেছে। এ রকম তো হতে পারে? পুলিসের মাথায় অবিশ্যি এত কথা যাবে না, এ সে আগেই জানত...

আমি এবং বিমলদা কিছুক্ষণ দূরে রাস্তার ওপারে চেয়ে রইলাম। শেষের কথাগুলি এত বিস্ময়কর যে আমরা দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে অন্ততঃ তখন যেন ঘটনাটা বায়স্কোপের ছবির মতো সরে সরে যাচ্ছিল... তারপর একটু পরেই আমাদের দুজনের মনে একটা সন্দেহ দেখা দিল। ফিরে পাশের চেয়ারের দিকে চেয়ে দেখি চেয়ার খালি—ছুটে রাস্তায় বার হয়ে এলাম, যতদূর দৃষ্টি চলে বক্তার চিহ্নমাত্র নেই, যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে!

বিমলদা বললেন, অ্যাঁ, চোখের সামনে দিয়ে পালিয়ে গেল?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়, হরবিলাসবাবুর যখন অবস্থা খুবই খারাপ ছিল তখন তিনি দু-একটি দুষ্কর্ম করেছিলেন এবং সে কথাটা পরবর্তী জীবনে ভোলবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন। বাইরের লোক তো ভুলে গিয়েছিলই, নিজেও প্রায় ভুলতে বসেছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ দুষ্টগ্রহের মতো তাঁর যৌবনের সেই কুকর্মের এক সহচর গোবিন্দ কলকাতায় এসে উপস্থিত হ'ল।

বলা বাহুল্য যে হরবিলাসবাবু এই আকস্মিক বিপদে প্রমাদ গুনলেন। তখন তিনি সবে প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্যের পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তখনও তাঁর ভবিষ্যৎ অনেক দূর-প্রসারিত এবং সে ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল, লোভনীয়। তিনি গোবিন্দকে নিরাপদ স্থানে সরাবার উপায়

চিন্তা করতে লাগলেন। উপায়ও খুব শীঘ্রই হ'ল। গোবিন্দর অপরাধের যেসব ইতিহাস হরবিলাসবাবুর জানা ছিল, গোপনে তা তিনি পুলিসকে জানিয়ে দিলেন আর তার উপযুক্ত প্রমাণও তিনি তাদের হাতে দিয়ে দিলেন।

অপরাধ কঠিন, বিচারে গোবিন্দর আট বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হ'ল। ব্যাপারটা বেশ নির্বিঘ্নেই মিটত কিন্তু গোল বাধল একেবারে সব শেষে, গোবিন্দ কেমন ক'রে খবর পেল যে এ কাজ হরবিলাসবাবুরই। সে কাকেও কিছু বলল না, শুধু শেষ বিচারের দিন আদালতে উপস্থিত হরবিলাসবাবুর দিকে নিঃশব্দে একবার চেয়ে দেখল। সে চাহনি এতই ভয়ঙ্কর যে হরবিলাসবাবু শিউরে উঠলেন।

এর পর বহুদিন কেটে গেছে, গোবিন্দ বলে কেউ যে পৃথিবীতে আছে তাই হরবিলাসবাবু প্রায় ভুলে গেছেন। এমন সময় অকস্মাৎ একদিন তিনি ডাকে একখানি বেনামী চিঠি পেলেন। চিঠিটি ছাপা, অর্থাৎ প্রেরকের হাতের লেখা বোঝবার উপায় নেই। খবরের কাগজ থেকে শব্দ কেটে কেটে আঠা দিয়ে সাদা কাগজের উপর লাগানো। চিঠির ভাষাও খুব সংক্ষিপ্ত—

হরবিলাস,

> পাপের শাস্তি শুধু অপরকে দেওয়া যায় না, নিজেকেও পাইতে হয়। তোমার এই ব্যবসায়, এই প্রাসাদ, এই মোটরগাড়ি বড় মায়ার জিনিস, বড় গর্বের বস্তু। এইগুলি হইতে বঞ্চিত করিয়া অকালে পৃথিবী হইতে বিদায় দিলেই বোধ হয় সব চেয়ে শাস্তি তোমাকে দেওয়া হইবে। সেই শাস্তির জন্যই প্রস্তুত হও। আগামী মাসের ৩রা তোমার মৃত্যুর দিন। আরও তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করিতে পারিতাম কিন্তু মৃত্যুভয়ে তুমি ছট্‌ফট্ করিবে—সেই ভয়ের চেহারাটাই দেখিতে চাই। মনে রাখিও—আগামী মাসের ৩রা!

বলা বাহুল্য, চিঠি যে কে পাঠিয়েছে হরবিলাসের তা বুঝতে বাকী রইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ পুলিসে খবর দিলেন এবং গোবিন্দর নামটাও তাদের জানিয়ে দিলেন। কিন্তু নাম করলেই তো পুলিস তাকে ধরতে পারে না। প্রমাণ কই? পুলিস খবর নিয়ে জানল গোবিন্দ ছাড়া পেয়েছে বটে কিন্তু সে দেশে থাকে এবং জেল থেকে মুক্তি পেয়েই সোজা দেশে চলে গেছে। অথচ এ চিঠিতে বৌবাজারের ছাপ আছে, অর্থাৎ বৌবাজার পোস্ট-অফিসের এলাকার মধ্যে কোন ডাকবাক্সে ফেলা। সুতরাং পুলিস কোন ব্যবস্থাই করতে পারল না, শুধু গোবিন্দর উপর একটু কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা করল মাত্র।

কিন্তু হরবিলাসবাবু এতে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তিনি গোবিন্দকে চিনতেন, সে যে কত ভয়ানক লোক এবং কত অনায়াসে সে যে কত বড় কাজ করতে পারে তা হরবিলাসবাবুর চেয়ে বেশী আর কে জানে? তিনি বহু অর্থব্যয় ক'রে বাড়িতে ও অফিসে দিনরাত একজন ক'রে গোয়েন্দা রাখবার ব্যবস্থা করলেন, এমন কি মোটরেও একজন পুলিসের লোক রাখতে শুরু করলেন। বাড়ির প্রত্যেকটি দুয়ার জানলা দুর্ভেদ্য ক'রে তোলা

হ'ল। নতুন ধরনের বিলাতী তালাচাবি আনানো হ'ল এবং অতি পুরাতন জনতিনেক মাত্র চাকর-বামুন ছাড়া সব ঝি-চাকরকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হ'ল।

তবুও তিনি ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না! এধারে তিনি মৃত্যুর জন্যও প্রস্তুত হতে লাগলেন। বিষয়-আশয় এবং ব্যবসায়ের রীতিমতো ব্যবস্থা ক'রে উইল বা চরমপত্র প্রস্তুত করলেন। স্ত্রী পূর্বেই মারা গিয়েছিলেন। একমাত্র ছেলে তখন বিলেতে। একবার ভাবলেন তাকে এরোপ্লেনে আসতে লেখেন আবার ভাবলেন এখানে এলে হয়ত তারও কোন বিপদ ঘটতে পারে, তার চেয়ে যেমন আছে তেমনি থাক্। শুধু তিনি মারা গেলে সে কি করবে সেই বিষয়ে উপদেশ দিয়ে এক দীর্ঘ পত্র লিখে লোহার সিন্দুকে রেখে দিলেন।

এধারে ক্রমশ দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল। হরবিলাসবাবুর আহার-নিদ্রা একরকম বন্ধ হয়ে গেল। তিনি রোগা হয়ে পড়লেন, দুশ্চিন্তা ও মৃত্যুভয়ে মাথার মধ্যেও যেন কেমন গোলমাল হতে লাগল। ইদানীং আর হিসাবপত্র যেন মাথায় ঢোকে না। শেষে যখন মাত্র তিন চার দিন বাকী তখন তিনি একদিন আর থাকতে না পেরে বিখ্যাত শৌখীন গোয়েন্দা তরুণ গুপ্তকে ডেকে পাঠালেন।

তরুণকে তিনি সব কথাই খুলে বললেন। এমন কি পুলিসকে যে কথা বলতে পারেন নি, অর্থাৎ নিজের প্রথম জীবনের কথাও বাদ দিলেন না। তরুণ গুপ্তের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার কথা তিনি বহু লোকের মুখেই শুনেছিলেন, বোধ হয় সেই জন্যই তাঁর মনে হ'ল যে যদি কেউ এই ব্যাপারে তাঁকে বাঁচাতে পারে তো এই লোকটিই পারবে। সুতরাং এর কাছে কিছু গোপন না করাই ভাল।

তরুণ সব কথা শুনে প্রশ্ন করল, এ লোকটি সম্বন্ধে তাহ'লে সত্যিই আপনার ভয় আছে?

হরবিলাসবাবু নিঃসংশয়ে বললেন, আছে।

তরুণ বলল, তাহ'লে এক কাজ করুন না কেন! এই লোকটিকে কিছু টাকা দিয়ে একটা সন্ধি ক'রে ফেলুন না কেন! অনেকখানি দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচবেন।

হরবিলাসবাবু সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, কিন্তু সে কি রাজী হবে?

তরুণ ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বলল, তা বটে, আট বছরের জেলখাটার দেনা টাকায় শোধ হবে কিনা সন্দেহ। তবু চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি!

হরবিলাসবাবু লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। কিন্তু তবুও ব্যাকুল আগ্রহে তার দুই হাত চেপে ধরে বললেন, একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন না তরুণবাবু! সে যত টাকা চায় আমি দিতে রাজী আছি, পাঁচ হাজার, দশ হাজার—যা চায়।

তরুণ চিন্তিত মুখে বলল, তাহ'লে তো আজই যেতে হয়।

হরবিলাস ব্যগ্রভাবে বললেন, আমি মোটর ঠিক ক'রে দিচ্ছি, এখন বেরোলে সন্ধ্যের মধ্যেই তার দেশে পৌঁছতে পারবেন। আর এই দু'হাজার টাকা নিয়ে যান—আর যা লাগে তা দিতে রাজী আছি। কালই পাঠিয়ে দেব—

তরুণ বলল, কিন্তু সে যে কথার ঠিক রাখবে তার ঠিক কি?

হরবিলাস জবাব দিলেন, টাকা যদি একবার সে নেয় তো আর কোন ভয় নেই। আমি তাকে যতদূর জানি কথা দিয়ে কথার খেলাপ সে করবে না।

কিন্তু তরুণের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হ'ল। গোবিন্দ অত্যন্ত বিস্মিত হবার ভান করল। বার বার অনুনয় করা সত্ত্বেও সে মানতে রাজী হ'ল না যে এসবের সে কিছু জানে এবং টাকাও কিছুতে নিতে রাজী হল না। গভীর রাত্রে তরুণ চিন্তিত মুখে ফিরে এল।

হরবিলাসবাবু খবর শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বহুক্ষণ জড়ভরতের মতো বসে থেকে বললেন, কি হবে তাহ'লে তরুণবাবু?

তরুণ আশ্বাস দিয়ে বলল, ভয় কি! আমরা এতগুলো লোক থাকা সত্ত্বেও আপনাকে খুন ক'রে যাবে? এ কি মগের মুল্লুক, না ভূত হয়ে আসবে! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তরুণ এরপর বাইরে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত পুলিস কর্মচারীর সঙ্গে বহুক্ষণ পরামর্শ করল। তারপর হরবিলাসবাবুকে ডেকে নির্দেশ দিল, দোস্‌রা রাত্রে অবশিষ্ট তিনজন চাকরকেও বিদায় দিতে। বলল, বাড়ির মধ্যে যেন একজন লোকও না থাকে। কার মনে কি আছে তা কে জানে?... আর আমরাও বাড়ির চারপাশে এমন দুর্ভেদ্য পাহারা বসাব যে আমাদের চোখ এড়িয়ে কোন লোক যেতে পারবে না।

হরবিলাসবাবু আশ্বস্ত হয়ে বললেন, দোরটাও বন্ধ ক'রে রাখব, কি বলেন?

তরুণ ঘাড় নেড়ে বলল, দরকার নেই। বরং যদি একটু লোভ দেখিয়ে লোকটাকে ধরতে পারা যায় তো সেই চেষ্টা করাই উচিত।

তাই হ'ল। দোস্‌রা তারিখ রাত্রে তরুণ বাড়ির মধ্যের প্রত্যেকটি ঘর, প্রত্যেকটি কোণ এবং প্রত্যেকটি আসবাব পরীক্ষা করে বেরিয়ে এল এবং বাইরে কয়েকজন অতি বিশ্বস্ত পুলিসের লোক পাহারা বসানো হ'ল। ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টার নিজে সাদা পোশাকে সদরের সামনে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ ক'রে তরুণ রাত্রি বারটার সময় নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে এল এবং বাকী রাতটুকু ঘুমিয়ে আবার ঠিক ছ'টার সময় হাজিরা দিল। ইন্‌স্পেক্টার তখনও সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে, চারিদিকের পাহারাও যথেষ্ট সতর্ক; ইতিমধ্যে দুবার পাহারা বদল করা হয়েছে, পাছে বহুক্ষণ বিনিদ্রভাবে পাহারা দেবার ফলে কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়।

তরুণ ইন্‌স্পেক্টারকে প্রশ্ন করল, ভেতরের খবর নিয়েছেন?

তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, দরকার নেই। কর্তা রোজ যেমন ভোর পাঁচটায় উঠে আফিস ঘরে এসে বসেন আজও তেমনি এসেছেন, ঐ দেখছেন না আলো জ্বলছে!

তরুণ চেয়ে দেখল সত্যই নিচের বড় আফিস ঘরের আলো জ্বলছে। এমন কি ঘষা কাঁচের বন্ধ শার্সির উপর চেয়ারে উপবিষ্ট হরবিলাসবাবুর ছায়া এসে পড়ছে, তাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তরুণ নিশ্চিন্ত হ'ল।

সময়টা শীতকাল, তার উপর গতরাত্রের কুয়াশা তখনও ভাল ক'রে কাটে নি—ঘরে আলো না জ্বাললে কাজকর্ম করা কঠিন। সুতরাং প্রথমটা তরুণ বিস্মিত হয় নি, কিন্তু বেলা বেড়ে গেল, এমন কি আটটা নাগাদ কুয়াশা একেবারে কেটে গেল, অথচ হরবিলাসবাবু

আলো নেভালেন না দেখে তরুণ বিচলিত হয়ে উঠল। কথাটা ইন্‌স্পেক্টারকে বলতে তিনিও বললেন, দেখুন ছায়াটা বহুক্ষণ একভাবে আছে—নড়ছে না তো!

সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল। তখন দুজনেই একরকম রুদ্ধশ্বাসে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। ঘরের দ্বার ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে, তারই মধ্য দিয়ে ঘরে ঢোকবার আগেই তাঁরা ব্যাপারটা দেখতে পেলেন। হরবিলাসবাবু চেয়ারেই বসে আছেন বটে কিন্তু তাঁর মাথাটা সামনের দিকে ঢলে পড়েছে এবং কাঁধের উপর তখনও একটা ছুরি আমূল বিঁধে আছে!

দুজনে মুহূর্তকাল যেন বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইল, তার পরই ছুটে কাছে গিয়ে দেখল যে বহুক্ষণ পূর্বেই হরবিলাসের প্রাণ বার হয়ে গেছে।

তরুণের প্রথমেই যে কথাটা মনে জাগল, তা হচ্ছে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য ধিক্কার। সে যদি বাইরের পাহারার উপর ভরসা না ক'রে নিজে ঘরের মধ্যে বসে থাকত তাহ'লে হয়ত এমনটা ঘটত না। লোকটি মৃত্যুভয়ে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করল এবং সেজন্য প্রচুর অর্থব্যয় করল, তাদের প্রত্যেকটি আদেশ পালন করল অথচ শেষ পর্যন্ত তারা রক্ষা করতে পারল না। তাদের সকলকে নির্বোধ ও অপদার্থ প্রমাণ ক'রে হত্যাকারী নিজের কাজ শেষ ক'রে প্রস্থান করল। ছিঃ ছিঃ—লজ্জায় যেন তরুণের আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করল।

কিন্তু বৃথা অনুশোচনায় নষ্ট করবার ছেলে সে নয়। সে তৎক্ষণাৎ বাইরের পাহারাওলাদের মধ্য থেকে তিনজন লোককে ডেকে নিল এবং বাকী সকলকে আরও সতর্ক থাকবার আদেশ দিয়ে বাড়িটি পুনরায় খানাতল্লাসী করতে শুরু করল। ইন্‌স্পেক্টার ইতিমধ্যে থানায় ফোন ক'রে অ্যাম্বুলেন্স আনাবার ব্যবস্থা করলেন, তারপর প্রত্যেকটি লোককে ডেকে প্রশ্ন করলেন যে, কেউ কোন লোককে ইতিমধ্যে বাড়িতে ঢুকতে বা বার হতে দেখেছে কিনা। কিন্তু প্রত্যেকেই শপথ ক'রে বলল যে তারা সকলেই প্রাণপণে পাহারা দিয়েছে এবং তাদের সতর্ক চক্ষু এড়িয়ে কোন জীবিত প্রাণী ঢুকতে বা বার হতে পারে নি।

তরুণ ততক্ষণে বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর, কোণ পাতি পাতি ক'রে খুঁজে, প্রত্যেকটি বাক্স, আলমারী উপুড় ক'রে খুঁজেছে কিন্তু একটা বিড়ালের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পায় নি।

শুষ্ক মুখে নেমে এসে ইন্‌স্পেক্টারকে সে প্রশ্ন করল, খোঁজ পেলেন কিছু?

ইন্‌স্পেক্টার ঘাড় নেড়ে বললেন, কিছু না। প্রত্যেকটি লোকই পুরনো এবং বিশ্বাসী। তারা সবাই দিব্যি গেলে বললে যে তারা জেগেই ছিল আর কাউকে ঢুকতেও দেখে নি। আপনিও তো কোন খোঁজ পেলেন না! অথচ লোকটা খুনও যে হয়েছে তাতেও তো কোন ভুল নেই। এখনও রক্ত জমাট বাঁধে নি, দেহ এখনও ভালরকম ঠাণ্ডা হয় নি—কে করলে এ কাজ, সে কি অশরীরী?

তরুণ শেষ প্রশ্নটায় সহসা কেমন যেন চমকে উঠল, তার পর কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ছুটে একবার ঘরের মধ্যে গেল এবং ঠিক এক

মিনিটের মধ্যে ফিরে এল। তার মুখের উপর থেকে সমস্ত বিষাদ তখন চলে গিয়েছে, জয়ের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। সে লাফাতে লাফাতে এসে বলল, বোস মশাই, বোধ হয় ব্যবস্থা হবে। কালীঘাট পোস্ট অফিসে একটা টেলিফোন করুন দেখি; আপনার পরিচয় দিয়ে মাস্টারকে বলুন যেন পোস্ট অফিসের কোন পিওনকে আমরা না যাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে না দেন।

ইন্‌স্পেক্টার বিস্মিত হয়ে বললেন, তার মানে! ব্যাপার কি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

তরুণ অসহিষ্ণু ভাবে বলল, কী জ্বালা! আমাকে কি পাগল ব'লে মনে হচ্ছে আপনার? তা যখন হচ্ছে না তখন ইতস্ততঃ করছেন কেন, যা বলছি তাই করুন না।

অগত্যা ইন্‌স্পেক্টার কালীঘাট পোস্ট অফিসে ফোন করলেন। পোস্টমাস্টার বিস্মিত হ'লেও পুলিসের প্রয়োজন শুনে আর কিছু বললেন না। তাঁকে বলে দেওয়া হ'ল যে কোন লোককে কিছু না বলে শুধু একটা বাজে ওজরে কিছুক্ষণ যেন আটকে রাখেন। মাস্টার তাতেই সম্মতি জানালেন।

তার পর দুজনেই একটা ট্যাক্সি ডেকে চড়ে বসলেন এবং মিনিট-কতকের মধ্যেই কালীঘাট পোস্ট অফিসে উপস্থিত হলেন। অল্প একটু আলাপের পরই তরুণ সহসা প্রশ্ন করল, আজ আপনাদের কোন্ পিওন সব চেয়ে দেরিতে এসেছে জানেন?

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পোস্টমাস্টার তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে বললেন, জানি, ছ'নম্বর বিটের পিওন কালীধন। আমি একটা কাজে চিঠি সর্ট করার জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম, তখনই শুনলুম কালীধন আসে নি। কী হ'ল ভাবছি এমন সময়ে কালী এল, কাজেই কথাটা মনে আছে।

তরুণ প্রশ্ন করল, সাধারণতঃ পিওনরা আসে কটায়?

মাস্টার বললেন, সাড়ে ছটায়।

তরুণ জিজ্ঞেস করল, কালীধন এসেছে কটায়?

মাস্টার একটু ভেবে জবাব দিলেন, বোধ হয় তখন সাড়ে সাতটা কিম্বা সাতটা চল্লিশ হবে—

তরুণ ঘাড় নেড়ে বলল, হুঁ। একবার কালীধনকে ডাকুন তো!

মিনিটখানেকের মধ্যেই কালীধন এল। নিতান্ত ছোক্‌রা, বোধ করি বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স হবে। প্রথমটা সে খুব স্বচ্ছন্দেই এসেছিল কিন্তু মাস্টারের টেবিলের পাশে পুলিসের লোককে বসে থাকতে দেখে মুহূর্তের জন্য যেন তার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। তরুণ তাকে আর সামলে নেবার অবকাশ না দিয়ে প্রশ্ন করল, তুমি রেস খেল?

সহসা এই প্রশ্নে কালীধন বিহ্বল হয়ে গেল, সে খানিকটা আমতা আমতা ক'রে কোনমতে শুধু প্রশ্ন করল, আজ্ঞে?

তরুণ প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বলল, দেখ আমরা পুলিসের লোক, আমাদের সঙ্গে চালাকি ক'র না—ঠিক ঠিক জবাব দাও।

কালীধন এবারে রীতিমত কাবু হ'ল। সে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, আজ্ঞে আমি মাঠে কখনও যাই নি।

—লোকের মারফৎ খেল, এই তো?

কালীধন জবাব দিল, কখনও কখনও, পাঁচ আনা ক'রে।

তরুণ বলল, হুঁ। দেনা কত হয়েছিল? ঠিক ঠিক জবাব দেবে—

কালীধন ভয়ে ভয়ে মাস্টারের দিকে চেয়ে বলল, বেশি নয়, প্রায় দেড়শো টাকা হবে।

তরুণ বলল, তার মধ্যে কাব্‌লের কাছেও কিছু ছিল, না?

কালীধন বলল, আজ্ঞে সেখানেই সব।

তরুণ বলল, যাক্, সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তা বাপু, যে লোকটি তোমার পোশাক ধার চাইতে এসেছিল সে কত টাকা দিলে যে তুমি সরকারী পোশাকটা ছেড়ে দিলে?

সামনে বজ্রপাত হ'লেও বোধ করি কালীধন অত বিস্মিত হত না। সে কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে থেকে বলল, কই, কেউ তো আমার পোশাক ধার নেয় নি!

আবার তরুণ এক ধমক দিল, বলল, ফের মিথ্যে কথা! দেখছ যে তোমার সব কথাই আমরা জানতে পেরেছি তবে আর কেন ঢাকবার চেষ্টা করছ!

কিন্তু তবু কালীধন স্বীকার করে না।

ইন্‌স্পেক্টার এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিলেন যে তরুণ পাগলামি করছে না। তিনি এইবার নিজে কথা বললেন, দেখ ব্যাপার বড় সহজ নয়। খুনের ব্যাপার, যদি ভাল মানুষের মতো সত্যি কথা না বল তাহ'লে ফাঁসীর দড়িটা তোমায়ই গলায় পরতে হবে। এইবার ব্যাপারটা কিছু বুঝলে কি?... বুঝে থাক তো সত্যি কথা বল।

খুনের কথা শুনে কালীধন কাঁপতে লাগল। সে বসে পড়ে বলল, খুন! দোহাই হুজুর, আমি কিচ্ছু জানি না।

তরুণ কঠিন কণ্ঠে বলল, কিছু যে জান না সে কথা হাকিমকে বুঝিও তাহ'লে, এখন আমরা চালান দিই!

কালীধন কেঁদে ফেলে বলল, আমাকে যা জিজ্ঞেস করবেন, ঠিক ঠিক জবাব দেব হুজুর, আমাকে বাঁচান।

তরুণ বলল, তাহ'লে ব্যাপারটা সব খুলে বল দেখি—

কালীধন চোখ মুছে যা বলল, তা সংক্ষেপে এই ঃ রেসের নেশায় দেনা ক'রে পর্যন্ত কালীধনের ভাল ক'রে ঘুম হয় না, কাব্‌লীওয়ালা প্রত্যহ এসে গাল দেয় এবং নালিশ করবে বলে ভয় দেখায়। মাত্র আঠার টাকা মাইনে, তা-ও নালিশ করলে চাকরি থাকবে না। এই যখন অবস্থা, ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না—তখন পরশুদিন একটি লোক রাত্রে এসে এক অদ্ভুত প্রস্তাব জানায়। সেও কেমন ক'রে তার রেস খেলার বৃত্তান্ত জানতে পারে এবং সেই কথাটা শুনিয়ে তার বক্তব্য শুরু করে ঃ

এমন কিছুই নয়, সেইদিন সকালে কালীধন যদি আধ ঘণ্টার জন্য তার পোশাক, পাগ্‌ড়ী ও ব্যাগ তাকে ধার দেয় এবং পরে সে কথা কাকেও না জানায়, তাহ'লে সে লোকটি কালীধনের সমস্ত ঋণ, প্রায় একশো সত্তর টাকা, সব শোধ করে দেবে। প্রথমটা

কালীধন রাজী হয় নি, কিন্তু পরে নগদ টাকাটার লোভ অসম্বরণীয় হওয়ায় শেষ পর্যন্ত হয়েছিল।

সেই কথামতো সেইদিনই সেই অপরিচিত লোকটি এসে হাজির হয় এবং তার পোশাক পরে ব্যাগ ঘাড়ে ক'রে বার হয়ে যায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সে যখন ফেরে তখন কালীধন পোশাকটা পরতে গিয়ে ব্যাগের গায়ে তিন-চার ফোঁটা রক্তের চিহ্ন লক্ষ্য করে এবং সন্দিগ্ধ হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করে। সে লোকটি এই প্রশ্নে কিন্তু অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং খুব রূঢ়ভাষায় তাকে জানায় যে সে মানুষ খুন ক'রেই এসেছে এবং এসব কথা যদি কোন কারণে কালীধন কাকেও জানায় তাহ'লে সে কালীধনকেও খুন ক'রে ফেলবে, কেউ কোনমতেই তা রোধ করতে পারবে না।

তখন আর উপায় কি? দৈবক্রমে সেই মুহূর্তেই সেই কাবুলীওলা এসে উপস্থিত হয় এবং টাকার জন্য জুলুম করে। অগত্যা কালীধন চোখ-কান বুজে লোকটির কাছে থেকে টাকাগুলি নেয় এবং কাবুলীওলার দেনা শোধ ক'রে উর্ধ্বশ্বাসে আফিসের পথে যাত্রা করে। সে লোকটি যে কোথায় থাকে তা কিছুই তার জানা নেই।

তরুণ মনোযোগের সঙ্গে সমস্ত কথা শুনে পোস্টমাস্টারকে বলল, আপনি দয়া ক'রে এই লোকটিকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানেই আট্‌কে রাখবেন, তারপর একে থানায় আট্‌কে রাখবার ব্যবস্থা করব। একে আবার দরকার হবে।

তরুণ বাইরে এসে বলল, এইবার আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে গোবিন্দকে গ্রেপ্তার করুন। গোবিন্দ যে খুনী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গোবিন্দর ভরসা ছিল প্রমাণাভাবে আমরা ওর কিছুই করতে পারব না, পারতুমও না, যদি না এত সহজে কালীধনকে ধরা যেত।

ইন্‌স্পেক্টার বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, কিন্তু কালীধনকে ধরলেন কেমন ক'রে তাই তো আমি এখনও বুঝতে পারছি না!

তরুণ হেসে বলল, আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন যে কোন এক অদৃশ্য শত্রুর হাতে হরবিলাস প্রাণ দিয়েছে। বাড়ির মধ্যে যে কেউ ছিল না, তা আমরা ভাল ক'রে আগেও দেখেছি, পরেও দেখেছি। বাইরে সমস্ত বিশ্বাসী লোক পাহারা ছিল, তারা সকলেই শপথ ক'রে বলছে যে কেউ বাড়ির মধ্যে ঢোকে নি বা বেরোয় নি। তবে? এক ভূতে করতে পারে কিন্তু যেহেতু ভূতের ওপর দোহাই দিলে আপনার চাকরি থাকবে না সেহেতু ও কথাটা বাদই দিন। সুতরাং এমন কেউ করেছে যে অদৃশ্য থেকেই খুন ক'রে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও কথাটাও মানতে রাজী নয়, অতএব একটা কথা স্থির বুঝতে পারলুম যে এমন কোন লোক ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে যাকে ঐ পাহারাওয়ালাদের চোখ দেখলেও মন দেখতে পায় নি!

ইন্‌স্পেক্টার বললেন, সে আবার কি?

তরুণ বলল, ব্যাপারটা খুব সহজ। ধরুন আপনার ভাই-বোনদের মধ্যে কেউ কেউ বিদেশে গেছেন, এমন সময় কোন আত্মীয় বাড়িতে এসে আপনাকে প্রশ্ন করলেন, 'এখানে তোমরা কে কে আছ এখন?' তখন তাকে আপনি কি জবাব দেবেন? আপনি একটু ভেবে

বলবেন, 'আমি আছি, আমার মা আছেন আর ছোট ভাই আছে।' কিন্তু তা ছাড়াও হয়ত তিন-চারজন চাকর আপনার বাড়িতে আছে, তাদের কথা আপনার মনেই পড়বে না। এটা অসত্যভাষণ নয়, কারণ কথাটা ঠিক True Statement না হ'লেও আপনার আত্মীয় যে কথাটা জানতে চেয়েছেন ঠিক ততটুকুই আপনি তাঁকে জানিয়েছেন, এক্ষেত্রে কথার অর্থ হিসেব ক'রে জানান নি। তেমনি এখানেও এমন লোক ঐ পাহারাওয়ালাদের সামনে দিয়ে গিয়েছিল যাকে ওরা লোক ব'লে হিসেবেই ধরে নি।

ইন্‌স্পেক্টার রুদ্ধনিঃশ্বাসে তার কথা শুনছিলেন, এমন ক'রে তিনি কথাটা তো কখনও ভেবে দেখেন নি! তিনি বললেন, তারপর?

তরুণ বলল, সুতরাং আমি ভাবতে লাগলুম যে কে এমন লোক হতে পারে? তখনই আমার প্রথমে মনে হ'ল পিওনের কথা। পিওন চিঠি দিতে আসবে, এটা এমন স্বাভাবিক ব্যাপার যে কোন পাহারাওয়ালারই সে কথাটা মনে এল না।... সেই অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রেই আমি আপনাকে কালীঘাট পোস্ট-অফিসে খোঁজ করতে বলি।

ইন্‌স্পেক্টার বললেন, কিন্তু ওর রেস খেলার খবরটা কি ক'রে জানলেন?

তরুণ হেসে জবাব দিল, সেটা আন্দাজে ঢিল মারা। জানতুম যদি লেগে যায় তো ওকে চেপে ধরা সহজ হবে, আর হ'লও তাই।

নবম পরিচ্ছেদ

তরুণ গুপ্তের পয়সার খুব বেশি অভাব ছিল না। সে গোয়েন্দাগিরি করতে শুরু করে কতকটা শখ করেই। কিন্তু অদৃষ্ট প্রসন্ন ছিল বলেই বোধ হয় সে অর্থও যথেষ্ট উপার্জন করেছিল।

শুধু তাই নয়, বহু ক্ষেত্রে তাকে সরকারী গোয়েন্দাদেরও সাহায্য করতে হত। ফলে বহু খুনী বদমাইশ তারই সাক্ষ্যের জোরে জেলে যেত কিংবা ফাঁসীকাঠে উঠত। তরুণের উপর এদের ক্রোধের সীমা ছিল না। তারা স্পষ্টই বলত, 'ঐ লোকটা না থাকলে পুলিসের সাধ্য কি যে আমাদের ধরে!' কেউ কেউ বলত, 'আচ্ছা, জেল থেকে বেরুই তারপর দেখে নেব, কত বড় গোয়েন্দা ও! ওকে যদি জব্দ ক'রে দিতে না পারি তাহ'লে আমার নামই অমুক নয়—' ইত্যাদি।

তরুণ এসব প্রশ্নের উত্তরে মুখ টিপে হাসত মাত্র। কারণ অধিকাংশ সময়ই দীর্ঘদিন কারাবাসের ফলে এ উত্তাপের কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। থাকলেও তরুণের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হত না, কারণ সে খুবই সতর্ক থাকত। কিন্তু তবুও কেউ কেউ তাকে জব্দ করবার চেষ্টা করেছিল বৈকি। এমনিই একজনের কথা আজ বলব।

সেও পুলিসের ব্যাপার। বড়কর্তা চুপি চুপি তরুণকে ডেকে খাস-কামরায় বসিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললেন। রায় বাহাদুর হরিসাধন বসু বিখ্যাত ব্যক্তি, অতি সামান্য অবস্থা

থেকে তিনি আজ অ্যাসেমব্লীর মেম্বার হয়েছেন। এম. এ. পাস ক'রে যখন তিনি বেকার হয়ে বেড়াচ্ছিলেন সেই সময় এক অতিশয় ধনী জমিদারের অত্যন্ত কুৎসিত কন্যাকে বিবাহ করেন এবং শ্বশুর-দত্ত অর্থে ব্যবসায় ফেঁদে বেশ নাম করেন। সম্প্রতি প্রায় বৎসর-খানেক পূর্বে তাঁর সেই শ্বশুর মারা গিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না, তাই শ্বশুরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের স্ত্রীও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। পুত্র-কন্যা কিছুই হয় নি, সংসারে তাঁর আর কোন অবলম্বন নেই বলে সম্প্রতি তিনি পুনরায় বিবাহ করবার সংকল্প করেছেন।

এই ইতিহাসটুকু বিবৃত করে বড়কর্তা চুপ করলেন।

তরুণ প্রশ্ন করল, তারপর?

বড়কর্তা বললেন, এই বিয়েটাই আমার কাছে কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকছে!

তরুণ বিস্মিত হয়ে বলল, কেন? স্ত্রী মারা গেছে, ছেলেপুলে নেই, এমন কিছু বয়সও হয় নি, সে লোক আবার বিয়ে করবে এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

বড়কর্তা বললেন, আশ্চর্য হবার বিশেষ কিছুই নেই, তবু মনটা একটু যেন কেমন সন্দিগ্ধ হচ্ছে। বিয়ে করছেন উনি আবার নিজের শালীকে।

তরুণ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, ওঁর শ্বশুরের ক'টি মেয়ে?

বড়কর্তা জবাব দিলেন, দুটি। তিনি উইল ক'রে সমস্ত বিষয় ঐ দু'টি মেয়েকেই দিয়ে গেছেন এবং ছোট মেয়েটিরও দেখাশোনার ভার দিয়ে গেছেন জামাইয়ের ওপরই। বড় মেয়েটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেক বিষয় ওঁর হাতে এসে পড়ল, বাকী অর্ধেকও ছোট মেয়েকে বিয়ে করলেই হরিসাধনবাবুর করতলগত হবে।

তরুণ জিজ্ঞেস করল, ছোটটির বয়স কত?

বড়কর্তা বললেন, উনিশ। আর হরিসাধনবাবুর বয়স ছেচল্লিশ।... মুশকিল হয়েছে সেইখানেই, ব্যাপারটা এমন কিছু বিসদৃশ নয়, শালীকে বিয়ে করাও খুব স্বাভাবিক এবং ওঁরও বিয়ের বয়স একেবারে চলে যায় নি। মেয়েটিও খুব ছোট নয়!

তরুণ প্রশ্ন করল, কিন্তু মেয়েটির সম্মতি নেওয়া হয়েছে কি?

বড়কর্তা বললেন, কি ক'রে জানব তা? হরিসাধনবাবুই ললিতার একমাত্র অভিভাবক।

তরুণ বলল, এখন আমায় কি করতে বলেন?

তিনি জবাব দিলেন, এ ব্যাপারটা নিয়ে আমরা সরকারীভাবে কিছুই করতে পারি না। কিছুই না, এমন কি বেসরকারীভাবেও খোঁজখবর করা নিরাপদ নয়। হরিসাধনবাবু এতই উঁচুতে আছেন যে যদি তিনি একথা জানতে পারেন তো অনায়াসে আমার চাকরির মাথা খেতে পারবেন। অথচ এধারেও একটা বিপদ আছে, আমার সন্দেহ তো বরাবরই ছিল, আজ সকালে আবার এক উড়োচিঠি পেয়েছি। নামঠিকানা কিছুই নেই, ইংরেজীতে টাইপ করা চিঠি, তাতে শুধু লেখা আছে, "ললিতা ঘোষের সঙ্গে হরিসাধন বসুর বিয়ে হওয়া মানে ললিতার অকাল-মৃত্যু"—এই দেখ সে চিঠি—

এই বলে তিনি একখানা কাগজ তরুণের সামনে ফেলে দিলেন। তরুণ চিঠিখানা হাতে

ক'রে তুলে একবার চোখ বুলিয়েই ফিরিয়ে দিল। তারপর মুখ টিপে হেসে বলল, ওঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে দিন কুড়ি আগে হরিসাধনবাবু জবাব দিয়েছেন, খুব সম্ভব এ তারই কীর্ত্তি।

বড়কর্তা বললেন, আমারও তাই বিশ্বাস, কিন্তু তুমি এ খবর জানলে কি ক'রে?

তরুণ একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলল, সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন খবরের কাগজে ওঁর পুনর্ব্বিবাহের খবরটা শুনে আমারও কেমন কথাটা ভাল লাগে নি। বড্ড তাড়াতাড়ি নয় কি ব্যাপারটা? বিশেষ ক'রে ওঁর ওপরই যখন সে মেয়েটির ভার দেওয়া হয়েছে তখন চক্ষুলজ্জার খাতিরেও অন্ততঃ ললিতাকে বিয়ে করা ওঁর উচিত নয়। সেই জন্যই একটু খোঁজখবর নিচ্ছিলুম!

বড়কর্তা সাগ্রহে বলেন, তাহ'লে তো খুব ভালই হ'ল। তুমিই বাবা একটু খবর নাও—খুব গোপনে অবশ্য, যদি ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে আনা যায় এমন কোন সন্ধান পাও, তাহ'লে আমাকে জানিও, আমি সেই মুহূর্তে চেপে ধরব। তবে এ ব্যাপারে তোমার আর্থিক লাভ হয়ত কিছুই হবে না, সে কথা আগে থাকতেই ব'লে দিচ্ছি।

তরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, টাকাটাই তো সব নয়। মানুষের কৃতিত্বেরও তো কিছু মূল্য আছে।

বড়কর্তা তরুণের সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এসে বললেন, তা ছাড়া যদি সত্যিই ও চিঠির কোন মূল্য থাকে তাহ'লে একটা নিরীহ মেয়ের প্রাণরক্ষা করাও হবে।

তরুণ সেখান থেকে বেরিয়ে চিন্তিতমুখে বাড়ি ফিরল। ব্যাপারটা বড় সহজ নয়। পুলিসের লোকেরা যে তদন্ত করতে ভয় পায় সে তদন্ত তার মতো লোকের পক্ষে করাও কম বিপদের কথা নয়। হরিসাধনবাবু রীতিমতো প্রতিষ্ঠাবান লোক, যে কোন মুহূর্তে তিনি তার মতো লোককে বিব্রত করতে পারেন। সুতরাং যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে তদন্ত শুরু করা প্রয়োজন।

সে আহারাদি শেষ ক'রে খানিকটা বিশ্রাম ক'রে নিল, তারপর সন্ধ্যার কিছু আগে আলিপুরের দিকে যাত্রা করল।

ডায়মণ্ডহারবার রোডের উপর প্রকাণ্ড একটা বাগানবাড়ি হরিসাধনবাবু সম্প্রতি কিনেছেন, সেইখানেই তিনি থাকেন। ভবানীপুরের বাড়ি ভাড়া খাটে। এ-সব কথাই তরুণ জানত এবং সেই জন্যই একটু সন্ধ্যার ঝোঁকে হরিসাধনবাবুর বাড়ি যাত্রা করল।

ট্রাম থেকে নেমে খানিকটা হেঁটে তরুণ যখন বসুভবনে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হতে বড় বেশি বিলম্ব নেই।—গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তবুও খানিকটা ইতস্ততঃ করে তরুণ একসময়ে ফটকের মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়ল।

দেউড়ীতে একটি হিন্দুস্থানী দারোয়ান ছিল, সে তরুণকে দেখে ভ্রূকুটি ক'রে প্রশ্ন করল, আপ্‌নে কাকে চান মোশা?

তরুণ গম্ভীর মুখে বলল, রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সে লোকটা মাথা নেড়ে জবাব দিল, সে হোবে না।

তরুণ আরও দু-এক পা অগ্রসর হয়ে বলল, সে কথা থাক্ বাপু, তিনি আছেন কি বাড়িতে?

—আছেন।

—বেশ। তাহ'লে আস্তে আস্তে গিয়ে খবর দাও যে পুলিস আফিস থেকে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। আমি পুলিসের লোক, বুঝেছ? দেরি ক'র না।

নাটকীয়ভাবে এই কথাগুলো বলে তরুণ ভ্রূকুটি ক'রে রইল। সে লোকটিও 'পুলিসে'র নাম শুনে আর উচ্চবাচ্য করল না, তৎক্ষণাৎ ভিতরে চলে গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এসে সংবাদ দিল, হুজুর বাইরের ঘরে আছেন। সিধা দুতালায় চলিয়ে যান—

সম্মুখের বিস্তৃত বাগান অতিক্রম করতে সময় লাগে। কিন্তু তরুণের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় যেন সে ইচ্ছা করেই আরও বেশি বিলম্ব করছে। প্রত্যেকটি ফুলগাছ, প্রত্যেকটি প্রস্তরমূর্তি ও ফোয়ারার কাছে থেমে থেমে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল। এমন কি পিছনে যে দারোয়ান বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এ কথা জেনেও সে কিছুমাত্র বিচলিত হ'ল না।

অবশেষে একসময় বাগানও শেষ হ'ল। কিন্তু শেষপ্রান্তে এসে তাকে থমকিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। ঠিক গাড়িবারান্দার সামনে একটা পাথরের বেঞ্চিতে একটি মেয়ে চুপ ক'রে বসে আছে। বয়স বোধ করি আঠার-উনিশ হবে, সুশ্রী গঠন এবং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দেখবামাত্র তরুণ চিনতে পারল এই মেয়েটি ললিতা।

সে কাছে আসতেও ললিতা মুখ তুলে চাইল না, সে একদৃষ্টে এক 'পাম্' গাছের টবের দিকে চেয়ে বসে ছিল, তেমনি স্থির হয়ে বসে রইল। তার মুখের ভাব অত্যন্ত বিষণ্ণ, এমন কি শোকার্তও বলা চলে।

তরুণ মিনিটখানেক ইতস্ততঃ করে বলল, দেখুন রায়বাহাদুর কোথায় আছেন বলতে পারেন?

ললিতা শ্রান্ত চক্ষু তুলে তার দিকে চেয়ে বোধ করি একটু বিস্মিত হ'ল, বলল, ঐ যে ওপরে!

কিন্তু যে লোকটি খবর জানতে চাইল তার উপরে যাবার কোন ইচ্ছাই দেখা গেল না। বরং কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে সহসা জিজ্ঞেস করল, আপনাদের বিয়েটা কবে স্থির হয়েছে জানতে পারি কি?

ললিতা চমকে মুখ তুলে চাইল, এই অদ্ভুত প্রশ্নের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকটির কি সম্পর্ক তা বুঝতে না পেরে বিস্মিত দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে রইল।

তরুণ ফিস্‌ফিস্ করে বলল, বলুন, বলুন, দাঁড়াবার সময় নেই!

হয়ত ললিতার বলবার ইচ্ছে ছিল না, তবু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, এই মাসের সতেরোই।

আজ দশই অর্থাৎ আর মাত্র সাতটি দিন আছে!

কিন্তু অন্য কোন কথা বলার অবসর হ'ল না, তার আগেই পিছন থেকে অত্যন্ত রূঢ়কণ্ঠে কে প্রশ্ন করল, কি চাই আপনার?

উপর থেকে হরিসাধনবাবু কখন নিঃশব্দে নেমে এসেছেন তা ললিতাও লক্ষ্য করে নি, সহসা তাঁকে দেখে সে যেন ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে উঠল। তরুণও ফিরে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের হিংস্র ভাব লক্ষ্য ক'রে একটু আশ্চর্য হ'ল, তবে তার মুখের প্রশান্ত ভাব নষ্ট হ'ল না। বরং বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই অগ্রসর হয়ে নমস্কার ক'রে বলল, নমস্কার, আপনিই কি রায়বাহাদুর?

রায়বাহাদুর ভেঙিয়ে উত্তর দিলেন, আপনিই কি রায়বাহাদুর! দরকার আমার সঙ্গে তো ওখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছিল? ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা কইতে লজ্জা করে না?

তরুণ বুঝল যে ললিতার সঙ্গে তাকে কথা বলতে দেখে রায়বাহাদুর ভীত হয়েছেন। বুঝে সে মনে মনে একটু হাসল কিন্তু মুখে অপরাধ স্বীকার ক'রে নিয়ে বলল, আজ্ঞে আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

রায়বাহাদুরের তবুও রাগ পড়ল না, তিনি আগেকার মতোই রুক্ষস্বরে বললেন, কি চাই?

তরুণ বিনীতভাবেই বলল, দেখুন আমি সি-আই-ডি* অফিস থেকে আসছি—

মুহূর্তকালের জন্য যেন হরিসাধনবাবুর মুখে একটা পাণ্ডুর ছায়া পড়ল। কিন্তু তখনই আবার নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, বেশ তো, কি দরকার সেইটে চট্‌পট্‌ ব'লে বিদেয় হোন।

এই স্পষ্ট অভদ্রতাতে তরুণ মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হ'লেও বাইরে বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ল না। সে পিছন ফিরে চেয়ে দেখল ললিতা ইতিমধ্যেই উঠে ভিতরে চলে গেছে, তখন সে আর ভূমিকা না ক'রে আসল কথাটাই বলে ফেলল। বলল, দেখুন দু'দিন আগে আমাদের অফিসে একটা বেনামি চিঠি এসেছে, তাতে আপনার নামে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। পত্রপ্রেরকের বক্তব্য হচ্ছে যে আপনি আপনার প্রথমা স্ত্রীকে তাঁর বিষয়ের লোভে হত্যা করেছেন এবং আপনার শ্যালিকা সম্বন্ধেও সেই রকম একটা অভিপ্রায় আছে!

এই সুস্পষ্ট অভিযোগের আঘাতটা যেন এতক্ষণে রায়বাহাদুরকে লাগল। তিনি বোধ হয় এতটা আশা করেন নি। বিবর্ণ মুখে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টা করতে করতে অত্যন্ত জোর ক'রে হাসতে লাগলেন, তারপর অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বললেন, চলুন ঐ বেঞ্চিটাতেই বসি—আমার আবার বাত আছে, বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারি না।

কিছুক্ষণ পূর্বে ললিতা যে বেঞ্চিখানাতে বসেছিল সেইটিতেই দুজনে বসলেন, তারপর রায় বাহাদুর প্রশ্ন করলেন, এই সব উড়ো চিঠিও আপনারা বিশ্বাস করেন? আশ্চর্য!

* পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগ

তরুণ প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের স্বরে বলল, আপনি ভুলে যাচ্ছেন রায়বাহাদুর যে চিঠিটা বিশ্বাস করলে আপনি এতক্ষণ এখানে বসে আমার সঙ্গে কথা কইতেন না, এতক্ষণে আপনাকে হাজতে থাকতে হ'ত!

রায়বাহাদুর 'হাজত' শব্দটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে একবার শিউরে উঠলেন এবং তা তরুণের অজ্ঞাত রইল না। তবু প্রাণপণ চেষ্টায় কণ্ঠস্বর অবিচলিত রেখে রায়বাহাদুর প্রশ্ন করলেন, তাহ'লে আপনার এখানে আসবার উদ্দেশ্য?

তরুণ বলল, এই সব চিঠির কথা আমরা বিশ্বাস করি না বটে কিন্তু এর অভিযোগ এতই গুরুতর যে অন্ততঃ একটা মৌখিক তদন্ত করতে আমরা বাধ্য। তাই আপনার কাছ থেকে আপনার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ এবং ইতিহাসটা একটু জেনে নিতে চাই।

হরিসাধনবাবু কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে বললেন, আমার স্ত্রীর শরীরটা কিছুদিন ধরেই ভাল যাচ্ছিল না, সেই জন্য ডাক্তাররা হাওয়া বদল করবার পরামর্শ দেন, বিশেষ ক'রে সমুদ্রের হাওয়া লাগাতে পারলেই ভাল হবে এই কথাই তাঁরা বার বার বলেন। সেই কথামতো আমরা সমুদ্র-যাত্রাই স্থির করি। ঠিক সেই সময় একটা জাপানী জাহাজ-কোম্পানী এখান থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত একটা Conducted Tour-এর বিজ্ঞাপন করছিল। আমার স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে আমি সেই কোম্পানীরই দুখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কিনে একটা স্টেট্রুম রিজার্ভ করি। যাত্রার দিন তাঁর শরীর ভালই ছিল এবং তিনি খুব প্রফুল্ল ছিলেন। ভোরবেলা জাহাজ ছাড়বার কথা, রাত্রি এগারটার মধ্যে জাহাজে গিয়ে শুয়ে থাকতে হবে ওরা জানিয়ে রেখেছিল। বাবুঘাট থেকে জাহাজ ছাড়বে—এইখান থেকে এইটুকু, রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পর গিয়ে শুধু শুয়ে থাকব, সুতরাং কোন দুর্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু রাত্রি আটটার পর থেকে সেইদিনই খুব ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তাতেই একটু যা বিব্রত হতে হয়েছিল। যাই হোক, সেই বৃষ্টির মধ্যেই আমরা পৌনে এগারটার সময় কোনমতে গিয়ে জাহাজে উঠলুম, ওঁকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আমি একবার মালপত্রগুলো তদারক করতে গিয়েছিলুম; বোধ হয় মিনিট পনের আমার লেগেছিল কিংবা আরও কম, তারপরই ফিরে গিয়ে দেখি ঘর খালি, আমার স্ত্রী নেই। প্রথমে ভাবলুম বোধ হয় বাথরুমে গেছেন, কারণ তাঁর জামা, স্কার্ফ সব পড়ে রয়েছে, শাড়ি আট্কানোর হীরের ব্রুচ, মুক্তোর কণ্ঠিটি পর্যন্ত টেবিলের ওপর খোলা পড়ে আছে, মানে শুতে যাবারই যে উদ্যোগ করছিলেন তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও যখন সাড়া পাওয়া গেল না তখন বাথরুমের দোরে গিয়ে টোকা দিলুম। কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন দোরটা খোলবার চেষ্টা করতেই খুলে গেল। এইবার ভয় পেয়ে বাইরে এসে যতটা সম্ভব খোঁজাখুঁজি করলুম কিন্তু সেই দুর্যোগে বাইরেই বা থাকবে কোথায়? তখন স্কীপারকে খবর দিলুম। জাহাজসুদ্ধ পাতি পাতি ক'রে খোঁজা হ'ল, সারারাত ধরে বৃথা চেষ্টা করবার পর ভোরবেলা গঙ্গাতে ডুবুরি নামানো হ'ল। কিন্তু কিছুতেই কোন খবর পাওয়া গেল না।

এই পর্যন্ত বলে রায়বাহাদুর একবার কোঁচার খুঁটে চোখটা মুছে নিলেন। তরুণ একান্ত মনোযোগের সঙ্গে এই কাহিনী শুনছিল, সে বলল, তারপর?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হরিসাধন জবাব দিলেন, আর তারপর! পুলিস আর জাহাজের লোকেরা অ্যাক্সিডেণ্ট ব'লেই স্থির করলে। কিন্তু আমি তো ভেবেই পাই না, কেন তিনি ঐ বৃষ্টিতে রেনকোট পর্যন্ত না নিয়ে রেলিং-এর ধারে দাঁড়াতে যাবেন! অথচ তা না হ'লেই বা গঙ্গায় পড়বেন কেন? সত্যি-সত্যিই তো আর উবে যাওয়া সম্ভব নয়!

তরুণ বলল, আচ্ছা, আত্মহত্যা ব'লেই কি আপনার কোন সন্দেহ হয়?

প্রবলবেগে ঘাড় নেড়ে রায়বাহাদুর বললেন, একদম না। আপনি জানেন না আমাদের বিবাহিত জীবন কি সুখের ছিল!... এ অন্তর্ধান আমার কাছে রহস্যময় হয়েই রইল, আমি মনে মনে এর কোন কারণই খুঁজে পাই না।

তরুণ মুহূর্ত-কয়েক স্থির থেকে খুব আস্তে একবার প্রশ্ন করল, আপনার বর্তমান বিবাহটা কি একটু অশোভন হচ্ছে না!

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই ধৃষ্টতায় রায়বাহাদুর মোটেই চটে উঠলেন না, বরং একপ্রকার ম্লান হাসি হেসে বললেন, সে কথা আমার চেয়ে বেশি কে-ই বা জানে! কিন্তু উপায় নেই। শ্বশুরমশায় মরবার আগে আমাকে হাতে ধরে বলে গেছেন, "বাবা, ললিতাকে তুমি দেখেশুনে একটি সৎপাত্রে দিও। তবে একটা কথা, উমার শরীর যে রকম দেখছি বেশিদিন যে বাঁচে এমন মনে হয় না। যদি ললিতার বিয়ের আগেই উমার ভালমন্দ কিছু ঘটে তো ললিতাকে তুমিই বিয়ে ক'রো, এই আমার শেষ অনুরোধ রইল।"... তিনি আমার শ্বশুর ছিলেন না, বাপের মতো ছিলেন, তাঁর এ অন্তিম আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে, তা লোকের চোখে যতই অশোভন হোক বা আমার পক্ষে যতই কষ্টকর হোক।

ততক্ষণে তরুণ উঠে দাঁড়িয়েছে। নমস্কার ইত্যাদি বিনিময়ের পর ফেরবার জন্য পা বাড়িয়ে সহসা সে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, চিঠিটা কে লিখেছে ব'লে আপনার মনে হয়?

রায়বাহাদুর জবাব দিলেন, কার নাম করি বলুন! তবে এক বেটা পাজী সোফেয়ারকে আজ দিনকতক হ'ল জবাব দিয়েছি, সে-ই হয়ত এই কীর্তি করেছে। ব্যাটা তেল চুরি করেছিল ব'লে অপমান ক'রে বিদেয় দিয়েছি।

তরুণ অকস্মাৎ খুশী হয়ে বলল, এ তাহ'লে তারই কাজ! মনে করলে যে আপনাকে ভারী জব্দ করবে! যাক— কিছু মনে করবেন না, মিছিমিছি আপনাকে বিরক্ত করলাম।

হরিসাধনবাবু মিষ্টকণ্ঠে বললেন, না না, মনে করব কেন! ভালই হ'ল আপনাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল—! আচ্ছা নমস্কার।

তরুণ ফেরবার পথেও যতটা সম্ভব দেরি করে ফিরল, বাগানের প্রত্যেকটি গাছপালা নিরীক্ষণ করতে করতে এবং বোর্ডের গায়ে নিষেধ লেখা থাকা সত্ত্বেও ফুল তুলতে তুলতে এক সময়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু যেজন্য তার এই দেরি ক'রে আসা—ললিতাকে আর কিছুতেই দেখতে পেল না। বরং একেবারে ফটক দিয়ে বের হবার সময়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল উপরের দোতলা ঘর থেকে হরিসাধন স্থির-দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছেন।

বের হ'ল বটে কিন্তু তরুণ তখনই ফিরে গেল না। সে খানিকটা দূর গিয়েই পাশের

একটা ছোট রাস্তায় নেমে পড়ল এবং রায়বাহাদুরের বিপুল উদ্যানটির চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

বাগানের পিছনদিকেও একটি মাঝারি গোছের রাস্তা ছিল, রাস্তাটি পাকা হ'লেও অত্যন্ত নির্জন, গোরুরগাড়ি ছাড়া আর বিশেষ কোন যানবাহন বা মানুষ যায় না। সেই রাস্তায় এসে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তভাবে সে বাগানটা দেখতে লাগল। সেই রাস্তারই উপর একটি খিড়কীর দোর আছে—বড় ফটক দুটি এবং বেশ চওড়া বাঁধানো ক্যালভার্ট, কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হয় যে বহুকাল এ দ্বার ব্যবহৃত হয় নি। দুটি শিকওয়ালা লৌহকপাটের মধ্যে মোটা ভারী একটা শিকল দিয়ে তালা লাগানো হয়েছে। হয়ত এমনিই সে-দুটি দেখে সে চলে যেত কিন্তু সহসা তার চোখে পড়ল যে তালাটি নতুন! এখনও তার পালিশ উঠে যায় নি।

সে বিস্মিত হয়ে কাছে এসে তালাটি নেড়েচেড়ে দেখল, শিকলটি নিয়ে খানিকটা টানাটানি করল, তার পর আরও একটি অদ্ভুত কাজ করল। হাঁটুগেড়ে মাটির উপরেই বসে পড়ে দুই ফটকের মধ্যবর্তী পথ, দুই পাশের প্রাচীর-প্রান্ত লেন্সের সাহায্যে পরীক্ষা করতে লাগল। তার পর সেখান থেকে উঠে বড় রাস্তায় পড়তেই প্রথম যার সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল, আর যাই হোক, তাকে দেখবার জন্য তরুণ প্রস্তুত ছিল না। সে হ'ল গোবিন্দ—কিছুদিন, বোধ হয় মাত্র বছরখানেক আগে হত্যার অপরাধে তরুণই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল এবং বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। গোবিন্দ কখন নিঃশব্দে রাস্তায় এসে তার দিকে কুটিল দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তরুণ তার চোখের দিকে চেয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই একবার শিউরে উঠল, তারপর নিজের পকেটে হাত দিয়ে পিস্তলটা অনুভব করে নিল।

গোবিন্দই প্রথম কথা বলল, কী গো বাবু, চিনতে পারেন?

তরুণ বলল, পারি। কিন্তু তুমি এখানে এলে কি ক'রে?

গোবিন্দ ক্রূর হাসি হেসে বলল, ভাবছেন পালিয়ে এসেছি কিনা! নইলে বেরিয়ে এলুম কি ক'রে, এই তো?

ততক্ষণে তরুণ নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে ঘাড় নেড়ে বলল, তাই তাই!

বিদ্রূপের সুরে গোবিন্দ বলল, তা বেশ তো, পুলিস ডাকুন না, আমি দাঁড়িয়ে আছি।

তরুণ স্থির নেত্রে তার দিকে চেয়ে বলল, পুলিসে তোমাকে দেবার আমার বিন্দুমাত্র তাড়া নেই। তুমি তো আমার কোন অনিষ্ট কর নি। একটা লোক তাকে রক্ষা করবার জন্য আমাকে পয়সা দিয়েছিল, তুমি সেই লোককে খুন করেছ, সুতরাং আমার কর্তব্য ছিল তোমাকে ধরিয়ে দেওয়া। তাই দিয়েছি। এখন তোমাকে জেলে ধরে রাখা সরকারের দায়িত্ব, সে ভার তাঁদের। তাঁরা ধরে রাখতে পারেন ভালই, না পারেন সে তাঁদের কলঙ্ক। তোমার ওপর আমার তো কোন ব্যক্তিগত রাগ নেই।

গোবিন্দ বিদ্রূপের সুরে বলল, যে লোকটাকে আমি খুন করেছি সে আমার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিল তা আপনি জানতেন? তৎসত্ত্বেও আমাকে ধরিয়ে দিয়েছেন—এর শোধও আমি নেব। আমাকে তো চেনেন!

Indra
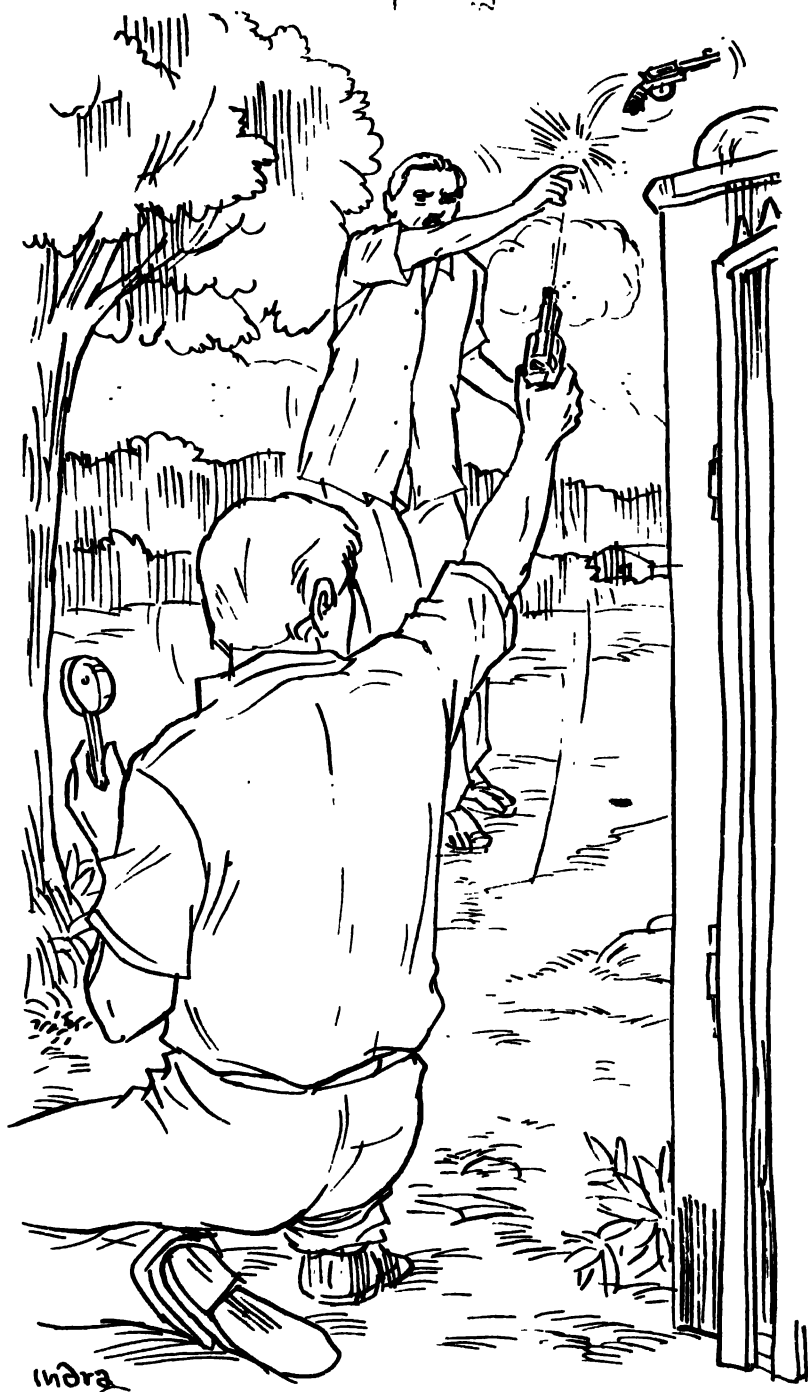
তরুণ বলল, চিনি। একবার ভুল করেছিলুম ব'লে কি আর করব! এবার থেকে সাবধানেই থাকব, কিন্তু শোধটা নেবে কখন?

গোবিন্দ দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিল, এখন! এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডান হাতে একটা কি মুঠো ক'রে ধরে হাতটা তুলতে গেল, কিন্তু তরুণ সত্যিই এবারে আর তাকে চিনতে ভুল করে নি। গোবিন্দ বিদ্যুৎ-বেগেই হাত তুলে তাকে লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু তার চেয়েও দ্রুত পিস্তল বার ক'রে তরুণ তার হাতের দিকে গুলি ছুঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ যন্ত্রণাসূচক অব্যক্ত একটা শব্দ ক'রে উঠে পিস্তলটা ছেড়ে দিল। গুলি তার হাতে লাগে নি, হাতের পাশ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু তাতেই তার হাত কেটে ঝরঝর ক'রে রক্ত ঝরে পড়ছিল। বাঁ হাতে সেই হাতটা চেপে ধরে সাপের মতো হিংস্রদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে গোবিন্দ বলল, প্রথমটা রাগ সামলাতে পারি নি তাই তোমাকে মারতে চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু সেটাই মস্ত ভুল হ'ত। মৃত্যুতে আর তোমার শাস্তি কি হ'ত! তার চেয়েও ভীষণ শাস্তি তোমাকে দেব—সে এমন কঠিন শাস্তি যে মাথা খারাপ হয়ে যাবে, নিজেই সে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করবে।

সাপেরই মতো একটা হিস্‌হিসে শব্দে এই কথাগুলো বলে অকস্মাৎ গোবিন্দ দৌড় মারল, পাশের একটা মাঠ ভেঙে মুহূর্তমধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল। তরুণ তাকে ধরবার চেষ্টা মাত্র করল না, শুধু তার পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে ফেলল।

অতএব এখন থেকে তাকে একটু বিশেষ ক'রে সাবধান হয়ে চলতে হবে—এই মাত্র!

তরুণ ডায়মণ্ডহারবার রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দু দিকের ফুটপাথের উপর প্রত্যেকটি দোকান লক্ষ্য করছিল। প্রায় মিনিট দশেক চলবার পরই সে যা খুঁজছিল তাই নজরে পড়ল। ডানদিকে একটা ছোট্ট চুন-বালি-সুরকির দোকান, তারই মধ্যে রঙেরও ব্যবস্থা আছে।

দোকানে তখন একমাত্র মালিকই বসে ছিলেন, তরুণকে খরিদ্দার মনে ক'রে খুব সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। তরুণ বসে এটা-ওটা নানা কথার পর সহসা প্রশ্ন করল, আচ্ছা আপনারা আমাকে একটু বালি-সিমেণ্ট মেশানোর ব্যাপারটা শিখিয়ে দিতে পারেন? মানে তাহ'লে ছোটখাটো মেরামত-টেরামতগুলোর জন্যে আর মিস্ত্রীকে পয়সা দিই না!

দোকানের মালিক মৃদু হেসে বললেন, বিলক্ষণ! তা আর পারি না! এতদিন এ কাজ করছি কি জন্যে?

তারপর একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললেন, আপনারা সবাই এই কাজ শিখতে আরম্ভ করলেন, মিস্ত্রী বেচারীরা যায় কোথায়!

ঠিক এই কথাটারই জন্যে তরুণ অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সে মনের ভাব চেপে নিস্পৃহভাবেই প্রশ্ন করল, সবাই মানে?

তিনি বললেন, কত বড় বড় লোক পর্যন্ত! এই দেখুন না, সেদিন ঐ রায়বাহাদুর হরিসাধনবাবু চারটি বালি আর সিমেণ্ট কেনবার জন্য এসেছিলেন, তিনিও ঐ কথাই জিজ্ঞেস করছিলেন। কতটা বালির সঙ্গে কতটা সিমেণ্ট মিশোতে হয়, কতটা জল দিতে হয় এই সব জিজ্ঞেস করছিলেন। এমন কি একটা কর্ণিকসুদ্ধ চেয়ে নিয়ে গেলেন।

তরুণ ঈষৎ হেসে বলল, ওঁদের ওটা এমনিই কৌতূহল, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন।

তার পর আরও দু-একটি খুচরো কথাবার্তা বলে তরুণ উঠে পড়ল। বলল, বাড়ি মেরামত শুরু করব এই মাসেই, তখন আসব এখন।

সেদিনই গভীর রাত্রে তরুণ আর একবার আলিপুর গেল। তার পরের দিন আবার। কি কাজে সে যায়, কি খোঁজখবর নেয় তা কেউই জানে না। তৃতীয় দিনে বড়কর্তা তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি হে! আর যে মোটে বিয়ের চার-পাঁচদিন বাকী!

তরুণ মুখ টিপে হেসে বলল, ওর মধ্যেই হয়ে যাবে।... ভাগ্যিস অসদুপায়ে অনেক টাকা জমিয়েছিলুম, তাই কাজটা সহজে হাসিল হয়ে গেল।

বড়কর্তা বিস্মিত হয়ে বললেন, তার মানে?

তরুণ জবাব দিল, বলব এখন!

* * * *

গোবিন্দ রাত্রি বারোটার সময় তার বন্ধু শঙ্করের সঙ্গে একটা ব্যাগ হাতে ক'রে খিদিরপুরের এক সঙ্কীর্ণ গলি দিয়ে বেরিয়ে এল। শঙ্কর একবার সভয়ে চারিদিক চেয়ে নিয়ে চাদরটা ভাল ক'রে গায়ে টেনে দিল। তারপর চুপিচুপি প্রশ্ন করল, ঠিক জান তো, না কি গিয়ে দেখব সব ফক্কিকার!

গোবিন্দ দৃঢ়স্বরে বলল, কখ্‌খনো না। আমি ক'দিন তার পেছনে পেছনে ঘুরেছি। আমি আগেই শুনেছিলুম যে আমাদের রক্তে ও লাখ্ লাখ্ টাকা জমিয়েছে, আর সে টাকা কোথায় লুকিয়ে পুঁতে রাখে! ভয়ানক কৃপণ, বিশ্বাস ক'রে ব্যাঙ্কে রাখতে পারে না।... আলিপুরে রায়বাহাদুর হরিসাধন বোসের বাড়ির পিছনদিকে বাগানের ধারে পুরনোকালের একটা ঘর আছে, আগে বোধ হয় মালীটালী থাকত, ঐ ঘরে এখন কেউ থাকে না, দোরজানলা ভেঙে 'হানা' হয়ে পড়ে আছে। সেইখানে ও রোজ কেন যায় বাপু! তাও রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে!

শঙ্কর সংশয়ের সুরে বলল, কিন্তু পরের বাড়িতে টাকা পুঁতে রাখে?

গোবিন্দ বলল, পাগল! নিজের বাড়িতে রাখলে কি এতদিন থাকত! কবে পাচার হয়ে যেত!

উভয়ে নিঃশব্দে পথ চলতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে মনে হ'ল যেন কে পিছনে আসছে, শঙ্কর সভয়ে চেয়ে দেখল কিন্তু কাকেও দেখা গেল না।

গোবিন্দ অসহিষ্ণুভাবে বলল, তোর অত ভয়টাই বা কিসের? আমরা তো এখনও চুরি করি নি, আর সত্যি-সত্যিই কিন্তু আমি জেল থেকে পালিয়ে আসি নি। দস্তুরমতো মিশনারীদের ধরে ক্রীশ্চান হয়ে ছাড়া পেয়েছি। এখন আমাকে বাঁধা শক্ত।

আরও কিছুকাল পথ চলবার পর তারা রায়বাহাদুরের বাগানের পিছনদিকের ফটকের কাছে এসে পৌঁছল। সেখানে দাঁড়িয়ে একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখল চারদিকে, কোথাও জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। একে গভীর রাত্রি, তায় সন্ধ্যে থেকে টিপটিপ জল পড়ছে—এ সময় কারও থাকবার কথাও নয়।

সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার পর উভয়ে মিনিটখানেকের মধ্যেই পাঁচিল ডিঙিয়ে ওপারে পৌঁছল। গোবিন্দ ইতিমধ্যে রাস্তাঘাট ভাল ক'রেই চিনেছিল, সে-ই শঙ্করকে পথ দেখিয়ে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে চলল। একেবারে ভাঙা ঘরটির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গোবিন্দ ভরসা ক'রে টর্চটা জ্বালল। একটা কপাট নেই, আর একটা একটিমাত্র কব্জায় ঝুলছে, জানলা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই—শুধু গর্তগুলো আছে; দেওয়ালও মধ্যে মধ্যে ভাঙা, ঘরটার এমনিই শোচনীয় অবস্থা।

ঘরের মেঝেতেও স্তূপীকৃত জঞ্জাল। মাঝখানটা গোবিন্দ ক্ষিপ্রহস্তে পরিষ্কার ক'রে নিতেই দেখা গেল নূতন সিমেন্টের দাগ অর্থাৎ পুরনো মেঝের অনেকখানি আবার নতুন ক'রে বিলাতী মাটি দেওয়া হয়েছে।

গোবিন্দ উল্লাসে একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠল। বলল, দেখলি আমার কথা ঠিক কিনা! এইখানেই টাকা পুঁতে রেখে আবার সিমেন্ট দিয়ে গেছে।... বাবা, আমার সঙ্গে চালাকি! এইবার যা ঘা দেব, একেবারে আঁতে গিয়ে লাগবে!

তারপর উভয়ে আশ্চর্য রকম নিঃশব্দে এবং দ্রুতগতিতে মেঝেটা খুঁড়ে চলল। কিছুক্ষণ খোঁড়বার পরই নরম ঝুরো মাটি পাওয়ায় কাজটা সহজ হয়ে এল, তখন দুজনে শুধু হাত দিয়েই মাটি সরাতে লাগল।

কিন্তু সহসা একসময় অত্যন্ত একটা দুর্গন্ধ দুজনেরই নাকে এসে লাগল। শঙ্কর বলল, আলোটা জ্বাল্ তো গোবিন্দ!

টর্চ জেলে সদ্যোন্মুক্ত গর্তের উপর ফেলতে উভয়েরই গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। মাটির মধ্যে একটি গলিত শব শোয়ানো রয়েছে, শাড়ি, চুল ও কিছু কিছু অলঙ্কার দেখে মনে হয় সেগুলো কোন নারীর হবে।

দুজনে মুহূর্তকাল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থেকেই একসঙ্গে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল বাইরের দিকে, কিন্তু বেশি দূর যেতে হ'ল না, কারণ ঘরের ঠিক বাইরেই তরুণ ও পুলিসের এক ইন্‌স্পেক্টার অপেক্ষা করছিলেন।

বলা বাহুল্য রায়বাহাদুরকে সেই রাত্রেই গ্রেপ্তার করা হ'ল।

তরুণ বড়কর্তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল, লোকটাকে না দেখে যদিবা কিছু সন্দেহ ছিল দেখবার পর নিঃসংশয়ে বুঝলুম যে এ লোকের দ্বারা কোন কাজ হওয়াই অসম্ভব নয়, এর স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ এ নিজেই। কিন্তু তখনও আসল ব্যাপারটা ছুঁতে পারি নি। হঠাৎ পেছনের ঐ ফটকটায় নতুন তালা দেখে আমার প্রথম সন্দেহ হ'ল। খোঁজ নিয়ে জানলুম যে এ বাগানবাড়ি রায়বাহাদুর কেনা পর্যন্ত ও ফটক বন্ধই আছে, কেউ কোন দিন খুলতে দেখে নি। অথচ ইতিমধ্যে সেখানে নতুন তালা লাগাবার দরকার হ'ল কেন? তা ছাড়া মোটরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ফটকের পাশের দেওয়াল একটু ভেঙে গিয়েছিল, সদ্য বালি ভাঙবার দাগও সেদিন লক্ষ্য করেছিলুম। তারপর বাইরে এসে সিমেন্টওলার সঙ্গে কথা করে যখন

জানলুম যে রায়বাহাদুর নিজে লুকিয়ে সিমেন্ট বালি কিনেছেন এবং একটা কর্নিক পর্যন্ত ধার নিয়ে গেছেন তখন আর সন্দেহ রইল না।

বড়কর্তা প্রশ্ন করলেন, কিন্তু জাহাজ থেকে মৃতদেহ সরাল কি ক'রে?

তরুণ বলল, ওঁর স্ত্রী জাহাজে মোটে যানই নি। শেষ মুহূর্তে ভীড়ের মধ্যে উনি একলা গিয়েছিলেন কি স্ত্রী সঙ্গে গিছল, কে দেখেছে? স্ত্রীর জিনিসপত্রগুলো ঘরে রেখে বাইরে এসে খোঁজাখুঁজি করেছেন। সেই দুর্যোগের রাত্রে স্ত্রীকে খুন ক'রে রেখেই উনি একা জাহাজে গিয়েছিলেন।

বড়কর্তা বললেন, কিন্তু গোবিন্দর ব্যাপারটা কি?

তরুণ হেসে বলল, ও একটা রসিকতা। 'খোসখবরের ঝুটোও ভাল'—তা জানেন না? গোবিন্দর বিশ্বাস ছিল যে আমি আমার টাকাকড়ি ঐ বাগানে মাটিতে পুঁতে রেখেছি, আর সেইগুলো যদি ও সরাতে পারে তো এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। টাকাও পাবে, আমিও জব্দ হবো।... এইটে টের পেয়েই আমি অপেক্ষা করছিলুম ওর জন্যে। আমাদের অনেকটা পরিশ্রম বাঁচল না কি?
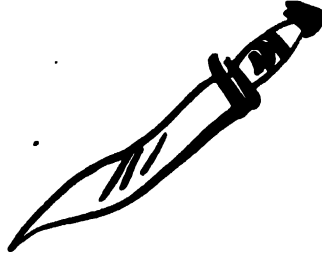
এই গল্পগুলির কয়েকটিতে বিদেশী গল্পের প্রভাব আছে।

গোবুর নিরুদ্দেশ যাত্রা

আমার লেখিকা নাতনী
কল্যাণীয়া সোমা মিত্রকে
সাগ্রহ উপহার—
আশা করছি যে একদিন
বিখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক হবে।

॥ ১ ॥

আসলে গোবিন্দর একটু রাগই হয়েছিল। এখানে তখন তিন-চারটে ভাল ভাল ম্যাচ—এ সব ফেলে চল কিনা সেই কোথায় ওর বাবা-মা'র গুরুদেব কি মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন, সেখানে, পাক্কা হাজারটি মাইল দূর কলকাতা থেকে।

গোবিন্দর বয়স বেশী না হলেও তার খেলাতে বেশ নাম হয়েছে এর মধ্যেই। এই তো মোটে তেরো বছর বয়স, ক্লাস এইটে পড়ছে—এর মধ্যেই বড় বড় ধাড়ি ছেলেদের টিমে খেলবার জন্যে তারা এসে সাধ্যসাধনা করে। তাদের অনেককে কথাও দেওয়া হয়েছে—টাকা নেয় না গোবিন্দ কিন্তু তারা বিস্তর জিনিস দেয়, একটা টিম তো একটা দামী ঘড়িই দিয়েছে এর মধ্যে—এদের ফেলে, এসব ফেলে অত দূর যেতে কি মন চায়?

সে গুরুদেব নাকি মস্ত বড় সাধু। ভারত-জোড়া নাম তাঁর, ভারতের বাইরেও অনেকে তাঁকে ভগবানের মতো মানে। তিনি নাকি মড়া বাঁচাতে পারেন, তাঁর পৌঁছবার দেরি থাকলে সরকার নাকি হাওয়াই জাহাজ বা রেল গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখেন। তাঁর নাকি বারো-তেরো লাখ শিষ্য, দেশের নানা জায়গায় সত্তর-আশিটা বড় বড় মন্দির আশ্রম করেছেন—এমন গুরুর দর্শন পাওয়াও মহা পুণ্যি।

তা বেশ তো, গোবিন্দ সবই মেনে নিচ্ছে। তা যাও না তোমরা, পুণ্যি জমাও না। গোবিন্দ কেন যাবে? এখানে বামুন-পিসী আছেন, পুরনো লোক, বেশ দেখাশুনো করতে পারবেন। গোবু আর দেবু যদি এখানে থেকে যায় তো অসুবিধে কি? ওরা বেশ মজা করে থাকত! না, তা হবে না, গুরুদেব নাকি ওদের নাম করে করে বলে দিয়েছেন নিয়ে যেতে, তিনি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করবেন।

অগত্যা আসতে হয়েছে এখানে, যতই রাগ হোক। বাবার মুখের ওপর কিছু কথা বলা যায় না, তাঁরও প্রচণ্ড রাগ।

জায়গাটা অবিশ্যি মন্দ না, তা গোবুও মানতে বাধ্য। হিমালয় তো নয়—কি যেন, হ্যাঁ শিবালিক পর্বতমালা, উত্তরে বিরাট বিরাট পাহাড়—অনেক বেলা অবধি সূর্যই উঠতে পারে না—গাছপালায় ঢাকা সুন্দর পাহাড়, কত কি জন্তু না জানি ওর মধ্যে আছে, লোকে তো বলে বাঘ ভালুক বুনো হাতি—সব দেখা যাবে ভেতরে গেলে। তার কোল দিয়ে কুলকুল করে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, ফটিকের মতো স্বচ্ছ আর মিষ্টি জল।

তারই ওপর অনেকখানি জমি নিয়ে আশ্রম তৈরি হয়েছে। সেখানে ভক্তদের থাকার জন্য বড় বড় বাড়ি—মধ্যে একটি বেশ মাঝারি রকমের মন্দির, সেখানে দশভুজা দুর্গার মূর্তি বসানো হবে। অষ্টধাতুর দুর্গামূর্তি, পাথরের অসুর। এই উপলক্ষে প্রায় হাজার দুই ভক্ত শিষ্য এসেছেন, খাওয়া-দাওয়া ভোগ যাগ খুব চলেছে। মিঠাইমণ্ডারও অভাব নেই।

এরপর—এই সব খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় দেখে রাগটা একটু কমবে, তা তো জানা কথাই। বিশেষ এই পাহাড় পাথর আর নদী বড় ভাল লেগেছে। তবু রাগ গেলেও দুষ্টু-বুদ্ধিটা যায়নি। গুরুদেবকে একটু খোঁচা না দিয়ে থাকে না সে—এটা ওর মনে ঠিক করাই আছে, শুধু সুযোগের অপেক্ষা।

সে সুযোগও একটা এসে গেল।

গুরুদেব প্রতিদিনই ওঠেন রাত তিনটে নাগাদ। সকালবেলাকার বাথরুমের কাজ সেরে চারটের সময় এক কাপ ফলের রস খেয়ে ধ্যান করতে বসেন, পাকা তিনটি ঘণ্টা খাড়া বসে থাকেন চোখ বুজে।

এ সময়টা কোন শিষ্য-টিষ্যর যাওয়া নিষেধ। গঙ্গায় স্নান করতে যান না, গঙ্গার জল বাথরুমে তোলা থাকে। নিজের কাজ নিজেই করে নেন। কোন সেবকের দরকারও হয় না। সাতটার পর চোখ খুললে তখন সবাই ভিড় করে।

এ সবই দু'তিনদিন ধরে লক্ষ্য করেছে গোবু। সেদিন তাই সে রাত তিনটেয় উঠে চুপি চুপি চলে গেছে গুরুদেবের ঘরের দিকে। ওদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল একটা তাঁবুতে। ঘাসের ওপর বিছানা, উঠে গেলে কোন শব্দ হবার কথা নয়। কেউ টেরও পেল না তাই!

গোবু অনেক মাথা খাটিয়ে মতলব বার করেছিল একটা।

গুরুদেব যখন বাথরুম সেরে পূজার ঘরে আসেন—বাথরুমের বাইরের দিকের দরজাটা খুলে দিয়ে ঘরে এসে মাঝের দরজাটা বন্ধ করেন—যাতে সেবকরা এসে বাথরুম সাফ করে যেতে পারে। গোবু ঠিক করে রেখেছিল ঠিক ঐ দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে টুক করে ঢুকে যাবে—উনি তো কিছু আর সে সময় চেঁচামেচি করতে বা জোর করে বার করে দিতে পারবেন না! না হয় একটু অসন্তুষ্ট হবেন, তা তাতে গোবু ভয় করে না।

করলও তাই। দরজার সঙ্গে মিশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। উনি বুড়ো মানুষ, আস্তে চলেন—বাইরের দরজাটা খুলে দিয়ে নিজের ঘরে আসবার আগেই গোবু সুড়ুৎ করে ঢুকে, ওঁকে পাশ কাটিয়ে ওঁর আগেই ভেতরের ঘরে ঢুকে পড়ল।

গুরুদেব তো অবাক।

'কি রে, তুই এমন সময় এখানে! আমার ঘরে! জানিস না আমি এখন একা থাকি!'

'জানি, সেই ভরসাতেই তো এসেছি। আপনাকে কতকগুলো কথা বলব, কিছু জিজ্ঞেস করব।'

'তা এখন কেন? যা যা'—গুরুদেব তাড়া লাগান, 'পরে আসিস, যখন আমি দরজা খুলে বাইরে বেরোব তখন—'

'উঁহু'—ঘাড় নাড়ে গোবু, 'তখন আপনার কাছে ঘেঁষতেই পারব না। চারশো লোক ঘিরে থাকবে, আর ঐ যে আপনার সব চেলারা আছে, আপনার মতো করে কাপড় পরে, আপনার মতো সরু সরু জটা—নকল গুরুদেব, ওরা আরও এক কাঠি বাড়া। আপনি যেন ওঁদের সম্পত্তি, কেউ হাত দিতে গেলেই লোকসান হয়ে যাবে।'

এইটুকু ছেলের মুখে পাকা পাকা কথা—এমন এর আগে কখনও শোনেননি! এভাবে

তাঁর সঙ্গে কেউ কথা কইতে পারে বড় বয়সের কোন লোকও—তা নিজে কানে না শুনলে কেউ বিশ্বাসও করবে না!

গুরুদেবের মজা লাগল। তিনি বললেন, 'তা বেশ, তাহলে এখনই বল কি বলবি! তবে যা বলবি চটপট, মিছিমিছি আমার সময় নষ্ট করিসনি।'

গোবু চটপটই বলল।

বলল, 'শুনুন, আপনি তো সন্ন্যিসী, লোকে তাই বলে। গেরুয়া কাপড়ও পরেন, জটাও আছে—সন্ন্যিসী নয় তো কি! আমি বাবার একটা বই পড়েছি—তাতে লেখা আছে বিষয়-আশয় সংসার সব ছেড়ে না দিলে সন্ন্যিসী হওয়া যায় না। কিন্তু আপনি তো দেখি এই সব বিষয়-আশয় নিয়েই আছেন। শুনেছি সমস্ত দেশে আপনার পঞ্চাশ-ষাটটা বড় বড় বাড়ি আছে—আরও কত জায়গায় জমি কিনেছেন—'

বাধা দিয়ে গুরুদেব বলে ওঠেন, 'বাড়ি কিরে, সে তো সব মঠ আর আশ্রম! সাধুরা সেখানে থেকে ভগবানকে ডাকবেন বলেই করা—'

'বাড়ি ফিরে সে সব- '

'সাধুরা তো পাহাড়ে বনে জঙ্গলে থেকে ফলমূল খেয়ে ভগবানকে ডাকেন—অন্ততঃ বই-টইতে তাই লেখা আছে। তাঁদের জন্যে এত বড় বড় বাড়ি কেন! তা ছাড়া কাল আমি

দু'-একজনকে জিজ্ঞাসা করছিলুম—শুনলুম এসব আশ্রমে আপনি যতদিন থাকেন ততদিনই সাধুরাও থাকেন, তারপর সব বন্ধ পড়ে থাকে। শুধু দু'জন কি তিনজন লোক—একটু পুজো করে, নিজেরা যা খায় তাই ভোগ দেয়। অথচ দেখুন, এর জন্যে দিনরাত আপনাকে টাকাপয়সা ইট বিলিতি মাটির কথা ভাবতে হচ্ছে, কে জয়পুর থেকে মার্বেল পাথর আনিয়ে দেবে, আপনি তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, কে আপনার জন্যে কোথায় একটা বড় মন্দির করিয়ে দিয়েছে—গৌরী সেন না কি নাম—দু'লাখ টাকা খরচ করেছে—সে লোকটা তো দেখলুম আপনার সামনেই অন্য সবাইকে কড়া কড়া কথা বলছে—আপনি চুপ করে শুনছেন। এ তো সবই পয়সার লোভে—তাই না! ঠিক করে বলুন তো! এত জায়গায় তো বাড়িঘর করলেন, আর কি হবে? ভগবানকে ডাকতে তো এত সব লাগে না। অন্ততঃ আমার যা মনে হয়।'

হঠাৎ যেন গুরুদেবের মুখখানা কি রকম হয়ে গেল। খানিকটা চুপ করে থেকে বললেন, 'আচ্ছা তোর কথা শুনেছি তো, এখন যা। এর উত্তর পরশু দেব।'

আর দাঁড়ালো না গোবু। সে বুদ্ধিমান ছেলে, এঁর মতো লোককে এসব কথা বলা উচিত হয়নি তা সেও বোঝে। বাবা মা জানতে পারলে ওর পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেবেন। উনি যদি তাঁদের ডেকে বলে দেন? ভয়ে বুকের মধ্যেটা ধড়াস ধড়াস করছে। তা ছাড়া বুড়ো মানুষ, মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল—এখন গোবুর খুব মন-কেমনও করছে।

এধারে সেদিন নতুন আশ্রমে হুলস্থূল পড়ে গেল।

গুরুদেব সেই যে দোর দিয়ে ধ্যানে বসেছেন—দোরও খোলেন না, কোন সাড়াশব্দও নেই। অনেকক্ষণ দেখে ভক্ত শিষ্যরা দরজায় ঘা দিতে বাধ্য হলেন। তাও অল্পেস্বল্পে কিছু হলো না, শেষে যখন দরজা ভাঙবার দরকার হবে কি না সকলে এই কথা ভাবছেন—গুরুদেবের হঠাৎ হার্টফেল করলো কিনা এইটেই সকলের ভয় মনে মনে—এক সময় তিনিই কপাট খুললেন। কিন্তু খুললেও ভেতরে কাউকে আসতে দিলেন না, চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়েই বললেন, 'আমি আজ সারা দিন ধ্যান করতে পারি, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না, কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করো না। যা পারো এধারের কাজ তোমরাই চালিয়ে নাও।'

বলার পরই আবার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন—ওদের মুখের ওপরই।

কি আর করেন শিষ্যরা! ওঁর কথামতোই কাজ হলো। গুরুদেবকে বাদ দিয়েই পুজো-উৎসব খাওয়া-দাওয়া সব সারা হলো। অনেক রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন কেউ কেউ—তাতেও যখন ঘরের মধ্যে থেকে কোন ডাক এলো না, কি দোর খুললো না—তখন তাঁরাও ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম হয়নি গোবুরই শুধু—সারা রাতই সে জেগে ছিল।

ওর কেবলই মনে হচ্ছে—এই যে গুরুদেব সারাদিন কপাট বন্ধ করে বসে আছেন—এ ওর ওপরই রাগ করে হয়ত। হয়ত ওর কথামত খুব আঘাত পেয়েছেন. দুঃখ পেয়েছেন। অপমানিত বোধ করেছেন।

এই ভাবতে ভাবতে গোবু সেদিনও রাত তিনটেয় উঠে পড়েছে। তাঁবুর মেঝেতে ঘাস—তার ওপর শতরঞ্জি পাতা—পা টিপে টিপে উঠে বাইরে এসেছে, কেউ টেরও পায়নি। দু-একটা কুকুর আছে আশ্রমের মধ্যে—তারা এই ক'দিনে গোবুকে চিনে নিয়েছে, দু-একটা একটু মুখ তুলে দেখলো, কেউ ডেকে উঠলো না।

গুরুদেবের ঘরের কাছে যেতে ওর বুকটা ঢিব-ঢিব করে উঠলো একেবারে।

ওঁর ঘরের দরজা খোলা, হাঁ-হাঁ করছে।

একটা নীল আলো জ্বলে ভেতরে, সেটা রাত্রে জ্বলেনি—এখন জ্বলছে।

ছুটে গিয়ে দেখলো, ঘর খালি, বাথরুমেও কেউ নেই।

তবে বুঝি আজ গঙ্গায় স্নান করতে গেছেন!

ছুটে গঙ্গার দিকে গেল, কিন্তু সেখানেও জন-মানব নেই।

কোথায় গেলেন তবে?

গোবু আর থাকতে পারলো না। তাঁবুতে এসে বাবাকে ডেকে তুললো। গুরুদেবের ঘর-দোর সব খোলা—উনি কোথায় গেলেন? কোত্থাও দেখা যাচ্ছে না তো!

তখন সকলে হৈ হৈ করে জেগে উঠলো।

প্রধান প্রধান শিষ্য যাঁরা—তাঁরাও ছুটে এলেন। দেখলেন, আসনের ওপর একটি চিঠি— 'আমাকে খুঁজো না, আর আমার দেখা পাবে না। আমি আর লোকালয়ে আসবো না। তোমরা আশ্রমগুলো হাসপাতাল বা ইস্কুল করে দেবার ব্যবস্থা করো, তাহলেই আমি শান্তি পাবো।'

চারদিকে খুব হৈ চৈ পড়ে গেল। তা তো পড়বেই। অনেকেই ভাবলো যে গুরুদেবের বেশী বয়সের জন্যে হোক বা অনেক তপস্যা করেই হোক, মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

॥ ২ ॥

গোবুর কিন্তু এ সব কথা ভাল লাগলো না। তার যেন চোখে জল আসতে লাগলো বার বার। বেচারী গুরুদেব, বুড়ো মানুষ, নিশ্চয় ওর কথাতেই দুঃখ পেয়ে এমন একা কোথায় বেরিয়ে চলে গেলেন।

আরও ওর মন-কেমন করতে লাগলো এই জন্য যে—উনি এত দোষ করা সত্ত্বেও ওকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন। ওর জন্যই যে এই কাণ্ড—সে কথা যদি লিখে রেখে যেতেন—কি ব্যাপারই না হতো!

যত ভাবে ততই খারাপ লাগে। নিজেকেই এর জন্যে দায়ী মনে হয়। মনে হয় এতগুলো লোক যাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে, নিশ্চয়ই তাঁর মধ্যে কিছু ভাল জিনিস আছে। তাঁকে এমন করে আঘাত দেওয়া উচিত হয়নি।

অথচ এখন উপায়ই বা কি, তাও ভেবে পায় না। শেষ পর্যন্ত মনকে ভরসা দেয়—কোথায় আর যাবেন, ঐ তো শরীর, এতখানি বয়েস—তা ছাড়া এত ভক্ত, এত বাড়ি-ঘর বিষয়-সম্পত্তি—এ সব ছেড়ে কি মানুষ বেশী দিন থাকতে পারে?

নিশ্চয়ই ফিরবেন, আর শীগ্গিরই ফিরবেন।

এ আশা আরও অনেকেরই ছিল।

সাধারণ ভক্ত যারা—ঘরবাড়ি কেউ বা চাকরি থেকে গোনা দিন ছুটি নিয়ে এসেছে, কেউ বা এসেছে ব্যবসা ফেলে, তাদের আর থাকার উপায় নেই। তা ছাড়া অসুবিধেও ঢের। খাওয়া-দাওয়া—এই যে এ ক'দিন এলাহি ব্যাপার চলছিল, সে সবই ভক্তদের দেওয়া পয়সাতেই চলছিল অবশ্য, কিন্তু তবু তিনি তখন মাথার ওপর ছিলেন, চারিদিক থেকে হুড়হুড় করে টাকা আসছিল—এখন এত টাকা খরচ করা উচিত হবে কিনা, তাও ভাবছেন কর্তাব্যক্তিরা। এতগুলো আশ্রম দেশের চারদিকে, তার খরচ তো কম নয়!

কাজেই মোটামুটি প্রায় সবাই চলে গেল। আশ্রম ফাঁকা হয়ে গেল বলতে গেলে। তাঁবু, কাশের তৈরী ঘর—এতকাল যেখানে খড় বা শুকনো ঘাস পেতে এতগুলি লোক বাস করছিল সেগুলো খালি হা-হা করতে লাগলো। এগুলো ভেঙে জায়গা সাফ করা, তাঁবু গুটিয়ে মালিকদের কাছে ফেরত দেওয়া—বহু কাজ বাকী। কিছু তাঁবু সরকারী মহল থেকে পাওয়া গিছল, যেগুলো ভাড়া করা, তার ভাড়াও মিটিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু এসব কে করে! যে ক'জন রয়ে গেলেন তাঁরা সবাই আর সবাইকে বলছেন, 'এ কাজগুলো সেরে ফেলা হোক'। কিন্তু কেউই এসব দায়িত্ব ঘাড় পেতে নিচ্ছেন না।

রয়ে গেলেন কর্তাব্যক্তিরা, বাবার প্রধান শিষ্য ক'জন। সকলেই এককালে বড় বড় সরকারী চাকরি করতেন, কেউ বা এখনও করেন। দু-একজন উকিল ব্যারিস্টারও আছেন। এঁরা চিরদিন হুকুম করে কাজ করিয়েছেন, নিজেরা কখনও হাতেকলমে করেননি কিছু—তাঁরা এসব কাজ কি ভাবে হবে, এখানে কে থাকবে, কার ওপর আশ্রমের ভার দেওয়া হবে—এসব ভাবনার কূলকিনারা পেলেন না। প্রায় প্রতি দিনই তিনবার চারবার করে সবাই বসতে লাগলেন, আলোচনার শেষ রইলো না, কিন্তু ঠিক হলো না কিছুই।

যাঁরা থেকে গেলেন তাঁদের মধ্যে গোবুর বাবাও একজন। গোবুর বাবা এক বড় কলেজে পড়ান, অধ্যাপক, অঢেল ছুটি ওঁদের—তা ছাড়া ওঁর লেখা অনেক পাঠ্যবই আছে, সেগুলো খুব চালু—পয়সারও অভাব নেই। একখানা রচনার বই-ই বছরে পঞ্চাশ ষাট হাজার বিক্রি হয়—উনি তা থেকে বছরে পনেরো-ষোল হাজার টাকা পান। কাজেই ওঁর কোন তাড়া নেই। সামনে গরমের ছুটি—ছেলেমেয়েদের জন্যেও ভাবতে হবে না।

মুশকিল হয়েছে এই, গোবুর দিন আর কাটে না। একে তো এখানে কাজ নেই, খেলার মাঠ নেই—এরা ফুটবল খেলতেও বোধ হয় জানে না। কাছাকাছি একটা ছোট ইস্কুল আছে, সেখানে ছেলেরা ছুটির পর শুধু হকি খেলে বা খেলার নাম করে মারামারি করে। তাদের দলেও ঠিক মেশা যায় না। হকি খেলা সে জানে না, তারাই বা আনাড়িকে নেবে কেন?

তা ছাড়াও কথা—ওর নিজের একটা অপরাধ-বোধ।

ওর জন্যেই এই বিভ্রাট, এতগুলো লোকের এত চিন্তা, এত কাজের ক্ষতি, এত অশান্তিও।

এক একবার ভাবে, কথাটা বলেই ফেলে বাবার কাছে, কিন্তু ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভয় পেয়ে যায়।

আর যাই হোক গোবু বোকা নয়। ইস্কুলে সব পরীক্ষায় প্রথম হতে পারে না ঠিক— কিন্তু সে পড়ায় অমনোযোগের জন্যে, বুদ্ধির অভাবে নয়। সে ভেবে দেখেছে এ কথা বললে বাবা-মা'র কাছে তার যা বকুনি জুটবে—মারধোর হয়ত এ বয়সে আর খাবে না—লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না এটা ঠিক—তবে তার চেয়েও ওর বাবার লজ্জা আর অপমানের চূড়ান্ত হবে। তাঁর ছেলের জন্যেই এত বড় একটা অঘটন—এ নিয়ে বাকী সকলে অনেক কথা শোনাবেন, বাবা যদি মনের দুঃখে কিছু একটা করে বসেন! বাপ রে. মনে হলেই কান্না পেয়ে যায় তার।

শেষ পর্যন্ত হঠাৎই মন ঠিক করে ফেলে গোবু।

সে নিজে গুরুদেবকে খুঁজতে বেরোবে।

কোথায় আর যাবেন, গেলে ঐ সামনের পাহাড়েই গেছেন নিশ্চয়। বুড়ো মানুষ, অথর্ব. নব্বই বছরের ওপর বয়স হয়েছে—হেঁটে কত দূরই বা যাবেন! সে ঠিক একসময় ধরে ফেলবে তাঁকে!

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে দুদিন ধরে তাঁর বহু ভক্ত ঐ সামনের পাহাড়, চারদিকে বাস-এর রাস্তা, বড় বড় জায়গা যেগুলো—এমন কি উত্তর কাশী পর্যন্ত ঘুরে এসেছে, তাঁর খোঁজ পায়নি। তবে তার কারণটাও গোবু বুঝতে পারে।

গুরুদেব মহাপণ্ডিত, খুব বুদ্ধিমানও। তিনি এইভাবে পালালে যে চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়ে যাবে তা কি আর জানতেন না! নিশ্চয়ই তিনি কাছাকাছিই কারও একটা ঘরে কি পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে ছিলেন ক'দিন! পাহাড় হলেই গুহা থাকবে—আর ভাল ভাল সাধুরা সব গুহাতে থাকেন—একথা সে ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছে, অনেক বইতেও পড়েছে। এরা বোকা তাই হাঁকড়-পাঁকড় করে পথে পথে ঘুরেছে। গোবু তো আর বোকা নয়—সে ঠিক খুঁজে বার করবে।

যা ভাবা তাই কাজ। বই ও অনেক পড়েছে—ছোটদের বড়দের সব রকম বই-ই। এমন 'অ্যাডভেঞ্চার' যাত্রার কথা সে জানে। কি কি নিতে হবে তাও মুখস্থ, তবে দুঃখের মধ্যে সব জিনিস হাতের কাছে নেই। রুকস্যাক আছে একটা, কিন্তু তাতে বাবার রাজ্যের জিনিস থাকে। সেটা নিলে বাবার খুব অসুবিধা হবে। ছুরি পাওয়া গেল, বড় মিলিটারী ছুরি। তার সঙ্গে আরও দুরকম ফলা আছে। এ ওর জ্যাঠামশাই এনেছিলেন—প্রথম যুদ্ধের সময়। একটা ছোট ওয়াটার-বট্‌ল্‌ও পাওয়া গেল। ওর বোনের ইস্কুল যাওয়ার জিনিস এটা, আসবার সময় জেদ করে এনেছিল।

যাই হোক, একটা বাড়তি প্যান্ট, একটা ঐ বড় ছুরি আর জলের জায়গা—এ ছাড়া

কিছু যোগাড় হলো না। প্যান্টটা একটা গামছায় জড়িয়ে পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে (মিলিটারী ধাঁচে, অনেক ছবি দেখেছে এমন) ছুরিটাও সেইভাবে বেল্ট্‌-এ ঝুলিয়ে ওয়াটার-বট্‌ল্‌টা হাতে নিয়ে ভোরবেলাই রওনা দিলো। এক্কেবারে খুব ভোরে, যেমন সময়ে সে এই পাঁচ-ছ'দিন আগে গুরুদেবের ঘরে গিছলো।

বুদ্ধি করে বাবাকে একটা চিঠিও লিখে রেখে এলো, তাঁর চশমার নিচে— 'বাবা, আমি গুরুদেবকে খুঁজতে যাচ্ছি। তুমি ভেবো না, আমি তাঁকে ফিরিয়ে আনবোই।'

॥ ৩ ॥

সবই গুছিয়ে নিলো বুদ্ধি করে, কেবল নেওয়া হলো না—কথাটা মাথাতেও যায়নি— শুধু খাবারটা। মানে খাবার মতো কিছু জিনিস।

একেবারেই মনে পড়েনি কথাটা, নইলে মা'র ভাঁড়ারে কিছু শুকনো ফল থাকে সর্বদা, কিসমিস, আখরোট আর খেজুর—তা থেকে কিছু বার করে নিতে পারতো। প্রসাদী ক্ষীরের বরফি আর বোঁদের লাড্ডুও ছিল—সেও ঐ গামছায় বেঁধে নেওয়া চলতো।

আসলে বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে কিনে খাওয়া সোজা, অনেক ভাল। কোন ঝঞ্ঝাট থাকে না তাতে। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত শহরে থেকে আর শহরে শহরে ঘুরে এই ধারণাটা হয়ে গেছে। এ নিয়ে ভাবতেও হয় না। এ তো আছেই। খাবার তো পয়সা ফেললেই পাওয়া যাবে। থাকে কলকাতায়, বেড়াতে যা গেছে এ পর্যন্ত, সেও শহরেই সব—কাশী, পুরী, লক্ষ্ণৌ, বোম্বে, সিমলা, দার্জিলিঙ্—সবই শহর—নানা রকম খাবার সেখানকার দোকানে দোকানে, পথে-ঘাটে। ফিরিওলা'র অভাব নেই। এই বিশ্বাসটা ওর রক্তে মিশে যাবে তাই তো স্বাভাবিক।

দরকার শুধু টাকারই।

কিছু টাকা ছাড়া পথ চলা উচিত নয়।

ওর বাবা কথাটা কেবলই বলেন, 'পুরাকালে লোকে হাতিয়ার নিয়ে রওনা হতো— এখন যায় টাকা নিয়ে। টাকাই এখনকার সব চেয়ে বড় অস্ত্র।' সে ব্যবস্থাটা ওর ভালই ছিল। আসবার আগে দিদিমা কুড়িটা টাকা দিয়ে দিয়েছেন, 'তোর যা খুশি কিনিস।' পৈতের সময়ও অঢেল টাকা পাওয়া গিছল, তারও বেশির ভাগই ওর স্যুটকেসে আছে। তা থেকে সবও নেয়নি ও—মোট গোটা পঞ্চাশ টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা নিয়েছিল প্যান্টের পকেটে।

বেরিয়েও মনে পড়েনি, যাবার আগে দুটো মিষ্টি কি বিস্কুট খেয়ে যেতে পারতো— কিন্তু অতো ভোরে কখনও কিছু খায় না, খাওয়ার অভ্যেস নেই—সে কথা মনে পড়বে কেন?

সে হনহন করে হাঁটতেই শুরু করেছে। মনটা আছে সেই দিকেই—বাবা উঠে ওর এই

যাওয়ার খবরটা পাবার আগেই অনেক দূরে গিয়ে পড়তে হবে—হারিয়ে যেতে হবে বনজঙ্গলের মধ্যে। ওঁরা খুঁজতে বেরোবেন তো বটেই—আর তার বেশী দেরিও নেই। বাবা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই উঠে পড়বেন, মুখ হাত ধুয়ে এসে ছেলের খবর পেতে পেতে আর বড়জোর আধঘণ্টা। আর আধঘণ্টা লাগবে কি করবেন, কিভাবে খোঁজ শুরু করবেন এইটে ঠিক করতে। তার মানে দু'ঘণ্টা সে সময় পাচ্ছে হাতে। এসব ওর ভেবেচিন্তে মনের মধ্যে অঙ্ক কষা একেবারে!

তাই জোরে হাঁটার কথাটাই মনের মধ্যে তখন একমাত্র চিন্তা। গঙ্গার পুলটা পেরিয়ে সামনেই পড়ে মহর্ষির নতুন আধুনিক আশ্রমটা। এখানে নাকি সাহেব সন্নিসী সব, তাদের পয়সাতেই আশ্রম চলে। ধ্যান করার জন্য ইট-সিমেন্টের গুহা তৈরি হয়েছে—সেগুলো ইলেকট্রিক দিয়ে গরমে ঠাণ্ডা, শীতে গরম রাখা হয়। খাওয়া-দাওয়াও নাকি খাসা। এমন কি মাংস-ডিমও নাকি খান সাহেব সন্নিসীরা।

কথাটা ভাবতে ভাবতেই গোবু মহর্ষির আশ্রমটা ডাইনে ফেলে বাঁ দিকের পথ ধরলো। কিন্তু এ সব তৈরী বাঁধা পথ দিয়ে গেলে চলবে না, গাড়ি ঘোড়া যায় এ পথে—চট করে লোকের চোখে পড়ে যাবে। ওপরদিকে তাকাতে তাকাতে চললো—ভালো মতো একটা পাক্‌দণ্ডী পথ পেলেই উঠে যাবে। পাহাড়ীদের হাঁটার ফলে পায়ে পায়ে যে রাস্তা হয় তাকেই পাক্‌দণ্ডী বলে! এগুলো সাধারণতঃ খাড়া হয়—তা হোক, গোবু তাতে ভয় পায় না। তার হালকা শরীর, পাহাড়ে উঠেছেও সে অনেক—ওর কোন কষ্ট হবে না।

খানিকটা গিয়েই একটা তেমনি রাস্তা পেয়েও গেল। খুব খাড়াও নয়, ওপরের দিকেই উঠেছে ক্রমাগত, তবু একটু বেঁকে— কতকটা যেন উত্তর দিকেই চলে গেছে।

আর গোবুকে পায় কে!

তার কেমন মনে হলো সাধু-সন্ন্যাসী যদি কেউ পালাতে চায় তো সে এই পথই ধরবে। এই পথে গেলেই সে পাবে গুরুদেবকে।

কিন্তু খানিকটা সেই পথ ধরে চলবার পরই বুঝল মুসৌরী কি রানীক্ষেত কি দার্জিলিং শহরের পাহাড়ে পথ আর এই পাকদণ্ডী রাস্তাতে অনেক তফাৎ। সেখানে একটু দম লাগে—তবে এমন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মতো ভাব হয় না, থমকে দাঁড়াতে হয় না খানিকক্ষণ করে।

আর এমন গলা শুকিয়ে কাঠও হয়ে যায় না। সে এনেছে একটা বলতে গেলে খেলাঘরের ওয়াটার-বট্‌ল্, তাতে কতটুকুই বা জল ধরে! তা বুঝেই সে এক এক চুমুকের বেশী খাচ্ছে না এক এক বারে—নিজের মনের কাছেই যেন কতকটা মিনতি করছে সে, 'জাস্ট্ এক চুমুক, গলাটা ভিজিয়ে নেবার মতো। এতে অনেকক্ষণ চলবে।'

তবে তা যে চলবে না, এত ঘন ঘন এক চুমুক করে খেলেও এইটুকু বোতলের জল যে শীগ্‌গিরই শেষ হয়ে যাবে, সে হিসেব ওর আছে। তাই মনে মনে সে বেশ একটু দমে যায়। ওর ধারণা ছিল পাহাড় মানেই ঝরনা আর নানা রকম ফলের গাছ। তা নইলে মুনি ঋষিরা বাস করেন কি করে। খেতে তো হবে, জলও চাই।

'খেতে তো হবে।'—এটা ক্রমশ বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবার। আসলে সেটাই এখন প্রধান চিন্তা হয়ে দাঁড়ায়। খিদে পেয়েছে খুব, প্রচণ্ড। পেটে মোচড় দিচ্ছে একেবারে। তার ওপর খালি পেটে ঐ এক চুমুক জল পেটে গেলেও অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। শরীর যেন আর চলছে না, পা ভেঙে আসছে। একটু কিছু পেটে না পড়লে সে বোধহয় এখনই মরে পড়ে যাবে রাস্তায়—আর রাস্তাতেই পড়ে থাকবে—কেউ টেরও পাবে না। শিয়াল কুকুর খাবে ওর মাংসটা টেনে টেনে—বাপ রে, ভাবতেই যেন কেমন করে ওঠে শরীরের মধ্যে! বাবা-মা জানতেও পারবেন না। খুঁজতে অবশ্য বেরোবেন—তবে এ পথে আসবেন কেন?

কথাটা আবছাভাবে মনে পড়লেও চোখে জল এসে যায় ওর। ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। আর সেই সঙ্গে এই হতাশা ছাপিয়ে ওঠে ওর নিজের বোকামির জন্যে একটা প্রচণ্ড আপসোস। কি যেন বলে—ধিক্কার।

এত হিসেব করলো সে—আসল জিনিসটাই মনে পড়লো না! খাবার যা খেয়ে বাঁচতে হবে, যা যোগাবে গায়ে জোর, চলবার ক্ষমতা—তাই নিলো না! অন্ততঃ একটু কিছু খেয়েও যদি বেরোতো তাহলে এত শীগ্‌গির এমন দুর্বল হয়ে পড়তো না, পেটের এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো না। পকেটে যদি একটু কিসমিসও ঢুকিয়ে নিতো। বোকা, বোকা! নিরেট বোকা সে!

সে বেরিয়েছে বাহাদুরী দেখাতে!

অসহায় ভাবে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। গাছপালা অনেক আছে, তবে ফলের গাছ একটাও চোখে পড়লো না। বাবলা জাতীয় কাঁটাগাছই বেশী। আর দেবদারু। দু-একটা সোঁদাল ফুলের গাছও নজরে পড়লো। মানে এইগুলো চেনে সে। আরও ঢের গাছ আছে অবিশ্যি, কিন্তু তাতে কোথাও কোন ফল ধরে নেই। এখন যা অবস্থা, বিষফল পেলেও খায় সে। মরবে—মরাই ভালো, এমন বেকুবের বেঁচে থাকা উচিত নয়!...

তবু চলার চেষ্টা করে সে। এক পা এক পা করে। মাঝে মাঝে উপুড় হয়ে পড়ে পেট চেপে ধরতে হচ্ছে—গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে বলে একরকমের কাশিও আসছে. অথচ কাশিও বেরোচ্ছে না—সে আর এক কষ্ট।

কোথায় যাবে তাও জানে না, কতটা দূর গিয়ে জল বা খাবার পাওয়া যাবে কে জানে! এমন ধরনের পাহাড়ে পথে যে চায়ের দোকানও নেই—সে কথাও কেউ বলেনি কখনও। শহুরে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে একথা ভাবা ও জানা যায় না। দোকান থাকতে গেলে মানুষজনের বসতি দরকার—এটা ভাবার তো এতদিন দরকারও হয়নি।

হতাশায় আর দেহের কষ্টে শেষ পর্যন্ত একেবারে ভেঙেই পড়ে। ঢালু পাহাড়ে পথ—গড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব—তবু তারই মধ্যে একটা গাছের গুঁড়ি আর বড় একখানা পাথরের খাঁজে পা দুটো আটকে বসে পড়ে সে, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেমন একটা ঘুমের মতো ভাব তাকে অবশ করে দেয়। একেই যে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বলে, যা বইতে পড়েছে। মা বলেন বেশী ক্ষিদেতে ভোচকানি লাগে—এও কি তাই? ভাবতে ভাবতেই একসময় ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা সত্যিসত্যিই অজ্ঞান হয়ে যায়।
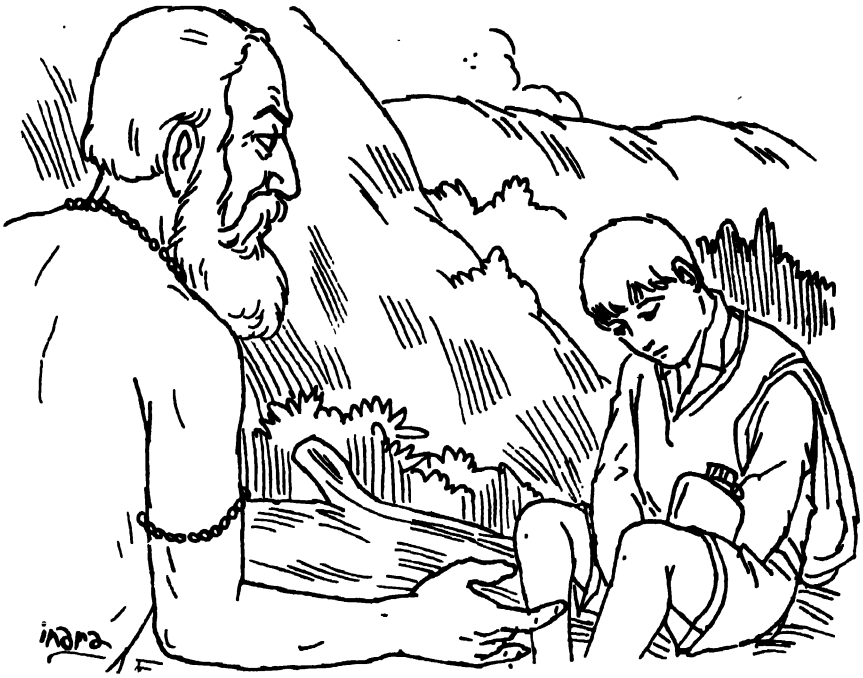
কাঁহাসে আয়া!

'আরে ই কাঁহাসে আয়া! এ বাচ্চা, উঠো উঠো! তুমি হিঁয়া ক্যায়সে আয়া? মালুম হোতা হ্যায় কি ঘরসে ভাগকর আয়া হোঙ্গে!

চমকে চোখ চায় গোবু।

দেখে এক বিরাট-দেহ সন্ন্যাসী! জটা নেই—বড় বড় ঝাঁকড়া চুল আর গোঁফদাড়ি প্রচুর। কপালে ছাইমাখা, হাতে বুকেও।

চায়, দেখে, কথা কইতে পারে না।

চেষ্টা করলো কিন্তু তখন এত দুর্বল হয়ে পড়েছে, গলা এমন শুকিয়ে গেছে যে কোন আওয়াজই বেরোলো না মুখ দিয়ে।

সাধুজী ওর অবস্থাটা বোধ হয় বুঝতে পারেন, মুখে একটা 'চুক চুক' শব্দ করে সমবেদনা জানান। তারপর ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলেন, 'মালুম হ[illegible] কি তুমি বাংগালী, আছ, তাই না?'

ঘাড় নাড়ে গবু—তাও কোনমতে।

'আহা রে, খাওনি কুছ সবেরেসে আর এই পাহাড়ে উঠছ! পিয়াস ভি লেগেছে বহোৎ! ...ঠারো, হামি বেবস্থা করছে—'

এই বলে তিনি ওপরের পাহাড়ের দিকে মুখ তুলে একটা কি রকম অদ্ভুত আওয়াজ করলেন—'হো-ই-ই' এই ধরনের। বেশ জোরেই শব্দ করলেন, মনে হলো যেন ইঞ্জিনের ভোঁ বাজলো একটা, সে শব্দ চারিদিকের পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে যেন ঘা খেয়ে ঘুরতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে।

এইবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলো গোবু।

পাহাড়ের খুব উঁচু অংশেও কতকগুলো গোরু চরছিল—তা এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। সেই গোরুদের মধ্যে তিন-চারটে হঠাৎ যেন হন্তদন্ত হয়ে এইদিকে নামছে এবার—তারই শব্দে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে পেলো এ জিনিসটা। এত উঁচুতে গোরু ওঠে? উঠতে পারে? ঐ ভারী দেহ নিয়ে? আর গোবু পারলো না ভাবতে। ওখানে কি খায় ওরা? অত উঁচুতে কি ঘাস আছে? আচ্ছা ওরা—ঐ তিনটে গরু অমন ধড়ফড় করে নামছেই বা কেন? সে কি এঁর এই ডাক শুনে? বাবা বলেন ডাকাতরা ভয় দেখাতে 'হাঁকার' দেয়—একেই কি হাঁকার বলে?

এমনি হাজারো প্রশ্ন মনে আসে ওর—তিন চার মিনিটের মধ্যে।

আর গোরুগুলোও প্রায় ঐটুকু সময়ের মধ্যেই নীচে নেমে এলো, ওদের কাছে এসে পৌঁছলো একেবারে। উড়ে এলো নাকি? অতখানি মাংসের ভার নিয়ে পাকদণ্ডী-পথে এত তাড়াতাড়ি নামলো কি করে—কৈ গড়িয়ে পড়ে তো গেল না!

গরুগুলো আসতেই 'চুক' 'চুক' শব্দ করে—গাড়োয়ানরা যেমন করে বলদ দাঁড় করায় তেমনি ভাবে ওদের দাঁড় করিয়ে দিলেন সাধুজী। তারপর একে একে সব ক'টার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, দেখছ খোঁকা, কিৎনা লছমী আছে এই গাইয়ারা। এমনি ডাক দিই আর বেটিরা এসে আমাকে দুধ পিয়াইয়ে যায়। হামাকে না হয় রসুই করতে, না হয় ভিক্ষায় যাইতে। ঠাহরো, বেটি ঠাহরো। আজ এই বাচ্চাটাকে একটু দুধ পিয়াইয়ে দাও দিকি—।'

এই বলে সাদায়-পাটকিলে-রঙে-মেশানো যে বড় গোরুটা—তার বাঁটে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, 'আ যাও, আ যাও বেটা—দুধ পিয়ে লাও। অঁজলা পাতো হাতে, আমি দুধ দুয়ে দিচ্ছি, যেমন জল খায় তেমনি খাইয়ে লাও...।'

এবার গলার স্বর ফুটলো গোবুর।

অতবড় গোরুটার পেটের নীচে বসে আঁজলা পেতে দুধ খাওয়া, যদি লাথি ছোঁড়ে! সে সভয়ে বলে উঠলো, 'না না, সে আমি পারবো না।'

'কিঁউ? ডর লাগতা কেয়া? কুচ্ছু ডর নেই। ও গরু কুচ্ছু বলবে না।'

'না, তা হোক্, সে আমি পারবো না।' বেশ জোরে ঘাড় নাড়ে গোবু।

'কেয়া মুশকিল! আচ্ছা এক কাম করো, তুমহারা ঐ খিলৌনাকে মাফিক লোটা দেও। উসিমে ভর দেগা। লেকিন বহোৎ দুধ গিরে যাবে বাহার, বরবাদ হোবে। ক্ষীর কা মাফিক দুধ হ্যায় হামার ইয়ে বেটির।'

এবার অন্য কথা মনে পড়লো গোবুর। সে কলকাতার ছেলে, প্রায় জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত বাবা কাকা মামার মুখে এ সব কথা শুনেছে—বললে, 'কিন্তু কাঁচা দুধ খাবো কি করে? দুধ তো স্টেরিলাইজ করে নিতে হয়! অনেক রকমের রোগের বীজ থাকে যে গরুর দেহে—ব্যাক্টিরিয়া—!'

এবার সাধু যেন বেশ একটু রেগেই উঠলেন, বললেন, 'হাঁ হাঁ, সে থাকে তুমাদের মুলুকে। হিঁয়া বীজাণু কাঁহাসে আয়েগা!... কাঁচা দুধ পিনেসে কিয়া হোগা, মর জায়গা! আউর নেহি পিনেসে? জিন্দা রহোগে?...... হামার এই শরীর দেখছ? ঐ দুধ পিয়েই ইৎনা তাগড়া—মরে তো যাইনি।'

কথাটা ঠিক, তা গবুও মানতে বাধ্য। সে একটু লজ্জাও পেলো। আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে এবার সে এগিয়ে গিয়ে আঁজলা পাতবার চেষ্টা করলো। তবে অভ্যেস নেই বলে—দু একবার অপরকে দেখেছে, তাও অত ভাল করে লক্ষ্য করেনি—ঠিক হলো না। সাধুজী তখন দুটো হাত ওর ঠিক করে পেতে দিলেন, তারপর দুইতে শুরু করলেন—চ্যাঁক চোঁক।

আঃ, ঠাণ্ডা কোথায়, এ তো বেশ গরম দুধ! আর কি মিষ্টি! দুধ এত মিষ্টি হয়? এমন তো কখনও খাইনি!

একেবারে খালি পেট আর গলা শুকনো—প্রথমটা খেতে একটু অসুবিধেই হলো—পেটে গিয়ে আবারও সেই মোচড়। তারপর অবিশ্যি সব ঠিক হয়ে গেল। পেটভরেই খেলো সে—ক্ষীরের মতো সেই দুধ। অনেকটা খাবার পর হাঁপ ধরতে মুখ তুললো একেবারে।

সাধুজী সবই লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, 'লে আও, তুমহারা ঐ জায়গাটা ভি ভরিয়ে লাও, পরে আবার পিয়াস পেলে কি ভুখ লাগলে খাইতে পারবে। কুছু বাহার পড়বে—তা কি আর হোবে—লাও, লাও!'

নিজেই ধরে ওয়াটার-বট্‌লটাও ভরে দিলেন তিনি। তারপর গরুটার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'যা যা বেটি। বহুৎ হো গিয়া। অর তুমভি থোড়া কুছ খা নেও।'

যেন মানুষের মতোই ওঁর কথা বুঝে তারা আবার সেই পাহাড়ের প‌থ ওপরে উঠে গেল।

॥ ৪ ॥

'লেও, আব বলো, ক্যা বাত হ্যায়! হিঁয়া কাহে আয়া, আউর ক্যায়সে আয়া! বাংলামে হি বলো, হামি সমঝে লেব।' সাধুজীও ওর পাশে পা ছড়িয়ে বসে জিজ্ঞেস করলেন।

সে কথার উত্তর না দিয়ে যে কথাটা জানার জন্য ও ছটফট করছিল সেইটেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বাংলা জানলেন কি করে?'

'হা রে বোকা! হামি বাচপনমে বহোৎ রোজ কলকাত্তা ছিল। হামার বাবা পুলিসে কাম করতেন ওখানে। ইনিস্‌পিকটার ছিলেন। হামি ইস্কুলে পড়িয়েসে ওখানে—বিশুদ্ধানন্দ

সরস্বতী ইস্কুলে। তারপর সন্নিয়াস নেবার পর ভি বাংগালকে সব তীরথ ঘুরে দেখেসে বহুৎ রোজ ধরে। আগে তো আউর ভি আচ্ছা বলতাম, এখন ভুলিয়ে গেসি। সো বাত ছোড়ো—অব তুমহার কোথা বোলো।'

বললো গোবু, সবই বললো। গুরুদেবকে কড়া কড়া কথা বলা—তার আসল কারণটা যে নিজের রাগ—তাঁর পালিয়ে আসা সবই বলল। নিজের কাজের জন্য তার অনুতাপ হয়েছে খুব, সেই জন্যেই এমন বোকার মতো এই পাহাড়ে পথে খুঁজতে এসেছে—শুনে সাধুজী খুশিও হলেন! আবার ওর ছেলেমানুষীতে খুব হা-হা করে হাসলেনও।

তারপর বললেন, 'তুমি তাঁকে এইভাবে ঢুঁড়তে এসেছে, ভেবেছ তিনি এইভাবে হাঁটছেন? তিনি, সমঝ লেও—হয়তো এখন সেই বহুৎ দূরে। গঙ্গামাইকী জনমস্থান গোমুখ পৌঁসে গিয়েছেন, নেহিতো সিধা চলে গিয়েসেন—কেদার বাবার ডেরায়।'

'দূর, তা কখনও হয়!' অবিশ্বাস্যের হাসি হেসে বলে গোবু, 'নব্বুই-নিরানব্বুই বছর বয়েস হবে, দু'পাও ভাল করে চলতে পারেন না—তিনি কি করে দুদিনে এতদূর চলে যাবেন!'

আবার হাসেন সাধুজী, তেমনি হা-হা করে। সে হাসির শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে এমন প্রতিধ্বনি তোলে, গোবুর মনে হয়, ওপরে সেই দূরে তাদের তাঁবু থেকে বাবা-মা শুনতে পাচ্ছেন।

সাধুজী বলেন, 'মানলাম তুমহার কথা, বহুৎ বুড্ঢা আছেন সে বাবা, তাহলে তো এখনও ঐ গঙ্গা কিনারে কোথাও পড়ে থাকতেন, তুমি এপারে এসেই দেখতে পেতে। হয়ত মরেই পড়ে থাকতেন। ইৎনা দূর আসার পরও দেখতে পেলে না কেন তুমি!'

'হয়ত তিনি অন্য কোন পথে গেছেন—যা আমি জানি না, হয়ত খুব কাছেই আছেন।'

'নেহি নেহি বেটা। হামার বাত মানো—সাধু যাঁরা, ইৎনা বড়ামানকা সাধু, এঁরা তোমাদের কাছে তোমাদের মাফিকই থাকেন, লেকিন ওরা হিচ্ছা করলে অনেক খেল দেখাতে পারেন। এক দিনে চারশো মিল দূরে পৌঁছানো ওঁদের কাছে লেড়কাকা খেল। উমর—কি যেন বলো তোমরা, বয়স—সে ওখানে, এখানে এসে নওজোয়ান বনে যান। ওঁদের যে শক্তি থাকে, বিভূতি বলা হয়—ওঁরা দেখাইতে চান না সব কোইকো।'

'তাহলে কি হবে! আর দেখাই পাবো না কোন দিন?'

হতাশভাবে বলে গোবু।

সাধু খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন চুপ করে, তারপর বলেন, 'তুমি সত্যিই যেতে চাও? দেখতে চাও তাঁকে?'

'হ্যাঁ, চাই।' গলায় খুব জোর দিয়ে বলে ওঠে গোবু, দু'হাতে ওঁর একখানা হাত চেপে ধরে বলে, 'আপনি পারবেন দেখা করিয়ে দিতে? আমি শুধু তাঁর কাছে মাপ চেয়ে নিতে চাই একবার।'

'হ্যাঁ পারবো। উমীদ হয় কি ঠিক ঠিক পঁওছিয়ে দিবো। এখানে এই দেওতাত্মা হিমালয়মে সাধু মহাৎমাদের বহুৎ ঘাঁটি আছে। খবর চলে যায় তুরন্ত—এক ঘাঁটি থেকে আউর এক ঘাঁটিতে। দনাদ্দন। লেকিন তার পহেলা ঘাঁটিতে পঁওছাতেই অনেক কষ্ট হবে, পারবে সহ্য করতে?'

'খুব পারবো। আপনি সঙ্গে থাকবেন তো? আপনি থাকলে কোন ভয় নেই। আর খেতেও তো পাবো। বেশ চলে যাবো।'

'হ্যাঁ, ভোজন মিলবে জরুর। মগর্ সে তুমাদের মতো ডাল ভাত মছলি নয়। হয়ত এই রকম দুধ খেয়েই থাকতে হবে ক'দিন। দুধ খুব আচ্ছা চীজ আছে, আহারকে আহার, জলকে জল।'

'হ্যাঁ, পারবো থাকতে। নিয়ে চলুন। আপনার পায়ে পড়ি।'

'তব্ উঠো। তৈয়ার হয়ে যাও। লেকিন তুমি তো এ পথে পায়দল যেতে পারবে না, গাড়হিও নেই এখানে, ঘোড়া ভি নেই। তোমার পায়ের তো সয়েদ এখনই কেটে গেছে জুতোর মধ্যে। এক কাম করো, জুতো খুলে এখানে রেখে যাও, ওয়াপিস আসার সময় নিয়ে যেও। নেহি তো হামি ভেজিয়ে দিবো।'

খালি পায়ে, যেন কেঁদেই ফেললো গোবু! 'খালি পায়ে হাঁটতে পারবো? পা তো আরও ফেটে যাবে?'

আবারও হা হা করে হাসলেন সাধুজী। বললেন, 'শখ তো বহুৎ, এখনই রোতে শুরু করলে! আরে বুদ্ধু, পাহাড়ে খালিপায়েই চলা আরাম—জুতোপায়ে এ পথে জ্যাদা হাঁটলে পা কেটে যায়, পায়ে ঘা হয়।' তারপর একটু মুচকি হেসে যেন চোখ টিপে বললেন, 'ডরো মৎ বেটা, তোমাকে আমি বয়ে নিয়ে যাবো, যেমন ভাবে পাহাড়িরা ভারী সামান বয়ে নিয়ে যায়। নইলে তোমার সঙ্গে হেঁটে গেলে আমার দু'মাস লেগে যাবে সে আড্ডামে পঁওছাতে।'

তা সাধুজী করলেনও বটে একটা কাণ্ডকারখানা!

প্রথমেই তো জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই একটু উপরে উঠে গিয়ে খালি হাতে কি একটা গাছের মোটা ডাল মট্ করে ভেঙে নিলেন। তারপর সে ডালে ছোট ছোট যে ডাল থাকে, প্রশাখা বলে ভাল বাংলায়, (সেগুলো যেমন শক্ত তেমনি তার গায়ে কাঁটা)—তাও না ছুরি না কাটারি—শুধু হাতে টপ টপ ভেঙে সাফ করে নিয়ে একটা লাঠির মতো করে নিলেন।

গোবু ব্যস্ত হয়ে বলে, 'আহা-হা, করছেন কি, হাত কাটবে যে!'

সাধুর সেই প্রচণ্ড হাসি আবারও, তারপর দু'হাত ওর চোখের সামনে মেলে ধরে বললেন, 'কৈ, কাটেনি তো!'

'তা আপনার নিজের লাঠিটা নিলেন না কেন?' এটা যে পাহাড়ে পথ চলবার লাঠি তা না জিজ্ঞেস করেই বুঝে নিয়েছিল গোবু।

'হামার লাঠি? আমি কি লাঠিয়াল! হামার লাঠি কেন থাকবে? লাঠি কি দেখছ হামার?'

'তা এই যে ওঠা-নামা করেন!'

'তার জন্যে লাঠি কি হবে, পা-ই তো বহুৎ।'

'শিব, শিব। জয় শংকরজী।'

এই বলে লাঠিটা একটা গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে রেখে তিনি নিজের গেরুয়া রঙের উত্তরীয়খানা খুলে নিলেন, তারপর উবু হয়ে বললেন, 'নাও, এবার তুমি আমার পিঠে চড়ে যাও। যেমন বাচ্চারা বসে, হাত দুটো বেড়ে গলাটা পাকড়ে—তেমনি আমার গলাটা পাকড়ে ধরো, আমি উঠে দাঁড়ালে পায়ের ভি বেড় দেবে—কেমন?'

'এই ভাবে নিয়ে যাবেন—সে কি!'

গোবু অবাক।

এবার বিকট একটা ধমক দিয়ে উঠলেন সাধুজী, 'আঃ, তুমি বহুৎ বকোয়াত করো! তুমাদের ইস্কুলে খালি বাতই বলতে শিখায় বুঝি! লিখাপড়ি কিছু শিখায় না? পাহাড়ীরা কেমন করে ছেলেমেয়ে নিয়ে যায়, কখনও কি তার চিত্র ভি দ্যাখোনি?'

ধমক খেয়ে ভয়ে ভয়ে সেই ভাবেই গলা ধরে ওর পিঠে গা এলিয়ে দিলো গোবু। বিরাট চওড়া পিঠ, কোন অসুবিধেও হলো না। দু'হাত দিয়ে ওঁর গলাটাও ধরলো। দাঁড়িয়ে একটু সুড় করে—কিন্তু কি আর করা যায়!

তারপর সাধুজী সেই চাদরটা গুছিয়ে নিয়ে ওর পিঠ পাছা জড়িয়ে দুই প্রান্ত নিজের সামনের দিকে নিয়ে এসে বেশ ভাল করে নিজের কপালের সঙ্গে বাঁধলেন, যেমন দার্জিলিঙে দেখেছে গোবু, চা-বাগানের কুলী মেয়েদের ছবি দেখেছে। তবে সে সেলাই করা পাটির মতো তৈরিই থাকে, শুধু লাগিয়ে নেওয়ার ওয়াস্তা এ কাপড়ের বাঁধন।

'শিব, শিব। জয় শংকরজী।' বলে সাধু এবার হঠাৎই উঠে দাঁড়ালেন।

গোবু তো বিষম চমকে উঠেছিল সেই সময়টায়, বুঝি পড়েই যাবে! কিন্তু দেখলো—না, সাধুজী বেশ ভালই বেঁধেছেন, ও একটু হেললো না পর্যন্ত।

সাধুজী হাসলেন, বললেন, 'ডরে গিছলে, না? ভাবলে গড়িয়ে একেবারে নিচেই পড়ে যাবে! নেহি নেহি, তুমি এবার আমার গলা ছোড়িয়ে দাও। বেফিকির বসে থাকো, বহুৎ আরামসে। দুধের বোতলটা বরং ধরে রাখো হাতে—পিয়াস কি ভুখ লাগলে খেয়ে নিও।'

'তা আপনি, আপনি কিছু নিলেন না?'

ক্রমশ যেন বেশী অবাক হয়ে যাচ্ছে গোবু।

'হামি? হামি কি নেবো? আর নেবার আছেই বা কি?'

'কি লাগবে—'

'যখন ভুখ লাগবে—কোই ব্যবস্থা হয়েই যাবে, যেমন আভি দেখলে।'

'অন্য কাপড়-চোপড়?'

'কাপড়া আর নেই তো, এই যা আছে। দুসরা কাপড়া পাবোই বা কোথায়, বইবে কে?'

'তা চান করেন না?'

'হ্যাঁ, করি।' চলতে চলতেই উত্তর দেন সাধুজী, 'দরকার বুঝলে, জল মিললে করি—সে এমনি শুখা হয়ে যায়, গায়েই শুখায়। নয়তো কই গাছের ওপর মেলে দিই।'

'তা আপনার কুটিয়ায় যাবেন না একবার?' কুটিয়া শব্দটা এখানে এসে শিখেছে গোবু।

'কুটিয়া তো হামার নেই।'

'কুটিয়া নেই, তাহলে থাকেন কোথায়? কোন আশ্রমে?'

'কেন, এই তো আছি! পাহাড়ে-জঙ্গলেই ঘুরি। যেখানে নিদ আসে, সেখানেই শুয়ে পড়ি।'

'ওমা, সে কি! বৃষ্টি এলে?'

'আসে তো। হামেশাই আসে।'

'ভিজে অসুখ করে না?'

'কৈ, করেনি তো! কালই তো ভিজেছি।'

'শীতকালে কি করেন?'

'সর্দি তো এখানে বছরে আট মাস। আউর ভি যদি উপরে উঠো দেখবে সেখানে বারো মাহিনাতেই জাড়া। হামাদের লাগে না।'

হঠাৎ একটা সন্দেহ দেখা দিলো গোবুর, 'তা আপনি এই যে ছাই মেখেছেন কপালে—মানে বিভূতি—এ কোথায় পেলেন?'

'কোই কোই মহাৎমা আছেন, তাঁদের বারো মাসে ধুনি জ্বলে, যখন যাই একটু মেখে নিই। কাল এমনি এক জাগাহমে গিয়ে পড়েছিলুম।'

বলছেন আর সাধু পাকদণ্ডী রাস্তা বেয়ে হু-হু করে উঠে যাচ্ছেন। তার জন্যে, এত বড় একটা ভার আছে পিঠে তা সত্ত্বেও কৈ হাঁপাচ্ছেন না তো! এত যে কথা বলছেন তাও তো বেশ সহজ ভাবেই!

একটু চুপ করে থেকে গোবু বলে, 'তা আপনি কোন আশ্রমে থাকেন না কেন?'

'বহুৎ বখেরা। হরেক আশ্রমের হরেক কানুন আছে, সেই মতো চলতে হয়। যত আদমি তত কেজিয়া ঝগড়া—বুঝলে না! তাতে আনন্দ থাকে না মনে, ভগবানকে ডাকা ভি যায় না।'

'কোন কুটিয়াতে তো থাকতে পারেন।'

'নেহি নেহি। ওতে ভি বহুৎ গোলমাল। ঘর হলেই জিনিস জুটবে, তার জন্যে দরওয়াজা চাই, কুলুপ লাগাইতে ইচ্ছে করবে। মেরামতি আছে—সে ভি এক সোংসার। হামি বেশ আসে।'

এই বলে, গোবু পাছে আরও বকবক করে আর সেজন্যে ওঁকেও করতে হয়—গুন-গুন করে কি একটা স্তোত্র গাইতে শুরু করলেন সাধুজী।

॥ ৫ ॥

এ কতদূর উঠছেন উনি! কত উঁচুতে এসে গেলো ওরা! বাপ রে, কি ঠাণ্ডা! শীত করছে!

সেটা বুঝলেন সাধুজী। বললেন, 'সর্দি লাগছে খুব, না? ডর নেহি, এত জাড়া থাকবে না। এবার আমরা পাহাড়টা পার হয়ে এসেছি, এবার নামার পালা 'আঁধিয়ায় আসার আগেই খানিকটা নিচে পৌঁওছিয়ে যাবো।'

গেলেনও পৌঁছে। লোকটি হাঁটছেন না তো—যেন উড়ে চলেছেন। এই পথে এত জোরে যাওয়া যায়! তায় খালি পা! তারপর ওর মনে হয়, ওঠার থেকে নামা আরও শক্ত এ সব পাহাড়ে রাস্তায়।

তবু এক সময় বেশ অন্ধকার হয়ে আসে চারিদিক। ওরা অনেকটা নিচের দিকে এসেছে বলেই আরও এত তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা মনে হচ্ছে। এখনও পাহাড়ের ওপরদিকগুলোতে রোদের আভাস লেগে আছে—ওখানে অন্ধকার হবে অনেক দেরিতে, অথচ ভোর হবে সকলের আগে।

এই দীর্ঘ পথ আসতে আসতে ওয়াটার-বট্‌লের দুধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ক্ষিদে পেয়েছে খুব, পিপাসা আরও বেশী। জলের তেষ্টা দুধে মেটে না। সাধুজীও বোধ হয় তা বুঝলেন, হঠাৎ এক জায়গায় থেমে উবু হয়ে বসলেন। তারপর বুকের কাছের গেরো খুলে উত্তরীয়খানা আলগা করে বললেন, 'আর উত্‌রো বেটা, পানি নজদীগ্ আ গয়া। পিয়াস লেগেছে খুব, না?

কাছেই জল আসে ('ছ'টা প্রায়ই স-এর মতো উচ্চারণ করছিলেন উনি), ঝরনার জল, বহুৎ উমদা আর মিঠা। মুখ হাত ধুইয়ে লাও, দিল চাহে তো আস্নান ভি করতে পারো। তবে ঠাণ্ডা জল—আস্নান না করলেই ভাল। আমি তোমার খাওয়ার যোগাড় করি।'

খাওয়া আর কি। এ বনে কোথায় বা কি পাবেন উনি? ঐ শুধু দুধ। আবার সেই আগের মতো একটা বিকট হাঁকার দিলেন—'হৈ—ঐ—ঐ—এম' এমনি গোছের। আবারও সেই মাথার দিক থেকে গোরু নামার শব্দ।

সাধুজী গোরুর ভাষা বোঝেন নাকি? না সব জীব-জন্তুর ভাষাই? আগেরবার মনে হয়েছিল ঐ গরু দুটো ওঁর পোষা, অনেকদিনের অভ্যেসে ঐ ডাকটা বুঝতে শিখেছে। কিন্তু এখানের গরুও দেখা যাচ্ছে নেমে আসছে। দুড়দুড় করে—একটা নয় তিন-চারটে।

তখনও মুখ হাত ধোওয়া হয়নি গোবুর। একভাবে অনেকক্ষণ থাকার জন্যে কেমন যেন সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তবু তো বার দুই 'হালকা' হবার জন্যে নেমেছিল পথে। বুকটাতেও যেন ব্যথা লাগছে। সাধুজীর চওড়া পিঠ, তাতে মাংসও বেশ, মানে হাড় বার করা হয়, সে পিঠে বুক দিয়ে লাগেনি কিছু—তবু একভাবে থাকা তো! আর সাধুজী দ্রুত হাঁটছেন, পেশীগুলো সেইভাবেই নড়ছে অনবরত। পালকার পেশী ফুলে ফুলে উঠছে, সে জন্যেও ওর বুকের পেশীতে ব্যথা হতে পারে।

তবে বেশীক্ষণ বিশ্রামের অবসর ছিল না। গোরুগুলোর গলায় হাত বুলোতে বুলোতে প্রচণ্ড তাড়া লাগালেন, 'যাও যাও বেটা, ঠাহরা কাহে। আস্নানা নেহি তো মু হাত ধোনা—যো করবার করিয়ে লাও। গোরুরা তো এখানে খাড়া থাকবে না। এ জঙ্গলে শের আছে, ওরা সন্‌ঝার আগে উপরে উঠে যাবে।'

শেরের ভয়! শের মানে তো বাঘ! বাঘ আছে এ জঙ্গলে? তাহলে ওদের কি হবে?

ভয় যতই হোক, দাঁড়াবার সময় নেই। গোরুদের যত না তাড়া ওর পেটের তাড়া অনেক বেশী। সকালের সে দুধ কখন হজম হয়ে গেছে। সে আর স্নানের হাঙ্গামা করলো না, দৌড়ে গিয়ে ঝরনার জলে মুখ ধুয়ে নিলো, আঁজলাভরে একটু খেয়েও নিলো সেই মিষ্টি আর ঠাণ্ডা জল। আঃ কি ঠাণ্ডা পরিষ্কার জল! নিচের ছোট ছোট নুড়ি পাথরগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে! স্নান করে নিলে হতো—কিন্তু ওধারে তাড়া লাগাচ্ছেন সাধুজী,—এদিকেও অন্ধকার হয়ে আসছে খুব তাড়াতাড়ি, আর একটু পরে হয়ত নজরই চলবে না।

তার উপর বাঘ!

সত্যিসত্যিই বাঘ আছে নাকি এ জঙ্গলে?

ভয়ে বুক গুরগুর করছে—আবার কৌতূহলও জাগছে। জঙ্গলের বাঘ—সে কেমন কে জানে! চিড়িয়াখানার বাঘের মতোই কি?

গোবু তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে ঘাড়ে মাথায় জল দিয়ে পা দুটো ডুবিয়ে রুমালে মুছতে মুছতে ছুটে এসে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে এক দৌড়ে একবার মুখে জল দিয়ে এসেছেন সাধুজীও। বোধহয় জলও খেয়ে নিয়েছেন একটু। তার মধ্যে গোরু দুটোও একটু জল খেয়ে নিয়েছে ঝরণায়।

এবার গোবুকে প্রস্তুত দেখে সাধু মহারাজ একটা গোরুর দুধ দুয়ে গোবুকে খাওয়ালেন—বললেন, 'ভরপেট খেয়ে লাও বেটা, কালকের আগে আর কুছ মিলবে না—না দুধ না আউর কোই খানেকা চীজ। ঐ পানিকে বোতলসে ভি ভরে লাও একটু। ঠাহরো, আমি ওটা ধুয়ে এনে দিই।' জলের জায়গাটা ধুয়ে এনে সেটাও ভরে দিলেন। তারপর অন্য একটা গোরুকে ধরে নিজেও বেশ খানিকটা দুধ খেয়ে নিলেন। এক হাতে দুইছেন আর এক হাত বাটির মতো করে সামনে ধরে চুমুক দিয়ে খাচ্ছেন।

অনেকক্ষণ ধরে খাওয়ার পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অব হো গিয়া—যা চলি যা বেটি।'

আশ্চর্য, সত্যিই কথাটা ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা সেই ড্রিলের 'রাইট অ্যাবাউট টার্ন' করে আবার ওপর উঠে গেল। এবার যেন একটু বেশী জোরেই—কারণ বেশী অন্ধকার হয়ে গেলে পথ দেখতে পারবে না, অথচ নিচেও থাকা চলবে না শেরের ভয়ে।

কিন্তু গোবুর মাথায় কথাটা কিছুতেই ঢোকে না—ওখানের গোরু হয়ত চেনা হতে পারে, এরা এমন ওঁর হুকুমে চলে এলো কেন, আর দুধ খাইয়েই উপরে উঠে গেল— সে-ই বা কি বুঝলো! কি বুঝলো ওরা, কি করে বুঝলো?

বলেও ফেললো কথাটা, 'আপনার ডাক শুনে গোরু তিনটে চলে এলো—এ কি আপনার চেনা গোরু?'

'আরে বেটা, দুনিয়াভর আমার চেনা গোরু থাকবে কেমন করে—বুঝাইয়ে দে দিকি!'

'তবে?' আরও যেন ঘুলিয়ে যায় গোবুর মাথাটা।

'তোবে আবার কি! গো মাতা সাক্ষাৎ ভগবতী, দুর্গা দেবি আছেন। মা তাঁর ছেলেদের খাওয়াইবেন না! ওঁরা না খিলাবেন তো কে খিলাবে বল!'

'তা ওঁরা তো সবাইকে এমনি খাওয়ান না!'

'কেউ কি ওঁদের ওপর ভরসা করে বসে থাকিস তোরা! যে বাইরে চেষ্টা করে কোশিস করে খানা যোগাড় করে তাকে খিলাইবেন কেন। যে বাচ্চা মা'র কাপড়া পাকড়কে চুপসে তাঁর কাছে বসে থাকে তাকেই মা খিলাইবেন—ঠিক কিনা?'

কথাটা যে ঠিক তা নয়।

এসব কথা বোঝা কি বিশ্বাস করার বয়স নয় গোবুর। সে এমন কখনও দেখেনি, শোনেওনি।

এবার সাধুজী এক প্রশ্ন করলেন, 'গাছে চড়তে পারিস বেটা?'

'গাছে? না, সে একটু-আধটু। শহরে থাকি, গাছ কোথায় যে চড়বো? ইস্কুলে একটা কাঠ-চাঁপার গাছ আছে, তাঁর একটা ডাল একটু হেলানো, তাতেই চড়ে ফুল পাড়ি মধ্যে মধ্যে—'

'তবে তো মুশকিল। খয়ের, এক কাম করো, আমি তোমাকে উঁচু করে উঠাইয়ে দিচ্ছি, ঐ যে বড় দুটো ডালের খাঁজ দেখছ—এটা শিশমকে পেড় আছে, বহুৎ মজবুত, ঐ খাঁজটা

ধরে নিয়ে চড়ে বসো। অনেকখানি উঁচুতে আছে, ওখানে বসলে আর কোন জানোয়ার হঠাৎ উঠতে পারবে না। ওখানে দুদিকে পা ঝুলিয়ে বসতে পারবে—বড় গুঁড়িটাতে ঠেসও দিতে পারবে। লেকিন আউর এক কাম করনে হোগা,—তুমি শাকবে—মানে পারবে এই চাদরটা ঐ গুঁড়ির সঙ্গে জড়িয়ে এনে নিজের বুকের কাছে বাঁধতে? খুব শক্ত করে বাঁধতে হবে কিন্তু!'

'কেন?' বোকার মতো প্রশ্ন করে গোবু।

'কঁউ—আবে বেঅকুব, সারা রাত বসে থাকলে, তুমি বাচ্চা—তোমার নিদ আসবে না? আর নিদ এলে তো গিরে যাবে নিচে—গিরতে পারবে না।'

ধমক খেয়ে আর বোকা উপাধি পেয়ে গোবুর লজ্জা হলো। এত ঝঞ্ঝাট তো সাধুজীর ওর জন্যেই—বলতে গেলে ওর বোকামির জন্যে।

সে বললে, 'না না, সে আমি পারবো। আপনি নিচে থেকে দেখে নিন, বাঁধনটা ঠিক হচ্ছে কিনা।'

সাধু তখন অনায়াসে একটা হালকা ফুলের ডালার মতো মাথার ওপর তুলে ধরলেন, তাও পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে—যতটা সম্ভব উঁচু করা যায়।

তবে দুটো ডালের খাঁজও অনেকটা উঁচুতে। গোবুকেও রীতিমত কসরৎ করতে হলো সে ডাল ধরে ওপরে উঠতে। ডালটা অবশ্য বেশ মোটা আর একেবারে সোজা বেরিয়েছে একটা রাইট অ্যাঙ্গল সৃষ্টি করে।

'হুয়া? অব মজেমে বৈঠো। লেও, ইয়ে লুগা পাকড় লেও।'

এই বলে তিনি উত্তরীয়খানা গুটি পাকিয়ে বলের মত করে ছুঁড়ে দিলেন একেবারে ওর কোলের ওপর।

কিন্তু গাছের গুঁড়িটা খুব বড় না হলেও নিতান্ত সরু নয়। হাত পিছন করে বেড়ে ধরা ওর পক্ষে সহজ নয়—তাও সামনের দিক থেকে বেড়ে ধরা আর পিছন করে বেড়ে কাপড়ের খুঁট ঘুরিয়ে আনার অনেক তফাৎ।

সাধুজী প্রায় এক লহমায় বুঝে নিলেন ব্যাপারটা। তিনি তরতর করে উঠে গিয়ে কাপড়টা নিয়ে গাছের সঙ্গে জড়িয়ে দুটো খুঁটই ওর হাতে ধরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'লেও, আর জোরসে বাঁধ লেও, খুব কড়হা করে বাঁধো, আচ্ছা! খুলে না যায়। হাঁ অমনি। আউর ভি এক গি'ট দেও। ঠিক আছে? সাবাস্! দুধের বোতল ভি আছে তো কাঁধে? ঠিক হ্যায়। পিসাব লাগে ওর ওপর থেকেই কাজ সেরে নিও। সমঝ গিয়া?'

তারপর নীচে নেমে এসে চেঁচিয়ে বললেন, 'আমি ঐ সামনের পাথরে বসে রইলুম। ঘাবড়িও না। কোন জানোয়ারের আওয়াজ পেলেও ডরাবে না। শের এলেও না। আরে শের পহলে হামাকে খাবে তব তো তুমহারে পাশ যাবে। বহুৎ মাংস আছে হামার। দুটো শের খেলে ভি ওদের পেট ভরে যাবে। তোমাকে ছোঁবে না।'

এই বলে অনেকক্ষণ পরে আবার সেই আগেকার মতো পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তোলা হাসি।

পাথরটা ওর সামনেই, গাছতলা থেকে অল্প কিছু দূরে। সেইখানে গিয়ে বেশ আরাম করে কতকটা আসন-পিঁড়ির মতো করে বসলেন, না, ঠিক আসন-পিঁড়িও তো নয়। দুটো পা-ই যে হাঁটুর ওপর, উঁচুতে। হ্যাঁ হ্যাঁ—ওদের গুরুদেবও যখন ধ্যানে বসেন তখন এমনি করে বসেন বটে—ও জানালার ফাঁক থেকে দেখেছে। বাবা বলেন পদ্মাসন।

এমনি বসে থাকবেন নাকি সারারাত? পিঠ-ব্যথা করবে না? পিছনদিকে ঠেস দেবারও তো কিছু নেই। একটা ভাল গাছতলাতে বসলে ক্ষতি কি ছিল! মাঝে মধ্যে তো তবু ঠেস দিতে পারতেন। কে জানে এঁদের সব যেন আলাদা! ঐ যে মা বলেন না, কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ—এ ত যেন তাই।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়।

ঠিক সন্ধ্যাতেও নয়—এখানটা অন্ধকার হলেও মাথার ওপরে রোদ ছিল—গোবু যখন গাছে উঠেছে। ফলে ওর মনে হচ্ছে যেন কতক্ষণ কেটে গেল, কত রাত হয়ে গেল। ওদের বাড়িতে—কলকাতার বাড়িতে এখনও রান্না হচ্ছে। বাবা এখনও বাড়িই ফেরেন না। এখন কত রাত হবে, ন'টা? না দশটা? কিংবা এখনও হয়ত আটটাই বাজে নি। হাতে একটা ঘড়ি থাকলে ভাল হতো—আছেও ওর ঘড়ি, তাড়াতাড়িতে আনা হয় নি।

আগে ভরসা করে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দেয় নি। কে জানে হয়তো বিছে আছে, কি সাপ! ঠেস দিলেই কামড় লাগাবে। সে সাপ যে এতটুকু, এক দু ইঞ্চি তফাৎ গলা বাড়িয়ে অনায়াসে কামড় লাগাতে পারে—বিছেও তাই—সে কথাটা মনে পড়ে নি।

আসলে ভয়। একটা নাম না জানা গভীর আতঙ্ক।

এ কোথায় এসে পড়লো সে? আর কি কোন দিন বাড়ি ফিরতে পারবে? মা, বাবা, ছোট বোন, ওর কাকীমা বড্ড ভালবাসেন, দিদিমা কারণে অকারণে কত কি জিনিস উপহার দেন—তাঁদের কি আর জীবনে দেখতে পাবে?

এক একবার এমন মনে হচ্ছে, এ রাত আর শেষ হবে না। ঐ লোকটা সব পারে—কোন মায়াপুরীতে এনে ফেলেছে হয়ত।

এমনি পাঁচসাত চিন্তা ও ভয়ের মধ্যে একসময় তন্দ্রাতে দুচোখ ঢুলে আসে। পিঠও টনটন করছে সোজা বসে থেকে। অগত্যা ঠেস দিয়ে বেশ গুছিয়ে বসে, যাতে পড়ে না যায়। অবশ্য বাঁধন আছে, খুব 'বজ্রআঁটুনি' নয় তবে।

নিশ্চিন্তি হয়ে চোখ বোজার আগে একবার নিচের দিকে চেয়ে নিলো। নির্মল আকাশে অসংখ্য তারা গিজগিজ করছে—এত কলকাতা থেকে দেখা যায় না, কলকাতা কেন কাশী পুরী কোথাও থেকে নয়। তার ফলে বেশ যেন একটু আলো হয়েছে। তাতেই দেখলো সাধুজী তেমনি বসে আছেন সোজা হয়ে। মনে হলো যেন—ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না—চোখ চেয়েই আছেন সামনের দিকে আর তাতে পলক পড়ছে না। কে জানে বাবা, এঁদের সবই বিদঘুটে!

হঠাৎ কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল গোবুর।

চমকে উঠতে গিয়ে টলে পড়েই যেত নিচে, খুব বাঁচিয়ে দিলো বাঁধনটা। বসবার ডালটা ধরেই আবার সোজা হয়ে বসলো। তারপর চেয়ে দেখল নিচের দিকে।

আরে কতকগুলো কি ছোট ছোট জন্তু এসে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধুর চারিদিকে।

বাঘ? না, বাঘ নয়। বাছুরও নয়, আরও ছোট কোন জন্তু।

কুকুর, কতকটা কুকুরের মতো দেখতে। শিয়াল হয়ত—একেই কি শিয়াল বলে? এতদূর থেকে শুধু নক্ষত্রের আলোতে ভাল করে দেখাও যায় না। নাকি নেকড়ে বাঘ? নেকড়ে নাকি কতকটা শিয়ালের মতোই দেখতে হয়। পেটে কি একটা দাগ আছে, তাই থেকেই চেনা যায়।

কিন্তু যে জন্তুই হোক—ডাকছে না কেন? শিয়াল কুকুর নেকড়ে সব জন্তুরই তো ডাকবার কথা। হায়না নাকি হাসে মানুষের মতো। সব নিঃশব্দে ওর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আচ্ছা, ভূত নয় তো? জন্তুর বেশে এসেছে!

মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সমস্ত শরীরে যেন হিম বোধ হয়।

অনেক গল্পে পড়েছে, ভূত এমনি যে কোন চেহারা ধরে আসে।

আবার মনে হলো, না, তাহলে কোন শব্দই হতো না। ওর ঘুম ভেঙেছে যে শব্দে, তা শুকনো পাতার ওপর দিয়ে এদের হেঁটে আসারই শব্দে নিশ্চয়।

কি করবে ও, চেঁচিয়ে সাবধান করে দেবে?

কিন্তু তাতে যদি ওরা ক্ষেপে গিয়ে ওঁকে কামড়াতে থাকে!

তাই কিছুই করা হলো না। শুধু সেই অন্ধকারে চোখ মেলে চেয়েই রইলো সে। আর কেমন একরকমের অকারণ ভয়ে বুকে টিপ টিপ করতে লাগলো।

তবে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। হঠাৎ সেই জন্তুগুলোই পাগলের মতো এক কাণ্ড করে বসলো। কেন, কে এলো বা কি এলো, কি বুঝলো ওরা—যেন চোখের নিমেষে যে যেদিকে পারলো দৌড় মারলো।

তীরবেগে ছুটে যাওয়া—কথাটা শোনাই ছিল, এই আজ চোখে দেখলো: অনেকদিন আগে ঘাটশীলায় দেখেছিল এক আদিবাসীকে তীর ছুঁড়ে একটা পাগলা কুকুর মারতে। তাতেই তীরের গতির আন্দাজ আছে। তীরটা ছুঁড়তে দেখলো, পরের পলক পড়তেই দেখলো কুকুরটাকে বিঁধে এফোড় ওফোড় করে দিয়েছে। এদের দৌড়নোটাও সেইরকম। সত্যিসত্যিই চোখের পলক পড়তে না পড়তেই জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

তবে পায়ের শব্দ হলো ঠিকই, এতগুলো পায়ের দৌড়বার শব্দ, শুকনো পাতার ওপর দিয়ে!

কিন্তু তাতেও তো সাধুজী নড়লেন না একটুও। তেমনিই পাথর হয়ে বসে আছেন।

ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

না মারা গেলেন?

বাপ রে—তাহলে কি হবে?

কিন্তু কি হবে ভাবার আগেই আর এক ব্যাপার ঘটলো, আর একটি মূর্তির আবির্ভাব হলো।

প্রথমে খুব সন্তর্পণে নরম পা ফেলার শব্দ, তারপর একটা যেন কি ছায়ার মতো নড়তে দেখা গেল। তারপরই একটা বড়গোছের কি জন্তু সামনে এসে দাঁড়ালো। বড় জন্তু, এতক্ষণ শিয়াল বা কুকুরের মতো যে প্রাণীগুলো এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল ওঁকে তেমন নয়।

তারা কি—তারা হয়ত এর আসার শব্দ পেয়ে বা গন্ধ পেয়েই এমন ছুটে পালালো।
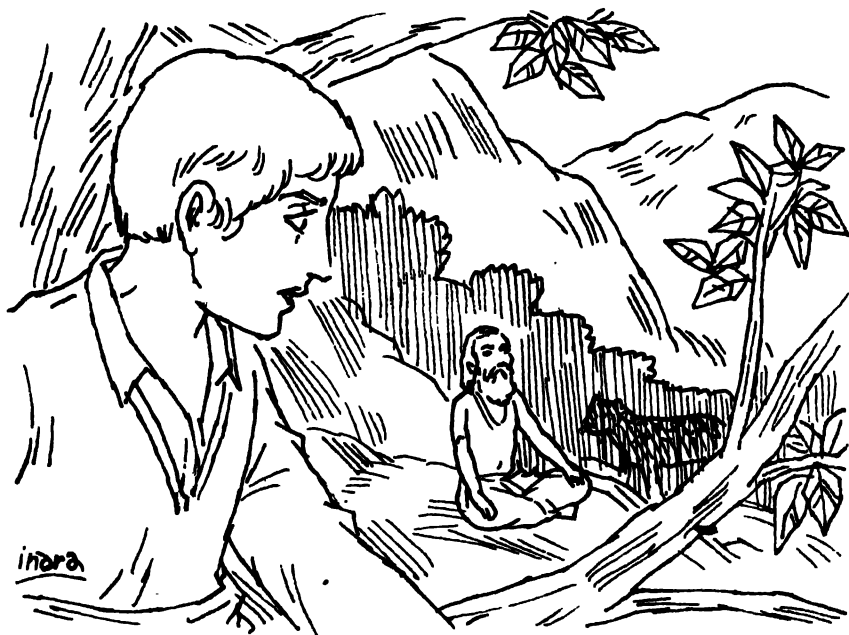
'এটা তাহলে কি জন্তু'—

এটা তাহলে কি জন্তু! সাধু বলেছিলেন শেরের কথা, শের মানে তো বাঘ। সেই জন্যেই ওকে বেঁধে দিয়েছেন, পাছে বাঘের ডাক শুনে ভয়ে গাছ থেকে পড়ে যায়। ওদের ডাক নাকি ভয়ানক, ঐ জন্যেই গর্জন বলে। অনেকে শখ করে শিকার করতে এসে সামনে ঐ মূর্তি দেখে আর ডাক শুনে পাগল হয়ে যায়।

বাঘ?

বাঘ যে গোবু দেখে নি তা নয়। আলিপুর চিড়িয়াখানাতে দেখেছে, সে কেমন মড়া-মড়া মতো, খেতে পায় না বোধ হয় ভাল করে। হ্যাঁ, বড় বাঘ দেখেছে লক্ষ্ণৌ-এর চিড়িয়াখানায়। বিরাট বাঘ। তবে ডাকে নি। ডাকটা কেমন শোনা যায় নি। ওর ভাগ্যে একবার এক সার্কাস

এসেছিল। তাতে বাঘের খেলা দেখায় নি, সিংহের খেলা ছিল, সিংহের ডাক শুনেছে। তবে পোষা জন্তু, আধপেটা খাওয়ানো—বাবা বলেন ওদের একটু একটু আফিং খাওয়ানো হয়—পাছে বেশী গোলমাল করে—তাদের ডাক আর কত জোর হবে!

ভয় হলো খুব—ডাকুক বা না ডাকুক।

নিজের জন্য অত নয়, হয়ত এত উঁচুতে উঠতে পারবে না—আর সামনে অত হৃষ্টপুষ্ট মানুষটা থাকতে তাকেই বা খেতে যাবে কোন্ দুঃখে! ভয় সাধুজীর জন্যেই বেশী। আর কতকটা, সেই কারণেই নিজের জন্যে—এ কোথায় এনে ফেলেছেন সাধুজী, এ জায়গাটাকে কি বলে কিছু তো জানে না। কাছে কোন লোকালয়ও তো বিকেলে চোখে পড়ে নি। উনি যদি এইভাবে বাঘের হাতে মারা যান—গোবুও তো না খেয়ে মরবে!

আর তাই বা কেন, ঐ বাঘটাও কি আর তাকে ছাড়বে? আজ খেয়েছে বলে কি আর কাল খাবে না? মুখের খাবার কে ছেড়ে দেয়?

প্রথমটা ভয়ে কাঠ হয়ে চোখ বুজে ফেলেছিল। কথাগুলো মনের মধ্যে খেলে যেতে তো এক মিনিটও লাগে নি। ক' সেকেণ্ডের ব্যাপার। ভয়—বিরাট ভয়, সীমাহীন ভয়। আর ভয়ে তো চোখ বুজবেই।

কিন্তু কৈ, নিচে তো সাড়াশব্দ নেই কিছু। বাঘটা খেতে আরম্ভ করলে সেও তো একটু শব্দ হবে। আর সাধু যত বড় সাধুই হোন, বাঘটা চিবুতে আরম্ভ করলে কি আর একটু চেঁচাবেন না!

সে আস্তে আস্তে একটু চোখ মেললো।

না, জন্তুটা সেই ভাবেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নড়ছে না চড়ছে না—শুধুই যেন সাধুজীকে দেখছে।

এবার গোবুও ভাল করেই দেখলো। যা আবছা নক্ষত্রের আলো তাতে চোখ সয়ে গেছে, মোটামুটি দেখা যায় বৈকি।

না, ডোরাকাটা বাঘ তো নয়, বরং গায়ে যেন কি ছাপ ছাপ দাগ।

হঠাৎই মনে পড়ে গেল। চিতা নয় তো? চিতা বাঘ! চিতার গায়েই তো এমনি দাগ থাকে। এদেশে বলে গুল বাঘা।

আবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো ভয়ে। এক মাস্টারমশাইয়ের মুখে শুনেছে, সব বাঘ মানুষ খায় না—কিন্তু চিতার কোন বাদবিচার নেই, সামনে যা পায় তাই খায়।

একবার ভাবলো চেঁচিয়ে সাধুজীকে সজাগ করে দেবে। আবার মনে হলো তাতেই বা লাভ কি! মাঝখান থেকে বাঘের দৃষ্টি পড়বে তার দিকেও! চিতারা বোধহয় গাছেও চড়তে পারে—বাপ রে!

আর তা ছাড়া, যতদূর এখান থেকে দেখা যাচ্ছে—সাধুজী তো চোখ চেয়েই আছেন। সোজা নদীর ওপারে পাহাড়ের দিকে চেয়ে বসে আছেন। অমন সোজা বসে আছেন কি করে সেই থেকে! আশ্চর্য, পিঠ-ব্যথা করে না! ও তো নিজে ঠেস দিয়ে বসে ঘুমিয়ে নিয়েছে তবু—তাতেই পিঠে রীতিমতো ব্যথা হয়ে গেছে।

তা হোক, সাধুজী তো আজ নির্ঘাৎ বাঘের পেটে যাবেন, তার কি হবে? তারও অদৃষ্টে এই আছে। বাবা মা টেরও পাবেন না। ভাবতেই আবার চোখে জল এসে গেল।

কিন্তু তা তো হলো—কৈ বাঘটা তো খাচ্ছে না এখনও! ঝাঁপিয়ে তো পড়লো না! ডাকছেও না তো!

চোখের জল মুছে ভাল করে তাকিয়ে দেখলো—বাঘটাও একদৃষ্টে সাধুজীর দিকেই তাকিয়ে আছে।

কি এত দেখছে? কোন্ দিক থেকে কামড়াবে? না আগে থাবা মেরে একটু একটু করে খাবে? নাকি টুঁটি ধরে ঝোলাতে ঝোলাতে নিজের বাসায় নিয়ে যাবে?

কিন্তু বাঘটা সেসব কিছুই করলো না। একবার মাটির কাছে মাথা নামিয়ে কি যেন শুঁকে দেখলো, তারপর আকাশের দিকে নাকটা তুললো। মানে এই সাধুজী ছাড়াও অন্য মানুষের গন্ধ পাচ্ছে, সে খাবারটা কোথায়?

খাবারটা দেখলোও।

একবার সোজা চোখ তুলে গোবুর দিকে তাকালো।

ঠিকই বলেছিলেন সাধুজী, বাঁধনটা না থাকলে গড়িয়ে ঠক করে নীচে পড়ে যেতো ঐ বাঘটার মুখের কাছে।

তবে বাঘটা ওকেও খাবার চেষ্টা করলো না।

বরং আস্তে আস্তে সাধুজী যে পাথরটায় বসে আছেন সেই পাথরটার চারদিক ঘুরে এলো, প্রদক্ষিণ করার মতো—(মজা দেখো, যেমন বিগ্রহকে ডাইনে রেখে প্রদক্ষিণ করতে হয়, যাকে বলে বামাবর্তে প্রদক্ষিণ, তেমনই ঘুরলো, উলটোদিকে নয়), তারপর আস্তে আস্তে তেমনিই নিঃশব্দে পা ফেলে আবার দূর অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণ ভয়ে যা হয়নি, ভয় সরে যেতে তাই হলো, গোবু গাছের গুঁড়িতে এলিয়ে পড়ে চোখ বুজলো। ঠিক ঘুম নয়—কেমন যেন একটা, কিছুই মনে নেই, কিছু ভাবছেও না, একেই কি অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বলে?

॥ ৬ ॥

তবে সে ভাবটা কাটতেও দেরি হলো না। একটু পরেই দু'একটা করে পাখি ডাকতে শুরু হলো। কাক এখানে নেই। 'শ্যামা', 'টিট্রিভি' এই ধরনের পাখি। 'চোখ গেল', 'খোকা হোক'—এগুলো ডাকবে একটু বেলায়।

তাড়াতাড়ি ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়ে বাধা পেলো ঐ বাঁধনটায়। আঃ! বিরক্ত হতে গিয়েও মনে হলো ভাগ্যে বাঁধনটা ছিল কাল!

আকাশ ফর্সা হয়েছে। তবে সূর্যমহাশয়ের দেখা পেতে অনেক দেরি, সামনে পাহাড়। ওদিকে মানে পুবদিকে পাহাড়ের ওপারে কোথাও তিনি উঠছেন, সেই আলোটা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশের চাঁদোয়ায়।

এইবার সাধুজীরও ধ্যান ভাঙলো।

চেয়েই ছিলেন, তবে চোখে তখনও পলক পড়ছিল না। এবার বারকতক পিটপিট করে নিয়ে যেন একটু অবাক হয়েই চারদিকে তাকালেন। সেই সময়েই মনে পড়লো কালকের কথাটা। 'শিব' 'শিব' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন একেবারে। তারপর ধাঁ করে নদীর দিকে চলে গেলেন, তবে সামনে নয় কিছু দূরে।

অবশ্য দেরি হলো না বেশী। একটু পরেই এসে বললেন, 'কি বেটা, ও লুগার গিঁট খুলতে পারবি, না হামাকে উঠে খুলিয়ে দিতে হবে?'

'আমি পারবো না, আমার হাত পা সব আড়ষ্ট হয়ে গেছে।'

'তব ঠাহরো।' বলে তরতর করে ওপরে উঠে গেলেন, উত্তরীয়ের বাঁধনটা খুলে এক রকম গোবুক্রে কোলে করেই নেমে এলেন। বললেন, 'লাও এবার মুহ্ হাত ধুইয়ে লেও, টাট্টি যানা হো তো ওহি ভি সরিয়ে লাও। চলো ফিন পাহাড় মে। এবার পথ আউর ভি কঠিন।'

বলে একবার সেই বিরাট হাসি হেসে নিলেন। সে আওয়াজে ভয় পেয়ে কতকগুলো পাখি টি-টি করে উড়ে এদিককার গাছ থেকে স্রেফ নদীর ওপারে চলে গেল!

মুখ হাত তো ধোওয়া গেল—কিন্তু চা-ও নেই, কোন খাবারও নেই। খেতে চাইলেও তো উনি সেই গোরুকে ডাকবেন! কাঁচা দুধ যতই ভাল হোক কত আর খাওয়া যায়!

সাধুজী বুঝলেন ওঁর মনের কথা।

বললেন, 'ঠাহরো, এখানে এক রকম ফল আছে, কুলের মতো খেতে— সাহেবরা খুব খায়। ঐ ওদিকে একটা গাছ আছে—চলো, যত খুশী খাইয়ে লাও। হামি ভি খাবে দো চারঠো।'

সত্যিই যেন গাছটা আলো করে আছে। বেশ বড় বড়, কুলের চেয়ে ঢের বড়, লালচে

ফল, রসে ভর্তি। এমনি খুব মিষ্টি, শুধু আঁটির কাছে একটু টক। তা হোক, সে বরং ভালই লাগছে।

ফল পেড়ে দিতে দিতে সাধুজী বললেন, 'কাল রাত মে শের আইয়ে সিলো, না? দেখ লিয়া তুমনে?'

'আপনি কি করে জানলেন!' গোবু প্রশ্ন করে, 'জেনেও অমন পাথরের মত স্থির হয়ে বসে রইলেন?'

'তো কি করবে? পালাইবে? পালালে ওদের সঙ্গে পারবে তুমি?...... আরে দেখলে তো আজ, ওদের পায়ের দাগ আসে, টাট্টিভি রয়েছে ঝরণার কিনারে—তাতেই বুঝলাম। পাত্থর কো মাফিক বসেছিল বলেই পাত্থর ভেবে ছোড়কে চলা গিয়া।'

এই বলে আবার সেই হাসি—পাহাড় কাঁপানো, জল চলকানো হাসি।

গোবু বললে, 'আর কতকগুলো যে ছোট ছোট পশু এসেছিল সেগুলো কি?'

'ছোটা ছোটা? ইৎনা ছোটা?' হাত দিয়ে দেখালেন, 'শিয়াড় হোবে হয় তো। হায়েনা ভি হো শকতা।'

পেটভরে সেই ফল খেয়ে নিয়ে গোবু তৈরি হয়ে দাঁড়ালো। বললো, 'আর না, এবার কোথায় যাবেন!'

আবার সেই যাত্রা। সেই ভাবেই। এবার আর নামা নয়, ঝরণা পেরিয়ে গিয়ে আবার চড়াই। খাড়া পাহাড় এবার। পথই নেই বলতে গেলে। পাকদণ্ডী মানে পায়ে হাঁটা পথের কোন চিহ্ন ভাল দেখা গেল না। তার মানে এ পথে বড় একটা মানুষজন যাতায়াত করে না।

গরুও যে খুব ওপরের দিকে চেয়ে দেখা গেল, তাও না। তবু ঐ গরুগুলোই একটু আধটু খাঁজ পেয়ে পেয়ে ওঠে বা নামে। সাধুজী মনে হলো তেমনি খাঁজ খুঁজে খুঁজে উঠছেন।

খুব সাহস কিন্তু লোকটার—গোবু মনে মনে মানতে বাধ্য হলো। এত বড় লোকটা বোঝা ঘাড়ে করে এই পথে উঠছেন। শুধু পথ যে পরিষ্কার তাও নয়, যে খাঁজগুলো আছে সেগুলোও ছোট ছোট নুড়িতে বোঝাই, পা দিলেই হড়কে যাবে। কি করে পা ঠিক রেখে উঠছেন সাধুজী কে জানে!

কষ্ট হচ্ছে খুবই, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। পিঠটা দেখতে দেখতে—এই ডোরাই ঠাণ্ডা হাওয়াতেও ঘামে ভেসে গেল, সে ঘাম তো ও নিজের দেহেই বুঝতেই পারছে। তবে হাঁপাচ্ছেন না যে ভদ্রলোক সেটাও টের পাচ্ছে। ওদেরই এই বয়সেও দার্জিলিং, মুসৌরীর রাস্তা বেয়ে উঠতে হাঁপ লাগে, এক সময় হাঁপরের শব্দ হয় নিঃশ্বাসের। এমন দম ওঁর আসছে কোথা থেকে!

আর উঠছেন তো উঠছেনই।

এ পাহাড়টা এত উঁচু—বাপ্‌রে!

ওপরের হাওয়া তো কন্‌কন্ করছে একেবারে। খুব ওপরে উঠলে তবে এত কন্‌কনে হাওয়া হয়। এ ওরা কতটা উঠলো তাহলে? মুসৌরীর সামনে উঠে গেল নাকি? না, লালটিব্বার হাওয়া আরও কন্‌কনে।

গোবুর আর কি! গতরাত্রে ভয়ে আর দেহের কষ্টে ভাল ঘুম হয়নি, এই চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়ায় একসময় ঘুমিয়েই পড়লো সে। শীত করছে একটু একটু, তবে ওর তো গায়ে একটু পুলওভার আছে—শীতে ঘুম ভেঙে গেল না।

হঠাৎ একসময় কানে গেল, সাধুজী বলছেন, 'বহুৎ নিদ গিয়া বেটা, আব উৎরো!'

চমকে চেয়ে দেখে সূর্য মাথার ওপরে—বরং যেন একটু হেলেই পড়েছে, মানে যার নাম বেলা দেড়টা দুটো।

এতক্ষণ ওকে নিয়ে হাঁটছেন সাধুজী, একটুও না জিরিয়ে? বাবা, লোকটা ভীমসেন নাকি? ভীম নাকি এমনি করে কুন্তিকে কাঁধে আর নকুল সহদেবকে কোলে করে দৌড় দিয়েছিলেন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে—বারণাবত থেকে! ওকে বললেই তো ও একটু নেমে দাঁড়াতো, উনিও বিশ্রাম করতে পারতেন।

পিঠ থেকে নেমে সেই কথাই বলতে গেল গোবু, 'আপনি একটু মানে থোড়া জিরিয়ে নিলেন না কেন! মনে হচ্ছে তো দেড়টা দুটো বাজে, একটানা চলছেন সেই ভোর থেকে—'

সাধুজী হাসলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, তকলিফ হয় একটু আজকাল। উমর তো বেড়ে যাচ্ছে শরীরটার, মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খাটতে পারে না। লেকিন বেটা, আমরা যেখানে পঁওছাতে চাই আজ, আঁধার হয়ে গেলে আর যেতে পারবো না। দেখছ কোথায় এসেছ!'

সত্যিই তো, এবার চেয়ে দেখলো গোবু।

ওরা সেই পাহাড়টা ডিঙিয়ে এপারে আবার একটু নেমে এসেছে। কিন্তু এ কি কাণ্ড রে বাবা! চেয়ে দেখলে যে ভয়-ভয় করে!

যেন অনেকগুলো বড় বড় এ-ই উঁচু উঁচু পাহাড় এইখানটায় খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে! জড়াজড়ি না বলে তালগোল পাকিয়েছে বললেই ঠিক হয়! ফলে নিচের দিকে চাইলে কিছু দেখা যায় না, বরং একটুখানি চেয়ে থাকলে মাথা ঘুরে ওঠে!

নিচেটা অন্ধকার, ঠাসা নিরেট অন্ধকার যাকে বলে। গাছপালাগুলোতে যেন আরও বেশী অন্ধকার করে রেখেছে। এই ভেতরদিকের গাছগুলোও বড় বড়—খুব পুরনো বোধ হয়—কত যে পুরনো তার ঠিক নেই। গাছের ছালে শ্যাওলা, কত কি অন্য গাছ গজিয়েছে তার ডালগুলোর খাঁজে কোণে!

এখনও সূর্য কিছু একেবারে অস্ত যায়নি। পশ্চিমের ঐ উঁচু পাহাড়টার ওপারেও যায়নি। দিব্যি দেখা যাচ্ছে এখনও। এখনই এই জড়াজড়ি তিনটে পাহাড়ের কোলের কাছটা কি ছায়া—একটু নিচে তো গাঢ় কালো অন্ধকার। মনে হয় কত কি নাম না জানা বড় বড় জন্তু লুকিয়ে আছে। হয়ত সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই দৈত্যের মতো জন্তু সব টেরোড্যাক্টিল (তার নাকি আবার পাখা আছে, সাপের মতো জন্তু—তাই তো মনে হচ্ছে, কে জানে বাবা গুলিয়ে যায়), ডাইনোসেরাস—'কিংকং' ছবিতে যা দেখিয়েছে, রাজেন আচার্যির লেখা 'পাতালে' বইতে পড়েছে—জুলে ভার্নি না কি এক ফরাসী লেখকের লেখা—ওখানে লুকিয়ে আছে! হয়ত ওখানকার মাটি সেই আগের যুগের পাঁক—পঁক যাকে বলে মা—যা পরে মাটির চাপে কয়লা হয়ে গেছে! তার মধ্যে পাহাড়ের মতো হাতিগুলো খেলা করছে, কিংকং-এর মতো গরিলারা।

কিংবা সত্যিসত্যিই দৈত্য নেই তো। বাবা বলেন রূপকথা ওসব—রূপকথা কি আর আকাশ থেকে ভেবেছে কেউ। এককালে ঐরকম সব ছিল নিশ্চয়, বিরাট বিরাট চেহারা, যারা রাজকন্যা রাজপুত্রদের ধরে বন্দী করে রাখতো—যারা অনেক খবর রাখতো, সেই যে দৈত্যের—মা বুড়ী ঘুমন্ত ছেলের একটা করে চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে জেনে নিয়েছিল, স্বপ্ন দেখছি বলে, যাতে সেই ছেলেটা গিয়ে রাজকন্যাকে বিয়ে করলো—কোন বইতে যেন পড়েছে, সুখলতা রাওর কি একটা বই—নাকি সেই দোকানের পুরনো বাঁধানো সন্দেশ কাগজে?...

সে যাই হোক, এখানে কেন এলেন সাধুজী, এখান থেকে কোথায় যাবেন উনি?

কোথায় যে যাবেন, তা সাধুজীই বললেন এবার।

বললেন, 'লেও বেটা, কুছ্ খাইয়ে লেবে—থোড়া দুধ্! এখন আমাদের যাইতে হবে নতুন এক মুল্লুকে। হাঁ, সেখানে পৌঁছাইলে খাবার পাবে, গরম খাবার—চা ভি পাইতে পারো এক গিলাস। দেখো, আর একটু কষ্ট করতে পারবে?'

'তা খুব পারব। কিন্তু কোথায় যাবো এখন আমরা? এ কি ভয়ানক জায়গা, দেখে যে ভয় করছে আমার!'

'হাঁ ডর লাগবে তা হামি জানে। সেইজন্যেই নামাইসে তোমাকে। এখন এমন এক জাগা যাইতে হোবে, ঐ নিচে বড়া এক জিঞ্জির হ্যায়—কেয়া বোলতা তুমলোক, হাঁ শিকলি, উসিমে পায়ে রেখে রেখে নামতে হোবে। সে তুমি দেখলে মাথা ঘুরে পড়েই যাবে। আর যদি আগয়ান হয়ে যাও, সে ভি তোমার শরীর ভারী হোবে, আমার অস্‌বিস্তা হোবে।'

'বাবা ঐ নিচে অন্ধকারে! কেন ওখানে যেতে হবে কেন? ওখানে কে আছেন।' মুখ শুকিয়ে যায় গোবুর।

'ওখানে সাধুদের এক বড়া ওস্তানা আছে। বিস্তর মহাৎমা থাকেন ওখানে—এক গাঁওকে মাফিক বড়া গুহা আছে। ওটা হলো এদিকে ঘোৎনা—মহাৎমা আছে তাঁদের—কি বলো তোমরা—হেড আপিস, খবরটবর সব আইসে যায় ওখানে।'

'তা আর কোনও পথ নেই?'

শেকলে পা রেখে যাবে কি! তাই কখনও কেউ পারে! উনিও নিচে পড়ে যাবেন, সে-ও যাবে। ঐ অন্ধকারে গিয়ে হয়ত কোন রাক্ষুসে জানোয়ারের দেশে পড়বে, নয়তো পথেই পাথরে পড়ে ছাতু হয়ে যাবে!

সাধু যেন ওর মনের কথা বুঝতে পারলেন। হেসে বললেন, 'নেহি নেহি, সে জিঞ্জির খুব বড় আছে, একটা পা ঠিক ধরে যায়—দেখবে—!'

'না না'—ভয়ে পিছিয়ে যায় গোবু, 'আমি দেখবো না।'

'নেহি নেহি, ডরো মৎ, হামি তোমার হাত পাকড় লিছে, ভয় কি!'

সাধুজী একরকম জোর করেই ওকে টেনে নিয়ে গেলেন, মনে মনে মা কালী মা দুর্গাকে মিনতি জানাতে জানাতে স্রেফ চোখ বুজেই গেল গোবু। একটা জায়গায় গিয়ে নিচে ঢালের মুখ—খাড়া একটা ঢাল, বড় দেওয়ালের মতো—একটা বড় কি গাছ ছিল, নিজে সেটা ধরে

নিয়ে সাধুজী বললেন, 'আব আঁখ খুলো, আচ্ছাসে দেখো, কৌন ভয় নেহি, এ মজবুত পেড় আছে, হামি ভি বহুৎ জোরসে পাকড়ে ধরেছি—দেখো এই জিঞ্জির শিকল।'

কোনমতে একটু একটু করে চোখ খুললো গোবু, নিচের দিকে চেয়েই মাথা ঘুরে গেল অবিশ্যি, কিন্তু সাধুজী সত্যিই 'জোরসে পাকড়ে' ছিলেন, পড়লো না। দেখলো সত্যিই বিরাট একটা শেকল। এখানে বড় একটা বেরিয়ে থাকা থামের মতো—মানে আলগা পাথর নয়, পাহাড়েরই একটা অংশ যেন বিরাট শিবলিঙ্গের মতো বেরিয়ে আছে—তার সঙ্গে বাঁধা। শেকলের মতোই তবে ওর দেখা যত রকম শেকল আছে—জাহাজের নোঙর ফেলা শেকলও সে দেখেছে—সকলের চেয়ে বড়—এক একটা ফাঁদ এত বড় যে সত্যিই একটা পা ঢুকে যায়। লোহা না ইস্পাত কে জানে, মরচে ধরেনি একটুও, রূপোর মতো ঝকঝক করছে।

তা না হয় হলো, বড় শেকল, মজবুত করে বাঁধা, সবই বুঝল গোবু। কিন্তু ঐ শেকল দিয়ে নেমে যাওয়া—পিছন ফিরে দেওয়ালের দিকে মুখ করে নামতে হবে, কোথায় নামছেন, কোথায় পা দিচ্ছেন সাধুজী কিছুই টের পাবেন না। আর তো কোন উপায়ও নেই, ওকে পিঠে করে সোজা নামা যায় না, তাহলে তো গোবুই পাথরে পিষে যাবে!

এটা তখন গোবুর মাথায় যায়নি যে সামনে ফিরে খাড়া শিকল রেখে নামতে গেলে একেবারেই দেখতে পাবে না, একটা বালা থেকে আর একটা বালায় পা দিতে হবে আন্দাজে আন্দাজে। তাও গোড়ালি দিয়ে—সামনের পায়ে যেমন আঁকড়ে ধরা যায় গোড়ালি দিয়ে, তা যায় না।

গোবু যাই ভাবুক সাধুজী আর দেরি করতে রাজী নন। তিনি এবার একটা উদ্ভট প্রশ্ন করলেন, 'তুমহার রুমাল আছে? হ্যাণ্ডকারচিফ?'

'আছে।' গোবু থতমত খেয়ে বলে।

'দেখি!'

গোবু বার করে দিলো।

'হামি তুমহার আঁখ বাধবে। সমঝা?'

'কেন, আমি চোখ বুজেই থাকবো!'

'তা থাকবে না বেটা। ডর লাগলেও ডর কা চীজ-সে আঁখ বন্ধ করা যায় না। দেখতে ইচ্ছা হোবেই। লেও লেও, ঝুটমুট দের মৎ করো। ইধার, হাঁ, এইসা—'

সাধুজীর ধমকে লক্ষ্মীছেলের মতো ওঁর দিকে পিছনে ফিরে রইলো গোবু, উনি রুমালটা কোণাকুনি চার ভাঁজ করে বেশ করে বেঁধে দিলেন। তারপর আবার ওকে পিঠে চড়িয়ে আগের মতো উত্তরীয় দিয়ে ভাল করে বেঁধে নিলেন। তারপর একবার আপনমনে 'জয় গুরুজীকা' বলে উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভবতঃ সেই পাথরটা ধরে সাবধানে সন্তর্পণে শেকলে পা দিলেন। সম্ভবতঃ এই জন্যে যে—আর তো কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না গোবু, যা অনুভব করতে পারছে তার ওপরই ভরসা।
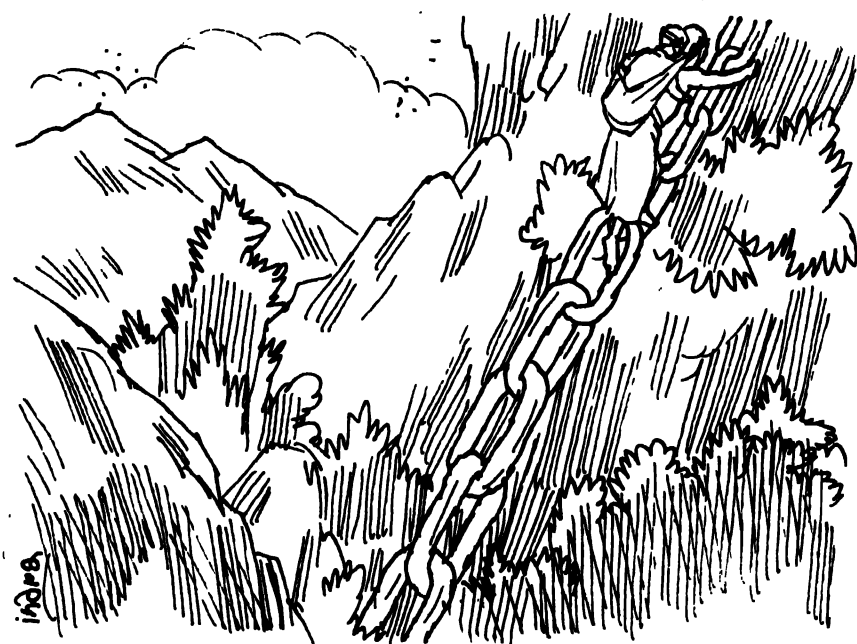
অনেকক্ষণ সময় লাগলো নামতে

অনেকক্ষণ সময় লাগলো নামতে। একটা পা ঠিক মতো বসেছে বুঝলে তবে আর একটা পা তোলা যাবে—তারপর আন্দাজে আন্দাজে একটু কোমরটা নিচু করে (সেখানে একটা একমণ বোঝা) তবে সে পা দিয়ে নিচের বালাটা ছোঁয়া, সন্তর্পণে পা গলানো, সে পা ঠিকমতো বসেছে বুঝলে এ পা-টা তোলা।

সময় যাচ্ছে-তো বটেই, কষ্টও কম হচ্ছে না। সাধুজী ঘেমে নেয়ে যাচ্ছেন একেবারে। সেও একটা ভয়, হাত ঘামলে যদি পিছলে যায়, যা চকচকে পালিশ করা ইস্পাত দেখেছে! হাতের ওপরই জোরটা বেশী, ওর ওপরই নিরাপদে নামার ভরসা।

গোবুর লজ্জাও করতে লাগলো, অনুতাপেরও শেষ রইলো না।

কেন মরতে সে গুরুদেবকে পাকামি করে ঐসব কথা বলতে গেল, আর কেনই বা আবার বোকার মতো (মতো কেন, সে তো রামবোকা একেবারে!) পাগলের মতো এমন ভাবে বেরিয়ে পড়লো! "ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার।" মিছিমিছি এই লোকটাকে কি পর্যন্ত কষ্ট না দিচ্ছে সে! আরও কত লোককে কত কষ্ট দিতে হবে তা কে জানে!...

কতক্ষণ ধরে নামলো তা সে জানে না! হয়ত এক ঘণ্টা, বোধহয় আরও বেশী।

সাধুজী যেন এবার অন্য রকম ভাবে পা বাড়িয়ে—খুব লজ্জাভাবে—তারপর আর নামার চেষ্টা করলেন না, যেন আর একটু কিছু ধরে কোন সমতল জায়গায় পা ফেললেন।

'আব লো, পহুঁছ গিয়া!'

সেইখানেই বসে পড়ে পিঠের বাঁধন খুলে ওকে মাটিতে নামিয়ে চোখের রুমালটা খুলে দিলেন।

'লেও অব দেখো। হাম লোগোঁকা হেডকোয়ার্টার, এইসাব বোলতা হ্যায় না!'

আবার সেই প্রচণ্ড হাসি হা-হা করে।

কে বলবে যে এই লোকটা এতক্ষণ ধরে ভারী বোঝা নিয়ে প্রাণ হাতে করে অমানুষিক কষ্ট করেছেন!

॥ ৭ ॥

চেয়ে তো দেখলো, কিন্তু কি দেখলো, অনেক বছর, ৬০-৭০ বছর আগে? বিখ্যাত লেখক, বিখ্যাত সাংবাদিক, নায়ক সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক বইতে এই গুহার বর্ণনা দিয়েছেন :

গোবু জীবনে সে দেখা কখনও ভুলবে না। তেমনি ঠিক বোঝাতেও পারবে না কাউকে, বিশ্বাস করাতে তো পারবেই না।

গুহা বলাও একে হয়ত ভুল।

বিরাট একটা হলঘরের মতো। কলকাতায় যে সবচেয়ে বড় সিনেমা হল—তার অন্ততঃ দশ বারো গুণ বড়। কতটা চওড়া তাও বলা মুশকিল, কোথায় শেষ হয়েছে, তা তো এখান থেকে দেখা যাচ্ছেই না। ওর বিভূতি দাদু বলতেন 'সীমে-মুড়ো নেই', সেই কথাটাই মনে পড়ছে।

কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। গুহার মুখটা অবশ্য বেশ বড়, খুব বড় দুর্গের ফটকের মতো, তবে সে যতই বড় হোক—সামনে ঝুপসী করা বড় পাহাড়গুলোর আড়াল, এখান দিয়ে বিশেষ আলো থাকার কথা নয়। অথচ এই গুহা অন্ধকার হলে যেমন ভয়াবহ মনে হতো তেমন তো মনে হচ্ছে না। কোথাও দিয়ে আলো আসারও একটা ব্যবস্থা আছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, অনেক লোক অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে, আলো না এলে এতটা দেখা যেতো না, কিছুই দেখা যেতো না।

আলো আসছে, জানলার মতো কিছু দেখা না গেলেও কোন ফাঁক আছে ওপরদিকে কোথাও যেখান থেকে আলো আসছে। কারণ মাঝে মাঝে এক একটা জায়গা বেশ আলো হয়ে আছে, সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, আবার খানিকটা করে জায়গা যেন আবছা—দেখা যাচ্ছে, তবে ছায়া-ছায়া মতো।

আরও একটা কথা—সেটা ওর পরে মাথায় গিছল—যেখানটা খুব আলো ঠিক

সেখানে কোন মানুষ, কি মালপত্র নেই। তার মানেই ওপরে ফাঁক আছে, গুহামুখের মতো, বর্ষায় সেখান দিয়ে জল আসে, শীতে হয়ত বরফ পড়ে—কে জানে।

চোখটা সয়ে যেতে অনেক রকমের অনেক ধরনের সাধু—কেউ একা একটা জায়গায় বাঘছাল বিছিয়ে একটা আস্তানা মতো করেছেন, তার পাশেই ধুনি, মানে মোটা কাঠের গুঁড়ি, ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছে। কেউ বা কম্বল বিছিয়ে বসেছেন। কোথাও বা তিন-চারজন সাধু এক জায়গায় আছেন। তাঁদের মোট একটাই ধুনি। কারো কাছে কোন ধুনিই নেই। কারও নারকেলমালার কমণ্ডলু, কারও বা পিতলের। কেউবা ধুনির ওপরই লোটা চাপিয়ে দিয়েছেন, হয়তো চা খাবেন, কিংবা খিচুড়ি। কারও একটু কৌপীন আছে, কারও তাই নেই, সম্পূর্ণ ন্যাংটো। আবার কেউবা গেরুয়া বহির্বাস পরে আছেন, একজন তো একটানা গোটা কম্বল জড়িয়েছেন বহির্বাসের মতো করে।

এঁদের মধ্যে জটাধারী ছাইমাখা সন্ন্যাসীই বেশির ভাগ। আবার কারও শুধুই ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল। কেউ কেউ চুলদাড়ি কামানো—সেও তাঁদের মুখ মাথার অবস্থা দেখলে বোঝা যায়। বয়সও সমান নয়, খুব বৃদ্ধও দু'একজন আছেন, মাঝারি বয়সীই বেশী। অবশ্য সে ঠিক বলাও যায় না। বেশ শক্তসমর্থ একজনকে দেখে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে শুনলো তাঁর আটানব্বুই বছর বয়স। একজন নাকি একশো চল্লিশ বছরের, বেশ হেঁটেহেঁটে বেড়াচ্ছেন, কোথা থেকে বোধ হয় স্নান সেরে এলেন। আবার ওদের গুরুদেবের মতো থুত্থুড়ে গোছেরও আছেন এক-আধজন, তাঁদের একজন নাকি মোটে নব্বুইতে পা দিয়েছেন।

ছোকরা সাধুও আছে কেউ কেউ। ব্রহ্মচারী গোছের। এদের ঝাঁকড়া চুল, সাদা বহির্বাস, কারও সমস্ত গায়ে ছাই মাখা, কারো শুধু কপালে। এঁরা বোধ হয় কতকটা অ্যাপ্রেন্টিস গোছের—যাকে শিক্ষানবীশ বলে। মানে এঁরা ফাইফরমাশ খাটছেন খুব।

আর একটু পরে আবিষ্কার করেছিল—এখানে একটা বড় রসুইঘর আছে, ঘর বলতে আলাদা একটা বড় জায়গা—দু'একজন নিজেরা খাবার করে খান, বাকি সকলের 'ভোজন' ঐখান থেকেই আসে। ইস্কুল-কলেজে যাকে 'ক্যানটিন' বলে। ছত্র বলা চলে। "বড়াপাঙ্গত"-এর ব্যবস্থা ব্রহ্মচারীই সেখানে খাবার তৈরি করে।

এ সব আসে কোথা থেকে? কি ভাবে?

প্রশ্ন করেছিল বৈকি গোবু।

সাধুজী মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'যিনি মিলিয়ে দেবার তিনিই মিলিয়ে দেন।'

'তার মানে? ভগবান?'

'আউর কোন? তিনিই তো সব কোইকে খাওয়াইসেন—না কি? এক একজনকে এক এক ভাবে দেন। যে তাঁর ওপর ভরসা করে থাকে তাঁকে নিজেই খাওয়াইয়ে যান, আর যে কোশিস করে খাবার যোগাড় করে তাকে সেই কোশিসের পথে পাঠিয়ে দেন।'

একটু গায়ের ঘামটা জুড়িয়ে গেলে সাধুজী প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আস্নান করবে?'

'স্নান? এখানে? জল কোথায়?'

'আছে, আছে। এখানেই—এই গুহার মধ্যেই এক জায়গায় ঝরণা আছে। ওপর থেকে

একটা চৌবাচ্চার মতো জায়গায় পড়ছে। সেও পাথরেরই। আবার সেটা ভরে গিয়ে নিচে কোথায় চলে যাচ্ছে। কান পেতে শোন, এখান থেকেই শুনতে পাবে।'

'আমার—আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।'

একটু লজ্জা লজ্জা ভাবে বললো গোবু।

'জরুর। সে বাত হামার শোচা উচিত ছিল। দিন তো খতম হয়ে এলো। চলো হামাদের ভোজনশালায়, ওখানেই ওঁরা খিলাইয়ে দেবে।'

'আপনি খাবেন না?'

'হামি? হামাদের অত ঘড়ি ঘড়ি ভুখ লাগে না। খাবো, আগে একটু আস্নান করিয়ে লিই। চলো তোমাকে খিলাইয়ে দিই আগে।'

বিরাট একটা জায়গা জুড়ে রসুইশালা। কতগুলো চুলোর মতো জ্বলছে, অথচ তেমন অসহ্য ধোঁয়া নেই। বোঝা গেল এখানেও ধোঁয়া নিকাশের কোন ব্যবস্থা আছে। বড় বড় হাণ্ডায় বোধহয় ডাল চেপেছে। একদিকে কতকগুলি ছেলেমানুষ সাধু বসে রুটি তৈরি করছে।

কিন্তু সাধুজী ওকে আর এক জায়গায় নিয়ে গেলেন। সেখানে এক আশ্চর্য জিনিস তৈরি হচ্ছে। ছাতু না কিসের পুর দিয়ে—পরে শুনেছিল, ছাতু নয়, আসাই মশলা দিয়ে ভেজে নিয়ে পুর তৈরি হয়—বড় বড় কচুরির লেচির মতো করছে, কতকটা চারআনা দামের বনরুটির মতো আকারের, কিন্তু তা কাঠকয়লার আগুরায় চিমটে দিয়ে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেঁকা হচ্ছে, তারপর ওপরটা বেশ মচমচে হয়ে উঠলে একটা বড় বাটির ঘিয়ের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। সে খুব অল্প সময়ের জন্যে অবশ্য, চোঁ-ও-ও করে শব্দ শেষ হলেই চিমটে করেই তুলে নিয়ে একখানা কাঠের বারকোশে রাখা হচ্ছে।

'এ আবার কি খাবার?'

গোবু শুধোলো।

'ইসকো লিট্টি বোলতা হোয়। খাইয়ে দেখো, খুব উম্‌দা চীজ আছে। ডাল সে ভি খাওয়া যায়—লেকিন কুছ লাগে না। ইসকো অলগ্‌ টেস্‌ট্‌ হ্যায়, বহুৎ সোয়াদিষ্ট।'

গোবু সন্দেহের সঙ্গেই প্রথমে একটা মুখে তুলেছিল, তারপর দেখলো সত্যিই 'বহুৎ সোয়াদিষ্ট'। এই সোয়াদিষ্ট কথাটা আগেও শুনেছে। এরা স্ব কে 'সোয়া' উচ্চারণ করে। স্বদিষ্ট মানে স্বাদযুক্ত। ইংরিজী সংস্কৃত মেলানো শব্দ বার করেছে এরা।

খুবই ভাল খেতে। ভেতরের পুর অনেক রকম মশলা দিয়ে মাখা—যেমন গন্ধ তেমনি খেতে টক-টক ঝাল-ঝাল। তবে অনেক বেশী খাবার ইচ্ছে হলেও বেশী খেতে পারলো না। দুখানা খেয়েই পেট ভরে গেল। সাধুজী তখন কিছু খেলেন না। আগে স্নান করলেন, তারপর ওকে এক জায়গায় বসতে বলে দূরে গিয়ে একটু ধ্যান পুজো মতো করলেন। জলফুল দিয়ে নয়—এমনিই চোখ বুজে যেটুকু হয়। আগের রাত্রের মতোই, তবে অতক্ষণ নয়।

ধ্যান শেষ হলে উঠে কোথা থেকে এক লোটা দুধ সংগ্রহ করে এনে চোঁ-চোঁ করে খেয়ে

নিলেন তা—গোবুর মনে হলো—দেড় কেজির কম নয়। খাওয়া শেষ হলে লোটাটা খাবার ঘরে ফেরত দিয়ে এসে বললেন, 'লেও, চলো আব বড়ে গুরুজীকে পাশ!'

অনেকদূর গিয়ে দেখা গেল একটা ছোট্ট নালার মতো ঝরনার ধারে একটা উঁচু পাথরে এক সাধু বসে আছেন। একখানা কালো কম্বল চারপাট করে পাতা—তার ওপরে বসেছেন কিন্তু তাঁর গায়ে কিছু নেই। একটু কৌপীন শুধু আছে মনে হলো—বাকি সমস্ত গা-টাই খোলা, যা একটু ভস্ম বা ছাই মাখা আছে। মাথায় জটা আছে, তাও ছোট হয়ে এসেছে—ওদের গুরুদেবের মতো।

বয়স কত? গোবু অনেক দেখেও আন্দাজ করতে পারলো না। মনে হলো ওদের গুরুদেবের চেয়ে ছোটই হবেন, অন্ততঃ সেই রকম দেখাচ্ছে। অত চামড়া কুঁচকে যায়নি, অত রোগাও নন। কপালেও অত বলিরেখা নেই। তাঁর তো ছিয়ানব্বুই না ঐ রকম কত—এঁর তাহলে আশি-পঁচাশি হবে।

এই কথাটাই ভাবছে—আবারও যেন সাধুজী অন্তর্যামীর মতো কানে কানে বললেন, 'এঁর কত উমর কেউ জানে না। কেউ বলে তিন বাও সাল, কেউ বলে চারশও। এক বাত একবার বলিয়ে ফেলেছিলেন কি বড়ে আলমগীর বাদশা কো টাইম মে উনি এই গুহায় এসেছিলেন আর কোভি এখান সে নিকালনি। আবেজ বাদশা হয়েছে, চলে ভি গেছে—সে খবর উনি এখানে বসেই জেনেছেন সব।'

'এত বয়স!' গোবুর বিশ্বাস হয় না।

'জী হাঁ!' ঠাট্টার সুরে বলেন সাধুজী, 'হামিই তো তিন সাল উনকো এইসাহি দেখতা হ্যায়। ঐ আসন সে ওঠেন না। হয়ত কভি কভি টাট্টি মে যান—তবে সে কোই দেখা নেহি। রাত্রে লেট যান না—মানে শোন না। নিদ যান কিনা ভগবানকে মালুম। কোই য়্যায়সা দেখা নেই উনকো নিদ যাতে।'

আরও চার-পাঁচজন বৃদ্ধ সাধু ওঁকে ঘিরে বসেছিলেন, এতক্ষণ তাই এরা কাছে যেতে পারেনি। এবার তাঁরা উঠে যেতে সাধুজী সামনে গিয়ে মাটিতে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। গোবু অতটা করলো না, তবে হাঁটুগেড়ে বসে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল। উনি 'শিব শিব' কি 'নারায়ণ নারায়ণ' কিছুই উচ্চারণ করলেন না অন্য সাধুদের মতো, শুধু গোবু লক্ষ্য করলো প্রণামের সময় প্রতিবারই একটু করে চোখ বুজলেন।

প্রণামের পালা শেষ হতে গোবুকে দারুণ চমকে দিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন গুরুজী (পরে শুনেছিল গোবু, উনি সব ভাষাই ঐ রকম বলতে পারেন), 'তুমি তোমার গুরুদেবকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এত কষ্ট করেছ—শুনে ভারী আনন্দ হলো বাবা। এতটা যে সাহস করেছ—এ তো এখনকার ছেলেরা কেউ করে না। তা তুমি কি তাঁকে সত্যিই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাও? তিনি কি আর ফিরবেন? মনে তো হয় না। কি লাভই বা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে? তুমি যা বলেছ তাঁকে ঠিকই বলেছ। সদুপদেশ ছোট ছেলের কাছ থেকে এলেও তা গ্রহণ করা উচিত। স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁর সন্তানদের কাছ থেকে শিক্ষা বা উপদেশ নিয়েছিলেন—পুরাণে বলে।'

'না, আমি তাঁকে ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই তা নয়। হয়ত তাঁকে ব্যথা দিয়েছি, হয়ত আমার অন্যায় হয়ে গেছে অমনভাবে বলা—আমি তাঁর কাছে মাপ চাইতেই যাচ্ছি।'

'বাঃ বাঃ, বেশ। খুব ভাল। আমি আরও খুশী হলুম। বড় ভাল ছেলে তুমি, তোমার ভাল হবে। তা বেশ। আমরা সব বন্দোবস্ত করে দেব। তোমাকে আর এত কষ্ট করতেও হবে না। আমি ঝাম্পানের কথা বলেছি। এ সাধু মহারাজেরও ছুটি। ইনিও খুব ভারী মহাৎমা আছেন, তোমাকে বয়ে এনেছেন বলে এঁকে সামান্য লোক ভেবো না।'

গোবু ঘাড় নেড়ে বলল, 'না না, আমি একবারও ভাবি না। আমি নিজে চোখে দেখেছি—বাঘ পর্যন্ত ভয় পেয়ে ফিরে গেল। আর কষ্টও খুব করেছেন।'

তারপর প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আমাদের গুরুদেব কোথায় আছেন?'

'সে অনেকদূর এখান থেকে। মানে রাস্তা ধরে চলতে গেলে। তবে একটা সিধা পথ আছে—দু-তিনটে বড় বড় গুহার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়—সে পথ কেউ জানে না। সে পথে গেলে কাল ভোরে বেরিয়ে সনঝাতক পৌঁছে যাবে।'

'সনঝাতক' শব্দটা শুনে এই প্রথম বুঝল গোবু যে গুরুজীর বাঙালী শরীর নয়।

সেকথা আর সে তুললো না, বললো, 'তা সেই বুড়ো মানুষ অতদূর গেলেন কেমন করে?'

'ওঁরও অনেক [illegible] পথ জানা আছে বৈকি। পঁচিশ বছর হিমালয়ে তপস্যা করেছেন। তা ছাড়া—যোগবল বলে একটা জিনিস আছে তো, সে তুমি এখন বুঝবে না, তাতে খুব বেশী কষ্টও কষ্ট বলে মনে হয় না।'

তারপর বললেন, 'যাও এখন বিশ্রাম করো গে। সব ইন্‌তিজাম হয়ে যাবে রাত্রের মধ্যেই।'

বিশ্রামের ব্যবস্থা ভাল, তা মানতেই হলো গোবুকে। পুরু কম্বল পাতা, খুব নরম কম্বল গায়ে দেবার ব্যবস্থা। অবশ্য বালিশ নেই। তা না থাক, শোওয়া মাত্র আরামে দুচোখ বুজে এলো। এমন কি— মা না-জানি কত কান্নাকাটি করছেন, সে চিন্তাতেও ঘুমকে ঠেকানো গেল না।

ভোরে উঠে দেখলো সত্যিই সব ইনতিজাম বা বন্দোবস্ত প্রস্তুত। মুখ হাত ধুয়ে আসতেই এক লোটা গরম দুধ এসে গেল হাতের কাছে। তাতে প্রচুর চিনি। তার সঙ্গে কিছু পেঁড়া। কিছু পেঁড়া পাতায় মুড়ে সঙ্গেও দিলেন এঁরা—পথে খাবার জন্যে সেই সঙ্গে গতরাত্রির দুখানা পুরীও।

ঝাম্পানও প্রস্তুত। গত সন্ধ্যায় কথাটা শুনেছিল, ঠিক বোঝে নি। গরুটা না গাড়ি-টাড়ি কিছু ভাবছিল। এখন দেখলো তা নয়। একটা উঁচু লম্বাটে বেতের ঝুড়ির মতো। তার মধ্যে কিছু কম্বল দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। সেইটে একটা বড় ফিতেয় বেঁধে যে বইবে—সে ঝুড়িটা পিটে ফেলে কপালে ফিতেটা আটকে নেয়, যেমন পাহাড়ে মাল বয় তেমনি। যাত্রীকে চেয়ারের মতো সেই ঝুড়ির ওপর বসতে হয়—যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে পিছন করে। ঠেস দেবার ব্যবস্থা বাহকের পিঠে। বাহকের হাতে মোটা একটা লাঠি থাকে—অন্ততঃ এঁর ছিল।

এই বাহককেও ব্রহ্মচারী মনে হলো। সাধারণ গাড়োয়ানী মুটে নয়। সুন্দর চেহারা, কপালে একটু বিভূতি বা ছাই। বুকেও তাই। চুলগুলো বড় বড়—এখনও জটা পাকায়নি। একেবারে খালি গা।

এখানেই বেশ শীত, ওরা যেখান দিয়ে যাবে—সাধুজী দেখালেন—সে পথের একটু ওপরেই বরফ জমে আছে। একসময় নাকি বরফের উপর দিয়েই যেতে হবে।

'ওঁর শীত করবে না?'

'না, ও এমনিই থাকে। খালিপায়ে বরফের ওপর দিয়ে যায়।'

'এটা কি—আপনারা যাকে বলেন—যোগ না কি, তারই শক্তি?'

'দূর বোকা ছেলে! সে ক্ষমতা কি এত অল্প বয়সে আসে? অনেক দিনের তপস্যায় হয়। এটা ওর অভ্যেস। অভ্যেস করেছে ইচ্ছে করে। মানুষ ছেলেবেলা থেকে যেটা অভ্যেস করে সেটা তার স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। ইংরেজীতে পড়োনি?'

এই ব্রহ্মচারীটিকে ভারী ভালো লাগলো গোবুর। সুন্দর চেহারাই শুধু নয়, স্বভাবটিও ভারী মিষ্টি। এই যে ওকে নিয়ে যাবেন—এটা তো একেবারে বেগার দেওয়া। এই দুর্গম পথে এত বড় একটা বোঝা—একটা ধেড়ে ছেলেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া—শুধু শুধু—গোবুর বোকামির ফল ওঁরা কেন ভোগ করবেন?—কিন্তু তাঁর মুখে হাসি, মনে হলো তাঁরই উৎসাহ বেশী। তিনি যেন ভারী একটা মজা করার সুযোগ পেয়েছেন।

'আও, আও ভাইয়া, বৈঠ যাও জলদি। বহুৎ দূর কা সফর হ্যায়।'

তিনি যেন অধীর যাবার জন্যে।

ওঁর পিঠে চড়তে সত্যিই গোবুর লজ্জা করছিল। এ তো সাধারণ দাণ্ডী কি সাম্পান বাহক নয়—সাধু ভদ্রবংশের ছেলে, মনে হচ্ছে লেখাপড়াও জানেন—তার পিঠে আরাম করে বসে যাওয়া—রিকশাওলার মতোও নয়, তার চেয়েও কষ্ট হবে বেচারীর, মুটের মতো বইতে হবে।

তবু যেতেই তো হবে। যেখানে এসে পড়েছে এখান থেকে তার একা যাবার কি হেঁটে যাবার সাধ্যি নেই। সে সবাইকে প্রণাম করে, দুধ খাবার নিয়ে ওঁর পিঠে চড়ে বসলো।

গুরুজী ওকে একখানা পুরু গায়ের কাপড় দিয়ে দিলেন, কম্বলের মতো, অথচ বেশ নরম, মাথায় একটা পশমের টুপি। বললেন, 'গরমজামা দিতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু আমাদের এখানে সেরকম কিছু নেই।'

বড় গুহা থেকে বোধহয় ব্রহ্মচারীটি এমন ভাবে চলতে লাগলেন, তাকে ছোটাই বলা উচিত। এতখানি একটা বোঝা পিঠে নিয়ে, যার সমস্ত ভারটা আছে কপালে—কেউ যে এমন ভাবে চলতে পারে—তা না দেখলে বিশ্বাস করতো না গোবু।

কতই বা বয়েস। কাল সাধুজী বলছিলেন—পনেরো-ষোল কি আরও কম বয়সের ছেলেরা আসে ব্রহ্মচারী হয়ে। এটা হলো কতকটা শিক্ষানবিশের মতো—যাকে ইংরেজীতে বলে অ্যাপ্রেন্টিস। অনেকের এত কষ্ট সহ্য হয় না, তারা দু'চার বছর দেখে—কেউ কেউ এক বছরেই সরে পড়ে—কেউ টিকে যায়। যারা টিকে থাকে, বছর দশেক দেখে তাদের সন্ন্যাসী করা হয় পুরোপুরি। খুব ভাল ব্রহ্মচারী ছাড়া এ গুহায় আনা হয় না। এই যে ব্রহ্মচারীটি ওকে নিয়ে যাচ্ছেন, ওঁর মোটে উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস, দশ বছর বয়সেই এখানে এসেছিলেন, স্বয়ং বড় গুরুজী মহারাজের সেবক, তাঁর কাছেই শাস্ত্র যোগ এই সব শিখেছেন।

ক্রমেই ওপরে উঠছে ওরা, ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস। আরও ঠাণ্ডা—আরও। ব্রহ্মচারীটি যেতে যেতেই বললেন, 'তুমি আলোয়ানে মুখ ঢেকে বসো ভাইয়া, নইলে কানে নাকে ঘা হয়ে যাবে ঠাণ্ডায়। আমাকে উপর দিয়ে যেতে হবে, নইলে তোমার গুরুদেব যেখানে আছেন সে বহুৎ দূর। ভাল পথে যেতে গেলে এই রকম চললেও তিন দিন লাগবে।'

মুখ মাথা সবই ঢাকলো গোবু! তবু শীত যায় না। উঃ, কি ঠাণ্ডা রে বাপ! মনে হচ্ছে কে যেন বরফ চেপে ধরছে মুখে!

আর এ উঠছেনও তেমনি। ওপরে, আরও, আরও ওপরে। একবার শুধু বললেন—হেঁকেই বলতে হলো, নইলে যা সোঁ সোঁ করে ঝড়ের মতো হাওয়া বইছে, কিছুই শোনা যায় না সে শব্দ ছাড়া—'আমরা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি, আগেকার হিসেবে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু। লোকে এখানে নিঃশ্বেস নিতে পারে না ভাল করে—অনেকের মাথা ঘোরে। তবে ভয় নেই, এবার নিচের দিকে চেয়ে থাকো খানিকটা। তুমি পারো তো একটু ঘুমিয়ে নাও।'

চোদ্দ হাজার ফুট!

আর এ লোকটি দিব্যি খালিগায়ে যাচ্ছেন। বরং এই ছোটবার মতো করে চলায় আর খাড়া ওপরে ওঠায় ওঁর ঘাম বেরিয়ে গেছে—একবার চোখ থেকে কাপড় সরিয়ে দেখে নিলো গোবু—মানুষ না অন্য রকম কিছু—পুরাণে পড়া গন্ধর্ব-টন্ধর্ব?

ওপরে শীতে বড্ড কষ্ট হচ্ছিলো বলে ঘুম আসছিল না। খানিকটা নিচে আসতেই ঘুমিয়ে পড়লো গোবু। ভাগ্যে আগেই ব্রহ্মচারী বুকের সঙ্গে ওর কোমর বেঁধে দিয়েছিলেন, নইলে হয়ত ঢুলে পড়েই যেতো।

একেবারে একটানা চলে এসে দুপুর নাগাদ থামলেন ব্রহ্মচারী। ধীরে ধীরে বসে বাঁধন খুলে ওকে নামিয়ে বললেন, 'এবার কিছু খেয়ে নাও; আমাকেও খেতে হবে কিছু। বড়ে গুরুজী মহারাজ বলে দিয়েছেন।'

ঝাম্পানের খোলের মধ্যে শুখা খাবার, প্যাঁচ দেওয়া লোটাতে দুধ এই সব ছিল। গোবুর কোলে আলাদা কিছু প্যাঁড়া দিয়েছিলেন সাধুজী। কিন্তু ঠাণ্ডায় হাত বার করে খেতে পারে নি।

এবার যেখানে এসেছে ঠাণ্ডা অনেকটা কম। ব্রহ্মচারী তো গলগল করে ঘামছেন।

সে অবশ্য বেশী কিছু খেলো না। একখানা পুরী, একটা প্যাঁড়া আর একটু দুধ। পাশেই একটা ঝর্ণার মতো ছিল, খুব সরু ধারায় জল নামছে ওপর থেকে বরফ গলে—তাও এক আঁজলা খেলো।

'এত কম খেলেন? হাঁটবেন কিসের জোরে?' গবু শুধোলো।

'হাঁটতে হবে বলেই কম খেলাম। পেট ভরা থাকলে চড়াইয়ে ওঠা যায়? আর তা ছাড়াও আমি খাই কমই। সন্ন্যাসীর বেশী খাওয়া নিষেধ। তাতে আলসে হয়ে যায়, লোভ বাড়ে।'

খাওয়ার পর আবার তেমনি গোবুকে তুলে নিলেন তিনি। আবার সেই যাত্রা। মনে হলো যেন ছেলেটি হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছেন, পা ঠেকছে না মাটিতে।

আবার ঠাণ্ডা।

মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো গোবু।

ঠিক সন্ধ্যার মুখে গুরুদেবের দর্শন—

ঠিক সন্ধ্যার মুখে গুরুদেবের দর্শন পেলো।

অনেক নিচে জায়গাটা, এখানে তেমন শীত নেই। ঋষিকেশের পৌষমাসের মতো।

একটা ছোট্ট ঝরনার ধারে খুব নিচু একটু গুহা। মাটির ওপর একটা বাঘছাল পাতা। তার ওপর একখানা কম্বল জড়িয়ে বসে আছেন গুরুদেব। ঘরে কিছুই নেই, একটা পিতলের কমণ্ডলু ছাড়া। এক কোণে বোধ হয় আর একটা কম্বল, তার ওপর গেরুয়া কাপড়ের মতো।

ওকে দেখে খুব খুশী হলেন গুরুদেব। একটু আশ্চর্যও হলেন!

ব্রহ্মচারীর মুখেই গোবু কেন এসেছে আর কি করে এসেছে শুনে তাঁর চোখ ছলছল করতে লাগলো! হাত ধরে টেনে পাশে বসিয়ে ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'কেন এত কষ্ট করতে গেলি বাবা। তোর কিছু দোষ হয় নি। তুই সত্যিকারের গুরুর কাজ করেছিস। আমিই যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলুম, তুই সে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিস। তুই আমার মহৎ উপকার করেছিস। তোকেই আমার প্রণাম করা উচিত।'

তারপর বললেন, 'তুই নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যা। আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তোর বাবাকে দিস, তাঁরা বুঝতে পারবেন সব। আর কেউ যেন না এখানে আসার চেষ্টা করে। খুব দুর্গম পথ। চিনতেও পারবে না কেউ সহজে। তোমার যা সুযোগ হয়েছে—সবাইয়ের তা হবে না। আজ রাতটা এখানেই থাকো। কাল ভোরে এই ব্রহ্মচারীই তোমাকে পৌঁছে দেবেন। খুব কষ্টকর পথ—ইনি ছাড়া কেউ পারবে না। অপরের যেতে সাতদিন লাগবে, ইনি কাল সন্ধ্যের মধ্যেই পৌঁছে দেবেন। তারপর ইনি নিয়ে যাবেন ঐ গুহায়।'

'ওঁর—ওঁর খুব কষ্ট হবে তো!' গোবু লজ্জা লজ্জা ভাবে বলে।

গুরুদেব বলেন, 'তা তো হবেই। তবে ও বুঝে গেল আমার কত খাতির, তোরা কত ভালবাসিস আমাকে!'

বলে হা হা করে হেসে উঠলেন।

সন্ধ্যের সময় একটি পাহাড়ি লোক কোথা থেকে বিস্তর খাবার, গরম দুধ নিয়ে এলো—সঙ্গে দুটো কম্বল।

গোবু অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে গুরুদেব বললেন, 'আমি টের পেয়েছিলুম। এখন খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়, কাল আবার শেষরাতে রওনা হতে হবে।'

'টের পেয়েছিলেন? কি করে? কে খবর দিলো?'

গোবু উপরি উপরি প্রশ্ন করে।

মুখ টিপে থেকে গুরুদেব বললেন, 'ও আমরা খবর পাই। কি করে পাই সে তুই এখন বুঝবি না, আর একটু বড় হলে আপনিই বুঝবি।'

ওরা তাঁর নির্দেশমতো তখনই খেয়ে শুয়ে পড়লো। গুরুদেব খেলেন পাহাড়ি লোকটির আনা একটা মুসাম্বি লেবু, ব্রহ্মচারী দুখানা পুরি এবং দুধ। গোবু একটু মিষ্টি আর পুরী খেলো—দুধে অরুচি হয়ে গেছে এই গত তিন চার দিনে। তারপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। ব্রহ্মচারীকে ওর বড্ডই ভাল লেগেছিল। ও একটু লজ্জা লজ্জা ভাবে বললো, 'আপনার কাছে শোবো একটু, আর হয়তো কখনও দেখাই হবে না! অনর্থক এত কষ্ট দিলুম—'

ব্রহ্মচারী বললেন, 'শোবে? তা শোও। তবে কষ্টের কথা বলো না! ওতে কিছু হয় না। অনেক দিন বাইরে বেরোতে পারিনি—এ বরং ভালই হলো।'

পাশেই শুলেন ব্রহ্মচারী কিন্তু কম্বল গায়ে দিলেন না। গোবুর ইচ্ছা ছিল ওঁকে জড়িয়ে শোবে, তা হলো না। নিজের কম্বলের মধ্যে থেকে একটা হাত বার করে ওঁর গায়ে দিয়ে রাখলো।

গুরুদেব ঠিক রাত তিনটেয় ওদের ডেকে দিলেন। মুখ-হাত ধোওয়া হলে ধুনির আগুনেই আগের রাতের দুধ খানিকটা গরম করে খেতে দিলেন ওদের। শীতের ভোরে আজ মন্দ লাগলো না গোবুর। সঙ্গে কিছু খাবার বেঁধে দিতেও চেয়েছিলেন, ওরা নিলো না। কারণ সেই বড় গুহা থেকে আনা প্যাঁড়া বরফী তখনও ঝাম্পানের খোলে ছিল।

আবারও সেইরকমভাবে ব্রহ্মচারীর পিঠে বাঁধা হলো ঝাম্পান। তারপর পাহাড়ের মাথায় দিনের আলোর ছোঁয়া লেগেছে কি না লেগেছে—রওনা দিলো ওরা।

গুরুদেব বলেছিলেন অনেক দূর—কিন্তু ব্রহ্মচারী খুব দুর্গম পথে নিয়ে গিয়ে আজই পৌঁছে দেবে।

কেমন সে পথ? খুব উঁচু দিয়ে যাবেন? না ঐ নিচের সরু ঝিরঝিরে পাহাড়ী নদীটার পাড়ে নেমে গিয়ে ওর ধারে ধারে যাবেন?

এই কথাটাই ভাবছিল গোবু, কিন্তু ব্রহ্মচারী যে এ কাণ্ড করবে তা কে জানতো!

সেদিনের এই স্মৃতি ওর দীর্ঘদিন মনে থাকবে, বোধহয় মরণকাল পর্যন্ত।

খানিকক্ষণ চড়াই উঠলেন অবশ্য, ব্রহ্মচারী বললেন, বেশী নয়, যেখানে ছিল ওরা তা থেকে আড়াই হাজার ফিট হবে হয়ত—তারপরই একটা টানেল বা কাটা গুহার মতো অন্ধকার পথে ঢুকে পড়লেন।

টানেল অনেক দেখেছে গোবু! কাশী যাবার পথে গ্রাণ্ড কর্ড লাইনে তিনটে টানেল পড়ে। এই তিনটি বেশ। আসার পথেই হরিদ্বার ছাড়ালে দুটো ছোট ছোট টানেল পাওয়া যায়। কালকা থেকে কিমনা যেতে একশো তিনটে টানেল পড়ে। অনেক ঘুরে পাহাড়ি পথে যাওয়ার থেকে যেখানে সুড়ঙ্গ কেটে পথ করলে অনেক সোজা হয়—সেখানেই রেল কোম্পানি এইভাবে টানেল বা সুড়ঙ্গ কেটে বার করে। কাশ্মীরে শ্রীনগর যাবার পথেও নাকি প্রকাণ্ড একটা টানেল কাটা হয়েছে—পথ কমানোর জন্যে।

এ কিন্তু তা নয়। এ সুড়ঙ্গ কেটেছেন প্রকৃতি বা ভগবান। আসলে এটা একটা নদীরই পাড়। নদী বাইরে দিয়ে পাহাড়ে পথ না করে নিয়ে পাহাড়ের মধ্যে কি করে ঢুকে পড়লো কে জানে। হয়ত ঐ পাহাড়ের মধ্যেই কোথায় একটু একটু করে ঝরনার জল জমেছিল, একসময় অনেক জল হতে তারই বেগে এই নিকাশা পথ হয়ে গেছে। রবি ঠাকুরের কবিতার মতো 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' হয়েছে।

নদীতে জল খুব বেশী নয়—মানে এখন বেশী নয়। তবে এ সব নদীতে কখন যে বৃষ্টির জল বা বরফ গলে জল নামবে তা কেউ জানে না! তখন একেবারে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। সে সময় একটা বড় স্টীম এঞ্জিনও জলের সামনে পড়লে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

ব্রহ্মচারী বললেন, 'হয়ত স্বাভাবিক ভাবেই পাহাড়ের মধ্যে কখনও বড় একটা গর্ত হয়ে থাকবে—ভূমিকম্প হলে এমন হয়—তাতে বৃষ্টির জল বা বরফ গলা জল জমতে জমতে এমন চাপ সৃষ্টি হয়েছে যে দুদিকেরই মাটি ইঁদুরের দাঁতে যেমন কোরে—তেমনি ভাবে কুরতে কুরতে পথ—ও পথে ওদিকে বেরোলে দুদিনের হাঁটা কমে যায়।

প্রথমটা অত ভয় পায়নি গোবু।

তারপর যখন বেশ খানিকটা ভেতরে গেছে—একেবারে আলকাতরার মতো লাগে অন্ধকার, তখনই যেন মনে হলো ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

তারপর ঐ শব্দ।

কি ভয়ানক গম্ভীর একটা শব্দ। একটা শব্দ বলাও ভুল—অনেক রকমের অনেক শব্দ, যেন চারদিক থেকে মেঘ ডাকছে, বাজ পড়ছে।

আসলে যা—ব্রহ্মচারী বুঝিয়ে দিলেন, এর ভেতরের নুড়িতে ধাক্কা খেয়ে জল যেতে যে শব্দ হচ্ছে—তারই প্রতিধ্বনি উঠছে চারদিক থেকে। তারই এত রকম বিচিত্র আওয়াজ। জলের ওপর দিয়ে ওর চলার শব্দও তার কাছে যোগ হয়েছে।

শেষে আর থাকতে পারলো না গোবু, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো এক সময়—ফিরে চলো ফিরে চলো।

'দূর পাগল! অনেকটা এসেছি, এখন ফিরতে কি কম সময় লাগবে! ততটাও তুমি সহ্য করতে পারবে না।... আচ্ছা দেখছি।'

এই বলে তিনি এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। কেমন করে যেন ঝাম্পানের বাঁধনটা আলগা করে ঝাম্পানটা সামনের দিকে নিয়ে এলেন! তারপর বললেন, 'তুমি আমার গলা জড়িয়ে গলার খাঁজে মুখ গুঁজে দাও—তাহলে আর অত ভয় করবে না। তারপর আমি ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি তোমাকে, তাহলেই হবে তো! এক সময় দেখবে খোলা মাঠে বেরিয়ে পড়েছ।'

'ঝাম্পান সামনে আনায় আপনার অসুবিধা হবে না? পথ দেখবেন কেমন করে?' গোবু প্রশ্ন করলো।

'এতে আর পথ দেখব কি? আলো কোথায়? যা করে এই পা আর এই লাঠি। তা ছাড়া তুমি ঘুমিয়ে পড়লে ঝাম্পান আবার পিঠে ঘুরিয়ে দেবো।'

তাই করলেন তিনি। গোবু ওর গলার খাঁজে মুখ ঢেকেই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তার ওপর ভরসা করলেন না ব্রহ্মচারী। কেমন করে যেন ওর কপালে আর চোখের ওপর হাত বুলোতে লাগলেন—দেখতে দেখতে অঘোর তন্দ্রায় ঢুলে পড়লো গোবু।

তারপর আর কিছু মনে নেই। এভাবে কতটা এসেছে, কিভাবে এসেছে, এই নদীপথ কতদূর গেছে কিছুই টের পায়নি। একেবারে ওর চমক ভাঙলো—যখন ব্রহ্মচারী ওকে আস্তে ধাক্কা দিয়ে সজাগ করছেন।

চোখ চেয়ে দেখলো—ঝাম্পান পিঠ থেকে নামানো হয়ে গেছে, বাঁধনও আর নেই।

আর দেখলো ওদের আশ্রমের এপারে—সেই সাহেব যোগীর আশ্রমের কাছে পৌঁছে

গেছে। এখান থেকে ছুটে বাবা-মার কাছে যাওয়া কিছু না, পনেরো মিনিটের তোয়াক্কা।

ও অধীর হয়ে বলে উঠলো, 'চলো, চলো, আর থেমো না। একেবারে আমাদের তাঁবুতে চলো। তোমাকে একটু চা খাওয়াই আগে।'

এতক্ষণ যে 'আপনি' বলছিল গোবু, আনন্দে তা ভুলে গেল। তা ছাড়া এই ব্রহ্মচারীকে আপন করে নেওয়ার ইচ্ছাটা খুব বেশী হয়েছে মনে মনে, ওকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা আদৌ নেই!

কিন্তু ব্রহ্মচারী ঘাড় নাড়লেন।

হেসে বললেন, 'না ভাই, তুমি তো এবার ডেরায় পৌঁছে গেলে বলতে গেলে। এখান থেকে বেশ যেতে পারবে। তুমি চলে যাও, আমার যাওয়া হবে না। আমাকে এখনই ফিরতে হবে। আমার এত লোকজন শহর বাজার সহ্য হয় না। তা ছাড়া বড়ে গুরুজীর হয়ত অসুবিধা হচ্ছে আমি না থাকায়। ওঁর সেবা করে আমার বড় সুখ, আনন্দ। এখনও আমার দুদিন পুরো লাগবে ওঁর কাছে পৌঁছতে, তাও জোরে চলে। আজ রাত্রেও আমি বিশ্রাম করবো না।'

এই বলে গোবু কিছু বলার বা বাধা দেবার আগেই ঝাম্পানটা তুলে নিয়ে যেন চোখের নিমেষে পাকদণ্ডী পথে অনেকটা ওপরে উঠে গেলেন।

গোবু অনেকক্ষণ কেমন যেন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কি হলো, মানুষটা কি বললো—সত্যিই কি সারা জীবন ঐ গুহায় বুড়ো মানুষগুলোর সঙ্গে কাটাতে কোন আনন্দ আছে?—ভাবতেই অনেক সময় লাগলো তার।

তারপর এক সময় ধীরে ধীরে ঋষিকেশের পুলে উঠলো বটে, কিন্তু মা-বাবার কাছে যাবার আনন্দও অনেকটা যেন কমে গেছে। মনে হচ্ছে এই ক'টা দিন বেশ ছিলুম। ভারী ভাল লোক ওঁরা। কৈ, ওঁদের সঙ্গে থাকতে একবারও তো বন্ধু-বান্ধবদের কথা মনে পড়েনি!

॥ ৯ ॥

গোবুর রাশিচক্রেই বোধ হয় এই রকম উদ্ভট খেয়ালের যোগ লেখা ছিল।

রাশিচক্র কাকে বলে?

সূর্যকে যে গ্রহগুলি প্রদক্ষিণ করছে—তারা যেভাবে করে তার পাককে বারোটা ভাগ করা হয়েছে। এক এক ভাগ এক একটা রাশি। তাদের নাম আলাদা আলাদা। মেষ, বৃষ, মিথুন—এই সব।

তোমার জন্মের সময় কোন্ গ্রহ কোন্ ভাগে ছিল, মানে কি রাশিতে—তার ওপরই থাকে তোমার ভাগ্য, তোমার স্বভাব, তোমার মর্জি নির্ভর করছে।

এইটে ছক কেটে দেখিয়ে দেন পণ্ডিতরা—তাকে বলে রাশিচক্র।

তাই—যা বলছিলুম গোবুর কথা।

বার বারই এমনি সব কাণ্ড করে বসে দুম করে—নিজে তো নাকাল হয়ই, বাপ-মাকে সুস্থ-ব্যস্ত করে তোলে।

এই ধরো সেবার কাশীর কাণ্ডটাই।

কাশী—কাশী—কাশী। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছে কাশীর কথা। সেখানকার মতো গঙ্গার শোভা আর কোথাও নেই—বাবা যখন তখন সত্যেন দত্তের কবিতার দুটো লাইন আবৃত্তি করেন, "যাত্রীরা সবে গাহিয়া উঠিল, জয় জয় বারাণসী। চমকি দেখিনু স্বর্গ সুষমা মর্ত্যে পড়েছে খসি।"

এ ছাড়াও অনেক গল্প শুনেছে গবু। সেখানকার মতো রাবড়ি কোথাও হয় না। কচুরি গলির কচুরি খেলে মানুষের বয়স বাড়ে না—ইত্যাদি ইত্যাদি। 'ষাঁড়, সিঁড়ি, সন্ন্যাসী—এই তিন নিয়ে কাশী' ওর দাদু এ কথাটাও প্রায় শোনাতেন।

ফলে গবুর মনে একটা খুব ভাল ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল কাশীর। মুঘলসরাই ছাড়িয়ে যখন গঙ্গা পড়ল আবার (একবার তো কলকাতায় পার হতে হয়েছেই)—মালব্য পুলের ওপর থেকেই কাশীর দৃশ্য দেখে যে মুগ্ধ হয়েছিল তাও অস্বীকার করা যায় না।

এমন কি শহরে পৌঁছেও খুব খারাপ লাগেনি। বরং বলা চলে ভালোই লেগেছিল। ওরা যে হোটেলটায় উঠেছিল সেটা দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই—বড় রাস্তার ওপরে। বারান্দায় বসে নানা চেহারার নানা পোশাকের লোক দেখা, নানা রকমের ঠেলাগাড়িতে কত কি জিনিস বিক্রি হচ্ছে, সবাই চেঁচাচ্ছে তার জিনিস ভাল বলে—এর একটা মজা আছে বৈকি।

বিশেষ ভোরবেলা যখন একেবারে জলের স্রোতের মতো মানুষের দল গঙ্গায় চান করতে যায়—কেউবা চেঁচিয়ে স্তোত্রপাঠ করতে করতে, কেউবা আপনমনে বিড়বিড় করে—কেউ কেউ শুধু একটু গামছা কি এক ফালি ল্যাঙট পরে—হাতে থাকে শুকনো কাপড় আর একটা ঘটি, কারও সেই সঙ্গে ফুলের সাজি কিংবা বাজারের থলি—দেখতে বেশ লাগে। এমনি সময় কলকাতায় গবুকে রোজ বকেঝকে ঘুম ভাঙাতে হয়—এখানে এই দৃশ্য দেখার লোভে নিজেই ভোরবেলা উঠে বারান্দায় বসে থাকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে।

তবু—এ আর কত দেখা যায়!

খাওয়ারও কোন নতুনত্ব নেই। আমড়ার চাটনি করা আছে বোধহয় তিন মাসের মতো, দুবেলা তাই এক টুকরো করে দেওয়া হয়। জলের মতো ডাল. মাছের ঝালের সেই এক গন্ধ, চচ্চড়ি কি অন্য তরকারি—প্রতিদিন ঠিক সেই একরকম স্বাদ আর গন্ধ। এ আর ক'দিন সহ্য হয়!

আলাদা বাড়িতে থাকলে নিজেরা রেঁধে খেলে—মা কত কি খাওয়াতেন এ ক'দিনে। এবার যে মা'র কি হলো—বলে বসলেন, 'আমি বাপু ওখানে গিয়ে আর হাঁড়িবেড়ি ধরবো না, তুমি একটা হোটেল দেখো—দুটো দিন পরের রান্না ভাত খেয়ে জিরিয়ে আসি।' বাবাও কি আর করবেন—সেইমত ব্যবস্থা করলেন। দু-একবার অবশ্য বলেছিলেন বটে যে, 'অনেক খরচ কিন্তু, আর সেই একঘেয়ে খাওয়া। কি তেল দেয় তার ঠিক নেই, শেষ অবধি না সব পেট ছাড়ে।'

মা অবশ্য এখন পস্তাচ্ছেন, দু-একবার বলেছিলেন যে, 'তা না হয় একটা ঘর-টর দেখো না, এখানে তো শুনেছি উনুন থেকে শুরু করে বাসন পর্যন্ত সব ভাড়া পাওয়া যায়। সত্যিই তো এ সব মাছ—তুমি ভালবাসো খরশুলা, পাবদা—এরা তো কিছুই দেয় না।'

বাবা ঝেঁঝে উঠেছিলেন, 'হ্যাঁ এখন একেবারে ঘর—সব বসে আছে হাত জোড় করে তোমার জন্যে! তখনই বলেছিলুম!'

অবশ্য গবু জানে, বাবা ভেতরে ভেতরে ঘরের খোঁজ করছেন। কিন্তু কবে পাবেন—ওর যে আর দিন কাটে না।

যেসব ভালো ভালো খাবারের কথা শুনে এসেছিল তার কোন চিহ্নও মেলে না। রাবড়ি কিনে এনে বাবা একটু খেয়ে বাকিটা ফেলে দিয়েছিলেন। কচুরি খেয়ে অম্বলে মা সারা হয়ে যান। তা ছাড়া দোকানের লোকগুলোকেও গবুর ভালো লাগে না। সবাই যেন ওদের ভাবে ছাগল কি ভেড়া—বেশ ঠকিয়ে দেয়।

যে সব গল্প শুনে এসেছিল তা কোথায় গেল! রাজা দিবোদাস বিশ্বনাথের কাশী কেড়ে নিয়েছিলেন। দেবতারা সকলেই চেষ্টা করেছিলেন দিবোদাসকে জব্দ করার, কেউ পেরে ওঠেননি—এক গণেশ ছাড়া। সেই জন্যে গণেশের খুব খাতির এখানে। একবার ব্যাসদেব নাকি গঙ্গার ওপারে আর একটা কাশী গড়তে চেষ্টা করেছিলেন, কাশীতে মরলে পাপী-তাপীও স্বর্গে যাবে—কাশীর এই মহিমা নষ্ট করতে ব্যাসদেব বললেন, 'আমার কাশীতেও তাই হবে। ও কাশীতে যেতে হবে না'। তাই শুনে অন্নপূর্ণা করলেন কি, খুব থুড়থুড়ে বুড়ীর বেশে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, তোমার এ কাশীতে মলে কী হবে?' ব্যাসদেব যত বলেন, 'শিব হবে' ততই বুড়ী কানটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'অ্যাঁ—কি হবে?' শেষে এক সময় ব্যাসদেব রেগেমেগে বললেন, 'গাধা হবে।' তথাস্তু বলে অন্নপূর্ণা চলে গেলেন।

এ তো গেল পুরাণের কথা। ইতিহাসের কথাও ঢের শুনেছে সে। তার মধ্যে চৈৎ সিং-এর গল্পটা ওর বেশী প্রিয়। ওদের স্কুলের দরোয়ান সূর্যা সিং ওকে অনেকবার শুনিয়েছে—আর ঐ ছড়াটা তো মুখস্থ গবুর—'হাতি পর হাওদা; ঘোড়ে পর জিন। জলদি আও জলদি আও ওয়ারেন হস্টিন্।' পরে হেস্টিংস-এর ভয়ে চৈৎসিং যেখানে লুকিয়ে ছিলেন সেই দেওকীনন্দন হাভেলি পাথরের বড় বাড়িটা এখন আছে, দেখেও এসেছে গবু।

তার আগের ইতিহাসও আছে। ইট পাথরে লেখা আছে সারনাথে। এটা ছিল কাশীর রাজার বাগান, হরিণ থাকত এখানে, সেইজন্যে 'মৃগদাব' বলা হতো। এখানে বুদ্ধদেব প্রথম তাঁর ধর্ম প্রচার করেন। তারপর অশোক বড় চৈত্য তৈরি করেন, স্তূপ বিহার।

মৌর্যবংশ, গুপ্তবংশ, হর্ষবর্ধন—পরপর কত কি তৈরি করেছেন। কয়েকশো বছরের ধুলোতে, একটা কীর্তি ঢেকে গেছে, আর একটা কীর্তি গড়েছে অন্য রাজারা, আবার তাও ঢেকে গেছে একদিন। এখন সে সব চিহ্ন খুঁজে বার করা হয়েছে। সেও দেখে এসেছে গবু।

মানে এটা পুরাণ ইতিহাসের দেশ।

গবুর এখন শখ হয়েছে সে ইতিহাস কিছু চোখে দেখবে। সেটা ঠিক কি করে কি হবে—সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা কিছু নেই ওর। আজ যেটা দেখছে পরে সেটাই ইতিহাস হয়ে যায়—একথা ওর মাথায় ঢোকে না। ও মনে করে এখনও তো বেশ জমকালো কিছু ঘটতে পারে—ও যার মধ্যে থাকবে, কিংবা কাছে থেকে দাঁড়িয়ে থাকবে—ওর নাম ওর ছবি সেই ইতিহাসের সঙ্গে লেখা থাকবে। দেড়শো দুশো বছর পরে ওর মতো অন্য ইস্কুলের ছেলেরা পড়বে, ওর নাম মুখস্থ করবে।

আর তেমন ইতিহাস ঘটার জায়গা তো কাশীর চেয়ে ভাল কোথায় আছে?

হাজার হাজার বছরে কত কি ঘটেছে এখানে—পুঁথি পুরাণে ভর্তি তার গল্প। তাই বা কেন, ওর দিদার মুখে শুনেছে—তিনি চোখে দেখেছেন দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়িতে একজন অঘোরপন্থী সাধু এসেছিল। সাধু যে অনেক রকমের হয় কাশীতে এসে প্রথম জানলো গবু। "আলেক" বলে আওয়াজ করে একরকম সাধু দোকানে দোকানে এসে দাঁড়ায়—মানে দাঁড়াবার কথা কিন্তু দাঁড়ায় না, সর্বদা পায়চারি করে। ওদের নাকি কোথাও স্থির হয়ে থাকতে নেই, সর্বদা চলতে হবে। অঘোরপন্থীরা আবার ভগবানের কথা ভাবতে ভাবতে নাকি একেবারে বেহুঁশ হয়ে যায়, কোথায় আছে কি করছে কোন জ্ঞান থাকে না। কিন্তু তাই বলে ক্ষিদে তেষ্টা বোধ করবে না তা তো হয় না। মানুষ মাত্রেরই ওটা থাকবে। তবে বেহুঁশ বলেই কি খাচ্ছে তা দেখে না, কোন বিচারও করে না, সামনে যা পায় তাতেই কামড় লাগায়।

দিদা যে অঘোরপন্থীকে দেখেছেন, সে ঐ ঘাটের সিঁড়িতে আধাঘুমন্তর মতো বসেছিল তিন দিন প্রায়। তারপর বোধ হয় পেটে খুব জ্বালা ধরেছে, তখন চোখ মেলে চেয়ে দেখেছে কাছে কোথায় কি পাওয়া যায়, মানে খাওয়ার মতো কি আছে। ঠিক সেই সময় এক মহিলা স্নান সেরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন, সঙ্গে একটি চার পাঁচ বছরের ছেলে। সাধু করলে কি, সেই ছেলেটিকে ধরে কাঁধের কাছে দিলে এক কামড়—এমন দাঁতের জোর, খানিকটা মাংস কেটে বেরিয়ে এলো, সাধু মনের সাধে তা চিবুতে লাগলো।

তারপর হৈ হৈ, বহুলোক ছুটে এলো। ছেলেটাকে নিয়ে কেউ কেউ ছুটলো হাসপাতালে। তখন এখানের লোক সাধু-মহাত্মাদের খুব ভক্তি করতো—তাই সাধুকে কেউ মারধোর দিলে না, সবাই মিলে দড়ি দিয়ে বেঁধে ওপারে রামনগরের চড়ায় ছেড়ে দিয়ে এলো।

দিয়ে এলো তো এলো, সাধু সেখানেই বসে থাকে ভোম্ মেরে। কি রোদ কি ঠাণ্ডা কিছুই হুঁশ নেই। কিন্তু দু-একদিন পরেই আবার পেয়েছে ঐ রকম ক্ষিদে। চোখ মেলে দেখে প্রকাণ্ড একটা গোখরো সাপ সেখান দিয়ে যাচ্ছে—হুঁশ থাকলে আগে মাথাটা ধরত। সাধু করলো কি, ল্যাজের দিক ধরে চিবুতে শুরু করলো। সে সাপেরপোও দিলে বেশ গুটিকতক কামড়। পরের দিন সকালে চাষীরা চড়া থেকে খরমুজ তুলতে এসে দেখে দুজনেই দুজনের কামড়ে মরে পড়ে আছে।

তা এও তো ইতিহাস। এমন কিছুও কি একটা ঘটবে না ওর সামনে! কাশীতে এসেও যদি বলবার মতো, মনে রাখবার মতো ঘটনা কিছু না দেখতে পায় তাহলে আর কোথায় পাবে!

যত ভাবে ততই মনের মধ্যে ইচ্ছাটা বাড়তে থাকে। এক এক সময় হতাশও হয়ে পড়ে খুব। মনে হয় এর চেয়ে কলকাতায় থাকলেই হতো।

এইভাবে থাকতে থাকতে একদিন আর কোনমতেই স্থির থাকতে পারলো না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বাবা-মা-দিদি সব শুয়েছে—গবুর কোনদিনই দুপুরে ঘুমনো অভ্যেস নেই, বারান্দায় বসে গঙ্গার দিকে চেয়ে ভাবতে ভাবতেই ওর দুপুর কেটে যায়—সেদিনও তাই বসেছিল, হঠাৎই উঠে নিঃশব্দে হোটেল থেকে নেমে একেবারে গঙ্গার ঘাটে চলে গেল।

আজ সে একটা কিছু অঘটন দেখবেই। বলার মতো একটা ইতিহাস দেখে আসবে।

এই দুপুরের সময়টা গঙ্গার ঘাটে বড় একটা কেউ থাকে না। ফুচকা চানাচুরওয়ালা আসে অনেক পরে, রোদ পড়লে। নৌকাওলারা যারা রামনগর নিয়ে যায়—কি কেদারঘাট থেকে মণিকর্ণিকা ঘুরিয়ে দেখায় 'শেয়ারে' বা মাথাপিছু একটা পয়সা হিসেব করে বসায়—তাদেরও এটা রান্না খাওয়ার সময়। ঘাটিয়াল পাণ্ডারা অনেকেই তল্‌পি-তল্‌পা গুটিয়েই বাড়ি চলে গেছে, কেউ কেউ বসে সকালের যা রোজগার সেই সব টাকাপয়সা গুনছে, চাল আলু ফল মিষ্টি কাপড়ে বাঁধছে। এত বেলায় কোন 'বাবু যজমান' নাইতে আসবে না, যারা আসবে তারা ঘাটে কাপড় জমা রাখবে না।

দু'একজন অবশ্য এদেশী নাওওয়ালা কি ফিরিওয়ালা সবজীওলা আছে ঘাটে—কেউ চান করছে, কেউবা জলে দাঁড়িয়ে ওপরের শুকনো সিঁড়ির পাথরের ওপর গোড়ালি ঘষছে (খালিপায়ে চলতে চলতে গোড়ালির দু'দিকের চামড়া শক্ত হয়ে যায় কড়া পড়ার মতো), এক আধজন সাবানও ঘষছে। দূরে নৌকোও যাচ্ছে, সে খুব অল্পই। অনেকে সংকল্প করে পাঁচটা বিখ্যাত ঘাটে স্নান করেন, তাঁরা হয়ত ফিরছেন এবার। কেউ সকালে রামনগর দেখতে গেছলেন—ফিরতে দেরি হয়েছে—এমন যাত্রীর দলও আছে এক-আধজন। মধ্যে শুশুক ভেসে উঠছে জলে। মাথার ওপর কিছু পাখি ঘুরছে চক্রাকারে—যদি কোন ভেসে ওঠা মাছ দেখা যায় সেই সন্ধানে। না পেয়ে রাগ করে টি টি করে চেঁচাচ্ছে।

এ সব দেখতে বেশ, কিন্তু এর মধ্যে ইতিহাস কই?

গবু পায়ে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে একেবারে জলের ধারে এসে দাঁড়ায়।

সামনের একটা নৌকোয় তাগড়া চেহারার একটা মাঝি—এই জোয়ান চেহারা, চমৎকার বুকের ছাতি, বোধহয় রোজ কুস্তি কি ডনবৈঠক করে—বসে বসে তেল মাখছে। মাখছে মানে মাখানো হচ্ছে। একটা ষোল-সতেরো বছরের ছেলে—তারও বেশ গড়ন, রঙ কালো হলেও ভাল দেখতে—সেই ঘষে ঘষে তেল মাখাচ্ছে আর মাঝে মাঝে চটাস্‌ চটাস্‌ করে চাপড় মারছে। এই নাকি এখানকার তেল মাখানোর রীতি। ঘাটেও অনেককে এইভাবে তেল মাখতে দেখেছে গবু সকালবেলায়।

মাঝিটা অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছে ওকে। এখন একেবারে সামনে এসে দাঁড়াতে খুব মিষ্টি গলায় প্রশ্ন করলো, বাংলাতেই বললো—এরা বেশ বাংলা বলে—এখানের ঘাটিয়াল মাঝি দোকানদার সব, 'কি খোকা, নাও চড়বে?'

খুব জোরে ঘাড় নাড়লো গবু। নাও বা নৌকো চড়ার মতো মজা আর কি আছে! এখানে

এসেই যা নৌকো চড়া, কলকাতায় তো হয়ই না এসব। তাও এসে মাত্র তিন দিন চড়তে পেরেছে সে।

'তা চলো—তোমাকে ওপার ঘুরিয়ে আনি!'

'তুমি নাইবে না? ভাত খাবে না?' গবু কতকটা ভদ্রতার খাতিরেই জিজ্ঞাসা করে।

'আরে সে হোবে হোবে। ফিরে এসে নাহিয়ে নোবো। তুমি কলকাতা থেকে এসেছ—আমাদের এদেশের মেহ্‌মান—অতিথি—তোমার খুশ আগে দেখতে হোবে তো! চলো উঠে পড়ো!'

যে ছেলেটা তেল মাখাচ্ছিল সে কে জানে কেন হি হি করে হেসে উঠলো খুব একচোট।

'আরে হাসতা হ্যায় কেঁও বে উল্লুকা মাফিক! লে, উঠা বাবুকো!'

উঠতে গিয়েও মনে পড়ে যায় কথাটা, হাফপ্যান্টের ওপর গেঞ্জি পরে বসেছিল, সেই ভাবেই চলে এসেছে—পয়সাকড়ি আনা হয়নি। বললো, 'আমার কাছে কিন্তু পয়সাকড়ি নেই—'

'তাতে কি, সে পোরে দিবে। তুমি উঠে পড়ো নাও সে। দেরি হইয়ে যায়সে।'

মনের আনন্দে নৌকোয় চড়ে বসলো গবু।

মাঝিটা বড়ো ভাল লোক—যাই বলো বাপু! বিশ্বাস করে ওঠাচ্ছে তো! কে এমন ধারে কারবার করে? ও যদি মনে করে কাল পয়সাটা না-ই দেয়—লোকসান তো!

নৌকোয় উঠতে পেরে এমন আনন্দ যে এই চড়া রোদে ডিঙি নৌকোয় চলেছে সে হুঁশও নেই। হুঁশ হলো ওরা দুজন দরদর করে ঘামছে দেখে। তখন দেখলো তারও গেঞ্জি ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে।

তা হোক, এমন তো একটু হবেই।

ওপারে গিয়ে নৌকো থামতেই গবু চড়ায় নামতে যাবে—লোহার মত শক্ত হাতে ওর একটা কব্‌জি চেপে ধরে বললে, 'কাঁহা যাতা হ্যায়, হামারা রূপৈয়া?'

এটুকু হিন্দি বোঝে গবু। সে একেবারে আকাশ থেকে পড়লো।

'বা রে! আমি তো আগেই বলেছি আমার কাছে পয়সা নেই—তুমি তো বললে পরে দিলে হবে—'

'ঠিক। এহি তো পরেই মাঙ্গছি আমি! আউর কিৎনা পরে! নেমে চলে গেলে আমি তোমাকে পাবো কোথায়? উসব জুয়াচুরির বাত ছোড়ো। আউর পয়সা কা সওয়াল আসছে কেনো? আমাদের এক নাও ইসপার আসে পাঁচ রূপেয়া লাগে। আমরা ইৎনা ধূপসে এসেছি—কম সে কম দশ রূপেয়া লিবো।'

'দশ টাকা! কি বলছ? এই তো আট আনা করে নেয়, কখনো তিরিশ পয়সাতেও নিয়ে নেয়—'

'হাঁ হাঁ, সে কতো লোক উঠে—সে হিসাব ধরলে এক বারেই বারো রূপৈয়া দিতে হোবে—দিবে? লাও লাও, দিল্লাগী ছোড়ো, রূপৈয়া দেকে উতার যাও!'

'আমার কাছে একটা পয়সাও নেই, রূপৈয়া পাবো কোথা থেকে?'

বেশ শান্তভাবে বলে গবু। কোথা থেকে যেন মনে অনেকখানি জোর পেয়ে যায়।

এই বুঝি ইতিহাস হতে চলেছে তার জীবনের এই দিনটা।

'মতলব? ভেবেছ ফাঁকি দিয়ে নেবে যাবে! আমরা ইৎনা ধুপসে নাও বাইয়ে এলম্‌, ফির যেতে ভি হোবে—সব মাগনা? তুমহার সুরৎ দেখে ছেড়ে দিব সো হোগা নেহি—নিকালো রূপেয়া। চোট্টা কাঁহাকা—এই উমরমে ইৎনা শয়তানী তুমহারা!'

'দেখো খুঁজে, টাকা থাকে তো নাও। আর যদি ওপারে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, বাবাকে বলে একটা কি বড়জোর দুটো টাকা এনে দিতে পারি—এর বেশী বাবা দেবে না।'

অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড চড় মারে মাঝিটা। শক্ত লোহার মতো হাতের চড়। কিছুক্ষণের মতো চোখে অন্ধকার দেখে গবু। কি ঘটছে কোথায় আছে বুঝতে পারে না। নৌকোর তলার দিকে পড়ে গিছল, সেখানেই পড়ে থাকে মরার মতো।

তারপর অল্প অল্প করে হুঁশ ফিরে আসে।

তবে তখনই নড়তে পারে না, মাথাও তুলতে পারে না। এত জোরে কেঠো হাতের চড় মেরেছে লোকটা—বোধহয় গাল কেটে গেছে, জ্বালা করছে খুব—তবু পিট পিট করে চেয়ে দেখে বড় মাঝিটা গায়ের ঘাম মুচছে বসে বসে, ছোকরাটা দাঁড় বাইছে। নৌকো ফিরে যাচ্ছে বা অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে ওকে—

ভয় পেলো না গবু। বরং কেমন একটা আনন্দ আর আশার সিরসিরিনি বয়ে গেল সারা দেহে।

এই তো—মনে হলো ওর—ইতিহাস তৈরি হতে যাচ্ছে!

আর একটু পরে উঠে বসলো।

নৌকোর তলায় যেখানে পড়েছিল সেখানে জল জমে থাকে। সে জলে ওর প্যাণ্ট শার্ট ভিজে গেছে। ও আরও একটু জল তুলে নিজের গালে দিলো।

মাঝিটা নির্বিকার। ঘাম মোছা হয়ে গেছে, নিজেই নিজের গায়ের তেল ডলে যেন শুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। ওর দিকে চেয়ে দেখলো কিন্তু কিছু বললো না। মুখ দেখেও বোঝা গেল না ওর মনের ভাব কি—বরং যে ছোকরা দাঁড় টানছে তার মুখটা বেশ খুশী-খুশী।

এবার পাড়ের দিকে চেয়ে দেখলো।

না, প্রয়াগ ঘাট থেকে উঠেছিল কিন্তু সেদিকে ফিরে যাচ্ছে না নৌকো। ধারের দিকেও যায় নি, নদীর মাঝখান দিয়ে সোজা দক্ষিণের দিকে এগোচ্ছে। এসেওছে অনেকটা। ঐ তো রাণামহল পেরিয়ে এলো। এবার নারদ ঘাট না মানস সরোবর—কি যেন, ঠিক মনে নেই। দূরে কেদার ঘাটটা চিনতে পেরেছে ওর কাদালাগানো দেওয়াল দেখে।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এরা?

মতলব কি? এরা গুণ্ডা নয় তো? কোথাও নিয়ে গিয়ে মারধোর করবে নাকি?

একটু যে ভয় হলো না তা নয়। বুকটা একটু কেঁপেও উঠলো। হাত-পা'য় হিম হিম ভাব। তবে সে ঐ একটুখানির জন্যেই, জোর করে মনকে শক্ত করলো। না, এদের কাছে দয়া ভিক্ষে করবে না, করে কোনও লাভ নেই—মহা বদ লোক এরা, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। মনে হয় ওকে বন্ধ করে রেখে বাবার ঠিকানা চাইবে, তার কাছে মোটা টাকা চাইবে।

ইস, কি আহাম্মুকিই করেছে সে এদের বিশ্বাস করে! দরদস্তুর করে হোটেলে ফিরে গিয়ে কিছু পয়সা যদি নিয়ে আসতো! সত্যিই যদি বাবাকে ভয় দেখায়? বাবা বেচারিকে যেমন করেই হোক টাকা দিতে হবে—ঠিকানা না বলে কি সে-ই থাকতে পারবে? ওরা যদি মারধোর করে খুব—শুনেছে এরা নানারকম কষ্ট দেয়।

তার আগে যা হয় কিছু করতে হবে।

এবার সে পাটাতনটায় উঠে বসলো।

একটু এদিক ওদিক চেয়ে যেন কতকটা আপনমনেই বলে উঠলো, 'বড্ড ক্ষিদে পেয়ে গেল যে!'

মাঝি উত্তর দিলো না, কিন্তু এবার তার যেন টনক নড়লো। ওর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলো অনেকক্ষণ, তারপর বললে, 'তোমার ভয় করছে না?'

'ভয়? ভয় কেন করবে?'

'আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি জানো? ঐ হরিশ্চন্দ্র ঘাটের কাছে—ঐ যে মড়া পুড়ছে দেখছ, ওটাই হরিশ্চন্দ্র ঘাট। ঐখানে একটা পুরানা বড় বাড়ি দেখতে পাচ্ছ? বড় বটগাছে বাড়িটা ঢেকে দিয়েছে। ঐ বাড়িতে মাটির নিচে ঘর আছে। সেইখানে হাত পা বেঁধে তুমাকে ফেলে রাখবো। তারপর কোই ভিখমাঙ্গার সর্দার কিনতে এলে বেচিয়ে দেবো—তারা তোমাকে কানা কি খোঁড়া করিয়ে লিয়ে কিংবা নাক খানিকটা কেটে—তুমরা কি যেন বলো, গন্নাখাঁদা না কি, তাই করে তুমাকে দিয়ে ভিখ মাঙ্গাবে। টাকা সব লিবে তারাই, তোমায় শুধু খাইতে দেবে থোড়া থোড়া আর রাত্রে নিজেদের আড্ডায় লিয়ে গিয়ে পায়ে মে জঞ্জীর দিয়ে আটকে রাখবে।'

একবার যে বুকের মধ্যেটায় গুরগুর করে না উঠলো তা নয়, এমন সত্যিই হতে পারে। ওর মেজ মামা পুলিসের বড় কর্মচারী একজন, তাঁর মুখে অনেক শুনেছে। সত্যিই অনেক ছেলেমেয়ে ধরে নিয়ে লুকিয়ে রাখে, পরে বেচে দেয়—তারা সেখানে কেনা চাকরের মতো খাটে, নয়তো কানা খোঁড়া করে পোষা ভিখিরি করে রাখে।

তবু উপায় তো নেই, ভয় পেলে চলবে না।

খানিকটা চুপ করে থেকে গবু বললো, 'তা কেন, আমাকে নৌকো বাইতে শেখাও না, বেশ তোমাদের সঙ্গে নৌকো চালাবো।'

একটু যেন অবাকই হলো মাঝিটা। তারপর বললে, হ্যাঁ, তা আর নয়! তোমার বাবা তো বোধহয় এতক্ষণেই পুলিসে খবর ভেজিয়ে দিয়েছেন। খোলা নাওতে দেখে পুলিস পাকড়ে নিলে আমাদের জেহেল হয়ে যাবে।'

গলায় জোর দিয়ে বলে গবু, 'বাবা আমার জন্যে পুলিসে খবর দেবেন! তাহলেই হয়েছে—তাহলে আর আমার দুঃখ কি ছিল!'

'মতলব! ইয়ার মানে? তুমি তাঁর ছেলিয়া, তুমাকে না পেলে পুলিসে খবর ভেজবেন না? তুমাকে ঢুঁড়ে বেড়াবেন না?'

খুব খানিকটা যেন আপনমনেই হেসে নিলো গবু, তারপর বললো, 'আমি যদি এমনি

ভাবে হারিয়ে যাই, তাহলে বাবা তো বেঁচে যাবেন। আমাকে কি করে দূর করবেন সেই তো তাঁর চিন্তা।'

আগে দেখে নিয়েছে গবু, কেদারঘাট ছাড়িয়ে যাচ্ছে—হরিশ্চন্দ্র ঘাট কাছে এসে পড়েছে, যা করতে হবে, এখনই।

'কিঁউ ?' মাঝিটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, ছেলেটাও দাঁড় টানা বন্ধ করে আস্তে আস্তে পাড়ে ভেড়াবার চেষ্টা করছে।

গলাটা নামিয়ে বেশ একটু অন্তরঙ্গ সুরে বলে গবু, 'আমার যে একটা অসুখ আছে, বিশ্রী অসুখ! বাবা পাগল বলে কিছুদিন চিকিচ্ছে করিয়েছিল, তারা বলে এ তো ঠিক পুরো পাগল নয় একে নিয়ে আমরা কি করবো? তাই তো বাবা মহা মুশকিলে পড়েছে, আমাকে ইস্কুলে দিতেও সাহস করে না।'

'কেন, তুমার বিমারটা তাহলে কি আছে?'

'বিমার? ও অসুখ? সে—বলবো? বলতে লজ্জা করে—'

'নেহি নেহি, সরম কি কেয়া হ্যায়! বোলো, বোলো—'

মাঝি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

আরও একটু ইতস্ততঃ করে যেন গবু, তারপর বলে, 'আমি মানুষের মাংস খেতে বড় ভালবাসি।'

'ফোঃ!' মাঝি হতাশ হয়ে যায়। 'ঝুট বাত বলার আর জায়গা পাওনি!'

'না, সত্যি। ঐ জন্যে তো বলতে চাইনি, বিশ্বাস করবে না বলে। এ যে আমার কি লোভ! বাবা কি কম পয়সা খরচ করেছে এর জন্যে? কত বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছে। তারা কি করে জানো, কেবল ঘুমের ওষুধ দেয়—ঘুমোলে কি খাবার লোভ যায়, তুমিই বলো!'

'কি বলছ তুমি খোঁকা! বাওরা হয়ে গেছ কি!'

'হ্যাঁ, তাই তো বলে ডাক্তাররা। বলে, এ এক রকমের পাগলামি। বাবা বলে, পাগল বলে তো কেউ রেয়াৎ করবে না, কোন্‌দিন কি করে বসবে, পুলিস ধরে ফাঁসি দেবে।'

বিশ্বাস হয় না—আবার ওর কথা ধরলে পুরোপুরি অবিশ্বাসও করতে পারে না। বলে, 'কি করে খাও, রসুই করে?'

'ওমা, রসুই আবার করবো কোথায়! ওকি রসুই করা যায়! তোমার কি বুদ্ধি! সে এক শ্মশানে ঘুরলে হয়, ঝলসানো মাংস খাওয়া যায়। সেইজন্যে তো বাবা আমাকে কখনও শ্মশানের ধারে যেতে দেয় না। এই যে এতদিন কাশী এসেছি, কোথায় মণিকর্ণিকা ঘাট আছে, সেখানে নিয়ে যায়নি কাউকেই—অন্যকে নিয়ে গেলে আমাকেও নিয়ে যেতে হয়।'

'দূর! জ্যান্ত মানুষের কাঁচা মাংস খাবে কি করে! কামড়াতে পারো—লেকিন চিবিয়ে খেতে পারবে না!'

'খুব পারবো। আমার কসের দাঁতগুলো দেখেছ—ঠিক নাকি কুকুরের মতো, এই তখন থেকে একে দেখা পর্যন্ত আমার খেতে ইচ্ছে করছে—'

এই বলে যে ছোকরা দাঁড় টানছিল তাকে দেখিয়ে দেয় গবু (তার অবিশ্যি দাঁড় টানা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে)।

কি দুর্মতি হলো মাঝির, সে বলে উঠলো, 'ভাগ্! জিয়ান্ত মানুষের মাংস খাবে তুমি! কভি নেহি হো শকতা!'

'তুমি যদি কিছু না বলো তো খেয়ে দেখি একটু, এখানকার লোকের মাংস কেমন! খুব লোভ হচ্ছে, সত্যি বলছি! অনেক দিন খাইনি—'

হাতের পেশীতে একটা কামড়—

বলতে বলতে হঠাৎ ঘুরে সেই দাঁড়ি ছেলেটার কাঁধের কাছে, ওপর হাতের পেশীতে একটা কামড় লাগিয়ে দিলে গবু।

এমনিই ওর দাঁত ধারালো খুব, বেশ বড় গোছের মজবুত দাঁত, আখের খোলা ছাড়িয়ে চিবিয়ে খায় খুব সহজেই, তার উপর বুদ্ধি খেলিয়ে খুব হিসেব করে কাজ করেছে। অনেকখানি মাংস মুখে দেবার চেষ্টা করেনি, অল্প খানিকটা জায়গা ধরে প্রাণপণে কামড়

দিয়েছে। ফলে সত্যি এক টুকরো মাংস ওর মুখে চলে এল এবং যেন বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই চিবোবার ভঙ্গি করতে লাগলো। এটা ওর প্রাণের দায়ে করা, নইলে খেতে ভাল লাগা তো দূরের কথা, ঐ লোকটার ঘামসুদ্ধ গায়ে কামড় দিয়েছে—তার ওপর মানুষের মাংস, মনে হয় বমি আসছে তখন!

কিন্তু ওর যাই হোক, মাঝিদের যা অবস্থা—সে ছেলেটা 'আরে বাপ রে। মর গিয়া রে। ইয়ে সাচমুচ পিশাচ হ্যায়, রাকসস্!' বলে এক লাফ দিয়ে জলে পড়েছে। কাটা ঘায়ে জল লেগে জ্বালা করে উঠেছে আরও, সে প্রাণপণে চেঁচাতে চেঁচাতে আর কাঁদতে কাঁদতে তীরের দিকে সাঁতার দিতে চেষ্টা করলো কিন্তু ডান হাতই অবশ—সে সাঁতার দেবে কি করে!

সে ডুবে যায় দেখে মাঝি হাত বাড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করবে—কিন্তু তা হলে গবুর দিকে পিছন ফিরতে হয়—গবুর দুই কস্ বেয়ে রক্ত ঝরছে, মুখের চারদিকে রক্ত—তার মধ্যেই যেন বেশ মনের সুখে চিবিয়ে যাচ্ছে দেখে অমন তাগড়া গুণ্ডা গোছের লোকটারও বুক হিম হয়ে গেছে—সেও একটা কি বলে চেঁচিয়ে উঠে জলে লাফিয়ে পড়লো এবং কোনমতে ছেলেটার সেই কাটা কাঁধের কাছটা ধরেই (ছেলেটার লাগছে দারুণ, সে নিজের বিপদের কথা না ভেবে হাত ছাড়াবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো)—চুল ধরাই নিয়ম এসব ক্ষেত্রে, কিন্তু ধরবে কি করে, চুল ছোট করে ছাঁটা—প্রাণপণে তীরের দিকে সাঁতার দিয়ে এগোতে লাগলো।

তার মানে যারা বন্দী করবে তারা নেই!

গবু একটা দাঁড় ধরে টানবার চেষ্টা করতে নৌকোটা চোঁ করে ঘুরে গেল। তাতে তীরের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে পড়লো আপনিই। গবু দেখলো তাতে ফল ভালই হলো, কারণ মাঝনদীতে স্রোতটা উত্তর দিকেই, মানে দশাশ্বমেধের দিকে। খানিকটা ওদিকে এগিয়ে যাক, তখন পাড়ের দিকে যাবার চেষ্টা করবে আবার। সে এখন দাঁড়টা হাতে পেয়েছে। ওরা যদি সাঁতরে এদিকে আসার চেষ্টা করে, মারবে ওর বাড়ি এক ঘা মাথায়। যদিও খুব ভারী, তবু দুহাতে ধরে কি আর এক ঘা কসাতে পারবে না?

তবে বিপদ বাধলো অন্য ব্যাপারে।

মুখের মাংসের টুকরোটা অবশ্য আগেই ফেলে দিয়েছিল—এখন মনে পড়লো মুখময় রক্ত লেগে আছে, কেউ যদি ঐ অবস্থায় দেখে অন্য নৌকো থেকে!

সে গেল হেঁট হয়ে মুখ ধুতে।

নৌকোয় অনেক লোক থাকলে ভারী হয়ে নৌকোটা জলের মধ্যে অনেকখানি ডুবে থাকে, জলটা কাছে পাওয়া যায়। এখন ও একা। ফলে বেশ কিছুটা হাত বাড়িয়েও জল পেলো না। আরও হেঁট হতে গিয়ে আর টাল সামলাতে পারলো না, গেল জলে পড়ে।

সাঁতার জানতো গবু—তবে কলকাতার ছেলে, সাঁতারের অভ্যেস রাখবে সে উপায় কৈ?

তবু স্রোত ঠেলে যাবার জন্যে যুঝতে লাগলো। গড়েন ঘাটের ধারে কয়েকটা নৌকো বাঁধা ছিল, তার মাঝিরা তখন রান্না করছে—একটা ছেলে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখে একজন

একটা নৌকো খুলে নিয়ে কাছে এসে—যাকে বলে নড়া ধরে তোলা—সেইভাবে তুলে নিলো।

সে বেচারী বোধহয় ওর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে একটু কৃতজ্ঞতা আশা করেছিল—কিন্তু গবুর তখন নতুন করে ভয় ধরেছে—আবার মাঝিদের হাতে পড়লো, ওরা যদি ঐ মতলব করে! নৌকোটা পাড়ের কাছে আসতেই সে এক লাফে মাটিতে পড়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগলো দশাশ্বমেধের দিক ধরে।

আসবার সময়েই দেখেছে চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে তখনও অনেকে চান করছে—একবার ওখানে গিয়ে পড়তে পারলে নিশ্চিন্তি। সে গুণ্ডা মাঝিটা ছুটে এসেও তাকে ধরতে পারবে না—চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবে গবু।

॥ ১০ ॥

কাশীর কাণ্ডতেই কি গোবুর শিক্ষা হলো? না। আবার এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলো গত বছর।

গবু বোধহয় জ্ঞান হবার পর এই প্রথম বেশীদিনের জন্যে বাইরে এলো।

আসলে ওর বাবার সময় কম, কি সব ব্যবসা করেন—কিসের ব্যবসা তা গবু অত জানে না—বেশীদিনের জন্যে বেড়াতে যাওয়া তো দূরের কথা, তিন-চারদিনের জন্যে যদি কলকাতার বাইরে যান তাহলেই নাকি খুব ক্ষতি হয়ে যাবে।

তাই কোথাও বেরোতে চান না। ওদের বাইরে যাওয়া বলতে গোয়াড়িতে মামারবাড়ি যাওয়া কিংবা পিসিমার বাড়ি আসানসোলে। সেও বাবা এখান থেকে তুলে দেন—তারা নামিয়ে নেয়, এই ব্যবস্থা। ফেরার সময়ও ঐ একই ব্যাপার চলে।

তবে এবার বাবা আর মা দুজনেরই কোথাও না গেলে নয়। শরীর দুজনেরই খুব খারাপ। মা'র তো নানানরকম অসুখ—তার মধ্যে হজমের গোলমালটাই বেশী; বাবারও রক্তের চাপ, হজমের দোষ, ঘুম হয় না, এমনি বিস্তর উপসর্গ। শরীরটা যে ভেঙে পড়ছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে এবার। তাতেই গবুর এক ডাক্তার কাকা খুব বকাবকি করতে এবার ওর বাবা চেঞ্জে যেতে রাজী হয়েছেন।

এখন কথা হচ্ছে কোথায় যাবেন? বাবার ইচ্ছে ছিল এলাহাবাদ কিংবা পুরী। এই দুটো জায়গা সম্বন্ধে এত কথা শুনেছেন, অথচ দেখা হয়নি। পয়সা—আর তার চেয়েও বেশী, সময় নষ্ট করে যদি কোথাও যেতেই হয় তো এর একটায় গেলে ক্ষতি কি? গবু আর তার দিদি লতা তো নেচেই উঠেছিল—ওরাও অনেক শুনেছে দুটো জায়গার কথা—কিন্তু মা এক কথায় নাকচ করে দিলেন, গবুর এই বছর জলে ফাঁড়া আছে—মানে জলে ডুবে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা—এলাহাবাদে গঙ্গা আছে, পুরীতে সমুদ্র—ওখানে যাওয়া হতেই পারে না।

অনেক ভেবে দেখে ঠিক করলেন ওঁরা, ভুবনেশ্বরে যাওয়াই ভাল। ওখানকার জল খুব

হজমী, মা বাবা দুজনেরই উপকার হবে। এমন কোন বড় নদীও নেই—বরং কাছাকাছি পাহাড়-টাহাড় আছে—ভালই লাগবে।

তাই হলো। দু মাসের জন্যে একটা বাড়ি ভাড়া করা হলো গৌরী কেদারের কাছে—মন্দিরও দূরে নয়—রামকৃষ্ণ আশ্রম আছে, বেশ সময় কেটে যাবে।

আর যে কথাটা বাবা ভাঙলো না কারও কাছে—মধ্যে মধ্যে এক আধদিন ব্যবসার খবর-টবর নিয়ে যেতেও পারবেন। রাত্রের ট্রেন ধরে ভোরে কলকাতা পৌঁছে কাজ সেরে আবার রাত্রের ট্রেনে ফিরতে পারবেন।...

প্রথম ক'দিন বেশ কাটলো, তারপরই গবুর বড় একঘেয়ে বোধ হতে লাগলো। শুধুই খাওয়া—আর খাবার হজম করার জন্যে বিকেলে খানিক হাঁটা। এখানে হয়ত বল-টল খেলা হয়, কিন্তু কে দলে নেবে?

কাছাকাছি বেড়াবার যা জায়গা তা সবই মোটামুটি দেখা হয়ে গেছে। এখন শুধু একবার নতুন শহরে যাও আর নয়ত মন্দিরের কাছটা ঘুরে এসো। এ আর কতদিন ভাল লাগে!

খুবই খারাপ লাগছে, অথচ কি করা যায় তাও ভেবে পাচ্ছে না। হঠাৎই মনে পড়লো—নতুন শহরে বাস স্ট্যাণ্ড দেখেছে অনেকবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, পুরীর বাস ছাড়ে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অন্তর। সময়ও বেশী লাগে না ফিরে আসতে। সকালে জলখাবার খেয়ে যদি বেরিয়ে পড়া যায়, সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসতে পারবে। মা-বাবা ভাববেন? তা ভাবুন না একটু। যেমন কে কবে বলেছে—ফাঁড়া, সেজন্যে ভাল ভাল জায়গাগুলো দেখা আটকে রেখেছেন মা। বকবেন, মারধোর করবেন? তা করুন—তবু ওঁদের ভয়টা তো ভাঙা যাবে! আর একটা নতুন জিনিসও দেখা হবে—সমুদ্দুর! তার সঙ্গে জগন্নাথের মন্দির—সে নাকি এ মন্দিরের চেয়ে ঢের উঁচু। এখন কিভাবে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়তে পারবে, এই চিন্তা।

তবে ইচ্ছের জোর থাকলে নাকি উপায়ের অভাব হয় না—ইংরেজীতে একটা কথা আছে।

আসবার আগে ওর দিদিমা দেখা করতে এসে ভাইবোনের হাতে দশটা করে টাকা দিয়ে গিছলেন—সে টাকাটা ওর রাখাই ছিল। এখানে আর কি আছে যে খরচ করবে! সেটা এবার পকেটেই রাখতে শুরু করলো। এখন একটা শুধু সুযোগের অপেক্ষা।

সেটা মিলেও গেল। বাবা রোজ সকালে বাজার করতে যান নতুন শহরে। গবুও প্রায়ই সঙ্গে যায়। বাবার সেদিন কি সব কেনার ছিল, বলেই ছিলেন দেরি হবে—গবু রিকশা থেকে নেমে বাবাকে বললো, 'বাবা, তুমি বাজার করো গে—আমি একটু এমনি ঘুরি।'

'তা যা, তবে দেরি করিস না।'

'না, এখানেই থাকবো। তবে বেশী দেরি হলে বাড়ি চলে যাবো।'

'না না, এখানেই থাকিস।' বলতে বলতে ভেতরে চলে গেলেন। বাজার ছাড়াও কিছু কেনার ছিল, বেশী কথা বলার সময় নেই।

সেই জন্যেই, বাজার থেকে বেরিয়ে যখন দেখলেন কাছাকাছি কোথাও গবু নেই, তখন ধরে নিলেন সে বাড়ি চলে গেছে। ছেলেটা বড় অস্থির—একটুও ধৈর্য নেই, মনে মনে বললেন। অবিশ্যি দেরিও হয়ে গেছে অনেক। ঘড়ি দেখলেন—পুরো দুটি ঘণ্টা কেটে গেছে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ছেলে সে নয়। নিশ্চিন্ত হয়েই তিনি রিকশায় চাপলেন।

কিন্তু বাড়ি পৌঁছোতে স্ত্রী প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, 'গবু? গবু কোথায়?'

'সে কি! সে ফেরে নি?'

'কৈ, না তো! তোমার সঙ্গে যায়, তোমার সঙ্গেই ফেরে—সে একা আসবে কেন?'

'সে বলেছিল যে দেরি হলে সে একাই ফিরবে—। তাই তো!' তবে কি অনেক পরে সে হাঁটতে শুরু করেছে? না ক্ষিদে পেয়েছে বলে সবে কোন খাবারের দোকানে ঢুকেছিল, উনি দেখতে পান নি?

বাজার ফেলে ওর বাবা সেই রিকশাতেই ছুটলেন আবার নতুন শহরে। যাবার পথে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন, ওখানে গিয়ে খাবারের দোকান বাজার—দোকানগুলো সব তন্ন তন্ন করে দেখলেন। যদি এমন হয়, সেও ওঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে!

দুবার তিনবার—সমস্ত বাজারটা ঘুরে দেখলেন, গবুর কোন চিহ্নই নেই। ক্লান্তিতে দুশ্চিন্তায় পা তখন ভেঙে পড়ছে। ধপ করে একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। চা দিতে বলবেন—যেন সে ক্ষমতাও আর নেই। তখন তাঁর চোখে জল এসে গেছে।

কোথায় গেল ছেলেটা? কেউ ভুলিয়ে নিয়ে গেল না তো? অনেক রকম ছেলেধরা ঘোরে চারদিকে—যদি অজ্ঞান করে নিয়ে গিয়ে বিদেশে কোথাও—সৌদী আরবে কি ইটালীতে বেচে দেয়! ওঁরা কোনদিন জানতেও পারবেন না!

চা বললেন বটে, চা খাওয়ার ধৈর্য রইলো না। একটা সিকি টেবিলে ফেলে দিয়ে একটা চলন্ত রিকশায় লাফিয়ে উঠলেন আবার।

না, তখনও গবু ফেরেনি। ওর মা নিঃশব্দে বসে কাঁদছেন, লতা শুকনো মুখ বসে আছে একধারে। বাজার যেমন তেমনিই পড়ে, মাছগুলো পচে উঠছে, কিছু মিষ্টি এনেছিলেন, তাতে পিঁপড়ে ধরেছে—সেদিকে কে নজর দেবে!

তবু এবার লতাই একটা হদিশ দিলো।

'বাবা, ও পুরী চলে যায় নি তো? ক'দিন ধরেই কেবল বলছে, "এত দূরে এসে সমুদ্দুর দেখা হলো না! এর চেয়ে এখানে না এলেই হতো! মা আগে বলেছিল মধুপুরের কথা, সেখানে গেলে এত আপসোস থাকতো না।" যদি তাই পালিয়ে চলে গিয়ে থাকে!'

'একা যাবে! কখনও কোথাও যায় নি—যাঃ!' তার পরেই বললেন, 'টাকা, টাকা পাবে কোথায়?'

'কেন, দিদ্‌মার দেওয়া সেই দশটা টাকা? সেটা ওর পকেটে পকেটেই ঘোরে।'

আর দাঁড়ালেন না গবুর বাবা ভোলাবাবু। আবার ছুটলেন নতুন শহরের দিকে। বাস-

স্ট্যাণ্ডে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন—এইরকম চেহারার, এইরকম জামা-পরা, কোন ন' দশ বছরের ছেলেকে কেউ যেতে দেখেছে কিনা!

কেউ মোটে উত্তরই দিলো না, কেউবা বললো, অত লক্ষ্য করে নি। একটি বৃদ্ধ মিস্ত্রী গোছের শুধু বললো, 'চেহারা অত দেখিনি তাকিয়ে, তবে জামাটার কথা মনে পড়ছে। সাড়ে ন'টার বাসে উঠলো বোধহয়, পুরীর বাস!'

তখন বারোটা বাজে। শুনলেন একটু পরেই একটা বাস ছাড়বে। ভোলাবাবু তখনই উঠে বসলেন। পকেটে গোটা পঁচিশ ত্রিশ টাকা আছে, বেশী টাকা নিতে গেলে আবার বাড়ি ফিরতে হয়। অতটা সময় নষ্ট করতে আর ইচ্ছে হলো না তখন। যা হয় হবে। গাড়িভাড়া, দুটো লোকের হোটেলে খাওয়া এতেই চলে যাবে। আর ছেলেকে যদি না পান—তাঁর আর বাড়ি ফেরার তো কথাই উঠবে না!

পুরীতে তো নামলেন।

কিন্তু এ বিরাট শহর! ভোলাবাবু কলকাতার বাইরে বেশী কোথাও যাননি, ব্যবসার খাতিরে দু'একবার বোম্বে যেতে হয়েছিল—আর কাছাকাছি নবদ্বীপ আসানসোল কেষ্টনগর—এমনি।

পুরী অবশ্য কলকাতা কি বোম্বের মতো নয়—তবু একটা ছোট ছেলেকে এর মধ্যে খুঁজে বার করবেন কোথায়? সেই কি একটা বিলিতী রূপকথায় পড়েছিলেন, খড়ের মধ্যে করে একটা ছুঁচ নিয়ে গিছল এক বর তার কনের জন্যে—এও তো সেই অবস্থা হলো!

তবে, সে গেলে আগে সমুদ্রের ধারেই যাবে। উনি একটা রিকশাওলাকে বললেন, 'সমুদ্দর কিনারকু চলো।' একদিনে কিছু উড়িয়া ভাষা শিখে ফেলেছেন ভোলাবাবু।

সে বলল, 'দরিয়া? কৌঠি যিবে, চকরতীর্থ না সরগদুয়ার?'

এর মধ্যেও এত আছে! ভোলাবাবু প্রথমে বললেন, 'যেখানে খুশি চলো।' তারপর একটা কথা মনে পড়লো—'স্টেশনের কাছে কোন্‌টা পড়বে?'

সে বললো, 'চক্রতীর্থ।'

সেখানেই নিয়ে গেল। একটা জায়গায় নামিয়ে দূর থেকে সমুদ্রের নীল জল দেখিয়ে তিনটি টাকা (নতুন লোক, বেশী তো নেবেই) আদায় করে সরে পড়লো।

তখন বেলা প্রায় দুটো। জনমানবের চিহ্ন নেই সমুদ্রের ধারে। বালি তেতে আগুন। থাকবেই বা কে! দু'তিনটে হিপি বা জংলী সাহেব বোধহয় চান করতে গিছল, এখন ফিরছে।

তাহলে এখন কোথায় যান!

আবারও চোখে জল এসে গেল ভোলাবাবুর।

তার মধ্যেই হঠাৎ নজরে পড়লো, একটা প্রায়ভাঙা পোড়োবাড়ির রকের ওপর ইট বার করা থামে ঠেস দিয়ে শ্রীমান গবু ঘুমোচ্ছে।

'এই!' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই গবুর ঘুম ভাঙলো। তবু চোখকে যেন বিশ্বাসই হতে চায়

না। তারপর সেও 'বাবা!' বলে চেঁচিয়ে ছুটে এসে ওঁকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো।

কান্নার কারণ অনেক।
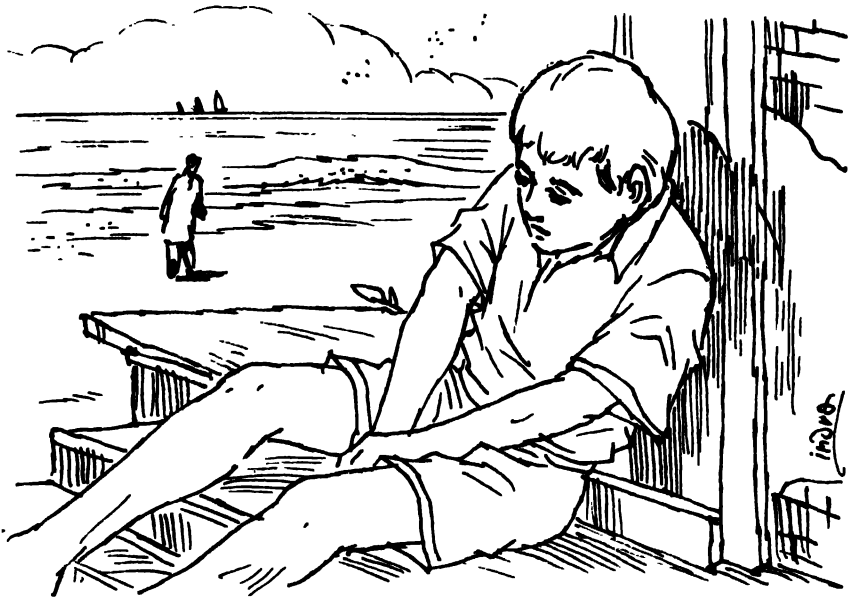
ইঁট বার-করা থামে ঠেস দিয়ে শ্রীমান গবু ঘুমোচ্ছে

বাসে ভাড়া দেবার সময় দশ টাকার নোটটা ভাঙিয়ে বাকি টাকা যত্ন করেই বুকপকেটে রেখেছিল। পকেটমার বলে কিছু লোক আছে—কথাটা যে একেবারে শোনা ছিল না তা নয়—কিন্তু ওর পকেট থেকে কেউ টাকা চুরি করবে, করতে পারে—এতটা মাথায় যায়নি। পুরীর বাস-স্ট্যাণ্ডে নেমে প্রথমেই যেটা মনে হলো—কিছু খাওয়া দরকার। এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে একটা দোকানও চোখে পড়লো। নোংরা, খাবারও ভাল না, খুবই সামান্য দোকান, তবু তখন কিছু খেতেই হবে—সে বেঞ্চিতে গিয়ে বসে বললে, 'আমাকে দুটো সিঙ্গাড়া দাও, আর এক কাপ চা।'

জামা প্যান্ট ভাল, দোকানির সন্দেহ হবে কেন! সে সিঙ্গাড়া তো দিয়েছেই, তার ওপর একটা ছানার মিষ্টিও গছিয়ে দিয়েছে—তার নাম নাকি 'পোড়াপিঠা', একটুকরো এক টাকা দাম।

খেয়ে উঠে দাম দিতে গিয়ে চক্ষুস্থির। পকেটে কিছু নেই, মায় খুচরো পয়সাসুদ্ধ কে তুলে নিয়েছে।

তারপর হৈ চৈ, বহুলোক ছুটে এলো। ওকেই চোর বলে সাব্যস্ত করলো সবাই।

দোকানদারটা তো বেশ কয়েকটা গাঁট্টা বসিয়ে দিলো। আরও প্রচণ্ড মার খেতে হতো—মানুষকে ঠেঙ্গাবার এমন সুযোগ পেলে কে আর ছাড়ে, নেহাৎ সেই সময় একটি বেশ ভব্যিযুক্ত গোছের উড়িয়া ভদ্রলোক রিকশা করে—পরনে মটকার ধুতি, গায়ে মটকার চাদর, পরে শুনেছিল খুব বড় পাণ্ডা একজন, মধুসূদন বুঝি নাম—তিনি গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লেন। সব শুনে দোকানিকে খুব বকলেন, "তোমরা লোক দেখলে বুঝতে পারো না, কে চোর আর কে নয়।" এই বলে ট্যাঁক থেকে দুটো টাকা বার করে দোকানিকে দিয়ে তিনি 'যাও খোকা, তুমি বাড়ি যাও' বলে চলে গেলেন।

এ বিপদ থেকে তো মুক্তি পেলো। কিন্তু তারপর? উনি তো বাড়ি যাও বলে নিশ্চিন্তি হয়ে চলে গেলেন—বাড়িটা যাবে কি দিয়ে, কিছুই তো পকেটে নেই, এক পয়সাও নয়। বাসওলাদের হাতেপায়ে ধরলেও তারা নেবে না। ওর যে টাকাপয়সা চুরি গেছে, তারা কি বিশ্বাস করবে? ওকেই মহা জোচ্চোর ভাববে। যা পথ এলো—এটা যদি হেঁটে ফিরতে হয় তাহলে ওর বোধ হয় সাত আট ঘণ্টা লাগবে। তাও কি অতটা একটানা হাঁটতে পারবে?

খুব যেন মিইয়ে গেল গবু। মন্দির তো ঐ দেখা যাচ্ছে, যা শুনলো সমুদ্রও খুব একটা দূরে নয়—কিন্তু কিছুতেই তার তেমন উৎসাহ রইলো না। খাবে কি, ফিরবে কি করে—এই প্রশ্নটাই সমুদ্র দেখার থেকে বড় হয়ে উঠলো।

তবু হাঁটতেই লাগলো। এ লোকগুলো এখনও উলটে উলটে চাইছে। ও যে জোচ্চোর সে বিষয়ে তাদের সন্দেহই নেই, পাণ্ডাটাই বোকা—এই ভাবছে। এখন যদি কোন একটা ছুতোয় ওকে ধরে হাতের সুখটা করে নেয়! এখান থেকে সরে পড়াই উচিত।...

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই এক সময় সমুদ্রের ধারে এসে পড়েছে তারপর। সমুদ্র খুবই ভাল—দূর থেকে যা দেখছে—কিন্তু কাছে যাবার ইচ্ছাও নেই, উপায়ও নেই। বালির যা তাত, পায়ে জুতো আছে, তবে তা পরে যাওয়া যায় না, জুতোর মধ্যে বালি ঢুকে যায়। তা ছাড়া পা'ও আর চলছে না। এত হাঁটা অভ্যেস নেই। ক্ষিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। একটু কোথাও বসা দরকার। তাই কাছাকাছি আর কিছু না পেয়ে এই ভাঙা বাড়িটার বারান্দাতেই বসে পড়েছিল, আর কি করে ফিরবে ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

বকবারই কথা। খুবই বকা উচিত, কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে ভোলাবাবুর মায়া হলো। সব শুনে বললেন, 'বেশ হয়েছে, খুব শিক্ষা তো হয়েছে! এখন ঘরে চলো, তারা না খেয়ে বসে আছে, মা কাঁদছেন তোমার!'

গবু এবার ভরসা, সাহস, বুদ্ধি সবই ফিরে পেয়েছে বাবা আসতে। সে বাবার একটা হাত ধরে দু'পা এগিয়ে আস্তে বললে, 'বাবা!'

'কি?'

'যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আবার কবে আসা হবে তার ঠিক নেই। বেলা পড়ে এসেছে—এখন আর তত কষ্ট হবে না।'

ভোলাবাবু প্রথমটা তো অবাক। একটা ধমকও লাগালেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেলে আর একটু পীড়াপীড়ি করতে রাজী হয়ে গেলেন। কথাটা ওঁরও মনে লাগলো। সত্যিই তো, আর

কি আসা হবে! এতখানি বয়েসে এই তো প্রথম সমুদ্র দেখলেন। তাও দৈবাৎ, ছেলের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চেপেছিল, তাই।

সমুদ্রের ধারে গিয়ে ঢেউ ভাঙা দেখছেন, গবু আস্তে আস্তে বললো, 'বাবা, চলো না একটু চান করে যাই।'

'সে কি! কি পরে চান করবো রে!'

'কেন, তোমার আমার দুজনেরই তো আণ্ডার-প্যান্ট আছে। সেইটে পরে চান করি, তারপর ওগুলো হাতে করে নিয়ে গেলেই হবে।

ক্রমশ তাও বুঝলেন ভোলাবাবু। ছেলের সহজ বুদ্ধি যে তাঁর চেয়ে বেশী, মনে মনে সেটাও স্বীকার করলেন।

এইবারই কিন্তু একটু গোলমাল হয়ে গেল সব।

দুজনেই আনাড়ি। ধারে দাঁড়িয়ে ঢেউ খাওয়া কি ডুব দেওয়া বেশী বিপজ্জনক তা কেউই জানে না। ভোলাবাবুই প্রথম ঢেউ খাবার সঙ্গে সঙ্গে—তাও তখন খুব শান্ত ছিল সমুদ্র, কিন্তু ভাঁটার সময় নিচের দিকে টান বেশী—ঢেউটা ভাঙবার সময় ডুব দিতে গেছেন—প্রচণ্ড টানে চলে গেলেন জলের নিচে।

গবু চেঁচিয়ে উঠলো, 'বাবা গো! বাবা! বাবা যে ডুবে গেল!'

তখন কেউই ছিল না। এ সময় কেউ বিশেষ স্নান করতে আসে না। যারা বেড়াবে তারা আরও পরে আসে।

শুধু একটি হিপি সাহেব—ওরা যখন তখন আসে, অল্প জলে ভিজে বালিতে পা ছড়িয়ে বসে ছিল, কখনও ঢেউভাঙা শেষের জলটুকু এসে লাগছে, কখনও বা তাও পৌঁচচ্ছে না। সে গবুর ঐ চেঁচিয়ে ওঠাতেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে, এক লাফে জলে পড়ে নিমেষে ডুব দিয়ে গভীর জলের মধ্যে চলে গেল, তারপর বেশ খানিকটা পরে ভোলাবাবুর চুলের মুঠি ধরে ভেসে উঠে—আর একটা পিছনের ঢেউয়ের ধাক্কায় পাড়ে চলে এলো।

তখন ভোলাবাবুর প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। এত জল খেয়েছেন, আর এতক্ষণ দম নিতে পারেন নি—হুঁশ হারিয়ে ফেলাই তো স্বাভাবিক।

খানিকটা গরম বালিতে পড়ে থেকে আপনা থেকে জ্ঞান ফিরলো। উঠে বসে সাহেবকে ধন্যবাদ দেবার চেষ্টা করলেন—তবে সে তার কানেও গেল না, সে তখন আবার জলে নেমে পড়েছে।

জামাকাপড় পরে স্টেশনের দিকে যেতে যেতে গবু বললে, 'দেখলে বাবা, ফাঁড়াটা তোমারই ছিল, আমার নয়—তাও কেটে গেল। এবার সবাইকে নিয়ে আমরা আসবো। মাকে একটু বুঝিয়ে বলো।'

॥ ১১ ॥

এ গল্পটা অবশ্য গোবুর নিজের কোন ব্যাপার নয়। তবে তার সংগ্রহ করা। সেই লিখে শুকতারায় পাঠিয়েছিল। তাঁরা ছাপেন নি।

এ গল্পটা গবুর কাশীদার মুখে শোনা। সত্যি মিথ্যে আমি কিছু বলতে পারবো না। কাশীদা মধ্যে মধ্যে বেশ গাল-গল্প ছাড়তেন জানি—তবে তাঁর জীবনের অনেক সত্যি ঘটনাও গাল-গল্পের মতো শোনাতো।

আসলে কাশীদা ছিলেন একজন বিপ্লবী।

আমি বলছি অনেকদিন আগের কথা—১৯৩০ সাল-টাল হবে—ধরো এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা।

দেশ তখন ইংরেজের অধীনে, তাদের এ দেশ থেকে তাড়াতে না পারলে আমরা স্বাধীন হতে পারবো না—আর স্বাধীন না হলে দুঃখ-দুর্দশার শেষ হবে না—এটা সকলেই বুঝেছিল।

অবশ্য একথাটাও আমরা ইংরেজের কাছ থেকেই শিখেছিলুম। ইংরেজী শিখে জিনিসটা বুঝেছি।

আর আমরা যে এটা বুঝেছি, এরপর বেশীদিন পরাধীনতা সহ্য করবো না—ইংরেজদেরও সেটা বুঝতে দেরি হয়নি।

বড়লাট লর্ড কার্জন তাই বাঙালীকে জব্দ করার জন্যে এমনভাবে দেশটাকে দু'ভাগ করে দিলেন যাতে কোন প্রদেশেই বাঙালী না মাথা তুলতে পারে।

তাতেই হিতে বিপরীত হলো। মানে আমাদের ভালই হলো। দেশের চারদিকে যেন আগুন জ্বলে উঠলো। কিছু কিছু লোক—অল্পবয়সীই বেশী—ইংরেজদের খুন করতে ও নানাভাবে জব্দ করতে শুরু করলো। এদেরই বলা হতো বিপ্লবী। বেগতিক দেখে ইংরেজরা আবার বাংলা জোড়া দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিলেন।

কিন্তু বিপ্লবীদের একেবারে শেষ করা গেল না। স্বাধীনতা যে আমাদের কত দরকার তা আমরা বুঝে নিয়েছি। তা নিয়ে যে আন্দোলন আমাদের, তা থামলো না। তবে দুটো ভাগ হয়ে গেল। মহাত্মা গান্ধী অহিংসা আন্দোলন শুরু করলেন, 'আমরা সেই পুরাণের প্রহ্লাদের মতো মার খাবো কিন্তু মারবো না। দেখি ওরা কত মারতে পারে!' এই হলো তাঁদের পথ। এই দিকেই দেশের বেশির ভাগ লোক ছুটলো। কিন্তু কিছু কিছু লোক বিপ্লবের পথই আঁকড়ে রইলো। বোমা মেরে রেল লাইন নষ্ট, বড় বড় রাজকর্মচারীদের হঠাৎ খুন,—অস্ত্রাগার লুঠ—নানাভাবে তারা চেষ্টা করতে লাগলো ইংরেজদের জব্দ করার, ভয় দেখাবার।

কাশীদাও এই দলে ছিলেন।

অহিংস দল মার খেতো, জেল খাটতো—তেমনি এদেরও কষ্টের শেষ ছিল না। পালিয়ে বেড়ানো, পুলিসের চোখ থেকে গা-ঢাকা দেওয়া—এই তো একটা বড় ঝঞ্ঝাট। ধরা পড়লেই তো ফাঁসী কিংবা দ্বীপান্তর। মানে সাত সমুদ্দুরের পারে আন্দামানে পাঠিয়ে দেবে সরকার। তার সঙ্গে মারধোর তো আছেই। সে মারধোরও বড় হালকা কিছু নয়—সে সব শুনলে তোমরা শিউরে উঠবে।

এই কাশীদা একবার একনাগাড়ে তিন বছর গবুদের পাড়ায় লুকিয়ে ছিলেন—ওঁদের ভাষায় 'গা-ঢাকা দেওয়া'। ইংরেজীতে বলে 'আণ্ডারগ্রাউণ্ডে' যাওয়া—মানে কতকটা পাতাল-প্রবেশ। জঙ্গলের মধ্যে, আধভাঙা পুরনো বাড়ি, বাড়িউলি এক বুড়ী—খেতে পেতেন না, তাঁর বোনপো সেজে থেকে গিছলেন। তিনি খরচ দিতেন, বুড়ী রেঁধে-বেড়ে খাওয়াতেন। আর কাশীদারই পরামর্শে রটিয়ে দিয়েছিলেন—'আমার বোনপোর যক্ষ্মা হয়েছে, কে আর কোথায় থাকতে দেবে বলো! চিকিৎসা করালেও তো এ রোগে কিছু হবে না—ও একরকম মরতেই এসেছে।'

যক্ষ্মা শুনে সকলেই ভয় পেতো—কেউ ত্রিসীমানায় ঘেঁষতো না। পুলিসও তাই খবর পায়নি। দলের লোকেরা গভীর রাত্রে এসে টাকা-কড়ি আর খবর পৌঁছে দিয়ে যেতো।

কিন্তু কাশীদা ওরই মধ্যে গবুদের দলের জনাকতক ছেলের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছিলেন। এটা-ওটা খাওয়াতেন, সিনেমা দেখার পয়সা দিতেন—ওরা ওঁর ভক্ত হয়ে উঠেছিল।

এ গল্প সেই সময়েই শোনা।

একবার উনি একথলে বোমা নিয়ে যশোর জেলার এক গ্রামে যাচ্ছেন, খুব ভেতরে গাঁ—রেল ইস্টিশান থেকে ছ'সাত মাইল দূর, এ পথটা হেঁটে যেতে হয়। অজ পাড়াগাঁ যাকে বলে। ওখানে ওঁদের একটা গোপন ঘাঁটি ছিল—ঐখানে বোমা পিস্তল টাকা, এসব হাত-বদল হতো। অত দূরে—তা ছাড়া গাঁয়ে বেশির ভাগ লোকই চাষী, তারা এসবের ধার ধারতো না—কেউ খবর পাবে না জেনে ওঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন।

কিন্তু ট্রেনে উঠেছেন—একটা ফিরিওলা মতো লোক হঠাৎ উঠে ওঁর দুটো পা জড়িয়ে ধরে বললে, 'বাবু, আমার বিষম বিপদ—শ্যালদার মুখে পকেট মারা গেছে। ছেলের ব্যামো, ওষুধ কিনতে হবে। এক শিশি মিকচার করতে দিয়েছি—দু'টাকা দাম লাগবে। আর একটা বেদানা—কত? না আটগণ্ডা পয়সা! এই থলেটায় বাবু চার টাকার বাজার আছে—কপি মাছ মুরগি সব মিলিয়ে, তা ছাড়া এক বোতল মদও আছে—ওখানে জমিদারবাবুকে ভেট দেবো বলে নে যাচ্ছিলাম। এইটেই আপনি নে আমাকে আড়াইটে টাকা যদি দেন—আমার ছেলেডার প্রাণরক্ষে হয়।'

বলছে আর কাঁদছে—আর পা জড়িয়ে ধরার তালে পায়ে এক জায়গায় আঙুলের চাপ দিচ্ছে।

কাশীদা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা, পুলিস খবর পেয়েছে যে উনি যাচ্ছেন—সেই গাঁয়ে ওত পেতে বসে আছে, গেলেই মালসুদ্ধ ধরবে।

কাশীদা দু'একবার 'না, না' করে—'তা টাকা না হয় দিচ্ছি, তোমার বাজার নিয়ে কি করবো—এই সব বলে তাকে আড়াইটে টাকা বার করে দিলেন পকেট থেকে—তবে শেষ পর্যন্ত বাজারের থলিটা রেখেই দিলেন।

কিন্তু শুধু তাই নয়, লোকটি এক ফাঁকে খবরের কাগজে মোড়া একটা ধোয়া ধুতি আর শার্টও রেখে গেছে। কাশীদা যাচ্ছিলেন সাধারণ গাঁয়ের গরিব লোকের মতো পোশাকে, হাঁটুর কাছে তোলা ধোয়া কাপড় আর ফর্সা একটা পাঞ্জাবি। গাড়িটা বনগাঁ ছাড়ালে কামরা যখন খালি হয়ে এল তখন সে পোশাক ছেড়ে ধোয়া কাপড় জামা পরে 'ফীট' বাবু সেজে নিলেন। তারপর আনাজের ব্যাগের মধ্যে সাবধানে বোমার বাণ্ডিলটা নিয়ে—ওপরে আনাজ, তার ওপর মুরগি আর মদের বোতল সাজিয়ে—তৈরি হয়ে বসলেন।

' স্টেশনে যখন নামলেন কাশীদা, তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। কাশীদা কিন্তু নেমে গাঁয়ের দিকে গেলেন না, একটা মুটেকে দুটো পয়সা দিয়ে সোজা তার সঙ্গে থানায় গিয়ে উঠলেন।

থানায় পৌঁছে দেখলেন, সেখানে একটা চাপা উত্তেজনা, অনেক সেপাই সান্ত্রী এসে জড়ো হয়েছে। ঐটুকু গ্রামের থানা—পাঁচ-ছ'জন সিপাই থাকলেই যথেষ্ট, সে জায়গায় অন্ততঃ তেইশ চব্বিশ জন লোক এসেছে। বোধহয় সদর থানা থেকে আনানো হয়েছে এদের।

কাশীদা বুঝলেন, আসলে তাঁকে ধরবার জন্যেই এত কাণ্ড। তিনি কিন্তু সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য না করে সোজা দারোগাবাবুকে গিয়ে ধরলেন, 'বড়বাবু, আমার বড় বিপদ, আমাকে বাঁচান!'

বড়বাবু তখন কোথায় কাকে পাঠাবেন এই সব হিসেব করছেন, তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'বাপু বিশ্ব-সুদ্ধ বিপদ তো আমি একা সামলাতে পারবো না! আমার বিপদ কে দেখে! চাকরি রাখতেই প্রাণ যাচ্ছে—কি হয়েছে আপনার, অ্যাঁ? কি করতে হবে আমাদের?

'কিছু করতে হবে না—শুধু যদি আজকের রাতটা আমাকে গারদে পুরে রাখেন! তার জন্যে যদি দু'এক টাকা ভাড়া লাগে আমি দিতে রাজী আছি।'

'গারদে পুরবো? কেন, আপনি কি করেছেন?'

'কিছু করি নি বাবু। এক বেটা গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছি। কলকাতার ব্যাপার তো জানেন, আমড়াতলার এক গুণ্ডাদের পাল্লায় পড়ে গিছলুম। তারা জুয়ো খেলে জিতিয়ে দেয় খানিকটা গোড়ার দিকে, তারপর হারাতে শুরু করে। যখন নেশা কেটে যায়—যা থাকে সব ছেড়ে বেরিয়ে আসে মানুষ। আমি বাবু বোকা-সোকা লোক বটে, তবে শুনিছি তো ঢের—গোড়াতেই বুঝে গিয়েছিলুম ব্যাপারটা। তাই গোড়ার দিকে যেমন জেতার পালা শেষ হয়েছে—আমি টাকাকড়ি নিয়ে ওরা কিছু করার আগেই রাস্তায় বেরিয়ে এইছি। তখন আর কিছু হয় নি। কিন্তু বাবু আজ এই গাড়িতে একটু আগে সে বেটাকে দেখেছি। সে আমাকে খুন করবে বাবু, যদি বাগে পায়। আমাকে আজকের রাতটা থানায় একটু থাকতে দিন—আমি কাল সকালের গাড়িতেই কলকাতায় ফিরে যাবো। তারপর আমারও লোকজন আছে—ওদের যদি ধরিয়ে না দিই তো আমার নাম নেই!'

এই ভাবে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বললেন কাশীদা। দুটো টাকাও বার করে দিলেন! খারাপ হয়ে যাবে এই অজুহাতে মাছ আর মুরগিও দিয়ে দিলেন ওদের। সেই সঙ্গে মদের বোতলও। থানায় যারা থাকে ওখানে, তাদের মধ্যে হুল্লোড় পড়ে গেল একেবারে। রাত্রে বলতে গেলে ফিস্টি হলো। কাশীদাও বাদ গেলেন না! উল্টে তারা গারদে নয়—থানার মধ্যেই ওঁর জন্যে একটা তোফা বিছানা পেতে দিলে!

তারপর?

মদ মাংস খেয়ে তো থানার লোকেরা অচেতন। যে সব সিপাই গাঁয়ের মধ্যে ওঁকে খুঁজতে গিয়েছিল—তারা ভোরে ফিরে এসে রিপোর্ট দিলে খবর মিথ্যে, কেউ আসেনি। সেই ফাঁকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে ভোরের গাড়িতে দে চম্পট কাশীদা। সোজা কলকাতা ফিরে এলেন থলের মধ্যে বেগুন আর আম চাপা বোমাগুলো নিয়ে। তখনকার মতো পৌঁছনো গেল না বটে—তবে কাশীদা তো সে যাত্রা বেঁচে গেলেন!

কাশীদা বলতেন, 'আলোর নিচেই অন্ধকারের বাসা, জানিস না। পুলিসের হাত থেকে বাঁচতে গেলে থানায় থাকাই সুবিধে! সেখানে কেউ আসামী খুঁজবে না।'
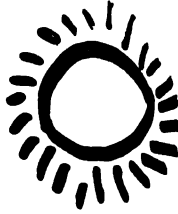
কল্পলোকের কথা

উৎসর্গ

শ্রীযুত রাধেশ রায়
করকমলেষু

মহাজ্ঞান

প্রথম পরিচ্ছেদ

[নিলামে কেনা অনেকদিনের পুরানো একটা সিন্দুকের মধ্যে এই ছেঁড়া কাগজের তাড়াটা পড়েছিল। হঠাৎ সেদিন বার ক'রে নেড়েচেড়ে দেখি যে কোন্ এক ভদ্রলোকের আত্মজীবনীর মত খানিকটা লেখা রয়েছে। গল্পটা আমার খুবই ভাল লাগল ব'লে সেটা আবার একটু অদল-বদল ক'রে এইখানে ছেপে দিলুম, আমার বিশ্বাস তোমাদেরও খুব ভাল লাগবে। সিপাহীবিদ্রোহের কথা ইতিহাসের বইতে পড়েছ, এইবার সেই সময়কারই একজন লোকের মুখে ব্যাপারটা শোন দেখি!]

কমিসেরিয়েটে চাকরি করলে বড়লোক হওয়া যায় একথা ছেলেবেলা থেকেই শুনছি। সুতরাং মামা যখন সেবার বাড়ি এসে বললেন "তোর চাকরি ঠিক করেছি মাধব, তোকে আমার সঙ্গে মিরাট যেতে হবে।"—আমি তখন আনন্দে নাচতে বাকী রেখেছিলুম শুধু।

মা কিন্তু খবরটায় মোটেই খুশি হতে পারলেন না। বললেন... কী সব ওধারে গোলমাল হচ্ছে শুনছি দাদা, ছেলেমানুষ—এখন না হয় নাই গেল!...

মামা ধমক দিয়ে উঠলেন, বললেন, গোলমালে যদি আমরা রক্ষে পাই তো তোমার ছেলেও পাবে।... পুরুষমানুষ টাকাকড়ি রোজগারের চেষ্টা করবে না তো কি চিরকাল তোমার আঁচল ধরে কাটাবে?

মা আমার কুলীনের মেয়ে, ভাইয়ের সংসারেই চিরকাল কাটল, সুতরাং তিনি আর প্রতিবাদ করতে সাহস করলেন না, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মায়ের ব্যথা বোঝবার বয়স অবিশ্যি আমার সেটা নয়, তবুও আমার মনটা ভার হয়ে উঠল। মা আর একবার বললেন, বড়দা যে সামনের মাসে ওর বিয়ের ঠিক করেছিলেন, তুমি তো সাতদিন বাদেই যাবে বলছ, তবে কী রকম কি হবে?

মামা বললেন, আচ্ছা সে বড়দাকে আমি বুঝিয়ে বলব এখন।

মামা গোলমালের কথাটা পরিষ্কার ভাবে উড়িয়ে দিলেন বটে কিন্তু সেটা উড়িয়ে দেবার মত খুব সহজ কথা নয়। গ্রামে বেশ একটা জনরব উঠেছে যে ইংরেজরা সিপাইদের আর পুরো বিশ্বাস করতে পারছে না। হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী বা মুসলমানদের মধ্যে নাকি বিলক্ষণ একটা গণ্ডগোল বেধেছে। সে সম্বন্ধে সন্দেহটুকু বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল যখন বড়মামা সেজমামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মাইনে কত দেবে?

সেজমামা বললেন, সত্তর টাকা—

বড়মামা চম্‌কে উঠলেন, স-ত্ত-র টাকা!

চম্‌কে ওঠবারই কথা বটে। সত্তর টাকা মাইনে উনিশ বছর বয়সে পাওয়া এক রকম

অবিশ্বাস্য কথা। কুড়ি-ত্রিশ টাকা মাইনেতে চাকরি করেই জমিদারী কিনছেন অনেকে।

বড়মামা বললেন, আর মাসখানেক কাটিয়ে গেলে হ'ত না? বিয়েটা সেরে—

মামা একটু অসহিষ্ণুভাবে বললেন, তাদের বিশেষ লোকের দরকার বলেই তো ঐ আনাড়ী ছেলেকে এত টাকা মাইনে দিতে চাইছে—

বড়মামা আর কথা কইলেন না। কিন্তু গোলমালের কথাটা আরও ভাল করে বুঝলুম এইতে যে সেজমামা তাঁদের ওখানকার বিস্তর জিনিসপত্র সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, নিশ্চয় ওখানে সে সব রাখা আর নিরাপদ নয়, তা নইলে ওসব নিয়ে আসার মানে কি?

কিন্তু আমার মন তখন বিদেশ যাওয়ার আনন্দে আর টাকার চিন্তায় মশগুল, তখন সে-সব কথা গায়ে মাখলুম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথে যেতে যেতেই বিপদের কিছু কিছু আভাস পেলুম। যেটা শুধু 'গোলমাল' বলে শুনেছিলুম সেটার রূপ যে কত ভীষণ তা তখন থেকেই বেশ বুঝতে পারছিলুম। চারিদিকে একটা আতঙ্কের ভাব, যেন সমস্ত আবহাওয়ায় একটা অসহ্য গুমোট হয়ে রয়েছে।

মামা প্রথম প্রথম মীরাটের গল্প করতেন শুধু। সামনে ফাল্গুন মাস, গরম ধুলো উড়িয়ে 'লু' চলবে। 'লু' লাগলে নাকি মানুষ মরে যায়—এই সব। একদিন বললেন, আর একটি অদ্ভুত লোককে দেখাব সেখানে, সে আমাদের বেনেকর্তা—

জিজ্ঞাসা করলুম, সে আবার কে মামা?

—সে জাতে অবিশ্যি বেনে নয়, আমাদেরই স্বজাতি। কিন্তু অনেকদিন আগে চাকরি ছেড়ে ঐখানেই তেজারতি আরম্ভ করে, সেই জন্যে 'বেনিয়া' বলত সকলে, আমরাও 'বেনিয়া' থেকে 'বেনেকর্তা' বলতে শুরু করেছি। এখন তেজারতি কারবার তুলে দিয়েছে।

—তুলে দিলে কেন?

—টাকারও দরকার নেই, অনেক টাকা জমিয়েছে, তা ছাড়া খুব বুড়ো হয়ে পড়েছে কি না!... আর আছেই বা কে—একমাত্র নাতনী! এসব ছেড়ে নাকি ইন্দ্রজাল নিয়ে পড়েছে—রাত্তিরে কি-সব যাগ-যজ্ঞ করে। হিন্দুস্থানীরা বলে যে 'বেনিয়া বুড়ো' ইচ্ছে করলে সব করতে পারে। ও ঘোর তান্ত্রিক, নররক্ত খায়, এই সব যত বাজে কথা—

আর একদিন কথায় কথায় মামা বললেন, বুড়ো বেনেকর্তারও ভণ্ডামী কি কম, বলে আমি একটা বই লিখেছি তাতে এমন সব মন্ত্র লিখে রাখলুম যে সে বই কাছে থাকলে এ পৃথিবীতে যা খুশি তাই করা যাবে। তাই সে বইয়ের নাকি নাম দিয়েছে 'মহাজ্ঞান'।

জিজ্ঞাসা করলুম, মামা, সে কি সত্যি?

—তুইও যেমন ক্ষেপেছিস! তাহলে আর ভাবনা ছিল না।...

গোলমালের কথা প্রথম মামার মুখে শুনলুম এলাহাবাদ ছাড়াবার পর, সহসা একদিন বললেন, সিপাইদের বিশ্বাস ইংরেজরা নতুন যে বন্দুকের কার্তুজ এনেছে তাতে নাকি শুয়োরের চর্বি আছে। দাঁতে করে কেটে নিতে হয়, তাতে তাদের জাত যাবে—

প্রশ্ন করলুম, একথা তাদের মনে হ'ল কেন?

—আমাদের আগেকার বড়লাটের আমলে অনেক রাজাদের রাজত্ব গেছে। তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ বোধ হয় হিন্দু মুসলমান সিপাইদের ক্ষেপিয়ে দেবার জন্য ঐ কথা রটাচ্ছে—সেদিন বারাকপুরে শুন্‌লুম একটা কি গোলমাল হয়ে গেছে। খাগড়াতেও একটা ছোটখাট লড়াইয়ের মত হয়ে গেল, বড়ই বিশ্রী ব্যাপার—

বলেই আমাকে অভয় দেবার জন্য বললেন, আমাদের মীরাটে অবিশ্যি বিশেষ ভয় নেই। ওখানে প্রায় আড়াই হাজারের ওপর গোরা সিপাই আছে। দেশী সিপাইরা বিশেষ কিছু করতে পারবে না।

অভয় দিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে নিজেও যে বিশেষ ভরসা পাচ্ছেন না, তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল। মীরাট যাচ্ছিলুম আমরা নৌকোয়—বেশী লোক নিয়ে পালা করে দিনরাত নৌকো চালানো হচ্ছিল কিন্তু মামা অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন। তিনি শেষের দিকে কথাবার্তা বন্ধ করে দিলেন একদম—শুধু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকতেন আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বলতেন, 'ছোড়দার কোনও খবরই পাচ্ছি না, তাই তো!' 'ছোড়দা' হলেন আমার মেজমামা।

শেষে একদিন মীরাট পৌঁছনো গেল। সেখানের হাওয়াও যে বিশেষ ভাল নয় তা সেই ঘাট থেকেই বেশ বুঝতে পারলুম। মুটে থেকে শুরু করে সকলেরই চাউনি যেন উদ্ধত, বিদ্বেষ যেন তাদের মুখ থেকে ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে।

মামা সেখানকার বাসায় পৌঁছেই আমায় স্নান করতে বললেন, নিজেও কোনও রকমে স্নান সেরে পুজোয় বসলেন। বুঝলুম যে বিশেষ তাড়া আছে। ওদের দেশের কথা আমি বিশেষ তখনও বুঝতে পারি না—তার ওপর মামাদের বাসার চাকরটির দেখ্‌লুম যে কথা শোনার কোনও বালাই-ই নেই। সেজমামার মুখে শুনেছিলাম ভজনরাম আগে সিপাই ছিল, কোথাকার লড়াইয়ে একটা চোখ কানা হয়ে যাওয়ায় পেন্সন নিয়ে এখন চাকরি করে। যেমন লোকটার গুণ্ডার মত চেহারা, তেমনি একচক্ষু পাকিয়ে পাকিয়ে কেবলই আমার দিকে চাইছিল। সেজমামাকে অনুযোগ করতে তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন, বল্‌লেন, না, না, ভজনরাম খুব ভাল লোক!

যাই হোক তখন ভজনরাম-চরিতে মন দেবার সময় নেই, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে কোনও রকমে মহারাজের (ওদেশে ঠাকুরকে মহারাজ বলে) রান্না কদর্য অন্ন ভোজন করে বেরিয়ে পড়লুম সেজমামার সঙ্গে ছাউনীর (ক্যানটনমেণ্ট) উদ্দেশে। পথ চলতে চলতে সেজমামা বললেন, এখানকার অফিসার-ইন্‌-চার্জ হলেন জেনারেল হিউসন, তিনিই তোমার চাকরি পাকা করবেন। ভাল করে সেলাম করে দাঁড়িও, আর যা জিজ্ঞাসা করবেন চেঁচিয়ে জবাব দিও—কানে একটু কম শোনেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছাউনীর মধ্যে ঢুকে দেখলুম যে গোরা সিপাইরা অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে ঘোরাঘুরি করছে, সকলকারই একটা চন্‌মনে ভাব। একজন ওর মধ্যে একটু সম্ভ্রান্ত গোছের, তাঁকে কোন অফিসার বলে মনে হ'ল, এগিয়ে এসে বললেন, শুনেছ চৌধুরী আম্বালার কথা?

মামা বললেন, না কর্ণেল ব্রিগসন, আমি এইমাত্র নৌকো থেকে নামছি। কি হয়েছে?

—আম্বালা থেকে খবর এল কাল নাকি ওখানে একটা ভয়ানক রকম গোলমাল হয়ে গেছে। এখানকার হাওয়া আমার বিশেষ ভালো ঠেকছে না।... যাও হাটসনের ঘরে, বুড়ো হাটসন তোমার কথা শোনে, দেখ যদি কিছু ভাল কথা বুড়োর মাথায় ঢোকাতে পার।

মামা আর দ্বিরুক্তি না করে জেনারেল হাটসনের আফিসের দিকে জোরে পা চালালেন। মামাকে দেখে চাপরাসী সেলাম করে উঠে দাঁড়াল।

মামা বললেন, ভেতরে কেউ আছে নাকি মহম্মদ আলি?

—শুধু বেনেকর্তা আছে হুজুর, আপনি যান। আপনার কথা জনাব আজ সকাল থেকেই জিজ্ঞাসা করছেন।

মামা চুপি চুপি বললেন, বুড়ো হাটসনের সঙ্গে বেনেকর্তার বড় ভাব, বেনেকর্তা নাকি ওকে একবার জল থেকে বাঁচিয়েছিল!

আমি কৌতূহলে অধীর হয়ে উঠেছিলুম। অতি কষ্টে আত্মদমন করে মামার পিছু পিছু ঘরে ঢুকলুম। প্রথমেই নজরে পড়লো টেবিলের সামনে বসে রয়েছেন প্রায় সত্তর বৎসরের এক বৃদ্ধ সাহেব, পোষাক দেখেই বুঝলুম ইনি হাটসন, কিন্তু তাঁর পাশে আর একজন শ্বেত শ্মশ্রু বৃদ্ধের দিকে নজর পড়ে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। কোমর বেঁকে পড়েছে, চুল দাড়ি গোঁফ সব সাদা, কিন্তু তার চোখের চাউনি এত তীক্ষ্ণ যেন সেদিকে চাইলে হাত পা অসাড় হয়ে আসে। বুঝলুম ইনিই বেনেকর্তা—

হাটসন মামাকে দেখেই লাফিয়ে উঠলেন. চৌধুরী এসেছ, তোমার কথা আজ সারা সকাল ভাবছিলুম!

মামা সেলাম করে হেসে বললেন, আমার সৌভাগ্য।

হাটসন মাথা নেড়ে বললেন, বোস, বোস, আম্বালার কথা শুনেছ?

মামা বললেন, পরিষ্কার কিছু শুনিনি, একটু জনরব শুনেছি মাত্র—

হাটসন্ বললেন, সেখানকার সিপাইরা বিদ্রোহী হয়ে গোরাদের আক্রমণ করেছে—ম্যাগাজিন লুঠ করেছে, এমন কি অফিসারদের স্ত্রী-পুত্রও দু'একজন মারা গেছে। সকালে এই টেলিগ্রাম এল। এখন কি করা যায়?

মামা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—এখানকার সিপাইদের অবস্থা কি বুঝছেন?

হাটসন বললেন, কর্ণেল ব্রিগসন খুব বেশী ভয় পেয়েছেন বটে, কিন্তু অত ভয়ের কিছু

কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। কে একজন নাকি ব্রিগসনকে এসে বলেছে যে, তারা নতুন কার্তুজ ব্যবহার করবে না—, ব্রিগসন একেবারে শুক্‌নো মুখে আমাকে এই খবর দিলেন।

মামা বললেন, ব্রিগসন কি প্রস্তাব করেন?

মামা যদিচ খুব চেঁচিয়ে কথা বলছিলেন, তবুও এবারে হাটসন সে কথার জবাব না দিয়ে বলে চললেন, আমাদের এখানে চব্বিশ-শ' গোরা সিপাই আছে। কাজেই এখানকার সিপাইরা বিশেষ কিছু করতে সাহস করবে বলে মনে হয় না। আর করলেও আমাদের বিশেষ ভয় পাবার কোনও কারণ নেই।

মামা এবার সপ্তমে চড়ে প্রশ্ন করলেন, কর্ণেল ব্রিগসন কি প্রস্তাব করেন?

হাটসন বললেন, ব্রিগসনের মতে সিপাইদের কাছ থেকে সব অস্ত্র কেড়ে নেওয়াই ভাল আর তাদের নজরবন্দী করে রাখা উচিত—

মামা বললেন, ব্রিগসন বেশ ভাল প্রস্তাব করেছেন বলেই মনে হয়। সাবধানের বিনাশ নেই, আমাদের শাস্ত্রে এই রকম বলে।

হাটসন বললেন, কিন্তু দেখ ওরা চুপচাপই আছে এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত তাই থাকবে, খামকা ওদের সবাইকে চটিয়ে দেওয়া কি উচিত হবে? আমার মনে হয় এত তাড়াতাড়ি এখানে কোনও কিছু করার প্রয়োজন নেই। কি বল হে?

শেষের প্রশ্নটি বেনেকর্তার ওপর নিক্ষিপ্ত হ'ল। তিনি এতক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে বসে ছিলেন, সাহেবের প্রশ্নে হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, আমার মনে হয় অন্ততঃ ম্যাগাজিনটা সিপাইদের পাহারা থেকে দূরে রাখা উচিত। গোরা সিপাইদের পাহারা ডবল করে ওটার দিকে কড়া নজর রাখা দরকার।

হাটসন খুসী হয়ে বললেন, এই প্রস্তাবই সব চেয়ে ভাল—আমি এখনই ব্রিগসনকে ডেকে সেই ব্যবস্থা করতে বলছি।

এইবার আমার দিকে তাঁর নজর পড়ল, বললেন, এটি কে চৌধুরী?

মামা বললেন, ওটি আমার ভাগ্নে, ওকে একজন জুনিয়ার ক্লার্কের কাজে ভর্তি করার কথা ছিল—

ওঃ, হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে—দরখাস্ত লিখে এনেছে একখানা?

দরখাস্ত মামা আমাকে দিয়ে অনেক দিনই লিখিয়ে রেখেছিলেন। সেটি পকেট থেকে বার করে দিলেন। সাহেব না পড়েই তার ওপর একটা সই করে দিলেন। মামা সাহেবকে সেলাম করে উঠে দাঁড়ালেন। আমিও সেলাম করে বেরোবার উদ্যোগ করছি, দেখি বেনেকর্তাও উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনজনে প্রায় একই সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলুম।

বেনেকর্তা বললেন, এইটি তা'হলে তোমার ভাগ্নে চৌধুরীবাবু?

মামা বললেন, হ্যাঁ।

—কি বাবা তোমার নাম?

নাম বললুম।

—আমার বাড়ি তোমার মামাদের বাসার কাছেই, যেও বাবা আমার বাড়িতে। ভাগ্নেকে নিয়ে যেও হে চৌধুরী।

মামা বললেন, যাব এখন।

—বরং আজই যেও, কেমন?

—আচ্ছা চেষ্টা করব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বোধ হয় সেজমামা ভজনরামকে কিছু বলেছিলেন, সে দেখি ইতিমধ্যে আশ্চর্য রকম ভদ্র হয়ে উঠেছে। বাসায় ফিরে আসতেই সে মুখ হাত ধোবার জল এনে দিলে, কাপড় ছাড়বার জন্য কাচা ধুতি এনে দিলে এবং কথাবার্তার ভাবও তার রীতিমত বদলে গেছে দেখা গেল।

ভজনরাম বেশ সৌখীন রকম প্রশ্ন করলে, মীরাট সহর কেমন দেখলেন বাবু?

জবাব দিলুম, এইটুকুর মধ্যে আর কি দেখ্‌বো বাপু! গেলুম ছাউনীতে আর ফিরে এলুম। তার মধ্যে তো আর বিশেষ কিছু দেখা সম্ভব নয়।

সে বল্‌লে, চলুন না আজ বিকেলে একটু ঘুরে বাজারটাজারগুলো দেখে আস্‌বেন। যাবেন বেড়াতে চকের দিকে?

বল্‌তে যাচ্ছিলাম যে যাব, কিন্তু মনে পড়ল বেনেকর্তার কথা, বল্‌লুম, বোধ হয় আজ যেতে পারব না, বরং কাল যাব। আজ মামার সঙ্গে বেনেকর্তার বাড়ি যাব।

সহসা তার মুখের ভাব আশ্চর্য রকম বদ্‌লে গেল। সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বল্‌লে, অমন কাজও করবেন না বাবু। ও বড় সাংঘাতিক লোক। ক্রেস্তানদের জন্যে ও প্রত্যেক অমাবস্যার রাত্রে একটা করে ব্রাহ্মণের ছেলে বলি দেয়। তার রক্তে হোম করে, যাতে হিন্দুস্থানে হিন্দু আর না থাকে। ও একটা বই লিখেছে বাবু, সে বইটা দিনরাত ওর কাছে থাকে—তাতে এমন সব জাদুমন্ত্র লেখা আছে, যাতে সিপাইরা কিছুতেই ইংরেজদের হারাতে পারবে না।

আমি প্রথম দিকটায় খুব গম্ভীর হয়ে থাকলেও শেষে আর হাসি চেপে রাখতে পারলুম না। বেশ গলা খুলেই হেসে উঠলুম।

ভজনরাম ক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে বললে, আপনি হাসলেন বাবু, কিন্তু এ সব খুব সত্যি কথা। ও লোকটা হিন্দুর দুশমন্‌, মুসলমানেরও দুশমন্‌।

আমি বললুম, এ সব সত্যি হতে পারে না ভজনরাম। তাছাড়া ইংরেজদের সিপাইদের কাছে হারতেই বা হবে কেন? তুমিও তো ইংরেজদের অন্ন খেয়েছ, ওসব কথা বলা যে পাপ।

ভজনরাম অপ্রস্তুত হয়ে বললে, সে তো ঠিক কথা বাবু। তবে লোকে বলে—

—আর ওর আমাদের সঙ্গে দুশমনী করেই বা লাভ কি বল!

—জানেন না বাবু, ঐ বুড়ো হ্যাটসনের সঙ্গে ওর বড় দোস্তি। হ্যাটসনের জন্যেই ওর অত পয়সা। আবার নাকি ওর নাতনীকে হ্যাটসন্ অনেক টাকা দিয়ে যাবে!

সেজমামা পেছন থেকে এসে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনছিলেন, তিনি বললেন, ভজনরাম, আমি ভেবেছিলুম তোমার এতদিন চাকরি করে কিছু জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে। এখন দেখছি তুমি যে গাঁওয়ার ছিলে, সেই গাঁওয়ারই আছ,—এই সব কথা এখনও বিশ্বাস কর? ছিঃ!

ভজনরাম অবশ্য তাড়াতাড়ি চলে গেল, কিন্তু বেশ বুঝলুম যে তার বিশ্বাস একটুও বিচলিত হ'ল না।

মামা খানিকটা চুপ করে থেকে বললেন, চল একটু বেড়াতে যাওয়া যাক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাস্তায় বেরিয়ে গম্ভীরভাবে, কতকটা যেন আপনমনেই মামা বললেন, কথাটা মোটেই ভাল নয়। এই সব অশিক্ষিত গাঁওয়ারদের মাথায় যে কথা তুমি একবার ঢুকিয়ে দেবে তা আর সহজে যাবে না।... এসব কথা যারা রটাচ্ছে তারা সহজ লোক নয়।... কোথায় গিয়ে যে এ ব্যাপার মিটবে তা জানি না!...

চকের মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একেবারে নদীর ধারে গিয়ে পড়লুম। শহরটায় অত্যন্ত বেশী রকমের ধুলো হলেও মোটের ওপর আমার মন্দ লাগল না। তাছাড়া সেই আমার প্রথম বিদেশ আসা। যা দেখবো তা-ই ভাল লাগার কথা। নদীর ধারটা বিশেষ করে ভাল লাগল। বেশ নির্জন, কেমন একটা নিবিড় শান্তির ভাব চারিদিকে জড়ানো রয়েছে।

মামা যে বেনেকর্তার বাড়ি যাবেন তা এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি। খানিকটা নদীর ধার দিয়ে চলার পর হঠাৎ মোড় ঘুরে একটা রাস্তার ধারে এসে পড়লেন। তার সামনেই একটা মাঝারি রকমের বাড়ি। চুপি চুপি বললেন, এই বেনেকর্তার বাড়ি!

যেমন এখানে সব বাড়িই হিন্দুস্থানী ধরনের জানলা-বিহীন, এটাও সেই রকমেরই, এমন কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না যাতে আর পাঁচটা বাড়ি থেকে পৃথক করা যায়। কিন্তু কে জানে কেন, কাছে এসেই মনটা যেন ছম্ ছম্ করতে লাগল। সে বোধ হয় ভজনরামের অত কথা বলার জন্যই—একে আমি ছেলেমানুষ, তাতে কুসংস্কার আমাদের মধ্যেও কম নেই—যতই কেন না হেসে উড়িয়ে দিই।

আমার ছমছমানি আরও বাড়ল, কারণ ঠিক যেমন আমরা দোরের কাছে গেছি, সদর দোর আপনা-আপনি খুলে গেল এবং দেখলুম দোরের সামনে প্রথম সিঁড়িতে নিশ্চল পাষাণ-মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন বেনেকর্তা—

আমাদের দেখে বললেন, আসুন চৌধুরী মশায়, আমি জানতুম যে আপনি এই সময় আসবেন, সেই জন্যই অপেক্ষা করছিলুম।

সর্বাঙ্গ শিউরে উঠে মনে পড়ল দিদিমার কথা, পিশাচসিদ্ধ লোক সব কথা জানতে পারে—এ লোকটাও কি পিশাচসিদ্ধ?

আগে আগে তিনি উঠে গেলেন, আমরা পিছনে পিছনে উঠছি, কিন্তু মাঝামাঝি আসতেই আমাদের পিছনের দরজা মহাশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। কে বন্ধ করলে তা দেখতে পেলুম না, তবে সিঁড়ির পাশ দিয়ে বরাবর একটা দড়ি নেমে গেছে, বোধ হয় তারই সাহায্যে ওটা বন্ধ হ'ল।

দোতলায় উঠেই প্রথম যার দিকে নজর পড়ল সে একটি পনের-ষোল বৎসরের মেয়ে, বেশ সুন্দর দেখতে।

বেনেকর্তা বললেন, চৌঁধুরী মশায়, এইটি আমার নাতনী ইন্দিরা। ইন্দু, দিদি, চৌধুরী মশায় আর তাঁর ভাগ্নে সতীশ এসেছেন, সতীশের জন্যে একটু জল-খাবারের যোগাড় কর।

মামা বাধা দিতে যাচ্ছিলেন, তিঁনি হেসে বললেন, আপনি যে খাবেন না তা আমি জানি। সতীশ ছেলেমানুষ, ও খাক্ না, তাতে দোষ কি?

ইন্দিরা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে আমার বেনেকর্তার দিকে নজর পড়ল! সকালের পিরাণ আর তাঁর গায়ে নেই। চুড়িদার পায়জামা আর আলখাল্লার মত ঝলমলে একরকম জামা, কতকটা সাহেবদের নাইটড্রেসের মত।

এমনিই সাধারণ ভাবে দু-চারটে আলাপ হ'তে হ'তে ইন্দিরা একটা আসন এনে পেতে দিয়ে গেল, আর একবার একঘটি জল রেখে ঠাঁই করে গেল এবং তারপরে পরিপাটি করে সাজানো একথালা মিষ্টি এনে রেখে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই আমাকে বললে, আপনার হাত পা ধোবার জল এই দোরের পাশেই রেখে দিয়েছি।

আমি ইতস্তত করতেই মামা বললেন, যাও সতীশ, হাত পা ধুয়ে নাও।

অগত্যা আমি খেতে বসলুম।

মামার সঙ্গে অনেকক্ষণ সিপাইদের মনোভাবের কথা আলোচনা হচ্ছিল—কথাবার্তা বেনেকর্তার এত সংযত এবং স্বাভাবিক যে যতই শুনছিলুম ততই মনে মনে আশ্চর্য হচ্ছিলুম যে এই লোকের সম্বন্ধে এত সব ভয়াবহ ধারণা মানুষ করে কি করে! এই সব কথা মনে মনে তোলাপাড়া করছি, এমন সময় সহসা আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, কেন আমার নামে এ-সব কথা রটাচ্ছে শুনবে?

আমি চমকে উঠলুম, সত্যই কি লোকটা সর্বজ্ঞ?

তিনি মামার দিকে চেয়ে বললেন, আপনার ভাগ্নে মনে মনে ভাবছিল যে এমন সব ভয়ঙ্কর কথা আমার নামে রটে কেন? কেমন না?

স্বীকার করতে হ'ল, কথাটা তাই বটে।

—আমি একটা বই তৈরি করেছি, জান? "মহাজ্ঞান" তার নাম। সে বই যার কাছে থাকবে এ পৃথিবীতে সে সর্বোচ্চ ক্ষমতা পাবে। জীবনের পথ যত কঠিনই হোক না কেন, তার কাছে সে পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে যাবে, প্রবল শত্রুও তার কাছে নত হবে—যে কোনও দুষ্প্রাপ্য বস্তু তার কাছে সহজলভ্য হবে।...... দেখবে সে বই?

সত্যসত্যই যে এ রকম বই আছে এবং সে বই লেখার দাবী তিনি করবেন তা আমি এর আগে দুজনের মুখে শুনলেও ঠিক বিশ্বাস করিনি। বিস্ময়ে কৌতূহলে অভিভূত হয়ে উঠলুম। মামার দিকে চেয়ে দেখলুম তাঁরও প্রায় সেই অবস্থা। ইন্দিরা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়েছিল, দেখলুম যে সে-ই শুধু বেশ নির্বিকার। সে একবার ফিরেও চাইলে না, যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল—শুধু যেন তার মুখে ক্ষীণ, একটা অতি ক্ষীণ বিদ্রূপের ভাব ফুটে উঠেই পরক্ষণে মিলিয়ে গেল। বেনেকর্তা অবিচল মুখে আলখাল্লার পকেট থেকে একটা পদার্থ টেনে বার করলেন, পুঁথির মত লাল কাপড় জড়ানো কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী চওড়া এবং বেশ মোটা।

সেটা হাতে করে একটু নেড়েচেড়ে চোখের কাছে এনে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, কোটরগত চোখ-দুটো যেন গর্বে আনন্দে জ্বলছিল এবং যেন মনে হ'ল তা এখনি ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। একটু পরেই সেটা আবার নিজের আলখাল্লার মধ্যে পুরে ফেললেন।

মামা বললেন, একি সত্যি?... ওতে ঐ সব মন্ত্র লেখা আছে?

তিনি জবাব দিলেন, সত্যি এবং বেটারা তা বিশ্বাস করে। ওদের বিশ্বাস যে বইটা যদি ওরা হাতে পায় তাহ'লে ইংরেজদের তাড়ানো ওদের পক্ষে সহজ হবে। বই যদি আমার কাছে থাকে আর ইংরেজদের আমি সাহায্য করি তাহ'লে ওরা হারবে। সেইজন্য ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা রটাচ্ছে, যাতে জনসাধারণ ক্ষেপে গিয়ে আমাকে মেরে ফেলে।... এ সেই ব্রাহ্মণ তান্তিয়াটোপীর কাজ, তাও আমি জানি।

কথা বলতে বলতে তিনি যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, মনে হ'ল যেন বহু দূরের কি একটা জিনিস দেখবার চেষ্টা করছেন।

...কিছুক্ষণ পরে মামা বললেন, আজ তাহ'লে যাই, রাত হ'ল—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন; আপনাদের আলো দেখাই।

সিঁড়ি দিয়ে আগের মতই উনি আগে আগে পথ দেখিয়ে চললেন। সিঁড়ির ঘন অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে সেই শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধকে দেখে আবার আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। সত্যিই কি লোকটা জাদুকর?

আমরা বাইরে পা দিতে, তিনি দোর বন্ধ করার আগে বললেন, না ভাই, জাদু জানি বটে কিন্তু জাদুকর নই।

আশ্চর্য!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এর পর চার পাঁচটা দিন চাকরি বুঝে নিতেই কেটে গেল। আফিসের কাজ কেমন তা আগে কিছুই জানতুম না। সুতরাং একেবারে যেন অকূলে পড়লুম বলে মনে হ'ল। তবু মামারা ছিলেন বলে রক্ষে—নইলে বোধ হয় চাকরির সাধ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'ত।

কাজ খুব বেশী; জনতিনেক মুসলমান কেরানী সহসা পদত্যাগ করলেন। কর্তৃপক্ষ অবশ্য এরকম সন্দেহ গোড়া থেকেই করেছিলেন এবং সেইজন্যই আমাকে ও আর একটি ছেলেকে বাঙ্গালা থেকে আনানো হয়েছিল—কিন্তু তিনজন অভিজ্ঞ লোকের কাজ দুজন আনাড়ী পেরে উঠবে কেন? সকালে উঠেই বল্‌তে গেলে অফিস যেতে হ'ত, ওধারে কাজ শেষ করে ফিরতেও রাত হয়ে যেত—সুতরাং কোথাও বেড়াতে যাওয়া এতদিন হয়েই ওঠেনি। এত ক্লান্ত হয়ে পড়তুম যে এসেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করত।

তাই রবিবার দিন ভজনরামকে বললুম, চল একটু বেড়িয়ে আসি।

ভজনরাম সর্বদাই প্রস্তুত—দ্বিরুক্তি না করে সঙ্গে সঙ্গে চলল। চকবাজার দেখাতে তার বড় উৎসাহ, প্রথমেই নিয়ে গেল চকে। চক্ ঘুরে ক্রমে আমরা সেদিন মামা যে পথে গিয়েছিলেন সেই পথেই গঙ্গার ধারে গিয়ে পড়লুম।

এ কয়দিন সহস্র কাজের ফাঁকেও ইন্দিরার কথা মনে পড়েছে। সেই আশ্চর্য মেয়েটির রূপ, তার আরও আশ্চর্য সংযত চালচলন আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলুম না। ওর

দাদামশায়ের কথাও যে ভুলে গিয়েছিলাম তা নয়, কিন্তু তাঁর অসাধারণ কথাবার্তা ও অমানুষিক শক্তির কথা মনে পড়লে কেমন যেন ভয় হ'ত—ভুলে থাকবার চেষ্টা করতুম।

কিছু দূর চল্‌বার পরই একটা গোলমাল কানে এল। আরও একটু চলবার পরই সে শব্দ বেশ প্রবল আকার ধারণ করলে। শব্দটা ওদের বাড়ির দিক থেকেই আসছিল বলে কৌতূহলবশতঃ জোরে পা চালিয়ে সেদিকে এসে পড়লুম।

সেখানে পৌঁছে যে দৃশ্য নজরে পড়ল তা সহজে ভোলবার নয়। একদল লোক, বোধ হয় জন পঞ্চাশেক হ'বে, লাঠি সড়কী প্রভৃতি নিয়ে হৈ হৈ করছে। তাদের লক্ষ্য বৃদ্ধ বেনেকর্তা। তিনি ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে সদরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁকে দু হাত দিয়ে আড়াল করে আছে ইন্দিরা। ক্রুদ্ধ জনতা তাকে সরে যেতে বল্‌ছে বারবার—

ভজনরামের হাতে লাঠি ছিল। কিন্তু ফিরে দেখলুম ভজনরাম নেই, সে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, আশেপাশে কোথাও তার চিহ্নমাত্র নেই।

কিন্তু তখন আর তাকে খোঁজবার সময় নেই। বেশীক্ষণ যে ইন্দিরার বাধা তারা মানবে না তা বেশ বুঝতে পারছিলুম। দু-হাতে উন্মত্ত জনতা সরিয়ে আমি ইন্দিরার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম,—প্রশ্ন করলুম, কি হয়েছে, তোমরা এরকম হল্লা করছ কেন?

আমার ভাঙা হিন্দী তারা পরিষ্কার না বুঝলেও হঠাৎ আমার আবির্ভাবে তারা একটু প্রকৃতিস্থ হ'ল। তাদের মধ্যে একজন বললে, ঐ বুড়োর কাছে একটা কিতাব আছে, তাতে আমাদের যাতে অনিষ্ট হয় সেই সব মন্ত্র লেখা আছে—সেই কিতাবটা চাই। তা ছাড়া বুড়ো যাগ করে করে দেশে সব রোগ আন্‌ছে...... ওর সঙ্গে আমরা বোঝাপড়া করব।

আমি ইন্দিরাকে বললুম, বাড়ীর মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা কর।

তারপর তাদের বললুম, কে এসব কথা বলেছে? সব মিথ্যে কথা। যারা এসব কথা বলছে, তোমাদের আরো বেশী অনিষ্ট করছে তারা, কোম্পানীর রাজত্বে এই রকম হল্‌লা করলে জেলে যেতে হয়, তা জান?

লোকটা হো হো করে হেসে উঠল—কোম্পানীর রাজত্ব থাকলে তো! সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার যেন ক্ষেপে উঠল, ওই বুড়্‌ঢা, ওকে চাই!

ইতিমধ্যে ইন্দিরা ক্ষিপ্রহাতে দোরটা খুলে ফেলেছিল। আমি চকিতের মধ্যে ঠেলে ওদের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ওরা টের পাবার আগেই ভেতরে ঢুকে দোর চেপে ধরলুম। সঙ্গে সঙ্গেই ওরা দোরে এসে পড়ল সত্য কিন্তু আমারও কুস্তি করা দেহ—ইন্দিরা যতক্ষণে বিরাট চাপা খিল লাগালে ততক্ষণ আমি দোরটা ধরে রাখতে পারলুম।

ইন্দিরা চুপি চুপি বললে, আমরা নদীর ধারে বেড়াতে যাব বলে বেরুচ্ছিলাম, ওরা এসে পড়ল—

কিন্তু আমার কান সেদিকে ছিল না, বাইরে লাথি ও পাথর ক্রমাগতই এসে পড়ছে, বরং বেড়েই চলেছে। এখানকার সাধারণ বাড়িতে চাপা খিল থাকে না, বুঝলুম এটা বেনেকর্তা করিয়ে নিয়েছেন—কিন্তু তাই বা কতক্ষণ?

বেনেকর্তা ভেতরে ঢুকেই কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু মিনিট দুইয়ের মধ্যেই

আবার ওপর থেকে নেমে এলেন। এবার আর তাঁর আগেকার মত মুখের ফ্যাকাশে রং নেই, পূর্বের অবিচলিত ভাব ফিরে পেয়েছেন। কারণ ভাবতে হ'ল না, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখলুম হাতে তাঁর একটি তিননলা পিস্তল—পিস্তলটি তৈরি।

আমার হাতে দিয়ে বললেন, হাটসন্ দিয়েছিলেন এক জোড়া; আর একটা আছে আমার কাছে। বাড়ির মধ্যে যখন আসতে পেরেছি তখন আর আমার জন্য তুমি ভেব না, তুমি এই পিস্তলটা দেখিয়ে বাড়ি চলে যাও—

তারপর সহসা কাছে এসে একটা কি ভারি জিনিষ আমার পিরাণের পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন। ফিস্ ফিস্ করে বললেন, এই আমার মহাজ্ঞান—এর জন্যই বেটারা অত কাণ্ড করছে। আজ তোমার কাছেই থাক্, তোমার কাছে থাকলে কেউ সন্দেহ করবে না।...

কী সর্বনাশ! মহাজ্ঞান! সেই মহাজ্ঞান আমার কাছে?

আমার সর্বাঙ্গ বার বার শিউরে উঠতে লাগল। আমি যেন অভিভূত হয়ে পড়লুম। কিন্তু তখন আর ভাববার সময় ছিল না, ঠিক সেই সময়ে মহা শব্দ করে খিলটা ভেঙে পড়ল।

লোকগুলো হুড়মুড় করে বিজয়উল্লাসে ভেতরে ঢুকছিল কিন্তু আমাকে পিস্তল হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সকলে থম্‌কে দাঁড়াল। তখন আমারও সাহস ফিরে এসেছিল, আমিও গম্ভীরভাবে এক পা, এক পা, করে এগিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালুম, উদ্যত পিস্তলের সাম্‌নে ওদের দম্ভ যেন মিলিয়ে এল—ওরাও আস্তে আস্তে পিছিয়ে গিয়ে আমার সামনে পথ করে দিলে।

আমি বাইরে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে বেনেকর্তা দোর বন্ধ করে দিলেন। বোধ হয় আরও কোনও লুকানো খিল ছিল, কারণ খিল বন্ধ করার শব্দ হ'ল। লোকগুলো ইতিমধ্যেই কম্‌তে শুরু করেছিল, সহসা দেখি সবাই দৌড়োতে আরম্ভ করেছে। বিস্মিত হয়ে ফিরে দেখি ওধারের রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন কর্ণেল ব্রিগসন। আমি কিন্তু আর ব্রিগসনের জন্য অপেক্ষা না করে পিস্তলটা হাতে করেই বাসার রাস্তা ধরলুম। আমার দেহ তখন ঘোরতর মানসিক উত্তেজনায় থর্‌থর্ করে কাঁপছে।

রাস্তার খানিকটা এগোতেই নজর পড়ল ভজনরামের দিকে—এক চক্ষু যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে নিতান্ত ভালমানুষের মত চেয়ে আছে।

একটু তীক্ষ্ন-স্বরেই বল্‌লুম, কোথায় গিছ্‌লে ভজনরাম?

সে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই উত্তর দিলে, ওখানে হল্‌লা হচ্ছে দেখে লোকজন ডাকতে গিয়েছিলুম বাবু।

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা তা বুঝতে পেরেও বিশেষ কোনও কথা কইলুম না, শুধু একবার বললুম, লাঠিটা আমায় দিয়ে গেলেই পারতে!

আরও খানিকটা চলবার পর ভজনরাম বল্‌লে, বুড়ো বইটা আপনার কাছে দিলে, না?

আমি চম্‌কে উঠলুম। সন্ধ্যার এই আবছায়া আলোতে ওর দেখতে পাবার কথা নয়, তাছাড়া বেনেকর্তা যখন আমাকে বইটা দিয়েছেন তখন আর কেউ ছিল না। বুঝলুম এটা ওর আঁধারে ঢিল মারা। আমি বললুম, কি বই?

—ওর সেই ডাইনের বইটা?

—কই না, আর সে তা দেবেই বা কেন?

—ওঃ, আমারই ভুল হয়ে থাক্‌বে!

ঐ পর্যন্ত। আর পথে কোনও কথাবার্তা হ'ল না। কিন্তু আমার মনে একটা রীতিমত আলোড়ন চলতে লাগল। ভজনরামকে আমি প্রথম থেকেই একটু সন্দেহের চোখে দেখছিলুম, এখন সে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হ'ল। নিশ্চয়ই বইটার ওপর ওর ব্যক্তিগত লোভ বা বিদ্বেষ আছে। আর সেটা পাবার জন্যে যে একটা ষড়যন্ত্র চল্‌ছে তার মধ্যেও সে আছে।

বাসায় পৌঁছে আমি সেজমামাকে ছাদে নিয়ে গিয়ে সব কথা খুলে বল্‌লুম।

সেজমামা বললেন, বইটা নিয়ে তুমি ভাল কাজ করনি। এই সব অশিক্ষিত লোকের মাথায় কুসংস্কার একবার ঢুকলে আর রক্ষা নেই।...... এনেছ যখন তখন আজকের রাতটা রেখে দাও, কাল সকালে আমি নিজে গিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে আসব। ওর জিনিষ ঘরে রাখা ঠিক নয়।...

আমি বললুম, আজ রাত্রে কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই তো?

—আমার মনে হয় যে বিশেষ নেই। তবে একটু সাবধানে থেকো, পিস্তলটা মাথার বালিসের নীচে রেখে দিও।

আমি বললুম, ভজনরাম!

মামা বললেন, ছোড়দার সঙ্গে কথা কয়ে কাল ওকে জবাব দেব।...

রাত্রে খেতে বসবার সময় আবার ভজনরামের সঙ্গে দেখা হ'ল। খাবার সময় সে জল দিত। যতবার সে জল দিতে আসছে ততবারই মনে হ'ল সে যেন আমার পিরাণের পকেটটা ভাল করে দেখে নেবার চেষ্টা করছে। সে চাউনিটা আমার বিশেষ ভাল ঠেকল না।... যাই হোক, আর ও সম্বন্ধে কোনও কথা না বলে খেয়ে ওপরে উঠে গেলুম।

রোজ রাত্রে খাবার পর ছাদে খানিকটা পায়চারি করে তবে ঘরে শুতে যেতুম, কিন্তু সেদিন একটু পায়চারি করতে না করতে যেন ঘুমে চোখের পাতা জুড়ে আস্‌তে লাগল। হাত-পাও ভারি ঠেকতে লাগল। শেষে মনে হ'ল যেন বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করলে পড়ে যাব। বিরক্ত হয়ে শুতে গেলুম।

ঘরে ঢুকে এক আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলুম। দোরের ভেতরদিকে ছিট্‌কিনি আর একটা শিকল ছিল, কিন্তু এখন আর শিকলটা ব্যবহার করার কোনও উপায় নেই, কারণ ওর আট্‌কাবার সূর্যোটা এইমাত্র কে কেটে বার করে নিয়েছে!

মনে হ'ল চেঁচিয়ে মামাকে ডাকি কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না, মনে হ'ল জিভ্‌ যেন জড়িয়ে আসছে। তখন এবং মাত্র তখনই সত্যটা মনে পড়ল—আমার জলের সঙ্গে নিশ্চয়ই ভজনরাম কোনও বিষ খাইয়েছে, এ ঘুম স্বাভাবিক নয়।

তখন আর কোনও উপায় নেই, কোনও রকমে ছিটকিনিটা লাগিয়ে টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে বিছানায় পড়লুম। বুঝতে পারলুম যে যেমন করেই হোক জেগে থাকতে হবে কিন্তু ক্ষমতায় কুলোল না! একটু পরেই সমস্ত দেহকে শিথিল করে ঘুম এল...

মনের জোর ছিল অসাধারণ, তাছাড়া স্বাস্থ্যও বরাবর ভাল সুতরাং বিষক্রিয়া আমার দেহকে জড় করে ফেললেও একেবারে অজ্ঞান করতে পারেনি। প্রাণপণ শক্তিতে সেই নিদ্রার মধ্যেই চৈতন্যকে জাগ্রত রাখবার চেষ্টা চলছিল। তাই কতক্ষণ পরে মনে নেই—খানিক্‌টা পরে যখন খুট্‌ করে ছিটকিনি খোলার শব্দ হ'ল তখন সেটা বেশ অনুভব করে প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ খুলে চাইলুম।

ঘরে বরাবরই 'সেজ' জ্বলত, তারই ক্ষীণ আলোতে আমি ভজনরামকে দেখ্‌ব আশা করেছিলুম, কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলুম, আগন্তুক স্ত্রীলোক। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা—তবু চলনটা চেনা চেনা বলে মনে হ'তে লাগল।

স্ত্রীলোকটি ঘরে ঢুকে সন্তর্পণে কপাটটি আবার ভেজিয়ে দিলে,—তারপর ত্বরিৎ গতিতে আমার বিছানার পাশে এসে ডাক্‌লে, ওগো শুন্‌ছ!

কী সর্বনাশ! এ যে ইন্দিরা!

প্রাণপণে ওঠবার চেষ্টা করলুম। দেহ যেন পাথরের মত ভারি, অবশ। চেঁচিয়ে সাড়া দেবার চেষ্টা করলুম—কণ্ঠে স্বর ফুটল না।

সে আর একবার আকুল কণ্ঠে ডাকলে, শুন্‌ছ!

সেবারেও সাড়া দিতে পারলুম না, বেদনায় আমার শিরাগুলো টন্‌টন্‌ করতে লাগল, কিন্তু বৃথা, বৃথা, বৃথা চেষ্টা—

সে বল্‌লে, ওগো, ওঠো না গো! এমন বিপদ মাথায় করে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও কি করে? আমি যে আর ভাবতে পারি না—

সে মশারী তুলে আমায় ধাক্কা দিয়ে ডাক্‌লে, ওঠো ওঠো, কেন ও আপদ বইখানা নিয়ে এলে, ওরা যে তোমাকে খুন করে ফেল্‌বে। বইখানা আমায় দিয়ে দাও—

পরক্ষণেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বল্‌লে, যা ভেবেছি তাই, এ যে জ্ঞান নেই...!

ব্যাকুলভাবে আমার নাকে হাত দিয়ে দেখলে নিশ্বাস পড়ছে। তারপরে চোখের দিকে চেয়ে বললে, ঐ তো চেয়ে আছ, তবে সাড়া দিচ্ছ না কেন? বইটা দিয়ে দাও, নইলে হয়ত ওরা কি করবে, হয়ত বা খুনই করবে—

তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে বোধহয় বুঝতে পারলে, বল্‌লে, দিয়েছে এরি মধ্যে বিষ? তবে তো আর সময় নেই...... কই বইটা?

চোখের ইঙ্গিতে পিরাণের পকেটের দিকটা দেখিয়ে দিলুম। সে ক্ষিপ্রহস্তে বইটা বার করে নিয়ে নিজের বুকের কাপড়ের মধ্যে পুরে ফেল্‌লে। তারপর আমার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বল্‌লে—শুধু অবশ করে রেখেছে না আর কিছু! তোমার প্রাণের ভয় নেই তো?

ঠিক সেই সময় যেন বাইরে একটা পদশব্দ শোনা গেল—খুব মৃদু, কিন্তু ইন্দিরার কানেও তা গিয়েছিল, সে তীরবেগে উঠে দাঁড়াল এবং বোধ হয় আলোটা নিভিয়ে দেবার জন্যই এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তাঁর আগেই দোর খুলে গেল।

এবার যে ঘরে ঢুক্‌ল সে ভজনরাম। তখন ইন্দিরা ঠিক ঘরের মাঝখানে, ভজনরাম ঘরে ঢুকেই ওকে দেখতে পেলে এবং একটা কুৎসিত গালাগালি করে উঠল—

ওকে দেখতে পেয়েই ইন্দিরা বুকের মধ্যে বইটা চেপে ধরলে, কিন্তু ভজনরামের এক-চক্ষুর দৃষ্টি এড়াতে পারলে না, সে বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল।

ইন্দিরার গায়ে যে এত জোর তা আমি কখনও কল্পনা করতে পারিনি। আমি ভেবেছিলুম ভজনরাম ছেলেমানুষের হাত থেকে মিঠাই কেড়ে নেবার মতই স্বচ্ছন্দে বইটা কেড়ে নেবে, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম যে দুজনেই ধস্তাধস্তি করছে এবং ইন্দিরা মোটেই কম যায় না—

প্রাণপণে ওঠবার চেষ্টা করলুম আর একবার, কিন্তু এই বিপদেও দেহে শক্তি সঞ্চার করতে পারলে না।

ইন্দিরা হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, তুমি কি কিছুতেই উঠ্‌তে পারছ না? আমি যে আর পারি না!
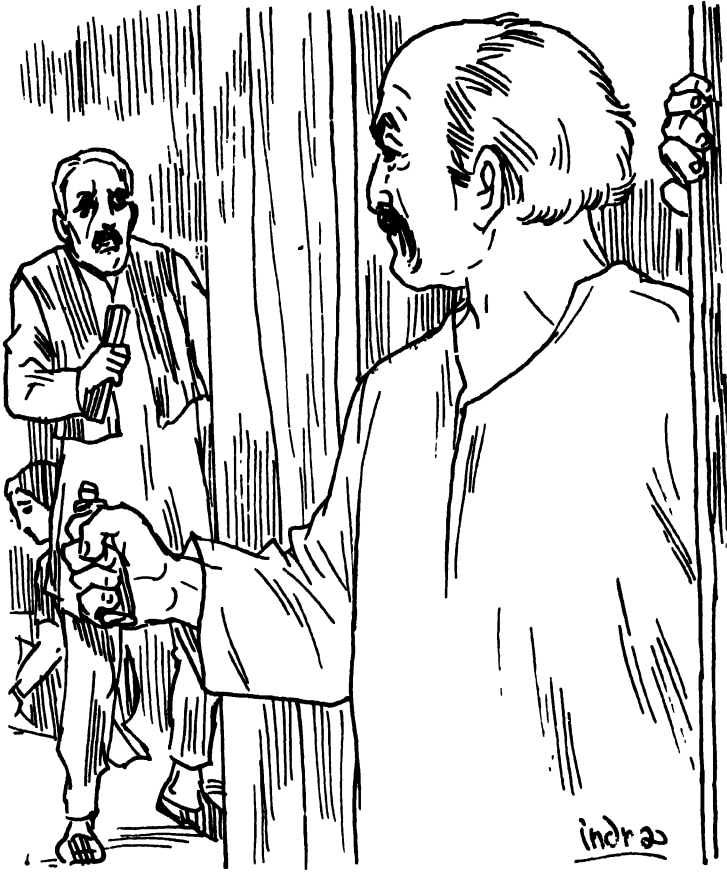
অসহ্য ক্রোধে কপালের দুটো রগ টন্‌টন্‌ করতে লাগল। একান্ত অসহায় ভাবে পড়ে রইলুম—ওকে রক্ষা করার জন্য একটা হাত পর্যন্ত নাড়তে পারলুম না।

শেষে একটা প্রচণ্ড আঘাতে বইটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে ভজনরাম। তারপর সেজের ক্ষীণ আলোতে দেখে নিলে সেইটেই আসল জিনিষ বটে। আমার দিকে ফিরে বল্‌লে, আর কিছু ভাবি না। এইবার সব কটাকে জব্দ করব!

কিন্তু বইটা পিরাণের মধ্যে ঢেকে যেমন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যাবে—যেন সহসা ভূত দেখেই সভয়ে পেছিয়ে এসে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলুম যুক্ত দ্বারপথে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বেনেকর্তা।

পেছনে চাঁদের আলোর আভাষ, সামনের দিকে মুখে গিয়ে পড়েছে সেজের আলো। সেই আলো-অন্ধকারের অস্পষ্টতায় পাষাণ-মূর্তির মত নিশ্চল বৃদ্ধকে দেখলে সত্যই মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

এক মুহূর্ত মাত্র—তারপরেই হাতে একটা চামড়ার শিশি থেকে একটা কী আরকের মত ভজনরামের মুখে ছুঁড়ে দিলেন। সে বিকট চীৎকার করে মেঝেতে পড়ে চেঁচাতে আর ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। অসহ্য যন্ত্রণায় তার দেহ ধনুকের মত বেঁকে বেঁকে উঠতে লাগল।

একটুখানি সেদিকে চেয়ে থেকেই বেনেকর্তা তার হাতের মুঠোর মধ্যে থেকে বইটা কেড়ে নিলেন, তারপর আশ্চর্য রকম সহজ ভাবে ইন্দিরার মূর্ছিত দেহ তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পরই কিন্তু অসম্ভব মানসিক উত্তেজনায় আবার আমার চৈতন্য লোপ পেল। খুব অস্পষ্টরকম ভাবে মনে হ'ল যেন ভজনরামের চীৎকারে মামারা ছুটে এলেন, খুব হৈ চৈ—কিন্তু ঐ পর্যন্ত।

জ্ঞান হ'ল আরও চার পাঁচ দিন পরে। শুনলুম ভজনরাম হাসপাতালে। ওর আর একটা চোখ তো কানা হয়ে গেছেই, তা ছাড়া সারা মুখটা খুব পুড়ে গেছে। আর একটা দুঃসংবাদ শুনে মনে আঘাত পেলুম। গতরাত্রে নাকি কারা বেনেকর্তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, তাঁরা অতি কষ্টে রক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু বাড়িটা পুড়ে গেছে।

অনেকে অনেক কথা প্রশ্ন করলেন। মামারা প্রায় সবই অনুমান করে নিয়েছিলেন। যেটুকু জানতেন না, সেটা আমিও আর জানাবার চেষ্টা করলুম না;—অর্থাৎ ইন্দিরার আগমন।

আরও দু'চারদিন পরে আমি অফিস যেতে শুরু করলুম। খুব বেশি রকম কাজের ভীড়—তার ওপর প্রত্যহ আম্বালা থেকে, দিল্লী থেকে ভীষণ ভীষণ খবর আসতে লাগল। কানপুরের নানাসাহেব নাকি তান্তিয়াটোপীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে এবং সিপাইরা সব ওদের দিকে। অফিসে সবাইকারই দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। কারণ এখানকার আবহাওয়াও খুব ভাল নয়, অথচ জেনারেল হাটসন্‌ পরম নির্বিকার, নিশ্চিন্ত।

এর মধ্যে একদিন পিস্তলটা ফেরত দেবার অছিলায় বেনেকর্তার বাড়ির দিকে গিয়েছিলুম, দেখলুম পুড়ে যেটুকু অনিষ্ট হয়েছে সেটা আবার মেরামত করা হচ্ছে বটে, কিন্তু গৃহস্বামী ছিলেন না, কোথায় গিয়েছেন তাও কেউ জানে না।...

...মে মাসের প্রথমেই একদিন সকালে উঠে শুনলুম যে কাল রাত্রে নাকি কানপুর থেকে সিপাইরা এখানকার সিপাইদের কি খবর পাঠিয়েছে—তার ফলে কাল ওদের এক মিটিং হয়ে গেছে। আজ সকালে কি যে হবে তার ঠিকানা নেই।

মামাকে জিজ্ঞাসা করলুম যে অফিসে যাওয়া হবে কিনা। তিনি জবাব দিলেন, নিশ্চয়ই যেতে হবে। দামী জিনিষপত্র আমি আগেই সরিয়ে ফেলেছি—কাজেই বাসার মায়া বেশি নেই। এখন বরং অফিসে থাকাই নিরাপদ—ওখানে প্রায় আড়াই হাজার গোরা আছে।

সকলে মিলে অফিসের দিকে যাত্রা করলুম। ব্যাপার যে বেশ প্রবল আকার ধারণ করেছে তা রাস্তায় পা দিয়েই বুঝতে পারলুম। ভজনরাম হাসপাতাল থেকে একদিন কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল, তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। দেখলুম সে একখানা এক্কা করে একটা সিপাইর সঙ্গে কোথায় যাচ্ছে। রাস্তায় ঘাটে যেসব লোকজনের সঙ্গে দেখা হ'ল, তাদের প্রত্যেকেরই মুখে একটা দারুণ উত্তেজনার চিহ্ন—যেন প্রত্যেকেই একটা ভীষণ কিছু আশা করছে।

অফিসে পৌঁছতেই কর্ণেল ব্রিগসন এসে সেজ মামাকে জেনারেলের খাস কাম্‌রায় ডেকে নিয়ে গেলেন। আমরা অবশ্য অফিসে এসে বসলুম বটে কিন্তু সেদিন কাজও বিশেষ ছিল না আর কাজ করার মত অবস্থাও নয়। মধ্যে মধ্যে দেশী সিপাইদের ছাউনীর দিক থেকে এক একটা চিৎকার ভেসে আসছে—রীতিমত হল্‌লা, গোরা সিপাইগুলোর মুখ যেন অন্ধকার, দস্তুরমত ভয় পেয়েছে বলে মনে হ'ল।

দুপুরের দিকে এক সময় একটা বিরাট চীৎকার শোনা গেল—ছুটে অফিসের বাইরে এসে দেখি সিপাইরা সব বন্দুক নিয়ে দল বেঁধে হৈ হৈ করতে করতে ছাউনী ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। শুনলুম, কর্ণেল মারফোর্ড নাকি ওদের ড্রিল করাতে গিয়েছিলেন, ওরা তাঁর কথা না শুনে বেরিয়ে যাচ্ছে।

জেনারেল হাটসন মামাকে সঙ্গে করে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—মামা আর ব্রিগসন দুজনেই ওঁকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে এদের এখনই আক্রমণ করা হোক এবং সময় থাকতে থাকতে বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া হোক। কিন্তু হাটসন্ কেবলই বলছিলেন, যতই হোক ওরা সংখ্যায় বেশি—এখন ওদের আক্রমণ করে বলক্ষয় না করে বরং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা বেশি করে করা হোক। আরও দেখ—আমি জঙ্গীলাটকে এখানকার অবস্থার কথা এর আগেই জানিয়েছি কিন্তু তিনিও কোনও হুকুম দেন নি—এক্ষেত্রে আমি নিজের দায়িত্বে কি করি বল?

মামার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছিল। তিনি সামনের ছোট ফুলের গাছটা থেকে একটা ফুল তুলে নিয়ে একটু একটু করে ছিঁড়তে লাগলেন। কর্ণেল ব্রিগসনও অধীরভাবে গোঁফের ডগা কামড়াচ্ছিলেন, শুধু জেনারেল হাটসন্ তাঁর ক্ষীণ শ্রবণশক্তির সবটা প্রয়োগ করে দিয়ে ওদের হল্‌লা শুনছিলেন, আর বোকার মত চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

একটু পরে ব্রিগসন বললেন, শহরে যেসব সিভিল অফিসারেরা আছে বা যেসব ইংরেজ বণিকেরা আছেন তাঁদের ছাউনীর মধ্যে এনে রাখা উচিত নয় কি?

হ্যাটসন্ বললেন, সিভিলিয়ানদের কি কোনও বিপদের সম্ভাবনা আছে? ওদের ওপর সিপাইদের আর রাগের কি কারণ থাকতে পারে?... যাই হোক্, যদি এর পর সে রকম কিছু দেখতে পাই তো সে ব্যবস্থাও হবে। ব্রিগসন্, তুমি ছাউনীতে ডবল পাহারা বসাবার ব্যবস্থা কর আর ম্যাগাজিনটা খুব সাবধান।...

হ্যাটসন্ নিজের অফিসঘরের দিকে চলে গেলেন। অতিরিক্ত বুড়ো হবার দরুণ তাঁর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভবও নয়! ব্রিগসন্ও সেজমামাকে সঙ্গে করে ম্যাগাজিনের দিকে চলে গেলেন।

সেজমামা আমায় যাবার সময় বলে গেলেন, তোমরা কেউ এখন ছাউনী ছেড়ো না যেন।

হায়রে সে কথা যদি শুন্তুম!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার একটু আগে আমি আর সুশান্ত বসে গল্প করছিলুম। আমার সঙ্গে যে নতুন বাঙ্গালীর ছেলেটি চাকরি করতে ঢুকেছিল তারই নাম সুশান্ত। আমি আর সুশান্ত সমবয়সী বলে দুজনে খুব বেশিরকম ভাব হয়েছিল। তাছাড়া সুশান্তর মন সত্যিই ভাল ছিল। আমার সব কথাই আমি সুশান্তকে বলতুম।

হ্যাঁ, সুশান্তর সঙ্গে বসে কথা কইছিলুম—এমন সময় একটা ছোট হিন্দুস্থানী ছেলে এসে আমার হাতে একখানা চিঠি দিলে। আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলুম, আমাকে আবার চিঠি দিলে কে?

খুলে দেখলুম, দু-ছত্র লেখা—

আমাকে এরা ধরেছে—দাদামশাই কোথায় জানি না। বড় ভয় করছে—

ইন্দিরা।

সমস্ত দেহে যেন বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে গেল। যদিও ইন্দিরার হাতের লেখা কখনও দেখিনি কিন্তু কোন রকম সন্দেহের তখন অবসর ছিল না। সে বিপদে পড়েছে, আমায় ডাকছে!

চিঠিখানা পড়ে নিঃশব্দে সুশান্তর হাতে দিয়ে ছেলেটাকে বললুম, এ চিঠি তোকে দিলে কে?

—ও এক বাঙ্গালী দিদিমণি।

—কোথায় আছে জানিস্? পথ দেখাতে পারবি?

সে বললে, পারব।

সুশান্তকে বললুম, কি করব সুশান্ত?

সুশান্ত বললে, চল আমরা চুপি চুপি বেরিয়ে যাই। কোথায় আছে সেটা চোখে দেখে তবে উদ্ধার করার ব্যবস্থা।

আমি বললুম, কিন্তু ছাউনী ছাড়া কি উচিত হবে? মামাকে জানালে হ'ত না?

তার অসীম উৎসাহ, সে বললে, আমরা কি এতই অক্ষম! চল এইধার দিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ি।

আমারও তখন বিশেষ বিবেচনা করার সময় ছিল না। দু'জনে দু'গাছা লাঠি নিয়ে নিরিবিলি বেরিয়ে পড়লুম।

ছেলেটা ছাউনী থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারের রাস্তা ধরলে। খানিকটা গিয়েই দুধারে আম-বন, রাস্তা নির্জন আর অন্ধকার—

সহসা সামনে আর দুপাশ থেকে একদল লোক আমাদের ঘিরে ধরল। সবাই-এর হাতেই বন্দুক। তাদের উল্লাসধ্বনিতে বুঝলুম এটা একটা ফাঁদ মাত্র—

কিন্তু তখন আর উপায় কি? চব্বিশটা বন্দুকের সামনে লাঠির জোর আর কতটুকু? আত্মসমর্পণ করতেই হ'ল।

আমাদের হাত বেঁধে কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে চলল ওরা—কোথায় কে জানে! সব ক'জনই সিপাই। ওদের কথাবার্তা থেকে যা বুঝতে পারলুম তা খুবই দুঃসংবাদ—কর্ণেল ব্রিগসনের ভয়ই যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে, উন্মত্ত বিদ্রোহীরা শহরে ঢুকে ডাক্তার সাহেবের বাংলায় আগুন দিয়েছে এবং হ্যামিল্‌টন সাহেবের সমস্ত পরিবারকে মেরে ফেলেছে। ডাক্তার সাহেব নিজে কোথায় কল্‌-এ গিয়েছিলেন, তাই তিনি নিজে রক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু ওঁর স্ত্রী-পুত্র সকলেই পুড়ে মরেছে। হ্যামিল্‌টন সাহেব নাকি স্নান করছিলেন—সেই অবস্থায় ওঁকে গুলি করা হয়েছে এবং তারপর যতটুকু সময় ওঁর দেহে প্রাণ ছিল, তার মধ্যেই ওঁর চোখের সামনে ওঁর শিশুপুত্রকে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে সঙ্গীনের ডগায় লুফে-নেওয়া হয়েছে, ফলে সে দু'টুক্‌রো হয়ে গেছে। মিসেস্ হ্যামিল্‌টনকে সঙ্গীন দিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেলা হয়েছে, এমন কি পাদ্রী এণ্ডারসনও রক্ষা পাননি।

জেনারেল হাটসনের অবিমৃষ্যকারিতার কথা মনে হয়ে ক্রোধে ও ক্ষোভে সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। বস্তুতঃ নিজেদের বিপদের কথা যেন ভুলেই গেলুম। সুশান্তরও প্রায় সেই অবস্থা। শুধু মাঝে মাঝে বল্‌তে লাগল, তোর এই অবস্থার জন্য বোধ হয় আমিই দায়ী।

—তা নয়, বরং আমারই ফ্যাঁসাদে তোকে টেনে আন্‌লুম।

সুশান্ত গা-ঝাড়া দিয়ে বললে, বাড়িতে থাকবার মধ্যে এক আছে আমার সৎমা—মলে কাঁদতে নেই, হারালে খুঁজতে নেই—আমার জন্যে ভয় কি? তোর মা আছে, মামারা আছে, তোর প্রাণের দাম আছে।

মায়ের কথা মনে হয়ে যেন চোখ একটুখানির জন্যে ঝাপ্‌সা হয়ে এল, কিন্তু পরক্ষণেই মনে সাহস এনে বললুম, ভয় কি সুশান্ত, মা আছে, মায়ের আশীর্বাদও তো আছে। এত তাড়াতাড়ি মরব না। দেখা যাক্ বেটাদের দৌড় কত!

গঙ্গার ধারে আমবাগানের মধ্যে ওরা বোধ হয় একটা আড্ডা গেড়েছিল। আমাদের

ঐখানেই টেনে নিয়ে গেল। কতকগুলো শুক্‌নো আমডাল আর পাতা জড়ো করে সেখানে এক বিরাট আগুন জ্বেলেছে, তার পাশে জন-দুই লোক একটা বেঞ্চের উপর বসে। দূর থেকে দেখেই বুঝেছিলুম ওরা বর্তমান দলের দলপতি—সত্যিই আমাদের সেইখানে নিয়ে চল্‌ল। কাছে গিয়ে কিন্তু দলপতিদের দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

একজন হাবিলদার লালচাঁদ, ওর ওপর বরাবরই ব্রিগসনের দৃষ্টি ছিল—আর একজন আমাদের বাসার ভূতপূর্ব চাকর ভজনরাম—দুই চক্ষু অন্ধ, সমস্ত মুখ বিষেতে বিকৃত—সে এক বীভৎস ব্যাপার! বেনেকর্তা ওর দেহে চিরকালের মত যে শাস্তির ছাপ এঁকে দিয়েছেন, তা কোনও প্রতিশোধেই মুছবে না।

ভজনরাম আমাদের পদশব্দে উৎকর্ণ হয়ে উঠে বললে, এসেছে—বাঙ্গালী বেত্‌-মিজ্‌টা এসেছে?

লালচাঁদ বললে, এসেছে—একজন নয় দুজন।

ভুরু বা সেই স্থানের চামড়া কুঞ্চিত করে ভজনরাম বললে, দুজন কে?

—কমিসেরিয়েট অফিসের আর একটা বাঙ্গালী ছোকরা।

ভজনরাম বললে, ভালই হয়েছে, ভাইসব, ও অফিসের সব বাঙ্গালীই আমাদের দুশমন্‌ সে কথা ভুলে যেও না।...... ওহে বাঙ্গালী কুকুর, যদি প্রাণের মায়া থাকে, যা সব জিজ্ঞাসা করি ঠিক ঠিক জবাব দেবে। নইলে একটু একটু করে ঝল্‌সে পুড়িয়ে মেরে কুকুর দিয়ে খাওয়াব, মনে থাকে যেন!

রাগে সমস্ত শরীরে যেন বিছার কামড় অনুভব করতে লাগলুম। দুজনেই কিছু যেন শুনতে পাইনি এইভাবে সোজা দাঁড়িয়ে রইলুম।

—শুনতে পাচ্ছ? বিষদাঁত ভাঙেনি বুঝি? কিগো সতীশবাবু, দু'চার ঘা পিঠে দিতে হবে?

আমি বললুম, তুমি আমার বাসার চাকর ছিলে সেকথা তুমি ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি। তা ছাড়া তুমি চোর—তোমার সঙ্গে ভদ্রলোকে কথা কইতে পারে না।

তার ভীষণ বিকৃত মুখ রাগে বীভৎসতর হয়ে উঠল। সে যেন কোন্‌ ক্ষিপ্ত রাক্ষসের প্রতিমূর্তি, সেদিকে চাইলে ভয় করে।

—বটে, বাসার চাকর!... লালচাঁদ, কোড়া তৈরি রাখ—ওদের আমি দশ লহমা সময় দেব জবাব দেবার জন্য—বেনেকর্তা কোথায়, শীগ্‌গির ভালমানুষের মত বলে ফেলো, নইলে রক্ষা নেই।

বেনেকর্তা! নজর তাহ'লে বেনেকর্তার ওপর। আমরা পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ হেতু হ'ল বেনেকর্তা বা তার সেই অপয়া বইটা!

—কী, জবাব দেবে না? লালচাঁদ, আমাকে ধরে নিয়ে যাও তো ওদের কাছে, ঐ কুকুরের বাচ্ছার জন্যই আম্মার এত কষ্ট, নিজে হাতে মারতে না পারলে সুখ হবে না।

লালচাঁদ প্রভু-ভক্ত ভৃত্যের মত উঠে ভজনরামের হাত ধরে নিয়ে এল, আমরা দুজনে অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাইলুম। এ লোকটার এদের ওপর এত প্রতিপত্তি কেন?

নবম পরিচ্ছেদ

উঃ বাপ্!

এক ঘা, দু'ঘা।

সুশান্তর পিঠে এক ঘা, দু'ঘা।

দু'জনেরই চামড়া ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। অসহ্য যন্ত্রণা—বুক ফেটে কান্না বেরোতে চাইছিল, কিন্তু তবু মুখ বুজে দু'জনে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আরও পড়ত—এবং ধৈর্যও যে আমাদের কতক্ষণ থাকত বলা যায় না, কিন্তু বাঁচালে লালচাঁদ। সে ঝুঁকে পড়ে ভজনরামের কানে কানে কি বললে, সে অট্টহাস্য করে উঠল।

—বাঃ, বহুত আচ্ছা লালচাঁদ! ঠিক বলেছ। মেরে এ কুকুরদের মুখ থেকে কথা বার করা যাবে না, তার চেয়ে ও ওষুধে চট্ করে বেরিয়ে আসবে। বাঃ, হিন্দুস্থান যখন আমাদের দখলে আসবে আর তান্তিয়াটোপী যখন সারা হিন্দুস্থানের উজীর হবে, তখন আমি নিজে তোমার কথা তান্তিয়াটোপীকে বলব, বড় হুঁসিয়ার তুমি!

ভজনরাম তাহ'লে তান্তিয়াটোপীর অনুচর! এতক্ষণে কথাটা পরিষ্কার হ'ল।

ভজনরাম ফিরে গিয়ে বেঞ্চিতে বসল। তারপর বললে, রামস্বরূপ, বুড়োর সেই নাতনীটাকে নিয়ে আয় তো!

মাথায় যেন নিমেষে বিদ্যুৎ খেলে গেল।

বুড়োর নাতনী?—ইন্দিরা নাকি?

এ কথাটা এতক্ষণ মাথায় যায় নি। চিঠির সবটাই মিথ্যা মনে করেছিলুম। কিন্তু ঐ যে!

একজন সিপাই, বোধ হয় তারই নাম রামস্বরূপ, হাত-বাঁধা অবস্থায় ইন্দিরাকে একটা গাছতলা থেকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে এসে ভজনরামের পায়ের কাছে এক রকম ছুঁড়েই ফেললে। ভজনরাম লালচাঁদের গা-টিপে প্রশ্ন করলে, ছুঁড়িটা এল নাকি?

লালচাঁদ বললে, এসেছে, ঐ যে পায়ের কাছে। ভজনরাম হাতের কোড়াটা আস্ফালন করে একবার যেন জেনে নিলে ইন্দিরা কোথায়, তার ডগাটা গিয়ে ইন্দিরার হাতের ওপর পড়ল এবং পরক্ষণেই ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়তে লাগল। একবার হাতের বাঁধন আলগা করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করলুম—কিন্তু বৃথা, অসহ্য রাগে সারাদেহ ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

ইন্দিরার চোখ কিন্তু শুক্‌নো—দৃষ্টি দৃঢ়। সে একবার চোখ তুলে আমার মুখের দিকে চাইলে, তারপর আবার দৃষ্টি নামিয়ে মাটির দিকে চেয়ে রইল। যেন আমাকে চিনতে পারলে না।

ভজনরাম হুকুম দিলে, ওর হাতের বাঁধন কেউ খুলে দিক্—

তৎক্ষণাৎ রামস্বরূপ ওর হাতের বাঁধন খুলে দিলে।

ভজনরাম বল্‌লে, দাদামশায়ের ঠিকানা বল্‌বে—না বলবে না?

ইন্দিরা তেমনিই ধীর গম্ভীর ভাবে বললে, আমি জানি না।

—হুঁ! ঐখানে ঝাড়ু আছে, ঝাড়ু নিয়ে গাছতলাটা ঝাঁট্ দাও, তারপর একটা লোটা করে জল নিয়ে এসে আমার পা ধুইয়ে কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দাও!

সুশান্তর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম তার কপালের শিরাগুলো লাল হয়ে ফুলে ফুলে উঠেছে। আমি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু ইন্দিরা যেন বিশেষ কিছু হয় নি—এমনি ভাবে উঠে গিয়ে ঝাড়ু নিয়ে বেশ করে ঝাঁট দিতে লাগল। সুশান্তর চোখ দিয়ে অপমানে ক্ষোভে জল পড়তে শুরু হয়েছে তখন।

ইন্দিরা বেশ অবিচলিত ভাবেই গিয়ে ঝাড়ু রেখে একটা ঘড়া করে জল নিয়ে এল তারপর ভজনরামের পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে জল দিয়ে পা ধোয়াতে শুরু করলে। এই ব্যাপারে চারপাশের সিপাইরা পর্য্যন্ত যেন চঞ্চল হয়ে উঠল।

ভজনরাম বল্‌লে, কিগো সতীশবাবু, দেখছ? বলি ভালয় ভালয় বুড়োর ঠিকানা বল্‌বে?

বুড়োকে ধরতে পারলে তোমাদের সকলকে ছেড়ে দেব। চাই কি ঐ ছুঁড়িটার সঙ্গে লালচাঁদের বিয়ে দিয়ে দিতে পারি। নইলে তোমাদের তো মেরে ফেলবই—তা ছাড়া তোমাদের চোখের সামনে ওকে নানারকমে অপমান করব। কি বল হে—? ভেবে দেখ!

বহু—বহু কষ্টে আত্মদমন করে বললুম, আমি জানি না, জানলেও বলতুম কিনা সন্দেহ।

—তুমি জান না, কিন্তু ঐ ছুঁড়ি জানে। এত ভাব তোমাদের, কথাটা জিগ্যেস করে নাও না। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেই তো ধরা পড়ল ও—নইলে বুড়ো সময় থাকতে পালিয়েছে—আরে না হয়, তোমার সঙ্গেই বিয়ে দেব।

এইবার ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করল, ছুটে গিয়ে ঐ মুখে একটা লাথি না মারলে স্থির হ'তে পারব না। কিন্তু হায়রে, দু'পা এগোতে না এগোতেই দু'জোড়া সঙ্গীন একেবারে বুকের দিকে! লালচাঁদ হো হো করে হেসে উঠল।

ভজনরাম বললে, কি হয়েছে হে, কি হয়েছে?

লালচাঁদ চুপি চুপি কি বললে, ভজনরাম দাঁত খিঁচিয়ে বললে, বটে, তেজ ভাঙেনি এখনও!

এই সময় একটা যেন কিসের গোলমাল শোনা গেল। একটু পরেই তার কারণও সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারলুম, কয়েকটা সিপাই একটি ইংরেজ ছেলেকে ধরে নিয়ে সামনে এগিয়ে এল। ছেলেটিকে চিনতেও দেরি হ'ল না, মারফি সাহেবের ছেলে এডওয়ার্ড মারফি। মারফি সাহেব সিভিলিয়ান, বহুদিন মীরাটে আছেন, এডওয়ার্ড তাঁর বড় ছেলে। এডওয়ার্ড লক্ষ্ণৌতে "লা-মার্টিনিয়েরে" পড়ত, মাঝে মাঝে ছুটিতে বেড়াতে আসত। এবারেও বেচারার দুরদৃষ্ট বশতঃই দিন-পাঁচেক হ'ল এখানে এসেছিল, পরশু দিনই আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। পনের বছর বয়স, অতি সুন্দর সুগঠিত দেহ—যেন কিশোর কন্দর্প!

তাকে দু'তিনজন সিপাই ধরে রাখতে পারছিল না, তখনও সে ধস্তাধস্তি করছিল—এবং ধরতেও যে সহজে পারেনি তা এডওয়ার্ডের বেশভূষা দেখেই অনুমান করা যায়। গায়ের শার্ট প্রায় সবটাই ছিঁড়ে গেছে, তার খানিকটা মাত্র গায়ে ঝুলছে, দেহের সর্বাঙ্গে কালশিরা পড়েছে, কপালের খানিকটা কাটা—সেখানে রক্ত জমে রয়েছে।

গোলমাল শুনে ভজনরাম বললে, কি ব্যাপার? এরা কারা এল?

তখন একজন এগিয়ে এসে বললে, আমি হাবিলদার জান মহম্মদ।

—কী খবর তোমার হাবিলদার?

—বড় খারাপ খবর আছে ভাইসাহেব, আমরা শহরে লুঠ করছি আর ঐ শুয়োরগুলিকে মারছি একথা শুনে ব্রিগসন জোর করে নাকি জেনারেল হাটসনকে দিয়ে অর্ডার সই করিয়ে নিয়ে সব গোরা সিপাইদের নিয়ে বেরোচ্ছে—আমাদের তো অর্ধেক লোক দিল্লীর দিকে বেরিয়ে গেছে, বাকী অর্ধেক নিয়ে কি আমরা ব্রিগসনের সঙ্গে পেরে উঠব?

বেশ বুঝতে পারলুম ব্যাপারটা ভজনরামের মোটেই মুখরোচক ঠেকল না। সে বললে, না ভাই, আমাদের এখন বলক্ষয় করা কিছুতেই উচিত হবে না। জান মহম্মদ, আমাদের বাকি যা সিপাই এখনও শহরে আছে সকলকে বল এখনই যেন সব লক্ষ্ণৌ যাত্রা করে।

ব্রিগসন আসার আগেই আমরা সব হাওয়া হয়ে যাব। হাটসন কখনও আমাদের পেছনে তেড়ে যেতে রাজি হবে না, আমরা শুধু শহরটা ছাড়তে পারলেই হয়।

লালচাঁদ প্রশ্ন করলে, মারফি সাহেবের ছেলে কি করেছে?

জান মহম্মদ বললে, আমরা যখন পাদ্রীর বাড়িতে আগুন ধরিয়েছি তখন মারফি সাহেব তার বাড়ির ছাদ থেকে আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে থাকে, তাতে আমাদের সিপাই প্রভুশরণ মারা যায়, আরও দু'একজন জখম হয়। তখন আমাদের দল ক্ষেপে গিয়ে মারফি সাহেবের বাড়ি চড়াও করলে সাহেবের সঙ্গে এই ক্ষুদে কুকুরের বাচ্ছা বন্দুক হাতে করে দোর আগলে দাঁড়িয়ে অনেককে জখম করে আর সেই ফাঁকে মারফির মেম ছোট ছেলেটাকে নিয়ে ভেগে যায়। আমরা অনেক খুঁজেও পাইনি। যাই হোক্ যখন আমাদের গুলিতে মারফি জখম হ'ল—আর এই ছোঁড়াটার টোটা গেল ফুরিয়ে, তখন বিস্তর ধস্তাধস্তি করে একে ধরা হয়েছে, মারফিকেও একটা দড়ি বেঁধে টেনে আনা হচ্ছিল কিন্তু সে পথেই মরেছে। এখন এর কি শাস্তি হবে?

ভজনরাম বললে, ওকে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে। কিন্তু এখন এদের কাউকেই শাস্তি দেবার সময় নেই। ঐ তিনটেকে একসঙ্গে বেঁধে নিয়ে চল।...... মেয়েটাকে আলাদা ধরে আনা হোক। আমরা এখনই লক্ষ্ণৌয়ের রাস্তা ধরব।... আমাদের লোক আছে কত এখানে?

লালচাঁদ বললে, শ'দুই হবে।

—রসদ ঠিক আছে?

—আজ রাতের মত হবে।

—তবে চল।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রায় রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত আমরা হাঁটলুম। আমি আর সুশান্ত, দুজনের মাঝখানে বেচারা এডওয়ার্ডকে বেঁধে দিয়েছিল। পথশ্রম, ক্রোধ এবং আতঙ্ক এই সব কটায় জড়িয়ে দেহ যেন আমার ভেঙে আসছিল কিন্তু সুশান্ত বেশ নির্বিকার। ও মধ্যে একবার গলা ছেড়ে গানও ধরেছিল, একজন সিপাহীর কাছ থেকে খোঁচা খেয়ে চুপ করলে। আর এডওয়ার্ড— সে চলতে আর পারছিল না, সদ্যপিতৃশোকে এবং মাতৃবিচ্ছেদে বেচারার ক্রোধ এবং তেজ কমে এসে এবার চোখের জলে পরিণত হয়েছিল। তার ওপর দৈহিক কষ্টে সে টল্‌ছিল। পাছে ওরা আরও অত্যাচার করে বলে আমরা অনেক কষ্টে এক রকম ওকে টেনে নিয়েই চল্‌ছিলুম। মধ্যে মধ্যে যখন ওদের পৈশাচিক সংকল্পের কথা মনে পড়ছিল—তখন মনে মনে সেই সুকুমার বালকের জন্য শিউরে উঠছিলুম আর ভাবছিলুম যে সে ভয়ঙ্কর পরিণামের চেয়ে ওর পথেই মরা ভাল।

ইন্দিরা ঠিক আমাদের আগে আগেই চলছিল, কিন্তু সে সোজা হয়ে দৃঢ় পদেই চল্‌ছিল।

ঐ মেয়েটি যেন সকল শ্রান্তি-ক্লান্তির অতীত—সকল দুঃখের ঊর্ধে। সে অবস্থায় বোধ হয় পাষাণপ্রতিমাও বিচলিত হ'ত, কিন্তু সে নির্বিকার।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর নাগাদ আমরা হাপুরের কাছাকাছি একটা বড় গ্রামে এসে পৌঁছলুম। সেখানে একজন মুসলমান জমিদারের দুর্গের মত বিরাট বাড়িতে আমাদের তাঁবু পড়ল। জমিদার নাকি এই সিপাইদের দলে—বাহাদুর শাহ্ আবার হিন্দুস্থানের শাহানশাহ্ মালিক হ'লে তিনি একটা মন্‌সবদারী-গোছ পাবেন এ ভরসা তাঁর আছে।

একটা অন্ধকার জানলাবিহীন ঘরে আমাদের তিনজনকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে শব্দ করে চাবি দিয়ে চলে গেল। সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে সে দুর্ভাগ্যের রাত্রি কাটাতে হ'বে!

আমরা মাটিতেই বসে পড়লুম। এডওয়ার্ড আর সহ্য করতে পারছিল না, সে বেচারা আমার গায়ে এলিয়ে পড়ে হু-হু করে কেঁদে উঠল।

আমারও চক্ষু সজল হয়ে উঠল, কিন্তু আশ্চর্য ধৈর্য সুশান্তর, সে বললে, সতীশ, Ned, এখন মেয়েছেলের মত কাঁদবার সময় নয়। আমাদের হাতপায়ের বাঁধন দড়ির, এ বাঁধন বোধ হয় দাঁতে কেটেই খোলা যাবে। আগে বাঁধনগুলো খুলে এই বর্তমান যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাই, তারপর পরের ব্যবস্থা।

এডওয়ার্ড কান্নাজড়িত স্বরে বল্‌লে, দড়ি আমার হাত কেটে বসেছে।

—সে তো সকলকারই ভাই। আমার দাঁতে জোর নেই। সতীশ, তুমি তো দাঁতের বড়াই কর, এইবার দাঁতগুলোকে কাজে লাগাও দেখি! আগে তোমার হাতের সঙ্গে নেডের হাতের যে বাঁধন আছে সেইটে কেটে ফেলো, নয় তো খুলে ফেলো। একটা হাত খালি হ'লে বাকি কাজ সহজ হবে।

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে আমাদের হাতের বাঁধন মুখের কাছে এনে দাঁতে করে খোলবার চেষ্টা করতে লাগলুম। একটা লোকের আশা সবাইকে যেন জাগিয়ে দিলে।

প্রায় বাঁধনটা খুলে এসেছে, এমন সময় বাইরে তালা খোলার শব্দ হ'ল। রাত্রেই যে কেউ আসবে তা আমরা আশা করিনি। স্থির হয়ে নতুন কি দুর্ভাগ্য আবার দেখা দেয় তারই অপেক্ষা করতে লাগলুম।

দোর খুলে এক হাতে একটা প্রদীপের আলো আর এক হাতে এক ঘটি জল নিয়ে ঘরে ঢুকল ইন্দিরা। পেছনে প্রায় পাঁচ-ছ'জন সিপাই দাঁড়িয়েছিল, সে ঘরে ঢুকতে তারা কপাট টেনে বন্ধ করে দিলে।

ইন্দিরাকে দেখে আমরা দু'জনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু তৃষ্ণার্ত বালক, সে ইন্দিরাকে চিন্‌ত না, ওর হাতে জলের ঘটি দেখে তার একমাত্র চিন্তা হয়ে উঠল সেই জলের ঘটি, সে অজ্ঞাতসারে সেইদিকে ঝুঁকে পড়ল—

ইন্দিরা নিমেষে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে আলোটা নামিয়ে রেখে ঘটি থেকে ওর মুখে জল ঢেলে দিতে লাগল। তারপর সুশান্তকে জল খাইয়ে আমার কাছে এসে ঘটিশুদ্ধ আমার মুখে

ধরে বললে, আমি সত্যিই তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য লুকিয়ে ওখানে এসেছিলাম, দাদামশাই এখন কোথায় তা আমি জানি না। তোমাদের বাড়িতে ঢোকবামাত্র ওরা আমাকে বন্দী করে। তারপর আর কে একজন বাঙ্গালীকে ধরে জোর করে তাকে দিয়ে ঐ চিঠিখানা লিখিয়ে নেয়। আমি বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু পারিনি, একথা তুমি বিশ্বাস করো।

আমি বল্‌লুম, আমি জানি ইন্দিরা যে তোমাকে দিয়ে ও চিঠি ওরা লেখাতে পারত না। কিন্তু তুমি যে আমার জন্য এই বিপদের মধ্যে এসেছ একথা ভেবে আমার আনন্দ আর বেদনা দুই-ই চেপে রাখতে পারছি না।

আমরা কথা কইছি—সেই অবসরে সুশান্ত তার হাতের সঙ্গে নেডের হাতের বাঁধনটা প্রদীপের শিখার ওপর ধরেছিল। মোটা দড়ি ধীরে ধীরে পুড়তে ওদের হাতও কিছু কিছু পুড়ছিল কিন্তু দুজনেই আশ্চর্যরকম ধৈর্যের সঙ্গে নির্বিকার চিত্তে বসে ছিল।

সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই ইন্দিরা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ভজনরাম আমায় পাঠিয়েছে তোমাদের কাছে। জল নিয়ে আসাও তারই আদেশে, তার বিশ্বাস এত দুঃখের পর একটু সুখের স্বাদ পেলে তোমরা মুক্তির জন্য লালায়িত হয়ে উঠবে। যদি আমার দাদামশায়ের ঠিকানা তোমরা দিতে পার, তাহ'লে তোমরা দুজনে এবং আমি নাকি মুক্তি পাব।

ইন্দিরা থামতে সুশান্ত বললে, যদিও শেষ পর্যন্ত তা পাব না—উঃ, কী শয়তান ঐ লোকটা! এই বেচারার কি হবে বলতে পারেন?

ইন্দিরা প্রদীপ হাতে করে উঠে দাঁড়িয়েছিল, দ্বারের দিকে পা বাড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। একবার যেন তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল, তার পর অবিচল কণ্ঠে বল্‌লে, একটু কান পেতে শুনুন মাটিতে গর্ত করার শব্দ শুনতে পাবেন। ডালকুত্তা এই জমিদারেরই আছে।

এই পর্যন্ত বলে ইন্দিরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার বাইরে থেকে দোরে তালা পড়ার শব্দ হ'ল। সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে বসে দূরে সেই মাটিতে কোদাল পড়ার একটা ধপ্ ধপ্ শব্দ শুনে সমস্ত শরীর যেন অবশ হিম হয়ে এল। মৃত্যুর এত ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা আর কেউ কখনও করেছে কিনা সন্দেহ।

কিছুক্ষণ পরেই সুশান্ত এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে উঠল, তারপর আমাদের বাকি বাঁধনগুলো খুলতে আরম্ভ করলে। কিন্তু নেড আর নড়াচড়া করলে না। ইন্দিরার কথা সে না বুঝলেও মানেটা অনুমান করে নিয়েছিল।

সুশান্ত অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে ঘরের দেওয়ালগুলো, দরজা সবই দেখে নিলে। নীরেট ইঁট আর পাথরের গাঁথনি, দোরও ভীষণ ভারী। জানলা বলে কিছু ছিলই না, এক জায়গায় অর্থাৎ দোরের ঠিক ওপরেই কয়েকটা ফোঁকর মাত্র ছিল—ঘরের দূষিত বাতাস বেরোবার জন্য।

—নাঃ, এদিক দিয়ে আর কিছু আশা নেই।

বলে সুশান্ত এসে যথাস্থানে বস্‌ল।... অকস্মাৎ নেড উঠল ফুঁপিয়ে কেঁদে—এবং সেই কান্নার মধ্যে মাঝে মাঝে একটা কথাই বার বার শুন্‌তে পেলুম—

'Oh! Mama, Mama!'

তখন আর সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পেলুম না, শুধু ওর মাথায় পিঠে নীরবে হাত বোলাতে লাগলুম।

কতক্ষণ পরে জানি না, বোধ হয় প্রহরখানেক পরে মাটি কোপানোর শব্দ থেমে গেল, শুধু ওদের পৈশাচিক উল্লাসধ্বনির মাত্রা যেন বেড়ে উঠল। বুঝলুম সময় হয়েছে—

সুশান্ত ওর একটা হাত ধরে বললে, তুমি ইংরেজ, তোমায় যদি মরতেই হয় আশা করি বীরের মতই মরতে পারবে!

নেড চোখ মুছে সোজা হয়ে বসল, একটু পরেই শব্দ হ'ল দোর খোলার। বুঝলুম যে সময় হয়েছে, সর্বাঙ্গ শিউরে উঠতে লাগল—

তিনজন সিপাইকে সঙ্গে করে লালচাঁদ এল। নেডকে হিন্দিতে বললে, চল, তোমার সময় হয়েছে।

তারপর আমাদের বললে, তোমাদের দাঁড়িয়ে দেখতে হবে—এই হুকুম।

কী সর্বনাশ! এমন পৈশাচিকতা মানুষ কল্পনা করতে পারে?

সুশান্ত কিন্তু এককথায় লাফিয়ে উঠে বল্লে, চল আমরা প্রস্তুত!

কী সৌভাগ্য, আমাদের বাঁধনগুলো যে খোলা এ নিয়ে কেউই মাথা ঘামালে না। আমরা তিনজনেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলুম। কিন্তু নেড দোরের দিকে পা বাড়িয়ে থেমে গেল, সহসা হাঁটুগেড়ে বসে পড়ে ওপরদিকে মুখ তুলে ভাঙা ধরা গলায় বললে,—

"I am the Resurrection, and the Life, so that whosoever believeth in Me, may not die a death!"

...Oh God! be merciful!

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে—Bless me!

আমি তাকে খুব কাছে টেনে এনে তার কপালে একটি চুমো খেলুম, তারপর বললুম, ঈশ্বর তোমার আত্মার কল্যাণ করুন।

তখন সে নিজে গিয়ে সুশান্তকে চুমো খেলে, বললে,—O dear boy!

তারপর বেশ শান্তভাবে পা বাড়ালে, চল—

বাইরের উঠোনে একটা উঁচু পাথরের বেদীতে একটা ভীষণাকৃতি মুসলমান আর ভজনরাম পাশাপাশি বসেছিল। বুঝলুম ঐটিই জমিদার।

ঠিক সামনেই একটা বিরাট গর্ত করা হয়েছে, তার মাটিগুলো একপাশে জড়ো করা—এবং দুটি ভয়ঙ্কর বিরাট কুকুর একটা খুঁটির সঙ্গে টেনে বাঁধা রয়েছে। চারিপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে অসংখ্য সিপাই, ঘন ঘন গাঁজা চলছে।

ওখানে আসতেই পায়ের শব্দ পেয়ে ভজনরাম ভূমিকা করলে, সতীশবাবু, আজ ভাল করে দাঁড়িয়ে দেখ—যদি বেনেকর্তার ঠিকানা ঠিক করে বল্‌তে না পারো, তাহলে কাল তোমাদেরও এই অবস্থা হবে মনে রেখো—

আমি কোনও জবাব দিলুম না কিন্তু কেমন যেন দেহের অভ্যন্তরে, শিরায় শিরায় স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা দুর্বলতা অনুভব করছিলুম।

নেডকে দু'তিনজন সিপাই ধরতে আসছিল, ও কিন্তু সহসা সবাইকার অসতর্কতার ফাঁকে ছুটে গিয়ে ধাঁ করে মারলে এক লাথি ভজনরামের মুখে। ভজনরাম উল্টে পেছন দিকে পড়ে গেল।

একটা বিরাট হৈ চৈ পড়ে গেল। দু'তিনজন লোক এসে ধরলে নেডকে, কিছু প্রহারও তার অদৃষ্টে জুটল। কিন্তু আমি আনন্দ চেপে রাখতে পারলুম না, 'বহুত আচ্ছা' বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। কেমন করে ও জানতে পেরেছিল যে ঐ লোকটাই যত নষ্টের গোড়া!

সবাই মিলে ওকে গর্তের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালে। গর্তে কোমর অবধি ডুবে গেল। তখন মাটি দিয়ে গর্তের বাকী স্থান ভরাট করে বেশ করে পিটে দেওয়া হ'ল। অর্থাৎ সে স্থান থেকে ওর পালাবার কোন উপায় রইল না।

সুশান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিল! সে সহসা বললে, ভজনরাম, তোমাকে আমি একটা কথা বল্‌তে চাই—চুপি চুপি—

ভজনরাম তখনও রাগে ফুলছে। সে বল্‌লে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওসব আমার জানা আছে—এই ওদের ভাল করে ধরে রাখ্‌!

সুশান্ত খুব নরম সুরে বললে, বেশ তো, আমার হাত পা ওরা ধরে তোমার কাছে নিয়ে চলুক না!

ভজনরাম বললে, না। তুমি আমার কান কামড়ে নেবে না তাতেই বা বিশ্বাস কি! যা বলবার ঐখান থেকেই বল—

অগত্যা সুশান্তকে বলতে হ'ল, দেখ, আমি অবিশ্যি বেনেকর্তার ঠিকানা জানি না কিন্তু সতীশ জানে বলেই মনে হচ্ছে। তা আমি ওর ঠিকানা সতীশকে বুঝিয়ে বলেকয়ে জেনে নিতে পারি, যদি একদিন সময় দাও। কিন্তু আমাদের তিনজনকেই ছেড়ে দিতে হবে—

—তিনজনকে! হুঁ!! ও কুকুরের বাচ্ছাকে আজ কুকুর দিয়ে খাওয়াবই—লাথি মারা! তোমরা যদি বাঁচতে চাও তো ঠিকানা এনে দাও, কাল দুপুর পর্যন্ত সময় দিলুম। নিজেরা প্রাণে বাঁচ তো খুব ভাগ্যি বলে জানবে—

অগত্যা সুশান্ত চুপ করলে। লালচাঁদ ইঙ্গিত করতেই একজন সিপাই গিয়ে কুকুরের শেকল খুলতে আরম্ভ করলে। এক ভয়াবহ শোচনীয় দৃশ্য দেখতে হবে বলে আমি মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করছি এমন সময়—

গুড়ুম!!

একাদশ পরিচ্ছেদ

পিস্তলে গুলি করার শব্দ। পরক্ষণেই নেডের প্রাণহীন মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

মুহূর্ত কয়েক যেন সকলেই অভিভূত স্তম্ভিত হয়ে রইল। তারপরেই সকলে ফিরে চাইলে, পিছনের প্রাচীর-দ্বারপথে এক অতি পরিচিত বৃদ্ধ মূর্তি।

বেনেকর্তা!

সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল এবং সকলেই ছুটল সেইদিকে একসঙ্গে। সুশান্ত সেই ভীষণ গোলযোগের মধ্যে আমার হাত ধরে টেনে বললে, আর দেরি করার সময় নেই, বাঁচতে চাও তো এস শীগগির, বলে ছুটল বাড়ির ভেতরদিকে।

আমি ছুটতে ছুটতেই জিজ্ঞাসা করলুম, নেড?

—ও হয়ে গেছে! গুলি মাথায় গিয়ে বিঁধেছে—

বিরাটাকার জমিদারটি আমরা পালাই দেখে ধরতে আসছিল, সুশান্ত মারলে সজোরে তার পেটে লাথি, সে 'ওরে বাপ' বলে উল্‌টে পড়ল। ততক্ষণ আমরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। বাড়ির মেয়েরা সকলেই ওপরের জানালায় বসে তামাসা দেখছিলেন, কাজেই নীচের তলায় জনপ্রাণীও ছিল না। এঘর ওঘর বার দুই করেই আমরা ভেতরের উঠানে গেলুম—সুশান্ত ঠিক অনুমান করেছিল, বাইরে পুকুরে যাবার খিড়কীর দোর সামনেই খোলা।

বেরিয়ে পড়লুম দ্বিধা না করে। বাঁ দিকে আমবাগান তার মধ্যে অন্ধকারে ঢুকে পড়তে পারলেই ঘোর অন্ধকার। কোনও রকমে গা-ঢাকা দেওয়া হয়ত সম্ভব হবে। ওরা এসে পড়ল বলে—

আমবাগানে ঢুকতেই সেই অন্ধকারের মধ্যে চাপা গলায় শব্দ এল—এস, এস, এই দিকে!

গলা বেনেকর্তার।

ফিরতেই সাদা কাপড় জড়ানো মূর্তি নজরে পড়ল—সেই মূর্তিকে অনুসরণ করে সেই ঘন তমসাচ্ছন্ন আমবাগানের মধ্যে দিয়ে দৌড়োতে লাগলুম। কিন্তু আশ্চর্য সে বৃদ্ধের শক্তি, একটু হাঁপিয়ে পড়লেন না বা পেছিয়ে পড়লেন না।

আমবাগানের শেষ প্রান্তে, গ্রামের একেবারে সীমানায় একটি ছোট দোকান এবং দোকানের পিছন দিকে দোকানীর থাকবার ছোট একটি ঘর। সেই ঘরেরই দোর ঠেলে বেনেকর্তা আমাদের ঢুকতে বললেন এবং নিজেও ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলেন। ঘরে ঢুকতেই আমাদের প্রথম নজরে পড়ল ইন্দিরা—যাক্ তাহ'লে ইন্দিরাও মুক্তি পেয়েছে!

বেনেকর্তা ঘরে ঢুকে চুপি চুপি বললেন, রাত্রি শেষ হওয়ার আর দেরি নেই বিশেষ, এখন পালাতে যাওয়া মূর্খতা হবে। বিশেষ করে ওরা এখন চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ দোকানী আমার বিশ্বাসী—প্রাণ দিয়েও আমাদের রক্ষা করবে।

আমরা দুজনেই অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন ভাবে সেই একটিমাত্র খাটিয়াতে বসে পড়লুম। ইন্দিরাও একটা চাটাইয়ের উপর মেঝেতে বসে ছিল, বেনেকর্তা দাঁড়িয়েই রইলেন। দোকানী লোকটি বুড়ো হয়েছে, দেখলেই মনে হয় ভালমানুষ। সে তাড়াতাড়ি একটা লোটা করে একলোটা জল এনে দিয়ে বললে, একটু মাথায় এবং মুখে জল দাও।

তারপর সে একটা চুপড়ী এনে প্রদীপের উপর চাপা দিলে। বুঝলুম যে এতরাত্রে ঘরে আলো জ্বলছে দেখতে পাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। আরও খানিকটা পরে আখের শুখ্‌নো গুড় ভিজিয়ে সরবৎ করে এনে আমাদের দিলে, বাস্তবিক তাই যেন আমাদের কাছে তখন অমৃত বোধ হ'ল।

বেনেকর্তা অধীর হয়ে পায়চারি করছিলেন, এমন সময় দোরে খুব মৃদু কে আঘাত করলে। তিনি দোর খুলে দিতেই একটি বুড়ো ঘরে ঢুকল।

—পেয়েছ?

বেনেকর্তা প্রশ্ন করলেন। সে বললে, পেয়েছি। কাল সন্ধ্যার সময় ঐ বন্‌শীতলাওর ধারে আমি গাড়ী আর ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব।

—আচ্ছা। তুমি যাও।

লোকটি সেলাম করে বেরিয়ে গেল।

বেনেকর্তা আবার দোর বন্ধ করে আমার পাশে এসে বসলেন, বললেন, আমার এক বন্ধু জমিদার আছে, তার ঘোড়া এক দণ্ডে চার ক্রোশ পথ যেতে পারে। সেই গাড়ী আর ঘোড়া চেয়ে পাঠিয়েছিলুম। ও লোকটি বিশ্বাসী, ও ঠিকই থাকবে কাল। যদি দিনটা কোনও রকমে কাটাতে পারি তা'হলে সন্ধ্যার সময় বেটাদের কলা দেখাব!

একটা কথা বহুক্ষণ ধরে মনে ঘুরছিল—প্রশ্ন করলুম, আপনি নেডকে গুলি করলেন কেন?

—ওকে শোচনীয় মৃত্যু থেকে অব্যাহতি দিলুম এবং তোমাদের পালাবার উপায় করে দিলুম। ভজনরামকেও গুলি করতে পারতুম কিন্তু তাতে ফল হ'ত না, নেডকে ফেলে তোমরা পালাতে পারতে না, অথচ সেই সামান্য অবসরে ওকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে যেতেও পারতে না, তার চেয়ে এ ভালই হ'ল।

তারপর সহসা ফিরে সুশান্তকে বললেন, তুমি বাবা বাহাদুর ছেলে। তোমার উন্নতি হবে। পৃথিবীতে অনেক দেখলুম, নিজের সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে চিরকাল জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে এসেছি। বুদ্ধিমান ছেলে দেখলেই চিনতে পারি। তোমার বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, উদ্যম আছে, জয় তোমার অনিবার্য।

তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, তুমি ক্ষুণ্ণ হয়ো না সতীশ, কিন্তু ঐ তিনটি গুণেই তুমি সুশান্তর নীচে। সত্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা বাইরে করতে পার কিন্তু নিজের মনে করো না। নিজেকে ঠকানোর চেয়ে আত্মঘাতী জিনিস আর নেই।

কিন্তু ক্ষুণ্ণই আমি হলুম, বিশেষ করে ইন্দিরার সামনে এই কথা বলাতে।

তিনি আমার মনের কথা জানতে পেরেই যেন বললেন, ইন্দিরা তোমায় ভালবাসে, তা

নইলে আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করে তোমাকে দেখতে আসার জন্য এতগুলো বিপদে জড়াত না। ওর কাছে আর লজ্জা কি!

ইন্দিরা বেচারী এসে পর্যন্ত একটি কথাও বলেনি, সে আরও মাথা নীচু করলে।

বেনেকর্তা হেসে বল্‌লেন, না না ভাই, তোকে আমি তিরস্কার করছি না।... এই তো চাই,—এতে মানুষ সুখী হয়। আদর্শবাদী যারা, ভাববাদী যারা তারা সুখী হয়, কিন্তু বুদ্ধিই যাদের সব, তারা সুখী হয় না—আবেগ তাদের কাছে তুচ্ছ। সতীশ, তুমি সুখী হবে কিন্তু সুশান্ত হবে জয়ী।

এই সমস্ত কথাই বেনেকর্তা এত আস্তে বলছিলেন যে কষ্ট করে আমাদের শুনতে হচ্ছিল, তিনি বলেই চললেন, আমার সময় হয়ে আসছে, না না ইন্দিরা, বাধা দিসনে আমায় বলতে দে,—আমি মনের মধ্যে নিঃসংশয়ে বুঝতে পারছি মৃত্যু আমার খুব নিকটে, মন আমার মিথ্যা বলে না। যাই হোক সতীশ, ইন্দুর ভার আমি তোমার ওপর দিয়ে যাচ্ছি, তোমার মামাকে আমি একথা বলেছি, তিনি রাজী আছেন। কৌলীন্যে ইন্দু তোমাদের চেয়েও বড়! যাই হোক— আর তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি আমার এই মহাজ্ঞান—

তিনি দীর্ঘ জামার মধ্য থেকে বার করলেন সেই পুঁথি, সেই মহাজ্ঞান—যার জন্য এত কাণ্ড!

আমি বললুম, আমাকে কেন দিচ্ছেন, আপনার কাছেই রাখুন।

—আঃ, আস্তে আস্তে, শুনতে পাবে যে! ছেলেমানুষ তুমি আমায় অবজ্ঞা কোর না। বিশ্বাস করো এ সত্যই মহাজ্ঞান, এ অমূল্য জিনিস; আমি যখন থাকব না তখন খুলে দেখো, দেখবে আমার কথা সত্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

একটু পরেই হ'ল সকাল। দোকানী কতকগুলো বস্তা সাজিয়ে এমন করে দিলে যে দোকান খোলা হ'লেও আমাদের দেখা যাবে না। ওর দোকান এবং ঘরের মধ্যে একটি দ্বারের ব্যবধান, তাতে কপাট লাগানো নেই, অগত্যা সেই আটা ও ডালের বস্তার পাশে আমরা চারজন পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলুম এবং পালা করে বসে বসেই ঘুমিয়ে নিলুম। দোকানী পানফলের আটা ঘি আর চিনি মাখিয়ে আমাদের এক ফাঁকে দিয়েছিল, সেইটুকু খেয়েই সমস্ত দিন কাটাতে হ'ল।

দিনের বেলা দুই তিন দল সিপাই এসে দোকানীকে প্রশ্ন করে গেল যে সে বাঙালীদের দেখেছে কিনা। উঃ, সে কি আমাদের উদ্বেগ সে সময়!

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। দণ্ড দুই তিন দোকান খুলে রেখে দোকানী ঝাঁপ দিলে টেনে। আগে বন্ধ করলে পাছে কেউ সন্দেহ করে এই ভয়। তারপর আমরা যাত্রার

জন্য প্রস্তুত হলুম। সে লোকটি বেরিয়ে গিয়ে একটু গরম দুধ সংগ্রহ করে নিয়ে এল এবং দেখে এল রাস্তার ভাবগতিক। সেই দুধ একটু একটু আমরা খেয়ে নিলুম। এবং দোকানী আলো নিভিয়ে দেবার পর একে একে সেই নিশীথ অন্ধকারে বাইরে বেরিয়ে এলুম।

আমরা সবে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, দোকানে ঝাঁপ ফেলার শব্দ এল।

—আরে শিউশরণ, এত সকাল সকাল দোকান বন্ধ করলে কেন হে?

শিউশরণ আমার হাত ধরে সজোরে টেনে বনের পথ ধরলে। আমরা সকলেই যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে এবং দ্রুত তার অনুসরণ করলুম। খানিকটা দূর যাবার পরই পিছনে একটা গোলমালের শব্দ শুনলুম। বুঝলুম যে ওরা কিছু সন্দেহ করেছে, তখন আমরা রীতিমত ছুটতে শুরু করলুম।

পিছনে পায়ের আওয়াজ ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল, তখন আরও জোরে দৌড়তে লাগলুম। ভাগ্যিস দুধটা খেয়ে নেওয়া হয়েছিল!—শেষে গাড়ীর কাছাকাছি যখন এসে পড়লুম তখন শব্দটা অনেকটা দূরে পড়েছে।

ছোট টমটম্ গাড়ী, চারজন অতিকষ্টে বসলুম। যে লোকটি অপেক্ষা করছিল সে আমরা যেতেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আমরা গাড়ীর ওপর উঠে বসলুম, বৃদ্ধ বেনেকর্তা নিজে নিলেন ঘোড়ার রাস। ওঁর হাতে পড়ে ঘোড়া যেন অসম্ভব জোরে চল্‌তে লাগল।

খানিকটা চলার পর প্রশ্ন করলুম, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

বেনেকর্তা বললেন, মীরাট। ওখানে ছাউনীতে পৌঁছতে পারলে বিশেষ কোনও ভয়ের সম্ভাবনা নেই। ইন্দু দিদি, তুমি একটা পিস্তল বার করে সতীশ-সুশান্তদের দাও, আর একটা আমার কাছে থাক্—কি জানি পথে দরকার হ'তে পারে হয়ত।

দরকার হ'লও—প্রায় প্রহরখানেক ধরে অনবরত গাড়ী চালাবার পর সহসা আমরা একটা বনের ধারে এসে পড়লুম। রাস্তাটা খানিকটা বনের পাশ দিয়ে চলে আবার মাঠের মধ্যে পড়েছে।

কিন্তু বনের ধারে আসতেই আমাদের সামনে লাফিয়ে পড়ল জনকয়েক লোক, তারা অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মশাল জ্বেলে ফেললে। সেই মশালের আগুনে দেখতে পেলুম জন-তিনেক সিপাই লালচাঁদ আর একটু দূরে একটা গাছের ওপর বসে, আছে ভজনরাম।

লালচাঁদ একটা অশ্রাব্য কটূক্তি করে বন্দুক তুললে, এইবার কোথায় যাবে! সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুৎবেগে সুশান্ত আমার হাত থেকে পিস্তল তুলে নিয়ে গুলি করলে লালচাঁদের মাথায়। সিপাই তিনজন সেই সময়েই গুলি করলে, সেগুলো আমাদের চারপাশ দিয়ে চলে গেল। খালি মনে হ'ল বেনেকর্তা যেন একটু চম্‌কে উঠলেন, হয়ত তাঁর গা ঘেঁষে কোনটা বেরিয়ে গেছে।

কিন্তু বেনেকর্তা পিস্তল তুলে, ওরা নতুন করে গুলি ভরার আগেই, গুলি করলেন। এবং সে গুলি সোজা লাগল ভজনরামকে।

তারপরেই ঘোড়াকে মারলেন সজোরে চাবুক। ঘোড়া একটা সিপাহীর বুকের ওপর দিয়ে তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সহরের সীমান্তে ছোট শিবমন্দির। সেইখানে গাড়ী থামিয়ে বেনেকর্তা বল্‌লেন, এই শিবমন্দিরে আমাদের অপেক্ষা করার কথা। কর্ণেল ব্রিগসনকে আমি খবর পাঠিয়েছি, তিনি আর সতীশের মামা জনকয়েক গোরা নিয়ে এইখানে আসবেন।

আমরা সকলেই নেমে পড়লুম। শিবমন্দিরের দোর খুলে আমরা অন্ধকারেই বসলুম। বেনেকর্তা বললেন, ভাই ইন্দু, আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দে, আর ভগবানের নাম—উঃ মাগো!

তিনি ইন্দিরার কোলে শুয়ে পড়লেন। আমরা সকলে একযোগে চম্‌কে উঠলুম। ইন্দু আর্তনাদ করে প্রশ্ন করলে, কী হয়েছে দাদামশায়!

তিনি হেসে বললেন, সময় যে হয়েছে তা তো বলেইছি, ওদের গুলি আমার বাঁ দিকের পাঁজরে এসে বিঁধেছিল। না না, ব্যস্ত হয়ো না সতীশ—ভালয় ভালয় এখানে এনে ফেলতে পেরেছি এই ঢের।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, সতীশ, ইন্দুকে আমার দেখো। আর আমার মহাজ্ঞান, বড় আদরের মহাজ্ঞান...... কৈ দেখি সতীশ তোমার হাত!

আমার হাতের উপর ইন্দিরার কম্পিত হাত রেখে বললেন, দেবাদিদেব মহেশ্বরের সাক্ষাতে তোমাদের মিলন হ'ল—মনে রেখ।

তারপর সহসা যেন উঠে বসার চেষ্টা করে বললেন, ভগবান তুমি আমাকে ভুলে যাওনি একেবারে!

পরক্ষণেই ঢলে পড়লেন।

সেই সময়েই দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। কর্ণেল ব্রিগসনের দল পৌঁছল।

*　　　　*　　　　*

ছাউনীতে পৌঁছে দুঃখে ক্লান্তিতে একেবারেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়লুম। তখন ঘুমোনো ছাড়া আর কিছুই সম্ভব নয়। ইন্দুকে সান্ত্বনা দিয়ে মামা নিয়ে গেলেন অন্য ঘরে।...

ঘুম যখন ভাঙল তখন পরের দিনের মধ্যাহ্ন। উঠে শুনলুম মামারা বেনেকর্তাকে দাহ করে ফিরে এসেছেন। ইন্দিরা শ্মশান থেকে ফিরে ঘুমোচ্ছে। আমরা স্নানাহার করে বসতে সুশান্ত প্রস্তাব করলে, এইবার আমরা মহাজ্ঞান দেখব।

সকলেই অনুমোদন করলুম। খালি মামা বললেন, বৌমা উঠুন।

তিনি সম্পর্কটা বেশ মেনে নিয়েছেন দেখলুম। 'বৌমা' যখন উঠলেন তখন সন্ধ্যার আর দেরি নেই। তাকে প্রশ্ন করা হ'ল, তুমি কিছু জান?

ইন্দিরা বললে, আমি জানিও না, বিশ্বাসও করতুম না। মনে হ'ত উনি লোকদের শুধু ভয় দেখান।

ততক্ষণে সুশান্ত ওপরের কাপড়টা খুলে ফেলেছে। পুঁথির পাতার আকারে নীরেট খাঁটি

সোনার পাত—বোধ হয় দুশো কি আড়াইশো হবে। দুধারে দুটো কাঠের মলাটের বদলে দুটো সেই আকারেরই সোনার বাক্স—বোতাম টিপে তার ডালা খুলতে দেখা গেল বহুমূল্য হীরে ও মুক্তো তার মধ্যে ঠাসা রয়েছে।

আমরা কিছুক্ষণ কেউই কোন কথা বলতে পারলুম না। এই কুবেরের ঐশ্বর্য তিনি সর্বদা বহন করতেন।

খানিক পরে মামা বললেন, সত্যিই মহাজ্ঞান! টাকার চেয়ে শক্তিশালী আর কি আছে পৃথিবীতে?...... তিনি শীগ্‌গিরই যে একটা ভীষণ গোলমাল হবে বুঝতে পেরেছিলেন, তাই ঐভাবে অগাধ ঐশ্বর্য সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতেন।

ছুটীর গল্প

এক

পূজোর সময়—

এখন যেখানে শোভাবাজারের নতুন রাস্তাগুলো বেরিয়েছে, বছরকতক আগে ঐখানে সার-সার কতকগুলো ছাপাখানা ছিল। ছোট ছোট ছাপাখানাই বেশী, ওরই মধ্যে কেদার চৌধুরীর 'নিউ সানরাইজ প্রেসটি' ছিল একটু বড়; গোটা দুই বহুকালের যন্ত্র আর জন চারেক জরাজীর্ণ কর্মচারী, এই 'নিউ সানরাইজ প্রেসের' ছিল কারবার।

কেদার চৌধুরীর বয়স বোধ হয় ষাটের ওপরে উঠেছিল, কিন্তু তাতেও তিনি একটি দিন ছাপাখানায় আসা বন্ধ করতেন না। প্রত্যহ বেলা ন'টা বাজলেই শোভাবাজারের মোড়ে দেখা যেত শুক্‌নো কাঠের মত শীর্ণ এবং ধনুকের মত ঈষৎ বাঁকা এক বৃদ্ধ কাঁধে শার্টটা ফেলে হাতে একগোছা মোটা মোটা চাবি নিয়ে প্রেসের দিকে চলেছেন।

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—কোনও দিন এর ব্যতিক্রম হ'ত না। একবার খুব বর্ষা হয়েছিল, বছরটা আমার মনে নেই, মোদ্দা সেদিন হেদো উপ্‌চে নাকি লোকের বাড়ির উঠোনে বড় বড় কাৎলা মাছ ঢুকে পড়েছিল; কিন্তু অমন যে দুর্যোগ তাতেও নিউ সানরাইজ প্রেসের অফিস খোলা ছিল। আর বেচারী কম্পোজিটর আর প্রেসম্যানরা আসেনি ব'লে পরের দিন তাদের গালাগাল খেতে খেতে প্রাণান্ত হয়ে উঠেছিল। তারা কিন্তু ভাবতেও পারেনি যে ঐ দুর্যোগে কেউ সেখানে আস্‌বে!

কেদার চৌধুরীর কৃপণতার খ্যাতি সারা কল্‌কাতা শহর তো বটেই, ওধারে বরানগর থেকে এধারে গোড়ের হাট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এক বৃদ্ধের মুখে শুনেছি (যদিও ঠিক বিশ্বাস করিনি) যে কেদার চৌধুরীর নামে হাঁড়ি ফাট্‌তে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। পাড়ার লোকেরা কেউ সেইজন্যে তার নাম করত না, বল্‌ত দ্বাদশী চৌধুরী, আর দৈবাৎ কোনদিন

সকালে উঠে তাঁর মুখ দেখে ফেললে ফিরে গিয়ে ফের ঘুম না আসা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থাক্‌ত, এতে ক'রে নাকি অনেককেই অপিসে লেট্‌ হয়ে জরিমানা দিতে হয়েছে।

এ-হেন কেদার চৌধুরীর গল্পই আজ তোমাদের বল্‌ব।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। চাকর রামটহল ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে ফিরে গিয়ে নিজের টুলটিতে বসেছে। প্রেসম্যান গৌর আর জনতিনেক কম্পোজিটার বাড়ি চলে গেছে, খালি বেচারী বিনোদ তখনও একটা ভাঙা কেরোসিনের টেবিল-ল্যাম্পের আলোতে ঘাড়গুঁজে কী একটা লেখা কম্পোজ ক'রে যাচ্ছে। বিনোদ লোকটি পুরোনো, তারই মাইনে একটু বেশী, মোট ছাব্বিশটি টাকা সে মাইনে পেত। কিন্তু প্রত্যহ তাকে সেজন্যে রাত আটটা অবধি থাকতে হ'ত। তার কারণ বিনোদ একটু-আধটু যন্তরের কাজও জান্‌ত, যদি কেউ হঠাৎ রাত্রে জরুরী কাজ নিয়ে এসে হাজির হয় তাহ'লে বিনোদকে দিয়ে দুরকম কাজই চালাতে পারা যাবে এই ছিল কর্তার ফন্দী। এরকম নাকি দু-একবার হয়েওছে, আর তাতে চৌধুরীমশাই বিলক্ষণ দু'পয়সা লাভও করেছেন।

কেদার চৌধুরী তখন একমনে হিসেবের খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি হিসেব লিখছিলেন আর আপনমনেই গজ-গজ করছিলেন, ভারী তো মুরোদ সব, তার আবার পুজো, পুজো, পুজো! শুধু শুধু মানুষের ক্ষতি করা—পুজো তো তোদের কি বাপু? খামোকা কামাই করিস কেন?

আসল ব্যাপারটা হ'ল কি জান? পুজোর চারটে দিন তাঁকে বাধ্য হয়ে ছাপাখানাটি বন্ধ রাখতে হ'ত এই ছিল তাঁর ভয়ানক রাগ। একে তাঁর এমনিই লোকসান, তার ওপর আবার কর্মচারীদের খামকা ঘরে বসিয়ে মাইনে গোনা, এ তাঁর রীতিমত অত্যাচার ব'লেই বোধ হ'ত।

যাই হোক্‌—কর্তার তো ঐ অবস্থা, বিনোদ বেচারী মাঝে মাঝে করুণভাবে আড়চোখে চাইছে আর ভাব্‌ছে যে কখন কর্তার দয়া হবে। তবে সে ছুটি পেয়ে মাইনে নিয়ে বাড়ি যাবে, তারপর ছেলেমেয়েদের কাপড় কিনতে আবার বাজারে যাবে—এমন সময় কেদারবাবুর ভাইপো নিখিল এসে দোকানে ঢুক্‌ল। কেদারবাবু প্রথম বয়সেই দেশের বিষয়ের সমস্ত অংশ ছোট ভাইকে বিক্রী ক'রে কলকাতাতে চলে আসেন, তারপর আর কখনও তার খোঁজ নেন্‌নি। সে ভাই আজ আর নেই কিন্তু নিখিল এখনও দেশেই থাকে, কোনমতে সামান্য জমি-জমার আয় থেকে সংসার চালায়। তাতেও সে পৈতৃক পুজো বন্ধ করেনি, একরকম করে মায়ের ছোট একখানি প্রতিমা ঘরে এনে ফুল-জল দেয়।

নিখিলের বয়স অল্প তার মুখখানিও সর্বদা হাসি-মাখানো। তাকে দেখলেই বিনোদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত। সেদিনও সে হাত তুলে নমস্কার ক'রে তাকে অভ্যর্থনা করলে। কর্তার মুখ কিন্তু নিখিলকে দেখেই গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল, তিনি ভুরু কুঁচ্‌কে প্রশ্ন করলেন, কি মনে ক'রে?

নিখিল একটু হেসে মাথা চুল্‌কে বললে, কলকাতায় এসেছি পুজোর সামান্য কিছু

বাজার বাকী ছিল তাই সারতে, অম্‌নি আপনাকেও বল্‌তে এলুম। চলুন না জ্যাঠামশাই এবার!

এ কাজ নিখিল বরাবরই করে, যদিও কেদারবাবু কখনও যান না। এবারও তিনি যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, বললেন, আমার তো মাথাখারাপ হয়নি! তোমার হয়ে থাকে হোক!

নিখিল ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, এই সব নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে বছরে তিনটি দিন একটু আমোদ করা—একে আপনি মাথা-খারাপ বলেন জ্যাঠামশাই?

কেদারবাবু যেন ধেই ধেই ক'রে নেচে নিলেন খানিকটা। বললেন, হ্যাঁ বলি। দুঃখকষ্ট ব'লেই তো আমোদ করা উচিত নয়। যাদের দুঃখে কষ্টে দিন যায় তারা আমোদ করে কোন্ অধিকারে?... তুমি যে পুজো করছ, কি আছে বাপু তোমার? অবস্থা তো অদ্যোভক্ষ্যধনুর্গুণো, খামকা এ হাতীপোষার সখ কেন? যেমন আছ তেমনি থাক্‌তে পার না?

নিখিল বললে, অবস্থা তো চিরদিনই সমান। পূজো বন্ধ করলেও কিছু রাজা হব না, খামকা গ্রামের ঐ একখানা পূজো বন্ধ করব কেন? কতকাল ধরে চলে আসছে, প্রায় ঠাকুর্দার আমল থেকে, সমস্ত গ্রামের লোকেরা আশা ক'রে থাকে।

বিনোদ থাক্‌তে না পেরে ব'লে ফেল্‌লে, তাই তো সে কি কখনও বন্ধ করা যায়?

কেদার বজ্রকণ্ঠে বললেন, তুমি থাম। আর একটি কথা বলেছ কি জবাব দেব, মনে থাকে যেন।

বিনোদের মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ল। সে আবার তার কম্পোজের ওপর ঝুঁকে পড়ল। কর্তা তখন নিখিলের দিকে চেয়ে বললেন, পূজো বন্ধ করলে রাজা হবে না বল্‌ছ, পূজোর খরচ কত পড়ে তাই শুনি? খুব কম ক'রে নমো-নমো ক'রে সারলেও তো দেড়শ'টি টাকার কম নয়? বছরে দেড়শ' টাকা ক'রে যদি বাঁচে, তাহ'লে সাত বছরে হাজার টাকার ওপর হয়। ঐ হাজার টাকা হিসেব ক'রে সুদে খাটাতে পারলে মাসে পঞ্চাশটি টাকা আয় করা যায়, তা জান? হুঁ!

নিখিল অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললে, আপনার সাত বছরে হাজার টাকা জমানোটাই বড় কথা, আর সারা গ্রামের ঐ তিনটে দিনের আনন্দর কোন দাম নেই?

কেদার চেঁচিয়ে উঠলেন, না—না—না। আমি বাবু তোমার সঙ্গে আর বক্‌তে পারি না, তুমি বাড়ি যাও দেখি! যখন রাস্তায় বসে ভিক্ষে করতে হবে, তখন যেন আমার কাছে এসো না, এলেও সুবিধে হবে না। যাও!

কর্তা আঙুল দিয়ে দোরের দিকে দেখিয়ে দিলেন। নিখিল বেচারী হতাশ হয়ে বেরিয়ে চলে গেল। কীই বা করবে সে? তার কর্তব্য সে পালন করতে আসে, কেদারবাবু যদি তাতে অসন্তুষ্ট হন্ তার উপায় কি?

বিনোদ সেই থেকে ঘাড়গুঁজে কম্পোজ ক'রেই চলেছে আর একটিবারও মাথা তোলেনি, তবুও কর্তা তার দিকে একবার রোষ-কটাক্ষে চেয়ে নিজের হিসেবের খাতায় মন দিলেন। মনে মনে স্থির করলেন, বিনোদের শাস্তি-স্বরূপ অন্যদিনের চেয়ে আরও আধঘণ্টা দেরি ক'রে ছাপাখানা বন্ধ করবেন।

খানিকটা কাজ করবার পর কেদারবাবু সবে হিসেবের খাতাটি বন্ধ করেছেন, এমন সময় আর দুটি ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। একটি ছেলেমানুষ, বোধ হয় কুড়ি-বাইশের বেশী বয়স হবে না, তার হাতে একখানা খাতা। আর একজনকে দেখলেই মনে হয় বেশ সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত ভদ্রলোক, তিনি শুধুহাতেই এসেছেন।

প্রথমটা কেদারবাবু খদ্দের মনে করেছিলেন কিন্তু তারপর ছেলেটির হাতে খাতা দেখেই তাঁর মুখ কালী হয়ে উঠ্‌ল। তিনি ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, কি চাই আপনাদের?

ভদ্রলোকটি বললেন, আজ্ঞে আমরা শোভাবাজার বারোয়ারীতলা থেকে আস্‌ছি।

কেদারবাবু বললেন, তারপর?

ভদ্রলোকটি যেন একটু বিস্মিত হলেন। বললেন, আমাদের পুজোর চাঁদাটা—

কেদারবাবু বললেন, গত বছর আপনাদের খাতায় আমার নাম ছিল?

ভদ্রলোক একবার খাতায় চোখ বুলিয়ে বললেন, আজ্ঞে না।

তার আগের বছর?

তা বল্‌তে পারব না—

কেদারবাবু বেশ প্রশান্ত-কণ্ঠেই বললেন, খোঁজ ক'রে দেখবেন তাও ছিল না। তার মানে আমি কোন বছরই চাঁদা দিই না। সুতরাং মিছিমিছি কেন এসেছেন আমার কাছে?

ভদ্রলোক বললেন, কিন্তু দেওয়া তো উচিত। যা পারেন যৎসামান্য—

কেদারবাবু বললেন, উচিত ব'লে আমি মনে করি না, কি করব বলুন!

ভদ্রলোকটি ফিরেই যাচ্ছিলেন, সঙ্গের ছেলেটির উৎসাহ বেশী, সে বললে, বছরে তিনটে দিন মাকে ডাকা সবাই মিলে, তার জন্য অন্ততঃ দুগণ্ডা পয়সাও কি দিতে পারেন না?

এবার কেদারবাবু খিঁচিয়ে উঠলেন, না, পারি না। তোমাদের ক্ষমতা থাকে, তিন দিন কেন সারা বছর ধ'রে কর না! পরের ওপর জুলুম করতে আস কেন? আমি একটা কানা-কড়িও দেব না।

ভদ্রলোকেরা অবাক্ হয়ে চলে গেলেন। কিন্তু কেদারবাবু তখনও গজ্‌রাতে লাগলেন, বুকের রক্ত জল ক'রে টাকা রোজ্‌গার করছি প্রায় ওঁদেরই জন্যে! দানছত্তর্ খুলে বসেছি আর কি! সখ থাকে নিজেরা কর্‌গে যা—

আরও অনেকক্ষণ বকবার পর তাঁর হুঁস্ হ'ল যে রাত নটা বাজে। বিনোদের কাজ অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে কর্তাকে চিন্‌ত ব'লে চুপ ক'রে বসে ছিল, এইবার তাকে ডাক দিলেন, এদিকে এস গো নবাবপুত্তুর—মাইনেটা নিয়ে যাও!

বিনোদ উঠে গিয়ে কাছে দাঁড়াতে তিনি সাবধানে দু-তিনবার গুনে টাকা কটা দিলেন। বিনোদ গুনে দেখলে দু-আনা পয়সা কম। সে করুণভাবে মনিবের মুখের দিকে চেয়ে বললে, মোটে একটি দিন লেট্ হয়েছিল, তাইতেই জরিমানা ধরে নিলেন! পুজোর মাসে খরচা-পত্তর বেশী, এ মাসটা মাপ করুন—

কেদারবাবু বললেন, কেন ধরব না? এই যে চারটে দিন নাহক্ কামাই করবে, বলি তার

জন্যে কি একটি পয়সা মাইনে কম নেবে? তোমার আবার পূজো কি? ঐ ক'টা টাকা মাইনে, বাড়িতে তো পঙ্গপাল ছেলে-মেয়ে, তোমার পূজোর জন্যে কাজ কামাই করার দরকারটা কি? আস্‌তে পার না তার বেলা?

বিনোদ চুপ ক'রেই রইল। কর্তা খানিকটা তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, কথাটা মনঃপুত হ'ল না! তবে যাও, মরগে! কিন্তু বলা রইল, একাদশীর দিন যদি আসতে একটি মিনিট দেরি হয়, তাহ'লে পুরো একরোজের মাইনে কাট্‌ব—মনে থাকে যেন। আমার নাম কেদার চৌধুরী—হুঁ!

এ রকম কথা বিনোদকে প্রায়ই শুনতে হয়, একরকম গা-সওয়াই হয়ে গেছে, তবু তার এক মুহূর্তের জন্য মনে হ'ল যে কর্তার নাকে একটা ঘুঁষি মেরে চাক্‌রিতে জবাব দিয়ে চলে যায়। কিন্তু তারপরই মনে হ'ল ঘরে অনেকগুলি ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়ের কথা, সে আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাইনের টাকা ক'টা কোঁচার খুঁটে বেঁধে ভাঙা ছাতিটা বগল-দাবায়

নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কর্তা তখন চাকরকে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ছাপাখানা বন্ধ কর না গো রাজপুত্তুর! চোখে দেখতে পাও না?

তারপর সে উঠে যতক্ষণ ছাপাখানা রীতিমত বন্ধ করতে লাগল ততক্ষণই কেদারবাবু গজগজ ক'রে বললেন, দেখ্‌বে কি, ব্যাটা মাইনে নেবে আর টুলে বসে বসে ঘুমোবে এই তো কাজ! সব ব্যাটা নেমকহারাম, মনিবের মাইনে খাবে আর কাজে ফাঁকি দেবে!

দোরে ততক্ষণে তালা দেওয়া হয়ে গেছে। তিনি প্রত্যেকটি তালা দু-তিনবার টেনে দেখে জামাটি কাঁধে ফেলে চাবির গোছাটি হাতে নিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন। ধীর মন্থর গতি, কোনমতে যেন দেহটি টেনে নিয়ে চলেছেন।

রাস্তা তখনও জনশূন্য হয়নি। পূজোর আগের দিন, তখনও রীতিমত বাজার করা চলেছে। ছেলেমেয়েরা বাপ-দাদার সঙ্গে কাপড়-জামা-জুতো কিনে নিয়ে মনের আনন্দে কল-কল করতে করতে চলেছে, সকলেরই মুখে চোখে ভাবী উৎসবের আভাস।

সেদিকে চেয়ে চেয়ে অস্ফুটস্বরে কেদারবাবু বললেন, সবাই যেন ক্ষেপে গেছে! পয়সা খরচের জন্যে শুধু শুধু মানুষ যে কত ফন্দিই বার করে!

দুই

এই পথটি কেদারবাবু রোজই হেঁটে যান, কিন্তু আজ গলির মোড়ের কাছাকাছি আস্‌তে হঠাৎ যেন তাঁর মনে হ'ল কে তাঁর পেছু নিয়েছে। মনে হবার কোনই কারণ নেই—কারুর পায়ের আওয়াজও পাননি, কিম্বা ফিরেও কাউকে দেখতে পেলেন না, তবু যেন গা-টা কেমন ছম্‌-ছম্‌ ক'রে উঠল। তিনি ফিরে চেয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন কিন্তু আশে-পাশে কাউকে নজরে পড়ল না, তখন তিনি নিজের দুর্বলতায় নিজেই চটে গিয়ে গট্‌গট্‌ করে হাঁটতে শুরু করলেন।

কিন্তু আর খানিকটা গিয়েই আবার!

আবারও মনে হ'ল যেন কে পেছনে পেছনে আসছে,—খুব কাছে! তিনি ফের পেছন ফিরে দাঁড়ালেন কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। বরং সামনের দিক থেকে একজন লোক আসছিল, সে-ই ওঁর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তখন তিনি রাগ ক'রে মনে মনে বললেন, যত বুড়ো হচ্ছি ততই যেন ভীমরতি ধরছে!

আর একটু গিয়েই তাঁর বাড়ির গলি। কেদারবাবু বিয়ে করেননি, বাড়িতেও কেউ আত্মীয়স্বজন নেই, সুতরাং রেঁধে ভাত দিতে পারে এমন লোক নেই। সকালে কেদারবাবু নিজেই যা হয় দুটো ভাত ফুটিয়ে নিতেন আর বিকেলে গলির মোড়ের উড়ের দোকান থেকে দুপয়সায় পাঁচখানা হিসেবে রুটি কিনে নিয়ে গিয়ে খেতেন। কেদারবাবু হিসেব ক'রে দেখেছেন যে এতে তাঁর সস্তাই পড়ে। নিজের ঘরে কয়লা পুড়িয়ে, তরকারী রেঁধে দুপয়সায় বিকেলের খাওয়া সারা কিছুতেই সম্ভব নয়।

সেদিনও তিনি মোড়ের দোকান থেকে দুপয়সার রুটি কিনলেন। বারতিনেক ছোট হবার অজুহাতে রুটি বদ্‌লে, বেশি ক'রে ডাল চেয়ে নিয়ে, এবার তিনি নিশ্চয়ই ওদের দোকান ছেড়ে দেবেন বার বার শাসিয়ে বাড়ির গলিতে ঢুকলেন। নিতান্ত অন্ধকার এবং সঙ্কীর্ণ গলি, একসঙ্গে দুটি রোগা লোকেরও চলবার উপায় নেই এত সরু। এরই মধ্যে এক অনেক কালের পুরোনো বাড়ি কিছুদিন আগে কর্তা সস্তায় কিনেছিলেন, তারই নীচের ঘরগুলিতে কয়েকজন উড়ে ভাড়া থাকে, উপরের ঘর দুটিতে থাকেন কর্তা স্বয়ং।

দোরের সামনে দাঁড়িয়ে চাবি বাছতে বাছতে কর্তার গা যেন কেমন শিউরে উঠ্‌ল। তার কারণ বোধ হয় কর্তার মনে হ'ল, উড়েগুলো দেশে গেছে ব'লে গলিটা নির্জন ঠেক্‌ছে, নইলে আর কি কারণ আছে?

কেদারবাবু জোর ক'রে মনে বল এনে তালা খুলতে গেলেন, কিন্তু হঠাৎ তালাতে চাবি ঢোকাতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কারণ তাঁর মনে হ'ল যে তালাটা যেন দুই চোখ মেলে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

কর্তা আপনমনেই বললেন, মাথাটা বড়ই গরম হয়েছে দেখ্‌ছি, কাল একটু কবিরাজী তেল দিতে হবে!

তারপর জোর ক'রে তালা খুলে বাড়ি ঢুকলেন। বেরোবার আগে সদরের পাশেই লণ্ঠন আর দেশলাই রেখে যেতেন, কাজেই আলো জ্বালবার জন্য কোনদিনই ভাবতে হ'ত না। দোরটা বন্ধ ক'রে এক হাতে আলো আর একহাতে খাবারের ঠোঙা নিয়ে ভাঙাচোরা সিঁড়ি বাঁচিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েই উঠছিলেন, কিন্তু সহসা দোতলার বারান্দার কাছাকাছি গিয়েই আবার এমন চম্‌কে উঠলেন যে নেহাৎ কেদারবাবু ব'লেই রক্ষা, অন্য কেউ হ'লে খাবারের ঠোঙা কিম্বা লণ্ঠন কোনটাই হাতে থাক্‌ত না। চম্‌কাবার কারণ কি শুন্‌বে? তাঁর এবারেও মনে হ'ল যে দোতলার ঘরে যে তালাটা তিনি লাগিয়ে গিয়েছিলেন সেটা হঠাৎ একটা মানুষের মুখে রূপান্তরিত হয়েছে এবং বেশ ড্যাব-ড্যাব ক'রে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু অত সহজে ভয় পাবার ছেলে দ্বাদশী চৌধুরী নয়! আমরা হ'লে বোধ হয় দুড়-দুড় ক'রে নেবে পড়ে, লোকজন ডেকে জড়ো করতুম, হয়ত বা অজ্ঞান হয়ে পড়েই যেতুম। কেদারবাবু মোদ্দা সটান আলো হাতে ক'রে তালাটার দিকেই এগিয়ে গেলেন। খানিকটা কাছাকাছি আস্‌তেই সে মুখখানা মিলিয়ে গেল। তিনি খুশী হয়ে মাথা নেড়ে বললেন, এই ক'রেই ব্যাটারা ভূত দেখে আর কি! স্রেফ্ চোখের দোষ!

তালা খুলে ঘরে খাবার রেখে মুখ হাত ধুয়ে নিলেন। সন্ধ্যা-আহ্নিকের হাঙ্গামা ছিল না, পয়সা খরচের ভয়ে তিনি দীক্ষা নেন্‌নি, বলতেন, গুরু তো নয়—এক একটি রাঘব বোয়াল, পয়সার জন্যে হাঁ ক'রেই আছে!

সুতরাং মুখ-হাত ধুয়ে রুটি কখানা খেয়ে নিলেন, তারপর জানলা গলিয়ে পাতা ক-খানা গলিতে ফেলে দিয়ে একসঙ্গে গেলাস দুই জল খেয়ে ফেললেন। এইবার তামাকটা সেজে, ঘরের দোর বন্ধ ক'রে হুঁকোটি হাতে ক'রে বিছানায় গিয়ে বসলেন।

এ তাঁর বহুকালের অভ্যাস। বোধ হয় তাঁর জীবনে একমাত্র বাজেখরচ ছিল, রাত্রে এই এক ছিলিম তামাক। এই তামাকটি খেতে খেতেই তাঁর চোখ ঘুমে ঢুলে আস্‌ত, তখন হুঁকোটি নামিয়ে রেখে আলোটি নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তেন। সেদিনও হয়ত তাই করতেন কিন্তু সহসা এক বিঘ্ন উপস্থিত হ'ল।

সবে একটান কি দুটান তিনি দিয়েছেন, এমন সময় মনে হ'ল নীচে কে কড়া নাড়ছে!

হুঁকোটা নামিয়ে খানিকটা কান পেতে শুনলেন, তখনও পরিষ্কার কড়া নাড়ার শব্দ কানে এল। বিরক্ত হয়ে তিনি আবার হুঁকোটা মুখে তুললেন, মনে মনে বললেন, আমাকে আর কে ডাক্‌তে আসবে, এ নিশ্চয় দুর্গাপূজোর চাঁদা!... ডাকুক্ ব্যাটারা, আমি সাড়া দিচ্ছি না!

কিন্তু তারপরই যে শব্দ পেলেন তাতে তাঁর তামাক খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মনে হ'ল দোর খুলে কে ভেতরে ঢুকে আবার দোর বন্ধ করে দিলে!

তিনি তো বেশ ভাল করেই দোরে খিল এবং ছিটকিনি দিয়েছিলেন, কে তবে দোর খুললে?

কেদারবাবু জীবনে কখনও আতঙ্ক কি জিনিস তা জানতেন না কিন্তু সেদিন বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। তাঁর কপালে ঘাম দেখা দিল, হাতের হুঁকোটা পড়ে যাবার উপক্রম হ'তে তিনি নামিয়ে রাখলেন।

কিন্তু যে ভেতরে ঢুকেছিল সে শুধু ঢুকেই থেমে গেল না, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলে। পায়ের আওয়াজ ক্রমশ স্পষ্ট বোঝা যেতে লাগল। কেদারবাবু একবার ভাবলেন জানলা দিয়ে বাইরের লোকজন ডাকবেন, পরক্ষণেই মনে হ'ল যে লাভ নেই, কে তাঁর চীৎকার শুনতে পাবে! উড়েগুলো পর্যন্ত দেশে চলে গেছে। দোরের দিকে চেয়ে দেখলেন যে খিল-ছিটকিনি দুই-ই দেওয়া আছে, তবু উঠে ঘরের একমাত্র ভাঙা চেয়ারটাকে কপাটের গায়ে ঠেকিয়ে রেখে এলেন।

যে সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌ছিল সে দোরের বাইরে এসে যেন মিনিটখানেক চুপ ক'রে দাঁড়াল, তারপর একবার কড়া নাড়লে। কেদারবাবু সাড়া দিলেন না, শুধু প্রাণপণে দোরটার দিকে চেয়ে বসে রইলেন। কিন্তু তারপরই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল, এমন অদ্ভুত ব্যাপার কেদারবাবু জীবনে কোনদিন দেখেননি, দেখবার আশাও করেন নি!

দোর যেমন বন্ধ ছিল, তেমনিই রইল, কপাট একটু নড়ল না পর্যন্ত, কিন্তু তার মধ্যে থেকেই বেরিয়ে এল বীভৎস এক মূর্তি।

প্রকাণ্ড লম্বা, বোধ হয় সাত ফুটের কম হবে না। মুখখানা যেন ঘোড়ার মত, হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটা এবং পরনে বাঘছাল। ছোট ছোট দুটি চোখ রাগে জ্বলছে, সেদিকে চাইলে ভয় করে।

মূর্তিটি কেদারবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল। গম্ভীর কণ্ঠে বললে, আমাকে চিনতে পারলে না? আমি নন্দী, বাবার অনুচর।

তখনও কেদারবাবুর জিভ্ যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে। মনে ভয়ও আছে, আবার সন্দেহও আছে—কেউ কোনও বুজরুকী করে ঠকাতে আসেনি তো? তিনি চুপ করেই রইলেন, কথার জবাব দিতে পারলেন না।

তখন প্রচণ্ড এক ধমক্, কী, কথা কইছ না যে!

কেদারবাবু ভয়ে ভয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, তা-তা বাবা, এখানে কেন? আমি তো, কৈ ডাকিনি!

নন্দী যেন রাগে জ্বলে উঠল, বললে, পাপিষ্ঠ, এখনও চালাকি? যে জগৎজননীর কৃপায় আজও বেঁচে আছিস্ তাঁর নাম করে দু আনা পয়সা চাইলে তাঁরই পূজার জন্যে, তুই তাও দিতে পারলি না? এর পরিণাম কি জানিস্?

বিহ্বলভাবে তিনি বললেন, পরিণাম?

নন্দী জবাব দিলে, হাঁ হাঁ, পরিণাম। লোককে পীড়ন করে আত্মাকে বঞ্চিত করে আত্মীয়-স্বজনদের ত্যাগ করে যত পয়সা তুই করেছিস্, ঐসব পয়সা মৃত্যুর পরে পাষাণের মত ভার হয়ে ঘাড়ে চেপে থাক্‌বে। যত কোম্পানীর কাগজ জমেছে প্রত্যেকটি লোহার শেকল হয়ে কোমরে জড়িয়ে থাকবে। অনন্তকাল ধরে কঠিন শাস্তি ব'য়ে বেড়াবে তোমার প্রেতাত্মা।

কেদারবাবু ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন, কোন কথাই তাঁর মুখ দিয়ে বেরোলো না।

নন্দী বললে, কিন্তু এখনও উপায় আছে, মা তোর প্রতি খুব সদয় তাই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।

কেদারবাবু এবার অতি কষ্টে বললেন, কী উপায় বাবা?

—শোন্ মূঢ়! যদি ভীষণ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার উপায় জানতে চাস তবে মন দিয়ে শোন। আজ থেকে তিন রাত্রি পর্যন্ত প্রতি রাত্রে একটি করে ভূত তোর কাছে আসবে—তারাই তোর মুক্তির পথ দেখিয়ে দেবে।

কেদারবাবু সভয়ে বলে ফেললেন, আবার ভূত?... তার চেয়ে আপনি বলে গেলেই হ'ত না ভাল?

না—না—না! নন্দী ধমক্ দিয়ে উঠ্‌ল, আজই রাত্রে প্রথম ভূত আস্‌বে, প্রস্তুত থাক্।

কেদারবাবু হতাশ হয়ে চেয়ে রইলেন এবং তাঁরই চোখের সামনে অকস্মাৎ যেমন ভাবে নন্দী এসেছিল তেমনি ভাবেই হঠাৎ মিলিয়ে গেল। তিনি অবাক্ হয়ে গিয়ে খানিকটা চোখ রগড়ালেন, আবার ভাল করে চাইলেন, তারপর উঠে দোরের কাছে এলেন। দোর যেমন বন্ধ তেম্‌নিই আছে, খিল খোলার চিহ্ন পর্যন্ত নেই!

কেদারবাবু অবাক্ হয়ে বললেন, তবে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলুম, না আমার জ্বর হয়েছে—বিকারের খেয়াল ওগুলো?

বলা বাহুল্য, কারুর কাছ থেকে কোন জবাব পেলেন না। খানিকটা ফ্যাল্‌ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে নিজের হাতে নিজেই একটা চিম্‌টি কাটলেন, যে পরিমাণ তাঁর লাগ্‌ল তাতে অন্ততঃ তখন যে স্বপ্ন দেখছেন না—এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। তখন আপনমনেই আবার বললেন, মাথাটাই গরম হয়েছে দেখ্‌ছি—দ্বারিক কব্‌রেজের কাছে যাওয়া ছাড়া গতি নেই!

অন্য লোক হ'লে একথা বলতে পারত না, কিন্তু আগেই বলেছি যে কেদারবাবুর বিশেষ ভয়ডর ছিল না, তিনি জিনিসটাকে নিজেরই মাথাখারাপ হওয়ার লক্ষণ বলে মনে করে নিশ্চিন্ত হলেন। চীৎকার করে লোক জড়ো করলেন না, বাড়ি ছেড়ে পালালেন না,

বরং নিশ্চিন্ত মনে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং শিগ্‌গিরই তাঁর নাক ডাকতে লাগল।

তিন

ঢং!

কোথায় একটা ঘড়িতে একটা বাজতেই কেদারবাবুর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। সেটা রাত একটা কি আধঘণ্টা বাজার শব্দ বুঝতে না পেরে যেমন পাশ ফিরতে যাবেন, তাঁর মনে হ'ল ঘরে একটা কে লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি চম্‌কে উঠে বসলেন, জানলা দিয়ে গ্যাসের আলোর যে আভাস ঘরে এসে পড়েছিল তারই আলোতে এবার পরিষ্কার দেখা গেল ঘরের মাঝখানে একটা মানুষই দাঁড়িয়ে আছে। তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, কে রে ওখানে?

তাঁর কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে যেন আলো জ্বলে উঠল। আর যে মানুষটি ঘরে এসেছিল সেও তাঁর বিছানার দিকে এগিয়ে এল। কেদারবাবু সবিস্ময়ে দেখলেন যে আগন্তুক একটি পনের-ষোল বছরের ছেলে, সুন্দর রং, পরনে নীল কাপড় একখানি, গলায় শিউলি ফুলের মালা, মাথায় কাশফুলের মুকুট, হাতে একটি শ্বেতপদ্ম!

কেদারবাবু যেন সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না, অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন। ছেলেটি এগিয়ে এসে নিজেই বললে, আমি শরৎ।

এইবার তাঁর কথা ফুট্‌ল, তিনি বললেন, কাদের ছেলে তুমি?

শরৎ হেসে বললে, আমি ঋতু শরৎ। তোমার ছেলেবেলায় আমাকে দেখেছিলে, মনে নেই?

ভারি মিষ্টি হাসি! কিন্তু কেদারবাবু সেদিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না—কেমন যেন তাঁর অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগল।

খানিকটা ইতস্ততঃ করে তিনি বললেন, কী চাও এখানে? কোথা দিয়ে এলে তুমি?

আবার সেই হাসি। শরৎ হেসে বললে, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

নিয়ে যেতে! কেদারবাবু লাফিয়ে উঠলেন, কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে? আমি কোথাও যেতেটেতে পারব না!

শরৎ বললে, আমি তোমাকে কিছুক্ষণের জন্যে তোমার অতীত জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাব, তারপর রাত্রি প্রভাত হবার আগেই আবার এখানে ফিরিয়ে দেব। কোন ভয় নেই, এস আমার সঙ্গে—

সে এসে কেদারবাবুর হাত ধরলে। হাত খুব নরম কিন্তু তার মুষ্টি শিথিল নয়, কেদারবাবু কিছুতেই সে হাত ছাড়াতে পারলেন না। সে অবলীলাক্রমে তাঁকে টেনে নিয়ে চল্‌ল। জান্‌লার কাছাকাছি আসতেই একটা জানলা যেন কোথায় মিলিয়ে গেল, মনে হ'ল খোলা দোর সেটা, তার মধ্যে দিয়ে তাঁরা অনায়াসে গলে গেলেন, তারপর শরৎ তাঁকে নিয়ে উঠ্‌ল আকাশে, মহাশূন্যে তারা দুজনে ভেসে যেতে লাগ্‌ল।

কেদারবাবু আগে ভেবেছিলেন যে নীচে পড়ে হয়ত তাঁর অপঘাতই ঘটবে, কিন্তু সেসব কিছু হ'ল না। শরৎ তাঁর হাত ধরে ছিল বলে তিনি নীচের দিকে কোনও আকর্ষণ পর্যন্ত যেন অনুভব করতে পারছিলেন না, মনে হচ্ছিল এমনি আকাশ বেয়ে চলে যাওয়াটাই তাঁর পক্ষে সহজ এবং স্বাভাবিক। ক্রমশ তাঁরা ওপরে উঠ্‌তে লাগলেন, আরও ওপরে, কল্‌কাতা শহরের আলো ক্রমে তাঁদের চোখে ঝাপসা হয়ে এল, শেষকালে একেবারেই মিলিয়ে গেল।

কতক্ষণ এভাবে চল্‌লেন তার শেষ নেই। কেদারবাবুর ব্যাপারটা খুব খারাপ না লাগ্‌লেও কেমন একটু ভয়-ভয়ও করছিল, একসময়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, আমাকে কি তাহ'লে স্বর্গে নিয়ে চললে? টাকাকড়ি বাড়ী-ঘরের একটা ব্যবস্থা করে আসা হ'ল না!

তার জবাবেও শরৎ একটু হাস্‌ল মাত্র।

অনেকক্ষণ পরে কেদারবাবু অনুভব করলেন যে তাঁরা আবার নাম্‌ছেন। অর্থাৎ পৃথিবীর মাটির উপরেই আবার তাঁরা ফিরে আসছেন।

যেখানে এসে নামলেন, অন্ধকারেই বেশ বোঝা গেল যে সেটা পাড়াগাঁ। চারিদিকে বড় বড় গাছপালা সোঁ সোঁ করছে, তার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট কুটিরের আবছায়া আভাস। মাটিতে পা দিয়ে চারদিকে চেয়েই কেদারবাবু 'আরে' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। শরৎ মুখ টিপে একটু হেসে বললে, চিন্‌তে পারছ?

কেদারবাবু বললেন, চিন্‌তে পারব না? বিলক্ষণ, এ যে আমার স্বগ্রাম, দেশ। চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলেও এখানকার পথঘাট আমি চিন্‌তে পারি।

শরৎ আর কোন কথা না বলে তাঁর হাত ধরে এগিয়ে চল্‌ল। তিন-চারখানা বাগান পেরিয়ে রায়েদের পুকুর বাঁয়ে রেখে শেষ পর্যন্ত একটা বাড়ির সাম্‌নে এসে থাম্‌ল। বড় বাড়ি, কিন্তু পুরোনো, অনেক জায়গাতেই ভেঙে গেছে। কেদারবাবু দেখে চম্‌কে উঠলেন, এই বাড়িতেই তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, এইখানেই তাঁর বাল্যকাল কেটেছে। কিন্তু তিনি থাকতেই বাড়ির কিছু কিছু সংস্কার ও পরিবর্তন হয়েছিল, এ যেন তার আগের অবস্থা। অথচ তিনি যতদূর শুনেছেন, তাঁর ছোট ভাইও মরবার আগে নতুন দুখানা ঘর তৈরি করেছিলেন। তিনি সেই সম্পর্কে কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, শরৎ ইঙ্গিতে তাঁকে থামিয়ে দিলে, তারপর বাড়ির পিছনদিক থেকে ঘুরে একটা খোলা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে ভেতরে দেখতে বললে।

কেদারবাবু উঁকি মেরে দেখলেন, ঘরে একটি মাটির প্রদীপ জ্বল্‌ছে, তারই একপাশে আলোতে বসে একটি ছয়-সাত বছরের ছেলে শ্লেটে হাতের লেখা লিখছে আর একপাশে একজন মেয়েছেলে বসে কাঁথা সেলাই করছেন। তাঁর বুক দুলে উঠ্‌ল, এ যে নিজে! ছেলে-বেলায় ঠিক অম্‌নি ক'রে বসে পড়াশুনো করতেন। আর ঐ-ত তাঁর মা!...... ঐ-ত খোকা, তাঁর ছোট ভাই তক্তাপোষের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে!...... কেদারবাবুর সেদিকে চেয়ে যেন মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগল। তিনি জানলার গরাদে মাথা রেখে মিনিটখানেকের জন্য চোখ বুজলেন।

একটু পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার চোখ মেলে চাইলেন। তখন বালক কেদার বল্‌ছে, মা, বাবা কখন আসবে?

মা সস্নেহে তার দিকে চেয়ে বললেন, এখনি আসবে মাণিক। ঐ যে গাড়ীর শব্দ হ'ল, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে।

বালক শ্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়ল। পরক্ষণেই কিন্তু মাথা তুলে আবার বললে, বাবা কাপড় আন্‌বে মা?

মা বললেন, আন্‌বে বৈ-কি ধন, তোমার কাপড়, খোকনের কাপড়, নতুন জামা, কত কি!

এই সময় বাইরে পায়ের শব্দ হ'ল। তারপরই বাবা ঘরে ঢুকলেন হাতে বাজারের পুঁটুলি, বগলে কাপড়ের বাণ্ডিল, ধপাস্‌ ক'রে পুঁটুলিটা নামিয়ে বসে পড়লেন। মা তাড়াতাড়ি উঠে পাখা এনে বাতাস করতে লাগলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, এত দেরি হ'ল তোমার?

বাবা কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছে বললেন, টাকার জন্য দেরি হ'ল।... টাকা কি দিতে চায়? পাওনা টাকা, বাক্সে রয়েছে, দেবেও ঠিক্‌ তবু রাত আটটা না বাজিয়ে দিলে না! টাকা পেয়ে তবে তো কাপড়চোপড় কিনে নিয়ে আসছি.... খোকন্‌টা ঘুমিয়ে পড়ল, না? আজ ষষ্ঠীর দিন, বাছারা নতুন কাপড় পরতে পেলে না!

মা বললেন, তা হোক্‌, কাল প'রে পুজো দেখবে।

বাবা বাণ্ডিল খুলে কাপড় জামা সব দেখাতে লাগলেন। বালক কেদার বই শ্লেট ফেলে সেই নতুন কাপড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল। লাল জামা, কোরা কাপড় কিন্তু তাতেই কত আনন্দ! বাবা পকেটে করে কুচো গজা এনেছিলেন, এই সময় বার করে দিলেন। তাই হাতে করে বালক নাচতে লাগল, সেদিকে চেয়ে বাবা মা দুজনকারই মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কেদারবাবুর সেদিকে চেয়ে চেয়ে দু চোখে জল এসে গিয়েছিল। তিনি হেঁট হয়ে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছলেন, তারপর কিন্তু মাথা তুলে আর সে দৃশ্য দেখ্‌তে পেলেন না। দেখলেন তাঁদের ছেলেবেলাকার পূজামণ্ডপ, আয়োজন খুবই সামান্য, কিন্তু তাতেই গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছে। কত লোক খাচ্ছে, কত লোক খাবার আয়োজন করছে। বালক কেদার এখন আর একটু বড় হয়েছে, সে আর খোকন দুজনে গলা জড়াজড়ি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর খেলা করছে; তাদের পরনে নতুন কাপড়।

এই বছরের কথাটা কেদারবাবুর ভাল রকমই মনে ছিল। আগে তাঁর জ্ঞাতি জ্যাঠামশাইরা পুজো করতেন, এ বছর থেকে তার বাবার হাতে ভার পড়ল। বাবা বহু কষ্টে ধারদেনা করে আয়োজন করেছিলেন তবু কোন অভাব হয়নি। গ্রামের লোকেরা অনেক জিনিসপত্র বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে দৃশ্য মিলিয়ে গেল। শরৎ আবার তাঁর হাত ধরে আকাশে উঠ্‌ল। এবার কল্‌কাতা শহর। কিন্তু এখনকার কলকাতা নয়, অনেকদিন আগেকার, তাঁর ছেলেবেলাকার কলকাতায় যেন তাঁরা ফিরে এলেন।

যে পুরোনো বড় ছাপাখানাটার সামনে এসে তাঁরা দাঁড়ালেন সেটিও তাঁর বিশেষ পরিচিত। এই চাটুজ্জে মশায়ের ছাপাখানাতেই তিনি প্রথম কম্পোজের কাজ শেখেন। এইখান থেকেই তাঁর উন্নতির সূত্রপাত।

কেদারবাবু আপনমনেই বলে উঠলেন, উঃ, সে কি আজকের কথা! তখন আমার পনেরো-ষোল বছর বয়স। ঐ যে চাটুজ্জে মশাই, আহা চাটুজ্জে মশাই বড় ভাল লোক ছিল গো!

যে দৃশ্য কেদারবাবুর চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল তা সেই সময়কারই। পূজার পঞ্চমীর দিন চাটুজ্জে মশাই সকাল করেই ছাপাখানা বন্ধ করতেন, ছুটি থাক্‌ত ছ'দিন, একেবারে দ্বাদশীর দিন ছাপাখানা খুলত। ছুটি দেবার আগে চাটুজ্জে মশাই ডেকে ডেকে সকলকে এক মাসের আগাম মাইনে আর একখানি করে নতুন কাপড় দিতেন আর প্রত্যেককে বলে দিতেন, পুজোর তিন দিন ছেলেপুলে নিয়ে সব আসবে। খেটেখুটে পুজোটি আমার তুলে দেবে, আর তিন দিন সবাই ঐখানেই খাবে। না এলে দুঃখ করব।

সেইসব দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেদারবাবুর বুকের ভেতরটা যেন কেমন হু হু করে উঠ্‌ল। পরিষ্কার দেখতে পেলেন তিনি নিজের সমবয়সী আর দুটি বন্ধুর সঙ্গে টাকা আর কাপড় নিয়ে হৈ-হৈ করতে করতে চলেছেন। হায়রে সেসব দিন! কী ফুর্তিই ছিল তখন!

আবার শরতের ইঙ্গিতে দৃশ্য সরে গেল। এবার চাটুজ্জে মশাইয়ের বাড়ি, কত আনন্দ, চারিদিকে, 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' চলেছে। চাটুজ্জে মশাই প্রত্যেককে সম্ভাষণ করছেন, প্রত্যেক

কর্মচারীটিকে মিষ্টি কথায় আপ্যায়িত করছেন—ওহে ভুবন, তোমার ছোট ব্যাটা এল না কেন? তাকে আবার কোথায় রেখে এলে? ...প্রবোধ, যাবার সময় বৌমার জন্য প্রসাদ নিয়ে যেতে কোনমতেই ভুলো না যেন। মনে করে চেয়ে নিও, নইলে আমি খুব রাগ করব।... ওরে ও কেষ্টা, দ্যাখ্ না ছেলেটা কেন কাঁদছে, দে না ওর হাতে একটা মিষ্টি।

এমনি আরো কত কি। মনিব যে পিতার মত হয়, চাটুজ্জে মশাই ছিলেন তারি দৃষ্টান্ত। সেদিকে চেয়ে চেয়ে অস্ফুটস্বরে কেদারবাবু বললেন, বেচারী বিনোদ!

শরৎ যেন সাগ্রহে প্রশ্ন করলে, বিনোদ কে?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কেদারবাবু বললেন, তার দেখা পেলে তাকে দুটো মিষ্টি কথা বলতুম। বড়ই গালমন্দ করি লোকটিকে। যখন-তখন গালাগাল দিই—অতটা ভাল না।

শরৎ তাঁর হাত ধরে একটা টান দিয়ে বল্‌লে, চল ফিরে যাই। এবার আমার যাবার সময় হ'ল।

আবার তাঁরা মহাশূন্যে উঠলেন। আবার ফিরে এলেন নিজের শোবার ঘরে। তাঁকে তাঁর বিছানার কাছে ছেড়ে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে গেল। কেদারবাবুও শ্রান্তিতে, মানসিক উত্তেজনায় যেন আর দাঁড়াতে পারছিলেন না, সে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় শুয়ে পড়লেন, পরক্ষণেই একেবারে গভীর নিদ্রা।

চার

আবার যখন তাঁর ঘুম ভাঙল তখন প্রথমেই যে শব্দ তাঁর কানে গেল তা হচ্ছে ঘড়িতে একটা বাজার আওয়াজ। একটু বিস্মিত হয়ে কেদারবাবু চোখ খুললেন, তবে কি বেলা একটা বাজল? কৈ না, এখনও তো গাঢ় রাত রয়েছে—চারিদিক অন্ধকার!

তবে কি, কেদারবাবু বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, তবে কি তিনি এক দিন-রাত অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমোলেন? কী আশ্চর্য!

অবাক্ হয়ে ঘড়ি দেখবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই তিনি লক্ষ্য করলেন ঘরে আরও একটি মানুষ রয়েছে। সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে রে ওখানে?

যে এসেছিল সে তখন সামনে এগিয়ে এল। কেদারবাবু দেখলেন যে আগন্তুক একটি দশ-বার বছরের ছেলে, তার গলায় নীলপদ্মের মালা, মাথায় নানা বর্ণের ফুলের মুকুট। ক্রমে ক্রমে তার দেহ দিয়ে একটা জ্যোতি বেরোতে লাগল, তার ফলে সমস্ত ঘরটা আলো হয়ে উঠল। কেদারবাবু অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন, তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

কিন্তু ছেলেটিই কথা কইলে। খুব মিষ্টি করে হেসে বল্‌লে, আমি শরৎ, তোমাকে আমার সঙ্গে একটু বেড়াতে যেতে হবে।

কেদারবাবু কোন আপত্তি না করে তার দিকে হাতটি বাড়িয়ে দিলেন। শুধু বললেন, তুমি কোন শরৎ?

শরৎ বললে, এ বছরের শরৎ আমি। এই সেদিন এসেছি পৃথিবীতে।

সে তাঁর হাত ধরে আগের দিনের মতই জানালা দিয়ে বেরিয়ে নীচে নেমে এল। ইতিমধ্যেই যেন কখন সকাল হয়ে গেছে, পূজোর সকাল, সপ্তমীর সকাল। কেদারবাবু মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখলেন যে তখন সবে পূর্বাকাশটি লাল হয়ে উঠেছে কিন্তু তাতেই কত সুন্দর দেখাচ্ছে পৃথিবীকে। বাতাসে ঝরা শিউলি ফুলের গন্ধ, প্রথম ঠাণ্ডা উত্তরে বাতাসের সঙ্গে সেই গন্ধ ভেসে এসে যেন সমস্ত দেহ জুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কতকাল, কতকাল তিনি এর আনন্দ থেকে বঞ্চিত ছিলেন, কেউ কি তাঁর চোখে আঙুল দিয়ে এটা দেখিয়ে দিতে পারেনি?

শরৎ খানিকটা চল্‌বার পর কতকটা যেন আপনমনেই বললে, এত ভোরেই ছেলেরা সব বেরিয়ে পড়েছে!

কেদারবাবু দেখলেন, সত্যিই তাই। ছেলের দল তখনই সব দলে দলে নতুন কাপড়জামা পরে ঝি-চাকর কিম্বা অভিভাবকদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। তাদের মুখে চোখে কি আনন্দ, তাদের দিকে চাইলেও যেন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কেদারবাবু সেদিকে চেয়ে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আজ সপ্তমী কিনা, কলাবৌ নাওয়ানো দেখতে বেরিয়েছে সব।

চারিদিকে তখন ঢাক-ঢোলের শব্দ বেজে উঠেছে, রাস্তায় তাঁরা বহু পূজোর দলকে কলাবৌ নাওয়াতে যেতে দেখলেন। দু-একটা বাড়ি থেকে রসুন-চৌকীর সুর ভেসে আসছিল, ঝি-বৌরা চন্দন ও সিঁদুর নিয়ে বাড়ির দোরে-দোরে ফোঁটা দিয়ে বেড়াচ্ছে; ধূপ-ধুনো-ফুল ও চন্দনের গন্ধে রাস্তার বাতাস শুদ্ধ যেন পবিত্র হয়ে উঠেছে।

শুধু কি তাই? খাবারের দোকানগুলোসুদ্ধ যেন ক্ষেপে উঠেছে। সকলে রাশিরাশি খাবার করে দোকান সাজিয়েছে, তখনও খাবার করে যাচ্ছে, নতুন নতুন। এত খাবার কিনবে কে? কেদারবাবু অবাক্ হয়ে ভাবলেন।

তিনি রাস্তা দিয়ে এইসব দেখতে দেখতে আপনমনেই হাঁট্‌ছেন, খানিকটা পরে শরৎ তাঁর হাতে টান দিয়ে বললে, চল, তোমার দেশে যাই।

যেন ইচ্ছা মাত্রই কাজ!

কেদারবাবু চোখ পাল্‌টাতে না পাল্‌টাতে দেখলেন তিনি দেশের বাড়িতে হাজির হয়েছেন। তাঁর ভাইপো পূজোর উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত, উঠোনে বাইরে লোক ধরে না, বোধ হয় সমস্ত গ্রাম ভেঙে এসেছে। পুরোনো বাড়ির ঠাকুর-দালানে ছোট্ট প্রতিমাখানি, আয়োজনও সামান্য, কিন্তু লোকের গোলমাল চেঁচামেচিতে আর সামান্য বলে মনে হয় না। একধারে বসে তাঁর ভাইপো-বৌ কাঙালীদের জন্য চিঁড়ে-মুড়কী ও নারকেলের লাড়ু সরায় সাজাচ্ছেন। ও-পাড়া থেকে রায়গিন্নি এসেছেন ভোগ রাঁধতে, তিনি হাতে যত কাজ করছেন মুখে তত বকছেন, তাঁর কথাতেঁ সকলে হেসে লুটিয়ে পড়ছে। চারিদিকেই উৎসবের চিহ্ন, আনন্দের চিহ্ন।

বুড়ো ভূপেন ঘোষাল বললে, বাবাজী তোমার জ্যাঠাকে এবারেও আন্‌তে পারলে না?

নিখিল ম্লান হেসে বললে, না। তিনি তাঁর কোটরটি ছেড়ে কিছুতেই বেরোতে রাজী হন

না। বেচারী! এত আমোদ-আহ্লাদ, বছরকার এমন একটা দিন, তিনি তার কিছুই বুঝতে পারছেন না, একলা ঘরের কোণে চুপটি করে বসে আছেন। মনে হ'লেও কষ্ট হয়।

ঘোষাল বললে, অত পয়সা, তা কোন দিন ভাইপো কি নাতি-নাত্নীগুলোর একখানা কাপড় দিয়ে খোঁজ নিলে না!

নিখিল তাড়াতাড়ি বললে, তা না নিন্, তার জন্যে কোন দুঃখ নেই। কিন্তু তিনি নিজে বুড়ো বয়সে যদি একটু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখতে পেতেন তো মনটায় শান্তি হ'ত।

কেদারের বুক ভেঙে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে শরৎ তাড়াতাড়ি তাঁর হাত ধরে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। এবারে উৎসবের কোলাহল থেকে দূরে একেবারে তাঁরই অতি দরিদ্র কর্মচারী বিনোদের বাড়ি।

একতলা একটা খোলার বাড়ির দুখানি মাত্র ঘর নিয়ে থাকে বিনোদ। ওর বড় ছেলেটির বয়স বছর পনের-ষোলো হবে, সে কী একটা কারখানায় কাজ করে, সেখানে সামান্য কিছু মাইনে পায়—এই দুজনের আয়েতে সংসারটি অতিকষ্টে চলে। আরও চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে, তার মধ্যে কোলের মেয়েটি রুগ্ন, তার জন্য প্রত্যেক মাসেই তাকে কিছু কিছু ডাক্তার-খরচা করতে হয়।

কেদারবাবু যখন গেলেন তখন বিনোদ তার ছেলেমেয়েদের ডেকে কাপড়জামা দেখাচ্ছে আর আপনমনেই বল্ছে, কাল অতরাত্রে মাইনে পেয়ে কাপড়জামা কিনে আন্তে অনেক রাত হয়ে গেল, তোরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলি!

সামান্য মিলের কোরা কাপড়, তাইতেই ছেলেমেয়েগুলোর আনন্দ ধরে না। আর সস্তা ছিটের জামা, কেবল খুকির জন্য জাপানী সাটিনের ফ্রক। স্ত্রীর দিকে চেয়ে একটু যেন ভয়ে ভয়েই বিনোদ বললে, এইটে একটু বেশি দামই নিলে, এক টাকা ছ' আনা—কিন্তু এত পছন্দ হ'ল যে আর না কিনে থাক্তে পারলুম না।

খুকির মা বললে, তাতে আর কী হয়েছে! দশ-বারো আনার কমে তো হ'তই না, না হয় আর কয়েক আনা বেশি লেগেছে!

তারপর বেরোল চন্দ্রপুলি, কাল খুকির মা সারারাত জেগে ছেলেদের জন্য তৈরী করেছে। প্রত্যেকের হাতে এক-একখানা দিতেই তারা আনন্দে নাচতে সুরু করে দিল, সেদিকে চেয়ে চেয়ে বিনোদের মনে হ'ল যেন তার জীবনে আর কোনও দুঃখই নেই।

শরৎ আপনমনেই বল্লে, আস্ছে বছর নাগাদ ঐ ছোট খুকিটা মরে যাবে!

চম্কে উঠে কেদারবাবু বললেন, কেন?

শরৎ বল্লে, ভাল করে চিকিৎসা হ'লে হয়ত বাঁচত, কিন্তু পয়সা কৈ ওদের?

কেদারবাবুর যেন মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। তিনি বললেন, 'আমার শরীর বড্ড খারাপ বোধ হচ্ছে, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল।

শরৎ তাঁর হাত ধরতেই আবার তাঁরা উঠ্লেন মহাশূন্যে, খানিকটা পরেই কেদারবাবুর ঘর। কেদারবাবুকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে শরৎ মিলিয়ে গেল। কেদারবাবুও অবসন্নভাবে বিছানায় শুয়ে পড়েই ঘুমিয়ে পড়লেন।

পাঁচ

আবার সেই একটা।

ঘড়িতে বাজল ঢং!

কেদারবাবু ঘুম ভেঙে বিছানায় ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। সমস্ত ঘর যেন ভরে গেছে চমৎকার জ্যোৎস্নায়, তারই উজ্জ্বল আলো চারিদিকে। তিনি আশান্বিত হয়ে চাইলেন, দেখলেন যে তাঁর অনুমান মিথ্যা নয়, আর একটি ছেলে ঠিক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁরই দিকে চেয়ে। কিন্তু এর মুখ যেন একটু গম্ভীর।

কেদারবাবু বললেন, চল আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে! আজ আমি শুধু প্রস্তুত নই, আজ আমি যেতে ইচ্ছুক!

শরৎ গম্ভীরভাবে বললে, যে শরৎ পরে আসবে, যার সঙ্গে তোমার জীবনে আর দেখা হবে না, আমি সেই শরৎ, তোমার ভবিষ্যৎ তোমাকে দেখাতে এসেছি।

কেদারবাবু যেন কথাটা শুনে শিউরে উঠ্‌লেন। কিন্তু তবুও বললেন, চল।

কিন্তু তাঁকে যেতে হ'ল না কোথাও। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তাঁর চোখের সামনে দৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে গেল।

সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যেই তিনি যেন মরে পড়ে রয়েছেন। দুদিন আগে তিনি শুয়ে মরে আছেন, কেউ তাঁর খবর জানে না। কর্মচারীরা প্রেসের সামনে এসে অপেক্ষা করে করে ফিরে যায়, অবাক্ হয়ে বলাবলি করে, কি হ'ল? আবার নিজেরাই মীমাংসা করে, বোধ হয় অসুখ করেছে। এধারে তিনি বদ্ধদ্বারের মধ্যে মরে পড়েই আছেন, তাঁর মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ ছাড়ছে, পিঁপড়ে সার দিয়েছে তাতে।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে কেদারবাবু দু'হাতে চোখ ঢাক্‌লেন কিন্তু তবুও সে দৃশ্য আড়াল করতে পারলেন না। নীচের উড়ে ভাড়াটেরা দোর ভেঙে দেখে পুলিশে খবর দিলে, পুলিশ আসতে আসতে তারা ঘরের মধ্যে নেবার মত যা কিছু ছিল সব হাতিয়ে নিলে। তারপর মুদ্দফরাস এল, তাঁর দেহটা কোনমতে বিছানাসুদ্ধ জড়িয়ে নিয়ে শ্মশানঘাটে নিয়ে গেল, পাড়ার লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, বেশ হয়েছে, বুড়ো যেমন হাড়কিপ্পন ছিল, তেমনিই তার উপযুক্ত গতি হয়েছে!

মাটিতে বসে পড়ে কেদার চৌধুরী বললেন, বন্ধ কর ওসব, আর আমাকে দেখিও না, তোমার দু-টি পায়ে পড়ি—এ আর আমি দেখতে পারব না!

গম্ভীর কণ্ঠে শরৎ বললে, এই তোমার নিয়তি।

কেদারবাবু ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন, এ নিয়তি কি কিছুতেই বদ্‌লানো যায় না?

শরৎ বললে, নিয়তি বদলায় মানুষের কর্মফলে। এমন কোন সৎকাজ কি তুমি করেছ কখনও, যাতে তোমার নিয়তি ফেরে?

তার পা দুটি চেপে ধরে কেদারবাবু বললেন, আমাকে আর কিছুদিন সময় দাও, আমি নিশ্চয়ই ফেরাতে পারব আমার ভাগ্যকে। আমার মন বদ্‌লেছে, আমি কাল-পরশু দু-দিনে বুঝেছি আনন্দ কি, প্রকৃত জীবন কি!

শরৎ বললে, দেখ যদি পার ফেরাতে!

এই বলে সে কোথায় মিলিয়ে গেল। কেদারবাবু আবার বিছানায় এসে শুয়ে যেন ঘুমে ও অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

ছয়

ঘুম যখন ভাঙ্‌ল কেদারবাবুর তখন ভোর হয়েছে। পূব আকাশ থেকে ঝল্‌মলে রোদ এসে পড়েছে পাশের বাড়ির কার্নিশের সবুজ শ্যাওলার উপর, উত্তরের জানলা দিয়ে ঝিরঝিরে বাতাসের সঙ্গে ভেসে আস্‌ছে পূজো-বাড়ির সানাইয়ের সুর।

তিনি বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাড়াতাড়ি ঘরের সমস্ত জানলাগুলো খুলে দিলেন, আজ যেন তাঁর নবজন্ম লাভ হয়েছে, যৌবন ফিরে এসেছে আবার।

জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন রাস্তা দিয়ে একপাল ছেলে যাচ্ছে নতুন কাপড় পরে চেঁচামেচি করতে করতে, তাদের ডেকে জিজ্ঞেস্ করলেন, ও ভাই খোকারা, আজ কি তারিখ বল্‌তে পার ভাই?

আঃ, এত মিষ্টি করে কথা তিনি কতদিন বলেননি, কিন্তু আজ বলেই কত আনন্দ তাঁর!

ছেলেরা সকলে এ ওর গায়ে ঠেস্ দিয়ে হেসে উঠ্‌ল, ওমা, তাও জান না, আজ যে পূজো—সপ্তমী পূজা!

পূজো?

তবে কি পূজো কেটে যায় নি? তবে কি সবটাই তিনি একরাত্রে দেখলেন? এটা কি সবটাই স্বপ্ন? হোক্ স্বপ্ন, কিন্তু তিনি যা দেখেছেন তাতেই তাঁর শিক্ষা হয়েছে।

তিনি তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে নিয়ে অনেকদিন আগেকার তোলা একটা দেশী কাপড় আর ভাল জামা বার করে পরলেন, তারপর অনেকগুলো টাকাপয়সা পকেটে পুরে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়।

সেই কলাবৌ-স্নানের দৃশ্য, সেই আনন্দ-মুখর ছেলের দল—সেদিকে চেয়ে তাঁর মনে হ'ল তিনি খানিকটা নেচে নেন!

একটি ভিখারীর মেয়ে একটি ছেলে কোলে করে মলিন মুখে এসে বললে, বাবু পূজোর দিন ছেলেটার হাতে একটা পয়সা দিন্, মা আপনার ভাল করবেন।

মনে পড়ল তাঁর যে কালও বেরোবার সময় এম্‌নি একটি ভিখিরীর মেয়ে তাঁর কাছ থেকে একটি পয়সা চেয়েছিল, তিনি খিঁচিয়ে উঠে তাড়া করেছিলেন। তাকে যদি আজ

দেখ্‌তে পেতেন।... তিনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে দুটো টাকা বার করে তার হাতে দিয়ে বললেন, যাও মা, ছেলেকে একটা নতুন জামা কিনে দাওগে।

সে মেয়েটি অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু কেদারবাবু দাঁড়ালেন না, হন্ হন্ করে এগিয়ে গিয়ে ঢুকলেন একটা বড় খাবারের দোকানে। সে দোকানদার তাঁকে চিন্‌ত, তারা খাবারের দোকানে ওঁকে ঢুক্‌তে দেখে এত আশ্চর্য হয়ে গেল যে ভাবতে লাগল তাদের নিজেদের মাথাখারাপ হয়েছে কিনা। মানে তারা ভুল দেখছে কিনা!

কেদারবাবুর সে সব কোন দিকে তখন লক্ষ্য নেই। তিনি নিজের প্রাণের আনন্দে মশগুল।... পকেট থেকে দুখানা দশ টাকার নোট বার করে খাবারওলার হাতে দিয়ে বললেন, দেখ তিন চার জায়গায় খাবার পাঠাতে হবে, আমি ঠিকানা দিচ্ছি তোমরা পাঠিয়ে দেবে, কিন্তু আমার নাম করবে না।

এই বলে তিনি আগে বিনোদের ঠিকানা লিখে দিয়ে বল্‌লেন, এইখানে পাঁচ টাকার ভাল ভাল মিষ্টি পাঠাবে। আর এই চার জায়গায় তিন টাকা করে খাবার পাঠাবে। বাকি তিন টাকা তোমাদের যে লোক নিয়ে যাবে তাদের বখ্‌শিশ। শীগগির পাঠাবে—

তাঁর অন্য কর্মচারীদের নামঠিকানা লিখে দিলেন। তারপর সেখান থেকে সটান্ গিয়ে ঢুকলেন গ্রে স্ট্রীটের মোড়ের এক কাপড়-জামাওলার দোকানে। সেখানে বিনোদের ছেলেমেয়েদের চেহারা যতদূর মনে পড়ল, আন্দাজে মাপ ঠিক করে ভাল ভাল জামা-কাপড় কিনলেন। সেখানেও টাকা দিয়ে বিনোদের ঠিকানা লিখে দিয়ে বললেন, তোমরাই পাঠিয়ে দিও কিন্তু আমার নাম কোর না।

সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁর মনে হ'ল যে মন আর দেহ দুই-ই তাঁর খুব হাল্‌কা হয়ে গেছে। এইসব পৌঁছবার পর-বিনোদের আর তার ছেলেমেয়েদের যে মুখের চেহারা হবে, কল্পনা করেই তাঁর হাসি পেতে লাগল। তিনি খানিকটা আপনমনেই পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন, তারপর চলে গেলেন গঙ্গায়। উড়ে ঠাকুরের কাছ থেকে গাম্‌ছা চেয়ে অনেকদিন পরে গঙ্গাস্নান করলেন, মনে মনে বললেন, মা গঙ্গা, যে পাপ করেছি এতদিন, তা যেন মুছে দিতে পারি এই আশীর্বাদ করো।

তারপর একটা দোকানে ঢুকে কিছু খাবার খেয়ে নিয়ে একটা ট্যাক্সি করে চলে গেলেন একেবারে দেশে।

দেশের বাড়িতে তখন পুরোহিত সবে পূজোয় বসেছে, গ্রামের লোকেরা সবাই জটলা করছে, ছেলেপিলেরা চেঁচিয়ে যেন বাড়ি মাথায় করেছে। তারই মধ্যে ঠাকুরদালানে মায়ের প্রসন্ন মুখের দিকে চেয়ে কেদারবাবুর বুক জুড়িয়ে গেল। নিখিল তাঁকে দেখে কলরব করে উঠল, জ্যাঠামশাই এসেছেন তাহ'লে এবার! দয়া হল কি?

কেদারবাবু মিষ্টি হেসে বললেন, হ্যাঁ বাবা, মা দয়া করে এবার সত্যিই টেনেছেন।

নিখিল তাঁর মুখে মিষ্টি কথা শুনে অবাক হয়ে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার হাতের মধ্যে

শ'তিনেক টাকার নোট গুঁজে দিয়ে তিনি বললেন, ভাল করে সকলের খাবার ব্যবস্থা করো, গ্রামস্থ লোক কেউ যেন না বাদ যায়। আরও যা লাগে আমি দেব। তিনদিনই খাওয়ানো চাই।...

উপসংহার

পূজোর চারদিনই দেশে কাটিয়ে কেদারবাবু একাদশীর দিন ভোরবেলা কলকাতাতে ফিরলেন। এই চার দিন গ্রামের লোক যেন তাঁকে নিয়ে মেতে ছিল। খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদে কোথা দিয়ে যে দিন কেটে গেল তা তিনি বুঝ্‌তে পারেননি। সকলে যেন এই চারদিনে তাঁর পরমাত্মীয় হয়ে গেছে। নিখিলের ছেলে তো দাদুকে ছাড়তেই চায় না, আবার তিনি আসবেন, পুতুল আর খাবার কিনে নিয়েই চলে আসবেন, এমনি নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে তিনি পালিয়ে এসেছেন। নিখিল প্রথমটা কেবলই ভাবছিল যে কেমন করে এ মানুষটার এমন পরিবর্তন হ'ল, কিন্তু এখন আর ভাবে না। মা'র দয়া বলে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

কেদারবাবু তাকে বলে এসেছেন যে কলকাতার বাড়িটা সারানো দরকার, সে যেন গিয়ে সব দেখাশুনো করে, তিনি তারপর সে বাড়ি ভাড়া দিয়ে নিখিলের কাছে দেশে এসেই থাকবেন, রোজ সেইখান থেকেই প্রেসে যাতায়াত করবেন।

বিনোদ বেচারী এসব তো কিছুই জানে না, কোথা থেকে তার নামে খাবার এল, কাপড়-জামা এল, কিছু বুঝতে না পারলেও এ ক'দিন খুব ফুর্তিতেই ছিল। তার ওপর বিজয়ার দিন অনেক রাত হয়েছে শুতে বলে একাদশীর দিন কিছুতেই সকাল করে বেরোতে পারেনি, প্রেসে যখন এসে পৌঁছল তখন তার নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে দশটি মিনিট বেশি কেটে গেছে। সে বলিদানের পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে এসে ঘরে ঢুকে দেখে যে কর্তা আগেনেই গম্ভীর মুখে বসে আছেন। সে ছাতিটি এককোণে রেখে মনে মনে দুর্গানাম জপ করতে করতে যেমন নিজের টুলে বস্‌তে যাবে কর্তা ডাকলেন, ওখানে বস্‌তে হবে না, এদিকে এস।

বিনোদ কেঁদে ফেলে আর কি! কোনমতে এগিয়ে এসে হাতজোড় করে বললে, একটু দেরি হয়ে গেছে আজ, কাল বড্ড রাত হয়েছিল শুতে, তার ওপর খুকিটার অসুখ। আজকের দিনটি মাপ করুন, আর কোন দিন হবে না। কর্তা ধমক দিয়ে বললেন, ওসব কোন কথা আমি শুনতে চাই না, তোমারও চাকরি গেল আজই।

বিনোদ ধপাস্‌ করে বসে পড়ে পায়ে হাত দিয়ে বললে, আজকের দিনটি মাপ করুন, নইলে কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে শুকিয়ে মারা যাব—

কর্তা বললেন, চাক্‌রি থাকতে পারে, কিন্তু ও মাইনেতে নয়, আর পনের টাকা বেশি মাইনে নিতে হবে!

বিনোদ হতভম্বের মত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। কথাটার মানেই বুঝতে পারলে

না। তখন কেদারবাবু তার কানটি মৃদুভাবে মলে দিয়ে বললেন, এটা আর বুঝতে পারলে না বোকারাম, তোমার মাইনে বাড়ল!

শুধু বিনোদের নয়, মাইনে সকলকারই বাড়ল। তা-ছাড়া বিনোদের মেয়েটির চিকিৎসার ভারও কেদারবাবুই নিলেন। ভাল ডাক্তার ডেকে যাতে ভাল হয় তার জন্য প্রচুর পয়সা খরচ করতে লাগলেন। এমনি করে সকলকার ভালবাসা ও আশীর্বাদের মধ্যে বুড়ো 'দ্বাদশী চৌধুরী' বহুকাল মনের সুখে বেঁচে রইলেন।*

এই গল্প দুটিই দুটি বিখ্যাত ইংরিজী গল্পের কঙ্কাল অবলম্বন করে লেখা। অনাবশ্যক বোধে তাদের নাম দিলুম না।

কিশোরদের রূপকথা
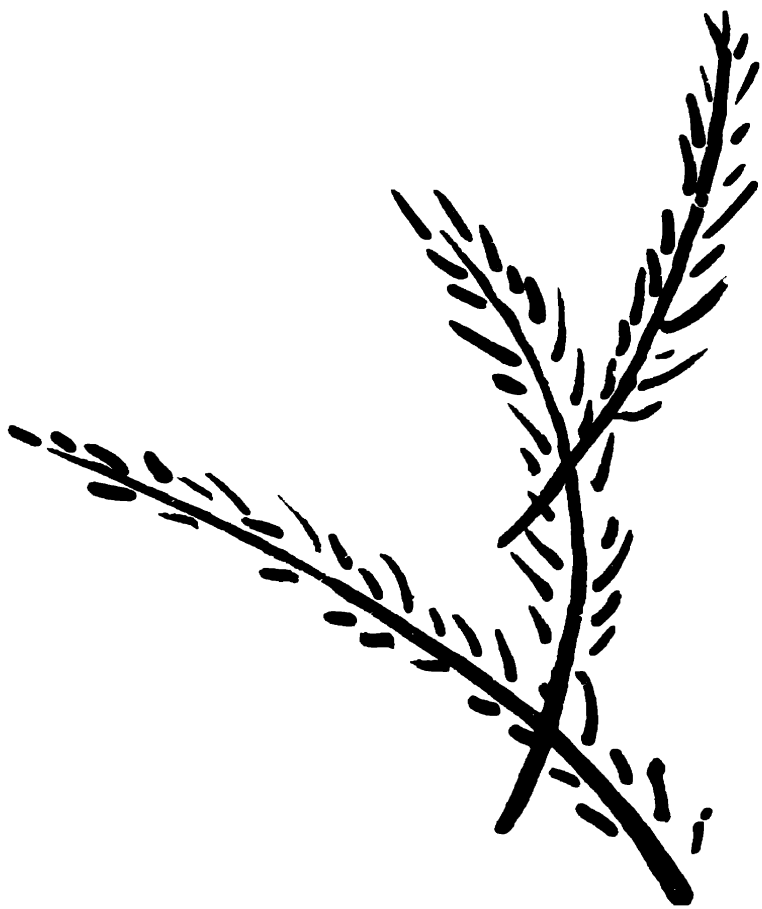
উৎসর্গ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

করকমলে-

ঋণ-শোধ

সে অনেক— অনেকদিন আগেকার কথা। তারপর কত শত-সহস্র বর্ষা গাছের পাতায় নেচে ফিরে গেছে! কত নতুন নগরী জেগে উঠেছে তাদের সৌধমালা তাদের ঐশ্বর্যের গর্ব নিয়ে। আবার কত প্রাচীন শহর তাদের সমস্ত প্রাচীন গৌরব নিয়ে বালুকারাশির মধ্যে ডুবে গেছে। কত নদী শুকিয়ে গেছে, কত নদী পথ ভুলে হারিয়ে ফেলেছে তাদের প্রাচীন গতিপথ।

সত্যি,—তারপর প্রায় দেড় হাজার বছর কেটে গেছে।

সে এক ক্ষত্রিয় রাজকুমার। বাল্যকালেই সে স্বপ্ন দেখতো—তার বাহুবলে তার পিতার ক্ষুদ্র রাজ্যের সীমা বহু নদী, বহু গিরিপথ পার হয়ে সুদূর গান্ধার থেকে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। দিকে দিকে তার প্রজা, দেশে দেশে তার প্রতিনিধি। আরও স্বপ্ন দেখতো যে সে যেন রাজসূয় যজ্ঞ করছে, ভারতের বিখ্যাত দেশগুলির প্রবল-প্রতাপশালী রাজারা পূজা পাঠিয়েছেন তার রাজসূয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ করার জন্যে।

কিন্তু শুধু স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগলো না তার। দেশগুলো কেমন, কার কত শক্তি, কার সৈন্যবল কত, এসব জানতে হবে তাকে। নইলে দিগ্বিজয়ে বেরুবে কেমন ক'রে সে?

অবশেষে কৌতূহল যখন আর চেপে রাখতে পারল না, তখন সে তার সমবয়সী দশ-বারোজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে একদিন শিকারের নাম ক'রে বেরিয়ে পড়ল দেশভ্রমণে।

রাজ্যের সীমা পার হয়ে একটি চাকরকে দিয়ে রাজার কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিলে, যেন তিনি না ভাবেন। যে বিরাট সাম্রাজ্য একদিন নিজের বাহুবলে গড়ে তুলবে, সেই বিপুল ভূখণ্ড কেমন, তা সে নিজের চোখে দেখতে চায়, সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়। আগামী বৎসর সূর্য উত্তরায়ণে যাবার পূর্বেই সে ফিরে আসবে যেমন ক'রে হোক।...

দশ-বারোটি ছেলে—বয়স আর কত হবে, এই পনেরো-ষোল আর কি!

কত গ্রাম, নগর, মাঠ, জলা পার হয়ে এগিয়ে যায় ঘোড়া ছুটিয়ে। কোথাও অতিথি হয় গৃহস্থ-বাড়িতে, সেখানে করে পরিচয় গোপন। কোথাও বা রাজধানীতে রাজার কাছে গিয়ে অতিথি হয়। পথে ছোটখাটো যুদ্ধ-বিগ্রহের সুযোগ পেলে ছেড়ে দেয় না। কোথাও দস্যু-তস্কর উপদ্রব করছে শুনলে তাদের মেরে গ্রামবাসীদের নিশ্চিন্ত করে। কোথাও বন্যবরাহ শিকার ক'রে নিজেদের শক্তির পরীক্ষা করে।

এমনি ক'রে যেতে যেতে যখন সুন্দর তক্ষশীলা পর্যন্ত চলে গেছে, তখন হঠাৎ রাজপুত্রের খেয়াল হলো,—তাই তো, বর্ষা যে যায়,—সামনে শুধু শরৎ আর হেমন্ত। —শীত পুরোটা পাওয়া যাবে না, তার আগেই উত্তরায়ণ এসে পড়বে;—এখন উপায়? সে যে বাবাকে কথা দিয়ে এসেছে উত্তরায়ণের আগেই ফিরে যাবে!

ছোট্ ছোট্!—দৌড়ো দৌড়ো! ঘোড়া আর বিশ্রামের অবকাশ পায় না। আরোহীদেরও

আহার-নিদ্রা নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত—এমন কি পথ ভাল পেলে রাত্রেও সবাই ছুটে চলেছে অবিশ্রান্ত গতিতে।

কিন্তু সোজা যে রাজপথ, সে পথ দিয়ে ফিরলে কিছুতেই বাড়ি ফেরা যায় না ঐ সময়ের মধ্যে—রাজকুমারের বন্ধুরা হিসাব ক'রে দেখে। একমাত্র বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে পাখীরা যেভাবে উড়ে যায় সরল রেখা ধরে, সেইভাবে যেতে পারলে হয়ত বাড়ি পৌঁছানো যেতে পারে ঠিক সময়ে। রাজকুমার হুকুম দিলে—'তাই চলো! পথে বন্য জন্তুর দেখা পাই, বধ করবো; দস্যুদল আসে, আমাদের দেখে পালাবে—ভয় কি?'

তাই হলো। পথ ছেড়ে সবাই বনে-জঙ্গলে ঢুকলো। সূর্য আর নক্ষত্র দেখে দিক্ ঠিক ক'রে নেয়, গাছের ফল আর শিকার-করা মাংস ঝল্‌সে খেয়ে দিন কাটায়।

একদিন এমনই এক শিকারের পিছনে ছুটতে ছুটতে রাজপুত্র এগিয়ে গেছে অনেকটা।

দলছাড়া হয়ে পড়েছে সে। দুপুর টা-টা করছে, তেষ্টায় বুক অবধি শুকিয়ে উঠেছে। জল চাই একটু—আর এখনই!

রাজকুমার কান পেতে শুনছে, দক্ষিণে বহুদূর থেকে সারসের ডাক আসছে কানে। নিশ্চয়ই জলাশয় আছে কাছেপিঠে কোথাও। সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে ঘোড়া ছুট্‌লো নক্ষত্রবেগে।

হ্যাঁ, জলই তো। পুকুর নয়, নদী। শুধু জল নয়, লোকালয়ও। ঐ যে দেখা যায় দূরে, পাহাড়ের কোলে। বন বুঝি শেষ হলো,—আর ভয় নেই।

তৃষ্ণার্ত রাজকুমার ঘোড়া বেঁধে রেখে দ্রুতপদে নেমে গেল স্রোতের ধারে। খরস্রোতা পাহাড়ী নদী শেষ বর্ষার পরিপূর্ণ স্রোতে তীরবেগে বয়ে চলেছে। কিন্তু সে সবদিকে ওর লক্ষ্য ছিল না। জল চাই ওর, সেইটেই বড় কথা। ধারে বড় নোংরা, জল বড় ঘোলা। তার চেয়ে ঐ যে বড় পাথরগুলো পড়ে আছে, ঐগুলোতে পা দিয়ে দিয়ে যদি এগিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে মাঝখানে ভাল জল পাওয়া যাবে।

যে কথা সেই কাজ। পাথরে পা দিয়ে দিয়েই এগিয়ে চললো রাজকুমার। কিন্তু বর্ষার জলে জলে পাথরগুলো হয়েছে পিছল, হঠাৎ পা পিছলে রাজকুমার একেবারে পড়লো জলের মধ্যে। প্রবল স্রোত—পা রাখতে পারে সে ক্ষমতা নেই। সাঁতার জানা আছে, কিন্তু যা স্রোত, তাতে সাঁতার জানা না-জানা দুই-ই সমান। ডুবতে ডুবতে, ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ী নদীর জলে হাবুডুবু খেতে খেতে রাজকুমার ভেসে চললো। একটু আগে যে জলের অভাবে প্রাণটা যেতে বসেছিল, এখন সেই জলের প্রাচুর্যেই বুঝি জীবনটা যায়!

কাছে কেউ নেই। লোকালয় দূরে। সঙ্গীরা কত দূরে কে জানে! কেউ জানতেও পারলো না,—মন্দশোরের যুবরাজ, চোখে যার বিশ্ব-বিজয়ের স্বপ্ন, প্রাণে যার সাম্রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা, সেই লোকটি আজ সামান্য একটা পাহাড়ী নদীর জলে বেঘোরে প্রাণ হারাতে বসেছে!

চিৎকার ক'রেও লাভ নেই, কারণ কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না—কে তার ডাক

শুনবে? কিন্তু আর পারাও যায় না। হাত-পা ক্লান্ত হয়ে এসেছে, বার বার পেটে জল গিয়ে দেহ হয়ে উঠেছে ভারী। ডুবছে ডুবছে,—এইবার সত্যিই ডুবছে সে।

কিন্তু না—রাজকুমারকে দিয়ে ভগবানের আরও প্রয়োজন আছে।

বড় একটি পাথরের আড়ালে তারই সমবয়সী একটি মেয়ে জল নিচ্ছিল। রাজকুমার তাকে লক্ষ্য না করলেও, সে রাজকুমারকে দেখতে পেয়েছিল ঠিকই। হরিণীর মতো লঘু অথচ দ্রুতপদে পাথরগুলোয় পা দিয়ে, জল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ছুটে এল সে রাজকুমারের কাছে তারপর ঘুরতে ঘুরতে জলের স্রোত রাজকুমারকে নিয়ে যেমন ওর পাথরখানার কাছে এসেছে, অমনি প্রাণপণ শক্তিতে সে রাজকুমারের চুলের মুঠিটা শক্ত ক'রে টেনে ধরলে।

রাজকুমারের চুলের মুঠিটা শক্ত করে টেনে ধরলে।

দেখতে ছোট ছিপ্‌ছিপে মেয়েটি, কিন্তু গায়ে জোর কম নয়। অত[illegible] দেহ রাজপুত্রের, কুস্তি-করা ভারী দেহ, পোশাকসুদ্ধ জলে ভিজে ভারী হয়েছে আরো। তবু সে রাজকুমারকে টেনে পাথরের ওপর তুললো। পাথরের ওপর এসে রাজকুমার এলিয়ে পড়লো। তার আর জ্ঞান রইলো না, চোখের পাতা যেন ভারী হয়ে বুজে এলো।

জ্ঞান যখন ফিরে এলো তখন দেখলো, মেয়েটি তার পরিচর্যা করছে। নিজের আঁচলে

তার সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দিয়েছে, ভিজে জামা নিয়েছে খুলে, হাত-পা ঘষে শরীর গরম করবার চেষ্টা করছে।

রাজকুমার ক্ষীণভাবে একটু হাসলে—লজ্জার হাসি।

'তোমার নাম কি?'

'মালবিকা।'

'কোথায় থাকো?'

দূর গ্রামের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মেয়েটি বললে—'ঐ যে ছোট্ট কুটির দেখা যাচ্ছে, ঐখানে আমার বাবা রাঘবাচার্য তপস্যা করেন। আমি তাঁর আশ্রমে থাকি।'

রাজপুত্র একটু ইতস্ততঃ করে বললো—'তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ, তোমাকে পুরস্কার দিতে পারি এমন কিছুই নেই। রাজ্য একটা তোমাকে এখুনি দিতে পারতুম, কিন্তু তাতে তোমার ঋণ কিছুই শোধ হয় না।... তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

মালবিকা একটুও লজ্জিত হলো না, বরং সরল ভাবেই প্রশ্ন করলে—'ব্রাহ্মণকন্যাকে বিয়ে করতে চাইছ তুমি, তোমার পরিচয় কি?'

রাজপুত্র মাথা হেঁট ক'রে উত্তর দেয়—'আমার নাম যশোধর্মা। মন্দশোরের যুবরাজ আমি, এর বেশি যে পরিচয়, সে আমার নিজের শৌর্যে। পৃথিবী জয় করবার আকাঙ্ক্ষা আছে আমার বুকে।'

মালবিকা একটু হেসে বলে—'আমার বাবা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাউকে কন্যাদান করবেন না। তা ছাড়া যুদ্ধ ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়দের তো নয়ই। তাঁর মতে, জোর ক'রে অন্য রাজ্য যারা দখল করে, অকারণে যারা সহস্র লোকের মৃত্যুর কারণ হয়, তারা মানুষের কৃপার পাত্র। ব্রাহ্মণের কাজ এদের পথ দেখানো; এদের আত্মার উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করা।—সে হয় না যুবরাজ। আমি তোমার প্রাণরক্ষা করতে পেরেছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য। তুমি প্রসন্ন মনে ফিরে যাও, কোন ক্ষোভ রেখো না। তুমি আজ থেকে আমার ভাই হ'লে এইটে মনে করো না কেন! বোনের কাছ থেকে কোন উপকার পেলে ভায়ের পক্ষে তা ঋণ মনে করার কোন কারণ নেই তো!'

যশোধর্মার দুই চোখ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভরে গেল। সে মাথা নেড়ে বললে—'তাই হবে বোন। তবে তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে। যদি কখনও কোন প্রয়োজন হয়, তাহলে ভাইকে নিশ্চয়ই স্মরণ করবে। তোমার কোন কাজে যদি লাগতে পারি, তবেই যে জীবন তুমি আজ দান করলে তা সার্থক হবে—স্মরণ করবে তো?'

মাথা হেলিয়ে মালবিকা বললে—'করব।'

হাত থেকে একটা আংটি খুলে যশোধর্মা মালবিকার হাতে দিয়ে বললে—'যেখানে থাকি না কেন, এই আংটি দেখালেই বুঝবো, তুমি আমায় স্মরণ করেছ। সব কাজ ফেলে তোমার ভাই তখনই তোমার কাছে পৌঁছোবে।'

মালবিকা হেসে আংটিটা হাত পেতে নিয়ে একটু থেমে বললে—'হয়ত কোন দিনই আর এ আংটি ফিরে যাবে না।—তবু ভাইয়ের চিহ্ন থাক্।'

হূণ-দলপতি তোরমানের অত্যাচারে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত জ্বলে গিয়েছিল;—তার ছেলে মিহিরকুলের অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠলো। যেদিকে যায় সে, শুধু শ্মশানের ভস্মস্তূপ সৃষ্টি করে। কাল যেটা ছিল সমৃদ্ধ নগর, আজ তার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। চারিদিকে হাহাকার আর ক্রন্দন-রোল। এই বর্বরগুলো শুধু লুঠতরাজ আর হত্যা—এই জানে। যত রকম পৈশাচিক কাজ, তাতেই তাদের আনন্দ।

জনপদের লোকেরা তো নিপীড়িত হতে লাগলোই,—সাধু, তপস্বী, ব্রাহ্মণরাও বাদ গেলেন না। পাহাড়ের ওপর, বনের মধ্যে যাঁরা শুধু ঈশ্বর-আরাধনা ও মানবের কল্যাণ-চিন্তায় দিন কাটান, তাঁদের উৎপীড়িত ক'রে যেন ওদের বেশি সুখ, বেশি আনন্দ। ওদের বিশ্বাস, এই মানুষগুলো আসলে অলস ও ভণ্ড। পাছে খেটে খেতে হয়, এই ভয়ে তপস্যার নাম ক'রে ঘরে বসে থাকে।

এমনি এক তপস্বী দলের সঙ্গেই মথুরার কাছাকাছি গোবর্ধন পাহাড়ের কোলে এক আশ্রম থেকে মালবিকা আর তার স্বামী-পুত্রকে ধরে নিয়ে গেল হূণরা। বড় বড় ক্ষত্রিয় রাজারা যাদের বাধা দিতে পারেন নি,—নিরীহ নিরস্ত্র ব্রাহ্মণরা কি করে বাধা দেবেন তাদের? তাঁরা সে চেষ্টাই করলেন না, শুধু চোখের জল আর দীর্ঘনিশ্বাস নীরবে নিবেদন ক'রে দিলেন ভগবানের উদ্দেশে।

ওদের ধরে নিয়ে গিয়ে হূণ-দলপতি প্রস্তাব করলেন—মালবিকা যদি তাঁর মেয়ের সঙ্গে হূণের বিয়ে দেন এবং ছেলেকে হূণ সেনাদলে চাকরি করতে দেন, আর মালবিকার স্বামী যদি হূণদের সঙ্গে একত্র আহার করেন, তবে ওঁদের দুই স্বামী-স্ত্রীকে তাঁরা ছেড়ে দিতে পারেন।

বলা বাহুল্য এ প্রস্তাবে তাঁরা কেউই রাজী হলেন না। অন্ধকার কারাগারে তাঁরা সকলে অনাহারে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। হূণের অন্ন গ্রহণ করবেন না মালবিকার স্বামী, কাজেই তিনি অনাহারে রইলেন। ফলে মালবিকারও উপবাসে দিন কাটতে লাগল। মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ রইলো না এঁদের।

কিন্তু নিজে অনাহারে মরা এক কথা, আর চোখের সামনে স্বামী-পুত্রকে মরতে দেখা অন্য কথা। মালবিকা আর পারলেন না। এমনি ভাবতে ভাবতে আর ভগবানকে ডাকতে ডাকতে হঠাৎ একদিন মালবিকার চোখে পড়ে যায় যশোধর্মার দেওয়া সেই আংটিটা। হূণরা সব কেড়ে নিয়েছিল, কেবল ওটাকে তিনি অতিকষ্টে রক্ষা করেছিলেন।—এই তো, একজন তো এখনও আছে, যে অন্তত তাঁদের রক্ষা করবার চেষ্টাও করতে পারে! মালবিকা শুনেছেন, মন্দশোরের রাজা যশোধর্মা আজ বিরাট এক সাম্রাজ্যের অধিপতি। মালব পর্যন্ত তাঁর পদানত। তিনি চেষ্টা করলে হয়ত...

আবার সংশয় জাগে মনে, আজও কি মালবিকার কথা মনে আছে তাঁর? কিন্তু এতদিন পরে এই যে আংটিটার কথা মনে পড়া, এও কি ভগবানেরই ইঙ্গিত নয়? না—নিশ্চয়ই সব আশা এখনও যায় নি;—উপায় একটা এখনও আছে।

প্রহরীদের মধ্যে একটি তরুণ হূণ ইতিমধ্যে মালবিকার ভক্ত হয়ে পড়েছিল।

কিছুদিন আগে এই তরুণ হূণটি এক দুরারোগ্য রোগে পড়েছিল। সকলেই তার জীবনের আশা ত্যাগ করেছিল। মৃত্যু একবারে অবধারিত। মালবিকার বাপ ছিলেন সাধুসন্ন্যাসী মানুষ। অনেক রকম গাছ-গাছড়া আর টোট্‌কা ওষুধ তাঁর জানা ছিল। সেই সব ওষুধ তিনি মরবার আগে দিয়ে গিয়েছিলেন মালবিকাকে। মালবিকা তাই থেকে একটা ওষুধ দেয় তাকে খেতে। তাইতেই তরুণ হূণটি সেযাত্রা বেঁচে যায়। একেবারে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে আনেন তাকে মালবিকা। তারপর থেকে সে হয়ে ওঠে মালবিকার পরম ভক্ত। সে গোপনে ফলমূল দিয়ে যেতো ওঁদের ঘরে। তাই ভাগ ক'রে খেয়ে এঁদের জীবনধারণ হতো। এই ছেলেটিকেই ডেকে একদিন মালবিকা অনুরোধ জানালেন, কোনমতে এই আংটিটি যশোধর্মাকে পৌঁছে দিয়ে জানাতে হবে যে তাঁর ভগ্নী মালবিকা হূণদের হাতে বন্দী।

হূণ যুবক মাথা নামিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করলো। তারপর বললো—'সে আমি পারবো না দেবী। আমাকে মাপ করবেন। যশোধর্মাকে এই সংবাদ দিলেই তিনি হূণদের আক্রমণ করবেন। যদিও না মিহিরকুলকে তিনি পরাস্ত করতে পারেন, তবু কয়েক সহস্র হূণ তো মরবে সে যুদ্ধে। এ শুধু বিশ্বাসঘাতকতা নয়, স্বজাতিদ্রোহিতাও;—এ আমি পারবো না!'

মালবিকা বুঝিয়ে বলেন—'কিন্তু তোমাদের রাজা তো দেশের পর দেশ, রাজ্যের পর রাজ্য জয় ক'রে এগিয়ে চলেছেন। আজ হোক কাল হোক, যশোবর্মার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধবেই। তাছাড়া যুদ্ধের ভয় বা লোকক্ষয়ের ভয় তিনি তো করেন বলে মনে হয় না।— ঐতেই তো তাঁর আনন্দ।'

হূণ-যুবক বলে—'তবু যা নিজের নিয়মে হয় হবে, আমি নিমিত্তের ভাগী হতে পারবো না।'

মালবিকা ওর পায়ের কাছে বসে পড়ে সজলনেত্রে বলে—'আমি ভিক্ষা চাইছি।'

ছেলেটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে—'এ প্রাণ আমাকে একদিন আপনিই দিয়েছিলেন, সুতরাং এ আমি আপনার কাজে উৎসর্গ করতে বাধ্য।—দিন, আমি যেমন ক'রেই হোক্ পৌঁছে দেব।'

রাজা যশোধর্মা চিন্তিতমুখে সিংহাসনে বসে। ভারতের বিভিন্ন দেশ থেকে রাজারা প্রার্থনা জানিয়ে দূত পাঠিয়েছেন,—হূণদের অত্যাচারে দেশ যায়;—এ বিপদে যদি যশোধর্মা না রক্ষক হন, তাহলে কারুর আর রক্ষা নেই। ভগবান যখন তাঁকে শক্তিশালী করেছেন, তখন তাঁর উচিত সে শক্তির সদ্ব্যবহার করা।

যাঁরা এই আবেদন জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একদা-প্রতাপশালী গুপ্তবংশেরও এক রাজা আছেন। ভগবানের কি বিচিত্র লীলা! যে গুপ্ত-সম্রাটরা একদিন বার বার বিদেশী শত্রুদের ভারত থেকে বিতাড়িত করেছেন, তাঁদেরই বংশধর একজন আজ সাহায্য ভিক্ষা করতে এসেছেন যশোধর্মার কাছে!... এ হয়ত ঈশ্বরের ইঙ্গিত। আজ যশোধর্মার হাত দিয়েই তিনি এই পবিত্র ভূমির উদ্ধার-সাধন করবেন,—তাই এই সব ব্যবস্থা। যশোধর্মার যশ ও গৌরব বৃদ্ধির জন্যই হয়ত অন্য রাজাদের তিনি হীনবল করেছেন।

কিন্তু তবু—

—তবু একটা কথা আছে বৈকি।

অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রে যশোধর্মা ধীরে ধীরে মুখ তুললেন। বললেন—'আপনাদের অনুরোধ আমার পক্ষে গৌরবের কথা, সন্দেহ নেই। কিন্তু হূণরা যে আজ দুর্ধর্ষ শক্তির অধিকারী। তাদের বিপক্ষে একা দাঁড়াবার মতো শক্তি আমার আছে কিনা সন্দেহ। অথচ আপনাদের কারুর সাহায্য পাবো, এমন আশাই বা করতে পারছি কই!'

গুপ্তদের দূত বললেন—'সে কি কথা মহারাজ, এখানে উপস্থিত যাঁরা আছেন, তাঁরা যে রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি, সেই সব ভারতবিখ্যাত ক্ষত্রিয়কেশরীরা নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করবেন। আজ সকলের এক পতাকাতলে সমবেত হবারই দিন এসেছে যে।'

কঠোর স্বরে যশোধর্মা বললেন—'দূত, সে'দিন কি আজই মাত্র এসেছে? সেদিন বহু পূর্বেই এসেছিল, যেদিন হূণরা এদেশের মাটিতে প্রথম পা দেয়,—সেই দিনই। আমাদের রাজারা যদি কয়েকজনও বিপদের সময় মিলিত হতে পারতেন, তা হ'লে কোন বিদেশীই এ মাটিতে পা দিতে সাহস পেত না। অপরের বিপদ যে কোন দিন আমাদের বিপদ হতে পারে, এ দূরদৃষ্টি এবং কল্পনা কারুর নেই বলেই এতদিন ভারতের সব নৃপতিরা চুপ ক'রে বসে দেখেছেন, এই বিদেশী দস্যুগুলো একটির পর একটি দেশ দখল করছে ও শ্মশান ক'রে দিচ্ছে। আপনাদের যাঁরা প্রেরক, তাঁদের ঘুম কি এতদিনে ভাঙলো? কেন, ভারত কি এতদিন নিঃক্ষত্রিয় হয়ে ছিল?'

উপস্থিত সব দূতই নীরবে নতমুখে এই তিরস্কার সহ্য করলেন। তাছাড়া উপায়ই বা কি? কথাগুলো সবই যে সত্য—একেবারে অকাট্য সত্য।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে যশোধর্মা আবার বললেন—'আজ আপনারা বলছেন যে আমাকে সাহায্য করবেন, কিন্তু কেমন ক'রে জানবো যে, কার্যকালে আপনারা ঈর্ষাবশত পেছিয়ে যাবেন না? তাঁরা সাহায্য করবেন, অথচ যুদ্ধজয়ের গৌরব আমার হবে,—এই ঈর্ষাতে এর আগে বহু সর্বনাশ হয়ে গেছে। আবারও যে হবে না তার [illegible] কি? কিসের ভরসাতে আমি আমার লক্ষ লক্ষ প্রজাকে মৃত্যু আর দুর্ভিক্ষের মধ্যে ঠেলে দেবো? শত্রু তো রাজ্যসীমা থেকে বহু দূরে, হয়ত তারা কোন কালেই আমার দেশ আক্রমণ করবে না, অনর্থক এ বিপদকে আমন্ত্রণ করে আনি কেন?'

এই পর্যন্ত বলে তিনি থেমেছেন, এমন সময় রাজধানীর শহর-কোটাল এসে নিবেদন করলেন—'মহারাজ, একটি হূণ-সৈনিককে গুপ্তচর সন্দেহে রাজ্যসীমার মধ্যে বন্দী করা হয়েছে, কিন্তু সে বলছে যে মহারাজের ভগ্নীর কাছ থেকে সে কি সংবাদ নিয়ে এসেছে!'

'আমার ভগ্নী?'

'হ্যাঁ মহারাজ। এ অবিশ্বাস্য কথা আমরা প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম, কিন্তু প্রমাণস্বরূপ সে আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক বার করলো। সে বললো, একবার তাকে শুধু আপনার কাছে উপস্থিত করা হোক, তাহলেই সে সব কথা আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে।'

'বেশ, তাকে নিয়ে এসো এখানে।'

মহামাত্য তাড়াতাড়ি বললেন—'তাকে নিরস্ত্র করা হয়েছে তো?'

'নিশ্চয়ই!'

হূণ যুবক বন্দী অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে মহারাজকে অভিবাদন জানালে। তারপর আংটিটা বার করে এক প্রহরীর হাতে দিয়ে ইঙ্গিত করলে তাঁকে দেখাতে।

আংটিটা হাতে নিয়ে যশোধর্মা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন। এ আংটি তাঁরই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কবে, কোথায়, কি করে এ আংটি হারিয়েছিল, আজ আর মনে করতে পারছেন না! এর সঙ্গে কী যেন কাহিনী জড়িত আছে!—বিস্মৃতির আড়ালে ঝাপ্সা, অস্পষ্ট কী একটা স্মৃতির সঙ্গে এ যেন মিশে রয়েছে!—মনে পড়ছে, অথচ মনে পড়ছে না!

ওহো! মনে পড়েছে—মনে পড়েছে!...

'যুবক, তুমি দেবী মালবিকার কাছ থেকে আস্‌ছ?'

'হ্যাঁ মহারাজ।'

'প্রহরীগণ, ওকে মুক্ত করে দাও,—সত্যই এ আংটি আসছে আমার এক ভগ্নীর কাছ থেকে!'

প্রহরীরা ওকে ছেড়ে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। হূণ যুবকটি সব কথা বলে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

অসহনীয় ক্রোধে যশোধর্মার মুখ হয়ে উঠল রক্তবর্ণ। তিনি প্রথমেই বললেন, —'মহামাত্য, আপনি যুদ্ধের আয়োজন করুন। আজ আমার এই সিংহাসনে বসা যে দেবীর জন্য সম্ভব হয়েছে, যিনি নিজের প্রাণ দিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন, তিনি হূণদের হাতে লাঞ্ছিতা হচ্ছেন,—তিনি বন্দিনী! বোঝা গেল, হূণদের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, তাই এমন দুর্বুদ্ধি হয়েছে তাদের। দূতগণ, আপনারা আপনাদের প্রার্থনার উত্তর পেয়ে গেলেন। ফিরে গিয়ে আপনাদের নিজ নিজ প্রভুর কাছে জানাবেন যে, তাঁরা যদি আমাকে সাহায্য করেন তো ভালই, তাঁদেরই গৌরব বৃদ্ধি হবে তাতে, ক্ষত্রিয়দের লজ্জা দূর হবে। আর যদি সাহায্য নাও করেন তো ক্ষতি নেই, আমি একাই যুদ্ধে যাবো। জীবনের ঋণ না হয় জীবন দিয়েই শোধ হবে!'

তারপর হূণ-সৈনিকটির দিকে চেয়ে বললেন,—'যুবক, তুমি আমার মহাঋণ শোধের উপায় ক'রে দিয়েছ, আমাকে অনন্ত লজ্জা ও অগৌরবের হাত থেকেও বাঁচিয়েছ—তার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। বলো তুমি কি পুরস্কার চাও? মুক্তামালা, সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, কিংবা ভূখণ্ড, যা চাইবে তাই দেব!'

হূণ-যুবকটি নতজানু হয়ে বললো, 'মহারাজ, আমি সৈনিক, অস্ত্রত্যাগ আমার কাছে মৃত্যুর চেয়ে কষ্টকর। এঁরা আমার তরবারি কেড়ে নিয়েছেন, সেইটি ফিরে পেলেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার পাওয়া হ'ল মনে করব।'

'নিশ্চয়ই। যুবক, তোমার অস্ত্র তো ওঁরা ফিরিয়ে দেবেনই, আমার এই তরবারিও

তোমায় উপহার দিলাম। বড় খুশী হয়েছি তোমার কথাতে। বীরের উপযুক্ত কথাই বলেছ।'

রাজ-তরবারি মাথা পেতে নিয়ে হূণ-যুবক উঠে দাঁড়াল। তারপর কেউ কিছু বোঝবার বা বাধা দেবার আগেই বিদ্যুৎবেগে সেই তরবারি দিলে সে নিজের বুকে বসিয়ে। বুকে বিঁধে তার অগ্রভাগ পিঠ ফুঁড়ে বেরোল।

'এ কি! এ কি যুবক! এ কি করলে!' সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। হূণ-সৈনিকটি ক্লান্তকণ্ঠে উত্তর দিলে,—'আমিও জীবন দিয়ে জীবনের ঋণ শোধ করলাম মহারাজ।... স্বদেশ ও স্বজাতির সর্বনাশ করার পরও প্রাণধারণ করা কি সম্ভব? এ কলঙ্ক আমার রক্তেই ধুয়ে যাক।'

একটু পরেই তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

তারপর?

তারপর যা, তা তোমরা তোমাদের স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের বইতেই পড়েছ। যশোধর্মা মিহিরকুলকে বিতাড়িত ক'রে হূণদের অত্যাচার থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করলেন। উত্তর ভারতের সর্বশেষ প্রান্ত থেকে মধ্যভারত পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত হ'ল। তাঁর যশোগৌরবে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় বাজাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিন্তু যাঁর জন্য এই অসম্ভব সম্ভব হল, সেই মালবিকাকে উদ্ধার করতে তিনি পারেন নি। সংবাদ আসা এবং যুদ্ধযাত্রা করা—এই দীর্ঘ সময় তাঁর পক্ষে স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় নি।

দেবতার রোষ

আঙ্কোর বা ওঙ্কার পুরীতে আজ উৎসবের শেষ নেই। এত বড় নগরী, সমস্ত পৃথিবীতে যার তুলনা মেলে না, ঐশ্বর্যে ও বিপুলত্বে যা বহু দিন থেকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর বলে গণ্য—তার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আলো আর ফুলের মালায় সাজানো হয়েছে। সমস্ত নাগরিকের পরিধানে নতুন কাপড়, নাগরিকরা নতুন নতুন অলঙ্কারে সেজেছেন। রাজ্যের সমস্ত প্রত্যন্ত ভাগ থেকেই ফুল এসেছে, সোনার ফুলেরও অভাব নেই, তবু নাকি আজ এক-একটি ফুলের মালা আট-দশ টাকায় বিক্রী হচ্ছে। বাজারে কোথাও কোন মিষ্টি খাবার নেই—সব রাজবাড়ি থেকে লোক এসে কিনে নিয়ে গেছে—প্রজা-সাধারণকে প্রজাধিনায়কের তরফ থেকে জলযোগ করানো হবে।

অবশ্য এ আনন্দের কারণ আছে বৈকি। সম্রাট বিষ্ণুবর্মণ আবার কাম্বোজের হৃত-গৌরব ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা, জয়বর্মণ, ইন্দ্রবর্মণ—এঁরা একে একে যেভাবে কাম্বোজের সাম্রাজ্য-সীমা বিস্তৃত ক'রে তার শক্তিকে সার্বভৌম ক'রে রেখে গিয়েছিলেন, পরবর্তী সম্রাটরা সে কীর্তির কিছুমাত্র মর্যাদা রাখতে পারেন নি। সিংহবিক্রম

শৈলেন্দ্র সম্রাটরা এবং মাজাপাহিতের সিংহশ্রী নৃপতিরা উপর্যুপরি আক্রমণে আঙ্কোরের বিপুল শক্তির মূলদেশ পর্যন্ত টলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এত দিন পরে মনে হচ্ছে, কাম্বোজের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আবার মুখ তুলে চেয়েছেন। বিষ্ণুবর্মণ সিংহশ্রীদের একটি যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছেন, চার হাজারের ওপর মাজাপাহিত সৈন্যদের বন্দী করেছেন এবং ওদের বাণিজ্য-তরী এনে নিজেদের বন্দরে আটক রেখেছেন। এর বেশি আনন্দ-সংবাদ আর ওঙ্কার পুরীর নাগরিকদের কাছে কী হতে পারে! আজ তাই নগরের বালক-বৃদ্ধ-নারীনির্বিশেষে সমস্ত প্রজা আনন্দে মেতে উঠেছে।

সম্রাট বিষ্ণুবর্মণের মন্ত্রী নিজে এ উৎসবের পুরোধা। তিনিই কর্মসূচী তৈরী করে দিয়েছেন। সকালে নাগরিক ও নাগরিকারা স্নান ক'রে, নৃত্য-গীত সহকারে শোভাযাত্রা ক'রে যাবে ওঙ্কার বট মন্দিরে। সেখানে অনন্তনাগের পূজা শেষ ক'রে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে এসে সম্রাটকে দর্শন করবে এবং প্রসাদ হিসাবে কিছু মিষ্টান্ন জলযোগ ক'রে যে যার বাড়ি ফিরে যাবে। তার পর সন্ধ্যায় নিজের নিজের বাড়িতে আলো জ্বেলে যাবে নদীতীরে—সেখানে নৌকোয় বাচ খেলা হবে এবং নৌকোর ওপরই পোড়ানো হবে আতসবাজি। এ বস্তুটি একেবারে নতুন, চীন থেকে নাকি কে এক ওস্তাদ ঐন্দ্রজালিক এসেছে—সে স্বয়ং অগ্নিদেবকে করেছে করতলগত। এই বাজি দেখবার জন্যই আরো সমস্ত নাগরিকরা অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছে, সুদূর গ্রাম-প্রান্ত থেকেও বিস্তর লোক এসে পৌঁচেছে।

এ-হেন উৎসবের দিনে সহসা এক বিঘ্ন উপস্থিত হ'ল।

সম্রাট স্নান-পূজা শেষ ক'রে প্রজাদের দর্শন দিতে যাবার আগে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, 'সঞ্জয়, গুরুদেবকে দেখছি না কেন? তিনি কোথায়? তাঁকে প্রণাম করব যে!'

সঞ্জয় মাথা হেঁট ক'রে জবাব দিলে, 'সে প্রশ্ন আমাকে করবেন না মহারাজ, আজকের দিনে ও-কথা থাক।'

'সে কি! আজকের দিনেই যে তাঁকে আমার বিশেষ প্রয়োজন!'

'তিনি আসবেন না।'

'আসবেন না? কেন? আমাদের এজাতীয় বিজয়ে কি তিনি খুশী হন নি?'

'না। তিনি বলেন, যুদ্ধ যুদ্ধই। একটা বিজয় আর একটা পরাজয়েরই সূচনা করে যদি না সমস্তটা মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে বিবেচনা করা হয়। তিনি বলেছেন যে, পূর্ব পূর্ব সম্রাটরা অকারণে বহু দেশ আক্রমণ করেছেন, বহু লোকের প্রাণক্ষয়ের কারণ হয়েছেন শুধু নিজেদের গৌরব ও ঐশ্বর্যবৃদ্ধির জন্য। সাম্রাজ্য বাড়িয়েছেন কিন্তু বিজিত দেশগুলিকে নিজের দেশের অংশ বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাদের শোষণ করেছেন—শাসন করেন নি। তারই ফলে তারা যদি আজ শক্তি সঞ্চয় ক'রে আপনাদের বার বার আক্রমণ এবং ক্ষতি ক'রে তো সে নির্যাতন আপনাদেরই প্রাপ্য। এমনি ভাবে জাতিরা পরস্পরকে যদি শুধুই বিজেতা ও বিজিতের মনোভাব নিয়ে দেখে তো মানুষের কল্যাণ কোন দিনই হবে না। তিনি এই বিজয়লাভের ফল নাকি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন, ভবিষ্যতে কাম্বোজের শোচনীয় পরাজয় এবং লোকক্ষয়। সেই জন্যই তিনি ব্যথিত এবং আনন্দ-উৎসবে যোগদানে অক্ষম।'

সম্রাটের মুখ রাগে ও অপমানে লাল হয়ে উঠল। তবু তিনি আত্মসংবরণ ক'রে বললেন, 'তিনি কি করতে বলেন?'

'তিনি বলেন যে, যেসব মাজাপাহিতের নাগরিকদের বন্দী ক'রে এনেছেন তাদের সসম্মানে ছেড়ে দিতে এবং নিজেদের ব্যয়ে তাদের দেশে পৌঁছে দিয়ে আসতে। তিনি আরও বলেন যে, ওদের বণিকদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে বাণিজ্যতরীগুলিও ফেরত পাঠানো উচিত এবং সিংহশ্রী সম্রাটদের কাছে আমাদের আচরণের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত।'

'কিন্তু—' ব্যঙ্গের সুরে সম্রাট বললেন, 'কিন্তু উদার-হৃদয় গুরুদেব কি ভুলে গেছেন যে আক্রমণ ওরাই আগে করেছিল, আমরা করি নি! ক্ষমাপ্রার্থনা, ক্ষতিপূরণ যা কিছু ওদেরই করা উচিত, আমাদের নয়!'

'সে কথাও তাঁকে বলেছিলাম, সম্রাট। তার উত্তরে তিনি বললেন যে, অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায়ে হয় না। তারা আমাদের প্রজাদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করেছিল বলেই তোমরা যদি তার প্রতিশোধ নাও, তাহলে বৃহত্তর প্রতিহিংসার জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। বুদ্ধিমানের রাজনীতি হ'ল বিজিতের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা, হিংসা দিয়ে হিংসাকে জাগ্রত করা নয়। একটা অন্যায় আর একটাকেই ডেকে আনে।'

রাজাধিরাজ আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'সঞ্জয়, তুমি সেই বৃদ্ধকে বুঝিয়ে দাও গে যে, রাজনীতিটা সন্ন্যাসীর জন্য নয়। তা ছাড়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা, সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা; হার-জিত যুদ্ধের অঙ্গ, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ক'রে লাভ নেই। বর্তমানে জয়লাভ করেছি এইটুকুই যথেষ্ট। তিনি গুরু হতে পারেন কিন্তু তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে তিনি আমার প্রজা। তাঁকে আমার আদেশ জানিয়ে বলো গে যে, দ্বিপ্রহরের মধ্যে তাঁকে রাজপুরীতে আসতে হবে।'

সঞ্জয় তখনই যাত্রা করলেন। দূত পাঠাতে ভরসা হ'ল না। গুরুদেব তখন নদীতীরে তাঁর আশ্রমে বসে গভীর শান্তির মধ্যে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করছিলেন। সঞ্জয়কে দেখে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, 'কি সংবাদ বৎস?'

সঞ্জয় রাজার আদেশ জানালেন। গুরুদেব সব শুনেও এতটুকু রাগ করলেন না, তাঁর মুখের প্রশান্তি এতটুকু নষ্ট হ'ল না। বরং হেসেই বললেন, 'তাঁকে আমার আশীর্বাদ দিয়ে বলো যে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করাই রাজধর্ম। মানুষ মাত্রই স্বাধীন, এক জাতি অপর জাতিকে শাসন করে এটা ঈশ্বরের নিয়ম নয়। তারা তোমাদের দেশ আক্রমণ করেছিল বটে কিন্তু তার আগে তোমরা করেছ বহুবার। তারা তোমাদের সৈন্য বন্দী ক'রে অত্যাচার করেছিল বলেই আজ তোমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছ, কিন্তু তাই বলে আবার তোমরা যদি সেই অত্যাচারই করো তো তারাও এমনি ক'রে সেই কথা মনে ক'রে রাখবে। এমনি ক'রেই পৃথিবীতে হিংসা ও যুদ্ধ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এতে মানুষের কোন কল্যাণ নেই। তুমি বিষ্ণুবর্মণকে বলো গে যে, যতক্ষণ না বন্দী সৈন্যগুলিকে অতিথি হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে, ততক্ষণ এ উৎসবে আমি যোগদান করতে পারব না।'

'কিন্তু তাঁর আদেশ অত্যন্ত কঠিন গুরুদেব!'

'আমার বিবেকবুদ্ধি আরও কঠিন বৎস। বিষ্ণুবর্মণ আমার ঐহিক সম্পত্তিরই অধীশ্বর, মনের নন। বিচার ও বিবেক-বুদ্ধি আমি ঈশ্বরকে অর্পণ করেছি।... আরও ব'লো যে তিনি যেন বলপ্রয়োগ না করেন, তাতে তাঁর দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে।'

সঞ্জয় ফিরে এসে সংবাদ দিতে বিষ্ণুবর্মণ নিষ্ঠুর মোঙ্গল সৈন্যদের ডেকে পাঠালেন। এদের সাহায্যেই তিনি এবারের যুদ্ধ জিতেছেন, এই বিদেশীদের সৈন্যদলে ভর্তি করার বুদ্ধি তাঁর, সেজন্য তিনি রীতিমত গর্ব অনুভব ক'রে থাকেন। এই মোঙ্গল সৈন্যদের নিয়ে বিষ্ণুবর্মণ নিজে চললেন সন্ন্যাসী গুরুদেবকে শাসন করতে।

তিনি তখনও তেমনি শান্তমনে বসে পুঁথি পড়ে যাচ্ছেন। সম্রাট তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এই শেষবার আদেশ জানাচ্ছি আপনাকে, এখনই গিয়ে আপনাকে উৎসবে যোগ দিতে হবে!'

গুরুদেব স্মিত হাস্য ক'রে বললেন, 'বৎস, তুমি তোমার ব্যবহারে এই জাতি ও দেশকে শাসন করবার যোগ্যতা হারিয়েছ। সুতরাং গুরুর পদবী ছেড়ে দিলেও প্রজা হিসাবে আমাকে আদেশ করবার অধিকার আর তোমার নেই।'

ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে বিষ্ণুবর্মণ বললেন, 'এ দেশের রাজা আমি, এখানে আমার ইচ্ছাই ন্যায়। কোন অন্যায় আমি করি না, আমার অধিকার মানুষের শুধু দেহ নয়—ইচ্ছার ওপর, মনের ওপরেও। আপনাকে যেতেই হবে।'

গুরুদেব বললেন, 'হায় অন্ধ! দেশের রাজা বলে তোমার অহঙ্কার! এই নদীটাও তো দেশের অন্তর্ভুক্ত, একে কি তোমার আদেশ পালন করাতে পারো? তুমি কত অসহায়, ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ—কোনটার ওপরই তো তোমার হাত নেই। এই সকলের যিনি রাজা, আমি একমাত্র সেই ঈশ্বরকেই আমার অধীশ্বর বলে মনে করি। তুমি যাও, তোমার আদেশ আমার ওপর প্রযোজ্য নয়।'

রাজা ইঙ্গিত করলেন মোঙ্গল সৈন্যদের। নিমেষে তারা সেই সন্ন্যাসীকে বন্দী করল—একটু পরেই সেই নির্লোভ শান্ত অহিংসাপরায়ণ পরম তপস্বীর শোণিতধারা মেকং নদীর সলিলধারায় গিয়ে মিশল। তাঁর দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ নিয়ে তারা উল্লাস করতে করতে রাজধানীতে ফিরে গেল। রাজাদেশ অবহেলার ফল কি, তা প্রজারা প্রত্যক্ষ দেখুক। ঈশ্বর অদৃশ্য, তাঁকে মানতে গিয়ে, যিনি সশরীরে বিদ্যমান সেই রাজাকে যারা অবহেলা করে, সে নির্বোধদের এমনিই হয়। সবাই দেখুক, রাজা বড় কি ঈশ্বর বড়!

কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্বে, রাজা যখন মহার্ঘ্য পোশাকে সজ্জিত হয়ে নৈশ উৎসবে যাত্রা করছেন, হঠাৎ তাঁর কানে খুব দূরাগত একটা গর্জন এসে পৌঁছল—মেঘের ডাকের মতো কিংবা জলের গর্জনের মতো। তিনি কান পেতে শুনছেন, এমন সময় বিবর্ণ মুখে সঞ্জয় এসে সংবাদ দিলে, 'রাজাধিরাজ, সর্বনাশ হয়েছে, নদীর উৎসব বন্ধ রাখতে হবে—নদীতে বন্যা আসছে।'

'বন্যা আসছে? এমন অসময়ে? সে কি!'

'হ্যাঁ প্রভু। আর এমন প্রলয়ঙ্কর বন্যা আমরা কখনও দেখি নি। মুহূর্তে মুহূর্তে জল বাড়ছে। ঐ শুনুন প্রজাদের আর্তনাদ—উৎসবের আনন্দ-কোলাহল ক্রন্দনরোলে পরিণত হয়েছে।'

সম্রাট ছুটে অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন। সঞ্জয়ের কথা সত্য, এমন বন্যা কেউ কখনও দেখে নি। যেন মনে হচ্ছে মেকং নদী হঠাৎ পথ বদলে একেবারে রাজধানীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। চারিদিক জলপ্লাবিত, তখনও গর্জন করতে করতে পাহাড়ের মতো ঢেউ ভেঙে জল ছুটে আসছে। আসছে তো আসছেই—এত বড় বিশাল পুরীর আর কিছু বোধ হয় জেগে থাকবে না!

বিষ্ণুবর্মণ পাগলের মতো ছুটলেন আত্মরক্ষার জন্য। উৎসবের জন্য যে নৌকো প্রস্তুত ছিল, তারই একটাতে গিয়ে বসলেন; কিন্তু তখন সবাই নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত—রাজা বলে কেউ খাতির করল না। তিনি যে নৌকোতে ছিলেন তাতে আরও বহু লোক এসে আশ্রয় নিলে। ধমক, ভয় দেখানো কিছুতেই কিছু হ'ল না—শেষে এত ভারী হয়ে উঠল নৌকো যে, বন্যার জলের একটা ঢেউ এসে লাগতেই নৌকো উল্‌টে গেল। বিষ্ণুবর্মণ সাঁতার জানতেন কিন্তু সে স্রোতে সাঁতার কাটাও অসম্ভব। শেষে কী একটা ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে দেখে প্রাণপণে গিয়ে সেইটেই আঁকড়ে ধরলেন।

যেটা আঁকড়ে ধরলেন—একটু পরেই বোঝা গেল—সেটা গুরুদেবেরই দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ!

সেই যে বন্যার জল এল সে জল আর গেল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, শতাব্দী গেল—বন্যা আর সরল না। ধীরে ধীরে শহরের চতুর্দিক জলা আর জঙ্গলে ভরে গেল, নিবিড় অরণ্যে ঢেকে গেল সেই বিপুল শহর আর সেই বিরাট মন্দির। এত বড় ঐশ্বর্য এবং শক্তির কোন চিহ্নই রইল না।

এর বহু শতাব্দী পরে এক ওলন্দাজ ভদ্রলোক জলা-জঙ্গলের মধ্যে শিকার করতে গিয়ে হঠাৎ ওঙ্কার বট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিলেন। এত বড় দীর্ঘায়তন মন্দির জলার মধ্যে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে—চামচিকা বাদুড় আর সাপের বাসা হয়ে! আশ্চর্য!

ক্রমে মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে শহরটাও আবিষ্কৃত হ'ল। সবাই অবাক হয়ে গেল এই ভেবে যে, এত বড় শহর কবে এমন ভাবে জঙ্গলে ঢেকে গেল, আবার এমন ক'রে এ শহর ছেড়ে দেশের লোক পালালই বা কেন? শহর পুরনো হলে এক সময়ে মাটির নীচে ঢাকা পড়ে কিন্তু এর বাড়ি-ঘর যে এখনও ঠিক রয়েছে, এমন কি কতক বাড়ি তৈরী হতে হতে সেই অর্ধসমাপ্ত অবস্থাতেই থেকে গেছে যে!

কেন এমন হ'ল—কী করে এমন হ'ল?—এই প্রশ্ন সবাই আজও করছে। কিন্তু জবাব কেউ পায় না।

পাশুপত অস্ত্র

তোমাদের মধ্যে যারা খবরের কাগজ পড়ো তারা নিশ্চয়ই দেখেছো যে, কিছুদিন আগে পশ্চিম-মধ্য-ভারতে প্রাচীন মাহিষ্মতী নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। পণ্ডিতেরা বলেছেন যে, এই আবিষ্কার ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা মহাবিপ্লব এনেছে। কারণ মাহেন-জো-দাড়ো এবং হরপ্পা এই দুটি শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে এইটুকু শুধু প্রমাণিত হয়েছিল যে, পাঁচ-ছ হাজার বছর আগে অন্ততঃ সিন্ধুর তীরে তীরে একটা প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এতে, আমাদের প্রাচীন ঐতিহাসিক মতবাদ যেটা, অর্থাৎ আর্যরা বাইরে থেকে এসে ঐ সিন্ধুর ওপারেই প্রথম তাদের সভ্যতা বিস্তার এবং উপনিবেশ স্থাপন করে, সেইটাই সমর্থিত হয়। কিন্তু মাহিষ্মতী একেবারে ভারতের মধ্যভাগে, সুতরাং এখানে যদি অন্ততঃ দু'হাজার বছরের পুরাতন একটি শহরের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়, তাহ'লে ইতিহাসটা একটু উল্টে পাল্টে যায় বইকি! একদিন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা ভারতবর্ষীয় সভ্যতাকে আড়াই হাজার বছরের বেশি বলে মানতেই চাইতেন না, তারপর রাখালদাসবাবুর যত্নে ও তদ্বিরে মাহেন-জো-দাড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ বার হতে অতি কষ্টে এইটুকু মেনেছিলেন যে, সিন্ধুর পশ্চিমে পাঁচ হাজার বৎসর আগে একটা সভ্যতা ছিল, তবে বাকি সারা ভারতবর্ষটা ছিল অন্ধকার। কিন্তু এইবার তাঁরা আরও ঘাবড়ে যাবেন। এত আগে মধ্য-ভারতে যখন এমন একটা রীতিমতো শহর গড়ে উঠেছিল তখন সে সময়ে সারা ভারতটাই সভ্য ও সংস্কৃতিযুক্ত ছিল, এটা মানতেই হবে। খুব সম্প্রতি আবার সিন্ধুর এপারেও রাজপুতানার মধ্যে আর একটি ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে—যা অন্তত মাহেন-জো-দাড়োর সমসাময়িক।

কিন্তু এসব তো গেল ইতিহাসের কচকচি। আমরা ভাবছি কি জানো? ভাবছি, এতবড় শহরটা এমন ক'রে মাটির নীচে চাপা পড়ে গেল কি ক'রে? এ রকম শহর-কে-শহর মাটির নীচে বিস্মৃতির নীচে চাপা পড়ে যাবার ইতিহাস অবশ্য আরও আছে। প্রাচীন কাম্বোজ সাম্রাজ্যের রাজধানী হঠাৎ মেকং নদীর বন্যায় রাতারাতি জলাভূমিতে পরিণত হয়। মধ্য এশিয়ার কয়েকটি শহর মরুভূমির বালুরাশির তলায় চাপা পড়ে যায় প্রাকৃতিক বিপ্লবে। পম্পিয়াই শহর বিসুবিয়াসের তরল ধাতু-স্রোতে ডুবে গিয়েছিল। মাহেন-জো-দাড়ো শহরটিও হঠাৎ জলশূন্য হয়ে যায় প্রচণ্ড ঝড়ে কিংবা বন্যায় বালি চাপা প'ড়ে, এই রকম অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু এখানে সে রকম কোন সম্ভাবনাই নেই, যেহেতু আশেপাশে এখনও অসংখ্য জনপদ আছে, শস্যশ্যামলা মাটি চারিদিকে। তবে শহরের কিছুটা পরিত্যক্ত হয়ে মাটি-চাপা পড়তে পারে, সেখান থেকে বর্তমান শহর একটু পাশে সরে যেতে পারে—যেমন কাশীতে বা দিল্লীতে দেখা যায়—হয়ত বা যেমন বৃন্দাবনেও হয়েছে, কিন্তু এমন ক'রে শহরের চিহ্নমাত্র মুছে যাওয়া সম্ভব হয় কি ক'রে? শহর পুরনো হ'লে যে সবাই সেটা ছেড়ে একসঙ্গে চলে যাবে, এমন কখনও হয় না। কাশী তো কম পুরনো নয়, শুধু

আমাদের দেশেই নয়, অন্য সভ্য দেশেও যেসব প্রাচীনতম পুঁথি পাওয়া যায় তাতে কাশীর উল্লেখ আছে। কিন্তু তবু কাশী আজও তো মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

এক হতে পারে শত্রুর হাতে যদি ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকে! কিন্তু সে ইতিহাস কই? প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ঠিক ঐ শ্রেণীর বর্বরতা চলত না। যুদ্ধক্ষেত্রকে বলা হল ধর্মক্ষেত্র—অকারণ হত্যা কিংবা লুণ্ঠন তখন ক্ষত্রিয়রা ভাবতেই পারতেন না।

তবে?

তবে যে গল্প বলছি শোন। ইচ্ছা হয় বিশ্বাস ক'রো, না হয় ক'রো না, কিন্তু যতক্ষণ না ঐতিহাসিকরা অন্য কথা বলেন বা প্রমাণ বার করেন, ততক্ষণ এই গল্পটা বিশ্বাস করতে দোষ কি?

সে অনেক দিনের কথা। পাণ্ডবরা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন তখন নীলধ্বজ ছিলেন মাহিষ্মতীর রাজা। তাঁরই ছেলে প্রবীর অর্জুনকে বাধা দিতে গিয়ে অর্জুনের হাতে নিহত হয়। প্রবীরের মা জনা ছিলেন খুব বড় বীরাঙ্গনা। তখনকার দিনে ভারতের নারীরাও সকলের শ্রদ্ধা ও ভয়ের পাত্রী ছিলেন, জনাই তার বড় প্রমাণ। এই প্রবীরেরই কয়েক পুরুষ পরে এক রাজা মাহিষ্মতীর সিংহাসনে বসলেন, তাঁর নাম—ধরো যুধাজিৎ। যুধাজিৎই মাহিষ্মতীর শেষ রাজা।

যুধাজিৎ সিংহাসনে বসে দেখলেন যে মাহিষ্মতী বড় ছোট রাজ্য—তাঁর মতো এত বড় রাজার পক্ষে রাজ্যটা নিতান্ত ক্ষুদ্র। এর সঙ্গে আর একটা ছোট রাজ্যও যদি জুড়ে নেওয়া যায়, তাহলে তাঁর মর্যাদা অন্ততঃ কতকটা রক্ষা পায়। কথাটা ভাবতেই তাঁর নজর পড়ল আশেপাশের ছোট ছোট রাজ্যগুলির দিকে। তিনি ভেবে দেখলেন যে, এক অবন্তী ছাড়া তাঁর দেশের কাছে আর তেমন কিছু নেই। অবন্তী রাজ্যের সীমা তাঁর সীমানার গায়েই লাগা, সুতরাং সবটা টেনে নিতে পারলে ব্যাপারটা মন্দ দাঁড়ায় না। তাছাড়া, মনে মনে একটা রাগও ছিল তাঁর অবন্তীর ওপর। ভাল তুলো মাহিষ্মতী আর অবন্তী এই দুটো দেশেই হ'ত তখন। কিন্তু মাহিষ্মতীর তুলোওয়ালারা ভাল দাম পেত না কোথাও অবন্তী' ন্য। অবন্তীর তুলো নাকি মাহিষ্মতীর চেয়ে অনেক ভাল অথচ দাম কম। এই সুযোগে সে শোধও নেওয়া হবে।

কথায় বলে দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। যুধাজিৎ অবন্তীর রাজাকে বলে পাঠালেন যে, যেহেতু মাহিষ্মতীর তুলোওয়ালাদের মাল বিক্রীর বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে, সেই হেতু তিনি যেন আগামী দুই বৎসর তুলো উৎপাদনে বিরত থাকেন! আর তিনি যদি এটা না করেন, তাহ'লে যুধাজিৎ বাধ্য হবেন অবন্তী আক্রমণ করতে।

বলা বাহুল্য, অবন্তীর রাজা এই অদ্ভুত প্রস্তাবে আমল দিলেন না, বরং এটাকে ধৃষ্টতা বলেই মনে করলেন। যুধাজিৎ এই সুযোগই খুঁজছিলেন অবন্তীরাজের এই জিদকে অন্যায় ও অসঙ্গত আখ্যা দিয়ে তিনি অবন্তী আক্রমণ করলেন।

কাজটাকে তিনি যতটা সহজ ভেবেছিলেন, যুদ্ধে নেমে দেখলেন মোটেই ততটা সহজ নয়। অবন্তী ঐটুকু দেশ বটে, কিন্তু তার শক্তি অসাধারণ। সৈন্যগুলোর অদ্ভুত সাহস, প্রাণের

ভয় একেবারে নেই। তাছাড়া তাদের খরচও কম। মাহিষ্মতীর সেনারা রীতিমতো বাবু, তাদের খাবার চাই ভালো, পোশাক চাই—বিছানার ব্যবস্থা চাই। অবন্তীর সেনারা ঘাস খেয়ে লড়াই করে। তাছাড়া ওখানকার প্রত্যেকটি লোক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেশের স্বাধীনতা কিছুতেই যেতে দেবে না তারা। তাদের ভাব দেখে যুধাজিতের মনে হ'ল যে, অবন্তীর একটি লোকও বেঁচে থাকতে অবন্তী জয় করার কোন সম্ভাবনা নেই। মাহিষ্মতীর সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে আগে দেখে কি ক'রে তারা নিজেরা নিরাপদ থাকবে আর অবন্তীর সেনারা এসেই দেখে কি করে তারা শত্রুসৈন্য মারবে। নিজের কথাটা একবারও ভাবে না তারা। এমন লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়?

যুধাজিৎ বিষম ফাঁপরে পড়লেন। সৈন্য নেই, রসদ নেই—এমনি একটা অবস্থা এসে দাঁড়াল এক সময়ে। এ যুদ্ধ জিততে এত সময় লাগবে তা ভাবেন নি আগে, সে রকম ভাবে প্রস্তুতও হন নি। এখন হয়েছে কতকটা তাঁর মানের কান্না—তাও বোধ হয় তিনি নিজের সম্মান বিসর্জন দিয়েও যুদ্ধ ছেড়ে দিতেন, যদি না ভয় থাকত যে অবন্তীরাজ অত সহজে ছাড়বেন না। তিনি ওদের রাজ্যটা কেড়ে নিতে গিয়েছিলেন এ কথাটা অবন্তীর মনে আছে, সে প্রমাণ দেবে তারা মাহিষ্মতীটা কেড়ে নিয়ে।

এই যখন বিপদ, সেই সময়ে যুধাজিতের কানে গেল তাঁরই রাজধানীর একপ্রান্তে তপোবন কুটীরে বাস করেন রাঘবাচার্য, তিনি নাকি সূর্যরশ্মি থেকে কি এক অস্ত্র বার করেছেন। তাতে পলকে প্রলয় আনতে পারে। একটা শহর ধ্বংস করতে সে অস্ত্রে এক মুহূর্তই যথেষ্ট!

কথাটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু তখন আর অত বিবেচনা করার সময় ছিল না। যুধাজিৎ তখনই নিজে গিয়ে হাজির হলেন রাঘবাচার্যের কুটিরে।

'আচার্য, এ কি সত্যি? আপনি এমন অস্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা প্রলয় ঘটাতে পারে?'

আচার্য হাসলেন, সবিনয়ে বললেন, 'আমি কিছুই করি নি বৎস—এ অস্ত্র বহুদিনের। পাশুপত অস্ত্রের নাম শুনেছ? শিব যা অর্জুনকে দিয়েছিলেন? এ সেই অস্ত্র। হঠাৎ আমার মনে হ'ল যে, এ অস্ত্র বোধ হয় তৈরী করা যায়! যা পড়াশুনা ছিল যৎসামান্য, তারই সাহায্যে লেগে গেলাম গবেষণায়, তারপর বহু চেষ্টা ক'রে বহুবার বিফল হয়ে কৌশলটাকে আয়ত্ত করেছি। ঐ যে দেখছ যন্ত্রটি, ওর নাম মার্তণ্ডচক্র, ওতে করে সূর্যরশ্মির তেজ সংহত করা যায়, তা থেকে নানা রশ্মি ভাগ ক'রে নিয়ে, বিচিত্র বস্তু ও শক্তির সংমিশ্রণে এই অস্ত্রটি তৈরী। এমন কিছু নয়—দেখবে বৎস? আমার প্রথম অস্ত্রটি সম্পূর্ণ হয়েছে—'

আচার্য সযত্নে এবং সস্নেহে এক বিচিত্র ধাতু-নির্মিত অস্ত্র তুলে দেখালেন। সামান্য একটা রম্ভার মতো আকৃতি, সেই রকমই গঠন।

রাজা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এই অস্ত্রের এত শক্তি—তা এর প্রয়োগকৌশল কি?'

'কিছুই না।' হেসে বললেন আচার্য, 'একটি তীরের সঙ্গে একে আটকে দূর থেকে শত্রুর দিকে ছুঁড়বে, তারপর সে তীরটি মাটিতে পড়বার আগেই নিপুণহাতে আর একটি তীর মেরে এই ধাতুর বস্তুটিকে ফাটিয়ে দেবে—তাহলেই হল!'

রাজা তবু বিস্মিত হয়ে আছেন দেখে আচার্য তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারলেন। বললেন, 'এইটুকু অস্ত্রের এত শক্তি শুনে বিস্মিত হচ্ছ কেন বৎস? সূর্যরশ্মিই হচ্ছে পার্থিব সমস্ত শক্তির মূল। সেই রশ্মির সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যেমন, ধ্বংসাত্মক শক্তিও তেমনি। আমি রশ্মির মধ্য থেকে মার্তণ্ডচক্র যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বংসাত্মক শক্তিটুকুই আলাদা করে নিয়েছি। তারপর সেই শক্তিকে নানা উপাদান এবং বিচিত্র প্রণালীর সাহায্যে বহু সহস্র গুণে শক্তিশালী ক'রে তুলেছি। ঘর বাড়ি মানুষ তো মোটা কথা মহারাজ, কয়েক কোটি পরমাণু দিয়ে একটি অণু নির্মিত, আবার কয়েক কোটি অণুতে একটি বালুকণা। আমার এই অস্ত্র সেই বালুকণাকে লক্ষ কোটি ভাগে বিভক্ত ক'রে তার মধ্যের পরমাণুর প্রাণশক্তি পর্যন্ত হরণ করতে পারে!'

যুধাজিৎ মুগ্ধ নেত্রে চেয়েছিলেন। সমস্তটা শোনার পর প্রণাম ক'রে বললেন, 'ঐ অস্ত্রটি আমাকে দিতে হবে প্রভু!'

আচার্য যেন কতকটা ভয় পেয়েই তাড়াতাড়ি সেটা সরিয়ে নিলেন। বললেন, 'সে কি, তুমি ও অস্ত্র নিয়ে কি করবে?'

যুধাজিৎ বললেন, 'আপনি কি জানেন না যে আজ দু-তিন বছর অবন্তীর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ চলেছে? মাহিষ্মতীর মান এবং প্রাণ দুই-ই যায় যায়! আপনার এই অস্ত্রে আপনারই দেশের শত্রু বিনষ্ট হবে।'

আচার্য বললেন, 'কিন্তু বৎস, তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ যে, পাশুপত অস্ত্র দেবার সময় শিব অর্জুনকে বলে দিয়েছিলেন যে, একমাত্র দেবতা ও দানবের যুদ্ধেই তা প্রয়োগ করতে। সাধারণ মানুষের ওপর প্রয়োগ করলে প্রয়োগকারীকেসুদ্ধ বিনষ্ট করবে। এ অস্ত্র যুদ্ধ-ব্যবসায়ীদের জন্য নয় বৎস, সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছাড়া, যাঁরা পৃথিবীর কাউকেই শত্রু মনে করেন না, তাঁদের হাতে ছাড়া এ অস্ত্র আর কারুর হাতে থাকা উচিত নয়। যে নিষ্কাম মনে মানবজাতির কোন বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য, রোষলেশশূন্য-চিত্তে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে, সে-ই এ অস্ত্রের অধিকারী।'

অসহিষ্ণু যুধাজিৎ মাটিতে পা ঠুকে বললেন, 'অত বিবেচনার সময় আমার নেই। আপনার দেশ শত্রু পদদলিত হবে এইটেই কি আপনি চান? প্রত্যেক দেশবাসীরই উচিত, যে কোন কৌশলে দেশের শত্রুকে বিনষ্ট করা!'

কঠিন-কণ্ঠে রাঘবাচার্য উত্তর দিলেন, 'যুদ্ধ তুমি বাধিয়েছিলে নিজের খেয়ালমত, নিজের শক্তি না বুঝেই। তখন কি আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলে? আজ সে হঠকারিতার ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে। যেমন করে পারো শত্রুকে তুমি পরাজিত করো। এসব সামান্য ব্যাপারের জন্য আমার এ অস্ত্র নয়। এই অস্ত্রেই দেবাদিদেব প্রলয়কালে সমস্ত কিছু ধ্বংস করেন। এ থেকে যে কত কী হতে পারে, সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই। একটা বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস তো হবেই—এ থেকে সমস্ত দেশ, এমন কি সারা পৃথিবীর প্রলয় আসাও বিচিত্র নয়। এ অস্ত্র প্রয়োগ করা শক্তিমানের কাজ, সর্বত্যাগী ঋষির কাজ, তোমার মতো স্বার্থপর ভোগবিলাসপরায়ণ ক্ষত্রিয়ের কাজ নয়।'

অস্ত্রের গুণ শুনে লোভে ও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিতে যুধাজিতের চোখ জ্বলছিল। তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'আপনার কাছে তত্ত্বকথা শুনতে আসিনি। আপনি আমার প্রজা, প্রজার সব জিনিসেই রাজার অধিকার আছে। বিশেষতঃ এমন আপৎকালে। আমি আদেশ করছি, ঐ অস্ত্র আমাকে দিন।'

চক্ষের নিমেষে তরবারি বসিয়ে দিলেন রাঘবাচার্যের বুকে

'কখনও না।' পাশুপত অস্ত্রটি বুকে চেপে ধরে রাঘবাচার্য বললেন, 'মানুষের এত বড় সর্বনাশ আমি প্রাণ থাকতে করতে দেব না। এ তো যুদ্ধ নয়, এতগুলো নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হবে—সে আমি হতে দেব না।'

অকস্মাৎ কোষ থেকে তরবারি খুলে নিয়ে যুধাজিৎ বললেন, 'আমার এবং আমার দেশের সম্মান এমন জায়গাতেই এসে দাঁড়িয়েছে যে, পাপপুণ্য, ন্যায়-অন্যায় বিচার করার সময় আর নেই। ও অস্ত্র আমার চাই-ই—আপনি যদি দেন তো ভালই, নইলে আমি জোর করে নেবো।'

রাঘবাচার্যেরও দৃষ্টি কঠিন হয়ে এল। তিনি বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণ, তা জানো?'

'কিছু জানবারই অবকাশ নেই। অতগুলি লোককে যে হত্যা করতে পারে, একটি

ব্রহ্মহত্যাকে তার এমন কি বেশি ভয়?' কর্কশ কণ্ঠে বললেন যুধাজিৎ, 'দিন, আর অপেক্ষা করতে পারি না।'

রাঘবাচার্য পাশুপত অস্ত্রটি মুঠো ক'রে ধরে বললেন, 'পাপিষ্ঠ, মনে রাখিস পাশুপত অস্ত্র এখনও আমারই হাতে। যদি প্রলয় আনতেই হয়, যদি প্রাণ দিতেই হয় তো আমিই তা প্রয়োগ করে যাবো।'

তিনি এর মধ্যে এক-পা এক-পা ক'রে পিছিয়ে মার্তণ্ডচক্রের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর অভিপ্রায় ঠিক কি ছিল তা ভেবে দেখা তখন সম্ভব নয়। নিজের প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে যুধাজিৎ চক্ষের নিমেষে তরবারি বসিয়ে দিলেন রাঘবাচার্যের বুকে, তারপর তাঁর অনড় দেহ মার্তণ্ডচক্রের ওপর এলিয়ে পড়ার আগেই হাত থেকে অস্ত্রটি কেড়ে নিলেন।

আচার্য বিস্ফারিত চক্ষু অস্ত্রের ওপর নিবদ্ধ ক'রে বার-দুই কী যেন বলতে গেলেন, তার মধ্যে শুধু 'প্রয়োগ' শব্দটা যুধাজিৎ বুঝতে পারলেন। হয়ত প্রয়োগের আরও কোন বিশেষ কৌশল আছে, সেই কথাটাই আচার্য জানাতে চাইছিলেন। অনধিকারী যে, প্রয়োগ করতে গিয়ে সে পাছে কোন বিপদে পড়ে সেইটাই ছিল সেই শেষ মুহূর্তেও আশঙ্কা। যে অন্যায় ভাবে হত্যা করলে তার বিপদের কথাটাই অন্তিমকালে হয়ত ব্রাহ্মণের প্রথম মনে হয়েছিল, কিন্তু সে কথা জানাবার আগেই তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল। বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত মহারাজেরও তখন সেদিকে মন দেবার সময় ছিল না। তিনি তখনই রথে চড়ে বায়ুগতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে নিজের প্রাণের ভয়টা শেষ পর্যন্ত প্রবল হয়ে উঠলো। তিনি সে কথা গোপন ক'রে এক সেনাপতিকে ডেকে মোটামুটি প্রয়োগবিধিটা বলে দিলেন। তারপর নিজে বহুদূরে গিয়ে বনের মধ্যে থেকে ফলাফল দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শত্রুপক্ষের ব্যূহ ও শিবির অনেক দূরে। নিজেরা নিরাপদই আছেন ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে সেনাপতি অদ্ভুতকর্মা অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। যুধাজিৎ মনে মনে অস্ত্রের ফলাফল সম্বন্ধে সব চেয়ে বীভৎস যে ছবি এঁকে রেখেছিলেন, তার সঙ্গে কিছুই মিললো না—কি কি দেখলেন তা অবশ্য তাঁর পক্ষে মনে করাও সম্ভব নয়, কারণ যা দেখলেন তাতে মুহূর্তের মধ্যে স্থান-কাল-ঘটনার সমস্ত হিসাব মাথায় তালগোল পাকিয়ে গেল। মনে হল যেন একসঙ্গে একই স্থানে সহস্র বজ্রপাত হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে বিরাট একটা অগ্নির সমুদ্র পর্বতপ্রমাণ ঢেউ তুলে উত্তাল হয়ে উঠলো। সেই প্রলয়ঙ্কর বহ্নিবন্যায় সারা পৃথিবীই যেন ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে!

রাজা আর দেখতে পারলেন না। যতদূর দৃষ্টি যায়, সেই আগুনের স্রোত দেখে তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে এল। তাছাড়া এক মুহূর্ত ছাড়া দেখার অবসরও পেলেন না, অস্ত্র নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে যে শত শত দানবের দাপাদাপি শুরু হয়েছিল, সে যেন প্রলয়ের ঝড়! সেই প্রচণ্ড ঝড়ের ঘূর্ণিতে তাঁকে সেখান থেকে মহাশূন্যে উড়িয়ে সাত যোজন দূরে নিক্ষেপ করলে। তারই আঘাতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

যখন জ্ঞান হল তখন দেখলেন যে সর্বাঙ্গে ব্যথা, আঘাতে মাথা-গা কেটে গেছে। চোখে

তখনও ঝাপসা দেখছেন, কানে সেই প্রচণ্ড শব্দে যে তালা ধরেছে তা এখনও ছাড়ে নি। কোথায় এসেছেন তা জানেন না, গভীর বনে পথ বলে দেবে এমন লোক নেই।

তবু তাঁকে উঠতে হ'ল। ক্লান্ত অবসন্ন পা টেনে টেনে বনের ফল ও ঝরণার জল খেয়ে জীবনধারণ ক'রে বহু পথ ঘুরে এক সময়ে মাহিষ্মতী যাবার পরিচিত পথ খুঁজে পেলেন। পথে যাদের সঙ্গে দেখা হ'ল তারা কেউ এই ছিন্নবেশ ভিখারীকে রাজা বলে চিনতে পারলে না। যুধাজিৎও চেনা দিলেন না। এ অবস্থার কথা কেউ না জানে তাই ভাল। অবন্তীর সেনারা গেছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরও সমস্ত বাহিনী যে নিশ্চিহ্ন হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড তাঁরই অবিমৃষ্যকারিতায় ঘটেছে—কোন্ লজ্জায় তিনি মানুষের কাছে পরিচয় দিয়ে সাহায্য চাইবেন? তার চেয়ে এই ভাল। এই বিপদের সম্বন্ধেই খুব সম্ভব আচার্য সাবধান করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু সে সব কথা ভাবতেও ভাল লাগে না।—থাক্!

যাই হোক—অবশেষে একসময় পথ চিনে চিনে মাহিষ্মতীর দ্বারদেশে পৌঁছলেন যুধাজিৎ। কিন্তু একি? নগরীর প্রবেশপথে ভিড় নেই কেন? জনতার চিহ্নমাত্র নেই—এ তো কখনও হয় না! এমন সকালে সার্থবাহের দল যে প্রবেশপথে ভিড় করে প্রত্যহ। তবে? প্রহরীরাই বা কোথায়? সমস্ত পুরী এমন প্রেতপুরীর মতো নিঃশব্দ এবং স্তব্ধ কেন? তবে কি, তবে কি এখানে তাঁর মৃত্যুসংবাদই এসে পৌঁছেচে, তাই পুরী এমন শোকার্ত?

তিনি জোরে জোরে এগিয়ে গেলেন। নগরীর মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন, সেখানেও কোন লোক নেই। জনহীন তো বটেই, সম্পূর্ণরূপে প্রাণিহীন; কুকুর বেড়াল এমন কি কাক পর্যন্ত কোথাও দেখতে পেলেন না। একি ব্যাপার! তিনি ঠিক মাহিষ্মতী পুরীতেই এসেছেন তো? নাকি কোন দানবসৃষ্ট মায়ালোকে এসে পড়লেন? না—ঐ তো বড়বাজারটা, ওটা তো বিশেষ পরিচিত তাঁর। কিন্তু বাজারেও কেউ নেই যে! ব্যাকুল হয়ে রাজা বাজারের মধ্যে ঢুকলেন।

সম্পূর্ণ জনহীন। প্রাণের লক্ষণ কোথাও নেই। কিন্তু এইবার একটা জিনিস তাঁর চোখে পড়ল। এতক্ষণ দেখেছেন কতকগুলো শুকনো কালো কালো কি পড়ে আছে পথের দু'ধারে, তবু লক্ষ্য করেন নি—এখন দেখলেন, আবলুসের মতো কালো এবং এক হস্ত পরিমিত কতকগুলো পদার্থ, কিন্তু সেগুলো মনুষ্যাকৃতি। যেন মানুষই কী এক প্রচণ্ড তাপে শুকিয়ে, কুঁকড়ে, পুড়ে ছোট হতে হতে ঐ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাজারের মধ্যেও ঐ রকম মূর্তি অসংখ্য। খালি বাড়ি যেগুলো খাঁ খাঁ করছে, তার মধ্যেও—অর্থাৎ তাঁর বড় সাধের মাহিষ্মতীপুরীর প্রজাদের ঐটুকু মাত্র চিহ্নই আছে। রাজা আর ভাবতে পারলেন না, তাঁর ধারণাশক্তি অবশ হয়ে এল, তিনি হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন।

যুধাজিতের আর ভয় নেই, তিনি পাগল হয়ে গেছেন। অনুশোচনা ও চিন্তা আর তাঁকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানো?

রাঘবাচার্যের দেহ মার্তণ্ডচক্রে পড়ে যন্ত্রের মুখটি যে আল্‌গা হয়ে গিয়েছিল তা রাজা তখন লক্ষ্য করেন নি। তার ফলে সূর্যরশ্মির সংহতশক্তি একটু একটু ক'রে বেরিয়ে সমস্ত দেশ এমনিভাবে পুড়িয়ে দিয়েছে।

সুবর্ণের সন্ধানে

সে অনেক দিন আগেকার কথা। এখন থেকে অন্ততঃ দু হাজার বছর তো বটেই।

ভারতবর্ষের পূর্বদিকে তোমাদেরই মতো একটি ছেলে ছিল—শান্তদাস বা সানুদাস তার নাম। তোমাদেরই মতো তারও পড়াশুনো তেমন ভাল লাগত না, গুরুগৃহে বসে সামনে পুঁথি খুলে রেখে আন্‌মনে কী যেন সব ভাবত, চোখ থাকত দূরে বনভূমির দিকে। বকুনি খেত এর জন্য নিশ্চয়ই, তবু স্বভাব বদলায় নি।

কি ভাবত?

কি ভাবত, তা তাকে জিজ্ঞাসা করলে বোধ হয় সেও বলতে পারত না। শুধু এইটে জানত যে, এই শান্ত জীবন, এই নিয়মিত পড়াশুনো তার ভাল লাগে না। ঐ পরিচিত বনরেখার বাইরে যে পৃথিবী পড়ে আছে, তার এই ছোট গ্রামখানির বাইরেকার বিশাল পৃথিবী তাকে যেন অনবরত আকর্ষণ করে—নতুন দেশ, নতুন মানুষ দেখার নেশা তাকে পেয়ে বসে। কি হবে এই শুকনো পুঁথির পাতা মুখস্থ ক'রে?

হঠাৎ ওর কানে গেল গুরু পড়াচ্ছেন অন্য ছাত্রদের, 'এই যে জম্বুদ্বীপ, যার মধ্যে তোমরা বাস করছ, এর তিন দিক ঘিরে রয়েছে যে সমুদ্র, তার বুকে এরকম আরও বহু দেশ আছে। আমাদের কাছেই আছে অঙ্গদ্বীপ, যবদ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ, বরাহদ্বীপ, কৈরদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ—এমনি আরও কত! সমুদ্রের বাধা প্রায় অলঙ্ঘ্য কিন্তু যদি কোন দিন তোমাদের কেউ তাকে শাসন করতে পারো তো এইসব অচেনা দেশ দেখে এসো—'

সুবর্ণদ্বীপ!

শান্তদাস চম্‌কে উঠল। সুবর্ণ মানে তো সোনা! সে কি তবে সোনার দেশ? সবিনয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল শান্তদাস, 'গুরুদেব, সুবর্ণদ্বীপ কি সত্যিই সোনা দিয়ে তৈরী?'

'না বৎস', শান্তকণ্ঠে উত্তর দেন গুরুদেব, 'মাটিরই দেশ সেটা, তবে সেখানকার মাটিতে বালুকণায় নাকি সোনা মেশানো আছে। সেইজন্যই তার নাম সুবর্ণদ্বীপ বা সুবর্ণভূমি।'

তিনি আবার ছাত্রদের পড়ায় মন দিলেন কিন্তু শান্তদাসের আর মন বসল না সেখানে। সে উঠে আশ্রমের বাইরে চলে এল একেবারে। সুবর্ণভূমি—সেখানকার মাটিতে সোনা আছে? না জানি সে কেমন দেশ! সে দেশ তো তাকে দেখতেই হবে, যেমন ক'রে হোক। নইলে বেঁচে থাকাই বৃথা।

ঘর-বাড়ি ছেড়ে শান্তদাস বেরিয়ে পড়ল সেইদিনই। সোজা চলে গেল সে সমুদ্রতীরে, পথ জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে। সমুদ্র দুর্লঙ্ঘ্য নয়। সে শুনেছিল যে, এক রকম যান তৈরি ক'রে কেউ কেউ সমুদ্রে পাড়ি দেয়, তারা ঘুরেও আসে প্রাণ নিয়ে। সেরকম কি কারুর দেখা পাবে না সে চেষ্টা করলে?

সমুদ্রতীরে পৌঁছেও সে পাগলের মতো হাঁটতে থাকে। প্রতিদিন আর কেউ সমুদ্রযাত্রা

করে না, যদি-বা সেরকম কোন দুঃসাহসীর দেখা পায় তো—সে শান্তদাসের কথায় কান দেয় না। অজানা সমুদ্র, তার মধ্যে অচেনা দ্বীপ—পাগলের মতো তো বকলেই হয় না! কে যাবে ওর কথা শুনে প্রাণ দিতে? সোনা? আমাদের দেশেই বা তার অভাব কি?

কিন্তু শান্তদাস তবু হাল ছাড়ে না। সমুদ্রতীর ধরেই ক্রমাগত দক্ষিণে এগিয়ে যায় সে। দিনের পর দিন কাটে—তবু হতাশ হয় না। পণ ওর দৃঢ়তরই হয়।

অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে একদিন দেখা হল ওরই মতো একদল ভবঘুরের সঙ্গে। তাদের সর্দার অচির সব কথা মন দিয়ে শুনলে। চোখ তারও জ্বলে উঠল কল্পনায় সেই সোনার দেশ দেখে। মন্দ কি! ঘুরেই আসা যাক না একবার! সোনার দেশে পৌঁছে মুঠি মুঠি সোনা তুলে বস্তা বোঝাই করবে ওরা—আর ওদের পায় কে!

সবাই মিলে চেষ্টা করে প্রাণপণে এক ভেলা তৈরি করলে। বিরাট ভেলা—ছোটখাটো জাহাজ একটা। তাতে নিলে খাদ্য আর জল আর অস্ত্র। তারপর শুভদিন দেখে শীতকালের এক শান্ত দিনে বেরিয়ে পড়ল ওরা, উত্তরের বাতাসে পাল তুলে দিয়ে।

দীর্ঘ, বিপদসঙ্কুল পথ। দিক্-নির্ণয়ের ভাল যন্ত্র নেই। রাত্রে ভরসা ধ্রুবতারা—দিনে সূর্য। কোন মানচিত্র জানা নেই। ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ধারণা আছে একটা। দেশটা আছে কি নেই তাই বা কে জানে? ওরা চলেছে শুধু জনশ্রুতির ওপর ভরসা ক'রে—শুনেছে যে, এত সহস্র যোজন দক্ষিণে গিয়ে এত সহস্র যোজন পূর্বে যেতে হবে। ঝড়জল, খাদ্যাভাব—সব তুচ্ছ করে তবু ওরা সেই জনশ্রুতির পথেই চলেছে। পিছনে ওদের কোন টান নেই—গতি ওদের সামনে। অজানাকে জানতে হবে, বিপদকে জয় করতে হবে, এই ওদের সাধনা।

অবশেষে একদিন ওদের তরী একটা তীরে এসে ভিড়ল। সেইটেই সুবর্ণ দেশ কিনা জানা নেই ঠিক, তবু আর চলারও ক্ষমতা নেই তখন। তাছাড়া ওদের মন বলল, এইটাই সেই দেশ, যার জন্য জীবন পণ করে বেরিয়েছে!

নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা, উত্তুঙ্গ পাহাড় দিয়ে ঘেরা দেশ। কাছাকাছি কোন মানুষ নেই—কোথাও কোন ঘরবাড়ির চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না। হয়তো বা এই প্রথম মানুষের পায়ের ছাপ পড়ল ওর সমুদ্রবেলায়।

সেই পাহাড়ের দিকে চেয়ে অচিরের মুখ শুকিয়ে উঠল। এখানকার বালুকণায় তো অন্ততঃ সোনা নেই, ভেতরে আছে কিনা কে জানে! কিন্তু ভেতরে যায় কেমন করে ওরা? পথ কই? এই খাড়া পাহাড় পেরোতে পারলে হয়তো পথ আছে, হয়তো সোনার মাটিও দেখা পাবে, কিন্তু পাহাড়ের বুকে তো কোন পথ নেই!

শান্তদাস তবু দমল না। ও অচিরকে অভয় দিয়ে বললে, 'রসো, আমি ব্যবস্থা করছি।'

সে জাহাজ থেকে গোটাকতক বড় বড় গজাল পেরেক জোগাড় ক'রে নিয়ে এল। আর আনল খানিকটা লম্বা দড়ি। পাহাড়ের বুকে প্রাণপণে একটা ক'রে পেরেক পোঁতে, তারপর সেই পেরেকে দাঁড়িয়ে আরও উঁচুতে পেরেক পোঁতে, আবার তাতে দাঁড়িয়ে নিচের পেরেকটা খুলে নিয়ে ওপরে পোঁতে। এমনি ক'রে ক'রে ও চলে এগিয়ে। ওর কোমরের সঙ্গে দড়িটা

বাঁধা আছে, সেই দড়ি ধরে ধরে বাকী সবাই এগোয়। কারুরই পড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই, পা পিছলে গেলেও দড়ি ধরে সামলে নেয়।

এইভাবে অতিকষ্টে শেষ পর্যন্ত ওরা পাহাড় পার হ'ল। কষ্টের শেষ নেই—এক এক জায়গায় এমনও ছিল যেখানে পেরেক পুঁতে দাঁড়ানো যায় না;—সেখানে চার হাত-পা দিয়ে পাথর আঁকড়ে বুকে হেঁটে হেঁটে পার হতে হয়। কোথাও বা পাহাড়ের বেত-ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সেই বেত ধরে ধরে এগোয়। কিন্তু অত কষ্ট ক'রে এপারে এসে যা দেখলে তাতে মুখ শুকিয়ে গেল। পাহাড়ের ঠিক নিচে দিয়ে খরস্রোতা পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে। ওরা জাহাজ থেকে ভেলা তৈরীর কোন সরঞ্জামই নিয়ে আসে নি, তা ছাড়া যা স্রোত, কোন ভেলাই টিকত না।

এখন উপায়?

শান্তদাসই উপায় বলে দিলে। নদীর ওপারে নিবিড় বাঁশবন। বিরাট বাঁশগুলো ঝড়ের বেগে এক-একবার নদীর ওপরে নুয়ে পড়ছে আবার পরক্ষণেই সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নুয়ে পড়বার সময় তাদের ডগাগুলো এপার পর্যন্ত চলে আসছে এক-এক সময়। ওরা সেই মুহূর্তকাল সময়ের সদ্ব্যবহার করলে, অর্থাৎ চকিতের মতো যেমন বাঁশগুলো নুয়ে পড়ে, ওরা তার ডগা চেপে ধরে আবার ওপরে গিয়ে সোজা হতেই নেমে পড়ে।

এত কাণ্ড ক'রে তো ওপারে যাওয়া হ'ল—কিন্তু সে সোনার দেশ কই? সমতলভূমিও তো বেশি নেই, এপারেও একটু এগিয়ে গেলেই আবার পাহাড়। সমস্ত দেশটাই যেন পাহাড়ে তৈরী। অবশ্য খাবারের অভাব নেই, ফল-মূল ঢের—তবু এমন ক'রে কত কষ্ট করা যায়? যাই হোক, এবার অচিরের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। এপারে কতকগুলো বুনো ছাগল চরছিল—বড় বড় বুনো পাহাড়ী ছাগল। কতকগুলো বুনো ছাগল ধরে ওরা তাইতে চেপে বসল, ছাগলগুলো ওদের নিয়ে অনায়াসে পাহাড়ে উঠতে লাগল। তারা পাহাড়ে ঘোরে, কাজেই যেটা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর, তাদের কাছে তা অনায়াসসাধ্য। ফলে এবার ওদের পা একটু বিশ্রাম পেলে—ভ্রমণের আনন্দ একটু একটু পেতে লাগল ওরা।

এমনি ক'রে সারাদিন চলে সন্ধ্যার ঠিক আগে এক মহাবিপদে প[illegible]ল বেচারীরা। জনমানবহীন দেশে এত[illegible] ওরাই ছিল সর্বেসর্বা, অকস্মাৎ নির্জন শান্ত সন্ধ্যায় পাহাড়ের বুকে প্রতিধ্বনি জাগল—মানুষের কণ্ঠস্বর না? ওদের গলা নয়—এ যে সম্পূর্ণ অপরিচিত গলা! আর একদল মানুষ কি তাহ'লে এসেছে এখানে ওরা ছাড়াও?

হ্যাঁ—ঐ যে! ওরা আসছে বিপরীত দিক থেকে। এর একদল, ওদেরই মতো বোধ হয়, সোনার সন্ধানে এসেছে!

অচিরের দৃষ্টি ক্রূর হয়ে উঠল। সে হুকুম দিল, 'মারো ওদের, এত কষ্টের পর সোনার ভাগ দিতে পারবো না!'

শান্তদাস ওদের শান্ত করবার চেষ্টা করলে, কোথায় সোনা তার ঠিক নেই, মিছামিছি মানুষ মেরে লাভ কি? এত বড় দেশ, ওরা আছে থাক্ না! কিন্তু অচির কোন কথাই শুনলে না, ওর তখন মাথায় খুন জেগেছে—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সইতে ও রাজী নয়।

তাই হ'ল। তাদের দলে ছিল কম লোক— অচিরের দলের সঙ্গে পারলে না তারা। এরা তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিলে ক্ষীণ পার্বত্য পথের পাশে যে অতলস্পর্শী খাদ, তারই মধ্যে। তাদের আর কোন চিহ্নও বোধ হয় রইল না!

এই অকারণে নরহত্যা শান্তদাসের ভাল লাগল না। অথচ উপায়ও নেই, সে একা কি করতে পারে?

সে রাতের মতো ওরা সেইখানেই শুয়ে পড়ল। শুকনো পাতায় আগুন জ্বেলে বেড়া করে দিলে। ছাগলগুলো লতাপাতায় বাঁধা রইল। পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই এক অপূর্ব দৃশ্য ওদের চোখে পড়ল। প্রথমে মনে করেছিল মেঘ, কিন্তু পরে দেখলে যে না—কি এক জাতের বিশাল পাখি তাদের বিপুল ডানা মেলে আকাশ অন্ধকার করে উড়ছে! কতকটা শকুনের মতো—তবে আরও অনেক বড়।

হঠাৎ অচিরের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে বললে, 'ঐ ছাগলগুলো মেরে ফেলা যাক—তারপর ওদের ছাল ছাড়িয়ে ছালটা পিঠে বাঁধা যাক। লোমের দিকটা থাকবে ভেতরে, কাঁচা মাংসের দিকটা থাকবে ওপরে।'

শান্তদাস তো অবাক! তাতে কি হবে?

অচির হেসে বলল, 'বোকারাম, তাও বুঝলে না? ওপর থেকে ঐ পাখিগুলো তখন আমাদের দেখে মনে করবে মাংসের ডেলা—খাবার মনে করে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বাসায় ফিরবে। তার ফলে ওই পাহাড়গুলো পার হওয়া যাবে অনায়াসে, হয়তো ওরা যেখানে নিয়ে ফেলবে সেইখানেই সোনা আছে, নইলে ওপর থেকে আমরা তো দেখে নিতে পারব দেশটার কোথায় কি আছে!'

সকলেই এ প্রস্তাবে উৎসাহিত হয়ে উঠল। হ্যাঁ, বুদ্ধি বলে তো এই। খালি শান্তদাসের একটু কষ্ট হ'ল ছাগলগুলোকে মারতে—বেচারীরা কাল থেকে মুখ বুজে সারাদিন তাদের বয়েছে, অকারণে মারা হ'ল বেচারীদের!

যাই হোক, সবাই তো পিঠে সেই 'আমচর্ম' (কাঁচা ছাল) বেঁধে প্রস্তুত হয়ে বসল। দেখা গেল অচিরের হিসাবে কিছুমাত্র ভুল হয় নি। একটু পরেই সেই বড় বড় পাখিগুলো ডানার ঝাপটে চারিদিকে ঝড় তুলে এসে নামল এবং একে একে মুখে ক'রে তুলে নিয়ে আবার আকাশে উঠল।

এর পর দলের বাকী লোকের কি হল তা শান্তদাস জানে না। কেননা আর কারুর সঙ্গে তার দেখা হয় নি—তার ভাগ্য এর পর তাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেললে বিচিত্র এক ভবিষ্যতের মধ্যে!

ও তো উঠল আকাশে, এর মধ্যে ভরসা ক'রে ও চারিদিক তাকিয়ে দেখবার আগেই আর এক পাখি খাদ্যের লোভে এসে করলে সেই পুরনো পাখিটাকে আক্রমণ। বিষম ঝটাপটি, খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি আর তার ফলে একসময়ে কার নখের আঘাতে ওর চামড়া গেল কেটে, এবং শান্তদাস সেই মহাশূন্য থেকে পড়তে লাগল নিচে।

সে একবার তার মাকে স্মরণ করলে, আর গুরুদেবকে। মৃত্যু তো অনিবার্য, এত উঁচু থেকে পড়লে কি আর মানুষ বাঁচে?
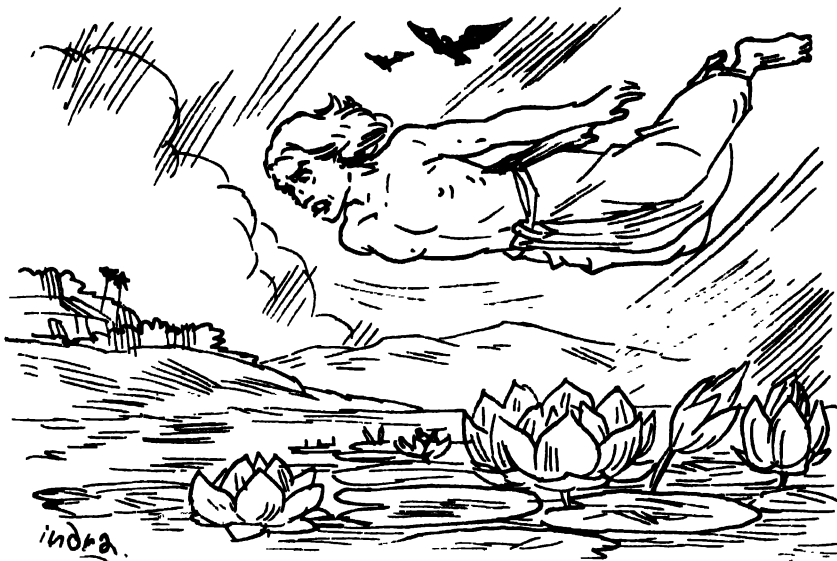
ও গিয়ে পড়ল জলে

কিন্তু ঈশ্বর ওর উপর প্রসন্ন—শান্তদাস ম'ল না। মাটিতে বা পাহাড়ে না পড়ে ও গিয়ে পড়ল জলে। বিশাল এক শান্ত সরোবর, অজস্র পদ্মের মেলা, তারই মধ্যে পড়ে আবার ও ভেসে উঠল। সাঁতার ভালই জানত, সুতরাং একটু চেষ্টা করেই তীরে এসে পৌঁছল।

এইবার সে ভাল করে চারিদিকে চেয়ে দেখলে। কী সুন্দর দেশ, কী মনোরম দৃশ্য! চারিদিকে প্রকৃতির কী অজস্র দান! আহা, সুবর্ণভূমি যদি এরই নাম হয় তো সার্থক নাম!

কিন্তু ও কি?

শান্তদাস চম্‌কে উঠল। ও কার কুটির ঐ দূরে? এখানে তাহ'লে মানুষ আছে? তারও আগে এসেছে?

কী করবে ভাবছে, এমন সময়ে কুটিরের দ্বার খুলে বেরিয়ে এলেন জটাজূটধারী এক ঋষি—মুখে তাঁর অভয় হাস্য, দৃষ্টিতে প্রসন্নতা।

তিনি কাছে এসে ওরই মাতৃভাষায় শান্তদাসকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'বৎস, আমি তোমারই অপেক্ষা করছিলাম। জানতাম তুমি আসবে।'

শান্তদাস তাঁকে প্রণাম ক'রে বললে, 'প্রভু, এই কি তাহ'লে সুবর্ণ দ্বীপ?

'হাঁ, এই সুবর্ণ দ্বীপ।'

'কিন্তু—কিন্তু তাহ'লে সোনা কোথায়?'

'মাটি এখানকার সোনা নয়—কিন্তু এ সোনার মাটি বৎস। এদেশে যা আছে তা কোথাও নেই। আর সেইজন্যই তোমার এখানে আগমন। তুমি এই বার্তা বয়ে নিয়ে যাও তোমার দেশে—ভারতভূমিতে। সেখানকার অধিবাসীদের জন্যই এই সোনার দেশ তার বিপুল ঐশ্বর্য-সম্ভার নিয়ে বসে আছে। এখানকার ইতিহাস রচনা করবে ভারতবাসী—বাণিজ্য-পথ ধরে আসবে তারা, ক্রমে বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে। তুমি সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উপলক্ষ্য মাত্র। যাও বৎস, দেশবাসীকে এর সন্ধান দাও গে। ভারত মহাসমুদ্রের বুক যেন বাণিজ্যতরীতে ঢেকে যায় একদিন। আমি এরই প্রতীক্ষায় বসেছিলাম।'

সেই ঋষিই পথ দেখিয়ে দিলেন শান্তদাসকে, ব্যবস্থা ক'রে দিলেন ভারতবর্ষে ফিরে আসার।

দেখতে দেখতে এই বার্তা ছড়িয়ে পড়ল দেশ থেকে দেশান্তরে, জম্বুদ্বীপের সর্বত্র। বড় বড় বাণিজ্যতরী যাত্রা করল সেই সুবর্ণ দ্বীপের সন্ধানে—সেখানকার মাটিতে সোনা ছড়ানো না থাকলেও, সোনা সেখানকার মাটিতে সত্যিই ফলে!...

তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী যেমন কেটেছে, ভারতবাসীর এক বিরাট্ উপনিবেশ, এক মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে সেখানে। শৈলেন্দ্রবংশীয় নরপতিদের প্রতাপে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের খ্যাতি সুদূর চীন থেকে আরব পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে একদা। কিন্তু সে অন্য গল্প। ভারতবাসীদের সে গৌরবময় ইতিহাস তোমরা এর পর প'ড়ো। জাভা, সুমাত্রা, মালয়, বালি, বোর্নিও, শ্যাম, ইন্দোচীন—একদিন তোমাদেরই উপনিবেশ ছিল, সেখানকার সাম্রাজ্য ও শক্তি তোমাদেরই পূর্বপুরুষ একদিন গড়ে তুলেছিলেন—এইটুকু শুধু জেনে রাখো এইখানে।

কথাটা ভাবতেও ভাল লাগে, না?

সত্যদাসের নব-জন্ম

সত্যদাস অমন হঠাৎ মারা যাওয়াতে প্রথমটা সকলেই চমকে উঠেছিল বৈকি! সারা দেশ জুড়ে সে যেন এক বিরাট হৈ-চৈ সোরগোল!

আমাদের দেশের প্রান্তে সে দেশ, হিমালয়ের দক্ষিণে। নাম? নামটা না-ই বা শুনলে সে-দেশের। ধরো, তার নাম মিথ্যাপুর! হ্যাঁ, এই নামই ভালো। কারণ ওটা তো আর সত্যিকারের নাম নয়, সবটাই যখন মিথ্যা তখন মিথ্যাপুরই ধরে নেওয়া যাক না। আর সে দেশের মানুষগুলোও যখন অত বেশি মিথ্যা বলে, তখন ও নামটা খুব বেমানান হবে না। তারা শুধু মুখেই মিথ্যা বলে না—সমস্ত কাজে, সমস্ত আচরণেই তাদের মিথ্যা যেন

জ্বল্‌জ্বল্‌ করে। মুখে যখন ভালো ভালো বক্তৃতা করে, তখন মনে ভাবে খারাপ কাজ। খাঁটি দুধ বলে জল বেচে, ঘি বলে বিক্রী করে তুলোর বীচির তেল। কোন জিনিসই সে দেশের বাঁধা-দামে পাওয়া যায় না—চারগুণ, আটগুণ, এমন কি বারোগুণ দাম দিতে হয়। ঘুষ না দিয়ে কিংবা সুপারিশ না ধরে সে-দেশে কেউ কোন কাজ করতে পারে না। সোজা-পথে চলা আর সোজা-কথা বলা দেশের লোক বহুকাল ভুলে গেছে।

সে-দেশের বালকরা পরীক্ষায় পাস করে টুকে, কিম্বা পরীক্ষকদের সুপারিশ ধরে। যুবকরা কর্মক্ষেত্রে দেয় ফাঁকি, আর বৃদ্ধরা চেষ্টা করে স্বয়ং ভগবানকে ঠকাতে। জপ কিংবা পুজো, বড় জোর উপোস-এর আড়ালে তারা তাদের অসৎ কাজ ও অসৎ চিন্তা ঢাকতে চেষ্টা করে। সে দেশের জমিদার প্রজাকে এবং প্রজারা জমিদারকে ঠকায়। রেলের লোক চেষ্টা করে যাত্রীদের ঠকাতে, আর যাত্রীরা চেষ্টা করে রেলকে ফাঁকি দিতে। সব চেয়ে হয়তো অবাক হয়ে যাবে একটা কথা শুনলে—সেখানকার ছাত্ররা পর্যন্ত শিক্ষককে ঠকাবার চেষ্টা করে, শিক্ষকরা চেষ্টা করে ছাত্রদের ঠকাতে। কাজেই এ হেন দেশের নাম যদি মিথ্যাপুর দিই, খুব অন্যায় হবে কি?

এমন মিথ্যাপুরে সত্যদাসের জন্মটাই আশ্চর্য, আরও আশ্চর্য এই যে, তিনি সত্যিসত্যিই সত্যদাস হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। অবশ্য বেশিদিন যে তাঁকে ওখানকার লোক সহ্য করতে পারবে না, এ আমরা সবাই জানতাম। আর হ'লও তাই। সত্যদাসের চেষ্টাতেই যখন দেশের সুখ শান্তি সমৃদ্ধি ফিরে এলো, তখন দেশেরই একজন লোক তাঁকে অতর্কিতে খুন করে বসলো। অন্ধকারে থাকতে যারা অভ্যস্ত, আলো তাদের সইবে কেন? পেঁচার সব চেয়ে বড় শত্রু হলেন সূর্যদেব—যাঁর আলো থেকে আমরা সবাই, এমন কি পেঁচারা পর্যন্ত প্রাণশক্তি পাচ্ছি। প্রতিটি খাদ্য তৈরি হচ্ছে যা থেকে প্রাণ আহরণ ক'রে, প্রতিটি ফুল ফুটছে যার দয়ায়, সেই সূর্য-কিরণকে পরিহার ক'রে চলে এমন প্রাণীর তো অভাব নেই!

মিথ্যাপুরের রাজারা হলেন শ্বেত-দ্বীপের লোক। ওখানকার সিংহবংশীয়রাই প্রতিনিধি রেখে রাজত্ব চালাতেন। তাঁরা এদেশে আসেনও একদিন মিথ্যার দৌলতে—মিথ্যাকে, শঠতাকে আশ্রয় করেই রাজ্যটাকে ধরে রেখেছিলেন এতকাল। তাঁদের প্রশ্রয়েই দেশে পাপ এমন ক'রে বেড়ে উঠেছিল। তাঁরা জানতেন এদেশে মানুষ নেই, যা খুশি আর যত খুশি অত্যাচার করুন না কেন, এরা সবই সইবে। তাঁরা এদের এমনই দমিয়ে রেখেছিলেন ভয় দেখিয়ে যে, প্রথমটা সত্যদাসের কথায় বা কাজে তাঁরা একটুও ঘাবড়ে যান নি, বরং হেসেছিলেন। তারপর যখন দেখলেন যে সত্যদাস বড়ই গোলমাল বাধাচ্ছে, তখন তাঁরা এদিকটায় খুব জোর দিলেন। পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজের অত্যাচারে চারিদিকে হাহাকার উঠলো। কত লোক যে বিনা দোষে শাস্তি পেলে তার ঠিক নেই। স্বর্গত রাজা চতুর চিল্ল সিং বিপুল বিক্রমে সত্যি-সত্যিই খুব চতুর ছিলেন—তাঁর বিক্রমও ছিল কম নয়, কিন্তু আগেই বলেছি—তাঁদের যা কিছু বুদ্ধি আর কৌশল, সবই চলতো মিথ্যার পথ ধরে। তাই যখন তিনি বাঁধন শক্ত করতে চেষ্টা করেন, ততই তা সত্যদাসের সত্যে লেগে আলগা হয়ে যায়। যত অস্ত্র সব তাঁর সত্যের বর্মে ঠেকে ফিরে আসে—পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজের হাতের অস্ত্র নিরস্ত্র এবং অহিংস সত্যদাসকে দেখে আপনিই যেন খসে পড়ে।

অবশেষে এমন অবস্থা হলো যে, শ্বেত-দ্বীপের লোকেরাই রাজার ওপর চটে গেল এই অত্যাচারের জন্য। তাদের রাজা তাদের হাতেই নিহত হলেন একদিন—নতুন যিনি এলেন রাজা হয়ে, তিনি বললেন, 'আর দরকার নেই ওখানে আমাদের রাজত্ব করে,—ও দেশ সত্যদাসই নিক!' শেষ রাজপ্রতিনিধি সিংহবংশীয়দের দণ্ড ও মুকুট সত্যদাসের পায়ের সামনে রেখে বললেন, 'তোমারই জয় হয়েছে সত্যদাস। এ মুকুট তোমার।'

সত্যদাস বললেন, 'মুকুটে আমার কাজ নেই, দণ্ডতেও না। যারা দেশের সত্যকার কল্যাণ চায়, দেশের উন্নতির জন্য এতকাল কষ্ট স্বীকার করে এলো—তারাই নিক। আমি যেমন আছি, তেমনই থাকি।'

সত্যি, অদ্ভুত মানুষ ছিলেন সত্যদাস। সমস্ত পৃথিবী যা বলে, তিনি বলেন তার উলটো। চিরকাল সবাই জেনে এলো যুদ্ধ করতে হয় অস্ত্র দিয়ে; উনি বললেন—'অস্ত্র না নিয়ে যুদ্ধ করাটাই সবচেয়ে বড় বীরের কাজ। অহিংসাই হলো আসল অস্ত্র।' সবাই জানে, জোর যার মুল্লুক তার; উনি বললেন, 'সে জোর—গায়ের নয়, সে জোর—মনের।'

বলতেন, 'বাপু হে, আগে মানুষ যুদ্ধ করতো পাথর দিয়ে, তারপর এলো লোহার অস্ত্র—তলোয়ার বল্লম বর্শা তীর ধনুক—তখন এইসব দেখলেই লোকে ভয় পেতো। কিন্তু কামান বন্দুক যখন এলো, তখন ওগুলো মানুষ অকেজো বলে ফেলে দিলে। আবার আগেকার বন্দুক কামান কিছুদিন পরে ছেলের হাতের খেলনা হয়ে উঠলো—লোকে বাড়ি বাগান সাজাতে শুরু করলে তা দিয়ে। এমন সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর নতুন অস্ত্র বেরোলো—এলো বোমা, তা থেকে আণবিক বোমা, আবার আলোক বোমা, বীজাণু বোমা, কতো কি শুনছি! কাজেই কতকগুলো অস্ত্র তৈরী করলেই কি নির্ভয়ে থাকতে পারবে? তার চেয়েও শক্তিশালী অস্ত্র তৈরী হতে কতক্ষণ? বরং যদি সমস্ত রকম অস্ত্রের সামনে প্রাণ তুচ্ছ করে দাঁড়াতে পারো, দেখবে অস্ত্র আপনিই খসে পড়বে অস্ত্রধরদের হাত থেকে। নিরস্ত্র লোককে আঘাত করতে খুব বড় অত্যাচারীও ইতস্তত করে।

এমনি ক'রে, সমস্ত পৃথিবীর লোক যখন কলকারখানা নিয়ে মেতে উঠল, এমন কি আমাদের ভারতবর্ষেও কলকারখানা ছাড়া চলবে না একথা সবাই মেনে নিলে, ওখানে তখন সত্যদাস বললেন, 'উঁহু উঁহু, তা নয়। কলে দরকার নেই, চাষবাস করো, নিজেদের খাবার নিজেরা তৈরী করো, হাতে সুতো কেটে কাপড় বুনে নাও, জুতোর চামড়া মরা জন্তুর থেকে নিজেরা ঘরে পাকিয়ে তৈরী করে নাও। কলকারখানা নিয়ে কি হবে? বিলেতে তো অত কলকারখানা, কিন্তু খাবারের জাহাজ না গেলে উপোস করে থাকতে হয়, তুলো না গেলে কাপড় হয় না। খাবার যদি নিজের দেশে না থাকে তো, হাজার পয়সা থাক্, এক এক সময় উপোস করতেই হয়। তখন তো আর কলকারখানা চিবোতে পারবে না! কলকারখানাতে অল্প সময়ে বেশী জিনিস হয় মানি—কিন্তু বেশি জিনিসে আমাদের দরকার কি? যে-যার কাপড় যদি তৈরী করে নিই, তাহ'লে কেনবার প্রয়োজন থাকে না। বিজ্ঞান যত বিলাস বা আরামের বাজে জিনিস আমদানী করছে, তাতে আমাদের কী উপকার হচ্ছে

বলতে পারো? আমরা আরো আরাম চাইছি, আরো বাজে-জিনিসে ঘর ভরাচ্ছি। আসল প্রয়োজন কতটুকু? খাওয়া এবং পরা। কলকারখানা থাকলেই অল্পসময়ে বেশি জিনিস হবে, তখন তা আর নিজেদের দরকারে লাগবে না, কাজেই বেচতে চেষ্টা করবো, সহজে খদ্দের না পেলে জোর করে বেচবো, আর তাই নিয়েই তো দুনিয়াতে যত অশান্তি, যত যুদ্ধ।

সত্যদাসের কথা কেউ মানতো, কেউ মানতো না। যারা মনেপ্রাণে মানতো না (তাদের সংখ্যাই বেশি) তারাও অনেকে কাজের সুবিধার জন্য মুখে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু সত্যদাস যখন তাদের স্বাধীনতা এনে দিলেন, হাতে-কলমে কাজ করবার সময় এলো—তখন আর সেভাবে কাজ করতে চাইলে না কেউ। বললে, সারা পৃথিবী যেদিকে যাচ্ছে, আমাদেরও সেইদিকে যেতে হবে। নইলে বাঁচবো কী করে? সবতাইতে পাগলামি করলে তো আর চলবে না! যা কেউ পারলে না—বুদ্ধ না, যীশু না, গান্ধী না—সত্যদাস তাই পারবেন? পাগল না মাথা খারাপ?

সত্যদাস ওদের ব্যাপার দেখে দুঃখিত হলেন, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। যাদের উনি একান্ত আপনার লোক বলে ভাবতেন, তারাও যখন এমনি কপটতা করলে, তখন উনি একাই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দেশ থেকে দেশান্তরে। বলে বেড়াতে লাগলেন, 'বর্তমান সভ্যতা মানেই মিথ্যা—তাতে কখনও শেষ পর্যন্ত ভালো হবে না, ঝগড়াঝাঁটি দলাদলিতে দুঃখ বেড়েই যায়, কখনও কেউ সুখী হয় না। প্রয়োজন বাড়িও না, স্বাবলম্বী হও, মানুষকে ভালোবাসো—তাহ'লেই সুখে থাকবে।'

প্রথমটা সবাই ভেবেছিল, ওঁর দিন চলে গেছে, আর ওঁর কথাতে কেউ কান দেবে না। কিন্তু যখন দেখলে, সাধারণ প্রজারা এখনও ওঁর দিকে আছে, এমনভাবে চললে মহা অসুবিধে হবে—তখন দেশের একদল লোক, উনি বেঁচে থাকলে যাদের অসুবিধা, তারাই ষড়যন্ত্র ক'রে মেরে ফেললে।

সত্যদাসের যেসব ভক্ত ও শিষ্যরা মিথ্যাপুরের শাসন চালাচ্ছিলেন, তাঁরা প্রথমটা ওঁর মৃত্যুতে খুব হাহাকার করে উঠলেন। মুখে বললেন, 'উনি চলে গেছেন, কিন্তু ওঁর আদর্শ তো আছে—সেইভাবেই কাজ করবো আমরা।' ফলে যেসব প্রজাদের মনে একটু অসন্তোষ জমছিল তারাও শান্ত হয়ে গেল। কিন্তু এখন তো সত্যদাস বেঁচে নেই, সুতরাং শাসনকর্তাদের খুব সুবিধা হলো—যাঁর যা খুশি তাই করতে লাগলেন, লোককে বললেন, 'এ তাঁরই ইচ্ছামত করছি।' আবার যারা চাইলে ওঁদের সরিয়ে দিয়ে শাসন-ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিতে, তারাও সত্যদাসেরই নাম ক'রে দল পাকিয়ে বেড়াতে লাগলো। হায়, যাঁর নামে এই মিথ্যা বেসাতি চললো, সেই সত্যদাসের কণ্ঠ যে নীরব, কে প্রতিবাদ করবে?

এমনি ক'রে আর-পাঁচটা দেশের মতোই মিথ্যাপুর সভ্যতার দিকে এগিয়ে চললো। কলকারখানাতে দেশ ভরে গেল, চিমনীর ধোঁয়াতে আকাশ অন্ধকার হয়ে উঠলো। অস্ত্রের কারখানাতে নানারকমের মারণাস্ত্র জমে উঠলো, সৈন্যদলে সবাইকে ধরে জোর ক'রে নাম লেখানো হলো। মনে হলো এইবার মিথ্যাপুর মাথা তুলে দাঁড়াবে জগতের মাঝে, তার প্রতাপে অপর দেশ কাঁপবে এইবার। সত্যদাসের কথাই ভুল—এমনি একটা ধারণাও

লোকের মনে হতে লাগলো ক্রমশ। কই, এই তো এতকাল কেটে গেল, মিথ্যাপুরের উন্নতিই তো হচ্ছে, অবনতি তো হয় নি!

কিন্তু সে উন্নতিতে যে অন্য দেশের চোখ টাটাচ্ছিল তা এতদিন ওরা বুঝতে পারে নি। বিশেষত, পাশেই ভারতবর্ষ। মিথ্যাপুরের জন্য তাদের মাল বিক্রি হয় না বাজারে। দুনিয়ার বাজারে মিথ্যাপুরের মালেরই আদর, তা সস্তা অথচ টেকসই। তারপর ওরা এত অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চয় করেছে, সে-ও একটা ভয়ের কথা। শুধু ভারতবর্ষই নয়—অন্যান্য দেশেরও টনক নড়লো! সবাই নানারকম ভয় দেখাতে লাগলো। বললে, 'যদি বাইরে মাল পাঠানো বন্ধ না করো তো দেখে নেবো!' অথচ মাল না পাঠালেই বা চলে কিসে, এত মাল কিনবে কে? কলগুলো এখন বন্ধ করে দিলে এতগুলো লোক বেকার হয়ে পড়ে। সে ভারি গণ্ডগোল বেধে উঠবে। ওধারে আরও অন্য যেসব দেশের মাল বিক্রি হচ্ছে না, তারা চাইছে গায়ের জোরে ভিন্‌দেশের বাজারে মাল বেচতে। আবার বুঝি একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে ওঠে! এই কারণেই তো এর আগের দুটো বড় যুদ্ধ বেধেছে।

এধারে দেশের মধ্যেও গণ্ডগোলের শেষ নেই। কলকারখানায় যারা কাজ করে তারা ভাবে, আমরাই সব করছি, মালিকেরা ফাঁকি দিয়ে বসে খাচ্ছে, আবার মালিকরা ভাবে, সব টাকাই তো ওরা নিচ্ছে, আমরা ব্যবসা চালাচ্ছি কি জন্যে, আমাদের লাভ কি? শ্রমিকদের আরও বেশি তার চেয়েও বেশি টাকা দিতে দিতে লাভ একসময় শূন্য হয়ে আসে—তবু তারা খুশী হয় না। টাকার লোভ বেড়েই যায়। তখন স্থির হলো, লাভের অংশ দেওয়া হোক, শ্রমিকদের মধ্যেই ভাগ ক'রে; কিন্তু তাতেও ওরা সন্দেহ করে যে, এর ভেতরে কর্তাদের কোন জোচ্চুরি আছে। গণ্ডগোল বাধাবার লোকেরও তো অভাব নেই। একদল শ্রমিকদের তাতায়, আর একদল মালিকদের। যেসব বিদেশী লোকদের এদেশে গোলমাল বাধালে সুবিধা হয়, তারা চেষ্টা করে গোপনে পয়সা দিয়ে এইসব হাঙ্গামা পাকিয়ে তুলতে।

তখন ঘর ও বাইরের এইসব গণ্ডগোল থামাবার জন্য সৈন্যদল বাড়াতে হয়—অস্ত্রের পর অস্ত্র তৈরী করতে হয়। ওসবে যা খরচা হয় তাতে কোষাগার খালি হয়ে দেনা বেড়ে যায়, তবু এমন কিছুই করা যায় না। অন্য দেশের তুলনায় তা খুবই নগণ্য। অথচ এটা সবাইকে মানতে হলো, এই টাকাটার দশভাগের একভাগ খরচ করলেই দেশের অনেক উন্নতি করা যেত, প্রজারা এর চেয়ে ঢের বেশী সুখে থাকতো।

ফলে এইবার কর্তারা পড়লেন এক ফ্যাসাদে। কী করা যায়, কী করা যায়—যখন ভাবছেন, তখন সত্যদাসেরই এক দরিদ্র শিষ্য, যাকে এতকাল কেউ লক্ষ্যও করেনি—তার কথা শোনা তো দূরে থাক্, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে এগিয়ে এসে কর্তাদের জানালে যে, সত্যদাসের পুঁথিপত্রগুলো একবার পড়ে দেখলে বোধহয় একটা হদিস মিলতে পারে। শিষ্যটি তখন নিতান্ত বৃদ্ধ, তাকে পাগল বলেই ভ্রম হবার কথা, তবুও অনেকের মনে পড়ে গেল, তাই তো, বুড়ো সত্যদাস সত্যই তো এই ধরনের কথাই সব কী কী লিখে গেছেন!

তখন খোঁজ, খোঁজ,—কোন্ ধুলোর গাদা থেকে দু-একখানা ছেঁড়াখোঁড়া পুঁথি উদ্ধার করা হলো। দেখা গেল, এমনটা যে হবে তা তিনি অতদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন,

এবং ওদের সাবধান করবারও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কেউই কান দেয় নি তাঁর কথাতে। পৃথিবীর বড় বড় বক্তৃতা ও ঝুটো সমস্যার মধ্যে, তাঁর সেই সাদাসিধে সরল সত্যি কথাগুলোকে সেদিন প্রলাপ বলেই বোধ হয়েছিল।

এখনও অনেকে বিশ্বাস করতে রাজী হলেন না যে, এত সহজে এতবড় সমস্যার মীমাংসা হওয়া সম্ভব। অথচ আর কোনও উপায়ও ছিল না। অগত্যা এই উপায়ই মেনে নিতে হলো।

'ভাঙ্ কলকারখানা, ভেঙে ফেল্ শহরের বড় বড় বাড়িগুলো, অস্ত্রশস্ত্র সব নদীর জলে ভাসিয়ে দে—ফিরে যা গ্রামে।' এই রব উঠল চারিদিকে।

আর সত্যদাস যা সবচেয়ে জোর দিয়ে বলে গিয়েছেন—'উঠিয়ে দে সবার আগে ঐ ট্যাঁকশালটা! যাতে অবিরাম টাকা তৈরী হচ্ছে, নোট ছাপা হচ্ছে। ঐটেই হলো যত গণ্ডগোলের মূল।'

কিন্তু এইবার সত্যিই শান্তি ফিরে এলো। সবাই নিজের খাবার নিজে করে নেয়, চরকায় নিজের কাপড়ের সুতো কাটে। মুচি জুতো দিয়ে তার বদলে নেয় ধান, তেল, নুন, কাপড়। বাজনাদাররা বাজনার বদলে পায় খাবার, মালীরা ফুল দিয়ে কাপড় নিয়ে যায়, টাকার দরকার কি? প্রয়োজন কম, অভাব-বোধও কম। শান্তি ফিরে এল বলেই সুখও দেখা দিলে। আর তুচ্ছ কারণে বিবাদ হয় না—টাকা নেই বলে মনোমালিন্যও নেই। ওরা আর কারুর প্রতিযোগী নয় দেখে বিদেশীরা নিশ্চিন্ত হলো। এদেশ জয় ক'রেও কোনো লাভ নেই বলে সে চেষ্টা কেউ করে না। কারণ টাকা নেই, মাল নেই—কী নেবে। ওরা দিন খাটে, দিন খায়। সবাই শ্রম করে—কেউ বসে খাবার চেষ্টা করে না বলে সবাইকারই স্বাস্থ্য ভালো হয়ে ওঠে, কারও মনে কোন অসন্তোষও থাকে না।

এদের এই শান্তি আর সুখ দেখে পৃথিবীর লোক অবাক হয়ে যায়। বলে, কেমন করে এ হলো?

যারা নিজেদের সুবিধার জন্য সত্যদাসকে মেরেছিল, তারাও মাথায় হাত দিয়ে ভাবে, এ কী হলো?

মিথ্যাপুরের লোকেরা দেখিয়ে দেয় সত্যদাসের পুঁথি। বলে, 'তিনি তো মরেন নি, তিনি আবার আমাদের বাঁচাবার জন্য জন্ম নিয়েছেন। তাঁর বাণী এবং তাঁর জীবনের আদর্শের মধ্যে তিনি বেঁচে উঠেছেন আবার। যা সত্যি তার যে মরণ নেই!'

আর ডাক দিয়ে বলে ওদের, যাদের মধ্যে ঝগড়া আর অশান্তি জমে উঠেছে পাহাড়ের মতো,—'ওরে তোরা আয়, শান্তি চাস তো আয়! অমন করে মরিস নি, এখনও বাঁচবার পথ খোলা আছে!'

রাজশক্তি বজ্র-সুকঠিন

'আবার বিদ্রোহ?'

মহারাজাধিরাজ বিন্দুসারের মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল বিরক্তিতে। 'তক্ষশীলার অধিবাসীরা আবার বিদ্রোহ করেছে? কী ভেবেছে ওরা? ওরা কি মনে করেছে যে মৌর্যদের রাজশক্তি আজ মরে গেছে, নাকি তাদের শৌর্য শুধু কাহিনীতে পরিণত হয়েছে?'

যে দূত এসেছিল তক্ষশীলা থেকে, সে অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

অমাত্যরা বসেছিলেন সম্রাটের ডান দিকে, রাজকুমাররা ছিলেন বাঁ দিকে। তাঁদেরই মধ্য থেকে কে একজন বিনীতভাবে প্রশ্ন করলেন মহারাজকে, 'বিদ্রোহের কারণটা আগে জানলে হত না—রাজাধিরাজ?'

সম্রাট আরও বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কারণ আবার কি? স্পর্ধা! ভেবেছে, সুদূর পাটলিপুত্র থেকে মৌর্য-সম্রাটের রাজশক্তি তক্ষশীলাকে শাসন করতে পারবে না। তাদের জানিয়ে দেব যে, আকাশের বজ্র আরও দূর থেকে আসে, তবু তা কম শক্তিশালী নয়। মগধের রাজশক্তি সেই বজ্রের মতোই, তেমনই শক্তিশালী।'

যে রাজকুমার প্রশ্ন করেছিলেন তিনি কিন্তু তাতেও থামলেন না। বরং খুব মৃদুকণ্ঠে হলেও বেশ স্পষ্টভাবেই আবার বললেন, 'তবু প্রজাদের যদি কিছু অভিযোগের কারণ থাকে, আপনি তাদের পিতা, আপনার সেটা জানা প্রয়োজন।'

রাজসভায় মৃদু গুঞ্জন উঠল, 'কে ও! ছোকরার ধৃষ্টতা তো কম নয়!'

কে একজন যেন কাকে বললে, 'অশোক বোধ হয়।'

'ও, তা না হ'লে আর অমন বুদ্ধি কার হবে? যেমন চেহারা, তেমনি হোঁৎকা বুদ্ধি!'

কিন্তু বিন্দুসার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। বললেন, 'বেশ, অভিযোগটা কি শুনি? কি হে, অভিযোগ কিছু আছে নাকি?'

দূত ঘাড় হেঁট করেই মাথা চুলকে বললে, 'তাদের অভিযোগ হচ্ছে আপনার রাজপ্রতিনিধির কুশাসন। তাঁর যথেচ্ছাচারিতা নাকি আর তারা সইতে পারছে না।'

'ওসব ছুতো!'... 'বাজে কথা!' এই সব নানা ধ্বনি উঠলো সভা থেকে।

অশোক কিন্তু এইসব গুঞ্জন ডুবিয়ে দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'তাদের অভিযোগের মূলে যদি কোন সত্য না থাকে তো তারা বারবার বিদ্রোহ করবে কেন? এই তো কিছুদিন আগেই তারা মগধের প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় পেয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি তারা বিদ্রোহ করে তো বুঝতে হবে যে, নিতান্ত প্রাণের দায়েই করছে।'

দূতও তাতে সায় দিয়ে বললে, 'সমস্ত তক্ষশীলাবাসী এক হয়ে এ বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে—রাজপ্রতিনিধি শুধু যে পরাভূত তাই নন—তিনি বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী। তারা

বলছে যে, সমগ্র তক্ষশীলা যদি এ বিরোধে ধ্বংস হয়ে যায় তাও ভালো, তবু এ অনাচার তারা সইবে না।'

'আচ্ছা দেখা যাক!' ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠেন বিন্দুসার, 'সমস্ত তক্ষশীলা ধ্বংস করেই তাদের এ স্পর্ধার উত্তর দেব। রাজপ্রতিনিধির শাসন যদি কুশাসন হয় তো তার বিচার করবার জন্য আমি আছি, সে বিচার তাদের নিজের হাতে তুলে নেবার কোন অধিকার নেই।'

এই বলে তিনি একটু থেমে বললেন, 'তক্ষশীলায় বিদ্রোহদমনের ভার এবার আমি কোন রাজকুমারকে দিতে চাই। কে যাবে তোমাদের মধ্য থেকে?'

সুসীম বললেন, 'আমি যাবো।'

অশোক বললেন, 'আমি যাবো।'

বীগতশোকও সেই প্রার্থনা জানালেন।

বিন্দুসার পড়লেন বিপদে। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কে কত সৈন্য চাও?'

বীগতশোক চাইলেন দশ হাজার, সুসীম চাইলেন পাঁচ হাজার।

অশোক বললেন, 'আমি একাই যাবো সম্রাট।'

সম্রাট বিস্মিত হয়ে বললেন, 'একা?'

'হ্যাঁ—একা।'

'মনে রেখো, তক্ষশীলার নাগরিকরা শিশু নয়—এ ব্যাপারটা ঠিক ছেলেখেলাও নয়!'

'তা জানি। তবু একাই যাবো।'

বিন্দুসার একটু ভেবে বললেন, 'একা যাওয়া অসম্ভব। দীর্ঘ পথ... বেশ, তুমি একশত জন দেহরক্ষী নিয়ে যাও।'

অমাত্যরা বললেন, 'কিন্তু এ যে বাতুলতা! এতে বিদ্রোহ-দমনের কাজে অনর্থক বিলম্ব হবে।'

অশোক সকলের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'যদি বিদ্রোহ দমন করতে না পারি, আর পাটলিপুত্রে ফিরব না—এই প্রতিজ্ঞা রইল।'

বিন্দুসার মনে মনে বীরপুত্রকে আশীর্বাদ করে অমাত্যদের বললেন, 'দেখাই যাক না—আমার পিতৃদেব একার চেষ্টাতেই এতবড় সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, ও তাঁরই পৌত্র।'

তক্ষশীলায় ইতিপূর্বেই সংবাদ এসে গিয়েছে, রাজকুমার অশোক আসছেন বিদ্রোহদমনে।

তক্ষশীলার নাগরিকরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তবু উৎকণ্ঠা একটু আছে বৈকি! না জানি তিনি কত বীর, কত লোক তাঁর সঙ্গে আছে তাই বা কে জানে!

সাবধানে তাঁরা প্রস্তুত হতে লাগলেন, নগরতোরণ রক্ষার ভার দেওয়া হ'ল বাছাই করা বীরদের হাতে। নগরপ্রাচীর পাহারা দিতে লাগলেন সকলে সারারাত জেগে।

অবশেষে সংবাদ এলো, অশোক এসে পড়েছেন।

কিন্তু কই, পাটলিপুত্রের বিপুল এবং অপরাজেয় বাহিনী কই?

অশোক আর তাঁর মুষ্টিমেয় দেহরক্ষী! তবে বুঝি সৈন্যদল আরও পিছনে আছে?

না, ঐ যে—সে-দেহরক্ষীদেরও দূরে রেখে অশোক ঘোড়া ছুটিয়ে একা এগিয়ে এলেন। কোমরে তরবারি আছে বটে, তবে সে কোষবদ্ধ, হাত একেবারে নিরস্ত্র।

তক্ষশীলাবাসীরা অবাক। তাদেরও হাত-পা চলছে না। ছবিতে আঁকা জনতার মতোই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা।

অশোক একেবারে সামনে এসে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা আমাকে বধ করতে চাও? করো—আমি তো নিরস্ত্র!'

প্রজারা তবু নির্বাক।

অশোক ঘোড়া থেকে নেমে এসে বললেন, 'এত যুদ্ধসজ্জা কার জন্য ভাই? আমরা কি তোমাদের পর? তোমরা আমার বাবার প্রজা, তাঁর সন্তান—আমার ভাই। ভাইকে অভ্যর্থনা করার তো এ রীতি নয়!'

কে দু-একজন পিছন থেকে কটূক্তি করে উঠল বটে, তবে তাদের কণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে বিপুল জয়ধ্বনি উঠল, 'জয় কুমার অশোকের জয়!'

'ছি-ছি ভাই, মহারাজ বিন্দুসারের জয়ধ্বনি আগে, তিনি আমাদের পিতা।'

'কিন্তু তিনি আমাদের দুঃখ-কষ্টে কান দেন না—তাঁর প্রতিনিধির কুশাসনে আমরা জর্জরিত। কিসের পিতা তিনি, সন্তানের বেদনা যদি না বোঝেন!' একজন নাগরিক বলে উঠলেন।

অশোক বললেন, 'তিনি দূরে আছেন, কিন্তু তোমাদের অভিযোগ শুনলে তিনি প্রতিকার করতেন না—এ কখনও হয়? রাজপ্রতিনিধির শাসন তোমাদের ভাল লাগে নি, সেকথা তাঁকে জানাও নি কেন? তোমার ভাই তোমার ওপর অত্যাচার করলে আগে বাবাকে জানাবে, না বাবার ওপর একেবারে বিদ্রোহী হয়ে বসবে? এ তোমাদের কেমন ভুল বোঝা ভাই!'

নাগরিকরা জবাব দিলেন—'সেইজন্যই দূরের শাসন আমরা চাই না, আমাদের শাসন আমরাই করব। আমাদের অভিযোগ যখন অতদূরে পৌঁছয় না—'

'কে বললে পৌঁছয় না? অভিযোগ তো করো নি তোমরা, করলে পৌঁছত ঠিকই। সংবাদ পৌঁচেছে মাত্র, তারই অভিযোগ শোনবার জন্য রাজাধিরাজ আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'আপনি এসেছেন বিদ্রোহ দমনে!' উত্তর এলো ভীড়ের মধ্য থেকে।

অশোক বললেন, 'কই, তাহ'লে তো অস্ত্র থাকত, লোক থাকত! আমি তোমাদের রাজপুত্র, তোমাদের অতিথি হয়ে এসেছি। তোমাদের কথা শুনতে এসেছি।'

তারপর সবাইয়ের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন, 'রাজপ্রতিনিধি তো কর্মচারী মাত্র। তাঁর শাসন ভাল না হয়, তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হবে, তাতে কি—তার জন্য এত কেন?'

একটি তরুণ বললে, 'আমাদের রাজপ্রতিনিধি তাহ'লে আমাদের বেছে নিতে দিন।'

'বেশ তো, নাও না। এ তোঁ সামান্য কথা।'

'কথা দিচ্ছেন?'

'দিচ্ছি।'

'বেশ, তাহ'লে আপনিই রাজপ্রতিনিধি হয়ে আমাদের শাসন করুন।'

কুমার অশোক বিব্রত বোধ করলেন, কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্য। তারপরই হেসে বললেন, 'এইবার তোমাদের কাছেই আমাকে হার মানতে হ'ল। বেশ তাই হোক।'

সঙ্গে সঙ্গে জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি ক'রে উঠল, 'জয় কুমার অশোকের জয়!'

অশোক বললেন, 'তাহলে আর বিদ্রোহের প্রয়োজন আছে কি? এখনও কি আপনারা রাজা বদলাতে চান?'

আবারও বিপুল জয়ধ্বনি ক'রে উঠল সবাই, 'জয় সম্রাট বিন্দুসারের জয়!'

অশোক তখন তার সঙ্গী একজন দূতকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে বললেন, 'তুমি সম্রাটকে খবর দাওগে যে, তক্ষশীলায় বিদ্রোহ দমন হয়েছে, মগধের বজ্র-কঠিন রাজশক্তির পরিচয় এঁরা পেয়েছেন। সম্রাটের জয়ধ্বনি তো তুমি নিজেই শুনে গেলে। সম্রাটকে আমার এবং তক্ষশীলাবাসীর প্রণাম নিবেদন ক'রো।'

আবারও সেই তক্ষশীলার নাগরিকদের বিরাট জনতা জয়ধ্বনি করে উঠল, 'জয় সম্রাট বিন্দুসারের জয়!... জয় কুমার অশোকের জয়!'

সূত্রপাত

সমস্ত সভা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল—কোথাও কারও মুখে কোন সাড়া নেই!

তারপর রাজা অম্ভীই সে জড়তা ভঙ্গ ক'রে প্রশ্ন করলেন, 'উত্তর-পশ্চিমের হিংস্র দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতিরাও হার মেনেছে গ্রীক যবনদের কাছে! কী বলছ বসুসেন, এ যে একেবারেই অবিশ্বাস্য!'

গুপ্তচর বসুসেন যবনদের সংবাদ সংগ্রহ করতেই গিয়েছিল। সে মাথা হেঁট ক'রে বললে, 'মহারাজের সামনে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করব এমন ধৃষ্টতা আমার নেই। সমগ্র পুষ্কলাবতী মাত্র এক মাসের মধ্যে ওদের পদানত হয়েছে, উরসা ও অভিসারের দিকে ওদের সৈন্যবাহিনীর মুখ ঘুরেছে দেখে আমি ফিরে এসেছি সংবাদ দিতে।'

'পুষ্কলাবতীর সংবাদ আমি আগেই পেয়েছি বসুসেন, কিন্তু আমি ভাবছি গান্ধার, মাসাগা—এদের কথা। এরাও হার মানলে? এদের ওপরই ভরসা যে আমাদের সবচেয়ে বেশি ছিল!'

'ওরা যতই হিংস্র হোক—যবনদের যুদ্ধ-কৌশল ও নিয়মানুবর্তিতার কাছে ওদের সমস্ত পরাক্রম হার মানতে বাধ্য হ'ল।'

প্রধান সেনাপতির ভ্রূ বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল, তিনি একবার তাঁর তরবারিতে হাত দিলেন। অর্থসচিব কিন্তু সেদিকে চেয়ে পরিহাসের সুরে বললেন, 'অত ক্রুদ্ধ না হলেও চলবে সেনাপতি। যারা এত বড় বড় বীর জাতিদের পরাজিত ক'রে অসংখ্য দেশ দখল করলে, তাদের রণকৌশলের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু আছে বৈকি। কিন্তু আমি ভাবছি

মহারাজ, পুষ্কলাবতী থেকে সোজা নদী পেরিয়ে আমাদের দেশে এসে না পড়ে উরসার দিকে যাবার অর্থ কি?'

প্রধানমন্ত্রী বজ্রভূতি উত্তর দিলেন, 'এর অর্থ খুব সহজ। আমাদের সামনে দিয়ে এত বড় নদী পেরোবার চেষ্টা করলে কিছু নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেওয়া হ'ত বৈকি! তার চেয়ে উরসা ও অভিসার যদি ওদের পদানত হয়, তাহ'লে আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ধরা কি ঢের সহজ হবে না! তা ছাড়া তক্ষশীলার নামডাক আছে তো!'

অর্থসচিব বললেন, 'তা আছে, তেমনি গান্ধার থেকে মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত রাজপথও পড়ে আছে আমাদেরই সামনে দিয়ে। এ ছেড়ে পাহাড়ের পথে অভিসার যাওয়াটা তাদের দুঃসাহসেরই পরিচয়।'

অম্ভী আবার কথা কইলেন, 'তাহ'লে এখন উপায়? উরসা হয়ে তারা ফিরে যাবে এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। তক্ষশীলার বিপুল ঐশ্বর্যের খ্যাতি তাদের অজানা নয়।'

বজ্রভূতি বললেন, 'উপায় আর কি, যুদ্ধ করা! পরাজয়ের সম্ভাবনা হয়ত আছে, তা বলে এই সুপ্রাচীন দেশের মর্যাদা বিনাযুদ্ধে যবনদের পায়ের কাছে রাখতে পারি না!'

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে অম্ভী বললেন, 'যুদ্ধ মানে ধ্বংস। এই সুন্দরী তক্ষশীলার চিহ্নও থাকবে না বজ্রভূতি।'

'কী আর করা যাবে মহারাজ, স্বাধীনতাই যদি গেল তো তক্ষশীলাও না হয় যাক। ওর মূল্য কি!'

'তাই হোক। সেনাপতি, তক্ষশীলার সমস্ত সৈন্যশক্তি একত্রিত করুন—চেষ্টার কোন ত্রুটি না হয়!'

অম্ভী সভা থেকে বেরিয়ে বিশ্রাম করতে যাবার পথে একটি অলিন্দের ধারে এসে থমকে দাঁড়ালেন। সুউচ্চ অলিন্দ থেকে তক্ষশীলার অনেকখানিই দেখা যায়। সুন্দর নগরী—এত সুন্দর শহর বোধ হয় সমগ্র ভারতবর্ষে আর নেই। অশিক্ষিত বর্বর গ্রীক যবনদের হাতে পড়লে এর কি আর কোন চিহ্ন থাকবে? অম্ভী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর সাধের তক্ষশীলা—পূর্বপুরুষরা পুরুষ-পরম্পরায় যে বিপুল ঐশ্বর্য, যে শিল্পসম্ভার এখানে জড়ো করেছেন, আগামী কালের নাগরিকরা তার চিহ্নমাত্র পাবে না—হয়ত এর কথাও শুনতে পাবে না! আজ তক্ষশীলা সমগ্র ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র, দেশদেশান্তর থেকে দু-তিন বৎসরের পথ অতিক্রম করে ছাত্ররা আসে পড়তে। এইখানেই ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ রসায়নশালা ও গবেষণাগার। এইখানেই আধুনিক আয়ুর্বেদসম্মত প্রথম চিকিৎসালয়—এইখানেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পভবন ও শিল্পশিক্ষালয়—এসব নষ্ট হয়ে যাবে? এটা তিনি জোর ক'রে বলতে পারেন যে এত বেশি শিল্পসম্ভার পৃথিবীতে কোথাও নেই—আর সব ঐশ্বর্যই একদিন মানুষ ফিরে পেতে পারে কিন্তু এসব জিনিস নষ্ট হ'লে একেবারেই গেল। অথচ যুদ্ধ বাধলে এর কিছু কি আর চিহ্ন থাকবে?

অম্ভীর চোখে জল এসে গেল। তিনি উত্তরীয়ে জল মুছে অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়ালেন।

এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল, বহুদূরে প্রাসাদ-তোরণে অগ্নিশিখার মতো এক দীর্ঘাকৃতি নগ্নপদ ব্রাহ্মণের সঙ্গে প্রহরীদের কী বচসা হচ্ছে। তিনি তখনই একজন প্রহরী পাঠালেন খবর নিতে। সে ফিরে এসে খবর দিলে, ঐ ব্রাহ্মণ এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়, প্রহরীদের কোন নিষেধ মানছে না, ব্রহ্মশাপের ভয় দেখাচ্ছে।

অম্ভী বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তা তাঁকে বাধা দিচ্ছ কেন?'

'বিশ্রামের সময়—!'

'বিশ্রাম আবার কি? নিয়ে এস ওঁকে। নিশ্চয়ই কোন জরুরী প্রয়োজন আছে, তাই উনি অমন করছেন।'

একটু পরেই ব্রাহ্মণ এলেন। দীর্ঘকায়, বরং কিছু শীর্ণ। গৌরবর্ণ, তেজস্বী মুখভাব—দৃষ্টি উজ্জ্বল। ব্রাহ্মণ বোধহয় দৌড়েই এসেছেন, কারণ তখনও হাঁপাচ্ছেন, 'মহারাজ, আপনি নাকি যবনদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন?'

বিস্মিত অম্ভী বললেন, 'হ্যাঁ—তাতে কী হয়েছে?'

'মহারাজ, আপনি কি উন্মাদ?'

ওঁর ধৃষ্টতা দেখে অম্ভী স্তম্ভিত। তিনি বললেন, 'রাজসভাতে এসব মন্ত্রণা হয়ে গেছে, আর কোন বক্তব্য থাকে বলুন!'

'না মহারাজ, আমার কথা শুনতে হবে। এতগুলো দেশ ও এত বড় বড় জাতি যাকে হারাতে পারলে না, তাকে হারাবার স্বপ্ন দেখবেন না। আমি রাজসভার বাইরের লোক মারফত খবর পেয়েছি, পুষ্কলাবতী, গান্ধার, উরসা—সব আজ তার পদানত। তক্ষশীলা, তার এই বিপুল ঐশ্বর্য এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে? আমি জানি—আপনিও তা চান না, সুতরাং এ আত্মঘাতী যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হ'ন। সম্মুখ-যুদ্ধে এদের সঙ্গে পারবেন না।'

'তবে? আপনি কি বলেন? যবনের পদ-লেহন করতে?' বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করেন অম্ভী।

'কৌশল অবলম্বন করুন মহারাজ, কোন একটা রাজ্যের সৈন্যবাহিনী ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। ওরা যুদ্ধবিদ্যা জানে, কৌশলে অদ্বিতীয়, তার ওপর এতদিনের অভিজ্ঞতায় অপরাজেয়। তাদের সঙ্গে আপনাদের মতো এইসব ছোট ছোট দেশ কী যুদ্ধ করবে? অসুররাই পারলে না। আমি যা বলি শুনুন, এখনই দূত পাঠান যবনরাজ সেকেন্দারের কাছে, তাঁকে উপহার দিয়ে বিনয়বচনে নিমন্ত্রণ ক'রে আসুক তক্ষশীলায়। আর এধারে সামান্য সৈন্য আপনার রাজধানীতে রেখে বাকী সৈন্য পাঠিয়ে দিন গোপনে বিতস্তা পেরিয়ে পুরুরাজের কাছে। আপনার সৈন্য, বৃদ্ধ পুরুরাজের সৈন্য এবং যদি তাঁর সঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তরুণ পুরুরাজের একটা আপোষ হয়ে চন্দভাগার পূর্বপার থেকে কিছু সৈন্য আসে তো কথাই নেই! যুদ্ধটা ওখানেই হোক, এই মিলিত বাহিনীর হাতে যবনদের পরাজয়ের সম্ভাবনা তবু আছে, আর তা যদি নাও হয়, তবে তক্ষশীলা তো বাঁচবে। তখন

এটাও সান্ত্বনা থাকবে যে, মিলিত বাহিনী যাকে হারাতে পারল না, আপনার একক বাহিনী তা পারত না!'

অম্ভী স্তম্ভিত হয়ে ব্রাহ্মণের কথাগুলো শুনলেন। ওঁর মনে হ'ল যে স্বয়ং ভগবান এঁকে পাঠিয়েছেন তক্ষশীলাকে বাঁচাবার জন্য, নইলে তাঁর মনের কথা ইনি জানবেন কি করে?

অম্ভী সব ভুলে ওঁর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললেন মন্ত্রণাসভার দিকে। এখনও সময় আছে, মন্ত্রীরা হয়ত সবাই চলে যান নি।
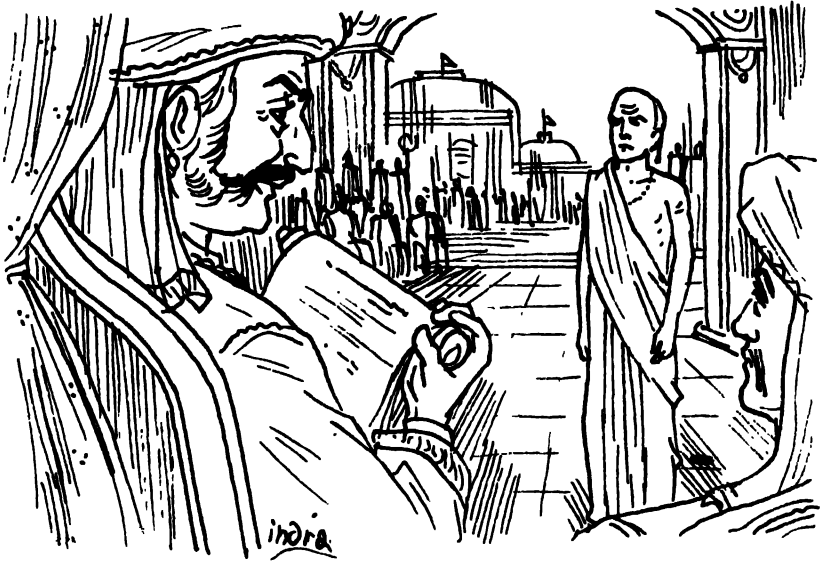
চিঠি পড়ে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল

সেই ব্রাহ্মণই অম্ভীর চিঠি নিয়ে গেলেন বিতস্তা পেরিয়ে পৌরবদের দেশে, বৃদ্ধ পুরুরাজের সভায়।

চিঠি পড়ে পুরুরাজের মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল। বললেন, 'শোন হে, কাপুরুষ অম্ভী ভয় পেয়ে গেছে, সে যবনদের সঙ্গে সন্ধি করেছে। আবার তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমাকে লিখে পাঠিয়েছে যে, আমি যদি যুদ্ধ করি তো গোপনে সে আমাকে তার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে রাজী আছে! ছোঃ!'

সমস্ত সভাতে একটা বিদ্রূপের গুঞ্জন উঠল। তারপর খুব একচোট হেসে নিয়ে পুরুরাজ

বললেন, 'অম্ভীটাকে গিয়ে বলো যে আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতই আছি—তবে তার কোন সাহায্য চাই না। সে ভীরু যেন তার এবং তার দেশবাসীর প্রাণ নিয়ে লুকিয়ে বসে থাকে। যবনরা এখনও পৌরবদের শৌর্যের পরিচয় পায় নি, এইখানেই তাদের পরাজয় ঘটবে।'

ব্রাহ্মণ বিরক্ত হ'লেও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার বললেন, 'এই যারা একের পর এক ওদের পদানত হচ্ছে, তারা সকলেই কি অমানুষ, শুধু পৌরবরাই বীর?'

'দেখা যাক না—ফলেই টের পাবে।' মুচকে হাসলেন পুরুরাজ।

'তা হয় না মহারাজ', দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন ব্রাহ্মণ, 'গান্ধার, পুষ্কলাবতী, উরসা—এরা কেউ পৌরবদের চেয়ে কম বীর নয়। শুধু আপনার সৈন্যরা কিছুতেই পারবে না। তক্ষশীলার সঙ্গে মিলিত হতে যদি আপনার আপত্তি থাকে তাহ'লে এখনও সময় আছে মহারাজ, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে নিন—চলে যান অভিসারের দিকে, তাদের সাহায্য করুন—সেইখানে যুদ্ধরত যবনদের অতর্কিতে আক্রমণ করুন, শত্রু ঐখানেই পরাস্ত হোক্।'

রাগে পুরুরাজের মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'একে তুমি দূত তায় ব্রাহ্মণ, তাই বেঁচে গেলে এযাত্রা! তোমার এত স্পর্ধা—আমাকে বুদ্ধি দিতে আস! কারুর সাহায্য লাগবে না—পৌরবরাই যবন-বিজয়ের গৌরব লাভ করবে। আমার ভাইপোকেও প্রয়োজন নেই। আমি একাই যথেষ্ট। আমি যাবো অভিসার রাজ্যকে সাহায্য করতে? প্রতিবেশী শত্রুকে প্রবল ক'রে তুলব? তার চেয়ে এই ভাল, ওরাও ধ্বংস পেলে, ইতিমধ্যে যবনদেরও কিছু বলক্ষয় হ'ল—আমাদের পক্ষে যবনদের হারানো সহজ হবে। তুমি ফিরে যাও ব্রাহ্মণ, অম্ভীকে গিয়ে বলো আমি তার প্রস্তাব ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেছি।'

ব্রাহ্মণ অস্ফুটকণ্ঠে শুধু বললেন, 'ফণী যার দংশে শিরে, কি করে ঔষধে!... মৃত্যু আসন্ন হ'লে এমনি দুর্বুদ্ধিই হয়! তবু একটা শেষ সৎপরামর্শ দিই মহারাজ—যদি একান্তই যুদ্ধ করবার সাধ হয়ে থাকে, তাহ'লে এখনই আপনাদের তিন-চারজন সেনানীকে পাঠিয়ে দিন উত্তর দেশে, যেখানে তারা যুদ্ধ করছে। ছদ্মবেশে গিয়ে গোপনে তাদের সমরকৌশল দেখে আসুক—সেইমতো প্রস্তুত হোক। আর একটি কাজ করবেন, হাতী নিয়ে যাবেন না, ওরা কাজ যত করে তার চেয়ে বেশি করে অকাজ!'

পুরুরাজ রাগের চোটে উঠে দাঁড়ালেন, 'ব্রাহ্মণ, এই মুহূর্তে রাজসভা এবং আমাদের দেশ যদি ত্যাগ না করো তো জীবনটি রেখে যেতে হবে এখানে স্মরণ রেখো! তোমার এত স্পর্ধা—বলো পৌরবরা যাবে যবনদের কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে! যাও দূর হও, ধৃষ্ট মূর্খ ব্রাহ্মণ!'

একটুখানি ম্লান হেসে ব্রাহ্মণ রাজসভা থেকে বেরিয়ে এলেন। আপনমনেই বলতে বলতে এলেন, 'হা রে দেশ, কোথাও কোন আশা নেই তোর, শুধু আত্মশ্লাঘাতেই তোর মৃত্যু হবে!'

সিংহদ্বারের বাইরে পা দিয়েছেন, এমন সময় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের এক তরুণ যুবক এসে ওঁকে প্রণাম করলে।

ব্রাহ্মণ একবার মাত্র তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এই রাজসভারই এক কোণে বসেছিলে না?'

'ঠিকই লক্ষ্য করেছেন ঠাকুর।'

'তুমি মাগধী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এখানে কী করছ?'

যুবক উত্তর দিলে, 'আমি রাজা মহাপদ্মনন্দের পুত্র। আমার এক ভাই এখন রাজা। সে রাজা হবার আগে আমি সেখানকার সমর-সচিব ছিলাম, আজ তার অত্যাচারে একবস্ত্রে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমার বেচারী মা এখনও সেখানে বন্দিনী।'

'তা এখানে কেন?'

'এসেছি যদি এখানে কোন সাহায্য পাই বা একটা সৈন্যদল গঠন করতে পারি তো একবার চেষ্টা করব মগধ সিংহাসনের জন্য।'

'হুঁ, তা আমার কাছে এসেছ কেন?'

'দেখলাম আপনার সৎপরামর্শ শোনবার লোক এখানে নেই—কিন্তু বুঝলাম তার সারবত্তা, তাই আপনার শরণ নিতে এসেছি, আমাকে যদি একটু বুদ্ধি দেন।'

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি সত্যি কথাই বলছ। আমি যা বলব—শুনবে?'

'শুনব।'

'চলে যাও এখনই উত্তর দেশে। সেকেন্দারের কাছে অনুনয় ক'রে তার দাসত্ব করগে।'

'দাসত্ব করব!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, অর্বাচীন—দাসত্ব করগে। সারা পৃথিবী যার পদানত হতে চলেছে তার দাসত্ব করায় কিছুমাত্র অগৌরব নেই। সেখান থেকে, তাদের একজন হয়ে শিখে এস কী কৌশলে এতগুলি বীরের জাতকে ওরা হারিয়ে দিলে! যখন বুঝবে ওদের যুদ্ধবিদ্যা সব শেখা হয়ে গেছে, তখন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো। আমি তক্ষশীলায় অধ্যাপক-পল্লীতে থাকি।'

যুবক ওঁকে আবার প্রণাম ক'রে বললে, 'আপনার আদেশই শিরোধার্য করলাম। কিন্তু প্রভু, আপনার নাম? কী বলে খোঁজ করব?'

'আমার নাম চাণক্য—তোমার?'

'চন্দ্রগুপ্ত নন্দ।'

সোনার দেশে লোহার মানুষ

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সঙ্গে নারায়ণের সামান্য একটু তর্ক বেধেছিল। নারায়ণ বলছিলেন, 'তোমার পূজো করে সামান্য লোকরা, কই তেমন বড় কেউ করেছে বলে তো শুনি নি! পৃথিবীতে যত বড় সাধক, ভক্ত আছে সবাই আমার জন্যই জপ-তপ করে, তপস্যা করে। এমন কি অসুর রাক্ষস যারা বড় হয়েছে, রাবণই বল আর বৃত্রাসুরই বল, তারাও কেউ তোমার পূজো ক'রে বড় হয় নি—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এঁদের কাছে বর পেয়ে তাদের যা কিছু শক্তি!'

লক্ষ্মী বললেন, 'কেউ হয় নি বলে যে হতে পারে না—এর তো কোন মানে নেই। আমি প্রমাণ ক'রে দেব যে শুধু আমার পূজো ক'রেও পৃথিবীতে মানুষ বৃত্র-বলি-রাবণের মতোই শক্তিশালী হতে পারে!'

এই বলে লক্ষ্মী পৃথিবীর দিকে তাকালেন। নীচের দিকে চাইতেই চোখে পড়ল—সুবর্ণপুরী—সোনার দেশ।

আহা সার্থক নাম! পাহাড় সমুদ্রে ঘেরা সুন্দর দেশ, গাছে তার অমৃত ফল, মাঠে তার সোনার ধান—নদীতে তো জল নয়, যেন ক্ষীরের ধারা বয়ে চলেছে! একই দেশের কোথাও সুমেরুর মতো ঠাণ্ডা, কোথাও সাহারার মতো উষ্ণ মরুভূমি—কোথাও বা স্বর্গের মতো চিরবসন্ত বিরাজমান! কোথাও কোন অভাব নেই, কোথাও দুঃখ নেই! মানুষকে সে দেশে শুধু বেঁচে থাকবার জন্য ছুটোছুটি করতে হয় না, খাটতে হয় না—তারা বেশি চায়ও না। ফুলের গন্ধে, পাখীর ডাকের মধ্যে ছোট ছোট কুটির বেঁধে লেখাপড়া নিয়ে থাকে। তাদের লোভ নেই, বেশি আশা নেই—যা পেয়েছে তাতেই খুশী। অন্য দেশের ঐশ্বর্য নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না, তাদের দেশে যারা আসে তাদেরই সাদরে ডেকে স্থান দেয়। বড় শান্ত, মধুর তাদের জীবন।

যেমন দেখা অমনি মন স্থির করা। লক্ষ্মী নেমে এলেন সুবর্ণপুরীতে।

প্রথমেই গেলেন রাজার কাছে। বললেন, 'তুমি আমার পূজো কর, তোমাকে আমি আরও দেব। সমস্ত পৃথিবীর রাজা ক'রে দেব তোমাকে।'

রাজা মাথা নেড়ে হাতজোড় ক'রে বললেন, 'দেবি, ভগবান আমাকে যে দেশটুকু দিয়েছেন শাসন করবার জন্য, সেইটিই যেন ভালভাবে শাসন করতে পারি এই আশীর্বাদ করুন। আমি ক্ষত্রিয়—প্রজাপালন করা, দুর্বলকে রক্ষা করা আর দুষ্টকে শাসন করা এই আমার কাজ। আর কিছু চাই না, লোভও নেই। যদি সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দিতে পারি তাহ'লেই আমার ঢের পুরস্কার পাওয়া হবে।'

লক্ষ্মী সেখান থেকে গেলেন প্রজাদের কাছে।

পুরুষরা বললে, 'লোভেতে লোভ বেড়েই যায়—ঐশ্বর্যে মানুষের তৃপ্তি নেই। তোমাকে আমরা চাই না, তুমি চলে যাও।'

মেয়েরা বললে, 'তোমার ও ধনদৌলতে আমাদের কি হবে? রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু—এর হাত থেকে তো তুমি আমাদের বাঁচাতে পারবে না! আমরা চাই অমরত্ব—অর্থ নয়। তুমি যাও।'

রাগে লক্ষ্মী জ্বলে উঠলেন। সেখান থেকে সোজা চলে গেলেন শ্বেতদ্বীপে। সেখানকার রাজাকে বললেন সেই কথাই—যা সুবর্ণপুরীর রাজাকে বলেছিলেন।

শ্বেতদ্বীপের রাজা বললেন, 'দেবি, আমার বড় লোভ ঐ সুবর্ণপুরীর ওপর—ওটি দিতে পারেন?'

লক্ষ্মী বললেন, 'পারি। সমস্ত পৃথিবীর রাজা ক'রে দেব তোমাকে—সুবর্ণপুরীও পাবে তুমি।'

রাজা বললেন, 'কি ক'রে?'

লক্ষ্মী জবাব দিলেন, 'আমার অন্য অস্ত্র নেই। আছে লোভ আর আছে এই টাকা, এই দিয়েই পৃথিবী জয় করতে পারবে।'

এই বলে তিনি একটি সোনার টাকা রাজার হাতে দিলেন। বললেন, 'টাকা দিলেই সব জিনিস পাওয়া যায়, এইটে ওদের বুঝিয়ে দাও। ওদের শস্য নিয়ে টাকা দাও, কাপড় নিয়ে টাকা দাও। আর সুন্দর সুন্দর বিলাসের জিনিস নিয়ে গিয়ে ওদের সামনে ধরো, টাকা দিলেই সেগুলো পাওয়া যাবে বুঝিয়ে দাও। এমনি ক'রে আগে যাও বাণিজ্য করতে, টাকাতে ওদের লোভ বাড়ুক, লোভ বাড়লেই দলাদলি হবে, সেই সুযোগে তুমি ওদের রাজ্য জয় করবে। টাকার চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছু নেই বৎস!'

তাই হ'ল।

শ্বেতদ্বীপের রাজা সুবর্ণপুরীর রাজার কাছে লোক পাঠালেন, 'তোমাদের দেশে তো প্রচুর শস্য হয়, আর আমরা খেতে পাই নে—কিছু কিছু দাও না, অবিশ্যি অমনি নেবো না, তার বদলে অন্য জিনিসও দেব।'

সুবর্ণপুরীর রাজা বললেন, 'বেশ তো!'

এল ওরা। সোনার টাকা দু'হাতে ছড়াতে লাগল দেশে। যে জিনিসের কোন অভাব নেই তা দিয়ে এমন চক্‌চকে টাকা পাওয়া যায়—মন্দ কি! সুবর্ণপুরীর লোকরা এই ভেবে টাকা নিয়ে জমাতে লাগল। এমনি ক'রে দেশে একদল হ'ল গরীব, একদল বড়লোক। যারা বড়লোক হ'ল তাদের লোভ বেড়ে গেল—আরও চাই। কারণ তারা ইতিমধ্যে বুঝেছিল যে টাকা দিয়ে এমন অনেক বিলাসসামগ্রী পাওয়া যায়, টাকা না থাকলে যার স্বপ্ন দেখাও দুরাশা! ফলে ঝগড়াঝাঁটি বেড়ে গেল—মিথ্যা কথা বলে, ঠকিয়ে, যেমন ক'রে হোক তাদের আরও চাই।

ঠিক সেই সময়ে সুযোগ বুঝে শ্বেতদ্বীপের রাজা সুবর্ণপুরী আক্রমণ করলেন। সুবর্ণপুরীর রাজা প্রজাদের ডাকলেন যুদ্ধ করবার জন্য—কেউ এল না। ওদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি বেঁধে উঠেছে ভীষণ রকমের—আসবে কেন? বরং কেউ কেউ শত্রুপক্ষে যোগ দিলে।

ফলে একরকম বিনা চেষ্টাতেই সুবর্ণপুরী শ্বেতদ্বীপের অধীন হ'ল। শুধু সুবর্ণপুরী নয়—বলতে গেলে সারা পৃথিবীই ওদের হাতে এসে গেল। টাকা আর লোভ, এই হ'ল ওদের বড় অস্ত্র।

কিন্তু সবচেয়ে দুর্দশা হ'ল সুবর্ণপুরীরই। ভগবান ওদের অনেক দিয়েছিলেন, তাই ওরা এ জীবনের দুঃখকষ্ট কি জানত না—লেখাপড়া নিয়েই থাকত সবাই। সংসারের খারাপ লোকদের সঙ্গে চলতে গেলে যতটা প্যাঁচালো বুদ্ধি থাকা দরকার ততটা কারুরই ছিল না, শ্বেতদ্বীপের লোকেরা ওদের এই সরলতার সুযোগ নিয়ে খুব ঠকাতে লাগল। আর ঐশ্বর্যও তো এদের কম ছিল না। লোভটা সেইজন্যে সকলের বেশি এই দেশের ওপরেই। ফলে অমন সোনার দেশ অভাবে যেন পুড়ে গেল। সুবর্ণপুরীর লোকরা খেতে পায় না, পরনে ওদের কাপড় নেই, লেখাপড়ার কথাও ভুলতে বসল। দেশে অরাজকতা দেখা দিল। রাজার লোকেরা এসেছে ওদের সর্বস্ব নিতে, শাসন করতে—রক্ষা করতে তো আসে নি! দুর্ভিক্ষ মড়ক এখন ওদের নিত্যসঙ্গী। পেটে অন্ন নেই বলে স্বাস্থ্যও দিন দিন সকলের খারাপ হয়ে গেল। এত বড় দেশের লোক বেঁচে রইল যেন মড়ার মতো। বুদ্ধি নেই, স্বাস্থ্য নেই, আনন্দ নেই, জ্ঞানচর্চা নেই—শুধু এক বেলা আধপেটা খেয়ে কোনমতে বেঁচে আছে, পরমায়ু ফুরিয়ে গেলে মরছে, এই পর্যন্ত!

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, যে-দেশে অন্নবস্ত্রের লোভেই বিদেশীরা এসেছিল, সে দেশেরই শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে বিদেশ থেকে চাল আসে তবে খেতে পায়, কাপড় এলে তবে পরতে পায়। চাষীরা চাষ ভুলল. তাঁতীরা ভুলল কাপড় বুনতে—শুধু উদয়-অস্ত গোলামী করে বিদেশী রাজার লোকদের কাছে, সামান্য যা পায় আবার ওদের কাছেই খাবার, কাপড়, ওষুধ কেনবার নাম ক'রে ফিরিয়ে দেয়।

অবস্থা যখন চরমে দাঁড়াল তখন লক্ষ্মী মুচ্‌কি হেসে নারায়ণকে বললেন, 'একবার চেয়ে দ্যাখো!'

নারায়ণও মিষ্টি ক'রে হেসে বললেন, 'তুমিই দ্যাখো!'

লক্ষ্মী চাইলেন অবিশ্বাসভরে। মনের ভাব এই যে, নারায়ণ হেরে গেছেন এবং মানতে চাইছেন না—কী ছেলেমানুষী!

কিন্তু চেয়ে দেখেই চমকে উঠলেন।

ওমা, এ কি!

ঐ শ্মশানপুরীর মধ্যে থেকেই এক শীর্ণ বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছেন। সর্বাঙ্গ নগ্ন,পরনে একটি মাত্র কটিবাস, শিরা-বার-করা দুর্বল হাতে একটি লাঠি, দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ—অত্যন্ত দুর্বল, অসহায় মানুষটি। বয়সে ও রোগে বেঁকে পড়েছেন।...... কিছুই না, তবু লক্ষ্মী শিউরে উঠলেন।

বৃদ্ধ বললেন, 'শ্বেতদ্বীপের লোকেরা লক্ষ লক্ষ জোঁকের মতো আমাদের দেশের ওপর এসে পড়েছে, রক্ত ফুরিয়ে এসেছে আমাদের, তবু ছাড়ছে না! এমন করলে যে আমরা কেউই বাঁচব না, এখনও হয়ত উপায় আছে ওদের তাড়াবার!'

কেউ শুনল তাঁর কথা, কেউ শুনল না। যারা শুনল তারাও অবিশ্বাসের সুরেই বললে, 'ওদের তাড়ানো অত সহজ নয়।...... তা ছাড়া ওদের দোষ কি, আমরাই এক হতে পারি না, আমরাই পয়সার লোভে আমাদের সর্বনাশ করি। রোগে, অনাহারে, অশিক্ষায় আমাদের কি আছে? ওরা চলে গেলে আমরা আরও বেশি করে মরব।'

পঙ্গু বৃদ্ধ যেন সিংহ-গর্জন ক'রে উঠলেন, বললেন, 'মিছে কথা। এ কথা ওরাই শিখিয়েছে, ওদের সুবিধার জন্যে। যা কিছু আমাদের খারাপ, তার জন্য ওরাই দায়ী। আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ওরা চলে গেলে—আগে ওদের তাড়াও।'

উপহাসের হাসি হেসে সবাই বললে, 'কেমন ক'রে তাড়াবে ওদের? ওদের সঙ্গে লড়াই ক'রে পেরে উঠবে?'

'লড়াই করবই না। এমন ব্যবস্থা করব যাতে ওরা আপনিই চলে যাবে।'

'কী ক'রে?' এবার যেন সকলের একটু আগ্রহ হ'ল কথাটা শোনবার।

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, 'ওরা কি জন্যে এখনও আমাদের দেশে পড়ে রয়েছে? আমাদের পয়সা লুঠ করবার জন্যেই তো? এখনও আমাদের যা আছে যৎসামান্য, ওদের জিনিস বেচে দাম হিসেবে তাও নিয়ে যাচ্ছে। ওদের জিনিস কেনা বন্ধ করো, তাহ'লেই ওরা জব্দ হবে। এদেশে থেকে যদি ওদের লাভ না হয়, ওরা আপনিই ছেড়ে চলে যাবে।'

কথাটা সবাই বুঝল না। কেউ ঠাট্টা করলে, কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে। হ্যাঁ—তাই কখনও সম্ভব! খাবো কি, ওষুধ পাবো কোথায়, কাপড় কই?

কিন্তু বৃদ্ধ হাল ছাড়লেন না। একা সেই লাঠিগাছিতে ভর দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে নিজের কথা বোঝাতে লাগলেন। বললেন, 'নিজেরা নিজেদের কাপড়ের সুতো কেটে নাও, নিজেদের তাঁতে বোনো। অভ্যেস নেই বলে মোটা হবে? হোক না, দুদিন পরেই অভ্যেস হয়ে যাবে, আর না হয় মোটা কাপড়ই পরলে! এককালে তো তোমরাই সবচেয়ে সরু কাপড় বুনতে সেটা ভুলে যেও না। তোমাদের বনে অনেক ওষুধের গাছ আছে, তাই দিয়ে ওষুধ তৈরী করো। স্বাস্থ্যের নিয়ম মেনে চলো—অসুখ করবেই না। খাবার নেই? অনেক জমি এখনও পড়ে আছে, ওদের চাকরি ছেড়ে চাষ করো—খাবারের ভাবনা থাকবে না।... মোট কথা, নিজেদের যা দরকার নিজেরা করে নাও—ওদের জিনিস কিনো না।'

দু-চারজন বৃদ্ধের কথা শুনলো। তাতেই শ্বেতদ্বীপের লোকের টনক নড়ল। তারা চেষ্টা করতে লাগল বৃদ্ধকে জব্দ করার। আর তারা বৃদ্ধকে ভয় করছে দেখেই সুবর্ণপুরীর লোকরা বুঝতে পারল যে বৃদ্ধের কথায় কিছু সত্য আছে নিশ্চয়ই, নইলে ওরা ভয় পাবে কেন? পাগল বলে তো তাদের মতো ওরা উড়িয়ে দিচ্ছে না!

তবু দু-চারজন বললে, 'কিন্তু ওদের মতো কলকারখানা তো আমাদের নেই, আমরা এত জিনিস দেশের লোককে জোগাতে পারব কেন?'

বৃদ্ধ বললেন, 'জোগাতে হবে কেন? সবাই নিজের দরকারমতো জিনিস ক'রে নেবে—আগে যেমন আমাদের ছিল, কলু তেল দেবে সবাইকে, তাকে তাঁতী দেবে কাপড়, মুচী দেবে জুতো, কবিরাজ দেবে ওষুধ।'

'তাই কি সম্ভব? সে সেকালে হ'ত—এখন সময় কই?'

'সময়ের অভাবটা যে তোমরাই সৃষ্টি করেছ ওদের মতো হ'তে গিয়ে, ওদের চাকরি করতে গিয়ে। আমরা যদি এমনই থাকি তো শ্বেতদ্বীপের লোকেরা গেলে অন্য দ্বীপের লোকেরা আসবে আমাদের লুঠ করতে, আমাদের দোহন করতে। আমাদের এদেশটা নাকি ভাল বাজার, ভাল বিক্রী হয় ওদের জিনিস—তাই সবাই আসতে চায়। সেই বাজার নষ্ট করো, বিক্রী বন্ধ করো—আর কেউ আসবে না।'

এবার বুড়োর কথা অনেকে বুঝল। আরম্ভ হ'ল তাঁর কথামত কাজ। নিজেরা চাষ করে, নিজেদের চরকায় সুতো কাটে, কাপড় বোনে, ওষুধ তৈরী করে।... শ্বেতদ্বীপের লোকদের মুখ উঠল শুকিয়ে। ওরা নানা রকমে চেষ্টা করতে লাগল যাতে সুবর্ণপুরীর লোকদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না—একদিন ওদের সুবর্ণপুরী ছেড়ে দিয়ে চলে যেতেই হ'ল। আবার সুবর্ণপুরীতে স্বাস্থ্য-সুখ-শান্তি-জ্ঞান সব ফিরে এল। আবার সবাই বলতে লাগল, 'সুবর্ণপুরীর নাম সার্থক—হ্যাঁ, সোনার দেশ বটে!'

নারায়ণ হেসে লক্ষ্মীকে বললেন, 'দেখলে?'

লক্ষ্মী মাথা হেঁট ক'রে জবাব দিলেন, 'দেখলুম।'

ভ্রমণকাহিনী

আজ এমন একটি ছেলের গল্প বলব যে আজ আর ছেলে নেই, তার বয়স অন্ততঃ চল্লিশে পৌঁচেছে। কিন্তু যেদিন সে ছিল কিশোরবয়সী, সেই সময়েই নিজে দরিদ্র হয়েও অনায়াসে নিজের সুখস্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে আর একটি দুঃস্থ লোকের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল। তার নাম? সত্যি নাম নাই-বা বললুম। কেননা হয়ত সে আজও বেঁচে আছে! যদি আমার এসব কথা কানে যায় তো লজ্জা পাবে। নিজের প্রশংসা সে বেচারা কখনও শুনতে পারত না, বড্ড লজ্জা পেত। ধরা যাক্ তার নাম ফণী। সে আর আমি ছেলেবেলায় কাশীতে একই ইস্কুলে, একই ক্লাসে পড়েছি। গল্পের সবটা আমার নিজের দেখা নয়—পরের মুখেই শুনেছি। তবে মানুষটিকে দেখা আছে বলেই কাহিনীটা আমি বিশ্বাস করি। আমি জানি এ সত্য, এ ফণীর পক্ষেই সম্ভব।

ফণী ছিল যেমন রোগা, তেমনি ঢ্যাঙা আর তেমনি কালো। বোধ হয় অত লম্বা বলে চলতে গেলেই সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ত, মনে হত আলকাত্‌রা মাখানো একটা বাঁকা কঞ্চি হেঁটে চলেছে। কিন্তু চেহারা যাই হোক, আমরা সবাই তাকে বড় ভালবাসতুম। ছেলেটার অন্তর ছিল বড় সাদা পরিষ্কার; যখনই হাসত সে, দিল খুলে হা-হা-হা ক'রে হাসত। যারা এ রকম হাসতে পারে, তাদের মন বড় সরল হয়। তারাই হয় সকলের প্রিয়। তা ছাড়া ফণী ছিল অত্যন্ত কৌতুক-প্রিয়, মানুষকে হাসাতে পারত সে বেদম। সর্বদাই

একটা না একটা ঠাট্টা তার মুখে লেগেই থাকতো, অথচ মজা ছিল এই যে, যাদের নিয়ে ঠাট্টা করত তারা কখনও কেউ ওর উপর রাগ করত না, এমন একটা মিষ্টি স্বভাব ছিল ওর। এবার ও আমাদের ক্লাস-টিচার শ্যামবাবুর সামনেই তাঁর হাঁটার নকল ক'রে দেখিয়ে দিলে। আমরা ভাবলুম, তিনি হয়ত ওতে অপমান বোধ করবেন, হয়ত বা রাগ করবেন, কিন্তু এমনই ফণীর হাসির ছোঁয়াচ যে নকল দেখাবার পর ফণী নিজে হেসে উঠতেই শ্যামবাবুও হো হো ক'রে হেসে উঠে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

ফণীরা ছিল অত্যন্ত গরীব। ওর বাবা কাশীরই এক ইস্কুলে বাংলার পণ্ডিত ছিলেন, মাইনে পেতেন মোট কুড়ি টাকা। কাশীতে তখনকার দিনে কুড়ি টাকা অবশ্য খুব কম নয়, তবু ওদের সংসার ছিল বেশ বড়, ওর এক কাকা, মা, বাবা, আরও চার-পাঁচটি ভাই-বোন, খুবই কষ্ট করে চালাতে হ'ত ওদের। ফণী বেচারাকে তো আমি কখনও জামা গায়ে দিতে দেখি নি। একটি ছেঁড়া উড়ুনি গায়ে, আর পায়ে একটা খড়ম, নয়তো একেবারে খালি পা। এই বেশেই তার চিরকাল গেল। এমন কি অনেক দিন পরে যখন সে স্কুল ছেড়ে কলেজে উঠেছে তখন হঠাৎ একদিন দেখা হয়েছিল। তখন দেখি তার ঐ বেশই বাহাল আছে, ঐ খড়ম পায়ে দিয়েই সে স্বচ্ছন্দে রোজ চার মাইল পথ হেঁটে নাগোয়া যায় কলেজে পড়তে, আবার অতটা পথ হেঁটে ফেরে। তবুও কি কুড়ি টাকা আয়ে সংসার চলে? কিছু কিছু যজমানীর কাজ করতেন ওর বাবা. ব্রাহ্মণ-বিদায় প্রভৃতি হলেও দু-চার পয়সা পাওয়া যেত—এইতে কোন রকমে ওদের জীবনধারণ হত। ওর কাকা আর ছোট ভাইবোনেরা প্রায়ই ছত্তরে বা অন্নসত্রে খেয়ে আসত।

এখনকার কথা বলতে পারি না কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলছি, মানে আমার ছেলেবেলার, কাশীতে ইস্কুল-কলেজের ছেলেরা দারিদ্র্যকে একটুও লজ্জা বা অপমানের কারণ বলে মনে করত না। সেই জন্যই সকলেই তাদের সাংসারিক অবস্থার কথা সহজভাবেই গল্প করত—কোন কথা বাড়িয়ে বা মিথ্যে ক'রে বলা কিংবা সত্য গোপন করার প্রয়োজন হ'ত না কখনও। আমাদের ফণীরও তাই একমাত্র যে সখ ছিল তার কথা আমরা জানতুম। ওর জীবনের বোধ হয় সবচেয়ে উচ্চাশা ছিল কলকাতা শহর সে দেখবে। কলকাতার এত গল্প সকলের কাছে সে শুনত যে তার কল্পনায় কলকাতা ছাড়া আর কোন বড় শহরই ছিল না। এমন কি তাকে কেউ লণ্ডন বা নিউইয়র্ক শহর দেখাতে চাইলেও অত উত্তেজিত হ'ত না। বরং আমার মনে হয় যে জিওগ্রাফীতে পড়া ঐ শহরগুলোকে সে একটু করুণার চোখেই দেখত। একমাত্র যে শহর লোকের দেখা উচিত, যে শহরের পৃথিবীতে তুলনা নেই—সে হ'ল কলকাতা। কোনমতে কলকাতা শহরটা একবার চোখে দেখে আসতে পারলেই তার জীবন সার্থক হয়ে যায়।

এই ব্যাপারে তার সবচেয়ে বড় মুরুব্বি ছিলাম আমি। তার অন্য সব সহপাঠীরা, কেউ হয়ত একবার কলকাতা দেখেছে, কেউবা বার দুই। কিন্তু আমি খাস কলকাতার ছেলে, সেইখানেই জন্মেছি, এখনও গরমের ছুটিতে প্রতি বছর কলকাতা যাই, সুতরাং তার শ্রদ্ধা ছিল আমার উপরেই সবচেয়ে বেশি। সে অবসর পেলেই আমার বেঞ্চিতে এসে গা ঘেঁষে

বসত এবং অনুরোধ করত, 'কলকাতার কথা একটু বল্ না ভাই!' কলকাতায় কেমন ক'রে ট্রাম চলে, বাস যায় শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট, কতগুলো বায়োস্কোপ আছে, হাওড়া ইস্টিশন কত বড়, গঙ্গায় সেখানে কত বড় বড় জাহাজ চলে—এসব কথা বহুবার শুনেও তার তৃপ্তি হ'ত না। আমারও তখন বয়স অল্প, আমিও একটু বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতুম। যা দেখি নি আর যা দেখেছি, তার একটা অদ্ভুত মিশ্রণ হ'ত আমার গল্পে—আর সে বেচারা একান্ত তন্ময় হয়ে শুনত সেই সব গালগল্প। বিস্ময়ে তার চোখ ক্রমশ বিস্ফারিত হ'তে থাকত—এক এক সময়ে পলক পড়ত না চোখে।

কিন্তু এই আজব শহর কলকাতা যে ও কোনদিন চোখে দেখতে পারবে, সে আশা ছিল না ওর। তাই শুনতে শুনতে শুধু ওর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ত। ওর বাবাই ছেলেবেলায় একবার মাত্র গিয়েছিলেন, যেন কারও একটা সঙ্গে। এমন কোন ধনী আত্মীয়ও এখন ওর নেই যে ওকে বিনা খরচায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে। সুতরাং কলকাতা ছিল ওর কাছে দুরাশা, সবচেয়ে অসম্ভব স্বপ্নের মধ্যে। আমরাও জানতুম এবং ফণীও জানত যে কলকাতা ওর জীবনে কোনদিনই দেখা হবে না।

ফণী তখন ক্লাস নাইনে উঠেছে, হঠাৎ ওর একটা সুযোগ মিলে গেল। ওদের পাড়ার কাছেই গণেশ মহল্লাতে এক পেনশনভোগী বৃদ্ধ ভদ্রলোক সপরিবারে এলেন। তাঁর নাতিটিকে পড়াতে হবে, মাস্টার চাই। কে একজন ফণীকে সন্ধান দিয়েছিল, ফণী গিয়ে দেখা করতেই তিনি রাজী হয়েছিলেন। নিতান্তই ফার্স্টবুক পড়ে ছেলেটি, মাইনেও প্রায় সেই অনুপাতে ঠিক হ'ল মাসিক দু'টাকা—অর্থাৎ ফণীর মাসিক দু'টাকা নিজের আয় দাঁড়ালো। কিন্তু হ'লে কি হবে? এধারে ওর অন্য সব ভাইরাও ইস্কুলে পড়তে শুরু করেছে, তাদের জন্য ওর বাবার খরচা বেড়েছে ঢের কিন্তু মাইনে এতদিনে কুড়ি থেকে মাত্র তেইশে এসে পৌঁচেছে, ফলে ফণী যে বইগুলো চেয়েচিন্তে না পায় সেগুলো পড়াই হয় না ওর। কাগজ নেই, খাতা নেই, মহা অসুবিধা। ফণী এই টিউশানিটা পেয়ে বেঁচে গেল। পড়াশুনার জন্য যেগুলো একান্ত দরকার, দু'একটা ক'রে ও তাই কিনতে শুরু করল। তাতেই ওর মাসিক দু'টাকা আয় কোন্ পথে অদৃশ্য হ'ত তা সে বুঝতেই পারত না।

তবু যে আশা, যে সংকল্প মানুষের অস্থিতে মজ্জাতে মিশে থাকে তা সফল করার চেষ্টা সে করেই—যে অবস্থাতেই থাক্ না কেন। ফণীও সেই অসম্ভব সম্ভব করার চেষ্টা করতে লাগল। ঐ দু'টাকা আয় থেকেই সে পয়সা জমাতে লাগলো। কলকাতা যেতে আসতে প্রায় দশ টাকা ট্রেনভাড়া, সেখানে ধর্মশালায় থেকে সামান্য কিছু খেয়েও যদি সে চার-পাঁচদিন ধরে ঘুরে ঘুরে শহরটা দেখে, তাহ'লেও অন্ততঃ পাঁচ-ছ'টাকা খরচ—সুতরাং কুড়ি টাকা যেমন ক'রেই হোক ওকে জমাতেই হবে।

যাঁরা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে তাঁরা বুঝতেই পারবেন না, বিশেষত আজকের দিনে, সে কুড়ি টাকা জমাতে কত সময় লাগতে পারে! কিন্তু যাদের চারিদিকে অভাব, যাদের বিরাট সংসার চলে তেইশ টাকায়, তার মধ্যে ইস্কুল-কলেজের খরচাও কিছু কিছু জোগাতে হয়, তাদের পক্ষে চারিদিকের সহস্র অভাব থেকে বাঁচিয়ে উপবাসী ভাই-বোনদের বঞ্চিত ক'রে,

নিজে অসংখ্য খাদ্যসম্ভারের মধ্যে থেকেও ক্ষুধা চেপে রেখে একটিও আনি জমানো যে কত কঠিন কাজ, তা যারা অভাবের সংসারে মানুষ হয়েছে, তারা হয়ত কতকটা বুঝতে পারবে। ফণী সেই দুঃসাধ্য-সাধন-ব্রতেই লেগে গেল প্রাণপণে। কী যুদ্ধটাই না করতে হ'ল ওকে দারিদ্র্যের সঙ্গে, প্রলোভনের সঙ্গে! একবার ক'রে দু'এক টাকা জমে আবার একটা বৃহত্তর প্রয়োজনে হয়ত চলে যায়। এর মধ্যে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হ'ল ওকে। আবার প্রবেশিকা দিয়ে কলেজে ভর্তি হ'তে হ'ল। মাইনে দেবার প্রয়োজন ছিল না বটে কিন্তু এগুলো তো আর রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। ওর বাবা অবশ্য কোন বড়লোককে ধরে কিছু টাকা পেয়েছিলেন—তবু তাতে সব খরচা কুলোয় নি, পাঁচ টাকা ফণীকেও তার এত কষ্টের তহবিল থেকে বার করতে হয়েছিল। এইখানে একটা কথা বলে রাখি, কলেজের বই একখানাও কেনে নি ফণী, সহপাঠীদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আগাগোড়া খাতায় নকল ক'রে নিয়েছিল।

যাই হোক, তবু তিন-চার বছরে একরকম ক'রে কুড়ি টাকা জমল। ইতিমধ্যে ওর টিউশানির মাইনেও বেড়েছিল কিছু, কলেজে ওঠবার পর বোধ হয় পুরো তিন টাকা ক'রেই পাচ্ছিল। সুতরাং এতদিনের স্বপ্ন সফল করবার জন্য উঠে পড়ে লাগল। সে কি ছুটোছুটি বেচারার! এর কাছে গিয়ে গাড়ির সময় জানে, ওর কাছে গিয়ে রাস্তার নাম লিখে নেয়—ব্যস্ততার অন্ত নেই যেন। সব জেনেশুনে যোগাড়যন্ত্র ক'রে নিয়ে যেদিন ও সত্যসত্যই যাত্রা করলে, সেদিন ওর মুখ দেখে মনে হ'ল যেন সাক্ষাৎ স্বর্গ নেমে এসে ওর হাতে ধরা দিচ্ছে, ও যাচ্ছে কলকাতা শহরে নয়, হয়ত বা চন্দ্রলোকেই!

স্টেশনে যখন পৌঁছল ফণী তখন ট্রেন এসে গিয়েছে, ছাড়বারও বিশেষ দেরী নেই। কোনমতে তাড়াতাড়ি টিকেট কিনে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় এক বাধা। একটি হিন্দুস্থানী বুড়ী প্রাণপণে তার প্রায় সতেরো-আঠারো বছরের রুগ্ন ছেলেকে কোলে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে যাবে, টিকেট কলেক্টার ঢুকতে দেবে না তাকে কিছুতেই—বুড়ী হাউ হাউ ক'রে কেঁদে চেঁচিয়ে হাট বাধিয়ে তুলেছে। ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা ক'রে ফণী জানল যে ওর এই ছেলে তিন-চার দিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, কী রোগ এখানকার ডাক্তাররা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। কে একজন ডাক্তার বলেছেন যে কলকাতা মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে ওর চিকিৎসা হ'তে পারে। ওর হাতে এক পয়সাও নেই—ও চায় বিনা ভাড়াতেই ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে যাবে। কিন্তু এরা তা যেতে দিচ্ছে না। বলতে বলতে বুড়ী আবারও হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল, বুকফাটা কান্না—'বাছাকে আর বুঝি বাঁচানো গেল না, হা ভগবান!'

আশেপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নানারকমের সস্তা উপদেশ দিচ্ছিলেন। কেউ বলছিলেন ওধারে লাইন ডিঙিয়ে ঢোক গে যাও, কেউবা বলছিলেন বিশ্বনাথের নাম ক'রে ফেলে রাখতে, যা করবার তিনিই করবেন। কিন্তু ফণী এক মুহূর্তও ইতস্ততঃ করলে না, ছুটে গিয়ে টিকিট-ঘর থেকে আর একখানা টিকিট কিনে আনলে। তারপর সেই দু'খানা টিকিটের সঙ্গে বাকী টাকাটাও বুড়ীর হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, 'যাও বুড়ী, তোমার বাচ্ছাকে দেখিয়ে এসো গে।'

তারপর বেশ প্রফুল্ল মুখেই পুঁটুলী এবং বিছানা বয়ে আবার বাড়ি ফিরে এলো।

এলিজাবেথের সাহস

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে, দুষ্ট গাইয়ের সঙ্গে কপিলা গাইও বন্ধ হয়। এটা মানুষের কথাই বলা হয়, গরুর উপমা দিয়ে। সব দেশে সব কালেই এমন ঘটে।

ফরাসী দেশে বহুশত বৎসরের অত্যাচারের ফলে দরিদ্র জনসাধারণ যখন ক্ষেপে উঠেছিল তখন তাদের সে রোষবহ্নিতে শুধু দোষীরাই পুড়ে মরে নি, বহু নির্দোষ লোকও মরেছে। বন্যার জলের মতো দেশ প্লাবিত ক'রে যে বিদ্বেষের স্রোত বয়ে গেছে সে কি আর অত বিবেচনা ক'রে চলতে পারে? রাজকর্মচারী, ধনী ও জমিদার—এই ছিল তাদের প্রতিহিংসার লক্ষ্য, কিন্তু তাদের সাহায্য করেছে এই সন্দেহে বহু দরিদ্র বা মধ্যবিত্তরাও প্রাণ দিয়েছে, বলতে গেলে বিনা বিচারে এবং বিনা বিবেচনাতেই। মানুষ যখন পাগল হয়ে উঠেছে, প্রতিটি লোকের কথা ভেবে দেখবার তখন সময় কোথা?

আজ যে মেয়েটির কথা বলছি, এলিজাবেথ কাজোৎ, তার বাবা ছিলেন সাহিত্যিক। শহর থেকে বহু দূরে এক নিভৃত পল্লীতে বসে সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ লিখতেন ও পড়তেন। অত্যন্ত শান্ত, নির্বিরোধ মানুষ ছিলেন, পৃথিবীর সমস্ত রকম অন্যায় অবিচার, দলাদলি ও বিবাদ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করতেন প্রাণপণে। দুনিয়ার খবরও বিশেষ রাখতেন না, বইতে যতটুকু পাওয়া যায় সেটুকু ছাড়া। বৃদ্ধ বয়সে অবলম্বন বলতে, সঙ্গী বলতে ছিল শুধু ঐ ষোল বছরের মেয়ে এলিজাবেথ আর ছিল তাঁর বাগান-ভরা ফুলের রাশি।

এলিজাবেথ বড় সুখেই ছিল। সমবয়সী সাথী কেউ ছিল না বলে সে দুঃখবোধ করত না। সরল বৃদ্ধ বাবা, তাঁর রাশিরাশি বই এবং চারিদিকে ফুলের সমারোহ, এরই মধ্যে তার দিন কেটে যেত একটা স্বপ্নের মতো। এর চেয়ে বেশি কিছু তার প্রয়োজনও ছিল না।

বিপ্লবের আগুন যখন জ্বলে উঠল তখন সে সংবাদ এসে পৌঁছল ওদের কানে কোন দূর দেশের সংবাদের মতো। তা নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় নি। বহু দূরের আকাশপ্রান্তের মেঘ-গর্জনের মতোই ছিল তা সুদূর, অন্যমনস্ক হয়ে শোনা যায়, হয়তো কোন অবসর সময়ে তা নিয়ে আলোচনা করাও যায়—কিন্তু তাতে ভয় পাবার কি আছে? এ বিবাদ যে দু'দলে হচ্ছে তাদের কোনটার মধ্যেই তো এরা পড়ে না!

কিন্তু তবু কী থেকে কী হ'ল—হঠাৎ জাতীয় সমিতির তরফ থেকে কতকগুলি লোক এসে বৃদ্ধ কবিকে গ্রেপ্তার করলে।

সে কি কথা! বৃদ্ধ অবাক—না না, নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে।

কন্যা ব্যাকুল হয়ে উঠল, 'আপনারা বড্ড ভুল করছেন। এঁর মতো নিরীহ মানুষকে কখনই ধরতে বলেন নি কেউ—এই বুড়ো মানুষ, এঁকে মিছিমিছি কেন কষ্ট দেবেন?'

যারা ধরতে এসেছিল, তারা শুধু গম্ভীর ভাবে বললে, 'বেশ তো, ভুল হয়—বিচারে ছাড়া পাবে। কিন্তু আমাদের ওপর স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে—এই দেখ না, নাম লেখা রয়েছে পরোয়ানায়।'

অনেক কাকুতি-মিনতিতে যখন তাদের টলানো গেল না, তখন এলিজাবেথ বললে, 'আমি সঙ্গে যাব তাহ'লে।'

বৃদ্ধ কবি হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন, 'না না মা, তুই কেন যাবি? তোকে যদি এরা কোন দুঃখ দেয় তো, তা যে শেলের মতো বাজবে আমাকে—'

'সে হয় না বাবা, সেখানে তোমাকে দেখবে কে? তোমার সেবা করবে কে? তোমার চোখে চশমা থাকতে তুমি চশমা খুঁজে বেড়াও, খাবারের সামনে বসে খেতে ভুলে যাও—'

জাতীয় সমিতির সদস্যরা বললে, 'তোমার নামে তো গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নেই, তোমায় কেন ধরব? সে আমরা পারব না।'

এলিজাবেথ দু'হাতে ওর বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'তা হ'লে আমার বাবাকেও নিয়ে যেতে পারবেন না আপনারা। হয় দুজনকেই নিয়ে যেতে হবে—নইলে আমাকে মেরে ফেলতে হবে আগে। আমি ছাড়ব না।'

ওরা দেখলো অত হাঙ্গামায় দরকার কি? চলো হে চলো—দুটোকেই নিয়ে চলো। গিলোটিনের খোরাক যত বাড়ে ততই ভালো।

ওঁদের দুজনকেই ধরে নিয়ে গিয়ে সদরে জেলখানায় বন্ধ ক'রে রাখলে।

তারপর কোথায় বা বিচার, কোথায় বা কি? ওদের দুঃখ-দুর্দশার সীমা নেই। একরত্তি কারাগারে অসংখ্য লোক, নিয়মিত খেতেও দেয় না কেউ। নানা রকমের লোকের ভীড়ে অনাহারে অনিদ্রায় দিন কাটে। ওরা বন্ধই হয়ে রইল এইভাবে। কর্তারা বোধহয় ভুলেই গেছেন ওদের কথা।

এইভাবে ন'দিন কাটবার পর হঠাৎ এক উন্মত্ত জনতা প্রচুর নেশা ক'রে এসে হাজির। জেলখানার দোর খুলে ভেতরে ঢুকে ওর ভেতরেই এক বিচারসভা বসালো। বিচারসভা তো কত, নিজেদেরই ভেতর থেকে কয়েকজনকে দেখিয়ে বলা হ'ল—এরাই তোমাদের বিচারক।

তারপর ঐসব কয়েদীদের একে একে হাজির করা হ'ল বিচারকদের সামনে। বিচারকরা খুব গম্ভীর হবার চেষ্টা ক'রে বললেন, 'বলো, তোমাদের কী বলবার আছে!'

যাদের হাজির করা হ'ল তাদের তো প্রাণের ভয়, তারা ভুলে গেল যে এর সবটাই প্রহসন, তারা প্রাণপণে নিজেদের নির্দোষিতা প্রমাণ করার চেষ্টা করতে লাগল। বিচারকরা নেশার ঘোরে কিছুক্ষণ চোখ বুজে তাদের যুক্তি শোনবার চেষ্টা করেন আর একটু পরে গম্ভীরভাবে বলেন, 'ও, তাই তো বটে—এ তো দেখছি ভুলই হয়েছে। আচ্ছা, এদের অন্য কারাগারে নিয়ে যাও।'

তারপর বেচারী কয়েদীরা আপাতত অব্যাহতি পেল মনে ক'রে যেমন বাইরে যাবার চেষ্টা করতে লাগল, বাইরের জনতার হাতে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এরা কে, কি এদের অধিকার, এই যে এরা নির্বিচারে হত্যা করছে তাই বা কোন্ সাহসে—এসব প্রশ্ন তখনকার দিনে ফ্রান্সে ছিল না। জনতাই সব, গায়ের জোরই বড় অধিকার।

কাজোতের পালা যখন এল তখন এলিজাবেথ করুণভাবে বিচারকদের কাছে বোঝাতে চেষ্টা করলো যে, ওর বাবা কত নির্দোষ, কত নিরীহ। কখনও অত্যাচারীদের কোন সাহায্য

করে নি, কখনও হাত মিলোয় নি তাদের হাতে— বরং আশ্বাস দিয়েছে দেশের নিপীড়িত জনসাধারণকে—

খানিকটা পরে চোখ খুলে একজন বিচারক ঐ একই রায় দিলেন, 'ও তাই তো, এটা ভুলই হয়েছে। আচ্ছা এদের অন্য কারাগারে পাঠিয়ে দাও। পরে একসঙ্গে তদন্ত হবে।'

ঐটেই ওদের কৌতুক, ওদের খেলা।

এলিজাবেথ অত জানে না। জানে বাবাকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে—এই মাত্র। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে ব্যাপার বুঝতে পারলে। অসংখ্য দলিত বিকৃত শব চারিদিকে, মানুষের ওপর মানুষে কত নৃশংস হ'তে পারে তারই কাহিনী সর্বাঙ্গে নিয়ে পড়ে আছে তারা, যারা কিছুক্ষণ আগেও তার আশেপাশে জীবনের আশা বহন ক'রে চলেছিল প্রাণপণে।

ততক্ষণে উন্মত্ত রক্তপাগলের দল ধরেছে ওর বাবাকে। সত্তর বছরের অথর্ব বৃদ্ধকেও তারা রেহাই দিতে প্রস্তুত নয়।

চকিতের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে এলিজাবেথ পাগলের মতো সবাইকে ঠেলে সরিয়ে কাছে গিয়ে বাবাকে নিজের দেহ দিয়ে ঢেকে দাঁড়াল—'খবরদার, আমাকে না মেরে আমার বাবার গায়ে হাত দিতে পারবে না কেউ!'

ঐটুকু একফোঁটা মেয়ের সিংহিনীর মতো মূর্তি দেখে সবাই বিস্মিত, হতচকিত। তাদের এমনি নেশা ও রক্তের নেশা দুই-ই যেন ছুটে গেল খানিকটা ক'রে।

তখন এধারেও যেন সরস্বতী ভর করেছেন এলিজাবেথের রসনায়, সে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা ক'রে চলেছে, 'এ কী করছ তোমরা? রক্তের নেশায় পাগল হয়ে এ কী করতে বসেছ? নিরপরাধ অসহায় বৃদ্ধ তোমাদের কল্যাণ ছাড়া কখনও অকল্যাণ করেন নি—এঁকে এমনভাবে হত্যা করলে সে পাপ কোথায় রাখবে? তোমাদের স্বাধীনতাই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে যে সেই পাপে!'

আরও কত কি! সে বক্তৃতার ফলে চারিদিকে কোলাহল উঠল, 'ছেড়ে দাও। যেতে দাও ওদের।'

কী হ'ল সে জনতার মনে কে জানে! সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো সরে দাঁড়ালো, এলিজাবেথ তার বাবাকে নিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে গেল সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে। ষোল বছরের মেয়ে তিন-চারশো হিংস্র লোকের হাত থেকে তাদের শিকার ছিনিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো!

অজন্তার আত্মা

অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি বললে ভুল বলা হয়। ঘোড়ার নালের মতো পাহাড়টি বেঁকে গেছে, তারই গায়ে সার সার উনত্রিশটি গুহা। কোনটা একটু ওপরে, কোনটা নীচে। গুহাগুলোর সামনে দিয়ে যে সরকারী পথটি তৈরী করা হয়েছে, সেটিও কোথাও সিঁড়ি হয়ে নেমে গেছে, কোথাও বা উঠেছে। আর এই অশ্ব-ক্ষুরাকৃতি পাহাড়ের মুখটি সম্পূর্ণ আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি পাহাড়। খুঁজে খুঁজে এই স্থানটিই বৌদ্ধ ভিক্ষুকরা বেছে নিয়েছিলেন—যাতে বাইরের কোথাও থেকে তাঁদের এই উপাসনার জায়গাটি নজরে না পড়ে। একেবারে দুটো পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে না পড়লে কিম্বা সামনের পাহাড়ের ওপরে না উঠলে এর অস্তিত্বই টের পাবার উপায় নেই। আর হয়েছিলও তাই—মুসলমান আমলে একেবারেই জায়গাটা জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছিল, ওর খবরও কেউ জানত না। মাত্র পঁচাত্তর বছর আগে, এক সাহেব সামনের পাহাড়ে শিকার করতে এসে হরিণের পিছু পিছু একেবারে সবচেয়ে উঁচু শিখরটায় উঠে পড়েন এবং হঠাৎ দেখতে পান গভীর জঙ্গলে ঢাকা এই পাহাড়টার গায়ে সার সার গুহাগুলি প্রেতাবাসের মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর অবশ্য ভারত সরকার ওঁর হাতেই ভার দেন এগুলিকে পরিষ্কার ক'রে রক্ষা করার এবং এ-সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার। ক্রমশ এর সংবাদও দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল—কত শিল্পী চেষ্টা করলে এর ভেতরে দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলোকে নতুন ক'রে রূপ দিতে—কত শিল্পী এর থেকে প্রেরণা পেয়ে বিখ্যাত হ'ল। গবর্ণমেন্টের বহু অর্থ এগুলিকে রক্ষা করতে ব্যয় হ'ল—আজও হচ্ছে। বাস্তুকর্মীদের যত্নের ত্রুটি নেই এর বর্তমান অস্তিত্বটুকুকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে।

জায়গাটি কিন্তু বেশ। হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের উঁচু-নীচু রুক্ষ জমি, মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে আমাদের বাস ছুটে এল। কোথাও কোথাও তা দুদিকেই দিগন্তবিস্তৃত—লোকালয় বা চাষবাসের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। গাছপালা বলতে শুধু মধ্যে মধ্যে কাঁটাগাছ। সবটা জড়িয়ে কেমন একটা ছবির মতো দেখায়। এরই ভেতরে এই পাহাড় দুটি, বোধ হয় সাতপুরা পর্বতমালারই একটা শাখার প্রান্তে নির্জনে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষাকৃত এই পাহাড় দুটিই একটু শ্যামল, অজন্তা গুহাগুলির কোল বেয়ে একটি ঝরণাও নেমে এসেছে, বারো মাসই তাতে জল থাকে। লোকচক্ষুর আড়ালে জনহীন এই পর্বতগুহা, তপস্যা করারই উপযুক্ত স্থান বটে।

এ গুহাগুলো কিন্তু স্বাভাবিক নয়—মানুষের কাটা। সবগুলো একসঙ্গেও কাটা হয় নি—ন'শো বছর ধরে বলতে গেলে এর নির্মাণ-কার্য চলেছে। যার যখন ইচ্ছা ও সুবিধে হয়েছে, সে তখন একটা গুহা কাটিয়েছে। এর ভেতর, ঐতিহাসিকরা বলেন, ন' নম্বর গুহাটিই নাকি সবচেয়ে পুরনো। খ্রীষ্টের জন্মাবারও প্রায় দুশো বছর আগে এর নির্মাণ শুরু

হয়। এর কোন-কোনটাতে বুদ্ধদেবের দেহচিহ্ন অবলম্বন ক'রে চৈত্য বা ছোট ছোট স্তূপ তৈরী করা হয়েছে, এসব গুহাতেই বোধ হয় তখন পূজা-উপাসনা চলত। সব গুহা এক রকম নয়—কোনটা বড়, কোনটা ছোট। সবগুলোতে ছবিও নেই। অবশ্য যত ছবি আঁকা হয়েছিল, তার খুব কম অংশেরই আজ অস্তিত্ব আছে, তবু কতকগুলোতে যে মোটে আঁকবার চেষ্টা করাই হয় নি তা বেশ বোঝা যায়। এর ভেতর আবার কোন-কোনটাতে কিছু ক্ষোদাইয়ের কাজ আছে, কোনটা বা শুধু মসৃণ সাধারণ পাথরের দেওয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এই শেষের শ্রেণীর গুহাগুলো, বেশ বোঝা যায় যে, অধিকাংশই তৈরী হয়েছিল শুধু প্রয়োজনে, অর্থাৎ ভিক্ষুদের ও ছাত্রদের থাকবার কিংবা পড়বার স্থান দিতে। থাকবার ব্যারাক যেগুলো, সেগুলো ভারি মজার, ছোট ছোট নীচু পাথরেরই খোপ মতো ঘর (পাহাড় কেটে বার করা—গাঁথা নয়—তা বলাই বাহুল্য), তাতে সামনাসামনি দরজার দু-পাশে দুটো পাথরেরই শোবার বেদী। পাশে একটি ক'রে কুলুঙ্গি কাটা, বোধ হয় পুঁথি রাখবার জন্য। আর বেদীর একদিকে একটা ক'রে পাথরের বালিশ। বেদীটাই এমন ভাবে ক্ষোদা হয়েছে যে, সেখানটা বালিশের মতো সামান্য উঁচু হয়ে আছে। কোন বিলাস বা আরামের ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্র ও ভিক্ষুদের সেই পাথরের শয্যাতে পাথরের ওপর মাথা দিয়েই শুতে হ'ত। মৃগচর্ম বা ব্যাঘ্রচর্ম পেতে শুতেন কিনা জানি না, তবে বালিশ যে জুটত না, তা ঐ পাথরের বালিশ দেখলেই বোঝা যায়। এই সব ঘরের একটা ক'রে দোরও ছিল—তার চিহ্ন আছে, তবে কপাট নেই।

সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত, তার ওপর আমার সঙ্গীদের মতো ঠিক অত দ্রুত দেখতেও পারি না—সুতরাং আমি একটু পেছিয়েই পড়েছিলাম। তা ছাড়া শুধু ছবি দেখার জন্য আমি আসি নি—ছবিওলা গুহার চেয়ে এই বসবাসের গুহাগুলোতে আমার কম কৌতূহল নেই। অথচ এগুলো সাধারণ দর্শকরা এড়িয়েই যান। আমি সেই নির্জন নিস্তব্ধ পাথরের বিরাট গুহার মধ্যেকার এই খুপ্‌রি-কাটা ঘরের কঠিন অনাড়ম্বর দেওয়ালগুলোর মধ্যে বহুশত বৎসর আগেকার এই ঘরগুলির অধিবাসীদেরও পরিচয় পাবার চেষ্টা করি। এর কোথাও কোন ইতিহাস লেখা নেই, তবু এরই ভেতর তারা বাস করেছে—বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী। কত লোক, কত রকমের লোক। কেউ হয়ত ঐসব কুলুঙ্গীতে পুঁথি রাখত, কেউ রাখত পেড়ে-আনা বন্য ফল কিম্বা বিহারের মহোৎসব থেকে বাঁচানো অথবা চুরি-করে-আনা পিষ্টক ও মিষ্টান্ন। কেউবা তাদের মধ্যে ছিল আমুদে, কেউ বা বদ্‌-মেজাজী। কেউ ভুগত আমাশায়, কেউবা হাঁপানী রোগে। কোন ছাত্রকে হয়ত পড়া শেষ করার আগেই মলিন-মুখে বিদায় নিতে হয়েছে। কেউবা দু'হাত ভরে আচার্য ও স্থবিরদের আশীর্বাদ এবং প্রশংসা নিয়ে উজ্জ্বলমুখে বাড়ি ফিরে গেছে। কোন ভিক্ষু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, সন্ন্যাসী হয়েছেন, মহাস্থবির হয়েছেন, কাউকে হয়ত কোন অপরাধে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনি কত এলোমেলো কথা মনে হয় আমার এই পাথরের ঘরগুলিতে ঘুরতে ঘুরতে। কেমন লোক ছিল তারা কে জানে? কী ভাষায় কথা কইত? কী

খেত? কোন ইতিহাসে কোথাও লেখা নেই আজ সত্য কথা কিন্তু এই পাষাণ-প্রাচীর, এই শয়নের বেদীগুলো যদি কথা কইতে পারত, তাহ'লে কত গল্পই শুনতে পেতাম, কত বিচিত্র বিবরণ নানাবর্ণের বিচিত্র মানুষের!

ঘুরতে ঘুরতে পরিশ্রান্ত হয়ে একটা খুপ্‌রিতে বসে ওই সব কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল এই বিছানায় কত দিন কত লোক শুয়েছে—আমিও শুয়ে যাই। দেখা যাক পাথরের বালিশে মাথা দিয়ে শুতে কেমন লাগে! সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম সেই পাথরের ওপরই। ধুলো বিশেষ নেই, অত উঁচুতে বোধ হয় ধুলো ওড়ে না। পাথরের বালিশগুলি বেশ মাথার মাপ মতোই তৈরি, সুতরাং খুব কষ্ট হ'ল না। ক্লান্তির পর বিশ্রাম এবং ঠাণ্ডা বাতাস পেয়ে বরং দুই চোখ যেন বুজেই আসতে লাগল। তবু ঘুমোলুম না, শুয়ে শুয়ে এই কথাটাই ভাবতে লাগলুম, এমন ক'রে এত দীর্ঘকাল এই গুহাগুলো সম্পূর্ণরূপে মানব-দৃষ্টির অগোচরে রইল কী ক'রে?

ভাবতে ভাবতে বোধ হয় একটু তন্দ্রাও এসেছিল, হঠাৎ যেন কার একটা নিঃশ্বাসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

চমকে চেয়ে দেখি আমার বেদীটার ঠিক পাশের বেদীতে, মাত্র হাতখানেক দূরে এক ন্যাড়া-মাথা, হলদে-কাপড়-পরা বৌদ্ধ ভিক্ষু কখন এসে বসেছেন। আশ্চর্য, আমি কি এতই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম?

ভিক্ষু একটু হেসে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'আমার পায়ের আওয়াজ পাওয়া সম্ভব নয়—তাই শুনতে পান নি!'

আরও অবাক হয়ে গেলাম। কালো রং, ঠোঁট পুরু—এদেশের অধিবাসীদের সঙ্গেই চেহারার মিল বেশি। আমি তো দক্ষিণী বলেই মনে করেছিলাম! প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কি বাঙালী?'

'না। আমি তামিলী কিন্তু আমি এখন যেখানে থাকি সেখানে সব ভাষাই আপনা-আপনি আয়ত্ত হয়।'

'সে আবার কোন্ দেশ?' মনে মনে ভাবি।

ভিক্ষুই উত্তর দেন, 'যে দেশে জাতি-বিচার নেই, ধর্ম নেই—দেশের কোন গণ্ডী টানা নেই, অর্থাৎ আমি এখন পরলোকে আছি।'

ভয়ে গা-টা শিরশির ক'রে ওঠে। কোনমতে প্রশ্ন করি, 'তবে কি আপনি ভূত?'

'ছি! ভূত বলে কিছু নেই। আমি হচ্ছি এখানকার শেষ সঙ্ঘাচার্য বা মহাধ্যক্ষ, ভিক্ষু জ্ঞানশ্রীর আত্মা। আমিও এখানকার শেষ অধিবাসী। আপনি যা ভাবছিলেন তার উত্তর দেব বলেই আপনাকে দেখা দিলাম, নইলে আমি দৃষ্টি ও স্পর্শের অতীত, আমার সত্যিসত্যিই কোন রূপ বা অস্তিত্ব নেই।'

সমস্ত দেহটা যেন কী একটা ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আছে, তবু পালাতে পারি না। এত কাছে ভিক্ষু বসে রয়েছেন, পালাব কি ক'রে?

ভিক্ষু বললেন, 'সমস্ত ইতিহাসই একে একে ধরা পড়ল; যা আজও পড়ে নি তাও

একদিন হয়তো পড়বে কিন্তু আমার কথা জানবার আর কোন উপায় নেই যে। তার না আছে কোন সাক্ষী, আর না আছে কোন প্রমাণ। সেই জন্যই আজ আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি, আমার এই কথাগুলো আপনি লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে যাবেন। পৃথিবীকে জানিয়ে দেবেন, আমার আচার্য ও গুরুদেব যে কঠিন দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, আমি প্রাণপণে তা বহন করেছি। অমানুষিক সে কাজ—তবু করেছি।'

এতক্ষণে যেন জিভে একটু জল ফিরে এসেছে। তবু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি, 'কী সে কাজ?'

'বলছি। তাই বলতেই এসেছি। এত যে অসাধ্যসাধন করলাম, তার কোন ইতিহাস কোথাও থাকবে না—এ কেমন ক'রে সইব?'

একটু বিদ্রূপ ক'রে বললাম, 'আপনাদেরও তাহ'লে বিজ্ঞাপনের লোভ আছে?'

তিনি ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিলেন, 'এটা বিজ্ঞাপন নয়, আত্মপ্রচারও নয়—ইতিহাস। ভারতের পুরাকাহিনীতে এতবড় একটা অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে আমি না বললে এ কথাগুলো! মন দিয়ে শুনুন।'

তিনি একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আমি যখন প্রথম শিক্ষার্থী হয়ে এখানে আসি, তখন এই ঘরে, ঐ যে শিলাসনে আপনি শুয়ে আছেন, ঐ শিলাসনেই আমার স্থান হয়েছিল। এটি তাই আমার বড় প্রিয়। মধ্যে মধ্যে নির্জন গুহাগুলোয় ঘুরতে ঘুরতে তাই এখানে এসে বসি।

সে আজ প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা। বৌদ্ধধর্মের আর কোন প্রভাবই নেই কোথাও। ভারতবর্ষ থেকে তা লোপ পেতে বসেছে। এতবড় বিহারে তখন গুটি পাঁচ-সাত শিক্ষার্থী ও ভিক্ষু এসে ঠেকেছে। আমিও এখানকার শেষ শিক্ষার্থী। কেউ আসত না, আর কেউ আসেও নি। বরং আমি আসতেই বৃদ্ধ স্থবিররা বিস্মিত হয়েছিলেন।

আগে আগে রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ কিংবা বৌদ্ধদের অনুগত, সুতরাং পয়সার অভাব ছিল না, কিন্তু আমার আমলে কোন রাজকীয় সাহায্যই আর বৌদ্ধ বিহাররা পেত না। বিক্রমশীলা, নালন্দা তখন লোপ পেয়েছে, সারনাথ মাটির তলায় অর্ধেক ঢাকা পড়ে গেছে। আমাদের এখানেও শোচনীয় অবস্থা। পুরাতন সঞ্চয় যা সামান্য ছিল মঠের কোষাগারে, তা থেকে কোনমতে পাঁচ-সাতটি লোকের চলত। শীতকালে তবু দূরবর্তী গ্রামে ভিক্ষায় যেতাম, তাও তারা বিশেষ ভিক্ষা দিতে চাইত না—হলদে কাপড় দেখলেই বিরক্ত হ'ত। বর্ষাকালটা সম্পূর্ণভাবে বন্য ফল ও কন্দ খেয়ে কাটাতে হ'ত।

এইভাবে আরও কিছুদিন কাটল। অপর যারা শিক্ষার্থী, তারাও চলে গেল, কেউবা এ পথ ছেড়েই দিল। দু-একজন সন্ন্যাসী যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও দেহ রাখলেন। এতবড় বিশাল বিহার, যা একদা লোকের ভীড়ে সর্বদা উত্তপ্ত থাকত, সেখানে এসে ঠেকলাম শুধু সঙ্ঘাচার্য শীলভদ্র ও আমি। আমি প্রথমে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র শিখতে এসেছিলাম সত্য কথা, আত্মীয়-বান্ধবরা অনেক নিষেধ করেছিলেন, বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে এদেশ থেকে যে ধর্ম লোপ পেয়ে যাচ্ছে তার শাস্ত্র অনুশীলনে প্রয়োজন নেই—কিন্তু কারু কথাই তখন শুনি নি।

তবে এখানে কিছুদিন থাকবার পর সে আগ্রহ আমার তত ছিল না, শুধু আচার্য শীলভদ্রের মায়া কাটিয়ে আর বিদায় নিতে পারি নি। অসহায় বৃদ্ধ আচার্য একা এই বিশাল মৃত্যুপুরীর মধ্যে কী করে থাকবেন আমি চলে গেলে? অথচ ওঁর নিষ্ঠা অসাধারণ, যদি কেউ না থাকে তবু তিনি এই বিহার ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না। একটিমাত্র বিশ্বাসের শিখা অনির্বাণ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তিনি, কোন দুর্দিনের ঝড়েই সে প্রদীপ নেভা সম্ভব নয়।

সুতরাং আমিও থেকে গেলাম। আমিই আহার্যের সংস্থান করি, সকালে ফুল এবং সন্ধ্যায় প্রদীপ সাজিয়ে দিই চৈত্য-পাদমূলে। আর রাত্রে গুরুর পদ-সেবা করতে করতে অন্ধকারে বসে তাঁর উপদেশ ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনি। বেশী আলো জ্বালাবার মতো তেল ছিল না। ভাগ্যিস এর অনেকগুলো গুহাই তখন অব্যবহার্য হয়ে জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছিল, নইলে ভয়ে টিকতে পারতুম না নিশ্চয়ই!

ইতিমধ্যে শীলভদ্র খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন—মহাস্থবির বিশেষণটি দিন দিন সত্য হয়ে আসছিল। ক্রমে এমন অবস্থা হ'ল যে, তিনি নিজেও বুঝতে পারলেন যে আর বেশিদিন তিনি ইহলোকে নেই। আমি তো সত্য কথা বলতে কি, তাঁর মৃত্যুর দিন গুনছিলাম, তিনি দেহ রাখলেই আমিও এই নির্জন পর্বত-গুহা ত্যাগ করব। আমার সাধনা তখনও এমন স্তরে পৌঁছয় নি যাতে এই নির্জন পাহাড়ে একা বসে তপস্যা করি।

শীলভদ্রও বোধহয় আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি হঠাৎ একদিন আমার সমস্ত কল্পনা উল্‌টে দিলেন। বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিন সকালে সহসা আমাকে বললেন, "বৎস, আমাকে মহাচৈত্যে নিয়ে চলো, আমি শেষ পূজা সেরে যাই।"

তখন তিনি চলৎশক্তিহীন, কেমন ক'রে অতটা যাবেন? ভয় হচ্ছিল যে, বোধহয় তাঁকে নাড়তে গেলেই মারা যাবেন। কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনলেন না, জিদ্ করতে লাগলেন। অগত্যা তাঁকে, বলতে গেলে টানতে টানতে নিয়ে এলাম তাঁর বাসস্থান থেকে ওপরের ঐ মহাচৈত্যে। বুড়োর জান অসম্ভব শক্ত। নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল মাঝে মাঝে, চোখ ঠেলে বেরোবার উপক্রম হ'ল—তবু তিনি নিবৃত্ত হলেন না। আমি প্রতিমুহূর্তেই ভয় করছিলাম যে এই বুঝি গুরুহত্যার জন্য দায়ী হতে হয়! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিরাপদেই পৌঁছলেন।

তখন আর স্নানের অবস্থা ছিল না। ঝরণার জল ছিটিয়ে দিলাম তাঁর মাথায়, ফুল-চন্দন সব হাতের কাছে গুছিয়ে দিলাম। তিনি প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। তাঁর কম্পিত শিথিল হাত ফুল ধরতে পারে না—আমিই তাঁর হাতে ফুল দিয়ে হাত এগিয়ে দিলাম বেদীর দিকে।

এইভাবে পূজা শেষ ক'রে সহসা তিনি বললেন, "বৎস শোন, আমার একটি শেষ কর্তব্য বাকী আছে। সেটি পালন করব এবার।"

"আদেশ করুন।" বললাম সবিনয়ে।

তিনি ইঙ্গিতে আমার মাথা তাঁর হাতের কাছে নিয়ে যেতে বললেন। আমি মাথা নোয়ালাম। তিনি তাঁর তুষার-শীতল ডান হাতটি কোনমতে আমার মাথায় রেখে বললেন, "আমি শীলভদ্র, এই বিহারের শেষ সঙ্ঘাচার্য ও মহাস্থবির, তোমাকে আমার উত্তরাধিকারী

ও ভাবী সঙ্ঘাচার্য নিয়োগ করলাম। আজ থেকে এই বিহার ও চৈত্যের ভার তোমার। যদি কখনও কোন শিক্ষার্থী কি ভিক্ষু আসে, তুমি গুরুর কর্তব্য পালন করবে—এই চৈত্য ও প্রভু অমিতাভের এই পূজার স্থানকে রক্ষা করবে প্রাণপণে। এই তোমার প্রতি আমার শেষ আদেশ।"

আমি যেন হাঁপিয়ে উঠে, প্রায় চিৎকার ক'রে বললাম, "এ কী করলেন গুরুদেব? এ সঙ্ঘে আর লোক কোথায়? আমি কার ওপর গুরুত্ব করব? তা ছাড়া আমার ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণের অবসর দিলেন না যে, আমি কী ক'রে এ-পদ গ্রহণ করব?"

"সে আমি বুঝব বৎস। আমিই যখন মনোনয়নের একমাত্র অধিকারী বর্তমানে— তখন সে দায়িত্ব আমার। তুমি এই চৈত্য স্পর্শ ক'রে শপথ করো যে এ-দায়িত্ব তুমি বহন করবে প্রাণপণে? বলো, বলো—আমার আর সময় নেই।"

অগত্যা তাই বলতে হ'ল। আর সময় ছিল না সত্যিই, কারণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুরুদেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আমি ভেবে দেখবারও অবসর পেলাম না—'না' বলতেও বড্ড মায়া হ'ল।

কিন্তু কোনমতে গুরুদেবকে সমাধিস্থ ক'রে যখন একটু বিশ্রামের অবসর পেলাম তখন আমার শপথের পূর্ণ গুরুত্বটা বুঝতে পারলাম। স্বার্থপর গুরুদেব এ কী ক'রে রেখে গেলেন আমাকে? জীবন্মৃত হয়ে রইলাম! এই বিশাল দুটি পাহাড়ে বাইরের জগৎ ও সংসার যেখানে একবারে আবরিত ক'রে রেখেছে, সেইখানে লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে এই বিশাল শূন্য গুহাগুলির মধ্যে একা একা প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াতে হবে আমাকে দিনের পর দিন? হয়ত বা বাইরের জগৎ এর অস্তিত্বই ভুলে গেছে। তাঁরা কোনদিনই হয়ত কল্পনাও করবে না যে এর ভেতর কোন মানুষ আছে!

যতই কথাটা ভাবতে লাগলাম ততই যেন দম বন্ধ হয়ে এল। চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠলাম একবার কিন্তু সে কান্নার শব্দ চারিদিকের শূন্যতায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এসে আমাকে স্তব্ধ ক'রে দিলে! অথচ উপায়ও নেই, মৃত গুরু এবং চৈত্য স্পর্শ করে শপথ করেছি, প্রাণপণে এই বিহারের রক্ষণাবেক্ষণ করব—সে শপথ ভাঙবার সাধ্য আমার ছিল না।

সুতরাং এমনি ক'রেই দিন কাটতে লাগল—এই প্রহরীহীন ও কপাটহীন নির্জন কারাগারে আমি একা। একা একাই ভূতের মতো নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াই। পুঁথিগুলো উল্টে দেখি, নয়ত নিজেও কিছু লেখবার চেষ্টা করি। আমার তখনকার দৈনন্দিন জীবনের একটা ইতিহাস বা অভিজ্ঞতা যা বলেন, লিখবারও চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এখানকার অসংখ্য পুঁথির সঙ্গে তাও নষ্ট হয়ে গেছে।

এইভাবেই কাটে— দিন, মাস, বৎসর, যুগ। আগে তবু দু-একদিন ভিক্ষায় বেরোতাম, ইদানীং আর তাও ইচ্ছা করে না। একা মানুষ—কার জন্য ভিক্ষা করব? বাদামের তেল তৈরি করি, তাতেই আলো জ্বলে আর ফলমূল খাই। হঠাৎ প্রায় তিন বৎসর একাদিক্রমে এইখানে বন্ধ হয়ে থাকবার পর অত্যন্ত বস্ত্রাভাব হওয়ায় একদিন ভিক্ষায় বার হলাম। পথ-

ঘাট অপরিষ্কার, প্রায় রুদ্ধ—তবু যাওয়া যায়। কিন্তু অত কষ্ট ক'রে লোকালয়ে গিয়ে চমকে উঠলাম। সর্বত্র একটা ভয়ের ভাব, সর্বত্র আতঙ্ক। ব্যাপার কি? অনেক চেষ্টার পর শুনলাম, একদল বিদেশী ও বিধর্মী দস্যু উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পার্বত্য পথ বেয়ে এসেছে ভারতবর্ষের সর্বস্ব লুঠ করতে। দেবস্থান ও মঠ বা বিহারের ওপর তাদের বৈশি ঝোঁক। সোমনাথের মন্দির ভেঙে নিশ্চিহ্ন করেছে, মালবের স্বপ্ন-বাসুদেবের মন্দিরের অস্তিত্ব নেই। দু-একটি বৌদ্ধ বিহার বা চৈত্য যা তাদের পথে পড়েছে, তারা কেউই রক্ষা পায় নি। সেই দুর্বার দস্যুদল নাকি এবার দাক্ষিণাত্যের দিকে এগোচ্ছে।

ভয় পেয়ে এখানে ফিরে এলাম। তখন সঠিক সংবাদ জানার কোন উপায় ছিল না, কিন্তু এদের দেখে মনে হ'ল শত্রু নিকটে এসেছে।

এখন কী করি? কি ক'রে এই চৈত্যকে রক্ষা করি? আমি যে শপথ করেছি প্রাণপণে এই চৈত্য-বিহারকে রক্ষা করব! যদিও তখন গুরুদেবের মনে এরকম সম্ভাবনা জাগে নি, তিনি সাধারণভাবেই রক্ষা করার কথা বলেছেন, পূজাঅর্চনা ঐতিহ্য রক্ষা করার কথাই হয়ত তাঁর মনে ছিল, তবু শব্দের অর্থ তাতে বদলায় না।

ভেবে যেন কূল-কিনারা পেলাম না। একে তো একা—তার ওপর লোক ডাকতে গেলেও কেউ আসবে এমন সম্ভাবনা নেই।

তিন-চার দিন ধরে অনবরত ভাবতে ভাবতে অবশেষে একটা চিন্তা আমার মাথায় এল। একজন মানুষের পক্ষে তা দুঃসাধ্য, তবু তা ছাড়া আর পথ ছিল না।

দুটি পাহাড়ের মধ্যে যে বিস্তৃত সমতল পথ—তার চিহ্ন পর্যন্ত লোপ করতে হবে, এখানকার অস্তিত্ব না টের পায় কেউ।

ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হ'ল সেই দুঃসাধ্য-সাধন ব্রত। একটি একটি ক'রে ছোট গাছ বেছে নিই, তারপর চার-পাঁচদিনের চেষ্টায় চারপাশের মাটি খুঁড়ে গোড়াসুদ্ধ তাকে টেনে নিয়ে যাই ঐখানে। আগেই গর্ত খোঁড়া থাকে, সেখানে পুঁতে দিই আবার। গাছ যত ছোটই হোক, তার ওজন তো কম নয়, টানতে পারি না, তবু একটু একটু ক'রে, এক এক চুল ক'রে নিয়ে যাই।

নড়ানোই এক-এক সময় অসম্ভব মনে হ'ত, তবু হাল ছাড়ি নি। একটি গাছ কেটে নিয়ে গিয়ে পুঁততে সময় লাগত ছ'দিন থেকে সাতদিন। এইভাবে এই সমস্ত পথটা জঙ্গলে ভরিয়ে দিলাম—যা ছিল প্রান্তর, তা হয়ে গেল বন। সমস্ত পথটিকে জঙ্গলে ঢেকে নিশ্চিহ্ন করতে সময় লেগেছিল আমার ন' মাস। বসন্তে শুরু করেছিলাম, শরতে শেষ হ'ল।

এইভাবে লোকালয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে, আমার মুক্তির সমস্ত সম্ভাবনা লোপ ক'রে, নিজের পলায়নের পথ নিজেই রুদ্ধ ক'রে স্বেচ্ছাকৃত কারাগারে যখন আবার ফিরে এসে বিশ্রামের নিঃশ্বাস ফেললাম, তখন আমার শরীরও ভেঙে এসেছে। ঝড় জল রৌদ্র সব সহ্য ক'রে পরিশ্রম করেছি দৈনিক তিন প্রহর থেকে চার প্রহর পর্যন্ত। তার ফল কি আর ফলবে না! মানুষের যা সাধ্য তার চেয়েও বেশি করেছি। আজ অবধি কোন একজন মানুষ বোধহয় এতটা কাজ করতে পারে নি।

ক্রমে আমার জীবনদীপও নিভে এল। হামাগুড়ি দিয়ে এসে একদিন ঐ চৈত্যের পাদমূলে আমারও শেষ পূজা সাঙ্গ করলাম। তারপর গুরু এবং ভগবান অমিতাভকে স্মরণ ক'রে শুয়ে পড়লাম ঐখানেই। বন্যজন্তু যদি আমার মৃতদেহ জঙ্গলে টেনে নিয়ে না যেত, তাহলে সে অস্থি বোধহয় ঐতিহাসিকরা ঐখানেই খুঁজে পেতেন। আজও ঐ পাহাড়ের নুড়ি সরিয়ে খুঁজলে দু-একটা টুকরো মিলবে শিলীভূত অবস্থায়।'

দীর্ঘ কাহিনী শেষ ক'রে ভিক্ষু থামলেন। আমি নির্বাক বসেছিলাম এতক্ষণ, এখনও কী বলব ভেবে না পেয়ে বললাম, 'তারপর?'

'তারপর আর কি? এই ইতিহাস লিখে রাখতে চেয়েছিলাম, থাকে নি। তাই আপনাকে বলে গেলাম, যদি বিশ্বাস হয় তো লিপিবদ্ধ করবেন—প্রচার করবেন। আপনি তো লিখেও থাকেন মধ্যে মধ্যে। আপনার আগে আর কেউ এখানকার অধিবাসীদের নিয়ে মাথা ঘামায় নি। আপনাকে আমাদের কথা চিন্তা করতে দেখেই আজ আপনার কাছে ধরা দিলাম।'

হঠাৎ বাইরে কোথা থেকে বিভূতিবাবুর গলা শোনা গেল, 'কই কোথা গেলেন? ঘুমোচ্ছেন নাকি?'

ধড়মড় ক'রে উঠে বসি। ভিক্ষু কোথায়? কারুর চিহ্নও নেই—পাশের বেদী শূন্য! হয়ত স্বপ্নই দেখেছি এতক্ষণ! তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়াই।

তাঁতিয়াটোপীর ফাঁসি

গল্পটা আমি শুনেছিলাম মদন মুখুয্যের কাছে। মদন মুখুয্যে কাশীতে আমাদের বাড়ির দোতলায় ভাড়া থাকতেন। তাঁর তখন বাহাত্তর বছর বয়স, বছর পনেরো আগে পেন্সন নিয়ে কাশীবাস করতে এসেছিলেন। মদন জ্যাঠামশাই এ গল্প আবার শুনেছিলেন তাঁর বাবার মুখে, তাঁর বাবা মিউটিনির সময় মাউতে চাকরি করতেন নাকি। কাজেই এ গল্পের সত্যি-মিথ্যে ঠিক ক'রে বলা আজ শক্ত। কারণ ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় একশো বছর আগে—যাঁরা বলেছেন, তাঁরাও কেউ বেঁচে নেই আজ।

যাই হোক—তবু গল্পটা বলছি এই জন্যে যে মোটামুটি এটা গল্পের মতোই। গল্প হিসেবেই শোনা যাক না।

মদন জ্যাঠামশাইয়ের বাবা প্রজাপতি মুখুয্যে মাউতে কাজ করতেন তা আগেই বলেছি, কিন্তু একটা কথা বলা হয় নি এই যে, মাউতে তিনি এসেছিলেন পরে। স্যার কলিন ক্যাম্পবেল যখন ডিসেম্বর মাসে কানপুর দখল করেন তখন তাঁরই হুকুমে একদল কমিসারিয়েট কর্মচারী কানপুর থেকে মাউতে আসেন. সার হিউ রোজ সেখানে যে ঘাঁটি বসিয়েছিলেন—তার কাজ চালাবার জন্য। কাজেই বিবিগড়ের হত্যাকাণ্ড যখন হয় তখনও তিনি কানপুরে আছেন।

কানপুর গ্যারিসনকে নিরাপদে নৌকা ক'রে এলাহাবাদে চলে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও

নানাসাহেব পরে তা রাখতে পারেন নি, পাড় থেকে গোলা ছুঁড়ে নৌকাগুলো ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল—এজন্য সকলেই সিপাইদের, বিশেষ ক'রে নানাসাহেব ও তাঁতিয়াটোপীকে দোষ দেয়। কিন্তু প্রজাপতি বলতেন যে, ওঁদের কোন দোষ ছিল না। ওঁরা সরল ভাবেই হুইলার সাহেবকে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই দিনই এলাহাবাদ থেকে খবর এসে পৌঁছল যে কাশী ও এলাহাবাদে বিদ্রোহী সিপাইদের দমন করবার পর ইংরেজরা সেখানকার বাসিন্দাদের উপর যে অত্যাচার করেছে তা অকথ্য। কোন মানুষ যে কোন মানুষের ওপর সে রকম অত্যাচার করতে পারে, তা চোখে দেখলেও বিশ্বাস হওয়া শক্ত—কানে শুনলে তো হয়ই না। তবু একের পর এক লোক যখন বললে যে, তারা চোখে দেখেই এসেছে, নিরীহ গ্রামবাসী বা শহরবাসীদের ওপর কী অকথ্য অত্যাচার হয়েছে—বৃদ্ধ বালক স্ত্রীলোক কেউ বাদ যায় নি, তখন সিপাইরা সব ক্ষেপে উঠল প্রতিরোধের জন্য। যারা এ কাজ করছে তাদেরই ভাইবেরাদাররা নিরাপদে চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে? কখনও না। নানাসাহেব ও তাঁতিয়াটোপী অনেক বোঝালেন, বললেন যে তাঁরা ওদের কথা দিয়েছেন সিপাইদের সেনাপতি হিসাবেই—কথার খেলাপ হ'লে বড় অন্যায় হবে ইত্যাদি। তাতে কতকটা শান্ত হ'ল সবাই কিন্তু তাঁতিয়া বুঝলেন এ বাহ্য শান্তি, এর ভিত মোটেই শক্ত নয়।

তবু তখন আর সময় নেই, নৌকা প্রস্তুত, সাহেবরা উঠছে। মেয়েদের ও শিশুদের নিয়ে যেতে চায় ওরা। তাঁতিয়াটোপী হঠাৎ বললেন, 'মেয়েরা থাক।'

হুইলার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন?'

তাঁতিয়া বললেন, 'কী জানি, আমি ভাল বুঝছি না। এদের মন ক্ষিপ্ত হয়ে আছে—কি ক'রে বসবে তা কে জানে? ওঁরা থাকুন, আমি বন্দী ক'রে রাখার নাম ক'রে আটকে রাখছি। সুযোগ বুঝে আমি নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেবো।'

হুইলার আর কি বলবেন, বললেন, 'আপনি কথা দিচ্ছেন যে ওদের—'

সেকথা শেষ করতে না দিয়েই তাঁতিয়া বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই। আমি ব্রাহ্মণ, যতক্ষণ আমার কোন হাত থাকবে, স্ত্রীলোক আর শিশুর ওপর কোন অত্যাচার হবে না।'

তাঁতিয়া নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এক নবাবের খালি প্রাসাদে মেয়েদের পাঠিয়ে দিলেন, সিপাইদের বলে দিলেন, 'খুব কড়া নজর রাখবে—খবরদার কোনমতে না কেউ পালায়!'

তিনি জানতেন যে ঐভাবে না বললে সিপাইদের হাত থেকে ওদের বাঁচানো শক্ত হবে। সেই থেকে ঐ প্রাসাদটির নাম হয়ে গেল বিবিগড়, যেখানে বিবিরা থাকেন!

এবার সাহেবরা সবাই প্রায় নৌকায় উঠেছে—কতকগুলো ছেড়ে মাঝগঙ্গায় গেছে, কতকগুলো ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় আবার নতুন খবর নিয়ে একদল লোক এল এলাহাবাদ থেকে— 'জানো, এই কুত্তারা কাশীতে কি করেছে? শিশুদের কেটেছে মা'র চোখের সামনে, স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীর মুণ্ড নিয়ে বল খেলেছে—যারা কোন অপকার করে নি, যারা এ লড়াইয়ের বিন্দুবিসর্গও জানে না, তাদের ওপর এই অত্যাচার! আর তোমরা এই শুয়োরদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছ!'

ব্যাস্, সত্যি-মিথ্যে বিচার করার তখন সময় নেই, অগ্র-পশ্চাৎ কে ভাববে? চোখের

সামনে তখন খুন জেগেছে ওদের। নানা ও তাঁতিয়ার ক্ষীণ চেষ্টা সে প্রবল বন্যায় কোথায় ভেসে গেল!

মাত্র চারজন ইংরেজ প্রাণ নিয়ে সেদিন পালিয়ে যেতে পেরেছিল। দেখা গেল তাঁতিয়ার অনুমানই ঠিক, কিছুক্ষণ পূর্বের শান্তিটা ছিল বাহ্য।

এরপর না রইল তাঁতিয়ার তিলমাত্র অবসর, আর না রইল নানাসাহেবের। আগুন জ্বলেছে কিন্তু অনুকূল বাতাস নেই। সবাই ইংরেজদের দিকে। রাজপুতরা, শিখরা, গুর্খারা, এমন কি মারাঠা-রাজারাও ইংরেজদের সাহায্য করছেন। জনসাধারণ প্রাণহীন, তাদের যেন কিছুই এসে যায় না, কে হারল আর কে জিতল সে খোঁজে। এই দারুণ প্রতিকূলতা ও নিস্পৃহতার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে ওঁদের দিনরাত। যাদের নিয়ে এ কাজ করছেন, তারাও এর গুরুত্ব বোঝে না। এমন এক এক হঠকারিতা করে বসে যে, সাধারণ লোকের বিরূপতা আরও বেড়ে যায়। এই বিপদের সামনে দাঁড়িয়েও কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই আছে।

এইভাবে তাঁতিয়া এখন চারিদিক থেকে এমন বিব্রত হয়ে উঠলেন যে বিবিগড়ের বন্দিনীদের কথা তাঁর মনেই রইল না। কিন্তু যাদের ওপর ভার ছিল ওদের পাহারা দেওয়ার, তারা ব্যস্ত হয়ে উঠল। চারিদিকে গৌরব অর্জনের নানা পথ খোলা, নিজেদের কর্তৃত্ব করবার অসংখ্য উপায় চারিদিকে—আর তারা কতকগুলো ছেলেমেয়েকে পাহারা দিতে এখানে বসে থাকবে? বিশেষত যারা ওদের চিরশত্রু? তাছাড়া খাদ্য-খাবারের যে রকম টান, অতগুলো মেম-সাহেবকে বসিয়ে খাইয়ে লাভ কি?

জমাদার ইন্দ্রপাল সিং রোজ হাঁটাহাঁটি করে, 'গুরুজী, হুকুম দিন ওদের শেষ ক'রে দিই! আর কতদিন এমন ক'রে আমরা বসে থাকব?'

তাঁতিয়া ওদের বিরুদ্ধ মনোভাব বুঝে কেবলই দিন পেছিয়ে দেন, 'সময় হলেই বলব ইন্দর পাল—আর দুদিন সবুর করো।'

অবশ্য অবসর এর ভেতর যে মেলে নি তা নয়—কিন্তু তাঁতিয়ারও তো সহস্র ঝঞ্ঝাট।

এমনি ক'রে হঠাৎ একদিন, ১৪ই জুলাই সন্ধ্যাবেলা ইন্দ্রপাল আবার এলো। তাঁতিয়া তখন নানা এবং আরও অন্যান্য প্রধানদের সঙ্গে গুরুতর মন্ত্রণা করছেন। চারিদিকে বিপদ আসন্ন—কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে চারিদিক থেকে যেসব সাহায্য তাঁরা পাবেন ভেবেছিলেন, তার একটাও পাচ্ছেন না, বরং ইংরেজরাই একটু একটু করে শক্তি সঞ্চয় করছে। দুশ্চিন্তার শেষ নেই, কোনদিকে পথ দেখতে পাচ্ছেন না—এমন সময়ে ইন্দ্রপালের সেই এক প্রস্তাব, 'কী করব বলুন গুরুজী!'

তাঁতিয়া বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দোহাই তোমার ইন্দর পাল, আমাদের একটু রেহাই দাও—'

'কথা একটা বলেই দিন না গুরুজী!'

'যা খুশি করো, শুধু আমাকে আর বিরক্ত ক'রো না।'

তারপর সেকথা ভুলেই গেলেন তাঁতিয়া। পরের দিন সন্ধ্যার সময় ভয়াবহ খবর এসে

পৌঁছল—স্ত্রীলোক শিশু প্রায় কেউই বাঁচে নি। সবাইকে হত্যা ক'রে ইন্দ্রপালের লোক এক বিরাট কুয়ার মধ্যে ফেলেছে—শুধু মৃতদেহে সে কুয়া ভর্তি হয়ে গেছে।

তখনই তিনি বিবিগড়ে ছুটলেন। সত্যিই ভয়াবহ। ভয়াবহ শুধু নয়— পৈশাচিক সে হত্যালীলা দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে চেয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

কিন্তু জানতেন যে ক্ষমা নয়—বিচারই আসবে সেখান থেকে। তিনি সিপাইদের দিকে চেয়ে বললেন, 'আর তোমাদের জয়ের কোন আশা রইল না—এই পাপেই ভারতের স্বাধীনতা সুদূরপরাহত হয়ে গেল!'

প্রজাপতি বলতেন, এরপর থেকে তাঁতিয়ার মনে একতিলও আর শান্তি রইল না। কাজ করেন, যুদ্ধ করেন, মন্ত্রণা দেন—সবই কলের পুতুলের মতো। কী একটা যেন অন্যমনস্ক ভাব। সর্বদাই যেন কি চিন্তা করেন। বাইরের দিকে কিসের শব্দে যেন কান পেতে থাকেন।

এক-একটা পরাজয় হয় আর তাঁতিয়ার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে ওঠে। সূক্ষ্ম, কুটিল হাসি—কেউ সে হাসির কোন অর্থ খুঁজে পায় না। বেতোয়ার যুদ্ধ গেল, মোরারের যুদ্ধ গেল, কোটার যুদ্ধ গেল—সর্বত্রই ঐ এক হাসি!

লক্ষ্মীবাই অনুযোগ করেন, ধুন্দুপন্থ অনুযোগ করেন, আজিমুল্লা অনুযোগ করেন—'যুদ্ধে তোমার মন নেই গুরুজী, এ কি ছেলেখেলা করছ?'

তাঁতিয়া হেসে বললেন, 'যুদ্ধে সত্যিই আমার মন নেই। আমি যে পরাজয়ের দিকেই কান পেতে আছি, এ শুধু কর্তব্য পালন করা বই তো নয়! ফল যে কী হবে তা আমি জানিই।'

তারপর সে পরাজয় সত্যিই হ'ল—চারিদিক থেকে সর্বতোভাবে। লক্ষ্মীবাঈ মারা গেলেন, নানাসাহেব পলাতক, ফুলওয়ার সিং নিহত, রাও সাহেব ধরা পড়েছেন—বন্ধু বলতে, সহকর্মী বলতে কেউ নেই। সারা ভারত আবার ইংরেজদের হাতে। তবু তাঁতিয়া মাতৃভূমির নামে শপথ করেছেন, দেহে যতদিন প্রাণ থাকবে তিনি চেষ্টা ছাড়বেন না। তাই আশা কিছু না থাকলেও বাইরে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান—এক জমিদারের কাছ থেকে আর এক জমিদারের কাছে। তারা সবাই ওঁকে শ্রদ্ধা করে, গুরুজী বলে—তাই ধরিয়ে দেয় না, কিন্তু সাহায্য? আর না, তাদের ঢের শিক্ষা হয়েছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে আর নয়।

তবু তাঁতিয়া ভেঙে পড়েন না। সে শিক্ষা তাঁর নেই। তিনি জানেন, একটি লোক যদি সত্যিই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক'রে লেগে থাকে তো তাই যথেষ্ট, যে আগুন নিভেছে সে আগুনই আবার জ্বালিয়ে তুলতে পারবে নিজের প্রাণের বহ্নিতে।

কিন্তু এবার এক নূতন উপসর্গ দেখা দিল। রাত্রে তিনি ঘুমোতে পারেন না। যে বিবিগড়কে প্রায় ভুলে এসেছিলেন এতদিনে, সেই বিবিগড়ই আবার নূতন ক'রে তাঁর

মনের মধ্যে জেগে উঠল। রাত্রে ঘুমুলেই স্বপ্ন দেখেন সেই বীভৎস দৃশ্য—সকালে জাগ্রত অবস্থাতেও, পূজা করবার সময় ধ্যানে বসলে নিজের ইষ্টদেবতার মূর্তির বদলে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে বিবিগড়ের সেই বিকৃত শবদেহগুলি!

তাঁতিয়া বুঝলেন—তাঁর সময় হয়েছে। আর নয়।

কী করবেন? আত্মহত্যা? যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবেন?

না, তাতে তো তাঁর প্রায়শ্চিত্ত হবে না। ইংরেজদের হাতেই তাঁকে শাস্তি নিতে হবে যে!

শেষ আশ্রয় নিয়েছেন তখন সিন্ধিয়ার সামন্ত মানসিংহের কাছে। মানসিংহ বললেন, 'ইংরেজরা চারিদিকে সহস্র চর রেখেছে গুরুদেব, এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। পালান।'

'তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে মানসিংহ, শেষ অনুরোধ!'

'ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাওয়া ছাড়া যা বলবেন তাই শুনব।'

'শুনবে তো?'

'হ্যাঁ—আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি।'

'তবে আমাকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দাও।'

মানাসংহের অনুরোধ উপরোধ অনুনয় কিছুই শুনলেন না তাঁতিয়া। মানসিংহ বললেন, 'আপনি নিজেই ধরা দিন না!'

'না, সে আমি পারব না। ঝাঁসির রাণীর কাছে শপথ আছে। তা ছাড়া তাতে তোমার বিপদ বাড়বে। আর এতে তুমি পাবে পুরস্কার।'

অগত্যা মানসিংহ ইংরেজ কর্তাদের কাছে খবর পাঠালেন, তাঁতিয়া ধরা পড়েছে, তিনিই বুদ্ধি ক'রে ধরেছেন। ওঁরা যেন ব্যবস্থা করেন এখনই।

ইংরেজদের হাজতে গিয়ে তাঁতিয়া বহুদিন পরে শান্তিতে ঘুমোলেন।

দেশ-বিদেশে

উৎসর্গ

বিমল ঘোষ 'মৌমাছি'

বন্ধুবরেষু—

এই বইটি লেখকের তরুণ বয়সে লেখা।

উদয়পুর ও চিতোরগড়

সেবার স্থির করলাম দ্বারকা যাবার পথে উদয়পুর আর চিতোরগড় নিশ্চয় দেখে যাব।

মেবারের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ? কে-ই বা না শুনেছে এই বীরভূমির নাম! মহারাণা সংগ্রামসিংহ, রাণা প্রতাপ, পদ্মিনীর দেশ এই মেবার—দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ আর দেশের জন্য প্রাণদান—এদেশের মাটির ধর্ম। শৌর্যবীর্য এর প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে। এর ইতিহাস সারা পৃথিবীর বিস্ময়।

এই মেবারের পুরনো রাজধানী হ'ল চিতোরগড়, উদয়পুর নতুন রাজধানী। দিল্লী থেকে আগেকার 'বি. বি. সি. আই. আর'-এর যে লাইন আজমীর হয়ে চলে গিয়েছে সেই লাইনে আজমীর থেকে যেতে হয় চিতোরগড়, সেখান থেকে আবার উদয়পুর-রেলে চেপে উদয়পুর যাওয়া যায়। আমাদের দ্বারকা যাওয়ার সোজা পথে পড়ে না এটা—আমরা কিন্তু স্থির করলাম যে ওখান থেকে ঘুরে এসে আবার দ্বারকার পথ ধরব তাও ভাল—চিতোরগড় দেখবই। ছেলেবেলা থেকে রাজস্থান পড়ে পড়ে ওখানকার ইতিহাস ছিল মুখস্থ, চোখ বুজলে হাজার বছর আগেকার ইতিহাসের ছবিগুলো যেন চোখের সামনে দেখতে পেতাম। আর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত কবিতা আমাদের পাঠ্য-পুস্তকে ছিল—

নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ কারণ
ভারতের নানা দেশ করি পর্যটন॥
অবশেষে উপনীত রাজপুতানায়
বসুধা বেষ্টিত যার কীর্তি-মেখলায়॥

এ-সব মনের পটে কল্পনার ছবি আঁকত। এতদিন পরে সেই রাজপুতানায় যাবার সুযোগ মিলল।

আজমীরে আমরা আশ্রয় পেয়েছিলুম ভালই। সুদূর প্রবাসে বাঙালী তীর্থযাত্রীর আশ্রয়ের জন্য যাঁরা এই বাঙালী ধর্মশালা তৈরী ক'রে দিয়েছেন, তাঁদের চেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে। বিশেষ ক'রে তখন যে ভদ্রলোক ধর্মশালাটির ভার নিয়েছিলেন—সেই বৃদ্ধ অমৃতবাবুর মতো লোকের আশ্রয়ে গিয়ে পড়া—সে রীতিমতো ভাগ্যের কথা।

সুতরাং স্থির হ'ল যে আমরা অধিকাংশ জিনিস আজমীরেই রেখে শুধু দু'দিন চালাবার মতো অল্প-কিছু জিনিস নিয়ে উদয়পুর থেকে ঘুরে আসব। বাড়ি থেকে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থাও আজমীরেই করা হবে স্থির হ'ল, কারণ সেখানে অমৃতবাবু আছেন, তাঁর 'কেয়ারে' টাকা আসাই সুবিধা। দ্বারকার পথে আর কোথাও অমন অভিভাবক পাব কি-না তার ঠিক কি?

আজমীর যাওয়া পুষ্করের জন্য। তীর্থরাজ পুষ্কর—অন্তত আমাদের শাস্ত্রমতে। আর তার কাছেই সাবিত্রী পাহাড়। সেখানে যাওয়া হিন্দুরমণীদের বহু ভাগ্যের কথা। এই দুটি

তীর্থ সেরে সেদিন ক্লান্তদেহে ধর্মশালায় ফিরলুম সন্ধ্যার কিছু আগে। পুণ্যার্জনের ক্লান্তি আমার মা-বৌদিদেরও বেশ জখম ক'রে ফেলেছিল—রান্নার দিকে তাঁরা কেউই এগোলেন না। দুধ, মিষ্টি ও গরম পুরীর ওপর দিয়ে নৈশভোজন শেষ ক'রে আমরা তখনই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলুম। গাড়ি প্রায় এগারোটায়—কিন্তু পাছে আমরা গাড়ি ফেল করি এই আশঙ্কায় অমৃতবাবু রাত নটার আগেই কুলী ডেকে আমাদের বিছানা ও অন্যান্য দরকারী যা-কিছু জিনিস ছিল—তাদের মাথায় চাপিয়ে দিলেন। ফলে আমাদেরও তখনই বেরিয়ে পড়তে হ'ল এবং স্টেশনে গিয়ে দু-ঘণ্টা ধরে বসে বসে বৃদ্ধদের সময় সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব নিয়ে আলোচনা করা ছাড়া আর কোনও কাজ রইল না।

আজমীর থেকে চিতোরগড় পর্যন্ত আগেকার বোম্বে-বরোদা-সেন্ট্রাল-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ব্রাঞ্চ লাইন গেছে কিন্তু সেখান থেকে উদয়পুর যেতে গেলে গাড়ি বদল ক'রে মহারাণার খাস্ লাইনে চড়তে হয়। যাত্রীদের গাড়ি বদল করার সেই 'ভীষণ' কষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্য কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সুবিধাজনক এক ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন এবং সেটা আর কিছুই নয়—'থ্রু-ক্যারেজ সার্ভিস' অর্থাৎ একখানা ক'রে গাড়ি ট্রেনের সঙ্গে এমনভাবে জোড়া থাকে, যাতে ক'রে তাকে চিতোরগড়ে কেটে উদয়পুরের ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়। অবশ্য প্রত্যেক ট্রেনে সে ব্যবস্থা আছে কিনা ঠিক মনে পড়ছে না, তবে ঐ ট্রেনটাতে থাকেই—সেটা জানি।

আমাদের কুলিপুঙ্গবরা বলল—বাবু, ভোররাতে গাড়ি বদল করার কষ্ট আপনাদের কিচ্ছু পেতে হবে না, আপনাদের একেবারে উদয়পুরের 'ডাব্বায়' তুলে দেবো।

ওরা বগি-গাড়িকে বলে ডাব্বা।

যাই হোক, সেদিন সাবিত্রী দর্শন ও তীর্থরাজ পুষ্করে স্নানরূপ মহাপুণ্যের প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া আমাদের অদৃষ্টে ছিল, তাই আমরা কুলীদের কথায় রাজী হলুম এবং অসংখ্য খালি গাড়ি পার হয়ে গিয়ে-সেই বিখ্যাত ডাব্বার একখানি ছোট কামরায় উঠলুম। সে ডাব্বা বা বগি-গাড়িতে একখানা ফার্স্ট-ক্লাস, একখানা সেকেণ্ড-ক্লাস ও দু'পাশে দুখানি স্বল্পপরিসর থার্ড-ক্লাস গাড়ি ছিল। আমরা যে কামরাতে উঠলুম তার তিনখানি বেঞ্চের মধ্যে দুখানি বেঞ্চে ইতিমধ্যেই এক ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী, তাঁর মাসী ও গুটিতিনেক ছেলেমেয়ে নিয়ে বিছানা বিছিয়ে জোড়া ক'রে শুয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা কোথা দিয়ে প্ল্যাটফর্মে আগে ঢুকেছিলেন তা তাঁরাই বলতে পারেন। আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক উঠলেন, আমরা চারজন আর তিনি—অতি কষ্টে সেই বাকী ছোট্ট বেঞ্চিটিতে বসলুম এবং ঘুমের আশা একেবারেই রইল না—এই ভেবে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লুম।

কিন্তু এই শোচনীয় নাটকের এইখানেই যবনিকা পড়ল না। আমরা বসবার মিনিট-তিনেকের মধ্যেই আরও প্রায় জন-আষ্টেক লোক সেই কামরাতে এসে উঠলেন এবং আনাগোনার সংকীর্ণ রাস্তাকে জিনিসপত্র ও নিজেদের উপস্থিতিতে এমনি ভরিয়ে ফেললেন যে, তখন আর সে-গাড়ি হ'তে নামবার চেষ্টামাত্র করাও বাতুলতা হয়ে দাঁড়াল। এক কথায় তখন আমাদের অবস্থা দাঁড়াল চক্রব্যূহে আটক অভিমন্যুর মতো। যদিবা প্রবেশ করলুম, নির্গমনের পথ আর রইল না।

এইভাবেই বসে বসে আর ঢুলতে ঢুলতে চিতোরগড়ে যখন গাড়ি এল, তখন ভোর চারটে হবে। তখন অন্ধকার আছে পুরোমাত্রায়। প্রথম উষার অস্পষ্ট আলোতে দূরে চিতোরগড়ের একটা আবছায়া মাত্র নজরে পড়ল, তার মধ্যে কুম্ভের বিজয়-স্তম্ভটিই অনেক উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—এইটুকু শুধু বুঝতে পারলুম। ওখানে অনেকক্ষণ গাড়ি দাঁড়াল, একটা ট্রেন থেকে কেটে আমাদের 'ডাব্বা' আর একটা ট্রেনে জুড়ে দেবে,—কাজেই দেরি হওয়া সেখানে উচিত। আমাদের কিন্তু সেদিকে খেয়াল ছিল না, আমরা সশ্রদ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে শুধু সেই অতিবিখ্যাত চিতোর পাহাড়ের দিকে চেয়ে ছিলুম।
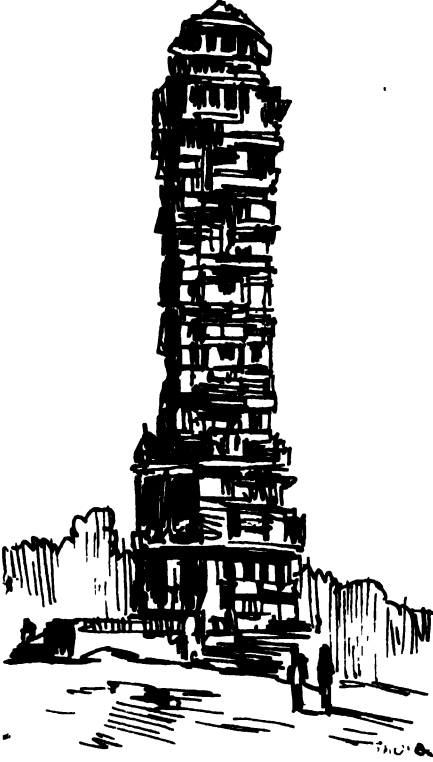
এই তাহ'লে চিতোরগড়! ছেলেবেলায় যজ্ঞেশ্বরবাবুর অনূদিত টডের রাজস্থান পড়েছিলুম। সেই সময়কার কল্পনাপ্রবণ রঙ্গীন মনে তার যে ছাপ পড়েছিল, সে ছাপ ইহজীবনে আর মুছবে না। বইখানি বারবার পড়েছিলুম, ছেঁড়া বইখানি এখনও আমার বাল্যকালের অত্যাচার বুকে নিয়ে টিঁকে আছে। কত কথা হয়ত বুঝি নি, কতক-বা বহুবার পড়ার পর মাথায় ঢুকেছিল। কিন্তু বাপ্পারাওলের কৈশোর-লীলা থেকে শুরু ক'রে পৃথ্বিরাজ, সঙ্গ, সমরসিংহ, কুম্ভ, প্রতাপ পর্যন্ত সকলের অদ্ভুত শৌর্য-কাহিনী আমার চোখের সামনে ছবির মতো ফুটে উঠত, কখনও মনে হ'ত সে-সব ঘটনা যেন আমার সামনেই ঘটেছে। তারপর কাব্য, উপন্যাস, নাটক এবং পাঠ্য-পুস্তকে বারবার সে-সব কথা পড়েছি, আসল টডের রাজস্থানও একাধিকবার পড়েছি। কিন্তু সে-সব পূর্বের ছবিকেই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেজে ঘষে দেখিয়েছে মাত্র—যজ্ঞেশ্বরবাবুর ছবিই আজ পর্যন্ত মনে আঁকা রয়েছে।

মা দ্বিজেন্দ্রলালের অমর সঙ্গীত "মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়" আবৃত্তি করতে লাগলেন, আমরা ভক্তিভাবে শুনতে শুনতে সেই দিকে চেয়ে রইলুম। সেই অবস্থায় ট্রেন ছেড়ে দিল এবং পবিত্র মেবারভূমির বুকের ওপর দিয়ে অভিনব ঝাঁকানি দিতে দিতে ছুটে চলল। বাংলাদেশের মাঠের ও আলের ওপর দিয়ে গরুরগাড়ি করে যেতে যেতে অনেকবার ভেবেছি যে হাড়ভাঙা ঝাঁকানিতে গো-যানই সবার উপরে টেক্কা মারে, কিন্তু সে ধারণা যে ভুল, তা বুঝতে পারলুম 'বি. বি. সি. আই. আর'-এর ছোট লাইনে চড়ে।

মাওলী জংশনে গিয়ে পৌঁছলো বেলা আটটার সময় এবং এইখানে গিয়ে গাড়ির প্রায় সমস্ত লোক নেমে গেল। আজমীর থেকে যে-অবস্থায় ছেড়েছিল তার পর বরং ভিড় বেড়েই গিয়েছিল, বিন্দুমাত্র কমে নি, কিন্তু মাওলীতে পৌঁছে শুধু আমরা চারজন ও সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি গাড়িতে থাকলুম। তিনিও উদয়পুরের যাত্রী, শুনলুম মহারাণার আদেশে তিনি উদয়পুরে যাচ্ছেন। তিনি কোন এক বিখ্যাত মণিকারের কর্মচারী, গয়নার মাপ ও অর্ডার নেবার জন্য তাঁকে ডাকা হয়েছে।

মাওলী জংশনে নেমে একটি ব্রাঞ্চলাইন ধরে যেতে হয় নাথদ্বারে। নাথদ্বারে নাথজী নামে এক বিখ্যাত বিষ্ণুমূর্তি আছেন। এই নাথদ্বারই রাজপুতানার সবচেয়ে বড় তীর্থ। এমন কি রাজপুতদের মধ্যে অনেকে পুষ্কর-স্নানের চেয়েও নাথজীর দর্শন অধিকতর কাম্য ব'লে মনে করেন। আমরা তখন আর নাথদ্বারে গেলুম না, ফেরবার সময় যাবো আগে থাকতেই ঠিক ক'রে রেখেছিলুম।

উদয়পুরে গাড়ি গেল দশটার পর। স্টেশনে পৌঁছে কুলীর মাথায় জিনিস চাপিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এলুম এবং একটা টাঙ্গার ওপর জিনিসপত্র চাপিয়ে শহরের দিকে যাত্রা করলুম। আমরা আগেই শুনেছিলুম যে উদয়পুরের টাঙ্গাওয়ালারা পশ্চিমের অন্যান্য শহরের মতো দর করে না অর্থাৎ চার আনার ভাড়াকে চার টাকা ব'লে বসে না। প্রথম যখন আমি দিল্লী যাই, তখন দিল্লীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘোরার জন্য আমায় ছত্রিশ টাকা খরচ করতে হয়েছিল। চতুর্থবার দিল্লী গিয়ে সেই সব স্থানই মাত্র তিন টাকা খরচে ঘুরে এসেছিলুম। যাই হোক উদয়পুর স্টেশন থেকে মহারাণার ধর্মশালায় যাওয়ার জন্য বেচারা চাইল মাত্র আট আনা এবং গেল ছ আনায়। অবশ্য পরে জেনেছিলুম যে চার আনা পাঁচ আনাই ওদের ন্যায্য প্রাপ্য।

অনেকখানি—প্রায় মাইল-দুই চলার পর আমরা উদয়পুর শহরের প্রান্তে পৌঁছলুম এবং সেইখানেই মহারাণার নতুন ধর্মশালা। যখন গাড়োয়ান বলল, এইটিই ধর্মশালা—তখন আমরা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে শুধু চেয়ে রইলুম, মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না। বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা, সেটা মহারাণার প্রাসাদ বললেও আমরা বিস্মিত হতুম না। বড় ধর্মশালা আমি অনেক দেখেছি—কিন্তু এমন প্রশস্ত, এত উঁচু এবং এত ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার ধর্মশালা আর কোথাও নজরে পড়ে নি। দোতলা-বাড়ি, সামনেই আরও উঁচু গম্বুজের ওপর বিরাট এক ঘড়ি। বাড়ির ভেতরের কাজ তখনও শেষ হয় নি, কিন্তু মূল বাড়িটার কাজ ভেতরে ও বাইরে সম্পূর্ণ হয়েছে দেখলুম। সদ্য চুনকাম-করা দেওয়ালের ওপর মধ্যাহ্নের সূর্যকিরণ প'ড়ে এমন এক অপরূপ শুভ্রতার সৃষ্টি করেছিল যে সেদিকে চেয়ে তখনই চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলুম।

ফটক দিয়ে ঢুকেই সামনে একটা দালানের মতো ব্যাপার এবং তার ঠিক মধ্যস্থলে মেবার-সূর্য প্রতাপসিংহের মূর্তি বিরাজমান। প্রতাপের একপাশে স্বর্গীয় মহারাণা ফতেসিংহের ও অপর পাশে বর্তমান মহারাণা ভূপালসিংহের মর্মরমূর্তি রয়েছে। সেদিকে চেয়ে প্রথমেই যে জিনিসটা আমাদের বিস্মিত করল, সেটা হচ্ছে বর্তমান মহারাণার শ্মশ্রুবিহীন মুখ।

প্রতাপ তাঁর ছেলে রাণা অমরসিংহকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে যতদিন না মেবারের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া যায় মেবারের মহারাণারা ক্ষৌরকার্য করবেন না, তৃণশয্যায় শয়ন করবেন এবং পাতায় ক'রে খাবার খাবেন।

শুনেছি সেই থেকে আমাদের দেশের স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত মেবারের মহারাণারা প্রতিজ্ঞাটা বজায় রেখেছিলেন। অবশ্য ততটা আর ছিল না, তাঁরা সোনার থালার নীচে একটি শুক্‌নো পাতা রেখে খাবার খেতেন, বিছানার নীচে রাখতেন একগাছি খড়। কিন্তু দাড়ি কখনই কামাতেন না। মহারাণা ফতেসিংহ পর্যন্ত সকলেই আমরণ দু-ধারে ভাগ করা বিরাট দাড়ি বহন ক'রে এসেছিলেন, কিন্তু ইনি সেই কুলপ্রথাকে অনায়াসে লঙ্ঘন করলেন কি ক'রে? অবশ্য আত্মপ্রবঞ্চনাকে আমরা কুলপ্রথার খাতিরে বড় ক'রে তুলতে চাই না—কিন্তু বিস্মিত হলুম তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের সমস্ত জাতটাই তো চিরকাল নিজেকে ঠকিয়ে আসছে, সুতরাং সেইটেই আমরা আশা করি।

যাই হোক—মহারাজা ভূপালসিংহের ব্যাপারটা পরে আমরা বুঝতে পেরেছিলুম। তিনি বিকলাঙ্গ এবং বেঁটে, কাজেই তিনি যদি আবক্ষ দাড়ি রাখেন তাহ'লে তাঁকে সত্যিই বিশ্রী দেখাবে। ওখানের অধিবাসীদের মধ্যেও অনেকে এই কারণটাকেই সত্য ব'লে স্বীকার করলেন।

যাক এবার আসল কথা। প্রবেশপথের সামনেই ফতেসিংহ-ফ্যাশানের দাড়িওয়ালা এক চৌকিদার আমাদের জানাল যে, ধর্মশালার মধ্যে তিন রকম আশ্রয়ের ব্যবস্থা আছে। এক রকম হ'ল একেবারে নি-খরচায়, আর-এক রকম হ'ল আট আনায় এবং সর্বোচ্চ শ্রেণী হ'ল এক টাকায়। আট আনায় আসবাবসুদ্ধ ঘর পাওয়া যাবে—আর ফার্স্ট-ক্লাস অর্থাৎ এক টাকার ব্যবস্থায় স্যুট্ বা তিন-চারখানা ঘরের একটা মহল। ওর মধ্যেই শোবার ঘর, ডাইনিং-রুম, ড্রইং-রুম প্রভৃতি সব ব্যবস্থা আছে। আমি প্রথমে সেকেণ্ড ক্লাসের ব্যবস্থাই করছিলুম কিন্তু যেই শোনা গেল সে ঘরের মেঝে 'ম্যাটিং'-করা—মা একেবার প্রবল আপত্তি জানালেন। 'ম্যাটিং'-করা ঘরে কোথায় বসে খাওয়াদাওয়া হবে? সে হতেই পারে না।

অগত্যা আমরা সেই বিনা-দক্ষিণার একটি ঘরই অধিকার করলুম। পরে দেখলুম যে আমাদের ঐ আট আনা পয়সাই লাভ হ'ল, কারণ সেই বিনা-দক্ষিণার ঘরই এমন চমৎকার যে অকারণ সেকেণ্ড-ক্লাস ঘরে একটা খাটিয়ার লোভে যাওয়ার কোনও দরকার নেই। প্রশস্ত ঘর, জানলা ও দরজা প্রচুর, এবং 'পেটেন্টস্টোনে'র মেঝে। তা-ছাড়া বাথরুম ও পায়খানা কাছেই। যাত্রীদের জন্য অসংখ্য পায়খানা ও দিনরাত জলের ব্যবস্থা আছে। কল-ঘর তো একাধিক বটেই, তা ছাড়া আবার বাইরেও কল আছে অনেকগুলি, আর তাতে সব সময়েই প্রচুর জল থাকে। পায়খানাগুলিও ভাল—তবে ওদেশের লোকের মাঠে যাওয়াই অভ্যাস। তারা অজ্ঞানতাবশত প্রায়ই পায়খানাগুলির অপব্যবহার করে, এই যা অসুবিধা।

তখনও ধর্মশালার রান্নামহল তৈরী শেষ হয় নি। ওদেশের যাত্রীরা উঠানে এবং মাঠে ইট পেতেই সে-কাজ সেরে নিচ্ছেন—কিন্তু আমাদের তাতে কেমন কেমন বাধ-বাধ ঠেকে। যাই হোক—আমাদের তখন এমনই শরীরের অবস্থা যে কোনও রকমে স্নান ক'রে শুয়ে পড়তে পরলে বাঁচি। আমি শহরের মধ্যে থেকে টক্-দই, খরমুজ ও পুরী-মিঠাই কিনে আনলুম। শরবৎ, খরমুজ ও সেই খাবার খেয়েই মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করলুম। ভাল দুধ ওখানে একেবারেই পাওয়া যায় না। তার কারণ গোমাতাদের খাদ্য বিশেষ-কিছু ওখানে জন্মায় না; তাই দুগ্ধজাত যা কিছু খাবার অর্থাৎ রাবড়ী বা দই একেবারেই তৃতীয় শ্রেণীর। পশ্চিমে তো নয়ই, আমাদের দেশেও গরুদের ওরকম দুর্দশার কথা আমরা ভাবতে পারি না। বাস্তবিকই গরুদের কি অবস্থা, সেই মরুভূমির মধ্যে তারা যে টিকে আছে এই আশ্চর্য!

যজ্ঞেশ্বরবাবু লিখেছিলেন 'স্বর্ণপ্রসূ মিবারভূমি', কিন্তু গিয়ে দেখলুম মেবার শুধু মাত্র রসুন-প্রসূ! হাটে-বাজারে গিয়ে অন্য আনাজের সঙ্গে বিশেষ দেখাসাক্ষাৎ ঘটে না, কেবল রসুন, প্রচুর রসুন! এবং বীর মেবারীরা যে প্রাচুর্যের সঙ্গেই তার বিশেষ সদ্ব্যবহার করেন তার পরিচয় পাওয়া যায় কাছে গেলেই। এমন কি টাঙ্গাওয়ালাদের পাশে বসে যাওয়া রীতিমত বিপজ্জনক, প্রতি মুহূর্তেই বমি হবার আশঙ্কা থাকে। রসুন ছাড়া আর-একটা শিম ও কড়াইশুঁটির মাঝামাঝি রকমের আনাজ পাওয়া যায়, সেটা খুব সস্তা। ফলে বাজারে খাবার কিনতে গেলে সেই তরকারিটিই বারবার অদৃষ্টে জোটে।

উদয়পুরের দেওয়ান—সুদূর রাজপুতানার মধ্যস্থলে অতি বিখ্যাত মেবার, তারই দেওয়ান—শক্তাবত্‌-ও নয়, চন্দাবত্‌-ও নয়—নেহাতই একজন বাঙালী। তাঁর নাম (যতদূর মনে আছে) শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সেদিন একথা শুনে সত্যি-সত্যিই আমরা যথেষ্ট গৌরব অনুভব করলুম। জীবনযুদ্ধে বাঙালী আজ হেরে যাচ্ছে, সমস্ত প্রদেশ থেকে সে বিতাড়িত, সে ঘরকুনো এমনি বহু কুৎসা প্রত্যহ শুনতে হয়, তারই মাঝে এরকম দু-একটা সংবাদ যেন পিপাসার্ত হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করে। পশ্চিমেই যাই আর দক্ষিণেই যাই, শিক্ষাবিভাগে তখনও বাঙালীর যথেষ্ট আধিপত্য আছে দেখা যেত, কিন্তু শাসন-বিভাগে তার কর্তৃত্ব ক্রমশই কমে আসছিল। শুনলুম ভূপালবাবু স্বর্গীয় মহারাণার প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁরই স্নেহের বর্ম তখনও তাঁকে বহু লোকের বাঙালী-বিদ্বেষ থেকে রক্ষা করছে।

আমি যখন গেলুম তখন জয়পুর থেকে তাঁর বাড়িতে কয়েকজন আত্মীয় এসেছিলেন, সুতরাং আমায় একটু বসতে হ'ল। খানিকটা পরেই তিনি বেরিয়ে এলেন এবং আমরা উদয়পুর বেড়াতে এসেছি—সে-বিষয়ে তাঁর সাহায্য চাই—এই কথা শুনেই তিনি পুনরায় ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। একটু পরেই আবার যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর হাতে একগোছা অনুমতি-পত্র রয়েছে দেখলুম। উদয়পুরের রাজকীয় ব্যাপার যা-কিছু আছে সমস্ত জায়গারই ছাপানো ছাড়পত্র তাঁর কাছে তৈরী থাকে, শুধু সই ক'রে দেওয়ার অপেক্ষা। তিনি তখনই বসে সেগুলিতে সই ক'রে দিলেন, আর তারই অবসরে মেবারের যাবতীয় দ্রষ্টব্য স্থানের তালিকা ও বর্ণনা আমায় শুনিয়ে দিলেন। তাঁরই মুখে শুনলুম রাজসমন্দর্‌ ও একলিঙ্গের মন্দির সেখান থেকে দূর, তবে পনেরো-ষোলজন যাত্রীর ভরসা পেলে 'বাস' ছাড়ে। আর জয়সমন্দর্‌ অর্থাৎ জয়সমুদ্র প্রায় ষাট মাইল দূরে। আমার মনে বঙ্কিমবাবুর রাজসিংহ পড়ার পর থেকেই রাজসমন্দর্‌ দেখার একটা বাসনা বরাবর লুকিয়ে ছিল—কিন্তু ভূপালবাবুর মুখে শুনলুম যে মানুষের কীর্তি হিসাবে জয়সমন্দর্‌ই দেখবার জিনিস। দেশের দুর্ভিক্ষের সময় দেশবাসীর অন্নসংস্থানের জন্য মহারাণা জয়সিংহ ঐ বিরাট হ্রদ খনন করান। হ্রদটার পাড় দিয়ে বরাবর হাঁটলে প্রায় নব্বই মাইল হাঁটতে হয় এবং শুনলুম যে যদি কখনও ঐ জয়সমন্দরের কোনও পাড় ভেঙে পড়া সম্ভব হয়, তাহ'লে তার জলে সমস্ত মেবার ভেসে যাবে।

যথারীতি নমস্কারাদির পর ভূপালবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলুম। বাঙালী উচ্চপদ পেয়েও যে নিজের স্বদেশবাসীকে ভুলে যান নি, এতে প্রাণে বড় আনন্দ হ'ল। বেরিয়ে এসে দেখলুম সব জায়গার 'পাশ' তো দিয়েছেনই, এমন কি উদয়সাগরের মাঝে জগনিবাস বা জগমন্দির দেখতে যাবার যে রাজকীয় তরণীর ব্যবস্থা আছে, তার দেয় চারটে পয়সা পর্যন্ত বাঁচিয়ে দিয়েছেন। "শ্রীনাও-ডুগুাকে-কারখানা"-কে আদেশ দিয়েছেন আমাদের বিনা দক্ষিণায় পার করতে। এটুকু না হ'লেও হয়ত বিশেষ ক্ষতি ছিল না কিন্তু এতে তাঁর মহৎ মনেরই পরিচয় পেলুম। সব ছাড়পত্রেরই এক গৎ, খালি স্থানগুলির নাম বিভিন্ন। যেমন 'সহেল্লাবাড়ি'র বেলায় লেখা হয়েছে 'হামিল হাজাকো শ্রীসহেল্লিয়া বাড়ি দেখায় দেগা', জগমন্দিরের বেলাও তাই, শুধু শ্রীসহেল্লিয়া বাড়ির জায়গায় শ্রীজগমন্দির বা জগনিবাস এইটুকু তফাত! 'হামিল হাজা' শব্দের অর্থ বোধ হয় পত্রবাহক।

ওখান থেকে বেরিয়ে আর শেয়ারে টাঙ্গা পেলুম না, দু আনা দিয়ে একটা পুরো টাঙ্গাই নিতে হ'ল। টাঙ্গাতে ক'রে চলতে চলতে প্রায় ধর্মশালার কাছাকাছি এসেই এক হাস্যকর ব্যাপার ঘটল এবং অভাবনীয় ভাবে আমার রাজদর্শন হ'ল। কেমন ক'রে তাই বলছি।

টাঙ্গাওয়ালা মনের উৎসাহে গাড়ি হাঁকাচ্ছে এবং আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে কলকাতা কত বড় শহর সেই সম্বন্ধে মনে মনে ধারণা করবার চেষ্টা করছে, এমন সময় সহসা তার বিষম ভাবান্তর ঘটল। আমাদের ধর্মশালার ঠিক পিছনে এসে সে অকস্মাৎ হুড়মুড় ক'রে টাঙ্গাসুদ্ধ নেমে পড়ল রাস্তা ছেড়ে পাশের খানার মধ্যে এবং আমার বিস্মিত প্রশ্নের কোন রকম জবাব না দিয়ে অস্ফুটস্বরে শুধু "উতারিয়ে বাবু, উতারিয়ে" ব'লে নেমে প'ড়ে মাথার পাগড়ী খুলে হেঁট হয়ে দাঁড়াল। চেয়ে দেখি মোড়ের কন্‌স্টেবলও আমার টাঙ্গাওয়ালার মতোই কোমর পর্যন্ত হেলিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, টাঙ্গাওয়ালার পা দুটো, বোধ করি ভয়েই, ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে।

তখন রাস্তার দিকে চেয়ে দেখি—দূরে নগরতোরণের মধ্যে থেকে সার-সার তিন-চারখানা মোটর বেরিয়ে আসছে। ব্যাপারটা বুঝতেই পারলুম—স্বয়ং মহারাণা আসছেন সান্ধ্যভ্রমণে। পরে শুনেছিলুম যে তিনি প্রায়ই সর্দারদের সঙ্গে ক'রে ফতেসাগরের ধারে বেড়াতে যান।

যাই হোক—আমি কিন্তু গাড়িতেই বসে রইলুম। 'শির' তো আমার 'নাঙ্গা'ই আছে, আর অভিবাদন? কি দরকার খামোকা আমার অভিবাদন করার? তাঁর সঙ্গে তো পরিচয় ঘটবার কোনই সম্ভাবনা নেই।

মহারাণার গাড়ি আস্তেই আসছিল, কিন্তু আমার টাঙ্গার কাছাকাছি এসে একেবারে দাঁড়িয়ে গেল। মহারাণা একবার আমার দিকে চাইলেন, তারপর ফিরে ধর্মশালার ঘণ্টা-ঘরটিকে ভাল ক'রে দেখে সে সম্বন্ধে কি-সব আলোচনা শুরু করলেন। মহারাণার খাস-মোটরেও জন-দুই সর্দার ও অন্যান্য পরিজন কেউ কেউ ছিলেন—তাঁরা আমার দিকে ভ্রূকুটিসহ বারবার তাকাতে লাগলেন, কারণ আমি তখনও টাঙ্গাতেই বসে এবং তাঁদের অভিবাদন জানাবার চেষ্টামাত্রও করলুম না। একবার ইচ্ছে হয়েছিল নেমে গিয়ে সম্মান জানাবার—কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করায় অপমানিত হবার ভয় আছে, তার চেয়ে বিদেশী লোক অপরিচয়ের দোহাই দিয়ে বসে থাকাই ভাল।

আমি সর্দারদের ভাল ক'রে দেখে নিলুম, কিন্তু কে কোন্‌টি তা জানার সুবিধা হ'ল না। চন্দাবৎ, শক্তাবৎ, ঝালাপতি কত নামই বারবার রাজস্থানে পড়েছি—এঁরা তাঁদেরই বংশধর, কিন্তু সে-সব কথা আজ এঁদের কাছেও বোধ হয় শুধু কাহিনী। অনুমান করলুম যে চন্দাবৎ ও শক্তাবৎ যদি থাকেন কেউ এঁদের মধ্যে, খাস-মোটরের ঐ দুজনই হবেন। টাঙ্গাওয়ালা আন্দাজে ঢিল মেরে সেই রকম পরিচয়ই দিলে বটে কিন্তু তার চেনবার কথা নয়।

যাই হোক, মিনিট তিনেক পরেই আবার ওঁদের মোটরগুলি চলতে শুরু করলো এবং আমার টাঙ্গাওয়ালারও পিঠ সোজা হ'তে শুরু হ'ল। সে বেচারা কিন্তু একটিও কথা বলার আগেই মোড়ের পাহারাওয়ালাটি মার-মার শব্দে তেড়ে এল তার দিকে। তার বক্তব্যের বঙ্গানুবাদ দিলে এই রকম দাঁড়ায়ঃ 'হতভাগা, তুই বাবুর কাছে পরিচয় দিলি নে কেন যে মহারাণা আসছেন! বাবু বিদেশী লোক, চিনবেন কি ক'রে?'

আমি তখন তাকে বুঝিয়ে বললুম যে মহারাণার মূর্তি ও ছবি আমি ঢের দেখেছি, তাতে ক'রে তাঁকে চিনে নিতে দেরি হয় নি।

সে তখন অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে—তবে আপনি নেমে গিয়ে রাজদর্শন ক'রে এলেন না কেন? চাই কি হয়ত মহারাণা আলাপও করতে পারতেন আপনার সঙ্গে!

আমি হেসে বললুম—বাপু, দর্শন তো এখান থেকেই হ'ল, নেমে গেলে কি বেশী কিছু সুবিধে হ'ত?

সে বিশেষ কোনও জবাব দিল না বটে কিন্তু বেশ বুঝলুম যে বাঙালীদের নাস্তিকতায় সে দারুণ চটে গেল। মহারাণা ঘড়ি-ঘরের সামনে গাড়ি দাঁড় করালেন কেন জিজ্ঞাসা করায় সে জবাব দিল—মহারাণা অনেকদিন এ পথ দিয়ে ফতেসাগরের তীরে যান নি; বোধহয় ঘড়ি-ঘর বসবার পর আর দেখেন নি, সেইজন্যই গাড়ি থামিয়ে ভাল ক'রে দেখে নিলেন।

আবার আমাদের টাঙ্গা ছেড়ে দিল। এবার দু'মিনিটের পথ, শীগগিরই পৌঁছে গেলুম। টাঙ্গাওয়ালাকে প্রশ্ন ক'রে জানলুম মহারাণার গাড়ি যখন রাস্তায় বেরোবে তখন তার সামনে অন্য গাড়ি থাকার নিয়ম নেই। সেইজন্যই তাকে গাড়ি নিয়ে খানায় নেমে আসতে হয়েছিল। যাক্—ধর্মশালায় ফিরে রাজদর্শনের শুভ খবরটা মাকে আর বৌদিকে দিলুম, তাঁরা শুনেই ছুটে ধর্মশালার ছাদে গিয়ে উঠলেন, যদি মহারাণা সেই পথ দিয়ে ফেরেন তা হ'লে ভাল ক'রে দেখবেন, এই ভরসায়। কিন্তু তাঁদের দুর্ভাগ্যবশতঃ মহারাণা সে-পথ দিয়ে আর ফিরলেন না। অনেকক্ষণ রাস্তা চেয়ে ব'সে থেকে থেকে শেষকালে ধর্মশালার ওপরতলাটা ভাল ক'রে ঘুরে দেখে আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে এলুম। আজিমগঞ্জের 'খানিকটা বাঙালী' এক জমিদার মোকদ্দমা উপলক্ষে প্রায় মাসখানেক এসে ঐ ধর্মশালায় সেকেণ্ড ক্লাসে আছেন। বাংলা কথা না বলতে পেয়ে তাঁরও অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল, তিনি ওপরতলায় আমাদের দেখতে পেয়ে ডেকে খানিকটা আলাপ করলেন।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরেই আমরা শুয়ে পড়লুম। স্থির হ'ল পরের দিন খুব সকাল ক'রে উঠেই আমরা নগর-ভ্রমণে বার হবো। বিভিন্ন জাতের লোকেদের ঝগড়া, গান ও আলাপের কোলাহলের মধ্যে আমরা অনায়াসেই ঘুমিয়ে পড়লুম এবং পরের দিন সকাল সকাল ওঠার প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও উঠতে একটু বেলাই হ'ল।

যাই হোক, পরস্পরকে অতিমাত্রায় তাড়া লাগাতে লাগাতে আমরা স্নানাদি সেরে কেবলমাত্র একটু সরবৎ পান ক'রে বেরিয়ে পড়লুম নগর-ভ্রমণে। টাঙ্গা দোরের কাছেই কয়েকটি ছিল, তাদেরই একটার সঙ্গে কিছুক্ষণ বচসা করার পর দু'টাকায় ভাড়া রফা হ'ল।

ভাড়া ঠিক করার পর সে আর একটি বালককে সঙ্গে ডেকে নিল এবং ভরসা দিল খানিকটা পরে ঐ বালকের হাতেই আমাদের সমর্পণ ক'রে সে স'রে পড়বে।

ধর্মশালার মাঠ পেরিয়ে, নগর-তোরণের মধ্য দিয়ে আমরা খাস্ উদয়পুরের মধ্যে ঢুকলুম। ফটকের কাছে জনকয়েক উদয়পুরী ব'সে তামাক খাচ্ছিল ও আলাপ করছিল; তারা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে বৌদির শাড়ি কিংবা শাড়ি পরার ধরন নিরীক্ষণ করতে লাগল এবং আঙুল দিয়ে কী সব দেখাতে লাগল।

প্রথমেই বাঁ-হাতি রাস্তা ধ'রে সোজা গেলুম 'আজায়ব ঘর' বা মিউজিয়মে। জয়পুরের মহারাজার মিউজিয়ম দেখে যে পরিমাণ আনন্দিত ও বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই পরিমাণ হতাশ হলুম রাজপুতশ্রেষ্ঠ মহারাণার মিউজিয়মের এই ব্যর্থ প্রয়াস দেখে। জয়পুরের দ্রষ্টব্য জিনিস জগতের শিল্পচাতুর্যের এক অভিনব সংগ্রহ, দু'দিন ধ'রে দেখেও শেষ হয় নি। আর সে বাগানই বা কি সুন্দর! কিন্তু এখানকার বাগানও যেমন হতশ্রী, তার ভেতরের ছোট হলটিও (মিউজিয়ম ঘর) তেমনি অনুকরণের ব্যর্থ চেষ্টায় ভরা। গোটাকতক শিলালিপি দু'একটা পুতুল (নানাজাতীয় লোকের মৃৎমূর্তি—তা-ও বেশী নয়), দু'একটা অস্ত্র-শস্ত্র, ব্যাস্! মহারাণা প্রতাপের দু'একটি মাত্র স্মৃতিচিহ্ন আছে, সমস্ত জিনিসের মধ্যে সেইগুলিই যা-কিছু দ্রষ্টব্য।

ঐ বাগানেরই মধ্যে গোটাকতক কুকুর, একটা জীর্ণশীর্ণ হাতী এবং দু'চারটে পাখী, এই নিয়ে মহারাণা পশুশালার সখ মিটিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আর-একবার অম্বরপতির উল্লেখ না ক'রে পারছি না; তাঁর পশুশালায় যে কুকুরের অদ্ভুত সংগ্রহ দেখেছি তা বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। এত রকম যে কুকুর আছে, তা এর আগে লাহা মহাশয়ের প্রবন্ধ প'ড়েও জানতুম না!

বাগান ছেড়ে আমরা আমাদের টাঙ্গার একদফা সারথি-বদল ক'রে যাত্রা করলুম প্রাসাদের উদ্দেশে। প্রাসাদের বাইরে আমাদের টাঙ্গা রেখে আমরা রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঢুকলুম। বোধ হয় চার পা গেছি কি-না সন্দেহ, একজন ফতেসিংহ-প্যাটার্ণের দাড়িওয়ালা সিপাহী হৈ-হৈ ক'রে এসে প'ড়ে আমায় জানালে যে মাথায় পাগড়ী বেঁধে তবে ভেতরে ঢুকতে হবে। একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করলুম,—আমরা বাঙালী, আমাদের মাথায় বুদ্ধি আছে ব'লে পাগড়ী বেঁধে তাকে অধিক ভারাক্রান্ত করতে চাই নে। এ-সব কথাই তাকে যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সে অটল—বললে, 'এটাই নিয়ম।' কি আর করা যাবে, ভাগ্যিস্ সিল্কের চাদরটা নিয়ে বেরিয়েছিলুম, কোনও রকমে সেইটেই মাথায় চাপিয়ে বললুম, —চল বাবা, এইবার কোথায় নিয়ে যাবে, এর চেয়ে ভাল-রকম পাগড়ী বাঁধা আমার দ্বারা আর সম্ভব হবে না।

ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই বাঁ-হাতি শিউনিবাসের দেউড়ি; আমাদের যদিচ শিউনিবাসেরও পাশ ছিল কিন্তু সিপাইরা ভ্রূকুটি ক'রে জানাল যে মহারাণার ভগ্নী এসেছেন এবং তিনি শিউনিবাসেই অবস্থান করছেন, অতএব সেখানে যাওয়ার চেষ্টা যেন আমরা না করি। শুনে একটু আশ্চর্য হলুম, কারণ রাজা-মহারাজা এমন কি আমাদের দেশের জমিদার-বাড়িতেও সেকেলে আইন ছিল যে কন্যারা বিবাহ ক'রে সেই যে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ঢুকবেন একেবারে মরে তবেই বেরিয়ে যাবেন। যদিও-বা তীর্থযাত্রার অনুমতি পান, পিত্রালয়-যাত্রার কখনও না। মহারাণা এতদিনের সংস্কারকে এভাবে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছেন—তাতে বিস্মিত না হয়ে পারলুম না।

মহারাণার বহির্বাটির দেউড়িতে জন-দশেক সিপাহী ব'সে খোস-গল্প করছিল, তারা হৈ-হৈ ক'রে এসে প'ড়ে আমাদের পাশ দেখল, তারপর তাদেরই একজন 'গাইড্'রূপে আমাদের সঙ্গে চলল। আমাদের সকলেরই পায়ে জুতা ছিল, তা নিয়ে প্রত্যেক বারেই বিব্রত হ'তে হ'ল। কারণ গায়ের চামড়া যাদের মহারাণার মতো—তাদের জুতো পায়ে দিয়ে কোথাও যাওয়া নিষেধ। অবিশ্যি সাহেবদের কোনও বাধা নেই, তাঁরা স-বুট সর্বত্র যেতে পারেন।... আইনটি বেশ! দিল্লী-আগ্রাতে সব শাহী-গোরস্থানেও দেখেছি এই ব্যবস্থা। সাহেবরা কালো চামড়াকে ঘেন্না করে ব'লে আমাদের ক্ষোভের আর সীমা নেই। কিন্তু কেন? স্বদেশবাসীর উপর আমাদের অবজ্ঞা কি তাদের চেয়ে কিছু কম? ঐ যে আবু-পাহাড়ের ওপর দিলওয়ারা মন্দির—সাহেব এমন কি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের পর্যন্ত সেখানে অবারিত-দ্বার, শুধু দুর্ভাগ্যক্রমে যারা শিরোহীপতির স্বদেশবাসী তাদেরই পাঁচসিকে ক'রে দর্শনী দিতে হয়!...

মহারাণার বহির্বাটিতে উপস্থিত হয়ে রীতিমত হতাশ হলুম। এই কি মহারাণা প্রতাপের রাজপ্রাসাদ? মহারাণা উদয়সিংহ উদয়পুরে প্রাসাদ স্থাপন করেন, সুতরাং মহারাণা প্রতাপের এটা জন্মস্থান না হ'লেও তাঁর বাল্যকাল নিশ্চয়ই এখানে কেটেছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই উদয়পুর প্রাসাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শুধু বিলাতী বিলাস-সম্ভার জমে উঠেছে। মহারাণার বহির্বাটি যেন রাধাবাজারের কাচের দোকান! তার কি দেখব? কতকগুলো বিলাতী আলোর ঝাড় আর আয়না! নীচে দু'চারখানা কৌচ-কেদারা ইত্যাদি—কোথাও রুচিবোধ বা সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচয় নেই, শিল্পকলার প্রতি এতটুকু মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা নেই, নেহাতই কতকগুলো বিলাতী জিনিস—সাধারণ, মোটা।... মহারাণা প্রতাপের বংশধর একমনে শুধু বিলাতী কাচের দোকান উজাড় করেছেন—তাঁদের দেশপ্রীতির আদ্যশ্রাদ্ধ করেছেন।

জয়পুর মহারাজের প্রাসাদের মধ্যে আমরা যাই নি, তবে বিখ্যাত সাহিত্যিক অলডাস্ হাক্সলী যেভাবে এঁদের সকলের সম্বন্ধে কটাক্ষ করেছেন, তাতে মনে হয় যে সকলেরই সমান অবস্থা। অবিশ্যি জয়পুরের যাদুঘর বা অন্যান্য জিনিস দেখলে মনে হয় যে অন্তত দেশীয় শিল্পকলার প্রতি টান তাঁর আছে, কিন্তু উদয়পুরের সর্বত্র কি মহারাণার খাস-প্রাসাদ, কি তাঁর জগমন্দির আর জগনিবাস—ঐ একই ব্যাপার! একখানা ভাল ছবিও কি রাখতে নেই? ছবির মধ্যে বর্তমান মহারাণা ও স্বর্গীয় ফতেসিংহের রকমারী ছবি সাজানো; একখানা বোধ হয় হেমেন্দ্র মজুমদারের আঁকা ছবি দেখেছিলুম! বিকৃত রুচির এই নিঃসংশয় পরিচয় পেয়ে ভাবতে লাগলুম যে এটা কি স্বদেশপ্রেমের প্রতিক্রিয়া?

কাজেই প্রাসাদ দেখা আমাদের মিনিট-দশেকের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। তারপর আমরা প্রাসাদের সংকীর্ণ পথ দিয়ে অনেকখানি গিয়ে পেশোলার ধারে একেবারে ঘাটে উপস্থিত হলুম! প্রাসাদটি পেশোলার জল থেকেই সোজা উঠেছে, সুতরাং পেশোলার বুকের ওপর থেকে মন্দ দেখায় না। যদিচ প্রাসাদের কোনোখানেই স্থাপত্যবিদ্যার বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই, নেহাতই সাবেককালের একটা বাড়ি—একটু বড় এই যা!

প্রাসাদের ঘাটে দাঁড়িয়ে কিন্তু দূরের জগমন্দির ও জগনিবাস বড় সুন্দর দেখায়—যেন দুটি সাদা হাঁস পেশোলার জলে খেলা করছে! একজন সাহেব দেখলুম মাটিতে ব'সে একমনে জগমন্দিরের ছবি এঁকে নিচ্ছেন, আর চারদিকে কতকগুলো মাওলাদের ছেলে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। ভদ্রলোকর অধ্যবসায়ের পরিচয় পেয়েছিলুম ঘণ্টা-দুই বাদে ফিরে এসে, কারণ তখনও তিনি ছবিই আঁকছিলেন।

আমাদের নৌকোর পারানী-পয়সারও ছাড়পত্র দেওয়া ছিল, সুতরাং আমরা নিশ্চিন্ত মনে নৌকোয় গিয়ে উঠলুম; বাকী কতকগুলি মারোয়াড়ী ও মাদ্রাজী যাত্রী ছিল, তাদের কাছ থেকে এক আনা ক'রে ভাড়া নিয়ে পার করল। এ-ক্ষেত্রে একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না—উদয়পুরে তখন নিজস্ব মুদ্রা চালু ছিল। উদয়পুরের মুদ্রা আমাদের মুদ্রার চেয়ে কম মূল্যবান ছিল, বোধ হয় আমাদের দশ আনাতে ওদের এক টাকা হত। প্রত্যেক জিনিসের দাম বলবার সময় কোন্ মুদ্রা, তার উল্লেখ করতে হত। যথা—'ঘিউকা

ভাও এক রূপেয়া কাল্‌দারী'—অর্থাৎ ঘিয়ের দাম ব্রিটিশ ভারতের মুদ্রায় এক টাকা। কাল্‌দারীটা হ'ল ব্রিটিশ ভারতের মুদ্রা, উদয়পুরী হ'ল ওখানকার। টাকা, সিকি, দোয়ানি, আনি—এমন কি পয়সা পর্যন্ত উল্লেখ করার সময় কাল্‌দারী কি 'উদয়পুরী' তা ব'লে দিতে হ'ত।
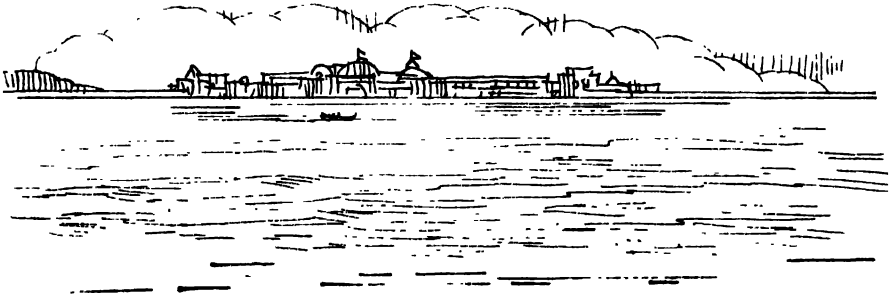
পয়সার খাঁইটা দেখলুম উদয়পুরে একটু যেন বেশী। রাজার সিপাই থেকে শুরু ক'রে নৌকোর মাল্লা পর্যন্ত বখ্‌শিশটা বেশ বোঝে, এমন কি খাস্‌মহলের সিপাইরা পর্যন্ত বখ্‌শিশ চাইতে ইতস্তত করে না এবং চাইবার সময় যদিচ এক টাকা চায়, পাবার সময় এক আনি পেলেও তাদের আপত্তি নেই। এই চাওয়ার ব্যাপারটা আবার বাঙালী দেখলেই বেড়ে যায়।

পেশোলার জলটি বেশ। খুব নির্মল, ওপর থেকে যেন কালো ব'লে মনে হয়। দোষের মধ্যে সামান্য একটু গন্ধ আছে এবং সে গন্ধ শোধিত হয়ে যখন পাইপে যায় তখনও তার আভাস পাওয়া যায়, তবে আজমীরের পাইপে আসা বদ্ধপুষ্করের জলের মতো নয়!...

প্রায় মিনিট-দশেক চলবার পরই আমাদের নৌকো জগনিবাসে গিয়ে পৌঁছল। জগনিবাস হ'ল মহারাণাদের গ্রীষ্মাবাস, মহারাণা প্রতাপের প্রপৌত্র মহারাণা জগৎসিংহ এটি তৈরী করেছিলেন। আর-একটি অপেক্ষাকৃত ছোট দ্বীপের ওপর জগমন্দির নির্মিত হয়েছিল। এইখানেই শাহ্‌জাদা খুরম, যিনি পরে শাহ্‌জাহান হয়েছিলেন—বিদ্রোহী অবস্থায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাঁরই জন্য এইখানে একটি মস্‌জিদ তৈরী করা হয়েছিল। আমাদের কর্ণধার বালক মাল্লাটি কিছুতেই আমাদের নৌকো জগমন্দিরে নিয়ে গেল না, নানা রকম যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ ক'রে দিল যে ওখানে দেখবার কিছু নেই।

জগনিবাসেও এমন কিছু নেই। মহারাণা ও মহিষীদের ঘরগুলি সেই বিলাতী আসবাবে

সাজানো; মহিষীদের স্নানের মহলে একটি ছোট পুকুরের মতো আছে, তাতে জল অবিশ্যি পেশোলা থেকেই আসে, কিন্তু তখন মহিষীদের আসার সময় নয় ব'লে সে জল পচে আছে। খানিকটা ঘুরেই বুঝতে পারলুম যে এ দূর থেকে দেখেই ফিরে যাওয়া চলত, ভেতরে আসার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

আবার নৌকা ক'রে প্রাসাদে ফিরে এলুম এবং প্রাসাদের বাইরে এসে আমাদের সেই দ্বিচক্র-যানে চড়লুম। বেলা তখন বেশ বেড়ে উঠেছে, তবে শীতের শেষ বেলা ব'লে তত কষ্ট আমরা পাই নি।

ওখান থেকে বেরিয়ে আমাদের সহেল্লা-বাড়ি ও ফতেসাগরে যাবার কথা। কিন্তু পথেই পড়ে প্রসিদ্ধ রণছোড়জীর মন্দির। এই মন্দিরে আছেন বিষ্ণুমূর্তি, কিন্তু সেজন্য নয়, অতি সুন্দর কারুকার্যের জন্যই মন্দিরটি বিখ্যাত। বস্তুত উদয়পুরে এসে পর্যন্ত এই প্রথম আমরা একটা দেখবার মতো জিনিস পেলুম। উদয়পুরে বিশাল হ্রদগুলি ও রণছোড়জীর মন্দির ছাড়া আর কোথাও কিছু আছে ব'লে মনেও হয় না।

রণছোড়জীর মন্দির থেকে বেরিয়ে আমার ভাইপোটিকে কিছু খাইয়ে নিয়ে আবার রথে চড়লুম। এইবার যাত্রাটা একটু মৃদু চালেই হ'ল, কারণ সেদিন দরবার ছিল ব'লে সর্দাররা সব মোটরে ও ঘোড়ার গাড়িতে দলে দলে যাচ্ছিলেন। সুতরাং সেই সংকীর্ণ পথে আমাদের টাঙ্গা যাবার রাস্তা কোথায়?

প্রাসাদ থেকে অনেকটা দূরে ফতেসাগর। স্বর্গীয় মহারাণা ফতেসিংহেরই কীর্তি এটি। জলবিরল মরুভূমির মধ্যে এত বড় হ্রদ দেখলে সত্যিই আশ্চর্য হ'তে হয়। জয়সমুদ্র যেমন মহারাণা জয়সিংহ ভীষণ দুর্ভিক্ষের দিনে করিয়েছিলেন, ফতেসাগরও অত না হোক্, একটা ছোটখাট দুর্ভিক্ষের সময় করা হয়েছিল। এতে সখও মেটে এবং রিলিফ-ওয়ার্ক বা আর্তদের সেবাকাজও চলে। এই সব হ্রদগুলির জন্যই উদয়পুরের সাহেবী নাম হচ্ছে City of Lakes—সরোবরের শহর!

ফতেসাগর খুব বেশী বড় নয়, কলকাতার উপকণ্ঠে ঢাকুরিয়া লেকের চেয়ে কিছু বড় হবে। চারপাশ বাঁধানো এবং পাড়ে বেড়াবার জন্য পাকা রাস্তা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘাটও আছে। মোটের ওপর এই নির্মল-সলিলা হ্রদটির তীরে গেলে বেশ একটু আনন্দই হয়।

শ্রীসহেল্লা-বাড়ি এই ফতেসাগরেরই পাশে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, মহারাণার বাগানবাড়ি। বিরাট একটা বাগানের মধ্যে বিশ্রাম করার মতো, ভোজ দেবার মতো একটা বাড়ি ক'রে রাখা হয়েছে—মহারাণার চিত্তবিশ্রাম বলা যেতে পারে। বাগানটি সাধারণ 'লেবেল' থেকে একটু নীচে, তার ফলে গাছে জল দেওয়ার কাজটা খুব অনায়াসে মিটে যায় অর্থাৎ ফতেসাগর থেকে পাইপে ক'রে জল আসে।

বাগানটি মন্দ নয়—গোলাপ ও চামেলীরই প্রাচুর্য। বৌদি চারদিকে গোলাপ ফুল দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আমি তাঁকে মহারাণার সিপাইদের ভয় দেখিয়েও নিরস্ত করতে পারলুম না, শেষকালে তাঁকে একটি ফুল তুলেই দিলুম। অবিশ্যি তার বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না, কারণ রাজপ্রাসাদের যে মালিনীরা মহারাণীদের জন্য ফুল তুলতে

এসেছিল—তাদের একজনকে একটি উদয়পুরী পয়সা দিতেই সে চারটে গোলাপ ফুল আর একমুঠো চামেলী আমাদের দিয়ে দিল। তবে তার অন্য কারণ থাকতে পারে—মালিনীটি ফুল দিতে দিতে তার সঙ্গিনীটিকে বলছিল,—"ছেলেটি ঠিক আমার ছোট ভায়ের মতো দেখতে, না?"... বলা বাহুল্য যে সেটা আমাকেই ইঙ্গিত ক'রে বলা হয়েছিল।

সহেলী-বাড়ি থেকে বেরিয়ে ক্লান্ত দেহে সোজা আমরা ধর্মশালায় ফিরে এলুম এবং পুনরায় স্নান ক'রে সামান্য কিছু জলযোগ ক'রেই শুয়ে পড়লুম—একেবারে তিনটে পর্যন্ত। শুয়ে পড়লুম কিন্তু ঘুম হ'ল না, কারণ মা একলিঙ্গ ও রাজসমন্দরের জন্য অনবরত তাগাদা দিতে লাগলেন।

কিন্তু হায়, সে বাসনা আমাদের অপূর্ণ রেখেই আসতে হ'ল! অন্য কোনও যাত্রীই অতদূর যেতে রাজী হ'ল না এবং শুধু আমাদের নিয়ে সেখানে যাওয়া ও ফিরে আসার জন্য বাসওয়ালা চাইল ত্রিশ টাকা। তখন ট্রেনভাড়া ছাড়া আমাদের হাতে আছে মোটে গোটা কুড়ি-পঁচিশ টাকা। তারই ভেতর রাজপুতানার শ্রেষ্ঠতীর্থ নাথদ্বার ও চিতোরগড় সেরে আজমীরে ফিরতে হবে!... মা ক্রুদ্ধ হয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন—একটু আগে টাকার ব্যবস্থা করলেই হ'ত, নয়ত আরও দু'দিন আজমীরে অপেক্ষা করলেই হ'ত—ইত্যাদি।

কিন্তু সে-সবই তখন 'গতস্য—'। আমাদের জয়সমন্দর্ ও রাজসমন্দর্ উভয়েরই আশা একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে ত্যাগ করতে হ'ল। ফলে মন এতই খারাপ হয়ে গেল যে চারটের সময় মহারাণার শূকর-ভোজন দেখতে যাবার যে বাসনা ছিল সে বাসনাও ত্যাগ ক'রে আমরা নাথদ্বার যাবার জন্য প্রস্তুত হলুম। এই শূকর-ভোজটি নাকি একটি দেখবার জিনিস। ঠিক ঐসময় প্রত্যহ মহারাণার অনুচররা প্রাসাদের প্রাচীর থেকে খাবার নীচে ফেলে দিতে শুরু করে এবং দেখতে দেখতে জঙ্গলের ভিতর থেকে হাজার হাজার শুয়োর এসে জড়ো হয়। সেই সময় মহারাণা নিজেও উপস্থিত থাকেন এবং আরও অনেকে সেই দৃশ্য দেখতে যায়।

ট্রেন আমাদের প্রায় ছটায়। আমরা পাঁচটা নাগাদ বিছানাপত্র বেঁধে যথারীতি বখ্‌শিশাদির ব্যবস্থা ক'রে ধর্মশালা ও উদয়পুর ত্যাগ করলুম। একে আহার্য বিশেষ কিছু পাওয়াই যায় না—তার ওপর রন্ধনাদির এত অসুবিধা যে বৃথা আর একটা দিনও ওখানে কাটাতে আমাদের কারুর ইচ্ছা হ'ল না।

ট্রেন অল্প কিছুক্ষণ 'লেট' ক'রে উদয়পুর ছাড়ল এবং ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই মাওলী জংশনে গিয়ে পৌঁছল। এইখানে বদল ক'রে আমাদের গাড়ি নাথদ্বারে পৌঁছল। এই নাথদ্বারই রাজপুতদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ভগবান শ্রীনাথজীকে দর্শন করার জন্য ওদের যে আকুলতা এবং তাঁর ওপর যা ওদের বিশ্বাস—তা দেখবার জিনিস।

মাওলী থেকে নাথদ্বার স্টেশন অল্পই দূর। কিন্তু নাথদ্বার স্টেশন থেকে নাথদ্বার শহর আরও সাত মাইল দূরে। এই পথ যাবার জন্য টাঙ্গা এবং একখানা বাসও পাওয়া যায়—যদি খারাপ হয়ে 'গ্যারাজ'-এ প'ড়ে না থাকে। নাথদ্বার স্টেশনটি অন্ধকার এবং কুলী-বিরল। অতি কষ্টে আমরা ট্রেন থেকে জিনিসপত্র নিয়ে নামলুম এবং শুনলুম যে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বাসও আছে। অচেনা জায়গায় এই অন্ধকার রাত্রিতে টাঙ্গা নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়, সুতরাং আমরা সকলে বাসে গিয়েই উঠলুম। যদিচ বাস রাত্রিবেলা মাথাপিছু ভাড়া অনেক বেশী নেয়, তবুও পূর্বোক্ত কারণে সে বাস দেখতে দেখতে বালিশে তুলো ঠাসার মতোই বোঝাই হয়ে উঠল। শেষকালে যখন তারা বুঝলে যে আর কোনও রকমেই তাতে লোক ভরা সম্ভব নয়, তখন তারা বাস ছাড়ল এবং ধুলোয় স্নান করাতে করাতে ঘণ্টাখানেক বাদে ধর্মশালার সামনে আমাদের নামিয়ে দিল।

নামিয়ে যখন দিল তখন ন'টা বাজে নি—কিন্তু তারই মধ্যে সেখানকার দোকানপাট বন্ধ হয়ে এসেছে এবং ধর্মশালার দ্বারও বন্ধ হয়-হয়। একটা জানলা-দরাজ-হীন ঘরে জিনিসপত্র রেখে ধর্মশালার মুন্সী বা চৌকীদারকেই পয়সা কবুল ক'রে তবে জল আনিয়ে মুখ-হাত ধোওয়া হ'ল, তারপর বেরিয়ে পড়লুম খাদ্যদ্রব্যের খোঁজে। একটিমাত্র দুধের দোকান তখনও খদ্দেরের মায়া কাটাতে পারে নি, আর সবই বন্ধ হয়ে গেছে। দুধওয়ালার কাছ থেকে কিছু দুধ আর ক্ষীরের 'কালাকন্দ্' সংগ্রহ করলুম, কিন্তু দাম দিতে গিয়ে তার দাবী শুনে অবাক হয়ে গেলুম। দুধ চার পয়সা সের, রাবড়ী দু'আনা এবং প্যাঁড়া ও বরফি তিন আনা সের।

পরের দিন অন্ধকার থাকতেই শয্যাত্যাগ ক'রে স্নানের জন্য তৈরী হওয়া গেল। কারণ শ্রীনাথজীর দর্শন শুনলুম বড়ই দুর্লভ। ভোরবেলা মঙ্গল-আরতির সময় একবার দর্শন হয়, তারপরেই একেবারে বেলা এগারটা। অথচ আমাদের তখন আর ট্রেন নেই—তার মানে আরও একদিন অবস্থান, কিন্তু তাতে তখন আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। যাই হোক্— কোনও রকমে স্নানাদি সেরে আমরা সূর্য-অনুদয়েই মন্দিরে পৌঁছলুম। কিন্তু তখনই কি অসম্ভব ভীড়! শিবরাত্রির দিন কাশীর মন্দিরে যেমন মারামারি হয় তেমনই পেষাপেষি চলেছে। কি আকুলতা ওদের! সে আগ্রহ চোখে দেখে তবে বোঝা যায় যে ভক্তি কাকে বলে।

"জয় শ্রীনাথজী! নাথোজী কি জয়! হে প্রভু, হে দয়াল, কৃপা রেখো হে স্বামী, হে নাথোজী!"

সকলেরই মুখে-চোখে-বাক্যে এই আকৃতি তখন ভাষা নিয়েছে—হে প্রভু, হে স্বামী, কৃপা রেখো!

কালো পাথরের মূর্তি, অধিকাংশই তখন কাপড়ে ঢাকা, শুধু অনুভবে বোঝা যায় যে বিষ্ণুমূর্তি। কোনও রকমে সেই ভিড়ের মধ্যে একবার চকিতে দর্শন শেষ ক'রে বেরিয়ে এলুম. কিন্তু মাকে নিয়ে বেরিয়ে আসাই দায়!

ফুল নিজে হাতে ক'রে দেবার হুকুম নেই, গদীতে গিয়ে জমা দিতে হয়, পূজারীরা নিজেদের ইচ্ছামত তার ব্যবহার করবে। আমরাও প্রত্যেকে এক-একটি ডালা কিনে যথাস্থানে জমা দিলুম। তারপর ভগবানের উদ্দেশে আর একবার প্রণাম ক'রে বেরিয়ে এলুম।

পুরীর জগন্নাথদেবের মতো নাথোজীর প্রসাদও নানা রকমের—সস্তা এবং পুরীর মতোই তা বিক্রী করার জন্য অসংখ্য দোকানযুক্ত বাজার আছে। এখানকার প্রসাদের সুলভতা ও উৎকৃষ্টতার খ্যাতি শুনছি বহুদিন থেকে, সুতরাং অবিলম্বে কিছু প্রসাদ কিনে দেওয়া গেল। খেয়ে দেখলুম সস্তা তা নিশ্চয়ই, কিন্তু উৎকৃষ্ট কিছুতেই নয়, বরং নাথোজীর মার্জনা ভিক্ষা ক'রে এই কথা বলা যায় যে তার অধিকাংশই অখাদ্য।

নাথোজীর মন্দির থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি ধর্মশালাতে ফিরেই বিছানা-মাদুর বেঁধে নিয়ে আমরা স্টেশনের দিকে রওনা হলুম। ট্রেন হ'ল সকাল সাড়ে আটটায়, আমাদের বেরোতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। যাবার সময় বাসে কিছুতেই যাবো না এই প্রতিজ্ঞা ছিল, সুতরাং টাঙ্গা ক'রে এক ঘণ্টায় সাত মাইল পথ যেতে পারব কি-না, অত্যন্ত ভয় হ'ল, কিন্তু দেখলুম যে 'পক্ষীরাজ' আমাদের যথাসময়েই নাথদোয়ারা স্টেশনে পৌঁছে দিল। ভাড়াও হিসেবমতো আমাদের কম পড়ল, কারণ টাঙ্গা ঐ পথের জন্য মাত্র চোদ্দ আনা পয়সা নিল। নাথদোয়ারায় একটা জিনিস খুব সস্তা দেখলুম সে-কথা এখানে উল্লেখ না ক'রে যবনিকা টানব না—সেটা হচ্ছে পেঁপে। চার পয়সায় যে পেঁপে কিনলুম তা খুব কম হ'লেও কলকাতায় পাঁচ-আনা বা ছ'আনার কমে দিত না।

এইবার চিতোরগড়।
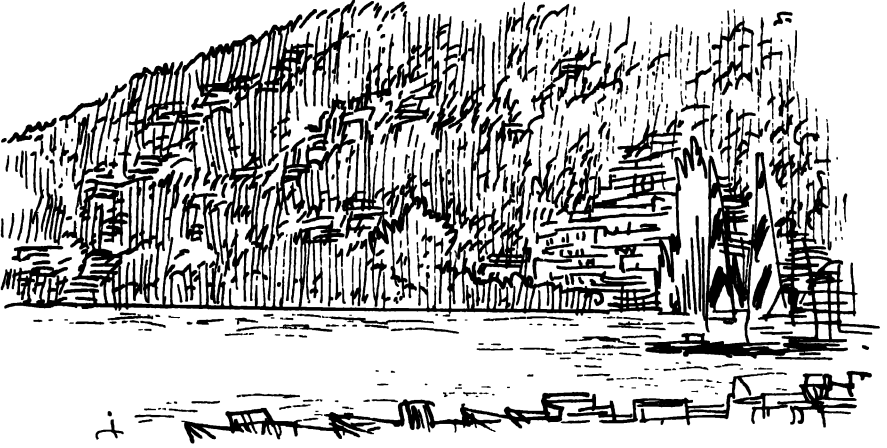
চিতোরগড় স্টেশনে যখন এসে পৌঁছলুম তখন বেলা একটা বেজেছে। স্টেশনে পৌঁছে কুলিপুঙ্গবকে প্রশ্ন করলুম, বাপু হে, ধর্মশালা আছে?

সে মহা উৎসাহে বলল, এই যে স্টেশনের কাছেই আছে বাবু, চলিয়ে না—

আশ্বস্ত হয়ে ওর পিছু-পিছু চললুম। কিন্তু স্টেশনের রাস্তাটা পেরিয়েই যে দৃশ্য নজরে পড়ল তাতে বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। শরৎবাবু গৃহদাহে "শেরশাহের আমলের যে ধর্মশালা"র বর্ণনা দিয়েছেন সে ধর্মশালাও এর কাছে লাগে না। ফটকহীন ভাঙা পাঁচিল-ঘেরা প্রকাণ্ড একটা মাঠের মধ্যে সেই কঙ্কালসার ধর্মশালা দাঁড়িয়ে আছে। খুব যে প্রাচীন তা নয়, তবে দেখলে মনে হয় যে ইটের গাঁথুনির পর আর নির্মাতাদের সামর্থ্যে কুলোয় নি। ভেতরে বা বাইরে কোথাও বালির কাজের চেষ্টামাত্র করা হয় নি। খান চার-পাঁচ ঘর, একটা জরাজীর্ণ কুয়া, অত্যন্ত নোংরা ও প্রাচীন পায়খানা একটা এবং খানিকটা রাঁধবার জায়গা—এই-ই সব। হয়ত ধর্মশালার কেউ রক্ষক আছে, কিন্তু তার চিহ্নমাত্র কোথাও দেখতে পেলুম না। যাত্রীরা যে ঘর খালি পায় তাইতেই মালপত্র নিয়ে ঢুকে পড়ে, খালি না পেলে ফিরে যায়, অন্য ব্যবস্থা দেখে।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তখনই একখানা ঘর খালি হ'ল, আমরা সঙ্গে সঙ্গে মালপত্র

ভেতরে পুরে ফেললুম। ঠিক দু-তিন মিনিট পরে আর একদল যাত্রী এলেন, তাঁদের অদৃষ্টে আর স্থান মিলল না, তাঁরা দালানেই মালপত্র নিয়ে মাথাগুঁজে রইলেন। ভদ্রলোকরা গুজরাটী বণিক— কি কাজে এসেছেন, কিন্তু সপরিবারেই এসেছেন। তাঁরা পরে রাঁধবার জায়গা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে রান্নাবান্না করেছিলেন—এমন কি আমাকে নিমন্ত্রণও করেছিলেন খাবার জন্য, কিন্তু সেই নোংরামির মধ্যে আমার খেতে প্রবৃত্তি হ'ল না। সেদিন আহারাদির ব্যবস্থা একরকম স্থগিত রাখলুম, মেয়েদের পূর্ণিমা ছিল, সুতরাং কিছু খরমুজ, কাঁকড়ী ও জঘন্য দই-এর ওপর দিয়েই আমরা দিনটা কাটিয়ে দিলুম।

যাই হোক— ঘরে জিনিসপত্র রেখে মুখে-চোখে জল দিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লুম চিতোরগড়ের উদ্দেশে। খান দুই টাঙ্গা ধর্মশালার বাইরেই দাঁড়িয়েছিল, উদয়পুরের মতোই জরাজীর্ণ ঘোড়া এবং দড়ির সাজ। তাদেরই একখানাকে যাওয়া-আসা ভাড়া ঠিক ক'রে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। রসুনের দুর্গন্ধে টাঙ্গাওয়ালার পাশে বসা ভার, তবুও কোনওরকমে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইলুম।

চারিদিকে ধূ-ধূ করছে মাঠ, প্রখর সূর্যকিরণে তা যেন নিঃশব্দে পুড়ছে, আর তারই গরম হাওয়া আমাদের মুখে চোখে এসে লাগছে, যেন দেহের রক্ত শুধু এই উষ্ণতায় শুকিয়ে উঠছে। ভিজে গামছা মাথায় দিয়েছিলুম, নিমেষের মধ্যে তা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল। চারদিকে শুধু আগুন।

মাঠ পেরিয়ে রেলের লাইন পার হয়ে টাঙ্গা চলল পাহাড়ের দিকে— একটু একটু ক'রে চিতোরগড়ের পাহাড় আমাদের নিকটবর্তী হ'তে লাগল। এই সেই চিতোরগড়, সেখানকার আশপাশে বাপ্পা, কুম্ভ, হামিরের স্মৃতি আজও মিশে রয়েছে।

পাহাড়ের পাদদেশে এবং গায়ে একটা গ্রাম আছে, বস্তুত এইটেই হ'ল আসল চিতোর। এখানে জনবসতি খুব বেশী, দোকানপাট যা-কিছু সবই এখানে। এরই সংকীর্ণ রাস্তার মধ্য দিয়ে বিস্তর রাজপুতের বিস্মিত দৃষ্টি অতিক্রম ক'রে আমরা এঁকেবেঁকে একটু একটু ক'রে পাহাড়ের ওপর উঠলুম। ক্রমে এগিয়ে এল গড়ের তোরণ।

প্রথম তোরণ পার হয়ে দু'দিকে 'র‍্যামপার্টের' মধ্য দিয়ে অনেকটা গেলে আবার একটা তোরণ পড়ে, এইখানে জয়মল্লের স্মৃতিস্তম্ভ আছে। অহোরাত্র সজাগ থেকে এই বীর একদা চিতোরের তোরণ রক্ষা করেছিলেন, শেষকালে মোগলসম্রাট আকবরের গুলিতে এঁকে প্রাণ হারাতে হয়। যেখানে তিনি আহত হয়ে পড়েছিলেন সেইখানেই একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে।

দু'দিকের প্রাচীরের দিকে চাইতে চাইতে যখন এগোচ্ছিলুম, তখন বার বার মনে হচ্ছিল যে এর প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডটি যেন আমার বিশেষ পরিচিত। যেসব লোক-দুর্লভ-কীর্তি এর অণুতে অণুতে জড়িত হয়ে রয়েছে, তার প্রত্যেকটিই আমার চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে যেন। এটা সম্ভব হয়েছে অবিশ্যি সেই যজ্ঞেশ্বরবাবুর ইতিহাসের কল্যাণে।

জয়মল্লর স্মৃতিস্তম্ভ পেরিয়ে আরও অনেকটা দুর্গপ্রাচীরের পাশ দিয়ে ওঠবার পর

টাঙ্গাওয়ালা বললে—এইবার নামতে হবে। যা-কিছু দেখবার পায়ে হেঁটে দেখতে হবে—তারপর আবার আমি নীচে নামিয়ে নিয়ে যাব।

অগত্যা নামলুম। সেইখানেই একজন গাইড এসে জুটল। আমাদের টাঙ্গাওয়ালা গাইডটিকে আমাদের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিল, হয়ত ওদের কিছু বন্দোবস্ত আছে।

কিন্তু সে যাই হোক, আমরা গাইড পেয়েছিলুম ভালই। ছেলেমানুষ, বয়স বোধ হয় চব্বিশ-পঁচিশ হবে, কিন্তু নিরক্ষর নয়। টডের রাজস্থান আর গৌরীশঙ্কর ওঝার ইতিহাস তার মুখস্থ। টডের ইতিহাস অনেক স্থলেই গোলমেলে, অসম্বদ্ধ, একথা আজকাল বহু ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। টডের এমনি বহু অসঙ্গতি ডাঃ ওঝা প্রমাণ-প্রয়োগের সঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছেন। টডের উক্তি যেখানে যেখানে ডাঃ ওঝা খণ্ডন করেছেন সবগুলিই আমাদের গাইডের কণ্ঠস্থ দেখলুম, যুক্তিগুলিসুদ্ধ। খুব ভদ্র, বেশী লোভ নেই। সে বেচারা আমাকে তার কার্ড দিয়েছিল কিন্তু সেটা হারিয়ে ফেলেছি ব'লে তার নামটা জানাতে পারলুম না।

টাঙ্গা থেকে নেমেই যে পথ দিয়ে আমরা চলতে শুরু করলুম তার প্রথমেই পড়ে মহারাণা কুম্ভের মহল ও অপর কয়েকটি সৌধ। এইখানেই খানিকটা ঐতিহাসিক অসঙ্গতি আছে, তবে তার আঘাতে তোমাদের অযথা ভারাক্রান্ত করতে চাই না।

সেই ভগ্নস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। এককালে এই প্রাসাদ সত্যিই দেখবার জিনিস ছিল তা আজও বোঝা যায়। লোকজন, দাসদাসীতে, কোলাহলে যখন সেই সব মহল দিনরাত মুখরিত হয়ে থাকত, সূর্যবংশধরদের প্রতাপ যখন ম্লান হয় নি, তাঁদের শৌর্য-বীর্য যখন পৃথিবীর ভয় এবং হিন্দুস্থানের গৌরব ছিল—তখনকার দিনের খানিকটা স্মৃতি শুধু খ'সে-পড়া মিনারে এবং ভাঙা দেওয়ালে আজও লেগে রয়েছে। মহিষীদের ঘোড়াশাল দেখে মনে হ'ল—হায় আজ কোথায় সেই আর্য-নারীরা যাঁরা তেজস্বী আরবী ঘোড়াকে সংযত ক'রে সওয়ার হতেন, দেশমাতৃকাকে স্বাধীন রাখার জন্য সেই অশ্বপৃষ্ঠে চ'ড়ে যাঁরা যুদ্ধযাত্রা করতেন!

প্রাসাদের কারুকার্য আজও বিলুপ্ত হয় নি, স্থাপত্যের গৌরব নিয়ে আজও তার সৌধের খণ্ডাংশ দাঁড়িয়ে আছে—তা থেকে কি ছিল তা সবটা না হোক্ খানিকটা আমরা বুঝতে পারি। বুঝতে পেরে শুধু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি, আর কি করব?

এইখানেই টড-উল্লিখিত সেই জহরব্রতের বিখ্যাত সুড়ঙ্গ বর্তমান। টড-সাহেবের মতে আলাউদ্দীন যখন চিতোরগড় জয় করেন তখন এই সুড়ঙ্গতেই আগুন জ্বেলে পদ্মিনীর দল তাতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। এই সুড়ঙ্গতে তারপর বহুদিন পর্যন্ত নাকি বিষাক্ত এমন গ্যাস জমেছিল—যে ওর ভেতর ঢোকবার চেষ্টা করেছে সে-ই মরেছে। অবশেষে ঝালোরের শনিগুরু সর্দার মালদেব ওর ভেতর ঢুকে দেখেছিলেন এক বিরাটকায় অজগর সাপ সেই সুড়ঙ্গ পাহারা দিচ্ছে এবং অলৌকিক এক নীল আলো সেখানে এখনও জ্বলছে। সে যাই হোক, কিন্তু এই সেদিনও দু-চারজন যাঁরা ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তাঁরা কেউই ফিরে আসেন নি, সেইজন্য সরকার বাহাদুর ওর মুখ একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। তবে

কেউ কেউ অনুমান করেন যে চিতোরগড় থেকে আবু পর্বত পর্যন্ত যে সুড়ঙ্গ মহারাণাদের আমলে বর্তমান ছিল ঐটেই সেই সুড়ঙ্গ।

মহারাণা কুম্ভের মহল পেরিয়ে আমরা বিখ্যাত জৈন মন্দিরের কাছে এসে পড়লুম। মেবারে এক সময় জৈনদের প্রতিপত্তি খুব বেড়েছিল তার সাক্ষ্য নিয়ে আবু পর্বতের 'দিলওয়ারা' আজও দাঁড়িয়ে আছে। মহারাণার মন্ত্রিবংশও জৈন—তাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির। মহারাণা প্রতাপের সেই বিখ্যাত মন্ত্রী ভামশা—যিনি এককালে প্রচুর অর্থ দিয়ে প্রভুবংশের মান রক্ষা করেছিলেন তিনিও জৈন ছিলেন। মন্দিরটির কারুকার্য সত্যই অপূর্ব। ছোট মন্দির, কিন্তু কারুকার্যে দিলওয়ারার কাছাকাছি যায়।

ওখান থেকে বেরিয়ে মহারাণাদের অস্ত্রাগারে পৌঁছনো গেল। সৈন্যব্যারাকের চিহ্ন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এসেছে, কিন্তু অস্ত্রাগারটি এখনও বর্তমান আছে। এইবার সেই বিখ্যাত জয়স্তম্ভের কাছে আমরা এসে পড়লুম। মহারাণা কুম্ভের অপূর্ব বীরত্বের এবং তৎকালীন রাজপুত-স্থাপত্যের চিহ্নস্বরূপ এই স্তম্ভটি আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভটি বিরাট এবং নির্মাণ-কৌশল অননুকরণীয়। টডসাহেব এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতার যা বিবরণ দিয়েছেন ডাঃ ওঝা মেপে দেখিয়ে দিয়েছেন যে তা ভুল। যাই হোক—দু'ফুট উঁচু-নীচু নিয়ে আমাদের কিছু এসে যায় না, আমাদের বিস্মিত হবার কারণও তাতে চ'লে যায় না। এই জয়স্তম্ভটি বহুদূর থেকে দেখা যায়। এত বড় স্তম্ভ বা 'টাওয়ার' কিন্তু নির্মাণ-কৌশলে দূর থেকে একে একটি সুদৃশ্য থামের মতোই দেখায়।

এই জয়স্তম্ভের কাছেই চিতোরগড়ের শ্মশান ছিল এবং ডাঃ ওঝা তাঁর বইয়ে প্রমাণ করেছেন যে, এইখানেই জহরব্রত পালন করা হয়েছিল—টডসাহেবের উল্লিখিত সুড়ঙ্গে নয়।... কোন কোন ঐতিহাসিক এখন আবার পদ্মিনীর জহরব্রতকে একেবারে কল্পনা ব'লেই উড়িয়ে দিতে চাইছেন।

এইখানে অর্থাৎ জয়স্তম্ভ থেকে একটু দূরে একটি ছোট পার্বত্য ঝরণা আছে। ঝরণার জল সামান্য, টিউবওয়েলের দেড়-ইঞ্চি পাইপ থেকে যতটা জল একেবারে পড়ে ততটা। এর জল খুব মিষ্টি এবং এখানকার লোকেরা বলে খুব হজমীও। ঝরণাটির একটা বিশেষত্ব এই যে, এর জল পড়ছে একেবারে একটি শিবলিঙ্গের ওপর। এই শিবলিঙ্গ নাকি মহারাণী পদ্মিনী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তিনি নাকি প্রত্যহ এখানে এসে ঝরণার জলে স্নান করতেন আর শিবপূজা করতেন।

যে সিঁড়ি বেয়ে পদ্মিনী নামতেন, সেই সিঁড়ি বেয়েই আমরা নেমে গেলুম এবং ঝরণার জল পান ক'রে মুখ-হাত ধুয়ে গামছা ভিজিয়ে নিয়ে ওপরে উঠে এলুম। এক রাজপুতানী এসেছিল জল নিতে, সে যাত্রী দেখেই বাবার প্রণামী দাবী করল এবং বলা বাহুল্য আমরা পয়সা দেওয়ামাত্র নিজের আঁচলে বাঁধল।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ব্যাপার উল্লেখ করি। আমাদের সঙ্গেই একদল মারোয়াড়ীও চিতোরগড় দেখতে গিয়েছিলেন। আমাদের সঙ্গেই বলবার অর্থ এই যে, তাঁরাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ওখানে পৌঁছান। যাই হোক— গাইড একটি তাঁদেরও ধরেছিল এবং যথারীতি

ঐতিহাসিক মহিমা সব বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ভাবে তার সঙ্গে ঘুরে শেষকালে ঈষৎ বিরক্তভাবেই তাঁরা বললেন, খামোকা সময় নষ্ট করছ কেন বাপু, কোথায় মন্দির-টন্দির আছে সেইখানে নিয়ে চল—'কালীমায়ী কি মন্দির।'
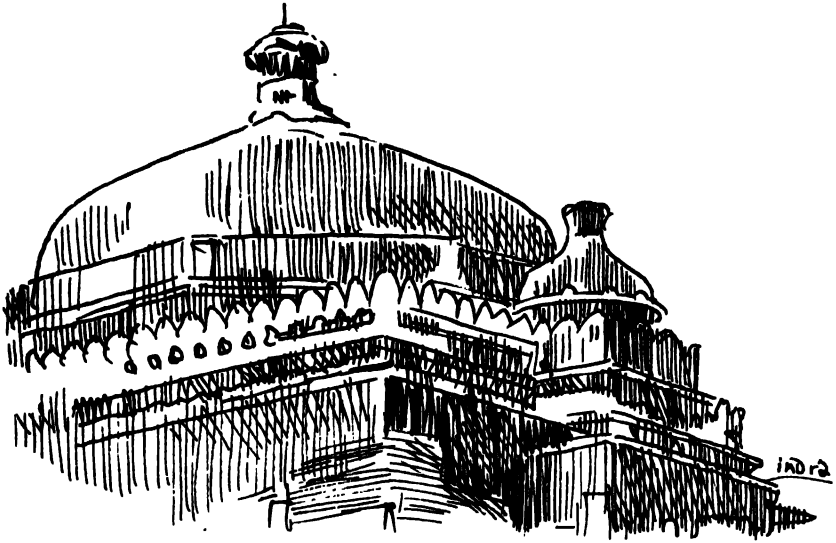
গতিক দেখে তাঁদের গাইড তাড়াতাড়ি চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে নিয়ে গেল। আমাদের গাইড একটু হেসে বললে—বাবু, এ-সব জিনিসের মহিমা কি সবাই বোঝে? সাহেবদের মধ্যে আমেরিকান, আর ভারতবাসীর মধ্যে বাঙালী—এরাই ঐতিহাসিক জিনিসের মর্যাদা বোঝে এবং দেখবার জন্য পয়সা খরচ করে, আর কেউ না! বাঙালীরা আছে, তাই আমাদের অন্ন হচ্ছে।

কথাটা শুনে আমার বহুদিনের একটা কথা মনে পড়ে গেল। তখন আমি ছেলেমানুষ—একলা আগ্রায় বেড়াতে গেছি। পাথরওয়ালা হোটেলে এসে হাজির হ'ল নানাবিধ পাথরের জিনিসপত্র নিয়ে। তার মধ্যে একজোড়া পাথরের বড় হাতী আমার পছন্দ হয়েছিল, সেইটেরই দাম জিজ্ঞাসা করলুম, বললে—আড়াই টাকা। আমি যখন বারো আনা জোড়া দিতে চাইলুম তখন সে মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলল, বাবু, এটা আষাঢ় মাস তাই আড়াই টাকা চাইলুম, পুজো কি বড়দিনের সময় হ'লে দশ টাকা বলতুম।

কৌতূহল হ'ল, বললুম—কেন বাপু?

সে বলল—ঐ সময়ই যে বাঙালীবাবুরা বেড়াতে আসে। বাঙালীবাবু ছাড়া এত দাম দিয়ে এ-সব জিনিস কে কিনবে বাবু? আমাদের অন্ন তো আপনাদেরই ঘরে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সে বোধ হয় এক টাকাতে হাতী দুটো দিয়ে গিয়েছিল।

ততক্ষণে আমরা চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে পৌঁছেছিলুম, কিন্তু মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। নীচে বলি হয়েছে, তারপর বোধ হয় তারই ছিন্নমুণ্ড নিয়ে কেউ মন্দিরে উঠেছে, সিঁড়ির ধাপে ধাপে রক্ত পড়তে পড়তে গেছে এবং সেই রক্ত তখনও কালো হয়ে শুকিয়ে রয়েছে। তা দেখে আমার মনে পড়ল, চিতোরেশ্বরীর সেই অদ্ভুত শোণিত-তৃষার কথা—ম্যয় ভুখা হুঁ!

শত্রু দ্বারে উপস্থিত, প্রত্যহ শত শত রাজপুতবীরের রক্তে চিতোরগড়ের মাটি লাল হয়ে উঠেছে, জননীর সন্তান—প্রেয়সীর স্বামী, ভগ্নীর ভাই এবং কন্যার পিতা—কত দুর্ধর্ষ বীর নিত্য তার আত্মীয়দের বুকে হাহাকার আর চোখে জলমাত্র শেষ সম্বল রেখে নিজেদের শোণিত ঢেলে দিচ্ছে জননী জন্মভূমির জন্য—তবুও ভুখা তুমি এখনও!

এই প্রশ্নই মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ করেছিলেন এবং তার জবাব পেয়েছিলেন—রাজরক্ত চাই, ও-সব শোণিতে আমার তৃষ্ণা মিটবে না!

রাজরক্ত দেওয়া হ'ল—রাজা এবং তাঁর একাদশ পুত্র নিজেদের বক্ষ-শোণিত ঢেলে দিলেন। চিতোরেশ্বরীর পিপাসা বোধ হয় তবুও মিটল না—চিতোর যবনদের করতলগত হ'ল।

কে জানে সেদিন কিসের ক্ষুধা জানিয়েছিলেন চিতোরের জননী, সে ক্ষুধা তাঁর কি ক'রে মিটবে! কিন্তু আজও বোধ হয় সেই তৃষ্ণা মেটাবার জন্যই প্রত্যহ তাঁর সামনে বলি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু চিতোরের মহারাণার অপরাধ কি রাজরক্তে কি পশুর রক্তে কিছুতেই ধুয়ে গেল না! চিতোরের রক্তপতাকা বার বার বিধর্মী ও বিজাতীয়দের কাছে মাথা নত করলে, আজও ক'রে রয়েছে![1]

চিতোরের মহারাণারা বাপ্পারাওয়ের সময় থেকেই [illegible]নত শৈব। তাঁরা মহারাজা নন—ভগবান 'একলিঙ্গ কি দেওয়ান' মাত্র। কি ক'রে যে তাঁরা শাক্ত হয়ে উঠলেন তা ভগবান জানেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালীই হলেই চিতোরেশ্বরী। সেই চিতোরেশ্বরীর মন্দিরের শোণিত-চিহ্নিত লাল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বার বার এই কথাই মনে হল যে কি জন্য আজও চিতোরেশ্বরী বলে এঁর পূজো দেওয়া, কেনই-বা কতকগুলো অসহায় পশুর রক্ত এঁর জন্য আজও ঢেলে দেওয়া? পাঠান এসেছে, মোগল এসেছে, ইংরেজ এসেছে—তাদের হাত থেকে তো ইনি চিতোরকে রক্ষা করতে পারেন নি, তবে ইনি কিসের অধীশ্বরী?

চিতোরেশ্বরী দর্শন ক'রে আমরা পদ্মিনী-সরোবর ও পদ্মিনী-মহল দেখলুম। পদ্মিনী-মহলটি এখনও ভাল অবস্থায় আছে এবং লাটসাহেবরা বেড়াতে এলে এরই বহির্বাটীতে মহারাণা ভোজের আয়োজন ক'রে থাকেন।

এই ভ্রমণকাহিনী যখন লেখা হয় তখন ভারতে ইংরেজ আমল।

চিতোরেশ্বরীর মন্দির ছাড়া গড়ের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির আছে, সেটি হচ্ছে ভক্তিমতী মীরাবাই-এর গিরিধারী গোপালের মন্দির। এই গোপালের জন্যই একদিন মীরাবাই তাঁর সব সুখ ছেড়েছিলেন, এই গোপালই তাঁর জনম-মরণের সাথী, এঁরই উদ্দেশ্যে তাঁর ব্যাকুল কণ্ঠে বার বার সেই প্রার্থনা বেজেছিল,—

"মীরা দাসী জনম জনমকী, মম অঙ্গসু অঙ্গ লাগাও,
প্রভুজী, চিত্তসুঁ চিত্ত লাগাও—"[২]

কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে তবে মন্দিরে উঠতে হয়। চিতোরগড়ের সব মন্দিরই প্রায় এই রকম। নলহাটির পীঠস্থান ললাটেশ্বরীর মন্দির যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি তুলসীমঞ্চ— তার মধ্যে ছোট্ট একটি তুলসীগাছ। এই তুলসীবিরল দেশে তুলসীগাছটি দেখে বড় আনন্দ হ'ল—কে জানে কেন, বোধ হয় বাংলা দেশের কথা মনে পড়ল। নাটমন্দিরের পাথর-বাঁধানো চত্বরটিও বড় ঠাণ্ডা, প্রেমময়ের স্নিগ্ধ অন্তরের আভাস যেন সেই শীতল নাটমন্দিরের বাতাসে লেগে রয়েছে ব'লে মনে হয়। আমরা একটুখানি সেইখানেই স্থির হয়ে বসলুম। তারপর প্রদক্ষিণ ক'রে নেমে এলুম আবার চিতোরগড়ের কঠিন কঙ্করময় পথে।

চিতোরগড় দুর্গের মধ্যেই চাষ-বাস করার যথেষ্ট জমি-জায়গা রয়েছে দেখলুম এবং সেখানে চাষ-বাস হচ্ছেও। শত্রুপক্ষ এসে দুর্গ অবরোধ করলে অন্ততঃ কিছুদিনের খাদ্য দুর্গের মধ্যেই জন্মাবে, বোধ হয় এই ছিল স্বর্গীয় মহারাণাদের কল্পনা। এখন ঐখানকার লোকজনই সেই চাষের ফসল উপভোগ করে।

আমরা আরও কিছুক্ষণ ঘুরে এটা-ওটা দেখলুম, তার পর গাইডকে বিদায় দিয়ে আবার টাঙ্গায় চড়লুম।

এবার অবতরণের পালা। আবার সেই টাঙ্গাওয়ালার পাশে বসে 'রসুন সৌরভের' ঘ্রাণ নেওয়া এবং চারিদিকের সেই অগ্নিবৃষ্টি! নামতে নামতে আমরা বার বার ফিরে চাইতে লাগলুম, বাপ্পা, হামির, কুম্ভ ও সংগ্রামের চিতোরগড়ের দিকে। মন যেন ভারী হয়ে উঠল, চোখ যেন ছলছলিয়ে উঠতে চাইল। কত মহাবীরের বুকের রক্ত ঐ রক্তপ্রস্তর-গঠিত দুর্গের মাটিতে মিশে রয়েছে, তা মনে করলেও গা শিউরে ওঠে। কিন্তু হায়, সব বৃথা! এইখানে এলেই মনে হয়—দৈব বুঝি পুরুষকারের চেয়ে অনেকখানিই বড়, নিয়তি বোধ হয় সত্যই দুর্লঙ্ঘ্য, নইলে এমন কি ক'রে সম্ভব হয়? চেষ্টার ত্রুটি কিছুই ছিল না—স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগেরও তো কোনও অভাব ছিল না, তবে?

ধর্মশালার জঘন্য ঘরে ফিরে এসে আমরা স্নানাহারের যোগাড় দেখলুম। মা ও বৌদি কিছুই খেলেন না প্রায়, আমি ও খোকা পুরী ও দই এনে খাওয়া সারলুম। পুরী আর

২ জনম জনম দাসী তব মীরা,
আমার অঙ্গে লাগাও অঙ্গ তব,
হে মোর দেবতা, হৃদয়ে হৃদয় তব-

জিলাপী, এ-ছাড়া বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। তবে আহার্য যে এখানে সুলভ তা মানতে হ'ল। আহার করতে করতেই সন্ধ্যে হয়ে এল; আমাদের ট্রেন কিন্তু রাত্রি প্রায় দশটায়। বিশ্রাম আমরা ন'টা পর্যন্তই করতে পারতুম, কিন্তু বহু যাত্রী স্থানাভাবে তখনও বাইরে বসেছিল, তাদের লোলুপদৃষ্টি প্রতিনিয়ত যেন আমাদের বিঁধছিল। বেশীক্ষণ তাদের বঞ্চিত না ক'রে ঘণ্টাখানেক পরেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম স্টেশনের দিকে। সত্যি কথা বলতে কি, ধর্মশালার ঘরের চেয়ে খোলা প্ল্যাটফর্মে বিশ্রাম করাই আমার কাছে শ্রেয় ব'লে মনে হ'ল। আর যাত্রীদেরও তাগাদা যে কি ভীষণ ছিল তা এইতেই বোঝা যাবে যে তাঁরা আমাদের যাত্রার ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র একদল জিনিসপত্র নিয়ে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লেন, আমাদের বেরিয়ে যাওয়া বা ঘর পরিষ্কার করার বিলম্বও তাঁদের সইল না।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম তখন অন্ধকার। ট্রেনের সময় ব্যতীত তৈলের অপব্যয় বোধ হয় রেল কোম্পানীর আইনে কার্যতঃ নেই। আমরা সেই অন্ধকারেই জিনিসপত্র রেখে একটা শতরঞ্জি বিছিয়ে মেয়েদের বসার জায়গা ক'রে দিলুম। আমার ঠিক বসার ইচ্ছা ছিল না, আমি সেই অন্ধকার প্ল্যাটফর্মের উপরেই যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে পায়চারি করতে লাগলুম।

দু-একটি যাত্রী তখন থেকেই এসে জুটতে লাগল। তারা নিঃশব্দে চলা-ফেরা করছিল প্রেতাত্মার মতোই। আলো নেই, বাতাস নেই, কোলাহল নেই—সমস্তটা জড়িয়ে যেন একটা থমথমে ভাব। অফিস-ঘরের ক্ষীণ আলো একটা জানালা দিয়ে এসে ওভার-ব্রীজের সিঁড়ির গায়ে পড়েছিল আর ওপরের আকাশে নক্ষত্রের মৃদু আলোক, সেই গভীর তমিস্রার মধ্যে এইটুকুই শুধু আলোর বিচ্ছেদ ছিল।

আমরা চুপচাপ ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলুম ট্রেনের। আমাদের উত্তরে-দক্ষিণে-পূবে-পশ্চিমে শুধু জমাট অন্ধকার এবং অনেকটা দূরে আরও জমাট খানিকটা অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে চিতোরগড়ের পাহাড়। মরে-যাওয়া অনেক বাসনা বুকে পুঞ্জীভূত ক'রে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে ঐ পাহাড়, ওকে অন্ধকারেই বোধ হয় মানায় ভালো। আর ঐ কুম্ভের বিজয়স্তম্ভ? দিবালোকে ও যেন বিজয়লক্ষ্মীকে উপহাস করতে থাকে! ভালোই হয়েছে, এখন ও মুখ লুকোবার মতো অন্ধকার পেয়েছে!

মধ্যে মধ্যে প্ল্যাটফর্মের ডালপালা কাঁপিয়ে একটা ক'রে দম্‌কা গরম হাওয়া ভেসে আসছিল। দূরের ঐ চিতোরগড়ের দিকে চেয়ে মনে হতে লাগল স্বর্গত মহারাণাদের ক্ষুব্ধ আত্মারা লজ্জায় উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করছেন!

সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্

ভগবান রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করবার জন্য যখন লঙ্কাযাত্রা করেন তখন সমুদ্র তাঁকে বড়ই জব্দ করেছিল। সমুদ্রের ওপর দিয়ে সেতু বেঁধে যাতে নির্বিঘ্নে তিনি যেতে পারেন এই আশায় রামচন্দ্র শিবপূজা করেছিলেন। প্রবাদ যে দক্ষিণ ভারতের সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামক তীর্থটি সেই শিবকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে। এইবার সেখানকার কথাই বলব।

শ্রীরঙ্গম্ থেকে গাড়িতে চেপেই যে ঘুমিয়েছিলুম, সে ঘুম ভাঙল একেবারে 'পম্বন্' জংশনের কাছাকাছি এসে, গাড়ি যখন সমুদ্র-সেতুর ওপর উঠেছে। গাড়ির বাকী যাত্রীরাও অধিকাংশই বাঙালী, তাঁরা দেশ থেকেই শুনে এসেছিলেন যে সাগরের ওপর দিয়ে ট্রেন যায়—সে এক তাজ্জব ব্যাপার! সুতরাং তাঁদের উৎসাহ ও কোলাহলের অন্ত নেই, সকলেই জানালার দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখছেন এবং অবিশ্রাম বকছেন।

বহুদিন পরে 'বাঙ্লা কোলাহলে' ঘুম ভেঙে গেলে আমিও বাঙ্ক্ থেকে নীচে নেমে এলুম। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, বাইরে তখনও রীতিমতো অন্ধকার। সমুদ্রের ঢেউ ঠিক গাড়ির চাকায় এসে ঠেক্‌ছে (যা আমরা দেশ থেকে শুনে এসেছিলুম) কিংবা ঢেউ মোটেই নেই (যে সত্য আমরা ফেরবার পথে আবিষ্কার করেছিলুম)—তা তখন কিচ্ছু বোঝবার উপায় ছিল না। শুধু আব্‌ছায়া অন্ধকারের মধ্যে বিপুল একাকার জলের অস্তিত্বটা বোঝা যাচ্ছিল মাত্র। যতক্ষণ পুলের উপর দিয়ে চলল ততক্ষণই প্রায় আমরা বাইরের দিকে চেয়ে ব'সে রইলুম কিন্তু ফরসা আর হ'ল না—এমন কি পম্বনে যখন এসে পৌঁছলুম, তখনও রীতিমতো অন্ধকার।

সেতুবন্ধ একটি ত্রিকোণাকার দ্বীপের ওপর। দ্বীপটির এক কোণে পম্বন্, এক কোণে রামেশ্বরম্ এবং অপর কোণে হ'ল ধনুষ্কোডি। যেহেতু ধনুষ্কোডি বন্দর, সিংহল যাত্রীদের সুবিধার জন্য ট্রেনগুলো সোজা ধনুষ্কোডিতেই যায়, রামেশ্বর যাওয়া-আসা করতে গেলে তখন পম্বনে নামা ছাড়া উপায় নেই। এমন কি রামেশ্বর থেকে ধনুষ্কোডি যেতে গেলেও ঐ একই ব্যবস্থা।

পম্বনে নেমে রামেশ্বরের গাড়িতে চেপে বসলুম। অসংখ্য পাণ্ডার ছড়িদার এসে ঘিরে ধরল। পাণ্ডা রামনাথ বিশ্বনাথের হিন্দুস্থানী ছড়িদার শর্মণপ্রসাদ আমাদের মাদ্রাজেই ধরেছিল এবং সেখানে বিস্তর ফায়ফরমাস খেটে আমাদের প্রতিশ্রুত করিয়ে নিয়েছিল যে আমরা রামনাথ বিশ্বনাথকেই পাণ্ডা ধরব। আমরা বিশ্বস্তভাবে তাঁর নাম ক'রে সেই পঙ্গপালের হাত থেকে অব্যাহতি পেলুম। গঙ্গাধর পীতাম্বরের প্রতিপত্তি আর ছড়িদারের সংখ্যাই কিছু বেশী দেখলুম, এমন কি তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমরা অন্য পাণ্ডা ধরায় রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করল। তাদের বোধ করি বিশ্বাস যে, বাঙালী মাত্রেরই একটিমাত্র পাণ্ডার কাছে যাওয়া উচিত।

শ্রীমান্ শর্মণপ্রসাদ রামেশ্বর স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। লোকটি মধ্যবয়সী, পাকা ছড়িদার। সে যথেষ্ট হাঁকডাক ক'রে একটা 'ঝট্‌কা' ভাড়া করলে এবং আমাদের মালপত্র তুলে আমাদের উঠিয়ে দিয়ে নিজেও সঙ্গে সঙ্গে ধর্মশালা পর্যন্ত হেঁটে গেল। আমরা বি. এন. আর. অফিসে একজন বুকিং ক্লার্কের কাছ থেকে ভগবান দাসের ধর্মশালার নাম সংগ্রহ ক'রে গিয়েছিলুম, সেখানে পৌঁছে দেখলুম ভদ্রলোক ভালোই বলেছিলেন। যেমন পরিচ্ছন্ন তেমনি প্রশস্ত, আর একেবারে নতুন। কেবল কুয়োর জলটা খারাপ, মানে নোন্‌তা—খাবার জন্য রাস্তার কল থেকে জল ধ'রে আনতে হয়, এই যা অসুবিধা।

আমরা স্নানাদি শেষ ক'রে তীর্থকৃত্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে পাণ্ডাজীর বাড়ি গেলুম। রামনাথ বিশ্বনাথের বাড়ি মন্দিরের কাছেই। ধর্মশালা থেকেও বেশী দূরে নয়। রামনাথ বিশ্বনাথ মারাঠী ব্রাহ্মণ, মন্দিরের পূজারীদের মধ্যে অন্যতম। মারাঠীরা যখন দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য লাভ করেছিল, তখনই তারা মন্দিরের স্থানীয় পূজারীদের সরিয়ে মারাঠা থেকে পূজারী আনায়। সেই ব্যবস্থা আজও র'য়ে গেছে। পাণ্ডাজীকে দেখে ভক্তি হ'ল। বেশ সৌম্যমূর্তি, মিষ্টভাষী ও শিক্ষিত। 'টাইমস' ও 'হিন্দু' দুখানি দৈনিক এবং ইংরাজী 'দীপালী' প্রভৃতি দু-একখানি সাপ্তাহিকপত্র তিনি নিয়মিত নেন। তিনি সেখানকার তীর্থকৃত্য সম্পর্কে যা যা করবার এবং দেখবার আছে, সমস্তই লিস্ট ক'রে দিলেন এবং আমরা কী পর্যন্ত অর্থ, সময় ও শক্তি নষ্ট করতে পারি তা জেনে নিয়ে তদনুপাতে লিস্টটি কিছু সংক্ষেপ করে দিলেন। প্রথমেই লক্ষ্মণকুণ্ডে স্নান করতে যেতে হবে, সেখানে স্নানান্তে ভোজ্য প্রভৃতি উৎসর্গ (ইচ্ছা হলে শ্রাদ্ধাদি), তারপর চব্বিশকুণ্ডে সঙ্কল্প ও স্নান (যা আমরা করি নি) এবং দর্শন। পাণ্ডাজী পরে লক্ষ্মণকুণ্ডে যাবেন বলে আমাদের তখনকার মতো শান্তিলাল বলে অপর একটি ছড়িদারের হাতে সমর্পণ করলেন, আমরা গাড়ি ক'রে লক্ষ্মণকুণ্ডে যাত্রা করলুম।

বলা বাহুল্য, চেনাশুনো হয়েছে বলে আমরা প্রথমে শর্মণপ্রসাদকেই চেয়েছিলুম কিন্তু শান্তিলালকে দেখামাত্র আমাদের সব আপত্তি চলে গেল। শান্তিলাল গুজরাটি, বয়স বোধ হয় উনিশ-কুড়ি হবে, প্রিয়দর্শন এবং ভদ্র। মালাবারে তার বাবা-মা থাকেন, ওর বাবা সেখানকার কোন্ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ম্যাট্রিকুলেশান পর্যন্ত পড়ার পরে সে-ও সেই ব্যাঙ্কে চাকরিতে ঢুকেছিল, কিন্তু বাপ-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এখানে পালিয়ে আসে। অল্প ইংরেজীতে এবং হিন্দীতে কথা বলতে পারে বলে আমাদের পাণ্ডাজী তাকে ছড়িদারের কাজ দিয়েছেন। কিন্তু ছড়িদারসুলভ কলাকৌশল তার কিছুই আয়ত্ত হয় নি এখনও, না জানে সে পয়সা আদায়ের নানা রকম ফন্দী, না জানে অতিরিক্ত মাত্রায় যাত্রীদের সেবা করবার অভিনয়।

তাকে যত দেখতে লাগলুম, ততই মুগ্ধ হয়ে গেলুম। সে কথা কয় আস্তে, মিষ্টি করে, চোখে তার স্বপ্ন, গতিতে তার ছন্দ—তারুণ্যের যত কিছু সংজ্ঞা, সব যেন তার মধ্যে মূর্তি ধরেছে।

আমরা ঝট্‌কায় চেপে যথাসময়ে লক্ষ্মণকুণ্ডে পৌঁছলুম। এইটিই এখানকার প্রধান তীর্থ—বেশ বড়গোছের একটি চতুষ্কোণ পুকুর, তার ধারে শ্রাদ্ধাদি করার জন্য পাথর-

বাঁধানো প্রকাণ্ড চত্বর। দেখলুম বেশ ভীড় হয়েছে, শ্রাদ্ধশান্তি করার মত যাত্রীই বেশী। আমরাই বোধ হয় তার মধ্যে সবচেয়ে পাষণ্ড—পিতৃলোককে যবের আটা কিছুতেই খেতে দিলুম না! আমি স্নান করলুম না—ধর্মশালা থেকেই সেরে এসেছিলুম। মা স্নান ক'রে সঙ্কল্প করলেন, কথা রইল ধর্মশালায় ফিরে গিয়ে ভোজ্য উৎসর্গ করা হবে।

লক্ষ্মণকুণ্ডের পরই আমরা সোজা মন্দিরের উদ্দেশ যাত্রা করলুম। রামকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড ছোট দুটি পুকুর আমাদের পাশেই পড়ে রইলো, আমরা নামলুম না। বেলা তখন বেশ বেড়ে গেছে, রাস্তার বালি তখনই তেতে আগুন হয়ে উঠেছে।

রামেশ্বরম্ মন্দিরের গোপুরম্ বা সিংহদ্বার খুব উঁচু নয়, মাদুরা কিংবা শ্রীরঙ্গম্-এর সঙ্গে তুলনাই চলে না, কিন্তু মন্দিরটি আয়তনে প্রকাণ্ড। একবার ঘুরে আসতে হলেই মাইল তিনেকের ধাক্কা। সহস্র-স্তম্ভ মণ্ডপটির যে-কোনও দিকের কোণে দাঁড়ালে অপর কোণ ভাল ক'রে দেখা যায় না। মন্দিরের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য 'ডায়নামো' বা বিদ্যুৎ-কেন্দ্র আছে, কিন্তু রাত্রে অজস্র আলো দেওয়া সত্ত্বেও বিরাট মন্দিরের মধ্যে যেন ভয়াবহ শূন্যতা অনুভব করতে হয়।

মন্দিরটির প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে না ঢুকে আমরা পূর্ব গোপুরম্ দিয়ে ঢুকলুম, কারণ গঙ্গাজলের অফিসটি সেই পথ দিয়েই কাছে হয়। শিবের মাথায় গঙ্গাজল ঢালতেই হবে, অথচ গঙ্গা বহু দূরে। সুতরাং মন্দিরের কর্তারা পয়সা রোজগারের এই অভিনব উপায়টিকে একটুও অবহেলা করেন নি। গঙ্গাজল শিবের মাথায় ঢালবার ট্যাক্স হ'ল দু'টাকা, তাছাড়া গঙ্গাজলের দাম আলাদা। এক টাকাতে সিকিভরি আতর ধরে এমনি একটি শিশির এক শিশি গঙ্গাজল পাওয়া গেল। আমাদেরই সঙ্গে একদল বড়লোক যাত্রী গিয়েছিলেন, তাঁরা ছ'টাকার গঙ্গাজল কিনে ছোট ঘটির একঘটি জল পেলেন।

জল ফুল মালা এবং পূজার সামগ্রী নিয়ে আমরা সহস্র-স্তম্ভ মণ্ডপ পেরিয়ে প্রধান মন্দিরের তোরণে এসে পড়লুম। বিরাট মন্দির, অগুনতি চত্বর ও তোরণ—এরই মধ্যে নাকি চব্বিশটি কুণ্ডও আছে কিন্তু সে মাইল-তিনেক হাঁটতে হবে শুনে তখনকার মতো সে আশা ত্যাগ করলুম।

রামেশ্বরম্ মন্দিরেও দক্ষিণের আর সব বড় মন্দিরের মতো সোনার ঘণ্টাস্তম্ভ আছে (যা নাকি বৃন্দাবনে গিয়ে সোনার তালগাছ আখ্যা পেয়েছে), তবে তা কিছু ছোট। সেই দৈন্যটা পুষিয়ে নিয়েছেন দেবাদিদেবের ষাঁড়টি। একখানা আস্ত পাথর কেটে এই বিরাট ষাঁড়টি তৈরী করা হয়ত বিশেষ কঠিন নয় কিন্তু কেমন ক'রে এখানে এনে বসানো হ'ল—তাই ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলুম।

নটরাজের মূর্তির পেছনে যে অপূর্ব কোণ-সমন্বিত ছটাটি দেখা যায় (মানে ছবিতে বা নটরাজের মাটির মূর্তিতে যেমন দেখা যায়), ঠিক সেইরকমই বড় পাথরের ছটা দক্ষিণের সব শিবমন্দিরের মূল তোরণের কাছে থাকতে দেখেছি; বোধ হয় ওটা শিবেরই প্রতীক হবে। ঐ পাথরের বিপুল ছটাটিকে অসংখ্য মণিমাণিক্য-খচিত ঝলমলে তোরণের মতোই দেখায়।

অবশেষে আমরা মূল মন্দিরের দ্বারে এসে দাঁড়ালাম। জয় রামেশ্বরম্।

হিন্দুর প্রধান তীর্থ চারটি, চার ধামের এক ধাম সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্। সীতা উদ্ধারের সময় যখন সাগরের উপর সেতু বাঁধবার দরকার হয়েছিল, তখন নাকি রামচন্দ্র এই শিবলিঙ্গ স্থাপন ক'রে শিবের পূজা করেছিলেন। স্বয়ং রামচন্দ্র-সেবিত এই লিঙ্গ বহুজন্মের তপস্যার ফলে পূজা করা যায়,—এই আমাদের বিশ্বাস।

আমরা সকলে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এই তীর্থদ্বারে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালুম। বহুদূর বিস্তৃত অন্ধকার পথের শেষে মূল মন্দির, তারই মধ্যে সেই অনাদিলিঙ্গ শিব। পাছে দেখার অসুবিধা হয় তাই শিবলিঙ্গের পেছন দিকে অসংখ্য দীপাবলীর ব্যবস্থা। সেই আলোকের পৃষ্ঠপটে দেবঋষি-সেবিত চন্দ্রশেখর শিবের উজ্জ্বল মূর্তির দিকে আমরা চোখ মেলে চেয়ে রইলুম। কত বছর কেটে গেছে, কত লক্ষ যাত্রী প্রতিদিন মরণপণ ক'রে এই সুদুর্লভ দর্শনের জন্য কত দূর-দূরান্তর থেকে এসেছে, আজও আসছে। সেই বহুজন-আকাঙ্ক্ষিত দর্শন কি সত্যই আমাদের অদৃষ্টে মিলল? স্তিমিত আলোকের আধো-রহস্যে-ঢাকা এই মূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হ'ল—এ কি শুধুই পাষাণ-মূর্তি? কোটি কোটি যাত্রীর প্রাণের ব্যাকুলতাতেও কি এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নি? তা যদি হ'ত তা হ'লে এই দেবদুর্লভ দর্শনের পরেও কি মানুষকে দুঃখ-শোক স্পর্শ করত? নিমেষে কি সব অমৃতময় হয়ে যেত না?

হয়ত হয় নি। আমার নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখলুম সেখানে বিশ্বাসও নেই, অবিশ্বাসও নেই—আছে দ্বিধা, আছে সঙ্কোচ। হয়ত এমনি দ্বিধা নিয়েই আজ পর্যন্ত সমস্ত যাত্রী, ঐ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নর-নারী এখানে এসেছে, তাই আজও ঐ পাষাণ-মূর্তির মধ্যে নীলকণ্ঠ দিগম্বর অহিভূষণ চন্দ্রশেখরের পরম-ভিখারী শিবের প্রতিষ্ঠা হয় নি। তাই আমাদের সমস্ত তীর্থযাত্রা বারে বারে ব্যর্থ হয়েছে, তাই আজও দিকে দিকে এত হলাহল—এত বিষ সকলের অন্তরে বাহিরে।

শিবের মন্দিরেও সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই, এমনটা শুধু দক্ষিণেই সম্ভব! পূজারীরা আমাদের কাছ থেকে গঙ্গাজল আর পূজার উপকরণ নিয়ে ভেতরে গেল। আমরা শুধু সেই আধো-অন্ধকারের মধ্যে প্রাণপণে চেয়ে রইলুম। পূজারী গঙ্গাজল ঢেলে দিল, তারপর নারিকেলটা ভেঙে একবার শিবলিঙ্গের সামনে ধরল আর কর্পূরটা জ্বেলে আরতির অভিনয় করল। ব্যাস্, পূজা শেষ—দাও পূজারীদের এক টাকা দক্ষিণা আর গঙ্গাজল দেবার সময় নামগোত্র বলার জন্য এক টাকা ট্যাক্স!

বলা বাহুল্য যে, মা বিনা দ্বিধায় তাদের সব দাবীই মেটালেন। সেখান থেকে বেরিয়ে পার্বতী দেবী দর্শন ক'রে আমরা ধর্মশালায় ফিরে এলুম। পথে ভোজ্যের থালা, গ্লাস, বাটি, চাল-ডাল-ঘি প্রভৃতি কেনা হ'ল, কাপড় আমাদের সঙ্গেই ছিল। ধর্মশালায় ফিরেও শান্তিলাল খানিকটা ছুটোছুটি ক'রে ভোজ্যের আয়োজন সম্পূর্ণ করল। পাণ্ডাঠাকুরের হাতে সেই ভোজ্য নিবেদন ক'রে মা প্রায় বেলা একটার সময় তীর্থকৃত্য সমাপ্ত ক'রে জল খেলেন।

সেই দিনই ব্রাহ্মণভোজন করাবার কথা। পাণ্ডাজীকে আমরা টাকা দিয়েছিলাম, তাঁরই

বাড়িতে রন্ধনের আয়োজন হয়েছিল। সুতরাং যথাসময়ে শান্তিলাল আমাদের ডেকে নিয়ে গেল—প্রসাদ পাবার জন্য ও দক্ষিণা দেবার জন্য। ভাত-ঘি-পুরী ও প্রায় ক্ষুদের মতো মোটাদানা সুজির হালুয়া, দুটো ডাল, একটা ব্যঞ্জন এবং নারকেলের সঙ্গে লঙ্কাবাটা দিয়ে চাটনি—এই হ'ল মেনু বা খাবার ফর্দ। ছড়িদার শর্মণপ্রসাদ এবং জন-সাতেক ব্রাহ্মণ খেলেন, শান্তিলাল খেল না। শুনলাম সে আগে পাণ্ডাজীর বাড়িতেই খেত, এখন পয়সা চেয়ে নিয়ে হোটেলে খায়। ছেলেটা নিরতিশয় অভিমানী, তার প্রমাণ পদে পদে পাচ্ছিলাম।

আমাদের পাণ্ডানী শুধুই রূপসী নন—সুপাচিকাও বটে। বাস্তবিক এই সুদূর অনার্যদের দেশে এমন সরেস রান্না আশা করি নি। বহুদিন পরে তৃপ্তি ক'রে খেলুম। পাণ্ডানী সুমধুর অথচ শান্তগম্ভীর হাসিমুখে বার বার আমাদের কি চাই প্রশ্ন করতে লাগলেন, ভাঙা হিন্দীতে আলাপ চলতে লাগল। তাঁর মহিমময়ী চেহারা এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

অপরাহ্নে বহুক্ষণ পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটালুম। তারপর সন্ধ্যার মুখে শান্তিলালকে নিয়ে রওনা হলুম সমুদ্রতীরে। যে আশা নিয়ে গিয়েছিলুম তার কিছুই না দেখে কিন্তু অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লুম। সমুদ্র এখানে একেবারে পুকুরের মতো। আমাদের ঢাকুরিয়ার লেকে যতটা ঢেউ ওঠে, এখানে তাও নেই। বাস্তবিক পুরীতে সমুদ্র দেখে সমুদ্র সম্বন্ধে যা ধারণা হয়েছিল—দ্বারকা, মাদ্রাজ ও রামেশ্বরে এসে তা একেবারে মুছে গেল। বিশেষ ক'রে রামেশ্বরের মতো স্থির সমুদ্র আর বোধ করি কোথাও নেই। যাই হোক—সমুদ্রের ধারে অসংখ্য পাথরের মধ্যে একটাতে গিয়ে বসলুম, তবু জল তো! শান্তিলাল ওরই মধ্যে একটু দূরে একটা বড় পাথরের ওপর গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়ে চাঁদের দিকে চেয়ে রইল। হয়ত ভাবতে লাগল তার মা-বাপের কথা, অন্য স্বজনদের কথা—যাদের সে ছেড়ে এসেছে!

আর একটি বাঙালী ভদ্রলোক আমাদের ধর্মশালাতে ছিলেন, সমুদ্রের ধারে তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। থাকেন বৌবাজারে পঞ্চাননতলাতে, নাম বিশ্বরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্পোরেশন-বিখ্যাত শৈলপতিবাবু তাঁর ভগ্নীপতি। তাঁর সঙ্গে শীগগিরই আলাপ জমে উঠল; স্থির হ'ল যে, পরের দিন প্রত্যুষে আমরা একসঙ্গেই ধনুষ্কোডি যাব। শুধু ধনুষ্কোডি নয়, আমরা তাঁর সঙ্গে তারপর তাঞ্জোর পর্যন্ত গেছি এবং বুঝেছি বহুভাগ্যেই তাঁর মতো সঙ্গী পাওয়া গিয়েছিল। ভদ্রলোক আদর্শ সঙ্গী।

রাত্রে একে চারটের সময় ওঠবার দুশ্চিন্তা, তায় মশা—ভালো ক'রে ঘুম হ'ল না। যথাসময়ে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে স্টেশনে রওনা হলুম। খিদিরপুর থেকে আর একদল বাঙালী যাত্রী এসে স্টেশনের কাছে একটা ধর্মশালায় ছিলেন, তাঁরাও আমাদের সঙ্গে ধনুষ্কোডি চললেন—একেবার রীতিমত দল। কিন্তু আজ আর শান্তিলাল নেই, বোধ হয় ছড়িদারের বকশিশ খোয়াবার ভয়ে শর্মণপ্রসাদই তাকে সরিয়ে নিজে সঙ্গে এসেছে।

ধনুষ্কোডি বন্দর থেকে সিংহলের জাহাজ ছাড়ে—এই হ'ল তার প্রধান পরিচয়। কিন্তু সেটা যে কী ক'রে আমাদের তীর্থ হয়ে দাঁড়াল তা আজও আমি জানি না। পাণ্ডাদের প্রশ্ন ক'রে সদুত্তর পাওয়া যায় না—কেউ বলে যে, এখানে রামচন্দ্র ধনুক পুঁতেছিলেন, কেউ

বলে, ধনুক দান করেছিলেন (যে দুটোরই কোন অর্থ বা কারণ নেই)। মোদ্দা সেখানে নারকেল হাতে দিয়ে সঙ্কল্প করিয়ে স্নান করাবার লোকের অভাব নেই। ভিখারীও প্রচুর এবং ব্রাহ্মণরাও যথাসময়ে ঝুলির ভেতর থেকে সোনার ধনুক বার ক'রে 'মালক্ষ্মী'দের জানায় যে, যেহেতু স্থানটার নাম ধনুষ্কোডি সেহেতু এখানে ব্রাহ্মণদের সোনার ধনুক দান করা অবশ্য কর্তব্য।... বছরতিনেক আগে পর্যন্ত এখানে একটা ঠাকুর কিম্বা মন্দিরের চিহ্নও ছিল না। সম্প্রতি কোন এক মারোয়াড়ী একটি ছোট মন্দির করে দিয়েছে, সেখানে জনকতক লোক থাকে, তারা যাত্রীদের ছোলাসেদ্ধ এবং পানীয় জল দিয়ে দু-একটি পয়সা নিয়ে থাকে।

আমরা যথারীতি ধনুষ্কোডির স্নান সেরে স্টেশনে ফিরে এলুম, সেখান থেকে ট্রেনটা গিয়ে একেবারে বন্দরের ওপর প্রায় ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে রইল। সিংহলের জাহাজ এসে দাঁড়াতে তার যাত্রী নিয়ে তবে ছাড়ল, ফলে রামেশ্বরম্ এসে পৌঁছলুম প্রায় একটায়। সেদিনও বেলা হবার আশঙ্কা করে পাণ্ডাজীর বাড়িতেই প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা ক'রে রেখে গিয়েছিলাম, সুতরাং বিশেষ কোনও অসুবিধা হ'ল না।

বিকেলে নিজেরাই একটা ঝট্কা ক'রে রামচট্কা বা রামঝরোখা দেখতে গেলুম। মাইল দেড়েক বালি পেরোবার পর একটা উঁচু টিলা, তার ওপরে একটি মন্দিরে রামচন্দ্রের পাদুকা না কি একটা আছে। মন্দিরের ছাদের ওপর থেকে সম্পূর্ণ দ্বীপটির দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, বোধ করি মন্দিরের সেইটেই প্রধান উদ্দেশ্য।

সেখান থেকে ফিরে শহরটা একটু ঘুরেফিরে দেখতে এবং বাজার করতেই রাত হয়ে গেল। শহর সেটা নয়—নিতান্ত ছোট এবং অকিঞ্চিৎকর জায়গা। মনে কোনও দাগ রাখে না, আবার দেখতে ইচ্ছে করে না। দক্ষিণের তীর্থের সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ নেই, তার প্রতি অন্তরের আকর্ষণ নেই। তাই মধ্যে মধ্যে এ ভ্রমণ সম্পূর্ণ অর্থহীন, হয়ত বা বিরক্তিকরও লাগছিল। পুণ্যসঞ্চয়ের নেশা যার নেই, তার অন্ততঃ চোখের খোরাক চাই; রামেশ্বরম্ এমন স্থান যে, সে শ্রেণীর লোকদের আকর্ষণ করবার কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই। পুরী বা গোপালপুরে তবু সমুদ্রতীরের শোভা আছে, কিন্তু এখানে তাও নেই—পুকুরের মতো স্থির জল দেখতে দেখতে বিরক্ত বোধ হয়।

রাত্রে ফিরে এসে জিনিসপত্র গোছগাছ ক'রে রেখে শুলুম। সেই ভোরের ট্রেন ধরতে হবে, সেখানাই সোজা মাদুরা যায়। বিশ্বরঞ্জনবাবুও আমাদের সঙ্গে যাবেন স্থির হ'ল। ভদ্রলোকের আবার এমন বাতিক, তিনি ভোরবেলা উঠে বিছানা বাঁধবার ভয়ে রাত্রি থেকেই বিছানা বেঁধে রেখে সারারাত মেঝেতে শুয়ে কাটিয়ে দিলেন।

পাণ্ডাজী রাত্রে এলেন দর্শন দিতে। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন ছড়িদারও এলো, আমাদের নাম-ধাম বিবরণ সব লিখে নিয়ে আশীর্বাদ ক'রে ছেড়ে দিলেন। ভদ্রলোক যথাসম্ভব নির্লোভ। আমরা তাঁকে ছ'টাকা ও মাতাজীকে দু'টাকা প্রণামী দিলুম, তিনি একটি কথাও বললেন না। ছড়িদারদের প্রত্যেককে এক টাকা ক'রে বকশিশ দিলুম, শর্মণপ্রসাদের হাসিমুখের বাহার দেখে বোধ হ'ল যে, এটাও সে আশা করে নি।

রাত্রে শোবার আগে শান্তিলাল আমাদের রামেশ্বরের শয়ন দেখাতে নিয়ে গেল। প্রত্যহ

রাত্রে সাজসজ্জা ক'রে উপযুক্ত জাঁকজমকসহকারে রামেশ্বরের কাঞ্চনমূর্তি দেবী পার্বতীর মন্দিরে যান শয়ন করবার জন্য, সেখানে সোনার দোলায় দু'জনের সুবর্ণ-মূর্তি সাজিয়ে আরতি করা হয়। পুষ্পমাল্যের প্রাচুর্যও খুব বেশী, আরও অনেক বিলাসের আয়োজন ভিখারী ভোলানাথের জন্য সাজানো থাকে।

সেদিনও রাত্রে মশার উৎপাতে এবং দুশ্চিন্তায় ভালো ক'রে ঘুম হ'ল না। চারটের সময় উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে তৈরী হবার আগেই শান্তিলাল এসে হাজির হ'ল। ছেলেটির মুখ বিষাদগম্ভীর, বোধ হয় সে আমাদের একটু ভালোবেসেছে। তুলে দিতে যাবার তার কথা নয়, কিন্তু তবু সে সকলের আগে এসেছে। সে-ই ঝট্‌কা ঠিক ক'রে আনল, আমাদের মালপত্র তুলে সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত গেল। আরও আশ্চর্য হলুম যখন সে আমাদের টিকিট কিনতে গিয়ে নিজের পয়সাতে পম্বনের টিকিট কিনে আনল, অর্থাৎ সে আমাদের সঙ্গে পম্বন্ পর্যন্ত যাবে, আবার ভোরের ট্রেনে রামেশ্বর ফিরে আসবে। যতটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকা সম্ভব, তার এক মুহূর্ত আগেও সে ফিরতে চায় না।

আমারও মন ভার হয়ে উঠছিল। সমস্ত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের মধ্যে এই একটিমাত্র প্রিয়দর্শন গুজরাটি তরুণের সঙ্গই কি তাহ'লে আমার অন্তর স্পর্শ করল? গাড়িতে উঠে মাকে শুইয়ে, বিশ্ববাবুর শোবার ব্যবস্থা ক'রে আমি একটু দূরে গিয়ে বসলুম। শান্তিলালও আস্তে আস্তে আমারই পাশে গিয়ে বসল। ট্রেন ছাড়ল, একটা স্টেশন পার হয়ে পম্বনে এসে থামল—আমরা দু'জনেই চুপচাপ পাশাপাশি বসে আছি, শান্তিলালের হাত আমার হাতের মধ্যে ধরা। কোন্ এক নিবিড় সহানুভূতি—যা কোনও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—আমাদের দু'জনের মনের কথা পরস্পরকে নীরবে জানিয়ে দিচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে কী যে আকর্ষণ আমাদের দু'জনের মধ্যে ছিল, তা আজও জানি না, আজ তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসরও নেই। কিন্তু সেই সময়টির জন্য বিভিন্ন প্রদেশবাসী, ভিন্ন ভাষাভাষী, অসমান-বয়স্ক দু'টি লোকের মন সহসা একই ব্যথায় মিলিত হয়েছিল।

পম্বনে বহুক্ষণ ঐ ট্রেনটা দাঁড়ায় ডাউন ট্রেনকে পথ দেবার জন্য। সেই সমস্ত সময়টা শান্তিলাল বসে রইল। শেষ পর্যন্ত যখন সত্যই ট্রেন ছাড়ল, তখন অগত্যা সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'ল। কিন্তু তার সেই বিদায় নেবার পূর্বেকার মুখের ছবি আজও আমার মনে আছে। সে মুখের দিকে চেয়ে ভুলে গেলাম সে গুজরাটি আর আমি বাঙালী—ভারতের পূর্ব-সীমান্তে থাকি আমি, আর সে থাকে সর্বপশ্চিম-প্রান্তে। মনে হ'ল আমার পরম স্নেহাস্পদ ছোট ভাইকে আমি চিরকালের মতো বিদায় দিচ্ছি।

কী নীরব ভাষায় আমাদের ইচ্ছা প্রকাশ পেল জানি না, তার মুখও শেষ মুহূর্তে আমার মুখের কাছে এগিয়ে এল, আমিও পরম স্নেহে তাকে চুম্বন করলাম। সে আমার একখানা হাত তার দু'টি হাতের মধ্যে নিয়ে একবার গভীরভাবে চেপে ধরল, তারপর চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ল। ট্রেন তখন রীতিমত জোরে চলতে শুরু করেছে।

শান্তিলালকে কখনও ভুলব না।

জয় রামেশ্বরম্—এবার মাদুরা, মীনাক্ষি দেবী!

মীনাক্ষি মন্দির

ভোরবেলা রামেশ্বরম্ ছেড়ে বেলা ন'টা নাগাদ আমরা মাদুরা এসে পৌঁছলুম। বড় স্টেশন এবং ভেতরে শহরের কর্মব্যস্ততা দেখেই বোঝা গেল যে, এইবার সত্যিই একটা শহরে এসে পড়লুম। মাদুরা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দ্বিতীয় নগরী, অর্থাৎ খোদ মাদ্রাজ শহরের পরেই এর স্থান। এতদিন দক্ষিণের যেসব তীর্থে ঘুরে বেড়ালুম তার মধ্যে তীর্থই সব, মন্দির বাদ দিয়ে বাকীটা গ্রাম মাত্র। শ্রীরঙ্গম্-এর শহর ত্রিচিনোপল্লী—তাও শ্রীরঙ্গম্ থেকে পুরো তিনটি মাইল গেলে তবে পাওয়া যায়।

মাদুরায় নেমে প্রথমেই যে ব্যাপারটা আত্মাকে শান্তি দিলে সেটা হচ্ছে এখানে পাণ্ডার উৎপাতের অভাব। অবিশ্যি কুলীরা কম বকালে না, কিন্তু তার জন্য দুঃখ ক'রে লাভ নেই, বকা আর বকানো এদের সকলেরই স্বভাব। পাণ্ডা নেই তার কারণ, মীনাক্ষি মন্দির দ্রষ্টব্য হিসাবে খুব বড় হ'লেও তীর্থগৌরব এর কম। এর পেছনে কোন দৈব ব্যাপারের কাহিনী জড়িত নেই।

মাদুরা স্টেশনের বাইরেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের 'মাঙ্গাম্মাল ছত্রম্'। সার সার চারটি বড় বাড়ি, এখানে দৈনিক সামান্য ভাড়া নিয়ে যাত্রীদের থাকতে দেওয়া হয়। মিউনিসিপ্যালিটির আর একটি ছত্রম্ আছে বটে কিন্তু সেটা শুনেছি নোংরা। আমরা 'মাঙ্গাম্মাল ছত্রম্'-এ থাকব আগে থাকতেই স্থির ছিল, সুতরাং কুলীদের সেই নির্দেশই দিলাম। কিন্তু অফিসে গিয়ে শোনা গেল—কোণের বাড়িতে একটিমাত্র ঘর আছে, দৈনিক আট আনা ভাড়া। আমরা একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে সেই ঘরটি দখল করলুম—ঘরটি না পেলে আমাদের দুর্দশার অন্ত থাকত না। পশ্চিমের যে-কোনও বড় শহরে বা তীর্থে যেমন অসংখ্য ধর্মশালা ও হোটেল থাকে, এখানে সে-সব কথা কল্পনা করাও দুরাশা। এখানে যেসব হোটেল আছে তা ভাতের দোকান মাত্র, সেখানে বাসা পাওয়া যায় না।

ছত্রম্-এর বাসাটি ভালই। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দোতলা বাড়ি। ভাগ্যক্রমে আমরা একটি দোতলার ঘরই পেয়েছিলাম। কিন্তু জলের বড় অভাব; পুরুষদের জন্য খোলা জায়গায় একটি কল এবং মেয়েদের জন্য একটি ছোট বাথরুম। অতগুলি লোকের এই মাত্র ব্যবস্থা! সুতরাং স্নান বা কাপড় কাচার জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেই হয়।

বাসায় পৌঁছতেই একটি গাইড্ পাওয়া গিয়েছিল. সে কোনমতে ভাঙা ইংরেজীতে জানিয়ে দিলে যে, এগারটার সময়ে মীনাক্ষি দেবীর মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে এবং এগারটা বাজতেও আর বিলম্ব নেই। কিন্তু হবে কি করে—? কলঘরে তখন দুটি মাদ্রাজী, একটি মারহাট্টি এবং কলঘরের বাইরেও জন-দুই-তিন মাদ্রাজী ও রাজপুত মেয়ে দাঁড়িয়ে—তারপর মা! অগত্যা তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ রাজপুত মেয়েটির সঙ্গে যথাসাধ্য হিন্দীতে আলাপ চালাতে লাগলেন। ছেলেমানুষ বৌ, বয়স বড়জোর আঠার-উনিশ হবে,

বেশ লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো রূপ। তারাও অর্থাৎ সে আর তার স্বামী সেই দিনই এসে পৌঁচেছে, কিন্তু তারা সেদিন মন্দিরে যাবে না, সুতরাং তাড়া নেই। মেয়েটির সঙ্গে গল্প ক'রে অনেকদিন পরে মায়ের বড় আনন্দ হ'ল—কারণ এদেশে এসে অবধিই প্রায় মুখ বন্ধ; যা কিম্ভূতকিমাকার ভাষা এদের, না যায় একবর্ণ বোঝা, আর না যায় আমাদের কথা বোঝানো!

প্রায় আধ ঘণ্টা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর মাতৃদেবী কল পেলেন, তবু রাজপুত বৌটি স্বার্থত্যাগ ক'রে তাঁকে আগেই ছেড়ে দিলে, বললে, আমরা তো আর মন্দিরে যাব না, আপনি সেরে নিন—

স্নান সেরে সবাই বেরিয়ে পড়লুম। গাইডকে জিজ্ঞাসা করলুম, মন্দির কতদূর? সে বললে, এই তো! সুতরাং স্থির করলুম কষ্টদায়ক 'ঝট্‌কা'য় চড়ার চেয়ে সামান্য পথ হেঁটেই যাওয়া যাবে। কিন্তু ও হরি, কোথায় মন্দির? যত পথ চলি, মন্দিরও তত দূরে সরে যায়—পথ আর ফুরোয় না! মায়ের তো অবস্থা কাহিল, তিনি চলতেই পাচ্ছেন না। দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে গাইডকে সরল বাংলায় গালাগাল দিচ্ছি, আর পথ চলতে চলতে ভাবছি যে বাংলা থেকে মাদ্রাজে এসেই রোদের এই অবস্থা! আর যারা বিষুবরেখার উপরে বাস করে, তারা বাঁচে কি ক'রে?

অবশেষে এক সময়ে সত্যিই মন্দির পাওয়া গেল। একটা পথের মোড় ঘুরতেই সহসা আমাদের চোখে পড়ল পাষাণনির্মিত বিরাট গোপুরম্। আমরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম। শ্রীরঙ্গমের গোপুরম্ বা সিংহদ্বার দেখেই আমরা বিস্মিত হয়েছিলুম কিন্তু মীনাক্ষি মন্দিরের কাছে সে-ও অকিঞ্চিৎকর। কত সহস্র মানুষের মাথার ঘাম এবং বুকের শোণিতে পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই বিপুল দৈত্য! দেবমন্দির নির্মাণের পেছনে মানুষের যে ঐশ্বর্যের দম্ভ আত্মগোপন ক'রে থাকে, সেই দম্ভই কি আজ পাষাণে রূপ নিয়েছে!

মা মুগ্ধ হয়ে বার বার বলতে লাগলেন—চমৎকার, কোনও দেশে বোধ করি এ সৌন্দর্যের তুলনা নেই! কিন্তু আমি ভাবতে লাগলুম সেই সব হতভাগ্যদের কথা—যারা তিল তিল ক'রে নিজেদের ক্ষয় ক'রে এই পাষাণস্তূপকে গড়ে তুলেছে! হয়ত তারা তাদের শ্রমের মূল্যও পায় নি, অর্ধাশনে অনশনে খেটে গেছে দিনের পর দিন! তারা বঞ্চিত করেছে নিজেদের আত্মাকে, সন্তানদের আত্মাকে, তাই এই সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রতিটি রন্ধ্রে এখনও মাথা কুটে বেড়াচ্ছে তাদের দীর্ঘশ্বাস! লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দর্শক যেদিকে চেয়ে আনন্দে অভিভূত হয়েছে, সেই দিকে চেয়ে চেয়েই কে জানে কেন আমার কেমন ভয় করতে লাগল।

কিন্তু তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্থাপত্যশিল্পের বিচার কিংবা দার্শনিক চিন্তা, কোনটারই সময় ছিল না। আমরা তাড়াতাড়ি মন্দিরে ঢুকে পড়লুম। একটি প্রাচীরের মধ্যে আর একটি ক'রে প্রাচীর এবং এক-একটি দ্বার—দক্ষিণের মন্দির সবই প্রায় এই রকম। মধ্যের জায়গাগুলিতে নানা ব্যাপার থাকে কিন্তু মীনাক্ষি মন্দিরে ঢুকে দেখলুম সে এক বিরাট নগর। কতরকম যে বাজার আছে মন্দিরের প্রথম প্রাচীরের মধ্যে তার ঠিকানা নেই। শুধু দর্জির কারখানাই প্রায় শ-দেড়েক হবে। শুনলুম 'দীপাবলী' বা দেয়ালী উৎসবের জন্য দর্জিরা এখন খুব ব্যস্ত। আমাদের যেমন পুজোর সময় নতুন কাপড়-জামা পরতেই হয়, ওদের তেমনি দেয়ালীতে।

আমরা যে কতগুলো বাজার এবং প্রাচীর পেরিয়ে মূল মন্দিরের কাছাকাছি এলুম, তার হিসেব আর মনে নেই। এইখানে এসে পূজোর ফুল ও অন্যান্য উপকরণ কেনা গেল। উপকরণ তো ছাই—আরতির জন্য একটু কর্পূর, একটু কুঙ্কুম ও একটা নারকেল। কর্পূরটা জ্বেলে ঠাকুরের মুখের কাছে ধরবে, নারকেলটা ফাটিয়ে দেবে ও কুঙ্কুমটা পায়ে ঠেকাবে—এই হ'ল এদের পূজো, দেখে দেখে চোখ ক্লান্ত।

যাই হোক, তাই নেওয়া গেল এবং এক সময়ে এক অন্ধপথের সামনে এসে দাঁড় করিয়ে গাইড বললে, 'এই মীনাক্ষি দেবী!' দোরের কাছে পাণ্ডারা ছিল, তারা বললে, 'যদি ব্রাহ্মণ হও তো ভেতরে চলে যাও—'

আমরা আর দ্বিরুক্তি না ক'রে ভেতরে ঢুকলুম, অবশ্য সেই গলিপথের শেষ সীমাটুকু পর্যন্তই গতি নির্দিষ্ট, মায়ের কাছে যাবার হুকুম নেই। দক্ষিণের সমস্ত মন্দিরে এই যে পদে পদে বাধা, এই বাধা মনকে রিক্ত ও সংকীর্ণ ক'রে তোলে। ভগবানের মন্দিরে তাঁর সন্তানরা যায় পূজো দিতে, শুদ্ধবাসে ও যথাসম্ভব শুদ্ধ মন নিয়ে যায় নিশ্চয়ই—সেখানে এত বাধা কিসের জন্য? এখানে এসেই বুঝেছি, মহাত্মাজী হরিজন আন্দোলন নিয়ে কেন এত মাতামাতি করছেন। অনার্য দক্ষিণীদের মধ্যে জন্মেছেন এবং বহুদিন কাটিয়েছেন বলেই তাঁর কাছে এ আন্দোলনের এত বেশী মূল্য; চিরকাল যারা আর্যাবর্তে মানুষ, তারা এর অর্থ বুঝবে না!

আমার মনে হ'ল এইজন্যই দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে তীর্থযাত্রীদের মন সাড়া দেয় না। এই তো সমস্ত দক্ষিণের তীর্থই ঘুরলুম, কিন্তু এর কোনও স্মৃতি আজ আর আত্মায় আনন্দের সঙ্গে জড়িয়ে নেই—না এ দেশ, না ঐ দেশবাসী, কারুর সঙ্গেই আমাদের প্রাণের যোগ খুঁজে পেলুম না। কিন্তু দেখেছি আমি বহুদিন বিশ্বনাথের মন্দিরে, দেখেছি শ্রীক্ষেত্রে রত্নবেদীর সামনে মানুষের ভক্তি, দেখেছি তার ব্যাকুলতা! সুদূর রাজপুতানায় শ্রীনাথজীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছি ভগবানের প্রেমে মানুষ কতদূর আত্মহারা হয় এবং সে-সব স্থানের স্মৃতি আজও আমার দেহের প্রতি রক্তকণাকে আনন্দে চঞ্চল ও উদ্বেল ক'রে তোলে। বহুবার যাওয়া এই সব তীর্থ তাই এখনও পুরনো হয় নি, মনে পড়লেই আবার যাবার জন্য মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মীনাক্ষির পূজো শেষ ক'রে বেরিয়ে এলুম। প্রচুর দক্ষিণাতুষ্ট পূজারীর দল মীনাক্ষির ভোগের প্রসাদ থেকে একটা তেলেভাজা ডালের বড়া এনে দিলে, সেই বড়া ও মালাসুদ্ধ নারকেল প্রসাদ শিরোধার্য ক'রে আমরা গেলুম সুন্দরেশ্বর শিবের দর্শনে। শুনলুম সেদিন 'সুন্দরেশ্বরের অন্নময়-রূপ' পূজো হবে, বেলা তিনটের সময় এলে দেখা যেতে পারে। ব্যাপার অবশ্য এমন কিছু নয়—আসল শিবলিঙ্গটিকে প্রচুর গরম ভাত ঢেলে ঢাকা দেওয়া হবে এবং যথারীতি পূজো ও আরতি হবে।

সুন্দরেশ্বর দর্শন ক'রে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে মন্দিরের ভেতরটা দেখতে লাগলুম। সুন্দরেশ্বরের মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে এক কষ্টিপাথরের চত্বর পড়ল, তার এক-একটি স্তম্ভে হর-গৌরীর নানারূপের মূর্তি খোদিত। কোনটায় বা শিব বৃষভ-বাহনে বিবাহ করতে

চলেছেন, কোনটায় দেখা গেল বিষ্ণু শিবের হাতে গৌরীকে সম্প্রদান করছেন—এই সব। বাস্তবিক পাথরে খোদাই বহু মূর্তি দেখেছি, বিশেষ ক'রে দক্ষিণ ভারতে তো এর অভাব নেই, কিন্তু এমন আশ্চর্য কারিগরি আর কোথাও দেখি নি! পাষাণের রেখায় এমন জীবন্ত ভাব, এত expression—এত ভাবব্যঞ্জনা দেওয়া যায়? প্রতিটি মুদ্রা আঙুলের বিভিন্ন ভঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, প্রত্যেক মূর্তির চোখের ভ্রূর ভঙ্গিমা পর্যন্ত অতি পরিষ্কার। বিশেষ ক'রে কন্যা-সম্প্রদানের মূর্তির কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ তো আর মুখে কথাই বেরুল না। বিষ্ণু গৌরীর একখানি হাত শিবের হাতে নিয়ে দিচ্ছেন, গৌরী সলজ্জভাবে ঘাড়টি হেঁট ক'রে রয়েছেন, বিষ্ণুর মুখে পরিহাসের হাসি—কিন্তু তারই সঙ্গে যেন গভীর স্নেহ-মেশানো এবং শিবেরও ঈষৎ সলজ্জ নতমুখ, আর তারই মধ্যে তিনি আড়চোখে গৌরীকে দেখবার চেষ্টা করছেন; তাঁর দৃষ্টি প্রসন্ন, হস্তে বরাভয়। সমস্ত ভাবটি এত নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠেছে যে, মনে হয় একরঙের পাষাণের গায়ে, শিল্পীর লৌহের আঘাতে এ সম্ভব হয় নি, তার সাধনায় পাষাণ প্রাণ পেয়েছে।

মন্দিরের মধ্যেই একটি সরোবর আছে, সেইখান থেকেই দেবীর স্নানের জল যায় শুনলুম, তারই চারপাশে চত্বরে নানা বর্ণের ছবি আঁকা। তার মধ্যে মীনাক্ষী মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাসও রয়েছে। এইখান থেকেই গাইড আমাদের মূল মন্দিরের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়াটি দেখাল। মূল মন্দিরের চূড়া ছোট ব'লে আর কোথাও থেকে দেখা যায় না।

এখান থেকে বেলা একটা নাগাদ আমরা বাসায় ফিরে এলুম। সেদিন কোজাগরী পূর্ণিমা, মায়ের উপবাস। সুতরাং আমরাও আর রান্নার চেষ্টা করলুম না। গাইডটির চেষ্টায় বহুকষ্টে এক গুজরাটী হোটেল খুঁজে বার করা গেল। সেইখান থেকে পাঁচসিকে সের দিয়ে ঘিয়ে-ভাজা পুরী আনিয়ে আমরা ভোজন শেষ করলুম। আহারের পর আমি আর বিশ্ববাবু বিশ্রাম করতে লাগলুম, মা আস্তে আস্তে বেরিয়ে সকালের রাজপুত মেয়েটির খোঁজ করতে গেলেন।

সেখান থেকে ফিরে এসে মা জানালেন যে আজ স্টেশনে বড় ভিক্টোরিয়া গাড়ি দেখেছেন, সেই গাড়ি ভাড়া করতে হবে—ঝট্‌কায় তিনি আর চাপবেন না।

অগত্যা স্টেশনে গিয়ে সেই গাড়িই ভাড়া ক'রে আনা হ'ল। গাইডটির কাছে জানা গেল যে, সমস্ত মাদুরা শহরে ঘোড়ারগাড়ি মাত্র দু-তিনখানিই আছে। বাকী সবই ঝট্‌কা অর্থাৎ টপ্পর দেওয়া গরুরগাড়ি।

রাজপুত দম্পতিকে টেনে ঘরের বার করা গেল। ছেলেটিরও বয়স অল্প, বোধ করি বাইশ কি তেইশ হবে, বেশ শান্ত চেহারা। গাড়িটা বড় ছিল, সুতরাং অনায়াসে আমাদের পাঁচজনকেই ধরল।

প্রথমেই আমরা গেলাম টেপাকুলম্ সরোবর দেখতে। প্রকাণ্ড একটি পুকুর, শহরের এক প্রান্তে। তার মাঝখানে একটি ছোট প্রমোদ-ভবন। মধ্যে মধ্যে সুন্দরেশ্বরের প্রতিনিধি এখানে আসেন, সেই উপলক্ষে উৎসবাদি হয়। নৌকো এবং মাঝি তৈরীই ছিল, আমরা ওপারে গিয়ে বেশ ঘুরেফিরে সব দেখে এলুম। এ ছাড়া এখানের দ্রষ্টব্যস্থানের মধ্যে রাজা তিরুমল নায়েকের প্রাসাদই প্রধান। আমরা শহরের বাইরে দিয়ে অসংখ্য গেঞ্জি মোজার

কল দু'পাশে ফেলে রেখে চললুম সেই প্রাসাদের দিকে। শুনলুম এই রাজার সময়েতেই মাদুরা বড় শহর হয়ে ওঠে; অর্থ ও প্রতিপত্তি এতদূর পর্যন্ত ছিল যে, তদানীন্তন মুসলমান শাসনকর্তাদের ইনি গ্রাহ্যই করতেন না।

প্রাসাদে ঢুকে দেখলুম যে সত্যিই তা দেখবার জিনিস। ইটের গাঁথুনি ও চুনবালির কাজ বটে কিন্তু এমন মজবুত সে বাড়ির গাঁথুনি এবং এত সুন্দর সেই চুনবালির কাজ যে, দেখে কিছুক্ষণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। এতদিনেও সে কারুকার্যের বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় নি। প্রাসাদটিতে ইংরেজ সরকার সম্প্রতি জেলা আদালত ও কালেক্টরের অফিস বসিয়েছেন। যে প্রাসাদ একদা দাম্ভিক ও শক্তিশালী রাজার স্বপ্ন দিয়ে তৈরী হয়েছিল, সে প্রাসাদ আজ নিতান্তই দারোয়ান ও কবুতরের বাসায় পরিণত হয়েছে।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা কাপড়ের বাজারে ঢুকলুম। এখানে যেসব সম্ভ্রান্ত কাপড়ের দোকান রয়েছে তাদের পণ্যবিক্রয়ের রীতি বড় অদ্ভুত। বাইরে থেকে দোকান বলে কিছুতেই বোঝা যাবে না। নিতান্তই সাধারণ সদর-দোর, তাতেও আবার পর্দা ঝোলানো। সেইখান দিয়ে অন্দরমহলে ঢুকে তবে দোকানে পৌঁছানো যায়। আমাদের তো ঢোকবার সময় প্রথমে রীতিমত ভয়ই হয়েছিল।

এ দোকান ও-দোকান করে শাড়ি ও চাদর কেনা চলল। মাদ্রাজী শাড়ি ও মাদ্রাজী চাদরের প্রধান আড্ডা এই মাদুরাই, সুতরাং বৈচিত্র্য এবং মহার্ঘ্যতার অভাব ছিল না।

কাপড় কেনা শেষ ক'রে আবার মন্দিরে যাওয়া গেল, উদ্দেশ্য আরতি দেখা ও বাসন কেনা। আমি যতদূর সম্ভব তাড়া লাগিয়ে শেষের কাজটা সংক্ষিপ্ত ক'রে বাসায় ফিরে এলাম। বাসায় ফিরে আবার গেলাম একটু গরম দুধের সন্ধানে, রাত্রের জলযোগ শেষ করবার উদ্দেশ্যে।

তারপর আবার জিনিসপত্র বাঁধবার পালা। সেই রাত্রেই ট্রেন, এখান থেকে তাঞ্জোর যাবার ঐ গাড়িই সুবিধের।

ক্রমে যাত্রার সময় এগিয়ে এল। রাজপুত মেয়েটি অশ্রু ছল-ছল চোখে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বোধ হয় এরই মধ্যে আমাদের সে স্বজন ব'লে মনে করতে শুরু করেছিল। আর্যাবর্তের লোক দাক্ষিণাত্যে এলে এমনিই হয়।

'আচারী'দের মহাতীর্থ

চিংলিপুট থেকে আমরা বিজয়াদশমীর দিনই যাত্রা করলুম, এবার শ্রীরঙ্গম্। দশমীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল প্রান্তরের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল বাংলাদেশের কথা, আজকের মহোৎসবের কথা। এই দিনটিতে আমি কোথাও যাই না বাড়ি থেকে—তার কারণ, এই দিনটি সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে একটা অসাধারণ মোহ আছে। যে-সব বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আমার কৈশোর কেটেছে তাদের অনেকেই নানা কাজে ব্যস্ত, বছরের

বাকী দিনগুলি তাদের হদিশ পাই না কিন্তু ঐ একটি দিন আবার তারা কাছে আসে, আবার সেই আনন্দ সমারোহের কথা মনে পড়ে, আবার মনে পড়ে নানা রঙে বিচিত্র কৈশোরকে। মনে হয়, কে বলেছে আমার কৈশোরকে বহুদিন পেছনে রেখে এসেছি; যৌবনও আমার যায় যায়! মিথ্যা কথা।

বাইরের দিগন্তবিস্তৃত, জনমানব-চিহ্নশূন্য মৃত প্রান্তরের দিকে চেয়ে চেয়ে এই দিনটির কথাই ভাবতে লাগলুম। রাস্তায় এইবার বোধ হয় জনসমাগম কমে এসেছে, গৃহস্থবাড়ির মিষ্টান্নের ভাণ্ডার খালি হ'তে বেশী দেরি নেই—বারোয়ারীতলাও জনশূন্য, শুধু সেখানে হয়ত সেই অনেক বাতির আলোটা এখনও নিঃশব্দে জ্বলছে! এক কথায় বিজয়াদশমীর সন্ধ্যা কেটে গেছে—উৎসবের সন্ধ্যা, আনন্দের সন্ধ্যা—আমাকে বাদ দিয়েই! যাক্—ও-সব 'সেন্টিমেন্টালিটি' এইবার কেটে যাক্, যে শারদ জ্যোৎস্না বাংলাদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল, তা এবার ম্লান হয়ে এসেছে—এবার দৃষ্টি ট্রেনের ভেতরদিকে।

মাদ্রাজের আগে পর্যন্ত অন্ধ্র সভ্যতা আমাদের সঙ্গে এগিয়ে এসেছিল, এইবার আমরা দ্রাবিড়দের মধ্যে এসে পড়েছি। গাড়িতে এবার যারা উঠেছে তাদের সকলকারই অঙ্গে পুরো দ্রাবিড় সভ্যতার ছাপ মারা। পুরুষদের মাথার সামনে দিকটা কামানো, পিছনে প্রকাণ্ড ঝুঁটি, কাছা-খোলা কাপড় পরা, হাত-কাটা কামিজ গায়ে, কাঁধে একটা চাদর আর খালি পা—এই এদের জাতীয় পোশাক। ধনী-দরিদ্র সকলেরই এই এক পোশাক; ধনীদের ঐশ্বর্যচিহ্ন থাকে শুধু তাদের মূল্যবান চাদর বা অঙ্গবস্ত্রে। যারা দরিদ্র তাদের চাদর খাটো, কখনও শুধু তোয়ালেতেই পর্যবসিত। যারা একেবারে দরিদ্র, তারা শুধু একটা ন্যাকড়া দিয়ে নিজেদের লজ্জা ঢেকে রাখে—তাদের উলঙ্গ বলাই উচিত।

অন্ধ্রদেশ অনেক এগিয়ে এসেছে, আর্যাবর্তের অধিবাসীদের সঙ্গে বেশভূষা, আচার-ব্যবহারে অনেক মিল; কিন্তু তামিলরা এখনও সেই দশ হাজার বছর আগেকার দ্রাবিড় সভ্যতাকে আঁকড়ে ধ'রে আছে। এদের মতো conservative বা রক্ষণশীল ভারতবর্ষে বোধ হয় কোথাও নেই। মহাত্মাজী দক্ষিণ ভারতে থাকেন বলেই হরিজন আন্দোলন নিয়ে অত মাতামাতি করেন। এরা নিজেরা অনার্য—খুব সম্ভব এদের অনেকের রক্তে এক বিন্দুও আর্যরক্ত মেশে নি কখনও, আর সেইজন্যই স্পর্শদোষের মুখোশ পরে নিজেদের হিন্দুত্ব প্রচার করতে চায়—এবং তাই এদের দেবমন্দিরেও অব্রাহ্মণ দর্শনার্থীর প্রবেশাধিকার নেই!...

আধো-ঘুম, আধো-জাগরণের মধ্যে শ্রীরঙ্গম্ স্টেশনে এসে গাড়ি পৌঁছল যখন, তখন দশমীর চাঁদ অস্ত গেছে, গাঢ় অন্ধকার। শ্রীরঙ্গম্ স্টেশন ছোট, কারণ অধিকাংশ লোকই ত্রিচী কিংবা ত্রিচিনোপল্লী স্টেশনে নামে; আর যারা সাউথ-ইণ্ডিয়ান্ রেলের কারখানার সঙ্গে জড়িত তারা যায় গোল্ডেন রক স্টেশনে। শহরটির এই চারটে স্টেশন। গোল্ডেন রকে রেলের কারখানা, ত্রিচিনোপল্লী ও ত্রিচী হ'ল মূল শহরেরই দুটি স্টেশন—মাইল দুই মাত্র তফাত।

ত্রিচিনোপল্লী শহরের এক প্রান্তে বিরাট শ্রীরঙ্গমের মন্দির, সেই মন্দিরেরই বাইরের দুটি

প্রাচীরের মধ্যে একটি বড়গোছের পল্লী গড়ে উঠেছে, সেই গ্রাম ও মন্দির উপলক্ষ ক'রে এই স্টেশনের সৃষ্টি। স্টেশনের বাইরে গুটিকতক 'ঝট্‌কা' বা গরুরগাড়ির মতো মাথায়-ছৈ-দেওয়া ঘোড়ারগাড়ি দাঁড়িয়েছিল, তারই একটায় চেপে বসে আমরা সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে কোন্ এক নাম-না-জানা ধর্মশালার উদ্দেশে যাত্রা করলুম। সঙ্গে একটি সামান্য-হিন্দী-জানা পাণ্ডার ছড়িদারের মতো ছিল—সেই লোকটিই ভরসা।

স্টেশনের সীমানা ছাড়াতেই শহরের আলো পাওয়া গেল, কিছুদূর যাবার পর প্রকাণ্ড একটা তোরণ পেরিয়ে আমরা শ্রীরঙ্গম্ পল্লীতে ঢুকলুম। এই তোরণ আর প্রাচীরটি, আমাদের ছড়িদার জানিয়ে দিলেন, মন্দিরেরই প্রথম প্রাচীর ও তোরণ। বাজার, শহর, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাস্তা সব এই প্রাচীরের মধ্যে, অর্থাৎ সত্যিসত্যিই যদি এটাকে মন্দিরের অংশ বলে ধরা যায় তো মন্দিরের বিস্তার কল্পনা করা শক্ত হয়ে ওঠে।

বাজার, জলের কল ও এমনি আর একটা তোরণ পেরিয়ে মন্দিরের প্রধান গোপুরম্ বা সিংহদ্বার বাঁয়ে রেখে আমরা প্রকাণ্ড চওড়া একটা রাস্তায় এসে পড়লুম, বুঝলুম যে এটা রথের রাস্তা। দক্ষিণের সব মন্দিরের কাছেই একটা ক'রে খুব চওড়া রাস্তা পাওয়া যায়, কারণ বড় বড় রথ এবং তার যোগ্য জনসমাগম তা নইলে সঙ্কুলান হওয়া মুশকিল।

এইবার ধর্মশালা এল। ধর্মশালাটি ছোট, নির্জন এবং বেশ পরিষ্কার। কোন এক মারোয়াড়ী তাঁর সঞ্চিত অর্থের কিছু খরচা ক'রে ধর্মশালাটি তৈরী ক'রে দিয়েছেন। ভেতরে একটি মন্দির আছে, তারই পূজারী হলেন ধর্মশালার রক্ষক। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, তবে 'আচারী' সম্প্রদায়ভুক্ত। খুব সম্ভব ধর্মশালার মালিকও ঐ সম্প্রদায়ের, কারণ বাড়ির ফটকেও আচারীদের বিখ্যাত ত্রিপুণ্ড্রক ও শঙ্খ-পদ্ম চিহ্ন আঁকা রয়েছে। রামানুজাচার্য যে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করেন, সেই ধর্মমতের যারা উপাসক তাদেরই বলে 'আচারী'। খুব সম্ভব 'আচার্য' এই শব্দ থেকেই আচারী শব্দের উৎপত্তি। এদের প্রধান ধর্মগুরু হলেন 'আচার্য' এবং শ্রীরঙ্গমের আগে যাঁরা মোহান্ত হতেন তাঁরাই এই আচার্য-পদ পেতেন। আচারীদের কপালে সাদা ও লালে আঁকা ত্রিপুণ্ড্রক থাকে এবং বাড়ি বা মন্দিরের সদরে ঐ ত্রিপুণ্ড্রকের সঙ্গে থাকে এক পাশে একটি শঙ্খ ও অপর পাশে পদ্ম। এরা চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির উপাসক। দক্ষিণের সর্বত্র এই সম্প্রদায়ের মন্দিরই বেশী। উত্তর ভারতেও বহু স্থানে আচারীরা মন্দির স্থাপন করেছে, বৃন্দাবনের বিখ্যাত সোনার তালগাছওয়ালা (ঘণ্টাস্তম্ভওয়ালা) রঙ্গজীর মন্দিরও এই আচারীদের। সম্প্রতি যাঁরা পুষ্করে গেছেন, তাঁরা দেখে থাকবেন, আচারীদের এক বিরাট মন্দির সেখানেও স্থাপিত হয়েছে।

একটা কথা এখানে উল্লেখ করি, এই সমস্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠার সময়েই সুদূর দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গম্ মন্দির থেকে আগুন যায় এবং সেই আগুনই মন্দিরের মধ্যে বরাবর নানা ইন্ধনে ও আধারে জ্বালিয়ে রাখা হয়।

ধর্মশালাটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন—যা সাধারণ ধর্মশালায় দেখতে পাওয়া যায় না। তার কারণ বোধ হয় যাত্রী-সমাগম কম। এখানে পাণ্ডা ঠিক নেই, তবে পাণ্ডা নামধারী দু-একজন লোক আছে, তারাই যাত্রীদের নিজেদের বাড়িতে নিয়ে তোলে এবং টাকাটা, সিকেটা

যা পায় তাতেই খুশী। আমরা কিন্তু ধর্মশালাই আঁকড়ে ধরেছিলাম বলে এই ব্যবস্থা। যাই হোক, তখনও দু-এক ঘণ্টা রাত্রি ছিল, কাজেই আমরা বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম এবং মনে মনে মাড়োয়ারীদের ধন্যবাদ দিতে দিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলুম। বেচুক ওরা ভেজালে-পূর্ণ ঘই বা ঘিউ—কিন্তু ধর্মশালা তো সর্বত্র একটা দুটো ক'রে রেখেছে! তার কৃতজ্ঞতা কি কম?

সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে আমরা কাবেরী-তীরে যাত্রা করলুম। কাবেরীই দুটি ভাগ হয়ে গিয়ে শ্রীরঙ্গম্‌কে ঘিরে রেখেছে—বস্তুতঃ স্থানটি একটি দ্বীপ। গোদাবরীর কর্দমাক্ত জল দেখে মনে মনে কাবেরী সম্বন্ধেও ভীত হয়ে ছিলুম, কিন্তু গিয়ে দেখলুম কাবেরীর জল, অন্ততঃ এখানে, অতি নির্মল। আরামে স্নান করলুম, তারপর তীর্থকৃত্য সেরে মন্দিরের দিকে যাত্রা করা গেল। একটা কথা এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না—এরা শুধু দ্রাবিড়ীয় জীবনযাত্রার পদ্ধতিকেই যে এখনো আঁকড়ে রেখেছে তাই নয়, দ্রাবিড় দেবদেবীদের পর্যন্ত ভুলতে পারে নি। দ্রাবিড়দের প্রধান উপাস্য সর্পযুগলের (পাথরের গায়ে খোদাই-করা দুটি সাপে-জড়ানো যে মূর্তি আমরা প্রায়ই ইতিহাসের বই-এ দেখে থাকি) মূর্তি এখানে চারিদিকে ছড়ানো এবং এখনও নানা নামে তার পূজা হয়। দক্ষিণের সর্বত্রই এই দেবতার মূর্তি দেখেছি—মন্দিরের মধ্যে, নদীর ধারে, রাস্তার পাশে, কোনও গাছের গোড়ায়—সর্বত্র। সবচেয়ে বেশী নজরে পড়েছে শ্রীরঙ্গম্ আর কাঞ্জীভেরমে। এখানেও কাবেরীর ধারে একটি বিপুল বটগাছের গোড়া বাঁধানো, আর তারই উপর গোল ক'রে সার দেওয়া ঐ সর্প-দেবতার মূর্তি। আমাদের ছড়িদার লক্ষ্মণ সিংহ (যে লোকটি রাত্রে আমাদের ধরে এনেছিল সে নয়—সে-ই এই হিন্দুস্থানী ছড়িদারটিকে সকালে দিয়ে গেল) জানালে, যেসব রমণীর ছেলে হয়েছে তারা এবং যাদের এখনও হয় নি তারাও এইখানে পুজো দিতে আসে, অর্থাৎ কিনা ইনি ষষ্ঠীদেবী!

লক্ষ্মণ সিংহের সঙ্গে গল্প করতে করতে আমরা ঝট্‌কায় চেপে শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরে এসে পড়লুম। বিপুল গোপুরম্ অর্থাৎ প্রধান প্রবেশদ্বারের চারপাশে এবং ভেতরে এমনভাবে বাজার গড়ে উঠেছে যে, কাছে এলে তার বিরাটত্ব নজরেই পড়ে না। কিন্তু পাশ থেকে বা দূর থেকে দেখলে কিংবা অন্য তিনটি গোপুরম্ দেখলে বোঝা যায় যে, কি প্রচুর অর্থব্যয়ে এবং কত লোকের প্রাণান্ত সাধনায় এই বিপুল পাষাণস্তূপ গড়ে উঠেছে। এগারো-বারো তলা সমান উঁচু পাথরের সৌধ—তার প্রতিটি রন্ধ্র অপূর্ব কারুকার্যে খচিত। কত দিন এবং কত লোকই না লেগেছে এর এক-একখানি পাথর খোদাই করতে! আর স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে কি অসাধারণ জ্ঞান ও ধারণা থাকলে এতগুলি লোকের মিলিত হাতের কাজকে চালিত ক'রে এমন নিপুণ ও সুষ্ঠু ভাবে এই বিশাল পাষাণসৌধ গড়ে তোলা যায়! কোথাও এর একটি রেখা বেঁকে যায় নি, কোথাও কোনও পাথর বসাতে ভুল হয় নি!

আরও দুটি-তিনটি তোরণ অর্থাৎ দুটি-তিনটি বাজার পেরিয়ে আসল মন্দিরের কাছাকাছি এসে পড়লুম। কিন্তু শুনলুম যে একে সেদিন শনিবার, তায় একাদশী—সুতরাং সেদিন সওয়ার বেরোবে। দক্ষিণের সব দেবতারই মূল মূর্তি হয় কালো পাথরের। তিনি প্রায়ই নিরাভরণ থাকেন এবং কখনই সে কারাগারের বাইরে যেতে পান না। তাঁর প্রতিনিধি

থাকেন, সুবর্ণ মূর্তি; তিনি নানা ছল-ছুতোয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্বর্ণনির্মিত যানবাহন চ'ড়ে হামেশা হাওয়া খেতে যান। মানে পুতুল-খেলার শখটা তাঁর ওপর দিয়ে মিটিয়ে নেওয়া হয়। যাই হোক্, যতক্ষণ না সে সওয়ার বেরোয় ততক্ষণ দর্শন হবে না, এই দুঃসংবাদ শুনে আমরা রীতিমত দমে গেলুম এবং ঘুরে ঘুরে মন্দিরটা দেখতে শুরু করলুম।

আজকাল ওখানে আর মোহান্তরাজ নেই, শুনলুম সরকার নিযুক্ত 'ট্রাস্টি'রা বা তত্ত্বাবধায়করা মন্দিরের দেখাশুনা করেন। তাঁরা মাসে একদিন ক'রে দেবতার ঐশ্বর্য সব ঠিক আছে কিনা তাই দেখতে আসেন, সেই দিন সমস্ত অলঙ্কার মণিমাণিক্যের ভার বাইরে এনে তাঁদের দেখানো হয়। সৌভাগ্যক্রমে সেই দিনই পরিদর্শনের দিন পড়েছিল। কলিকাতার সিনেট হলের মতো বিরাট একটা দালানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টেবিল পেতে শ্রীরঙ্গজীর অলঙ্কার বার ক'রে সাজানো হ'ল, আর বড়গোছের যা আসবাব তা পাশে পাশে মেঝেতেই রাখা হ'ল। এমনি তিন দফা আমরা সেদিন দেখেছিলুম। আরও ছিল কিনা জানি না। তার মধ্যে একদফা ছিল শুধু মণিমাণিক্যের গহনা। দেবতার নামে এই বিপুল ঐশ্বর্য জমে আছে না জানি কোন্ সুলতান মামুদের প্রত্যাশায়!

মন্দিরটি বহুদিনের। টাইম-টেবলের কথা যদি ঠিক হয় তাহ'লে নবম শতাব্দী অর্থাৎ বারোশো বছরের মন্দির এটি। পাথরের কারুকার্য এবং স্থাপত্যের বিপুলত্ব তো দেখবার মতো বটেই, এ ছাড়া অজন্তার ধরনে এখানেও দেওয়ালে বা ছাদের গায়ে ছবি আঁকা ছিল এবং তারও কিছু চিহ্ন এখনও আছে। অধিকাংশ স্থলেই সে ছবি উঠে গেছে, সেখানে চুন লাগিয়ে আধুনিককালের পট আঁকা হয়েছে, কিন্তু মূল মন্দিরের পাশে, যেখানে পাখীর খাঁচাগুলি আছে সেইখানে গিয়ে ওপরদিকে চাইলে এখনও সেই ছবিগুলি দেখা যায়। অজন্তারই মতো কালের অত্যাচারে এবং মশাল ও প্রদীপের ধোঁয়ায় তা বিবর্ণ, কালো হয়ে এসেছে, কিন্তু সেগুলি যে ঠিক অজন্তার পদ্ধতিতেই আঁকা হয়েছে তা আজও লক্ষ্য ক'রে দেখলে বোঝা যায়।

মন্দিরের মধ্যে অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে লক্ষ্মীর মন্দির, লক্ষ্মণের মন্দির, বিপুল গরুড়-মূর্তি (এত বড় গরুড় আর কোথাও নেই) প্রভৃতি দেখে আবার এসে বসলুম। ততক্ষণে খুব ভীড় জমে উঠেছে, কিন্তু দোর খোলার তখনও অনেক দেরি। বার-দুই ভোগ হয়ে গেল, তার প্রসাদও বিক্রী হ'ল, কিন্তু দেবতার দেখা নেই! খিচুড়ী ভোগ, অর্থাৎ দুই-একটি ডালের ফোড়ন-দেওয়া সা ঘি-ভাত, তাই ডেলা ডেলা ক'রে বিক্রী হয়! আর পাওয়া যায় খুব সামান্য ডাল (তাও ডেলা পাকানো) এবং দুই-একখানি চালের গুঁড়ির মালপো।

প্রসাদ আমরাও কিছু কিনলাম। তারপর আরও ঘণ্টা দুই বসবার পর দুপুরনাগাদ দোর খুলল। পূজার উপকরণ সামান্য এবং সর্বত্রই একরকম—কলা, নারিকেল, কর্পূর আর কুঙ্কুম। তাই একটি ডালায় ক'রে সাজিয়ে নিয়েছিলুম, কিন্তু ঢোকে কে? অন্ধকার, হাওয়া-বাতাসহীন গহ্বরের মধ্যে থাকেন দেবতা—তার সংকীর্ণ পথের সামনে প্রায় সহস্রাধিক লোক ঠেলাঠেলি করছে! দক্ষিণের আর কোনও মন্দিরে এত ভীড় দেখি নি।

যাই হোক্, অতি কষ্টে মাকে নিয়ে বারতিনেক চেষ্টা করার পর, ঘণ্টাখানেক ঠেলাঠেলি

ক'রে ভেতরে পৌঁছলুম। জানলা নেই, দরজা নেই, যথেষ্ট আলো নেই, তার মধ্যে অনন্ত শয্যায় শায়িত বিরাট বিষ্ণুমূর্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে মসীলিপ্ত ক'রে রাখা হয়েছে। তার ওপর সামনে একটি বালিশ এমন ক'রে সাজিয়ে রেখেছে যে, সহসা দেখলে মনে হয় ঐ বালিশটিই বুঝি মন্দিরের দেবতা! পূজারীদের চার আনা পয়সা দিলে তারা কর্পূরের আরতি করে (আরতি এ দেশের লোক করতে জানে না—শুধু কর্পূরটা জ্বেলে মুখাগ্নির মতো সামনে ধরে)—তখন সেই আলোতে পিছনের তমিস্রাশায়ী ভগবান্‌কে দেখা যায়।

আমার মনে হয়, সেকালে যত হিন্দুমন্দির তৈরী হ'ত প্রত্যেকটিই জানলাদরজাহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হ'ত শুধু এইজন্য যে, বিপুল অন্ধকারের মধ্যে সামান্য আলোতে আধো আব্‌ছায়ায় ঢাকা দেবমূর্তি দেখে রহস্যাবৃত অচিন্ত্য ভগবান্‌কে লোকে কল্পনা করতে পারবে। এখন সেটিই যে পূজারীদের অর্থ উপার্জনের চমৎকার উপায় হয়ে উঠবে, তা বোধ হয় তাঁরা ভাবেন নি। এ বিষয়ে পুরীর মন্দিরই সবচেয়ে ভাল।

মন্দির থেকে বেরিয়ে বেলা দেড়টা নাগাদ ধর্মশালায় ফিরলুম। আহারাদির পর বিশ্রাম ক'রে বেলা সাড়ে তিনটের সময় আবার বেরুলুম ত্রিচিনোপল্লী দুর্গ দেখতে। ঝট্‌কায় ক'রে যেতে মাইলতিনেক লাগে, সেখান থেকে জম্বুকেশ্বর মহাদেবের মন্দির দেখিয়ে ফিরিয়ে আনতে এক টাকা ভাড়া। লক্ষ্মণ সিংহের জীবনের ইতিহাস শুনতে শুনতে কাবেরী পেরিয়ে আমরা ত্রিচিনোপল্লী শহরে পড়লুম। লক্ষ্মণ সিংহের বাড়ি ফরাক্কাবাদে, সে আসলে রামেশ্বরমের পাণ্ডা গঙ্গাধর পীতাম্বরের ছড়িদার—এখান থেকে যাত্রী সংগ্রহ করার জন্য তাকে রাখা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আমাদের অন্য পাণ্ডার লোক মাদ্রাজ থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নিয়েছিল, সেইহেতু সেদিকে তার সুবিধে হ'ল না। এই সব ক্ষেত্রে সে যাত্রীদের এইখানকার দর্শনগুলো করিয়ে দেয় এবং যা বকশিশ পায় ও কাবেরীর পাণ্ডাদের কাছ থেকে যা কমিশন পায় সেটা তার উপরি লাভ।

লোকটি বৃদ্ধ, একটু খিট্‌খিটে স্বভাব, কিন্তু সৎ ও পরিশ্রমী। সে তার ফরাক্কাবাদের ঘরকন্নার গল্প করতে করতে চলল, Background Music বা পটসঙ্গীত হিসাবে কথাগুলো শুনতে শুনতে কখন একসময়ে ত্রিচিনোপল্লীতে এসে পৌঁছলুম।

ত্রিচিনোপল্লী বেশ বড় শহর, মাদ্রাজ ও মাদুরার পরেই বোধ হয় এই প্রেসিডেন্সীতে ত্রিচিনোপল্লীর স্থান। রাস্তাঘাট জনবহুল ও কোলাহল-মুখরিত। শহরের ঠিক মধ্যে ছোট এক দুর্গম পাহাড়ের শৃঙ্গে ত্রিচিনোপল্লী দুর্গ। কঠিন পাহাড়ের সূচ্যগ্র চূড়ায় এই দুর্জয় দুর্গ তৈরী করা খুবই কঠিন এবং সেই জন্যই তা আজও লোকের বিস্ময়ের কারণ হয়ে আছে। নিচে থেকেই এর মহিমা ভাল বোঝা যায় এবং ঘুরে ঘুরে যখন দুর্গটি সম্পূর্ণ দেখলুম (নিচে থেকেই), তখন আমি সত্যিই রীতিমত বিস্মিত বোধ করলুম। দুর্গের মধ্যে আগে একটি মন্দির ছিল, এখন রাজার বাসভবনগুলিতেও বিভিন্ন মন্দির আছে। দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছবার জন্য অধুনা একটি অতি সহজ সিঁড়ি তৈরী হয়েছে লক্ষ্মণ সিংহকে নিয়ে মা উপরে উঠে গেলেন দর্শন করতে, আমি নিচে ঘুরে ঘুরে উপরের বিরাট দুর্গ ও নিচের বিরাট জনতা দেখতে লাগলুম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওঁরা ফিরে এলেন, তখন আবার ঝট্‌কায় চড়ে জম্বুকেশ্বর মন্দিরে

যাত্রা করা গেল। কাবেরীর পুল পেরিয়ে শ্রীরঙ্গম্ দ্বীপের মধ্যেই ঐ মন্দিরটি। এর গোপুরম্‌গুলো খুব উঁচু না হ'লেও প্রসারে মন্দিরটি বৃহৎ এবং কারুকার্যের দিক থেকে শ্রীরঙ্গমের থেকেও ভাল। সহস্র-স্তম্ভ মণ্ডপ যেটা, সেটার প্রতিটি স্তম্ভ নির্মাণ করতে বোধ হয় দুটি কারিগরের ছ'মাস সময় লেগেছে। দক্ষিণের এই সব বিরাট মন্দিরের বিপুল শিল্পচাতুর্যের মধ্যে এসে আমরা হাঁপিয়ে উঠি, সব খুঁটিয়ে দেখার ধৈর্য বা শারীরিক অবস্থা থাকে না; কিন্তু মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ যখন একটি মূর্তি কিংবা স্তম্ভে নজর পড়ে তখন চম্‌কে উঠতে হয়। আর একটা কথা—প্রতিটি মূর্তির—তা সে যত ছোটই হোক না কেন—বিভিন্ন ভঙ্গীর বিভিন্ন মুদ্রা হাতে খোদাই করা। হাতের কোন্ ভঙ্গীর কি অর্থ তখন ধরা হ'ত তা এখন তো আমাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। তাই যখন উদয়শঙ্কর কি শঙ্করণ-নাম্বুদ্রির নাচ দেখেছি তখন অনেক মুদ্রারই অর্থ বুঝি নি, কিন্তু এখানে এসে বহু মুদ্রা জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল এবং সেটা হ'ল শুধু অনবরত দেখতে দেখতে...।

জম্বুকেশ্বর শিবলিঙ্গ, খানিকটা পাতালের মতো নেমে গেলে তবে দর্শন হয়। অনেক কষ্টে প্রধান মন্দির এবং পার্বতী মন্দির (কষ্ট এইজন্য যে প্রায় মাইল তিনেক মন্দিরের মধ্যেই হাঁটতে হয়) দেখে ক্লান্ত দেহে আমরা আবার শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরে এসে পৌঁছলুম। এবার উদ্দেশ্য বাজার করা। এখানকার বেতের কাজ বিখ্যাত। বিশেষ ক'রে বেতের এমন সুদৃশ্য ট্রে এরা প্রস্তুত করে যা না দেখলে সম্ভব বলেই মনে হ'ত না। কতকগুলি বেতের ট্রে আর চন্দনকাঠের মূর্তি কিনে ধর্মশালায় ফিরে এলুম। ত্রিচিনোপল্লীতে একটি গুজরাটীর দোকান আছে, সেখানে ঘিয়ের খাবার পাওয়া যায়—সেইখান থেকেই কিছু সংগ্রহ করে এনেছিলুম, তাইতেই জলযোগ শেষ ক'রে আবার বিছানা-পত্র গুছিয়ে স্টেশনে যাত্রা করা হ'ল। এবার সোজা রামেশ্বরম্! জয় রামেশ্বর!

শেষ করার আগে লক্ষ্মণ সিংহের একটা কথা ব'লে নিই। লোকটি সারাদিন ছায়ার মতো আমাদের সঙ্গে রইল, আমাদের সঙ্গে ঘুরল, কথায় কথায় কত পরিচয় হ'ল, কিন্তু ধর্মশালায় ফিরে এসে যখন তার হাতে বকশিশের টাকাটি দিলুম—ব্যাস্, লোকটি সঙ্গে সঙ্গে যেন বাতাসে মিশে গেল! একটা ধন্যবাদ জানাল না, কিংবা বকশিশের অংশ কম হয়েছে ব'লে অনুযোগও করল না—কোনও রকম প্রিয়সম্ভাষণ, কোনও রকম প্রীতিজ্ঞাপন নেই—একটি কথাও না বলে, এমন কি ছোট্ট একটি বিদায় নেবার ইঙ্গিত পর্যন্ত না দিয়ে লোকটি চলে গেল। সারাদিনের ঘনিষ্ঠতা যেন পদ্মপত্রের জলের মতো, কোথাও তাকে স্পর্শ করে নি, কর্তব্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধের আভাস পর্যন্ত তার মনে নেই, একেবারে গীতার নির্মম পুরুষ!

সে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল যে, এই পৃথিবীর মধ্যে কোথাও সত্যকারের আত্মীয়তা নেই, সমস্তটাই মুসাফিরি। এমনি ক'রেই কয়েক ঘণ্টার আত্মীয়তাকে নির্মমভাবে ত্যাগ ক'রে আবার নূতনের সন্ধানে যাত্রা করতে হবে। পৃথিবীও খুঁজবে আবার নতুন যাত্রী! এই-ই এখানকার সত্য সম্বন্ধ।

নগাধিরাজের শ্রীচরণে

রোহিলখণ্ড-কুমায়ূন রেলের ছোট কামরায় আরও ছোট বেঞ্চেতে শুয়ে ঝাঁকানি খেতে খেতে কখন যে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলুম তা জানি না, হঠাৎ এক সময়ে চম্‌কে উঠে দেখি—কী একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি ঢুকছে। ঘড়ির কাঁটাটার দিকে চেয়ে দেখলুম আমাদের দেশের সময় প্রায় পৌনে পাঁচটা অর্থাৎ আইনত এবার হলদোয়ানি পৌঁছানোই উচিত।

একটু পরেই একস্থানে গাড়িটা এসে দাঁড়াল, বাইরের দিকে চেয়ে বোঝবার উপায় নেই কি স্টেশন, তবে সামান্য আলোর ব্যবস্থা দেখে মনে হ'ল স্টেশন একটা বটে। মুখ বাড়িয়ে কুলিদের প্রশ্ন করলুম, 'কোন্ স্টেশন?'

জবাব এল, 'হলদোয়ানি।'

তখন 'ওঠ্-ওঠ্' আর 'বাঁধ্-বাঁধ্'! আমার সাহিত্যিক বন্ধু সুমথবাবুর বিছানার দড়ি নেই, একপাটি জুতো নি-পাত্তা, তার সে কী ব্যাকুলতা! ইন্দুরও তাই, মাস্টার শিবু ভাগ্যিস জেগে ছিল, সে হুঁশিয়ার লোক, চট্ ক'রে তার হয়ে গেল। বিপদ সুমথকে নিয়েই—কোনও মতে যখন তাকে প্রায় বিছানা-সুদ্ধ জড়িয়ে নামানো গেল, তখন ট্রেন চলতে শুরু করেছে।

টিকিট আমাদের দুজনের ছিল কাঠগুদাম পর্যন্ত, আর দুজনের ছিল হলদোয়ানি। কাঠগুদাম পর্যন্ত টিকিট কেটে কোনও লাভ নেই, এ-সংবাদটা পূর্বেই নিয়েছিলুম; কারণ বাসগুলো অধিকাংশই ছাড়ে হলদোয়ানি থেকে এবং ভাড়া দু জায়গা থেকেই সমান, অথচ হলদোয়ানি থেকে কাঠগুদাম, মাত্র সাড়ে তিন মাইল পথের জন্য, ট্রেনে নেয় ছ'আনা!

যাই হোক, হলদোয়ানির প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে দেখি তখনও চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। উষার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। পাহাড় আছে কি নেই বোঝা যায় না, তবে বেশ ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে শুক্‌নো তাজা হাওয়া এসে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে যে আমরা নগাধিরাজ হিমালয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি।

কুলিদের প্রশ্ন করলুম, ''নৈনীতাল যাবার বাস কোথা?'' তারা শুধু 'চলিয়ে না' বলে আমাদের মালপত্র তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল, আমরাও অগত্যা তাদেরই সাময়িকভাবে মহাজনের পদবী দিয়ে পদাঙ্ক অনুসরণ করলুম। স্টেশনে তবু আলো ছিল একটু, প্ল্যাটফর্মের বাইরে দেখি আরও অন্ধকার। নক্ষত্রের আলোতে কোনও মতে বোঝা যায় যে পথ একটা আছে, এই মাত্র। দূরে দুই-একটি আলোর বিন্দু, বুঝলুম যে ঐখানেই বাসের আড্ডা হবে। আর যথার্থই তাই—মাঠ ভেঙে স্টেশন কম্পাউণ্ডের বাইরে পৌঁছতেই দেখলুম সারি সারি, বোধ হয় পঞ্চাশ-ষাটখানা মোটরবাস ও লরী, অন্ধকারে ভয়াবহ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। তারই দু'দিকে অসংখ্য দোকান কিন্তু তারা তখনও কেউ ঝাঁপ খোলে নি। গুটি দুই চায়ের দোকান খুলেছে মাত্র, দোকানীরা জলের ডেক্‌চি চাপিয়ে উনুনের ধারে বসে হাত গরম করছিল, আমাদের দেখে একটু আশান্বিত হয়ে বারকতক চেঁচিয়ে শুনিয়ে দিল 'চা-গরম!'

কিন্তু এধারে চেয়ে দেখি যে কুলিগুলো বেশ নিশ্চিন্ত মনেই মালপত্র রাস্তার ওপর নামাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলুম, 'বাস কই রে?'

কুলিপুঙ্গবরা তখন যা নিবেদন করল তার তর্জমা করলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে—বাসওয়ালাদের এখানে একটা 'এসোসিয়েশন' নামে সমিতি আছে, তাদের হুকুম না পেলে কোন্ বাস আগে যাবে তা ঠিক হবে না। সুতরাং বাসে মাল চাপিয়ে লাভ নেই, এখনও 'নম্বর' হয় নি। এসোসিয়েশনের অফিসে উঁকি মেরে দেখলুম—তার দোর খোলা, ভেতরে একটি কেরানীও বসে আছেন অন্ধকারে ভূতের মতো গা ঢেকে। তাঁকে প্রশ্ন করতে শোনা গেল যে, ভোরের আলো না ফুটলে বাসও ছাড়বে না, নম্বরও দেওয়া হবে না। শেষরাত্রে অফিসে আলো জ্বালবার হুকুম নেই বোধ হয়!

যাই হোক, তাঁকে বিনীতভাবে নিবেদন জানালুম, 'সামনের বেঞ্চিটা অধীনদের জন্য থাকবে তো?' তিনি জবাব দিলেন, 'সে আমি বলতে পারি না, আগে 'সিট্' নিলেই থাকবে।' অর্থাৎ এইখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের মর্জির অপেক্ষা করতে হবে। আগে টাকা জমা দিতে চাইলুম, কিন্তু তিনি নিতে নারাজ।

অগত্যা আমরা চারটি প্রাণী অন্ধকারে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম। প্রাতঃকৃত্যের তাগিদ যথেষ্ট, এ অবস্থায় কী করা যায় ভাবছি এমন সময়ে সেই অন্ধকারেই একটি মানুষ এসে পাশে দাঁড়ালো, 'হোটেল, বাবু?'

মনে মনে বিরক্ত হয়েই ছিলুম, বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গে তাকে জানিয়ে দিলুম, 'আমরা নৈনীতাল যাব।'

সে পরিষ্কার হিন্দুস্থানী ভাষায় জবাব দিলে যে সে কথাটা তারা ভাল-রকমই জানে। তবে যাবার তো এখনও দেড় ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা দেরি—এই সময়টা আমরা তাদের ঘরে 'আরাম' করতে পারি। চৌপাই আছে, শোওয়া-বসার কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি নেই। গোসলখানাতে জল-টলের আয়োজনও আছে প্রচুর।

'গোসলখানা' শুনেই লাফিয়ে উঠলুম, প্রশ্ন করলুম, 'কত নেবে বাপু?'

সে জবাব দিলে, 'মাথা পিছু দু'আনা।'

বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বললুম, 'চলবে না। এক আনা ক'রে দিতে পারি, দেখ—'

একটু ইতস্ততঃ ক'রেই সে রাজী হয়ে গেল। পূজোর সময় এদেশে ঠাণ্ডা আসে নেমে, তাই যাত্রীও তাই এখন নামার দিকে। সুতরাং এই সময়টা এদের বড়ই দুরবস্থা। আর সেইজন্যই এখান থেকে নৈনীতাল পর্যন্ত সর্বত্রই দেখেছি, হোটেলওয়ালারা অসম্ভব রকম সস্তা রেটে নামতে প্রস্তুত। যাক্—সেই লোকটির পিছু পিছু বাস-অফিসেরই দোতলায় উঠে গেলুম। হোটেলটির নাম বেশ জাঁকালো, যতদূর মনে পড়ছে 'রয়্যাল', ঘরগুলোও মন্দ নয়। দড়ির ভাল খাটিয়া, চেয়ার, আয়না-লাগানো টেবিল—অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নেই। যদিচ তাতে আমাদের তখন কোনও দরকার ছিল না, আমাদের মন তখন গোসলখানার দিকেই একাগ্র।

সবাই মুখ-হাত ধুয়ে যখন নামলুম তখন অন্ধকার ঝাপ্সা হয়ে এসেছে। উষা আসেন

নি, শুধু তাঁর আগমনের আভাস পাওয়া গেছে মাত্র। কিন্তু সেই আবছায়াতেই ফুটে উঠেছে চারদিকে মেঘের মতো পর্বতশ্রেণীর ছায়া। বেশ একটা চনচনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, রাস্তায় পায়চারি করতে ভালই লাগছিল। রাস্তাঘাটগুলিও ভাল। তখন অতটা বুঝতে পারি নি, কিন্তু ফেরবার দিন দিনের আলোয় দেখেছিলুম হলদোয়ানি বড় শহরের মতোই গুলজার। বিরাট বাজার, সিনেমা, স্কুল—সবই আছে। কাঠগুদামে রেলের গুদাম ছাড়া আর কিছু নেই—শহর হ'ল এইটিই। হাওয়াও এখানকার ভাল, কাছেই আলমোড়া নৈনীতাল না থাকলে, চাই কি এইখানেই হাওয়া বদলাতে আসা চলত।

আর একটু পরেই এসোসিয়েশনের সেই বাবুটি ডেকে আমাদের জানালেন যে বাসের নম্বর হয়ে গেছে (মানে কোন্‌খানা যাবে স্থির হয়েছে), এখন আমরা ইচ্ছা করলে স্থান নিতে পারি। বলাই বাহুল্য, আমরা তৎক্ষণাৎ ছুটলুম সামনের সিটের দিকে তীরবেগে, স্থানও দখল করলুম, মালপত্রও উঠল কিন্তু উঠে যখন বসেছি, হঠাৎ খেয়াল হ'ল সুমথবাবু কই? খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। অনেকখানি হৈ-চৈর পর দেখা গেল, ততক্ষণে একমাত্র যে খাবারের দোকান খুলেছে সেইখানে তিনি ধন্না দিয়েছেন। ডাকাডাকিতে যখন ফিরে এলেন, হাতে দেখি একরাশ 'মিঠা সমোসা' অর্থাৎ মিষ্টি সিঙ্গাড়া বা লবঙ্গলতিকা। গম্ভীরভাবে উপদেশ দিলেন, 'বোঝ না তোমরা, খালি-পেটে কখনও বাসে চড়তে নেই!'

আমাদের মাস্টার শিবু এ-সব ব্যাপারে সে সুমথেরও ওপরে যায়। সে আবার খান দুই খাবার পরই সুমথকে খোঁচাতে শুরু করল, 'ওহে, আরও খানকতক সংগ্রহ করে নাও। খাসা জিনিস—কে জানে কখন পৌঁছবো, বেশী করে খেয়ে নেওয়া ভাল!'

ইন্দু সকালের দোহাই দিয়ে প্রতিবাদ জানাতে গেল, কিন্তু কে কার কথা শোনে!

যাই হোক্, যথাসময়ে বাস দিলে ছেড়ে। ভোরের প্রথম আলো ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো এসে লেগেছে আমাদের মাথায়, ঠাণ্ডা বয়ে আনছে যেন নগাধিরাজেরই অভ্যর্থনা, আর তারই মধ্য দিয়ে আমাদের বাসখানি উর্বরা, স্নেহশীলা সমতলভূমিকে পেছনে ফেলে রেখে কলরব করতে করতে ছুটল আঁকাবাঁকা পথ ধরে নৈনীতালের উদ্দেশে। তখনও পাহাড়ের রুক্ষ বন্ধুর রূপ চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, তখনও তা নীলাভ মেঘের মতোই অস্পষ্ট, সুন্দর।

হলদোয়ানি থেকে কাঠগুদাম সামান্য চড়াই থাকলেও পথটা সোজা, কিন্তু কাঠগুদাম ছাড়িয়েই পথ অবিরাম পাক খেতে খেতে গেছে। এই পথটিই নাকি ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল মোটর-পথ, অন্ততঃ বিজ্ঞাপনে তাই বলা হয়। বাস্তবিকই রাস্তাটি ভারি সুন্দর। দার্জিলিং-মুসৌরীর পাহাড়ের রাস্তাও দেখেছি, কিন্তু এর পথটিই সবচেয়ে ভাল লাগল। খানিকটা ওঠবার পরই সমতলভূমি গেল চোখের সামনে থেকে মুছে, একড়োখেবড়ো টুকরোটাকরা পাহাড় একদিকে ছড়িয়ে পড়ল, আর একদিকে খাড়া পাষাণ-প্রাচীর, অভ্রভেদী, কঠিন। একটি পার্বত্য নদী বহুদূর পর্যন্ত চলল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে, এখন বেচারী বড় শীর্ণ, যদিও তার বর্ষাকালের পরিপূর্ণ যৌবনের চিহ্ন দেহসীমা থেকে একেবারে ঘুচে যায় নি, তখনকার রূপটাও কল্পনা করা চলে। আরও একটু ওঠবার পর

সে-ও বিদায় নিলে; ডানদিকের টুকরো পাহাড়গুলোও কখন দেখি ডেলা পাকিয়ে ডাগর হয়ে উঠেছে, তাদের আর অবহেলা করা যায় না কোনমতেই।

রাস্তায় ক্রমশঃ আরও চোখা চোখা বাঁক দেখা দিল। দার্জিলিং-এ উঠতে উঠতে যেমন সব লুপ দেখা যায়, এখানে দেখলুম তার সংখ্যা বেশী। দেখলুম আর মনে মনে শঙ্কিত হলুম নামবার দিনের কথা চিন্তা করে, তখন এই সব বাঁকের মুখে দেহের নাড়ীতে এমন ঝাঁকানি দেবে যে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্যন্ত উঠে আসতে চাইবে। আমাদের সুমথবাবুরই ভয় বেশী, তিনি তো দেখি ওঠবার পথেই চোখ বুজে মুহ্যমান হয়ে বসে আছেন, বুঝলুম প্রাণপণে বমনেচ্ছা সম্বরণ করছেন।

নৈনীতালের কাছাকাছি এসে বাসটা একবার দাঁড়াল, এইখানে 'টোল্' মানে শুল্ক দিতে হবে। এর আগেই একবার পথে দাঁড় করিয়ে সবাইকে গুনে নেওয়া হয়েছিল, এখানেও একবার মাথা গুনে 'টোল্' বুঝে নিয়ে আবার ছেড়ে দেওয়া হ'ল। মাইলপাথর দেখে বুঝলুম যে আর আমাদের বেশী দেরি নেই, নৈনীতাল এসে পড়েছে। বেশ গা-ঝাড়া দিয়ে আশান্বিত হয়ে বসলুম, যদিও তখন আর আমাদের গা-ঝাড়া দেবার মতো অবস্থা বিশেষ ছিল না, বাসের ঝাঁকানিতে সবাই একটু নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলুম।

[illegible] [illegible], একটু বাদেই বাসটা এক জায়গায় এসে থামল, শুনলুম আমাদের যাত্রা শেষ—এইখানেই নামতে হবে।

যেখানে এই বাসগুলো এসে থামে (আবার ছাড়েও) সেটাকে ওরা বলে তল্লিতাল। এটা হ'ল লেকের লম্বা দিকের এক প্রান্ত। বাস থেকে নেমে একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালুম। ঝলমল করছে রোদ, কিন্তু তখনও সকালের রোদ, পাহাড়ের গায়ে ধোঁয়াগুলোকে তখনও নীলাভ দেখাচ্ছে। চারদিকে পাঁচিল-ঘেরা বাগানের মতো ব্যাপার, মধ্যে সরোবরটি টলমল করছে—তাকে ঘিরে তিনদিকে উঁচু উঁচু পাহাড় দাঁড়িয়ে। শহরটা সেই পাহাড়গুলোর ওপরেই। দার্জিলিং-এর চেয়ে ঢের ছোট জায়গা, ঘর-বাড়ির সংখ্যাও অনেক কম, আর সেইজন্যই রাস্তাগুলো অধিকাংশই এত খাড়া যে দু'পা হাঁটলেই দম বন্ধ হয়ে আসে। সরোবরটির ছবি দেখে যতটা বড় অনুমান হয়েছিল অতবড় নয় দেখলুম— এমন কি, বোধ হ'ল আমাদের ঢাকুরিয়া লেকের চেয়েও ছোট।

যাক, তবু মোটের ওপর ভালই লাগল। বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস, গায়ের কাপড়টা ভাল ক'রে জড়িয়েও যেন শরীর তাতে না, রৌদ্রে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। ...কুলিরা মালপত্র নামিয়েছে, হোটেলের লোকেরা ছেঁকে ধরেছে, যেখানে হোক একটা বাসা ঠিক করতে হবে। এখন যাত্রীর ভীড় নেই, হোটেলের ঘর অধিকাংশই খালি, সুতরাং প্রতিযোগিতা চলেছে সস্তার পথ ধরে। সবাই বলছে এক টাকায় ভাল ঘর দেবে এবং সবাই বলছে যে, অপরের মতো মিথ্যা আশা সে দেয় না, সে যা বলে তা কাজেও করে।

বন্ধুদের সেইখানে রেখে আমি হোটেল দেখতে গেলুম। ঠিক বাসস্ট্যাণ্ডের ওপরেই 'হিমালয় বোর্ডিং'—সেটা দেখলুম, আরও দু-একটা দেখলুম, কিন্তু পছন্দ হ'ল না। কেমন যেন ঘরগুলো অন্ধকার মতো আর ঠাণ্ডা। শেষে দুর্গাদত্ত শর্মা বলে এক গাইড ধরে নিয়ে

গেল 'ভিজিটার্স হোম' দেখাতে। সেখানে পৌঁছেই মন বলে উঠল, 'ঠিক এই রকমই চাইছিলুম!' পূব-মুখো নতুন বাড়ি, কাঠের মেঝে আগাগোড়া কার্পেট-মোড়া। প্রত্যেকটা ঘরেরই সামনে একটু করে ঘেরা-বারান্দা, স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের মতো। বারান্দাটিও ভারী চমৎকার, কাঁচের ফ্রেম, কাঁচেরই সার্সি জানলা দেওয়া, তাতে ধবধবে সাদা পর্দা মোড়া। ঘরগুলিও পরিষ্কার, ফার্নিচার ভাল—আর যেটা সবচেয়ে লোভনীয়—চমৎকার বাথরুম।

দুর্গাদত্ত জানালে 'সিজ্‌নে'র সময় নাকি ঐ ঘরগুলোই তারা তিন টাকা ক'রে ভাড়া নেয়, এখন সে এক টাকাতেই দিতে রাজী আছে। কিন্তু গোল বাধল খাট নিয়ে, প্রত্যেক ঘরে ওরা দুটো ক'রে খাট দেয় কিন্তু লোক আমরা চারজন। দুর্গাদত্তকে সমস্যার কথাটা জানাতে সে তৎক্ষণাৎ তারও সমাধান ক'রে দিল। বলল, দৈনিক দু' আনা হিসেবে সে আর দু'খানা বাড়তি খাট আমাদের ঘরে লাগিয়ে দেবে।

যাক্ বাঁচা গেল। নিচে গিয়ে মালপত্র নিয়ে আবার উঠে এলুম। এখানে এক বাঙালীরই হোটেল আছে—মিসেস গাঙ্গুলীর হিন্দুস্থান বোর্ডিং। কিন্তু সেটা এত উঁচু যে তাঁর হোটেলের এক ভদ্রলোক ঘর দেখে আসতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমাদের সাহসে কুলোল না। পরে জেনেছি, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।

ঘরে এসে বিছানাপত্র বিছিয়ে আরাম ক'রে বসা গেল। হোটেলের চাকর, ঠাকুর, বয় যা বলুন—ঐ একটি ছেলে ছিল, রতন সিং তার নাম। ভারী সুন্দর চেহারা এবং খুব বাধ্য। এই চাকরটির মতো এত পরিশ্রমী এবং নির্লোভ ছেলে খুব কমই দেখেছি। বিশেষতঃ হোটেলে যারা চাকরি করে, তাদের চোখটা সর্বদাই থাকে যাত্রীদের পকেটের দিকে। বকশিশের একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের আশা না পেলে তাদের কাজের উৎসাহ যায় কমে।

রতন সিং গরম জল এনে দিলে। গরম জলের চার্জ কম নয়, দু' আনা বালতি (অবশ্য দার্জিলিং-এর তুলনায় কমই)। তবে আমাদের প্রথম দিন ছাড়া গরম জল আর লাগে নি। শীত অতিরিক্ত হ'লেও আমরা ঠাণ্ডা জলেই স্নান করেছি—আর তা সহ্যও হয়েছে। স্নান সেরেই চিঠি লেখার পালা। এখানে আবার সকাল এগারটায় কলকাতার ডাক যায় বেরিয়ে। সুবিধের মধ্যে পোস্টাফিসটা ঠিক বাস-স্ট্যাণ্ডটার সামনেই। শেষ মুহূর্তে ফেললেও চলে যায়।

আহারাদি ও বিশ্রামের পর রতন সিংয়ের জলবৎ চা খেয়ে যাত্রা করা গেল নগর-ভ্রমণের উদ্দেশে। এইবার নগরের কথা কিছু বলা যাক।

আগেই বলেছি যে, ঈষৎ লম্বাটে ধরনের লেকটা, রেলের টাইম-টেবলের মতে প্রায় এক মাইল লম্বা এবং চারশো গজ চওড়া। এই লেকটিকে ঘিরে একটি সমতল পথ আছে বরাবর, তার খানিকটা পিচ-দেওয়া, খানিকটা কাঁকর-দেওয়া—অশ্বারোহীদের জন্যে। দার্জিলিং-এর মতো এখানেও ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়, তবে এঁদের বিশ্বাস যে পিচ-দেওয়া রাস্তায় ঘোড়া চালানো যায় না। তারই ফলে এখানে পাহাড়ে ওঠবার একটি পথও পিচ-দেওয়া নয়—আমাদের মতো শ্রীচরণ ভরসা পদাতিকদের কী বিপদ যে হ'তে পারে সেকথা এঁরা চিন্তা করেন নি একবারও। একে ঐ খাড়াপথ, তায় কাঁকর-দেওয়া, প্রতি মুহূর্তে

পদস্খলনের সম্ভাবনা। এই লেকের চারপাশের রাস্তাটি যা ভাল, তা-ও একটি বড় 'ল্যাণ্ডশ্লিপ' হয়ে আমাদের হোটেলের দিকের রাস্তাটা গেছে বন্ধ হয়ে, লেক-পরিক্রমার সুবিধে আর নেই। লাটসাহেবের বাড়ি যাবার সোজা রাস্তাই নাকি খসে পড়েছে, তার ফলে সে বেচারীকে অনেক কষ্ট ক'রে আর একটি খাড়াপথে যেতে হয়।

লেকের লম্বাদিকের শেষ প্রান্তে হ'ল তল্লিতাল—বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকটা। এদিকেও বাজার-হাট-পোস্টাফিস আছে, তবে অপর প্রান্তে মল্লিতালই হ'ল আসল শহর। মল্লিতাল যাবার পথে দু-একটা বিলাতী হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং একটা দেশী ও একটা বিলাতী সিনেমা পড়ে। সাহেবদের বসবাসের বাড়িও অধিকাংশ এই পথে যেতেই পড়ে। মল্লিতালে পৌঁছেই যেটা পাওয়া যায় সেটা হ'ল বিরাট একটা মাঠ, শুনলুম এইখানে ক্রিকেট খেলা হয়, দরবার জাতীয় কিছু করতে হ'লেও এইখানেই করতে হয়। এক লাটসাহেবের বাড়ি ছাড়া এতখানি সমতলভূমি আর নৈনীতালে কোথাও নেই। আর এই মাঠ পেরিয়েই সাহেবদের 'রিঙ্ক' ও 'ক্যাপিটল' নামে দুটি সিনেমা, থিয়েটার, ক্লাব, স্কেটিংরুম প্রভৃতি আমোদপ্রমোদের আস্তানা। আর তার পরেই হ'ল, একেবারে জলের ধার ঘেঁষে নৈনীদেবীর মন্দির।

আমরা তখন জানতুম না মন্দিরটা কার, হঠাৎ উগ্র বিলাতী ব্যাপারের পরই হিন্দুমন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে গিয়ে দেখি পাশাপাশি দুটি মন্দির। তার একটি নিঃসন্দেহে শিবের মন্দির, আর একটিতে অনুমানে বুঝলুম কোন দেবীমূর্তি আছেন। অনুমান মানে সে পাষাণমূর্তি দেখে চট ক'রে বোঝা কঠিন যে 'পুরুষ কি নারী'! মন্দির দু'টি ছোট, কিন্তু স্থানীয় পাহাড়ী নরনারীর ভিড় দেখে বুঝলুম যে তাদের মর্যাদা ছোট নয়। মনে বড় কৌতূহল হ'ল, কয়েকটি সাহেবী পোশাক পরা পাহাড়ী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে মন্দিরের সামনে ঝোলানো ঘণ্টাগুলি বাজাচ্ছিলেন, তাঁদেরই একজনকে গিয়ে প্রশ্ন করলুম, 'এ মন্দিরটি কার?'

তিনি ইংরাজীতে জবাব দিলেন, 'বলছি। এক মিনিট অপেক্ষা করুন।'

তারপর উভয় মন্দিরের সামনেই বহুক্ষণ ধরে প্রণাম ক'রে তিনি আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে জলের ধারে এক বেঞ্চিতে বসিয়ে যে ইতিহাস বিবৃত করলেন তা সংক্ষেপে এই:—

অনেকদিন আগে এই কুমায়ূন রাজ্যের (অধুনা কুমায়ূন জেলা) নয়নীদেবী বা নন্দাদেবী বলে এক পুণ্যশীলা রাণী ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশে জন্মেছেন এই ছিল সবাইকার বিশ্বাস। পাহাড়ীরা তাঁকে এতই ভক্তি করত যে, বলতো উনিই সাক্ষাৎ দুর্গা। এখান থেকে আশেপাশে বহুদূর পর্যন্ত যে প্রায় ষোল হাজার মন্দির আছে, সবগুলিই তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত। নন্দাদেবী পর্বত নামে হিমালয়ের যে শৃঙ্গ, তাও নাকি তাঁরই নামে। নৈনীতালের এই মন্দিরটি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত, বহুকালের প্রাচীন মন্দির। এখন যেখানে মন্দিরটি আছে আগে এর থেকে বহু পেছনে ছিল, তখন লেকও ছিল ততদূর অবধি বিস্তৃত। পরে দেবী স্বপ্ন দেন, শীঘ্রই বিরাট একটা পাহাড় ধস্‌বে, তাতে তাঁর মন্দিরও ভেঙে যাবে, কিন্তু তাতে ভয় পাবার দরকার নেই। তাঁর পুরনো মন্দিরের চূড়ো যেখানে গিয়ে পড়বে

সেইখানেই আবার নতুন মন্দির গড়ে তুলতে হবে। সেই আদেশমতোই নাকি বর্তমান মন্দির গঠিত হয়েছে, আর ঐ যে এতখানি সমতলভূমি সেও সেই পাহাড় ধসারই ফলে পাওয়া গেছে, মানে লেক্ গেছে অতটা বুজে।

আমরা যথাসাধ্য ভক্তিভরে এই কাহিনী শুনলুম। তারপর নন্দাদেবীকে প্রণাম করে উঠলুম মল্লিতালে।

মন্দির পিছনে ফেলে সোজা যে পথ মল্লিতাল বাজার ও ডাকঘরের দিকে উঠেছে, সে পথে প্রথমেই পড়ে খানিকটা মুসলমান পাড়া। তারপরই বাজার—কতকটা তল্লিতালের মতোই, তবে দু-একটা অপেক্ষাকৃত বড় দোকান আছে, এপারে এই হিসেবে এটাকেই বড়বাজার বলা চলে। তা ছাড়া একটা মিউনিসিপ্যাল বাজারও আছে এখানে, তার মধ্যে ফলের দোকানই সব। বাজারের ওপরই ডাকঘর। তারও ওপরে শহর আছে—অধিকাংশই বিলিতী পাড়া, অফিস অঞ্চলও বলা চলতে পারে। এই মল্লিতালেরই পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা উঠে গেছে 'চায়নাপিকে' অর্থাৎ নৈনীতালের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে। এই চীনাপিকই হ'ল নৈনীতালের সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্য। কারণ এখান থেকে প্রায় পাঁচশো মাইল পর্যন্ত হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী দেখা যায়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য—সে কথা পরে বলছি।

এমনি নৈনীতাল শহরের কোথাও থেকে 'তুষার' দেখা যায় না, কারণ আগেই বলেছি যে এ যেন পাঁচিল-ঘেরা শহর, পাঁচিলের ওপরে না উঠলে ওপারের কিছু নজরে পড়ে না। তবে শুনলুম যে ডিসেম্বর মাস নাগাদ এই পাহাড় ও গাছপালাগুলি বরফে ঢাকা পড়ে সাদা হয়ে যায়। তখনকার অবস্থাটা কল্পনা ক'রেই শিউরে উঠলুম, এখনই এত ঠাণ্ডা, তখন না জানি কী অবস্থাই হয়!

বেড়িয়ে যখন বাসায় ফিরে এলুম তখনও বোধ হয় আটটা বাজে নি—কিন্তু তখনই পথঘাট নির্জন হয়ে এসেছে, শহর যেন তন্দ্রাতুর। কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস চলেছে হু-হু ক'রে, সে ঠাণ্ডায় বাইরে কেউ থাকত চায় না, দোকান-বাজারে যায় কে? সুতরাং দোকানীরাও তাড়াতাড়ি ঝাঁপ বন্ধ ক'রে বাড়ি ফেরবার যোগাড় করছে। আমরাও আমাদের ঘরটিতে ফিরে এসে যেন বাঁচলুম, হাড়ের মধ্যে পর্যন্ত কন্‌কনানি ধরে গিয়েছিল।

সেদিন লক্ষ্মীপূর্ণিমা, কোজাগরী। সবচেয়ে মধুর জ্যোৎস্না পাওয়া যায় বছরের এই দিনটিতেই। এখানে পাহাড়ের প্রাচীর ডিঙিয়ে চাঁদ উঠতে কিছু বিলম্ব হয়, সুতরাং নীচে থাকতে মনে পড়ে নি যে আজ পূর্ণিমা। হোটেলের কাঁচের বারান্দাটিতে উঠে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ঠিক আমাদের সামনেই দেখা দিয়েছে পূর্ণচন্দ্র, আর তারই আলোতে সমস্ত পাহাড়গুলোর ছায়া স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে লেকের জলে। আমরা বারান্দার বিজলী আলো নিভিয়ে স্তব্ধ হয়ে সেই দিকে চেয়ে বসে রইলুম—অনেকক্ষণ ধরে। শান্ত রহস্যময়, ঈষৎ ভয়াবহ সেই পাহাড়গুলির নিবিড় ছায়া, আর তার মাঝে একফালি নীল আকাশ এবং শুভ্র চন্দ্রের শোভা—সবগুলো মিলিয়ে কী অপূর্ব ছবিই রচনা করেছিল! সে সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, অনুভূতি নিয়ে বুঝতে হয়।

পরের দিন সকালে আমাদের হোটেলের ঠিক সামনেই যে উঁচু চূড়োটা দেখা যায়

সেইটের ওপরে উঠেছিলুম। এমন কিছু উঁচু নয় অবশ্য, কিন্তু পথগুলো খুব খাড়া বলে তাইতেই কষ্ট হ'ল। আর পাহাড়ে ওঠার কোন বাসনা রইল না। অগত্যা আমরা নৌকো-বিহার করেই সেদিনের মতো বেড়ানোর সাধ মিটিয়ে নিলুম। এখানকার এই নৌকোগুলি বেশ। খুব হালকা পান্‌সি, বেশ দু'খানি চেয়ারের মতো করা আছে, তাতে চমৎকার 'কুশান' দেওয়া। সামনে আরও বসবার জায়গা আছে বটে, তবে সেগুলিতে অত আরামের ব্যবস্থা নেই। প্রথম দিন এসেই দর জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বলেছিল মাথা-পিছু ছ'আনা। আজ আমরা ইন্দুকে এগিয়ে দিয়েছিলুম, সে দরদস্তুর ক'রে গোটা নৌকোটা সাত আনায় ঠিক ক'রে ফেললে। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা আরাম ক'রে নৌকোয় চেপে বসলুম। পরিষ্কার কালো জল, তারই মধ্যে দিয়ে ছপ-ছপ ক'রে দাঁড় ফেলে নৌকাগুলো বেয়ে চলে যায়, চারদিকে সুন্দর ছবির মতো শহরটি দেখা যায়—খুবই ভাল লাগে ব্যাপারটা। একটা কথা এইখানে বলে রাখি, এর পর থেকে আমরা রোজই নৌকো চড়েছি এখানে, কিন্তু দরটা ক্রমশ কমিয়ে চার আনা এমন কি তিন আনাতে দাঁড় করিয়েছিলুম। তিন আনাতে পাঁচজন পর্যন্ত চড়েছি।

তার পরদিন স্থির হ'ল লাটসাহেবের বাড়ি যেতে হবে। সকালে নয় বিকেলে। সে ইচ্ছা আমাদের আরও প্রবল ক'রে তুললে মাস্টার শিবু; আমরা যখন দুপুরবেলা আহারাদির পর একটুখানি 'গা গড়িয়ে' নিতুম সে তখন শুত না, খিদে করবার জন্যে তখনই আপেল চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে পড়ত বোঁ বোঁ করে ঘুরতে। (আপেল বস্তুটি এখানে ভারী সস্তা, চার আনা থেকে ছ' আনা সের, যেমন সরস, তেমনি সুস্বাদু—ঈষৎ টক্‌-রস-যুক্ত। আমাদের দেশের বাক্সমোড়া আপেলের মতো পান্‌সে নয়, ভারী চমৎকার। আর পাকা 'পিয়ার' যাকে কাবুলি নাস্‌পাতি বলা যেতে পারে, তাও খুব সস্তা, চার আনা সের।) এমনিই তার যা খিদে বেড়ে গিয়েছিল, বলতে নেই, তাতে আবার খিদে করার চেষ্টা দেখে আমরা ঈষৎ ভীতই হয়ে পড়েছিলুম। মানে অত দ্রুত চেঞ্জটা ঠিক স্বাস্থ্যকর কিনা, এই আশঙ্কায়। যাই হোক্—ও সেদিন ঘুরে এসে বললে যে, ও নাকি লাটসাহেবের বাড়ির রাস্তা-ঘাট দেখে এসেছে, প্রায় কাছাকাছি গিয়েছিল, ভারী চমৎকার রাস্তা, ইত্যাদি—

সুতরাং স্থির হ'ল যে আজই যাওয়া হবে, কিন্তু চা প্রভৃতি উদরসাৎ করতে করতেই চারটে পার হয়ে গেল। তাতে আমরা কিন্তু দমলুম না, মহোৎসাহে পাহাড়ে চড়তে শুরু করলুম। এ পথটি তল্লিতাল বাজারের মধ্যে দিয়েই উঠে গিয়েছে, বাজারকে পিছনে রেখে। খাড়া পথ, আস্তে আস্তে এখানকার কোনও পথই ওঠে না, সবই প্রায় এমনি। তবে এ পথটা যেন আরও অভদ্র রকমের খাড়া। অনেক কষ্টে, হাঁপাতে হাঁপাতে, বিশ্রাম করতে করতে উঠতে লাগলুম। পথে পড়ল বড় একটা কলেজ—মেয়েদের আধা-আশ্রম আধা-কলেজ— এবং গির্জে। এ সমস্ত অতিক্রম ক'রে যখন শেষ পর্যন্ত লাটপ্রাসাদের সিংহদ্বারে এসে পৌঁছলুম, তখন আবিষ্কার করলুম—ও হরি, সেদিন "প্রবেশ নিষেধ"!

কিন্তু কী আর করা যায়, বাইরে থেকেই যতটা সম্ভব দেখে আবার ফিরে আসার পথ ধরা গেল। তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে, বড় বড় গাছের ছায়ায় বিশেষ কিছু দেখা যায় না,

তবে এইটুকু বেশ বুঝলুম যে, এই স্থানটিই সমস্ত শহরের মধ্যে একমাত্র সমতল জায়গা এবং এর মধ্যে বড় বাগান, মাঠ, গল্‌ফ্‌ খেলার মাঠ সব আছে। এই রকম খাড়া পাহাড়ের চূড়োয় এতখানি স্থান সমতল করতে, বাগান করতে এবং এতবড় প্রাসাদ গড়ে তুলতে আর তার মধ্যে সমস্ত রকম স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে কত অকারণ অর্থব্যয়ই না হয়েছে, কত লক্ষ মুদ্রা,—এই কথা চিন্তা করতে করতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমরা আবার মন্থর গতিতে চলতে শুরু করলুম। এবার আর পুরনো পথে নয়, মল্লিতাল থেকে যে রাস্তায় লাটসাহেব আগে আসতেন সেই পথ ধরে মল্লিতালে নামতে লাগলুম। এই পথটিই অপেক্ষাকৃত সহজ, এটা ভেঙে যাওয়ায় মোটর আসা বন্ধ হয়েছে বটে কিন্তু পদচারীদের যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। মল্লিতাল থেকে যে পথে আমরা উঠেছিলুম, ওটা এতই খাড়া যে মোটর ওঠা অসম্ভব। কেবল শুনলুম যে, এক পাঞ্জাবী ড্রাইভার ওপথেও একদিন গাড়ি তুলে লাটসাহেবের কাছ থেকে একশো টাকা বকশিশ পেয়েছিল।

অতখানি সফর ক'রে আমাদের পায়ের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আশ্চর্য, মল্লিতাল বাজার পেরিয়ে লেকের ধারে সমতল রাস্তায় পৌঁছতেই অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠলুম। এই সব ঠাণ্ডা পাহাড়ে-হাওয়ার এই একটা আশ্চর্য গুণ, পথ ভাঙতে যত কষ্টই হোক না কেন, একটু বিশ্রাম ক'রে নিলেই আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠা যায়। যাই হোক—লেকের ধারের 'মজ্‌নু' গাছের ছায়াবীথি দিয়ে আসছি (এই গাছগুলি ভারী চমৎকার—এর শাখা-প্রশাখার অগ্রভাগগুলি সব নিম্নমুখী, লেকের ধারে এই গাছগুলিই বেশী। জলের ওপর থেকে ভারী চমৎকার দেখায় একে, যেন কোনও সুন্দরীর সোনালী চুল জল স্পর্শ ক'রে আছে। কে যেন বলেছিল যে একেই weeping willow বলে), এমন সময় তিনটি বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। প্রথমটা বাঙালী দেখেই আনন্দ হচ্ছিল, পরে আবার দেখা গেল তাঁরা পরিচিত। ইন্দুরই জ্ঞাতিভাই একজন, কাশীপুরের ডাক্তার সুশীল দাশগুপ্ত, তাঁর বন্ধু কারমাইকেলের ডাক্তার হেমন্তবাবু, আর একজন সর্বশেষ কিন্তু সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ডাঃ প্রভাত সিংহ। এঁরা সেইদিনই এসেছেন এবং সুশীলবাবু সপরিবারে এসে উঠেছেন হিন্দুস্থান বোর্ডিং-এ। এত উঁচু ও খাড়া তার পথ যে বৌদি একবার কোনওমতে উঠে আর 'পাদমেকং' না যাবার সঙ্কল্প করেছেন,—সত্যিই এঁদেরও প্রাণান্ত। তা'ছাড়া মাথাপিছু চার টাকা ক'রে দিয়েও এঁরা আহারাদির দিক দিয়ে নাকি সন্তোষ পাচ্ছেন না। ব্যাস্‌, তখনই কথা হ'ল যে পরের দিন সকালবেলাই ইন্দু গিয়ে ওঁদের মালপত্রসুদ্ধ আমাদের হোটেলে নিয়ে আসবে।

তাই হ'ল। এতে আমাদের সুবিধে হ'ল খুব—প্রথমতঃ এতগুলি বাঙালী এবং পরিচিত প্রতিবেশী, দ্বিতীয়তঃ প্রভাতদার মতো রসিক লোকের সঙ্গে বাস—আর তৃতীয়তঃ এঁদের আওতায় ও বৌদির কল্যাণে আহারের উত্তম ব্যবস্থা। সুশীলবাবু এতরকম আহার্যের ব্যবস্থা করলেন, ভোজনবিলাসীদের পক্ষে একান্ত উপভোগ্য হলেও নগাধিরাজের রাজ্যে সেগুলি দুর্লভ বলেই ধারণা ছিল। বৌদির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আরও বেরিয়ে পড়ল, তিনি আমাদের বন্ধু এক সাহিত্যিক-শিল্পীর ভগ্নী। অর্থাৎ সুবিধে ষোল আনার ওপর আঠারো আনা।

সেদিনটা এমনি বেড়িয়ে কাটল। পরের দিন আমরা গেটিয়ার দিকে অভিযান করলুম। যাবার পথটি ভাল, কেবলই নিম্নগামী, রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্য দিয়ে যেতে বেশ লাগছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুক শুকিয়ে গেল এই ভেবে যে, এতখানি পথ ভেঙে আবার খাড়া উঠব কি করে! সঙ্গীরা আশ্বাস দিলেন, খেয়েদেয়ে সেই ওবেলা, নয়ত কাল সকালে আস্তে আস্তে ওঠা যাবে'খন। চাই কি যাদের বাড়ি যাচ্ছি তারা একটা ব্যবস্থাও ক'রে দিতে পারবেন। একবার চলো না, দেখবে আর কিছু ভাবতে হবে না।

অবিশ্যি ভাবতেও হ'ল না কিছু, কারণ সেখানে পৌঁছে শোনা গেল যে তাঁরা মীরাটে কোন্ আত্মীয়ের বাড়ি পুজো দেখতে গেছেন, এখনও ফেরেন নি—বাংলোয় তালা দেওয়া!

তৎক্ষণাৎ আবার সেই খাড়া দীর্ঘ পথ। সম্বলের মধ্যে গোটাকতক আপেল নেওয়া হয়েছিল। খানিকটা ক'রে যাই আর বসি, মধ্যে মধ্যে আপেলের স্বাদে সান্ত্বনা খুঁজি—এইভাবে যখন বেলা একটা নাগাদ ফিরে এলুম তখন আর গায়ের ব্যথায় কেউ নড়তে পারছি না।

এর পরের দিন পড়ল রবিবার, সেদিন লাটপ্রাসাদ দেখতে যাবার দিন। বিকেলে সেই উদ্দেশ্যে যাত্রা করা গেল। কিন্তু তার পূর্বে সুশীলবাবু একটি দুষ্কার্য করে গেলেন। এখানে এসে পর্যন্ত ডিম আর মাংস খেয়ে তাঁর বাঙালীর রক্ত বিদ্রোহ করেছিল। তিনি অনেক দুঃখে, অনেক খুঁজে বাজার থেকে পাঁচসিকা সের দিয়ে কিছু রুই মাছ (তার মৃত্যুর তারিখ যে অন্ততঃ দশ-বারো দিন পূর্বে চলে গেছে তা সহজেই অনুমেয়) ও কিছু লেকের টাট্‌কা 'ট্রাউট্' মাছ সংগ্রহ ক'রে চাকরকে দিয়ে বাসায় পাঠিয়ে দিলেন ও সেই সঙ্গে আমাদের শাসিয়ে রাখলেন, 'আপনারা একটু দেরি ক'রে খাবেন, মাছ তৈরী হ'লে তবে।'... কে জানত যে ঐ মাছ তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করবে!

যাই হোক্, মল্লিতালের পথ বেয়ে আমরা তো সন্ধ্যা হচ্ছে-হচ্ছে সময়ে লাটপ্রাসাদে পৌঁছলুম। বেশ মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছি, পাহাড়ের ওপর বিস্তৃত গল্‌ফ্ কোর্ট দেখে মনে মনে 'ঈর্ষিত' হচ্ছি, দূর থেকে কোন্ ঘরটায় দরবার হয় সেই সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে তর্ক করছি, এমন সময় এক অঘটন ঘটল। প্রাসাদের মধ্যে একটা অংশ ছিল নিষিদ্ধ। অত খেয়াল নেই আমাদের, আমরা গল্প করতে করতে সেইদিকে গিয়ে পড়েছি, আর তখন বেশ অন্ধকারও হয়েছে, অকস্মাৎ অত্যন্ত পরুষ এবং বিজাতীয় কণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল—'হুজ দ্যাট্!'... আমরা তো আর নেই! শিবুর অবস্থা আরও কাহিল, সে একেবারে এক লাফে প্রভাতদার পেছনে, আমাদের যে কী হ'ল, তা আর বর্ণনা না করাই ভাল। সুবিধের মধ্যে প্রভাতদা বহুদিন ভারতবর্ষের বাইরে চাকরি করেছেন, এ-সব মিলিটারি ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তিনিও মুহূর্ত-মধ্যে দুই হাত বিস্তারিত ক'রে জবাব দিলেন, 'ফ্রেণ্ডস্।'

দেবতা প্রসন্ন হলেন, আদেশ হ'ল, 'পাস্' অর্থাৎ যেতে পারো।

তখন অন্ধকারই হয়ে এসেছিল, আমরা আর জীবন বিপন্ন না ক'রে ফটকের পথই ধরলুম।

পরের দিন সকালে 'চীনাপিক্'-এ যাবার কথা। কিন্তু ভোরবেলা উঠে শোনা গেল যে

সুশীলবাবুর পেটে কলিক ধরেছে, ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন, প্রভাতদা এবং হেমন্তবাবু দুজনেই ছুটোছুটি করছেন। ভীষণ কাণ্ড! অতএব সেদিনটা স্থগিত রইল, পরের দিনও সুশীলবাবু ও হেমন্তবাবু রয়ে গেলেন, আমরা চারজন আর প্রভাতদা মাত্র যাত্রা করলুম। যাত্রার পূর্বে ইন্দুর তৈরী চা আর হালুয়া খেয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই ভরসায় অতগুলি প্রাণী কোনও রকম জল বা খাবারের ব্যবস্থা না ক'রেই পাহাড়ে উঠতে শুরু করলুম, কারণ শুনেছিলুম পথ মাত্র মাইল তিনেক, কতক্ষণই বা লাগবে!

ও মশাই, তখন কে জানত যে সে ডালভাঙা মাইল!

কাশী থেকে আসবার সময় মিঃ ব্যাস নামক এক বৃদ্ধ জহুরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁর ওখানে বাড়ি আছে, বলে দিয়েছিলেন যে চীনাপিকে ওঠবার ঠিক আধা-পথে তাঁর বাড়ি। দৃশ্য যা-কিছু সেখান থেকেই দেখা যায়, অনেকেই আর উঠতে পারে না, সেইখান থেকেই দেখে। আর বেশী ওঠবার দরকার নেই, দৃশ্য নাকি একই রকম দেখায়, সর্বোচ্চ শৃঙ্গ থেকেও যা, তাঁর বাড়ি থেকেও তাই। তিনি দিন-দুই সেখানে থেকে আলমোড়া যাবেন, আমাদের নিমন্ত্রণও জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু আমরা দু'দিনের মধ্যে যাই নি।

যাই হোক্, খানিকটা ওঠবার পরই আমরা 'ব্যাস-ভিলা' খুঁজছি, কিন্তু কোথায় ব্যাস-ভিলা? একেবারে খাড়া পথ, উঠছে তো উঠছেই—মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তবু ব্যাস-ভিলার দেখা নেই! আটটার সময় পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করেছি, ঠিক দশটার সময় দেখলুম একটি সংকীর্ণ শৃঙ্গের ওপর ব্যাস সাহেবের বাড়ি— ব্যাস-ভিলা! বাড়ি বন্ধ, তালা দেওয়া—হয়ত কোনও দারওয়ান আছে কিন্তু তারও পাত্তা নেই। তবে ভাগ্যিস্ ফটকটা খোলা ছিল, বাগানে অবাধ প্রবেশাধিকার। কারণ ভিলার বাইরে গাছের ফাঁক থেকে তুষাররাশির যা সামান্য আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, তাই আমাদের চঞ্চল ক'রে তুলেছিল। কিন্তু বাগানে ঢুকে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। সে কী দৃশ্য, ইংরাজীতে যাকে বলে 'গ্লোরিয়াস্'। সাদা তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী পরিষ্কার নীল আকাশের কোলে প্রখর সূর্যকিরণে চক্‌চক্ করছে। দার্জিলিং থেকেও দেখা যায় বটে মধ্যে মধ্যে, কিন্তু সে যেন বড় দূর, এখানে মনে হ'ল হাতের কাছে একেবারে! হয়ত দূরত্ব সমানই, তবে আমাদের মনে হ'ল এগুলো খুব কাছে। হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। তা'ছাড়া আকাশ খুব পরিষ্কার না থাকলে দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও এভারেস্ট ছাড়া আর বিশেষ কোনও শৃঙ্গ দেখা যায় না—কিন্তু এ একেবারে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ—বহুদূরবিস্তৃত গিরিশ্রেণী। পরে শুনেছিলুম যে চীনাপিক্ থেকে যতটা পর্যন্ত দেখা যায় তার দৈর্ঘ্য পাঁচশো মাইলেরও বেশী।

বহুক্ষণ পর্যন্ত ব্যাস-ভিলা থেকে আমরা নানাভাবে এ দৃশ্য দেখলুম। ব্যাস-ভিলার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর বাগানে দাঁড়িয়ে ওধারে যেমন তুষার দেখা যায় এধারে তেমনি সমস্ত নৈনীতাল শহরটিও চোখের সামনেই জ্বল্‌জ্বল্ করে। শহরের মধ্যস্থলে নীল সরোবরটি মনে হয় যেন সবুজ ফ্রেমে আঁটা আয়না, তাতে প্রতিফলিত হয়ে সূর্যদেবও স্নেহে ছল্‌ছল্ করতে থাকেন।

আমরা বহুক্ষণ ব্যাস-ভিলায় রইলুম, তারপর আবার উত্থান। আমি ব্যাস সাহেবের

কথা বুঝিয়ে বললুম কিন্তু বলা বাহুল্য যে, ওঁরা কেউই তা বিশ্বাস করলেন না। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমারও মনে হচ্ছিল যে এখানেই এ-হেন দৃশ্য, পিক্-এর ওপর থেকে না জানি আরো কী চমৎকারই দেখায়! কিন্তু উঠতে আর পারি না, আমাদের মধ্যে ইন্দু ছিল যাকে বলে পালক-ভার। সুতরাং ও বেশ অবলীলাক্রমে এগিয়ে যেতে লাগল, এমন কি একটার পর একটা, ওর যতগুলো গান জানা ছিল সবই শেষ করতে লাগল, কিন্তু যত বিপদ আমাদেরই। সমস্ত দেহ বিদ্রোহ করতে থাকে, শ্যামা মেদিনীর আকর্ষণ ক্রমেই প্রবলতর হয়ে ওঠে।

যাই হোক্, আরও বহুক্ষণ ওঠবার পর আর একটি স্থান পাওয়া গেল—যেখান থেকে বেশ ভাল দৃশ্য পাওয়া যায়। এইখানে কতকগুলি কুমায়ূন জেলার লোকের দেখা পাওয়া গেল, তারা বললে এইখান থেকেই সবচেয়ে বেশী তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ নজরে পড়ে, আর না উঠলেও চলে। তারা কতকগুলো পাহাড়ের সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিল—ঠিক সামনেই নাকি নন্দাদেবী পর্বত, আরও অনেক নাম করলে, তা আর আজ মনে নেই।

এখানে খানিকটা জিরিয়ে আবার উঠতে লাগলুম। এবার অবস্থা খুব কাহিল হয়ে পড়েছিল, পিপাসায় বুক অবধি শুক্নো, পেটে আগুন জ্বলছে, পা বিষম ভারী। বললুম, চলুন ফিরে যাই—কিন্তু প্রভাতদা নাছোড়বান্দা। তিনি উঠবেন তো বটেই, আমাদেরও তুলবেন শেষ পর্যন্ত। অবিশ্যি প্রভাতদার জন্য ওঠা সম্ভব হয়েছিল শেষ অবধি, কারণ এমন রসিক লোকের সঙ্গে সুমেরু অভিযানও করা যায়, চীনাপিক্ তো তুচ্ছ! যখনই দেহ অবশ হয়ে আসছে, ঠাণ্ডা কন্‌কনে শুক্নো হাওয়ায় হাড় পর্যন্ত হিম হবার জো, প্রভাতদার অপূর্ব রসিকতা আবার আমাদের চাঙ্গা করে তুলছে। প্রভাতদা ভারতবর্ষের বাইরে বহু স্থান ঘুরেছেন, তারই বিচিত্র ও সরস অভিজ্ঞতা শুনতে শুনতে কোনওমতে চলতে লাগলুম।

কিন্তু শেষের এই পথটুকু আরও খাড়া, একসঙ্গে পঞ্চাশ গজের বেশী ওঠা যায় না—বিশ্রাম না নিয়ে। তার ওপর সঙ্গে কোন পানীয় পর্যন্ত নেই। ফেরবার পথে এক সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি দেখলুম রীতিমত এক ফ্লাস্ক জল নিয়ে উঠেছিলেন—বুঝলুম 'ইহাই নিয়ম'—আমরাই বেকুবী করেছি। আর সবচেয়ে ট্রাজেডি কি জানো? ব্যাস-ভিলা ছাড়বার পরই বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ জমতে আরম্ভ হ'ল ওধারে হিমালয়ের গায়ে, ফলে অনেকগুলি শৃঙ্গই ক্রমে ঢাকা পড়ে গেল। এত দুঃখের পর যখন উঠলুম ওপরে, তখন দেখলুম যে চোখের সামনে আর দেখার মতো বিশেষ কিছুই নেই। ঐজন্যেই হোটেলওয়ালা ভোরে আসতে বলেছিল, এখন বুঝতে পারা গেল।

আর সবচেয়ে অভদ্র এখানের মিউনিসিপ্যালিটি—এইটেই যখন এখানকার বলতে গেলে একমাত্র দ্রষ্টব্য স্থান এবং সবাই আসে, তখন এখানে কি একটা কিছু বিশ্রামের ব্যবস্থা করে রাখা উচিত ছিল না? সে ব্যবস্থা তো নেই-ই, এটা কত উঁচু কিংবা এখান থেকে কোথাকার কোন্ কোন্ শৃঙ্গ দেখা যায়, তার কোনও নির্দেশ পর্যন্ত দেওয়া নেই—যে যা পারো বুঝে নাও! এর সঙ্গে দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির তুলনা করলে বোঝা যায় যে, দুটোর মধ্যে ব্যবস্থার তফাত কত।

ওপরে আমরা অনেকক্ষণ বসে বিশ্রাম করলুম। এদিকে সাবধানে একটু এগিয়ে এলে নৈনীতাল দেখা যায়, ওদিকে আলমোড়া এমন কি রাণীক্ষেত পর্যন্ত। তবে মোট কথা এই বুঝলুম যে—এত কষ্ট ক'রে এত ওপরে না উঠলেও চলত, এর আগে যেখান থেকে আমরা দেখেছি সেইখান দিয়ে দেখে গেলে কিছুমাত্র ঠকতুম না। একেই বলে আশার ছলনা!

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা। ক্লান্ত দেহ, পা আড়ষ্ট, তৃষাতুর কণ্ঠ—তবে কিনা মাধ্যাকর্ষণ প্রবল তাই উঠতে যেখানে চার ঘণ্টা লেগেছিল সেই পথ আমরা অনায়াসে এক ঘণ্টায় নেমে এলুম। তবুও বাসায় যখন ফিরে এলুম তখন বেলা দুটো। স্নান করারও ধৈর্য নেই তখন, কোনওমতে রতন সিংহের প্রস্তুত ডালভাত চারটি খেয়ে একেবারে শয্যাগ্রহণ।

সেইদিন থেকেই বিসর্জনের বাজনা বাজল, সেইদিনই গেলেন হেমন্তবাবু, পরের দিন শিবু আর প্রভাতদা, তার পরের দিন আমরা সবাই। সেই মোটঘাট বাঁধা, দেশের জন্য আপেল কেনা এবং বাস-যাত্রা। স্থানটি আমাদের এমন কিছু আকর্ষণ করতে পারে নি, দার্জিলিং-এর মতো প্রতিনিয়ত স্নেহবন্ধনে জড়িয়ে ধরে নি—কিন্তু তবুও আজ বিদায়ের ক্ষণে একটু মন খারাপ হয়ে গেল বৈকি! তিনদিকের সেই রুক্ষ বন্ধুর পাষাণ-প্রাচীর, আর তার মধ্যের ছলো-ছলো সরোবর,—সবই যেন আজ মনের উপরে ভালোবাসার দাগ টেনে দিল। ক্রমে বাসে চড়ে যখন অবিরত নামতে লাগলুম, বড় বড় পাহাড়গুলিও ক্রমে দূর হতে দূরে সরে যেতে লাগল। চোখের সামনে একটু একটু ক'রে সমতল জমি জেগে উঠে সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিয়ে দিল আবার সেই জীবন-সংগ্রামের কথা, আবার সেই দুশ্চিন্তা, অশান্তি ও সহস্র অভাব। মনে হ'ল যে বেশ ছিলাম নগাধিরাজের শ্রীচরণতলে, তাঁর শীতল আশ্রয়ে এই পৃথিবীর সকল দুঃখ ভুলিয়ে রেখেছিলেন তিনি। শুধু শরীরটাই আমাদের পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বে ওঠে নি, বোধ হয় মনটাও উঠেছিল।

শীতল কোমল শান্তিদায়িনী সে আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হয়ে আবার এসে পড়লুম আমরা উষ্ণ, পঙ্কিল, কোলাহলপূর্ণ ধূলির ধরণীতে—

এক সময়ে চম্‌কে চেয়ে দেখলুম—হলদোয়ানী!

ভারতের সংগ্রাম

উৎসর্গ

শ্রীমতী বর্ষা মিত্র

কল্যাণীয়াসু—

ঝিলমের যুদ্ধ

রাজা আম্ভীর চিন্তিত হবার কারণ ছিল বৈকি।

যবনদের দেশ থেকে যে তরুণ দিগ্বিজয়ী এগিয়ে এসেছেন সহস্র সহস্র ক্রোশ পথ অতিক্রম ক'রে, তাঁকে তো কেউ বাধা দিতে পারল না আজ পর্যন্ত। অমন যে প্রবল-প্রতাপ ইরানের সম্রাট, অসুরদের পরাস্ত ক'রে যাঁর পূর্বপুরুষরা নিজেদের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একদিন, সুদূর শ্বেতদ্বীপ থেকে শুরু ক'রে গান্ধার পর্যন্ত যাঁদের পদানত হয়েছিল—তিনিও তো পারলেন না বাধা দিতে এঁদের!

তবুও আম্ভী ভেবেছিলেন, তাঁর রাজ্যের উত্তরে ও পশ্চিমে যে দুর্ধর্ষ পাহাড়ী জাতিরা আছে, দুর্গম অরণ্যে ও পর্বত-গুহায় যাদের বাস—তাদের সঙ্গে পেরে উঠবেন না সেকেন্দার। কারণ সোজা পথে নিয়মমত যুদ্ধ তারা করে না, তারা অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে বন্যার জলের মতো এসে পড়ে কোনও স্থান থেকে, তারপর কিছুকাল ভীষণভাবে যুদ্ধ ক'রে আবার মিলিয়ে যায় কোথায়। তাদের ধরা যায় না, পিছু পিছু তাড়া করা যায় না—সামনাসামনি যুদ্ধ তো নয়ই। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন, ঘর-সংসার বলতেও কিছু নেই তাদের। কোনওক্রমেই তারা আগন্তুক কোনও জাতি বা সৈন্যবাহিনীকে বিনা বাধায় তাদের দেশ দিয়ে বা তাদের সামনে দিয়ে চলে যেতে দেবে না। সেটা তাদের ক্ষাত্রধর্মের অপমান। আজ অবধি এদের সঙ্গে বড়-একটা কেউ পেরে ওঠে নি। কিন্তু এ কী কাণ্ড! তারাও আজ হার মানল? মাসাগা দুর্গ গেল, ঔর্ণ গেল,—পুষ্কলাবতী, নাইসা বড় বড় আরও কত শহর পদানত হ'ল বিজয়ী বীরের। বলতে গেলে সমগ্র গান্ধারই আজ যবনদের অধীন।

তবে? এখন কী কর্তব্য?

এই প্রশ্নই আম্ভীকে চিন্তিত করেছে আজ। কী করবেন, বাধা দেবেন? ফল কি? আম্ভী তাঁর মন্ত্রণাকক্ষ থেকে বেরিয়ে বাইরের অলিন্দে এসে দাঁড়ান। ঝল্‌মল করছে সমস্ত তক্ষশীলা নগরী তাঁর চোখের সামনে। তক্ষশীলা আজ জগতের গৌরব। পৃথিবীর সুদূরতম প্রান্ত থেকে, কত অপরিচিত অজ্ঞাত দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা আসে তক্ষশীলায় পাঠ নিতে—অষ্টাদশ শাস্ত্র এবং তিন বেদ—এর সর্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র হচ্ছে তক্ষশীলা। শিল্পে-ভাস্কর্যে, ললিতকলায় তক্ষশীলার খ্যাতি সুদূর-প্রসারিত। কাব্যে সাহিত্যে তক্ষশীলাবাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বী নেই কোনও দেশে।

আর ঐশ্বর্য? তক্ষশীলার ঐশ্বর্যই কি কম? তক্ষশীলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বাণিজ্যকেন্দ্র। সেখানকার বিপণিমালা দিনরাত ক্রেতা ও বণিকদের পদশব্দে মুখরিত। কত দূর থেকে পণ্যভার বয়ে নিয়ে আসে স্বার্থবাহরা—পার্বত্যপথ বেয়ে জলের স্রোতের মতো আসে তারা—তাতার থেকে, চীন থেকে—আরও সুদূর উত্তর-পশ্চিমে শ্বেতাঙ্গদের দেশ থেকে। একদিনে নয় দুদিনে নয়, বহু শত বৎসরে এই বিপুল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তক্ষশীলা। তার কোণে কোণে এমনি ক'রেই কুবেরের ঐশ্বর্য জমে উঠেছে।

এই সবকিছু তিনি নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবেন? যবন দস্যুরা দু'হাতে লুঠে নিয়ে যাবে এই সম্পদ? তাও যদি বা সহ্য হয়, শিল্পকলা ও সৌন্দর্যের এই সব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, এর মূল্য কি সেই বর্বররা বুঝবে? ভেঙেচুরে ধ্বংস ক'রে দিয়ে যাবে সব।

না, আম্ভী বাধা দেবেন না। তিনি মনস্থির ক'রে ফেললেন। তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করবেন দিগ্বিজয়ী বীরের সঙ্গে। অভ্যর্থনার আয়োজন ক'রে রাখবেন।

মন্ত্রণাসভায় ফিরে এসে আম্ভী সেই আদেশই দিলেন। মন্ত্রীরা কেউ কেউ ক্ষোভে দুঃখে রক্তবর্ণমুখে মাথা হেঁট ক'রে রইলেন। কেউ কেউ নিঃশব্দে রাজাকে প্রণাম জানিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু তবু আম্ভী তাঁর মত বদলালেন না। সেই দিনই অশ্বারোহী দূত গেল সেকেন্দার শাহের কাছে।...

আম্ভী কি অন্যায় করেছিলেন সেদিন? আজ মনে হয়, না। তিনি ঠিকই করেছিলেন। প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিট্‌লারের বাহিনী যখন পারীর দোরে হানা দেয় তখন ঠিক এই কারণেই ফ্রান্সের শাসনকর্তারা বাধা দেন নি। হিট্‌লারের জয় দুদিনের—তাঁর বাহিনী, তাঁর বীর্য একদিন ছায়াবাজির মতোই আবার মিলিয়ে গেল, পারীও স্বাধীনতা পেল, কিন্তু যে শিল্পবস্তু জগতে দুর্লভ, যা নষ্ট হ'লে কোনওমতেই পাবার উপায় নেই, তা যে চিরকালের। একবার গেলে কি আর আসত?

কিন্তু সেদিন ভারতবর্ষের ক্ষাত্রশক্তি আম্ভীর এই আচরণকে কাপুরুষতা বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তাঁরা ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন খুব। বিশেষ ক'রে তক্ষশীলার দক্ষিণ-পূর্বদেশের পৌরবরা। পৌরবরা খুব প্রাচীন জাতি, বেদে পর্যন্ত এদের উল্লেখ আছে। পরাক্রম, সাহস, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণের জন্য এঁরা বিখ্যাত। তখন পৌরবদের দুজন রাজা, বৃদ্ধ পুরুরাজ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। বৃদ্ধ পুরুরাজের রাজ্য ছিল ঝিলম ও চিনাবের মধ্যেকার ভূখণ্ড আর কনিষ্ঠ পুরুরাজের রাজ্য ছিল চিনাব ও রাভীর মধ্যে বিস্তৃত।

এই বৃদ্ধ পুরুরাজই ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন।

আম্ভীর শোচনীয় কলঙ্কময় আচরণের কাহিনী অন্যান্য রাজসভার মতো পৌরবদের সভায়ও এসে পৌঁছল। বৃদ্ধ পুরুরাজ ক্ষোভে জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'আম্ভী যে কলঙ্ককালিমা লেপে দিলেন আর্য-ভূমির ললাটে, তা আমিই মোচন করব, মন্ত্রীগণ, আপনারা প্রস্তুত হোন।'

বৃদ্ধগোছের মন্ত্রী একজন বললেন, 'দেখুন মহারাজ, শত্রু দুর্ধর্ষ। যারা এতকাল অপরাজেয় বলে জানতুম আমরা, তিনি তাদেরও অনায়াসে জয় করেছেন। সুতরাং সম্মুখ-যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করা খুব সহজ কাজ হবে না। আম্ভী আত্মরক্ষার জন্যই অপমান বেছে নিয়েছেন। আমার অনুরোধ মহারাজ, অন্যান্য দেশের রাজন্যবর্গের কাছে দূত প্রেরণ করুন, বিরাট বাহিনী সজ্জিত ক'রে সমবেত চেষ্টায় শত্রুকে চিরদিনের মতো পরাস্ত করুন।'

পুরুরাজ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'হয়ত আপনি ঠিক বলেছেন কিন্তু তা কোনওদিনই সম্ভব হবে না। আমরা এত দীর্ঘদিন ধরে আত্মকলহে মগ্ন আছি যে আজ বাইরের শত্রুর সামনেও মিলিত হতে পারব না। যদিবা কেউ কোনও বাহিনী পাঠান তো

সে সৈন্যের সঙ্গে আমাদের সৈন্যরা এক হয়ে যুদ্ধ করতে পারবে না। নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুর্বল হয়ে পড়বে। তার চেয়ে অদৃষ্টে যা আছে তাই থাক। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়ার শিক্ষাই আমরা পেয়েছি। পরাধীনতা স্বীকারের কলঙ্ক যেন আমাদের না স্পর্শ করে। আমরা শুধু চেষ্টাই করতে পারি মন্ত্রী, ফল তো ভাগ্যের হাতে!'

একজন সসঙ্কোচে বললেন, 'অন্ততঃ আপনার জ্ঞাতি, তরুণ পুরুরাজকে—'

রাজা সংক্ষেপে বললে, 'না। এ দায়িত্ব ও কর্তব্য সকলকারই। আমি কেন সংবাদ পাঠাব, সে যদি এসে যোগ দিতে চায় তো দিক।'

অবশ্য বৃদ্ধ পুরুরাজের শক্তি-সামর্থ্যও খুব কম ছিল না। ত্রিশ হাজার পদাতিক, চার হাজার অশ্বারোহী, তিনশো রথ এবং দুশো রণহস্তী! তাছাড়া তাদের পরিচালনা করবেন মহারাজা স্বয়ং, যাঁর বীরত্ব ও রণকৌশলের খ্যাতি সারা আর্যাবর্তে বিস্তৃত। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ মহারাজা নিজেও অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ। সুতরাং এ-হেন প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে সেকেন্দারও একটু ভয় পেলেন বৈকি।

সেকেন্দার ঝিলমের যে প্রান্তে এসে নদী পার হবেন ভেবে রেখেছিলেন, তার অপর পারেই পুরুর এই বিশাল বাহিনী অপেক্ষা করছে। এধারে নদীতে তখন প্রবল স্রোত, বর্ষার জল নেমেছে। পার হওয়া এমনিই শক্ত, তার ওপর সামনে তীরন্দাজ বাহিনী। সেকেন্দার বুঝলেন এক্ষেত্রে কৌশল ছাড়া পথ নেই। তিনি পুরোভাগের সৈন্য কিছু কিছু রেখে বাকী সৈন্য নিঃশব্দে পিছন থেকে সরিয়ে ফেললেন এবং কয়েক মাইল উত্তর দিকে উজিয়ে গিয়ে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ স্রোতের কাছে পার হয়ে গেলেন।

এদিকে যারা রইল তারা গ্রীকরাজের নির্দেশক্রমে এমন হাঁকডাক ও কুচকাওয়াজ করতে লাগল যে পুরুরাজ জানতেই পারলেন না অধিকাংশ সৈন্য কখন সরে গেছে। একেবারে যখন গ্রীকরা নদী পার হয়ে পাশে এসে পড়েছে তখন টের পেলেন। তখনই খুব তাড়াতাড়ি কোনওমতে সৈন্যসজ্জা ঠিক ক'রে নিয়ে প্রস্তুত হলেন বটে কিন্তু একটি প্রকাণ্ড ভুল ক'রে বসলেন নিজে এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ না ক'রে। সেকেন্দারের সুশিক্ষিত তীরন্দাজ অশ্বারোহীরা প্রচণ্ড বেগে পাশ থেকে আক্রমণ করল হিন্দু সৈন্যদের, সে আক্রমণের বেগ এরা সহ্য করতে পারল না। জলে ও কাদায় মাঠ এত পিছল হয়ে গিয়েছিল যে পদাতিকেরা ঠিক হয়ে দাঁড়াতেই পারছিল না। অথচ দীর্ঘদিন নানাস্থানে যুদ্ধ ক'রে ক'রে গ্রীকরা কী মরুভূমিতে, কী বিঘ্নসঙ্কুল পার্বত্যভূমিতে—সর্বত্রই ওরা সমান অভ্যস্ত। ওদের ঘোড়াগুলিও তেমনি সুশিক্ষিত। তবু যতক্ষণ পারলে প্রাণপণে হিন্দুরা যুদ্ধ ক'রে যেতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাতিরা বিপদ বাধালে। প্রথম প্রথম গ্রীকসৈন্যদের মাড়িয়ে পিষে বিপর্যস্ত করলেও কিছুক্ষণ গ্রীকদের চোখা চোখা তীর খাবার পর তারা পিছন ফিরে পালাতে চেষ্টা করল, ফলে পুরুর সৈন্যরাই পিষ্ট হ'ল বেশী। এইবার তাদের মন ভেঙে গেল। দিন শেষ হবার আগেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে চেষ্টা করল এবং দলে দলে গ্রীক সৈন্যদের হাতে প্রাণ হারাতে লাগল।

কিন্তু পুরুরাজ নিজে পালালেন না। একা যতটা পারলেন ভীমবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে

যেতে লাগলেন। অবশেষে যখন অসংখ্য তীর ও বর্শায় তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, তখন অবিরাম রক্তক্ষরণে তিনি ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়লেন। গ্রীক সৈন্যরা তাঁর সেই অর্ধ-মূর্ছিত দেহ বন্দী ক'রে নিজেদের রাজার কাছে নিয়ে গেল।

সেকেন্দার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর বীরত্বে মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। বিশেষ ক'রে বন্দী অবস্থায় তিনি যেভাবে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ালেন ওঁর সামনে এসে, তাতে শ্রদ্ধাও হ'ল যেমন, তেমনি কৌতূহলও হ'ল তাঁর মানুষটির অন্তরের পরিচয় জানতে।

তিনি কিছুকাল নীরবে পর্বতসদৃশ এই বিরাট পুরুষটির দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'আমি আপনার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করব আপনি আশা করেন?'

দোভাষী প্রশ্নটা বুঝিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সহজ সরল উত্তর এল, 'কেন, রাজার সঙ্গে আর একজন রাজা যেমন ব্যবহার করে!'

কণ্ঠস্বরে তাঁর দম্ভ নেই, স্পর্ধা নেই। আছে আত্মবিশ্বাসের জ্যোতি। মৃত্যুকে যে একান্তভাবে উপেক্ষা করতে পারে, এ কণ্ঠস্বর তাকেই সাজে।

সেকেন্দার সিংহাসন থেকে নেমে এসে আহত বন্দীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর নিজে সসম্মানে তাঁকে ধরে এনে নিজেরই আসনের একাংশে বসিয়ে দিয়ে বললেন—'এত করেও আপনাকে জয় করতে পারলুম না মহারাজ। আমিই আজ বিজিত।'

কলিঙ্গযুদ্ধ

বিন্দুসারের অতবড় সাম্রাজ্য পেয়েও অশোক যে আবার রাজ্য-জয়ে বেরোবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ তখনকার দিনে ক্ষত্রিয় রাজাদের নতুন রাজ্য জয় করাটা কীর্তির মধ্যে গণ্য হ'ত এবং যে সব রাজার দ্বারা রাজ্য-বৃদ্ধি সম্ভব হ'ত না, ইতিহাসে তাঁরা অক্ষম অনুপযুক্ত বলে গণ্য হতেন।

অশোককে অবশ্য খুব বড় যুদ্ধ কিছু করতে হয় নি কোথাও—এক কলিঙ্গ ছাড়া। কারণ মগধের তখন এমনই প্রতাপ, চন্দ্রগুপ্ত বিন্দুসারের বীর্যের এমনই খ্যাতি যে তার বিজয়ী বাহিনীকে বাধা দেবার মতো ধৃষ্টতা বড়-একটা কারুরই ছিল না। কাম্বোজ, গান্ধার (এমন কি বর্তমান গিলগিট হুন্‌জা প্রভৃতি প্রদেশও ছাড়িয়ে কাশ্মীরের পশ্চিম-উত্তরে বহুদূর সিরিয়ার প্রান্তসীমা পর্যন্ত) থেকে শুরু ক'রে কৃষ্ণা নদী ও উত্তর মহীশূর অবধি; আর ওধারে সৌরাষ্ট্র গির্ণার থেকে ধৌলি, জৌগড় অবধি; উত্তর পূর্বে বর্তমান নেপাল পুণ্ড্র-বর্ধন ও দক্ষিণ-পূর্বে সমতট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। শুধু বাকি ছিল কলিঙ্গ।

এই কলিঙ্গকে নিয়েই যত গোলমাল। ইতিপূর্বে অশোকের পূর্বপুরুষরাও বারবার এখানে ঘা খেয়েছেন। জাতটা এমনই স্বাধীনতাপ্রিয় যে সর্বস্ব খোয়াবে তবু স্বাধীনতা দেবে না।... অশোকেরও বহু শতাব্দী পরে অন্যান্য নরপতিরা এমন কি মুসলমান রাজারাও এই কলিঙ্গ বা উড়িষ্যা নিয়ে বিব্রত হয়েছেন।

সে কথা যাক্—কিন্তু অশোকের এটা অশোভন স্পর্ধা বলে বোধ হ'ল। এদের এত ধৃষ্টতা যে মগধের সম্রাটকেও অবহেলা করে? এ অসহ্য। তা ছাড়া মানচিত্রের দিকে চাইলে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐ অংশটুকুকে ভগ্নাংশ বলে বোধ হ'ত। তাঁর দৃষ্টিকে আহত করত ওটা, দৃষ্টিকটু বলে বোধ হ'ত। এইটুকু পেলেই সমুদ্রতীরটা বরাবর অবারিত থাকে।

সুতরাং ওটুকু তাঁর চাই-ই।

এই চাওয়াকে সেদিন কেউ অন্যায় লোভ বা লালসা বলে মনে করে নি, বিনাদোষে অপরের স্বাধীনতা-হরণকেও কেউ অধর্ম বা পাপ ভাবে নি। বরং সকলে সেদিন সম্রাট অশোকের জয়ধ্বনি করে উঠেছিল। এই তো চাই, এই তো যথার্থ ক্ষত্রিয়ের কাজ! এই তো মৌর্য বংশের উপযুক্ত!

কিন্তু কলিঙ্গ সহজে সে অধীনতা মেনে নিতে রাজী হ'ল না। বৈতরণী থেকে মহেন্দ্র-পর্বত পর্যন্ত সমগ্র দেশের সমস্ত শক্তি একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হ'ল পাটলিপুত্রের বিপুল বাহিনীকে বাধা দিতে। জয়ের আশা নেই, সে তারা জানে। কোথায় আসমুদ্র হিমাচল-বিস্তৃত মগধের শক্তি আর কোথায় ক্ষুদ্রকায় কলিঙ্গের শক্তি। তবু তারা বাধা দেবে, মানুষের মরবার অধিকার তো আর কেউ কেড়ে নিতে পারে না। তাঁরা মরবে কিন্তু মর্যাদা হারাবে না।

ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। একদিন নয়—বহুদিন ধরে।

যেদিন যারা যুদ্ধযাত্রা করে তারা আর ফেরে না। তবুও আসে বার বার। অশোক অবাক হয়ে যান এদের বীরত্ব দেখে। তাঁর সুশিক্ষিত সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্রও নতুন—আর এদের সেই মান্ধাতার আমলের অস্ত্রশস্ত্র! তবু যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ পিছু হঠতে জানে না। অস্ত্রের অভাবে কাঠের বর্শা বল্লম ক'রে নিয়েছে অনেকে। তাই নিয়েই তারা লড়ে মগধের ঐ অপরাজেয় বাহিনীর সঙ্গে। এ কী সাহস! অশোক একদিন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রণহস্তী চালিয়ে দিলেন—হাতি মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল অনেককে, তবু বাকীরা নড়ল না, পালাল না। বরং ওদের বর্শার আঘাতে অনেক হাতি অস্থির হয়ে ফিরে এসে এদের বিপর্যস্ত করল।

তিল তিল ক'রে এগোতে হ'ল অশোককে, রক্ত-পিছল পথ ধরে। তোষালি ধ্বংস হয়ে গেল, কলিঙ্গের বহু গৌরবের চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেল। যতক্ষণ একটিও সক্ষমদেহ পুরুষ রইল কলিঙ্গে ততক্ষণ ওরা যুদ্ধ বন্ধ করলে না। অবশেষে কলিঙ্গের শ্মশান অধিকার করলেন অশোক।

অশোক কিন্তু সুখী হতে পারলেন না। কিছুদিন ধরেই একটা প্রশ্ন জাগে তাঁর মনে—কেন, কেন এই অকারণ নরহত্যা? এত রক্তস্রোত বওয়াবার কী প্রয়োজন? কী এমন বেশী লাভ হ'ল তাঁর কলিঙ্গ পেয়ে? না পেলে কী এমন ক্ষতি হচ্ছিল?

অশোক চারিদিকের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। তাঁর চোখের সামনে ভাসে অসংখ্য আহতের যন্ত্রণাবিকৃত দেহ, কানে আসে তাদের আর্তনাদ। উভয় পক্ষেই লোক মরেছে সংখ্যা-গণনার অতীত সংখ্যায়। এদের মৃত্যুর জন্যে কি তিনি দায়ী নন? এদের তো কোনও ব্যক্তিগত ক্রোধ কি কোনও আক্রোশ ছিল না পরস্পরের প্রতি—তবে?

শেষ যেদিন যুদ্ধ হ'ল সেদিন বহু রাত্রি পর্যন্ত অশোক একা রণস্থলে ঘুরে বেড়ালেন। মৃত ও আহতদের স্তূপ। যারা মৃত্যুযন্ত্রণায় চিৎকার করছে তাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রুষা পেলে বাঁচত। কিন্তু কে করবে তা, তার কোনও আয়োজনই নেই! এমনি যন্ত্রণা পেয়ে পেয়েই হয়ত মরবে দুই তিন বা বহুদিনে। কিংবা শিয়াল-কুকুরে খাবে।

চাঁদের ক্ষীণ আলোতেই তাঁর নজরে পড়ল একটি আহত যেন কী বলতে চাইছে তাঁকে। হেঁট হয়ে শুনলেন, সে চাইছে একটু জল।

সম্রাট নিজেই ছুটলেন ব্যস্ত হয়ে। বহু খুঁজেপেতে জল নিয়ে এলেন যখন তখন সে আর বেঁচে নেই। অনন্ত পিপাসা বুকে নিয়েই সে অপরলোকে যাত্রা করেছে।

বহুক্ষণ—একপ্রহর প্রায় সেই যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত ও মৃত-প্রায় দেহের মধ্যে চুপ ক'রে বসে রইলেন অশোক। অবশেষে শিবির থেকে খুঁজতে খুঁজতে অমাত্যেরা সেখানে এসে পড়তে তাঁর চমক ভাঙল।

'একি সম্রাট্, আপনি এখানে! আমরা যে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে পড়লুম! চারিদিকে বিজয়-উৎসব চলেছে, তার মধ্যে আপনি এখানে কেন? রাজভৃত্যরা কোথায়?'

'উৎসব বন্ধ করতে বলো অমাত্য। উৎসবের ভয়েই এখানে পালিয়ে এসেছি।'

'সেকি সম্রাট্, আপনার দিগ্বিজয় যাত্রা সার্থক হ'ল—আজ যে বড় আনন্দের দিন!' আর একজন অমাত্য বলে উঠলেন, 'সার্থক হ'ল কি বলছেন মহামাত্য, দিগ্বিজয় যাত্রা যে সবে শুরু—'

অশোক গম্ভীর ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, 'তুমিই ঠিক বলেছ, দিগ্বিজয় যাত্রা আজ থেকে সবে শুরু। তবে এ দিগ্বিজয় আর না—আজ থেকে আমার নব অভিযান ধর্মের পথে, অহিংসার পথে। লোহার অস্ত্র চিরতরে ত্যাগ করলাম, প্রীতির অস্ত্রে মঙ্গল-ইচ্ছার বর্মে সজ্জিত হয়ে পৃথিবী জয়ে বার হব। বিদ্বেষ, অকারণ নরহত্যা একেবারেই অনর্থক, আজ বুঝলুম। কলিঙ্গ অভিযান আমার এই উপলব্ধিতেই সার্থক হয়েছে।'

হূণযুদ্ধ

গুপ্তবংশের গৌরবরবি তখন অস্তাচলে যেতে বসেছেন। মহেন্দ্রাদিত্যের বিশাল সাম্রাজ্যের কাঠামোটা আছে কিন্তু ভিতরটা ঘুণধরা কাঠের মতোই ফাঁপা। মধ্য ভারতের পুষ্যমিত্ররা প্রবল হয়ে উঠে সাম্রাজ্যের অন্তরে ঘা দিচ্ছে। এমন সময়ে উত্তর-পশ্চিমের আকাশ-প্রান্তে আবার ও কী মেঘ ঘনিয়ে এল?

শ্বেত হূণ!

অদ্ভুত এই জাত। যেমন সাহসী, তেমনি রণনিপুণ কিন্তু তেমনি কি নিষ্ঠুর! অকারণে নরহত্যা ক'রে এদের আনন্দ, সুষুপ্ত গ্রাম চারিদিক থেকে বেড়া আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে এদের

উল্লাস। মায়ের কোল থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তরবারির ডগায় তাকে লুফে নেওয়া—এ তো খেলাই!

দুর্ধর্ষ এই জাত মধ্য এশিয়ার কোনও এক উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে বেরিয়ে তখনকার দিনের পরিচিত ও সভ্য জগতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওদিকে সুপ্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য কেঁপে উঠল ওদের সে পদভরে—অচিরে শ্মশানে পরিণত হ'ল। আর এদিকে ভারত!

কিন্তু তখনও গুপ্তদের কিছু বীর্য অবশিষ্ট ছিল। কুমার স্কন্দগুপ্ত বিপুল বিক্রমে সে আক্রমণ প্রতিরোধ করলেন। এমন শিক্ষা দিলেন এই বর্বরদের যে বহুদিন তারা আর মাথা তুলতে পারে নি। স্কন্দগুপ্ত যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন মধ্যে মধ্যে পশ্চিমদ্বারে হানা দিলেও ভারতের মাটিতে চেপে বসতে পারে নি তারা।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই গুপ্তসম্রাটেরা যেন একেবারে দুর্বল হয়ে পড়লেন। আর কে বাধা দেবে এই প্রবল ও দুর্বার দস্যুদের! হূণদের দল সুজলা সুফলা ভারতের বুকে বহুদূর পর্যন্ত চিতাভস্মের রেখা এঁকে দিয়ে এগিয়ে এল। তোরমান ও তার ছেলে মিহিরকুলের অপরিসীম বিক্রম, কে তাদের সামনে দাঁড়াবে? ভারতের ছোট ছোট রাজারা সকলেই একে একে মাথা নোয়ালে এই রণকুশলী দস্যু সম্রাটের সামনে। বর্তমান পাঞ্জাব, কাশ্মীর, রাজস্থান আচ্ছন্ন করে উত্তর মালব পর্যন্ত এগিয়ে এল এদের দল। মনে হ'ল বুঝি ভারতের আর কল্যাণ নেই। সারা ভারতকে মহাশ্মশানে পরিণত করাই বুঝি ঈশ্বরের অভিপ্রায়।

কিন্তু ছোট বড় কোন রাজা যা পারেন নি, স্বয়ং গুপ্তসম্রাটরা যা পারেন নি তাই সম্ভব করলেন সামান্য এক ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের আরও সামান্য এক নরপতি।

দশপুরের রাজা যশোধর্মন।

অজ্ঞাত অখ্যাত এই লোকটি, কোনও ইতিহাস কোথাও এর পূর্বপুরুষের পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রেখে যায় নি। ছোট দেশের ছোট রাজা, কোথায় বা তেমন সম্পদ কোথায় বা জনবল যে বিপুল শক্তি সংগ্রহ করবে? অদৃষ্ট এই লোকটিকে সম্পূর্ণ অবহেলাই করেছিলেন যেন—কিন্তু লোকটির পুরুষকার শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টকে বিদ্রূপ ক'রে সম্রাটের সিংহাসনে নিয়ে গিয়ে বসাল।

হূণদের অত্যাচারের কাহিনী বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। লোকপরম্পরায় প্রায়ই সে সংবাদ এসে পৌঁছয়। উত্তর ভারতে দাবাগ্নি জ্বলেছে, সে আগুন ক্রমশ এদিকেই এগিয়ে আসছে। সকলেই ভয়ে দিশাহারা। শুধু ভয় নেই দশপুরের রাজার মনে। বরং দূর ভারতখণ্ডের সে আগুন যেন তাঁর দৃষ্টিতেই প্রতিফলিত হচ্ছে, শাণিত খড়্গো যেমন সূর্যের কিরণ ঝল্সে ওঠে।

তিনি আস্ফালন করেন নি। তিনি দম্ভ প্রকাশ করেন নি। তিনি শুধু নিঃশব্দে প্রাণপণে সমরসজ্জা ক'রে গেছেন। যেটুকু সাধ্য তারও বেশি ক'রে করেছেন সে আয়োজন। লোক ও অস্ত্র সংগ্রহ—এই ছিল সেদিন তাঁর সাধনা।

ক্রমশ এমন সময় এগিয়ে এল যখন আর ধৈর্য ধারণ করা যায় না। উৎপীড়িতের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ভরে উঠল। যশোধর্মন যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন।

দশপুরের নৃপতির চিঠি নিয়ে বিভিন্ন রাজসভায় দূত গেল।

সে লিপিতে এই কথাই ছিল যে, এই দুর্ধর্ষ বিদেশী শত্রুকে জয় করতে পারেন ভারতে আজ এমন কোনও একক রাজশক্তি নেই। সুতরাং আপনাদের সমস্ত শক্তিকে সংহত করতে হবে, নইলে সবারই মৃত্যু। দশপুরের রাজা সজ্জিত হয়েছেন, আসুন আপনারা সকলে এগিয়ে, নইলে আপনাদের সর্বনাশ অনিবার্য।

প্রথম সাড়া দিলেন গুপ্তসম্রাট বালাদিত্য। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে নিজেই এগিয়ে এলেন যশোধর্মনের সঙ্গে মিলিত হতে। ছোট বড় আরও অনেকে তারপর এলেন। ভারতের ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত খুব দুর্লভ—যখন মহৎ সর্বনাশের সামনে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈর্ষা ভেদ-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে মিলিত হয়েছেন সবাই এমনি ক'রে। কিন্তু যশোধর্মনের ব্যক্তিত্ব সেই অসম্ভবই সম্ভব করেছিল।

তবু তখনও মিহিরকুল হেসেছিলেন।

দুর্বল পঙ্গু জরাগ্রস্ত গুপ্তবিক্রম আর কোথাকার কে এক যশোধর্মনের বাহিনী আসছে তাঁকে পরাস্ত করতে! মিহিরকুলকে? যার মাথা আজ অবধি কোনও মানুষের সামনে নত হয় নি?

তিনি খুব হাসলেন একচোট, প্রাণ খুলে।

কিন্তু সে হাসি মিলিয়ে যেতেও বিলম্ব হ'ল না। দেখা গেল এতকাল যশোধর্মন বসে বসে বিশ্রাম করেন নি, গোপনে লোক পাঠিয়ে হূণদের সমরপদ্ধতির মূল কৌশলগুলি জেনেছেন—তাদেরই মন্ত্রে তাদের জব্দ করলেন।

সেদিন মিহিরকুল যা বিস্মিত হয়েছিলেন তেমন বিস্ময় জীবনে কোনওদিন ভোগ করেন নি। ভারতীয় সৈন্যরা প্রথম একদল এল যুদ্ধ করতে সামনাসামনি। অল্প কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পরই কোথা থেকে যেন মনে হ'ল অসংখ্য সেনা লাফিয়ে পড়ল তাঁর বাহিনীর উপর। আর কি প্রচণ্ড তাদের গতিবেগ! প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের মতো এক নিমেষে নির্মম নিষ্ঠুর ভাবে ওরা শত্রুসৈন্য মথিত ক'রে যেন বহুদূর চলে গেল। মিহিরকুলের ভরসা ছিল আগুনের মশাল নিক্ষেপ করা যন্ত্রগুলির ওপর। এখন দেখলেন ভারতবাসীরাও তার সন্ধান রাখে। কোথা থেকে অসংখ্য জ্বলন্ত মশাল এসে পড়তে লাগল বৃষ্টির মতো। সে আগুনে সবাই সন্ত্রস্ত ও হতচকিত হয়ে উঠল। চতুর্দিকেই আগুন, আগুনে যেন ধাঁধা লেগে গেল। মিহিরকুলের সৈন্যরা আর পারলে না নিজেদের ব্যূহ ঠিক রাখতে, দেখতে দেখতে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

প্রথম জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল। তাহ'লে তো এরা অপরাজেয় নয়! প্রচণ্ড বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভারতের সৈন্য হূণদের ওপর, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল হূণদের এতকালের বীর্য-গরিমা।

বার বার বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মিহিরকুল মাথা নত করলেন। যশোধর্মনের সিংহাসন-প্রান্তে নিজের হৈমমুকুট নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে মাথা হেঁট ক'রে এসে দাঁড়ালেন।

দয়া করো, ক্ষান্ত দাও—এই তাঁর প্রার্থনা।

এমনি ক'রে একটি মানুষের পুরুষকার প্রবল শত্রুকেও পরাস্ত করে তাঁর যশোগৌরব ও শক্তি সৌরাষ্ট্র থেকে ব্রহ্মপুত্রের তটভূমি এবং হিমাচল থেকে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল। সকলে বলে উঠেছিল সম্রাট যশোধর্মনের জয়!

হূণদের আর কখনও মাথা তুলতে হয় নি।

সিন্ধুযুদ্ধ

হজরম মহম্মদের মৃত্যুর পর আরবরা যেন নতুন প্রাণের প্রেরণা পেল, সে প্রাণশক্তি ওদের বিজয়-পতাকাকে টেনে নিয়ে গেল বহুদূর। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকেই আমরা দেখতে পাই ওদিকে স্পেন থেকে শুরু ক'রে কাবুল উপত্যকার প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়ছে। কাবুলে তখন কনিষ্কের বংশধররা রাজত্ব করেন, তাঁরা প্রাণপণে সে দুর্বার বেগ রোধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এধারে বোম্বাইয়ের থানায়, ব্রোচে এবং দক্ষিণ আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের কোনও কোনও অংশে ইতিমধ্যেই আরবের বাহিনী এসে পৌঁচেছে।

ইরাকে তখন অল্ হজ্জাজ খলিফার প্রতিনিধি-রূপে শাসন করছেন। অল্ হজ্জাজের বহুদিন থেকেই নজর ছিল পশ্চিম ভারতের স্বর্ণপ্রসূ দেশগুলির উপর। মরুভূমির সন্তান ওরা, ওদের ওষ্ঠ পিপাসায় সর্বদাই শুষ্ক। সুজলা সুফলা এই দেশ তখন ওদের কাছে বিস্ময় বৈকি!

অল হজ্জাজ এবার স্থির করলেন বেলুচিস্তান থেকে এগোতে হবে ধীরে ধীরে। তিনি শুধু একটা ছুতোর অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশ্য দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না কোনওদিনই—সে ছুতোও শীঘ্রই পাওয়া গেল।

দেবল উপসাগরের কয়েকজন জলদস্যু বুঝি আরবদের একটা জাহাজ লুঠ করেছিল। এমন ঘটনা তখন হামেশাই ঘটত—তারপরও বহুকাল ঘটেছে। জোর যার মুলুক তার—এই ছিল তখনকার মন্ত্র। তাছাড়া জলদস্যুরা তো স্বাধীন, তারা কাউকে মানত না। প্রাণ দেওয়া ও নেওয়া ছিল তাদের কাছে ছেলেখেলা।

যাই হোক্—এই ঘটনার পরই অল হজ্জাজ চোখ রাঙিয়ে সিন্ধুর ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরের কাছে চিঠি দিলেন, এর ক্ষতিপূরণ করা হোক্, জলদস্যুদের বন্দী ক'রে আরবদের হাতে সমর্পণ করা হোক্ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা হোক্।

দাহির বিস্মিত হলেন। এ আবার কী অদ্ভুত দাবী! বা রে বা! জলদস্যু কি তাঁর অনুমতি নিয়ে দস্যুতা করে, না তারা তাঁর প্রজা? তিনি সবিনয়ে জানালেন যে, আরবদের যদি ক্ষতি হয়ে থাকে তো তিনি বিশেষ দুঃখিত। তবে জলদস্যুদের উপর তাঁর কোনও হাত নেই। তারা তাঁর প্রজাও নয়, তাঁর ইচ্ছাতেও চলে না। তিনিই শাস্তি দিতে উৎসুক কিন্তু আপাততঃ তাদের ধরবার কোনও সম্ভাবনা নেই।

অল হজ্জাজ ঠিক এইটিই চাইছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উদ্ধত কাফির (বিধর্মী) রাজাকে তার ধৃষ্টতার শাস্তি দেবার আয়োজন শুরু ক'রে দিলেন এবং অবিলম্বে এক বিপুল বাহিনী পাঠালেন দাহিরকে শায়েস্তা করার জন্য।

কিন্তু ব্রাহ্মণ হ'লেও দাহিরের ক্ষাত্রবীর্য কম ছিল না। তিনিও দুর্বল হস্তে অসিধারণ করেন নি। প্রচণ্ড ও সর্বনাশা এক যুদ্ধে আরবের বাহিনী পরাভূত হয়ে ফিরে গেল।

এরকম একবার নয়—আরও কয়েকবার। যারা আসে তারা অনেকেই আর ফিরে যায় না। সামান্য কয়েকজন ভগ্নদূত ফিরে গিয়ে সংবাদ দেয় যে ভারতের ধনী, বিলাসী ও আরামপ্রিয় রাজার হাতে আবারও তাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। দুর্ধর্ষ দুর্মদ মুসলমান সৈন্যদল পরাজিত ও নিহত হয়েছে মুষ্টিমেয় কাফির সৈন্যের হাতে, এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হতে পারে!

বারবার এই ঘটনা ঘটাতে অল্ হজ্জাজ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আরব মুসলমানদের বিজয়-গর্বের ইতিহাস এতদিন পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে রচিত হচ্ছিল। এবার কি সে ইতিহাস থেমে যাবে?

তিনি বুঝলেন যে যেমন তেমন ক'রে এ কাজ করা আর চলবে না। তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হবে।

তিনি ডেকে পাঠালেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা—মহম্মদ-বিন-কাশিমকে। বয়সে তরুণ হ'লেও সে বুদ্ধিতে পাকা। চতুর, সতর্ক, রণকুশলী এবং উচ্চাভিলাষী—যদি পারে তো একমাত্র সে-ই পারবে!

মহম্মদ-বিন-কাশিমকে সেনাপতি ক'রে তিনি তাঁর সবচেয়ে বিশ্বাসী ও বাছাবাছা সেনানায়ক দিলেন ওঁর অধীনে। সৈন্য আর জাহাজেরও ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। স্থির হ'ল একদল সৈন্য যাবে জলপথে, আর একদল যাবে বেলুচিস্তানের পথ ধরে। এবারে আর কোনও ত্রুটি না থাকে। অল হজ্জাজের শুধু নয়, ইসলামের মর্যাদা নির্ভর করছে এই যুদ্ধ-জয়ের উপর।

যথাসময়ে বিন-কাশিম দাহিরের রাজ্যসীমায় এসে উপস্থিত হলেন। দেবল, নেরুন প্রভৃতি শহর অধিকার ও ধ্বংস ক'রে সিন্ধুর পশ্চিম তীর বেয়ে এগিয়ে এলেন একেবারে রাজধানীর কাছাকাছি।

অবশ্য দাহিরও চুপ ক'রে ছিলেন না। তিনি শত্রুপক্ষের সব সংবাদই পেয়েছিলেন। বুঝেছিলেন যে চরম বিপদের সম্মুখীন হতে হবে এবার তাঁকে। সেইমত আয়োজনও ছিল।

শুধু তিনি বুঝতে পারেন নি যে অত সহজে এবং অত শীঘ্র শত্রু এই বিশাল ও বিস্তৃত সিন্ধুনদ পার হতে পারবে।

সুচতুর মহম্মদ-বিন-কাশিমও তা জানতেন। সেইজন্য তিনি সবটাই বরাতের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেন না। তিনি গোপনে গোপনে খোঁজ করতে লাগলেন জনকতক বিশ্বাসঘাতকের, যারা সামান্য কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তাদের স্বদেশ ও স্বজাতিকে শত্রুর পদানত ক'রে দেবে। সে রকম লোকের কোনও দেশে এবং কোনও

কালেই অভাব হয় না। এক্ষেত্রেও হ'ল না। কয়েকটি বিশ্বাসঘাতক রাজকর্মচারী এবং কদাচারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এসে মিলিত হ'ল আরবের শিবিরে। চক্রান্তের পর চক্রান্ত চলল। অবশেষে একেবারে অতর্কিতে ও অপ্রত্যাশিত দিক থেকে সিন্ধু পার হয়ে আরব বাহিনী এসে পড়ল এপারে।

তবুও দাহিরের মন ভাঙল না। অত্যল্প সময়ের মধ্যে যতটা পারলেন নিজের সৈন্য ঠিক ক'রে নিলেন। যুদ্ধ তো করতেই হবে, বিলাপ ক'রে লাভ কি?

বর্তমান রাওরের কাছে এক মাঠে উভয় পক্ষের সৈন্য এসে দাঁড়াল সামনাসামনি। প্রবল যুদ্ধ চলল সারাদিন ধরে। মনে হ'ল বুঝি এযাত্রাও দাহির জিতবেন, কারণ দ্বিপ্রহর পর্যন্ত হিন্দুরা এক পা-ও পিছোয় নি; আরবের সমস্ত শক্তিকে তুচ্ছ ক'রে নিজেদের ব্যূহে অচঞ্চল ছিল।

সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বারে বারে মুসলমানদের আক্রমণ এক এক প্রবল ধাক্কায় এসে ঘা দেয় এদের। এই কৌশলেই আরবরা অন্যত্র বিজয়ী হয়েছে। এক দল যুদ্ধ করে আর একদল প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করে। এদের দুর্বল বা ক্লান্ত মুহূর্তে অকস্মাৎ এক প্রবল আঘাত হানবার জন্য এসে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু-দাহির এতকাল এদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে এসব কৌশল জানতেন, তিনিও একদল সৈন্য রেখেছিলেন বাঁচিয়ে, যারা সেই সব সময়ে ঐ অতর্কিত আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসবে। তাই বিন-কাশিমের সমস্ত কৌশলই ব্যর্থ হচ্ছিল বার বার।

কিন্তু দৈব বিরূপ। ভারতের ভাগ্যাকাশে তখন ইসলামেরই গ্রহ প্রসন্ন।

অকস্মাৎ একটি তীর এসে বিঁধল দাহিরের চোখে। দাহির যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়লেন। প্রভুকে অবসন্ন দেখে নিরাপদ স্থানে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম দেবার উদ্দেশ্যে মাহুত হাতির মুখ ফেরালো। ব্যস্, দাহিরের সৈন্যরা ভাবল দাহির মারা গেছেন, তাঁর মৃতদেহ নিয়ে মাহুত পালাচ্ছে!

আজ আর তবে বুঝি আরবদের হাতে কারুর রক্ষা নেই! সঙ্গে সঙ্গে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল—পালাও, পালাও, যে যেখানে পারো! এখনও হয়ত প্রাণটা বাঁচতে পারে!

দাহিরের জ্ঞান ফিরে আসামাত্র তিনি বিপদটা বুঝতে পারলেন। তখন সেই অবস্থাতেই তিনি আবার যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছলেন; সেনাপতিরা প্রাণপণে ডাক দিতে লাগল ভীত হতচকিত সৈন্যদের। কেউ কেউ ফিরলও, কিন্তু আগের সে বিক্রম, সে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি আর রইল না।

আরবরাও এই সুযোগে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল এদের ওপর। হাজারে হাজারে নিহত হ'ল, আহতদের আর্তনাদে আকাশ বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠল। অবশেষে সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে দাহিরও যখন নিহত হলেন, তখন আর হিন্দুদের কোনও আশা রইল না—তারা একেবারেই ভেঙে পড়লো।

কিন্তু তবুও তখনই বিন-কাশিম রাওর দুর্গ অধিকার করতে পারলেন না। দাহিরের মহিষী ছিলেন পুরুষসিংহের উপযুক্ত সিংহী। তিনি সদ্য-বৈধব্য-বেদনা ভুলে, স্বামীর শোক ভুলে নিজে দুর্গরক্ষায় মন দিলেন।

তবে মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে তিনি কতক্ষণ যুঝবেন ঐ দুর্ধর্ষ বিজয়ী সৈন্যদের সঙ্গে? জয়ের একটা উন্মাদনা আছে, সে উন্মাদনায় আরবরা ক্ষেপে উঠেছে আর হিন্দুরা তখন ম্রিয়মাণ, হতাশ—এ অসম যুদ্ধ কি সম্ভব?

মানুষের যতটুকু সাধ্য মহিষী তা করলেন। কিন্তু তার বেশী করা সাধ্যাতীত বলেই রাওর দুর্গ বাঁচাতে পারলেন না, তা একদিন মুসলমানদের হাতে পড়ল। ক্রমে ক্রমে রাজধানী আলোরও জয় করলেন বিজয়ী মহম্মদ-বিন-কাশিম। সিন্ধু অতিক্রম ক'রে মূলতান পর্যন্ত ইসলামের জয়পতাকা উড্ডীন হ'ল।

কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন দাহিরের বিধবাকে বিন-কাশিম বন্দী ক'রে ইরাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা আরও বলেন যে, মহিষী সেখানে গিয়ে অপূর্ব কৌশলে বিন-কাশিমের মৃত্যুর আদেশ বার করেছিলেন অল্ হজ্জাজের কাছ থেকে। এমনি করে স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ে সে মহীয়সী মহিলাও প্রাণত্যাগ করেন।

থানেশ্বরের যুদ্ধ

গজনীর সুলতান মামুদ বহুবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন এখানকার ঐশ্বর্য লুঠ ক'রে নিয়ে যেতে, কিন্তু শুধুই যদি সাধারণ দস্যুর মতো লুঠ করে ক্ষান্ত হতেন তো ভারতের অনেক দুঃখ বাঁচত। তিনি ছিলেন সত্যকার রণকুশলী যোদ্ধা ও সেনাপতি। বার বার তাঁর বাহিনীর আগমনে ভারতীয় সৈন্যদের মনে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত থেকে আগন্তুক এই সব মুসলমান সৈন্যদের সম্বন্ধে। সেসব অভিযানের ফলাফলের নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক কাহিনী কেউ ভুলতে পারে নি—জনসাধারণ তো নয়ই, যুদ্ধ-ব্যবসায়ীরাও নয়। তবে কোনও কোনও ঐতিহাসিক যে লিখেছেন তিনি এখানে কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে আসেন নি সেটা ঠিক নয়। তিনি পঞ্জাবে ও কাশ্মীরের কয়েকটি জেলায় নিজের প্রতিনিধি রেখে গজনীর শাসন পাকা ক'রে রেখেছিলেন। রোগের বীজাণুর মতো এই সামান্য রন্ধ্র-পথেই ভারতের মহাসর্বনাশ এল পরে।

মামুদের মৃত্যুর পরই গজনীর সুলতান-বংশ হীনবীর্য হয়ে পড়লেন। এঁরা যেমন দুর্বল হতে লাগলেন তেমনি ধীরে ধীরে মাথা তুলতে লাগল ঘুর—হিরাটের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে পাহাড়ের ওপর এতটুকু বিন্দুর মতো একটুখানি দেশ, তারই সামান্য জমিদার। কে বা তাদের জানত, কে বা গ্রাহ্য করত! কিন্তু এই সামান্য জায়গীরদাররাই ক্রমে ক্রমে গজনীর শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল ও সুলতান মামুদের বংশকে বলতে গেলে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিলে। ভারত ও অন্যান্য দেশ থেকে ধনসম্পদ আহরণ ক'রে এনে গজনী সাজিয়েছিলেন মামুদ, সেই গজনী সাতদিন ধরে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিলেন ঘুরীরা।

শিহাবউদ্দীন মহম্মদ ঘুরী এই বংশেরই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নৃপতি।

মহম্মদ যখন তাঁর দাদার অধীনে গজনীর শাসনকর্তা মাত্র, তখনই তিনি তাকালেন ভারতের দিকে। গজনীর পুরাতন সুলতান বংশের একজন গজনী থেকে পালিয়ে এসে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁকে উপলক্ষ ক'রেই বোধহয় ওঁর মনে পড়ল ভারতের কথা।

প্রথম তিনি এলেন মুলতানের ইস্‌মাইলী মুসলমানদের (আগা খাঁ সম্প্রদায়) বিরুদ্ধে শস্ত্রপাণি হয়ে। কিন্তু সম্মুখযুদ্ধে কোনও সুবিধা তিনি করতে পারেন নি, হীন কৌশলে কিছুটা জয়ী হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। তারপর আবার কয়েক বছর পরে এসে আক্রমণ করলেন গুজরাত। তবে এ অভিযানে শুধু কলঙ্কই সার হ'ল ওঁর, গুজরাতের রাজার কাছে ভীষণভাবে হেরে কোনওমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলেন মহম্মদ ঘুরী।

অন্য কোনও লোক হ'লে দু-দুবারের এই অসুবিধার পর ভারতে রাজ্যস্থাপনের আশা ছেড়েই দিত। কিন্তু শিহাবউদ্দীন অন্য প্রকৃতির মানুষ ছিলেন—দৈবের কাছে মাথা নত করার অভ্যাস তাঁর ছিল না। পরের বছরই আবার ভারতে এসে শিয়ালকোট পর্যন্ত অধিকার করলেন এবং শিয়ালকোটে সুদৃঢ় একটি দুর্গ নির্মাণ ক'রে চিরস্থায়ীভাবে কতক ফৌজ রেখে দেশে ফিরলেন।

এইবার বাকী পঞ্জাবের পালা। গজনীর শেষ নামে-মাত্র সুলতান তখন বাতাসে আন্দোলিত শীষের মতো কাঁপছেন লাহোরে বসে। তবু অতটা সহজ হ'ত না বোধহয় লাহোর পর্যন্ত এগিয়ে আসা, যদি না জম্মুর রাজা বিজয়দেব অর্থ, সামর্থ্য, রসদ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেন ঘুরীকে, সোজা পথে ওদের পথ দেখিয়ে না আনতেন লাহোর পর্যন্ত। লাহোরের সুলতান গজনীতে ফিরে গেলেন আবার—বিজয়ী হয়ে নয়, বন্দী হয়ে।

ভারতের রাজারা তবু তখনও এ বিপদের গুরুত্ব অতটা বুঝতে পারেন নি। যেটুকু ভূমিখণ্ডে মুসলমানরা বাস করছেই বহুকাল ধরে, সেটুকু জায়গার মধ্যে যদি ওরা মারামারি কাটাকাটি ক'রে মরে তো মরুক না! কার কি ক্ষতি?

কিন্তু একজন এ আপাতশান্তিতে ভোলেন নি।

তিনি দিল্লীর চৌহান বংশীয় রাজা—মহাবীর পৃথ্বিরাজ

বর্তমান আজমীড় থেকে দিল্লী—এইটুকু মাত্র ছিল তাঁর রাজত্ব। কিন্তু বীযে, সাহসে ও কীর্তিতে তিনি তখন ভারতের সর্বাগ্রগণ্য নরপতি বলে বিবেচিত হতেন। সেজন্য তিনি যেমন আর কাউকে গ্রাহ্য করতেন না—বাকী সকলেও তাঁকে ঈর্ষার চোখে দেখত। আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিদ্বিষ্ট ছিলেন কনৌজের রাজা জয়চাঁদ।

অবশ্য জয়চাঁদের এতটা বিদ্বেষের আর একটু কারণ ছিল।

কনৌজের প্রবল প্রতাপ প্রতিহার-বংশকে উচ্ছেদ ক'রে গাড়ওয়ালের রাজারা সেখানকার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। জয়চাঁদ সেই বংশেরই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। রাজত্বের পরিমাণ, প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে তিনি পৃথ্বিরাজের চেয়ে অনেক বড়। তাঁকেই তখন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি বলা উচিত এবং ভারতের ইতিহাসে তাঁরই প্রভাব সবচেয়ে বেশি থাকার কথা। থাকত তাই, যদি না পৃথ্বিরাজ তাঁর চোখ-ঝল্‌সানো দীপ্তি নিয়ে সকলের চোখের সামনে এসে দাঁড়াতেন।

শুধু কি তাই? পৃথ্বিরাজ আবার এর মধ্যে জয়চাঁদের সর্বগুণান্বিতা কন্যা সংযুক্তাকে জয়চাঁদের ইচ্ছা ও মতের বিরুদ্ধে একরকম জোর ক'রেই বিবাহ করেন। অপত্যস্নেহের চেয়েও মানুষের আত্মাভিমান বড়, তাই যে জামাতা সন্তানের মতো প্রিয় হবার কথা, সেই জামাতাই জয়চাঁদের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন।

এমনই হয়। মানুষের ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত আমরা বার বার পেয়েছি। ব্যক্তিগত ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-মান-অভিমান জাতির সর্বনাশ রচনা করে। সামান্য তুচ্ছ কারণে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি, বৃহৎ সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়েও মানুষ তা ভুলতে চায় না বা পারে না। নইলে অস্ট্রিয়ার সম্রাটই বা জামাতা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন কেন?

মহম্মদ ঘুরী যখন লাহোর জয় করলেন তখনই পৃথ্বিরাজ সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠলেন। চৌহান বীরের দূত গেল ভারতের বিভিন্ন রাজসভায়, "ভাই সব, হুঁশিয়ার! শত্রু এসে দাঁড়িয়েছে সামনে, প্রবল ও সাংঘাতিক শত্রু। এরা যুদ্ধ সম্বন্ধে সভ্য জগতের কোনও নিয়মকানুন মানে না—নির্মম ও নিষ্ঠুর এরা। হত্যা ও লুণ্ঠনে এদের উল্লাস। আমাদের অপমানে ওদের তৃপ্তি।-প্রস্তুত হও।"

অনেকেই সে ডাকে সাড়া দিলেন। অস্ত্র ও লোকজন নিয়ে এগিয়ে এলেন বহু রাজপুত রাজা। শুধু অভিমানে কঠিন হয়ে রইলেন জয়চাঁদ। একটি মুদ্রা কি একটি লোক দিয়েও সাহায্য করতে রাজী হলেন না।

অথচ—অথচ তখন যদি তিনি মাত্র কয়েকদিনের মতো নিজের স্বার্থবুদ্ধি ও বিদ্বেষ বিসর্জন দিতেন তো ভারতের ইতিহাস অন্যরকম ভাবে রচিত হ'ত হয়ত।

যাই হোক— পৃথ্বিরাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন লাহোরের দিকে। শীগ্‌গিরই বোঝা গেল যে তিনি ভুল করেন নি। পঞ্জাবের সুব্যবস্থা ক'রেই ঘুরী পঞ্জাবের সীমা অতিক্রম করলেন ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে।

পৃথ্বিরাজও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি আক্রমণকারীদের বিন্দুমাত্র সময় দিলেন না, প্রায় দু লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ও তিন হাজার রণহস্তী নিয়ে তিনি সজ্জিত হয়ে এগিয়ে চললেন শত্রুর দিকে। থানেশ্বরের কাছে তরাইনের মাঠে ঘুরীর সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। বল-বীর্যে কেউই কম নন—ঘুরী নিজে ব্যূহ রচনা ক'রে মধ্যভাগে থেকে শত্রুর সম্মুখীন হলেন।

তখন মুসলমানদের মধ্যে যে রণকৌশল প্রচলিত ছিল তা আরবদের কাছ থেকে পাওয়া। ওরা অশ্বারোহীদের উপর নির্ভর করত বেশি। তিন-চারটি দল তৈরী হয়ে থাকত। এক এক দল এক একবার প্রচণ্ড বিক্রমে গিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করত, নিজেদের তূণের তীর বা অন্য অস্ত্রশস্ত্র ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে এলে তারা পিছু হটে আসত, আর একদল আসত নতুন শক্তি ও নতুন অস্ত্রসম্ভার নিয়ে। এমনি ভাবে ঢেউয়ের পর ঢেউ আসত বার বার, যতক্ষণ না শত্রুর সহ্য করার শক্তি কমে আসে, সে পিছু হঠতে থাকে। পৃথ্বিরাজ তা জানতেন। তিনি করলেন কি, সামনে এক বড় দল রাখলেন ঐ আক্রমণের ধাক্কা সামলাবার জন্য, আর দুটি দলকে পাঠিয়ে দিলেন একটু ঘুরে শত্রুব্যূহের ডাইনে ও বাঁয়ে আঘাত

হানবার জন্য। এই সাঁড়াশি আক্রমণের জন্য মুসলমানরা প্রস্তুত ছিলেন না, তা ছাড়া ওঁদের ব্যূহরচনায় পার্শ্বরক্ষার এমন কোনও বন্দোবস্তও থাকত না। সাধারণত ওঁদের শত্রুপক্ষ ওঁদের আক্রমণ সামলাতেই বিব্রত হয়ে পড়ত, পাল্টা আক্রমণের কথা ভাবত না।

তাছাড়া পরাক্রমে রাজপুতরাই শ্রেষ্ঠতর ছিলেন সেদিন। সে আক্রমণের প্রচণ্ডতা মুসলমানরা সহ্য করতে পারল না। বহু সৈন্য নিহত হ'ল, ছত্রভঙ্গ হ'তে গিয়ে বাকী অনেকে প্রাণ দিল, কেউ কেউ বন্দীও হ'ল। ঘুরী তবু নিজে অমিতবিক্রমে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন, বাছাই করা রাজপুত বীরদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পৃথ্বিরাজের ভাইকে লক্ষ্য ক'রে বর্শাও ছুঁড়েছিলেন, কিন্তু সে বর্শা তাঁর বুকে না লেগে মুখে লেগে অনেকটা কেটে গেল। অথচ তাঁর বর্শা ঘুরীর বুকে এসে এমন ভাবে লাগল যে তিনি তখনই ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে যেতেন যদি না পিছন থেকে একজন বিশ্বস্ত অনুচর লাফ দিয়ে এসে ওঁকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিরাপদ জায়গায় পলায়ন করত। এইভাবে সাংঘাতিক রকম আহত হয়ে প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় ঘুরী দেশে ফিরে গেলেন।

পৃথ্বিরাজ মনে করলেন এ পরাজয়ের পর সহজে আর এমুখো হবেন না ঘুরী।

সকলেই কতকটা নিশ্চিন্ত হ'ল।

তবে আগেই বলেছি যে ঘুরী সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। অত সহজে তাঁকে দমানো যেত না। তিনি ঠিক পরের বৎসরই আরও বড় এবং আরও সুসজ্জিত এক সেনাবাহিনী নিয়ে ভারতের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলেন। এবারে শিহাবউদ্দীনের আয়োজনের কোনও ত্রুটি ছিল না। দারুণ পরাজয়ের জ্বালা তাঁর বুকে, জিঘাংসায় তিনি ক্ষিপ্ত, প্রতিশোধ গ্রহণের অদম্য তৃষা তাঁকে একান্ত শক্তিশালী ক'রে তুলেছে। অর্থাৎ আগের যুদ্ধযাত্রা আর এ যুদ্ধ-যাত্রায় অনেক তফাত— সেবারে ছিল সামান্য রাজ্যজয়ের উচ্চাশা, এবারে ছিল অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের অদম্য সংকল্প।

তফাত এদিকেও ছিল ঢের।

ইতিমধ্যে পৃথ্বিরাজের দিকে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। যেসব রাজারা এর আগে প্রাণপণে সাহায্য করেছিলেন, তাঁরা অনেকে যুদ্ধের গুরুত্বটাকে লঘু ক'রে দেখেছেন। অর্থাৎ একবারের জয়ে আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে, তাঁরা ভাবছেন এমন কিছু নয় ওরা। আর একদল ঈর্ষাতুর হয়ে উঠেছেন, ভাবছেন যে যুদ্ধ করলেন তাঁরা আর জয়ের গৌরবমাল্য পড়ল চৌহানের গলায়—এতে লাভ কি?

আর জয়চাঁদ? তাঁরও বিদ্বেষের বিষ এতটুকু কমে নি। তিনি মনে মনে পৃথ্বিরাজের সর্বনাশের মন্ত্রই জপ করছেন।

অবশ্য এর কোনও কারণেই যুদ্ধ তো বন্ধ রাখা যায় না। পৃথ্বিরাজকে যাত্রা করতেই হ'ল আগের বারের মতো। কেউ কেউ এলেনও সাহায্য করতে, সৈন্যসংখ্যাও খুব কম হ'ল না, কিন্তু আগের বারের সে সুকঠিন সংকল্প ও চেষ্টা যেন কারুর নেই—একা পৃথ্বিরাজ যুঝলেন প্রাণপণে।

মহম্মদ ঘুরীও এবার যথেষ্ট সতর্ক। তিনি যুদ্ধের ধরন একেবারে পাল্‌টে ফেলেছেন। বাহুবলের চেয়ে তাঁর বেশী ভরসা কৌশলের উপর। কথিত আছে তিনি কাছাকাছি আসতেই পৃথ্বিরাজ এক লিপি পাঠালেন ওঁর কাছে অবিলম্বে ভারত ত্যাগ ক'রে চলে যাবার জন্য। ঘুরী তার উত্তরে বিনীত ভাবেই লিখলেন যে, তিনি দাদার মত জানবার জন্য আজই দেশে লোক পাঠাচ্ছেন, মতামত এলে সেই মতো কাজ করবেন।

পৃথ্বিরাজ তখন তাঁর লোকজন নিয়ে এগিয়ে এলেন কিন্তু আক্রমণ করলেন না। এই ভাবে একটি ছোট্ট স্রোতস্বিনীর দুই তীরে দুই বাহিনী বসে রইল। পৃথ্বিরাজের বাহিনী সংখ্যায় এত বেশী যে ওরা এত কাছে শত্রু থাকা সত্ত্বেও বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইল, আক্রমণের চেষ্টামাত্র করলে না।

এইভাবে উভয় পক্ষই কয়েকদিন নিষ্ক্রিয় থাকার পর সহসা মহম্মদ ঘুরী একদিন নদী পার হয়ে এদের আক্রমণ করলেন। পৃথ্বিরাজ তবু বিহ্বল হলেন না, সামনের দিককার সৈন্যরা যখন একান্ত বিহ্বলভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে এবং কোনওমতে ঠেকিয়ে রাখছে শত্রুকে, তখন পিছনদিকে সৈন্য সংস্থান ঠিক ক'রে শত্রুকে বাধা-দিতে এগিয়ে এলেন। সেই অবসরে আবার সামনেকার বিশৃঙ্খল সৈন্যরা পিছনে গিয়ে নিজেদের গুছিয়ে নিল।

ঘুরী দেখলেন মহাবিপদ। তিনি তখন পিছু হঠ্‌তে লাগলেন—যেন পালিয়ে যাচ্ছেন এমন ভাবটা দেখালেন। হিন্দুরা বিজয়গর্বে ওদের পিছনে পিছনে তাড়া ক'রে চলল। এই রকম ক'রে অনেকটা যাবার পর পৃথ্বিরাজবাহিনী যখন একেবারে অসতর্ক হয়ে পড়েছে, কোনও ব্যূহরচনাই যখন আর সম্ভব নয় তখন আগে থেকে প্রস্তুত রাখা, বাছাইকরা বারো হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঘুরী। সে আঘাতের জন্য এরা প্রস্তুতও ছিল না, সইতেও পারলে চা—চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। পলায়নপর শত্রুদের ভয়ার্ত চিৎকারে চারিদিকের বাকী সৈন্যরাও বিহ্বল হয়ে পড়ল। আর সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে যুদ্ধ্যমান, ক্লান্ত পৃথ্বিরাজ একসময়ে অকস্মাৎ মুসলমানদের হাতে বন্দী হলেন। পৃথ্বিরাজের ভাই নিহত হ'ল—আর সৈন্যদের অবস্থা? তারা দিশেহারা হয়ে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে দলে দলে প্রাণ হারাল।

তরাইনের প্রান্তরে সেদিন ভাগ্যলক্ষ্মী মহম্মদ ঘুরীকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর ললাটে যে রাজটীকা এঁকে দিলেন তা সহজে মুছল না, ভারতের ললাটে তা দীর্ঘস্থায়ী কলঙ্ক-রেখা অঙ্কিত করল।

দিল্লীতে স্থায়ী মুসলমান শাসনের পত্তন হ'ল সেদিন।

দেবগিরির যুদ্ধ

রামচন্দ্রদেব এ আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। দেবগিরি এতই দূর দিল্লী থেকে— 'দিল্লী হনৌজ দুরস্ত্' যে সেখান থেকে কোনওদিন কেউ আক্রমণ করতে আসবে এ ছিল তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর। সুদূর দাক্ষিণাত্যের এক কোণে তাঁর এই সাধের দেবগিরি বিপুল বিন্ধ্য পেরিয়ে, বহু নদনদী ও দুস্তর পর্বত পার হয়ে কে আসবে এখানে—কেন আসবে? নিশীথ স্বপ্নের মতোই শান্ত ও মধুর এই দেবগিরি—এ তো কারুর কোনও অনিষ্ট করে নি, কোনও চক্রান্তে যায় নি—তবে?

তিনি জানতেন না যে ঐশ্বর্যের খ্যাতি আকাশে ছড়ায়, বাতাসের ঢেউয়ে তা দেশ থেকে দেশান্তরে পৌঁছয় মানুষের অগোচরে, মানুষের আগে। সে খ্যাতির গন্ধ বহুদূরের বাতাসকে পর্যন্ত করে তোলে লোভনীয়, সে মধুগন্ধে লুব্ধ মানুষ ছুটে আসে সব রকম বাধা ডিঙিয়ে।

দেবগিরির বিপুল ঐশ্বর্যের কথা যুবরাজ আলাউদ্দীন খিলজীর কানেও পৌঁচেছিল এমনি অভাবনীয় উপায়ে। তাঁর উচ্চাশা তখন বৃদ্ধ সম্রাটের অনুগ্রহ ছাড়াই মাথা তুলতে চাইছে, তিনি তখন খুঁজছেন নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ। উচ্চাশার প্রথম অবলম্বন হ'ল ঐশ্বর্য। টাকা ছাড়া কিছুই হ'তে পারে না, তাই আলাউদ্দীন সম্রাটের মত না নিয়েই, সব বাধা অতিক্রম ক'রে বিন্ধ্য ডিঙিয়ে অকস্মাৎ একদিন বন্যার মতো দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেবগিরির ওপর।

পূর্বেই বলেছি যে রামচন্দ্রদেব প্রস্তুত ছিলেন না। বৃদ্ধ জালালউদ্দীন শান্তিপ্রিয়, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল ও নিরীহ। তাঁর রাজত্বকালে এমন আশঙ্কা যে আছে তা কে ভাববে? বিশেষ ক'রে রামচন্দ্রের পুত্র শঙ্করদেব অধিকাংশ সৈন্যসামন্ত নিয়ে সুদূর দক্ষিণে বিদ্রোহ-দমনে ব্যস্ত। লোক নেই, অস্ত্র নেই—যুদ্ধের কোনও আয়োজন নেই অকস্মাৎ এ কি বিপদ!

তবু রামচন্দ্রদেব একটা ক্ষীণ চেষ্টা করলেন। কোনওমতে অপ্রস্তুত ও সন্ত্রস্ত লোকজনকে সংগ্রহ ক'রে চেষ্টা করলেন আলাউদ্দীনের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে, কিন্তু সে কি সম্ভব? পরাজিত, অপমানিত রামচন্দ্রদেব সন্ধির প্রার্থনা করতে বাধ্য হলেন। আলাউদ্দীনও তাই চান, রাজ্যে তখন তাঁর লোভ নেই, বিপুল অর্থের বিনিময়ে রামচন্দ্রদেবকে অব্যাহতি দিয়ে দিল্লীর দিকে যাত্রা করলেন।

ঠিক সেই সময়ে দূতের মুখে সংবাদ পেয়ে দেশে এসে পৌঁচেছেন কুমার শঙ্করদেব। রামচন্দ্রদেব ছিলেন বিচক্ষণ ও শক্তিমান শাসক। কিন্তু শঙ্করদেব ছিলেন দুঃসাহসী বীর। তাঁর তখন তরুণ বয়স, বুকে অসীম আশা। পরাধীনতার অপমান তাঁর কাছে অসহ্য। তিনি কথাটা শুনে আর একতিল রাজধানীতে বিশ্রাম করলেন না, তখনই ছুটলেন আলাউদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। রামচন্দ্রদেব ব্যাকুল হয়ে নিষেধ করলেন বারবার, মন্ত্রীরা কত বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু প্রথম অপমানের তীব্র বিষে জর্জর ও প্রতিশোধ গ্রহণের আগ্রহে অধীর রাজকুমার কারও কথায় কর্ণপাত করলেন না।

প্রথমটা পরাজিত পক্ষের এই ধৃষ্টতায় বিস্মিত হয়েছিলেন আলাউদ্দীন, বোধ হয় একটু ভীতও।

কারণ প্রথম দিনের যুদ্ধে শঙ্করদেবই জয়লাভ করলেন—আরও কয়েকবার।

আলাউদ্দীন বুঝলেন—এ ছেলেখেলা নয়। তিনি সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করলেন শঙ্করদেবকে। তাঁর সুশিক্ষিত তীরন্দাজ অশ্বারোহীরা দু'দিক থেকে শঙ্করের সৈন্যদের মথিত করতে লাগল। বর্শাধারী বাহিনীর সামনে তাঁর হস্তীরা টিকল না, আহত হয়ে পাগলের মতো দৌড়োতে লাগল নিজেদের সৈন্যই মথিত ক'রে। চারিদিক আহতদের আর্তনাদে ভরে গেল। এই প্রচণ্ড আঘাত তাঁর বহুদিন-যুদ্ধে-অনভ্যস্ত সৈন্যেরা সহ্য করতে পারলে না, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল—শঙ্কর বহু চেষ্টাতেও তাদের সংহত করতে পারলেন না।

শঙ্কর তবু হাল ছাড়েন নি। খানিকটা পিছিয়ে এসে চেষ্টা করলেন আর একবার রুখে দাঁড়াবার। রামচন্দ্রদেবও ইতিমধ্যে দ্রুতগতিতে দূত প্রেরণ করেছিলেন দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজাদের সভায়। কিন্তু তাঁরা কেউই যেচে বিপদকে ঘরে আনতে চাইলেন না। রামচন্দ্রদেবেরই যদি এই অবস্থা হয় তো তাঁদের কি-না হতে পারে! এখন এদিকে দৃষ্টি নেই ওদের, মিছামিছি বিরাগভাজন হয়ে সে দৃষ্টি নিজেদের দিকে ফেরাবার দরকার কি?

এধারে রসদের একান্ত অভাব। সৈন্যদেরও মন ভেঙে গেছে। নতুন কোনও সাহায্য কোথাও থেকে না এলে সে মনোবল ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়।

রামচন্দ্রদেবকে আবার সন্ধি প্রার্থনা করতে হ'ল—ক্ষমা করো বালককে, ও বুঝতে পারে নি।

আলাউদ্দীনও তাই চান। তিনি আরও বেশী অর্থ প্রার্থনা করলেন। যে ঐশ্বর্য পেলেন তা দিল্লীর সুলতানেরও কল্পনাতীত। কয়েকশত উট ও হাতীর পিঠে বোঝাই ক'রে শুধু হীরা, মুক্তা, পান্না প্রভৃতি জহরতই নিয়ে গেলেন। সোনা রূপা যে কত মণ নিয়েছিলেন তা বোধহয় লেখাজোখা নেই। এইবার দাক্ষিণাত্যের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে এদের চোখ ফুটল।

রনথম্ভরের যুদ্ধ

আলাউদ্দীন পিতৃব্যকে নিহত ক'রে দিল্লীর সিংহাসনে বসবার পর কিছুদিন খুব বিব্রত ছিলেন মোঙ্গলদের নিয়ে। ঘরে-বাইরে অন্য শত্রুরও অভাব ছিল না। কিন্তু তারপরই তাঁর উচ্চাশা তাঁকে সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে সচেতন ক'রে তুলল। প্রথমেই তিনি তাঁর ভাই উলুগ খাঁকে ও নসরৎ খাঁকে পাঠালেন গুজরাটের দিকে। গুজরাট বিধ্বস্ত হলে তাঁর নজর গেল রনথম্ভরের দিকে।

রনথম্ভর ইতিপূর্বে ইলতুৎমিশ দখল করেছিলেন বটে কিন্তু তা বেশীদিন ধরে রাখতে পারেন নি, রাজপুতরা আবার তা উদ্ধার করেছিলেন। আলাউদ্দীন যখন সেদিকে নজর দিলেন তখন সেখানে রাজপুতবীর হাম্বীরদেব রাজত্ব করছেন।

এখানেও সুলতান উলুগ খাঁ ও নসরৎ খাঁকে পাঠালেন।

এঁরা বিপুল এক ফৌজ নিয়ে পথে দু'-চারটি দুর্গ ও শহর ধ্বংস ক'রে এসে রন্থম্ভরের সামনে হানা দিলেন এবং দুর্গটি অবরোধ করলেন। রন্থম্ভর দুর্গ অজেয় বলেই সেকালে জানত লোকে, বিশেষ ক'রে সাধারণ অবরোধে দুর্গের অধিবাসীদের জব্দ করা যেত না। কারণ দুর্গের ভেতরেই খাদ্য-খাবার যথেষ্ট ছিল—চাষবাসেরও কিছু কিছু আয়োজন ছিল। সুতরাং নসরৎ খাঁ দীর্ঘকাল অবরোধেরই ব্যবস্থা করলেন এবং চেষ্টা করতে লাগলেন অন্য উপায়ে দুর্গপ্রাচীর লঙ্ঘন করে ভেতরে নামবেন।

সেই উদ্দেশ্যে নসরৎ খাঁ একদিন নিজে দাঁড়িয়ে একটি প্রাচীর-সমান উঁচু পাথরের চত্বর গাঁথাচ্ছেন পরিখার অপরদিকে, এমন সময় দুর্গের মধ্যকার মাঘরিবী থেকে নিক্ষিপ্ত (কামানের মতো এক রকমের যন্ত্র, তা থেকে বড় বড় পাথরের গোলা ছোঁড়া হ'ত) পাথরে অকস্মাৎ নিহত হলেন।

রাজপুতরা যেন সেই সুযোগই খুঁজছিলেন, তাঁরা সেই সাময়িক বিহ্বলতার সুযোগ নিয়ে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন হতভাগ্য মুসলমান সৈন্যদের ওপর। রাজপুতদের তরবারি ও ভল্লের আঘাতে, কাস্তের আঘাতে যেমন করে ঘাস কেটে পড়ে তেমনি ক'রে ওরা পড়তে লাগল। কেউ কেউ ফিরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবার চেষ্টা করল বটে কিন্তু মৃত্যুর সে গতি সহ্য করতে পারল না। অধিকাংশ নিহত হবার পর যে যেদিকে পারল পালাল।

এই সংবাদ শুনে সুলতান নিজে এলেন।

তবু কাজটা অত সহজ হ'ল না। এক বৎসর ধরে দুর্গ অবরোধ ক'রে বসে রইলেন আলাউদ্দীন। চারিদিক থেকে এমন ক'রে আটকালেন যাতে একদানা শস্যও ভেতরে না যায়। খুবই কষ্ট হ'তে লাগল। শুধু খাদ্য বা পানীয় নয়—ঔষধ পর্যন্ত কেউ পেল না অসুখের সময়। বাইরের জগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।

এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অবশেষে হাম্বীরের বিশ্বস্ত ও প্রিয় অনুচর রণমল্ল তাঁর দলবল নিয়ে বেরিয়ে এসে আলাউদ্দীনের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। শুধু তাই নয়, কোন্ পথে আক্রমণ করলে দুর্গপ্রাকার সহজে ভাঙা যাবে, কোথায় তার গাঁথুনির দুর্বলতা—সবই বলে দিলেন।

হাম্বীর দেখলেন এবার আর রক্ষা নেই। তিনি একটুও ইতস্তত করলেন না। রন্থম্ভর দুর্গ একটা পাহাড়কে কেন্দ্র ক'রেই নির্মিত, সেই পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে তিনি বিরাট এক চিতা সজ্জিত করলেন, আগুনের লেলিহান শিখা মনে হ'ল যেন আকাশ স্পর্শ করেছে। সে আগুনের লাল আলো বহু শত ক্রোশ দূর থেকেও দেখা গিয়েছিল। তারপর দুর্গের মধ্যে যত স্ত্রীলোক ছিলেন, সকলে গিয়ে সেই চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে অসংখ্য মহিলা পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন।

এবার আর কারও জন্য দুশ্চিন্তা রইল না, রইল না আশঙ্কা। হাম্বীরদেব আদেশ দিলেন দুর্গদ্বার খুলে দিতে।

এদিকে পর্বত শিখরের সেই আগুন দেখে পর্যন্ত বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত আলাউদ্দীন একটা মহাবিপর্যয়েরই আশঙ্কা করছিলেন। হ'লও তাই, হাম্বীরদেব তাঁর অবশিষ্ট কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাঠান সৈন্যদের ওপর।

সে কী যুদ্ধ!

একদিকে অসংখ্য সৈন্য, আর একদিকে নিতান্ত মুষ্টিমেয় কয়েকশত মাত্র। যেন সমুদ্রের মধ্যে একটি বিন্দু। তবু সেই বিন্দুই সাংঘাতিক হয়ে উঠল। যাদের প্রিয়জনেরা এইমাত্র চোখের সামনে নিহত হয়েছে, জীবনে যাদের কোন মায়া নেই, যারা মরতেই এসেছে, তারা যে কী পর্যন্ত মরীয়া হতে পারে, কী অসুরের তেজ যে তাদের মাত্র দুখানি বাহুতে আশ্রয় করতে পারে, তা সে-যুদ্ধ যে না দেখেছে সে কল্পনা করতে পারবে না। এক একটি রাজপুত যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু, সংহার মূর্তিতে এসে যুদ্ধে নেমেছে। এক একজনের হাতে সেদিন যে কত শত্রু-সৈন্য মরেছে তার হিসাব নেই।

এক হাত কাটা গেছে, আর এক হাতে যুদ্ধ করছে—সে হাতও কাটা গেল তো দাঁতে ক'রে ভল্ল নিয়ে তেড়ে যাচ্ছে কিংবা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর টুঁটি কামড়ে ঝুলে পড়ছে। এমনি ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ড তাদের জিঘাংসা। তবু বিন্দু যত শক্তিশালীই হোক্—তা বিন্দুই। সমুদ্র চিরদিনই সমুদ্র। এক সময় সংখ্যারই জয় হ'ল।

কয়েক ঘণ্টা এইভাবে যুদ্ধ চালিয়ে ক্ষত-বিক্ষত শ্রান্ত হাম্বীরদেব চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন পাশে আর কেউ নেই—বিশ্বস্ত তাঁর বন্ধুরা, সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে আজীবন সহচর সব, সকলেই এক এক ক'রে সমর-শয্যায় শুয়েছেন, আর কতক্ষণ এমনভাবে যুঝতে পারবেন? কতক্ষণই বা? আর যে পারেন না!

তবে কি—তবে কি রাজপুতের দেহ শত্রুর হাতে বন্দী হবে? ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বিজিত শত্রুর সহস্র লাঞ্ছনা সইতে হবে? না, তাতেও তো মরণকে এড়ানো যাবে না! তা কখনই সম্ভব নয়—সেজন্য তিনি এমন নিঃসঙ্কোচে যুদ্ধে নামেন নি! হাম্বীরদেব প্রাণপণ চেষ্টায় আর একবার তাঁর অসি তুললেন, তারপর ঘোড়ার ওপরই স্থির হয়ে ব'সে ছিন্নমস্তার মতো নিজহাতে নিজের মাথা কেটে ফেললেন। সে বীভৎস দৃশ্যে পাঠান সৈন্যরা কিছুকালের মতো ভয়ে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তাদের হাত-পায়ে যেন আর বল ছিল না।

আলাউদ্দীনও এই মহান ও বীর শত্রুকে মনে মনে শ্রদ্ধা জানালেন। তার পর দুর্গে পৌঁছে প্রথমেই আদেশ করলেন রণমল্লকে ডেকে দিতে।

রণমল্ল এ আহ্বানের জন্য প্রস্তুতই ছিলেন। তিনি জানতেন তাঁর পুরস্কারস্বরূপ এ দুর্গের শাসনভার শেষ পর্যন্ত তাঁর হাতে দিয়েই আলাউদ্দীন ফিরে যাবেন। তিনি করদরাজা-রূপে বা রাজপ্রতিনিধিরূপে এটা শাসন করবেন।

বেশ প্রফুল্ল মুখেই বিজয়ী সুলতানের সামনে এসে দাঁড়ালেন রণমল্ল—'একে কোত্‌ল কর, এখনই।' শুধু এই আদেশ দিলেন সুলতান। বিশ্বাসঘাতকের পুরস্কার।

চিতোরগড়ের যুদ্ধ

রনথম্ভর বিজয়ের পরই আলাউদ্দীনের দৃষ্টি গেল চিতোরগড়ের দিকে। চিতোরগড় মেবারের রাজধানী, সেখানে মহাপরাক্রান্ত গিহ্লোট বংশীয় মহারাণারা রাজত্ব করেন। তাঁদের বিশ্বাস তাঁরা স্বয়ং সূর্যদেবের বংশধর। এঁদের শৌর্য ও বীর্যের খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। এদের জয় করতে না পারলে দ্বিতীয় সেকেন্দারের ও উপাধি গ্রহণই বৃথা।

কিন্তু কাজটি খুব সহজ নয়। চিতোরের দুর্গ পাহাড়ের ওপর, এবং এমন ভাবে তৈরি যে সহজে তা জয় করাও যায় না কিংবা অবরোধ করেও ওদের জব্দ করা যায় না। তবু সুলতান এসে পাহাড় ঘিরে ওদের অবরোধ করেই বসলেন।

এই যুদ্ধ সম্বন্ধে নানা রকম মতভেদ আছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক টড্ যে কাহিনীটি বলেছেন আমরা এখানে সেইটিই শোনাব।

মহারাণা রতন সিংহের (টডের মতে ভীমসিংহ—রতনের কাকা) মহিষী পদ্মিনী ছিলেন দেশবিখ্যাত রূপসী। তিনি সিংহলের মেয়ে, তাঁরও নাম সারা ভারতের লোকের মুখে মুখে। হঠাৎ আলাউদ্দীন বলে পাঠালেন যে, পদ্মিনীকে একবার দেখতে পেলেই খুশী হয়ে তিনি দেশে ফিরে যাবেন। তাঁর অন্য কোনও মতলব নেই। এত যাঁর রূপের খ্যাতি, তিনি দেখতে কেমন না জানি, শুধু এই কৌতূহলেই তিনি এসেছেন।

রাজপুতরা ভাবলেন যে, এই সামান্য ব্যাপারেই যদি গোলমাল মিটে যায় তো কী দরকার অকারণে হাঙ্গামা বাড়াবার! যুদ্ধের ফলাফল যে রাজপুতের পক্ষে খুব শুভ হবে লক্ষণ দেখে তা মনে হয় না—তাছাড়া ফলাফল যাই হোক্, অজস্র রক্তপাত ও নরহত্যা তো হবেই!

তাঁরা রাজী হলেন। সুলতান আলাউদ্দীনকে সসম্মানে আ[illegible]ণ ক'রে দুর্গের মধ্যে আনা হ'ল এবং আসল পদ্মিনীকে আড়ালে রেখে সাতাশখানি বড় বড় আয়নায় প্রতিফলিত ক'রে তাঁর প্রতিবিম্ব দেখানো হ'ল।

আলাউদ্দীন দেখে তুষ্ট হয়ে শিষ্টাচারের পর বিদায় নিলেন। তিনি অল্প কয়েকজন অনুচর নিয়ে নির্ভয়ে দুর্গের মধ্যে এসেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে যত বড় শত্রুই হোক্ সে যখন অতিথিরূপে আসছে তখন প্রাণ থাকতে রাজপুতরা তার কোনও অনিষ্টই হতে দেবেন না।

সেই মাননীয় অতিথিকে যথেষ্ট সৌজন্য দেখাবার জন্য এবং বিশেষ ক'রে আলাউদ্দীন যখন এতটা বিশ্বাস করেছেন তখন তার পাল্টা বিশ্বাস দেখাবার জন্যও—সামান্য কয়েকজন মাত্র সহচর নিয়ে মহারাণা অতিথির সঙ্গে প্রত্যুদ্গমন ক'রে দুর্গপ্রাকারের বাইরে পর্যন্ত এলেন।

ব্যাস্, যেমন কয়েক পা এসেছেন, সুলতানের সৈন্যরা জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে

অপেক্ষা করছিল, তারা অতর্কিত ভাবে এসে আক্রমণ করল এবং মহারাণাকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেল পাঠান শিবিরে।

এতখানি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এ পক্ষ প্রস্তুত ছিল না। তবু তখনই দুর্গদ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হ'ল এবং প্রাচীর পাহারা দেবার জন্য কড়া প্রহরী মোতায়েন করা হ'ল।

আলাউদ্দীন অতঃপর ব'লে পাঠালেন যে, পদ্মিনীকে যদি তাঁর হাতে সমর্পণ করা হয় তো তিনি ভীমসিংহকে ছেড়ে দেবেন।

এ প্রস্তাবে সব রাজপুতই অপমানে জ্বলে উঠলেন। কিন্তু পদ্মিনী তাদের সবাইকে চুপ করতে ব'লে আলাউদ্দীনকে ব'লে পাঠালেন যে, তিনি সেই প্রস্তাবেই রাজী আছেন। তবে তিনি যখন যাবেন তখন তাঁর কয়েকজন সখী তাঁর সঙ্গে শিবির পর্যন্ত যাবেন এবং যেসব দাসীরা তাঁর সঙ্গে দিল্লী যাবে তারাও থাকবে। এঁরা সবাই পর্দাঘেরা শিবিকায় যাবেন, কেউ যেন না তাঁদের আব্রু নষ্ট করে বা পর্দা সরিয়ে দেয়।

বলা বাহুল্য আলাউদ্দীন তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন—সানন্দে।

পর্দাঘেরা একশো পালকী বেরোল চিতোর দুর্গ থেকে, প্রতি পালকীতে ছ'জন ক'রে বেয়ারা।

সে পালকী পাঠান-শিবিরে গিয়ে পৌঁছতে মহারাণা এলেন, শেষবারের মতো রাণীর সঙ্গে দেখা করবেন ব'লে। অবশ্য তাঁকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা কোনও দিনই ছিল না সুলতানের, তবু অভিনয়টা পুরোপুরি করা চাই তো! তাই তিনি মহারাণাকে ঐ অল্প সময়ের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন।

যাক্—মহারাণাও এসে পৌঁছুলেন আর ঐ একশো পালকীর পর্দা খসে গেল। বেরিয়ে এলেন তা থেকে বাছাইকরা রাজপুত যোদ্ধা একশোজন। পালকী যারা বয়ে এনেছিল তারাও আসলে সৈনিক। অর্থাৎ সাতশো রাজপুত সৈন্য।

ইঙ্গিত বুঝে তখনই ভীমসিংহ এক পাঠানের ঘোড়া কেড়ে নিয়ে তাতে চেপে রওনা হলেন, তাঁকে ঘিরে যুদ্ধ করতে করতে চলল ঐ সাতশো বীর। উঁচু-নীচু পাহাড়ে রাস্তা, তাতে অগণিত সশস্ত্র শত্রু চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে সাগরের মতো। তারই মধ্য দিয়ে সাবধানে এক পা এক পা ক'রে চিতোরের দিকে চলেছেন এরা। যাঁরা ভীমসিংহের পেছনে ছিলেন তাঁদের যুদ্ধ করতে করতে পিছু হাঁটতে হচ্ছে, যাঁরা পাশে ছিলেন তাঁদের যেতে হচ্ছে আড়ভাবে, অথচ হাত খালি নেই কারও, কারও নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই—প্রতিটি রাজপুতবীরকে অন্তত কুড়িটি লোকের সঙ্গে একই সময়ে যুঝ্‌তে হচ্ছে।

পাঠানরাও তখন মরীয়া। এমনভাবে তাঁকে ঠকিয়ে বন্দী কেড়ে নেওয়াতে সুলতান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন, তিনি বলেছেন যেমন ক'রে হোক্ ঐ লোকটিকে তাঁর চাই। আর এই বা কি অপমানের কথা যে, তাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের মধ্য দিয়ে মাত্র সাতশো লোক বন্দীকে কেড়ে নিয়ে যায়!

কিন্তু আলাউদ্দীন দাঁড়িয়েই দেখলেন যে, সেই অসম্ভবই সম্ভব হ'ল। পাঠানরাও কম

চেষ্টা করছে না তবে রাজপুতরা সাক্ষাৎ কৃতান্তের মতো যুদ্ধ করছে, কেমন ক'রে তাদের বাধা দেবে?

সেদিন সেই অসম্ভব যুদ্ধ যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গোরা ও বাদলের নাম পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। বাদলের বয়স মাত্র বারো বৎসর। গোরা বাদলেরই কাকা। এঁরা দুজনেই পদ্মিনীর বাপেরবাড়ির আত্মীয়। সেদিন গোরার হাতে খুব কম হ'লেও এক সহস্র আফগান সৈন্য নিহত হয়েছিল। সে যুদ্ধের ইতিহাস লিখে বহু ঐতিহাসিক ধন্য হয়ে আছেন।

তবে দুঃখের কথা এই যে, গোরা চিতোরে ফিরতে পারেন নি। দুর্গদ্বারের কাছাকাছি যখন তাঁরা পৌঁচেছেন তখন মাত্র জন-কুড়িতে ঠেকেছে তাঁদের দলের লোক। মহারাণা ভেতরে ঢুকে নিরাপদে দুর্গদ্বার রুদ্ধ করবেন, অন্তত ওখানে পৌঁছুতে পারলে ভেতরের লোকও কিছু সাহায্য করতে পারবে এটা ঠিক—অসম্ভব তবু তাই করব, প্রতিজ্ঞা করলেন গোরা।

দেহের কোনও অংশ অক্ষত নেই, তবু সংকীর্ণ পার্বত্যপথে ব্যূহরচনা ক'রে দাঁড়ালেন। ওধারে দুর্গের ভেতর থেকে কয়েকজন অশ্বারোহী তীরবেগে নেমে আসছেন, আর একটু—আর একটু—আর পারলেন না, যুদ্ধ করতে করতেই গোরা মারা গেলেন। কিন্তু ততক্ষণ তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, মহারাণা নিরাপদে ভিতরে গিয়ে পৌঁচেছেন।

এরপর আলাউদ্দীন ক্ষেপে উঠলেন, যেমন ক'রেই হোক্ চিতোর ধ্বংস করতে হবে। মহারাণা দেখলেন উপায় নেই। তিনি যুদ্ধ করবেন স্থির করলেন। তাঁর এক-একটি পুত্র এক-একদিন প্রাণপণ ক'রে একদল সৈন্য নিয়ে দুর্গ থেকে বার হয়—ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুসৈন্যের সমুদ্রে, আর ফেরে না। সমুদ্রে কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

শেষে রইলেন মহারাণা নিজে।

জহরব্রতের আদেশ দিলেন তিনি। বিশাল সুড়ঙ্গ দাহ্যপদার্থে পূর্ণ ক'রে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল, তাতে একে একে সব মহিলা এসে ঝাঁপ দিলেন—পদ্মিনী সুদ্ধ। পাছে তাদের আর্তনাদে কেউ বিচলিত হয় এই ভয়ে সবাই সুড়ঙ্গে ঢুকতেই সুড়ঙ্গের দ্বার ওপর থেকে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল।

এইবার মহারাণা প্রস্তুত হলেন। বাকী যারা ছিল, বৃদ্ধ যুবক বালক সবাইকে নিয়ে তিনি নিজে বার হলেন দুর্গ থেকে। যতক্ষণ পারলেন প্রচণ্ড বেগে যুদ্ধ করলেন। অসংখ্য শত্রুসৈন্য নিহত ক'রে কল্কি অবতারের মতো শত্রুর অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তারপর সবাই মারা গেলেন একে একে। চিতোরের কোনও পুরুষ আর রইল না।

শুধু এক পৌত্রকে তিনি আগে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, সে-ই পরে বড় হয়ে চিতোরদুর্গ পুনরধিকার করেছিল। সেই বালকই মহাবীর হাম্মির।

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ

কোনও রাজশক্তির যখন পতন আসন্ন হয়ে ওঠে তখন তার চারিদিকে কতকগুলি লক্ষণ দেখা দেয়। তার মধ্যে বুদ্ধিনাশটাই বড়।

ভারতেও কয়েকশো বছর ধরে যে তুর্ক-আফগান রাজশক্তি শাসন করছিলেন, যেটাকে সাধারণত ঐতিহাসিকরা পাঠান আমল ব'লে আখ্যা দেন—তাদের পতন ঘনিয়ে এল ঐ যুগের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীর আমলে। ইব্রাহিম লোদী যখন সিংহাসনে বসলেন তখন দিল্লীর সাম্রাজ্য বলতে দিল্লীর চারপাশে কয়েকটি মাত্র জেলা বোঝায়, তার বাইরে চারিদিকেই আফগান শাসক ও জমিদাররা প্রবল হয়ে উঠেছেন, হিন্দু জমিদাররাও সুযোগ বুঝে স্বাধীনভাবে মাথা তুলেছেন।

এই সঙ্কটকালে যে স্থিরবুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োজন তা ইব্রাহিমের ছিল না, তিনি কঠোর হস্তে এই সব জমিদারদের শাসন করতে প্রবৃত্ত হলেন। অথচ সে শক্তি তাঁর ছিল না। ফলে তিনি যতই রূঢ় আচরণ করেন ততই তারা বিরুদ্ধাচরণ করে, তাঁর আচরণ আরও রূঢ় হয়ে ওঠে।

এই যখন অবস্থা তখন পঞ্জাবের দৌলত খাঁ লোদী ও আলম খাঁ বাইরের শত্রুকে ঘরে আহ্বান করলেন। বাবুর বা বাবরকে জানালেন নিমন্ত্রণ। এ কথাটা একবার মনে হ'ল না যে, গৃহবিবাদটা বরং মিটিয়ে কয়েকজন জমিদার এক হয়ে ইব্রাহিমকে শাসন করা যাক্। এ রকম নির্বুদ্ধিতার ইতিহাস ভারতে অনেক আছে।

বাবর এঁদের আমন্ত্রণ-লিপি পেয়ে হাসলেন। ভাগ্যতাড়িত গৃহহারা বাবর বহুদিন ধরেই স্বর্ণপ্রসূ ভারতের দিকে লুব্ধ-দৃষ্টিতে চাইছিলেন, এই সুযোগে আর তিলার্ধও বিলম্ব করলেন না। সামান্য কয়েক সহস্র অনুচর নিয়ে ভারতে প্রবেশ করলেন ও প্রায় বিনা বাধায় লাহোর পর্যন্ত অধিকার ক'রে নিজের শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করবার দিকে মন দিলেন।

এ আবার কি? এ রকম তো কথা ছিল না!

ব্যাপার দেখে দৌলত খাঁ ও আলম খাঁর চোখ কপালে উঠল। ওঁরা ভেবেছিলেন ভাড়া-করা গুণ্ডার মতো বাবর এসে ওঁদের কার্য উদ্ধার করে দিয়ে কিছু লুঠতরাজ ক'রে নিয়ে সরে পড়বেন। কিন্তু এখানে এমনভাবে জাঁকিয়ে বসে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় মন দেবেন—এমন সম্ভাবনা তো তাঁদের মাথায় যায় নি! এ যে খাল কেটে কুমীর ঘরে আনা!

সাজ, সাজ—চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। দৌলত খাঁ সৈন্য সমাবেশ করতে লাগলেন বাবরকে তাড়াবার জন্য। বাবর দেখলেন বেগতিক, তাঁর তেমন কোনও আয়োজনই নেই—তিনি আবার কাবুলে পালিয়ে গেলেন।

তাই বলে তিনি চুপ ক'রে বসে রইলেন না। বহু চেষ্টাচরিত্র ক'রে হাজার বারো সৈন্য সংগ্রহ হতেই তিনি আবার ভারতে প্রবেশ করলেন এবং অল্প আয়াসেই লাহোর দখল

ক'রে দৌলত খাঁকে দমন করলেন। এইবার নিশ্চিন্ত মনে দিল্লীর কথা ভাববার সময় পাওয়া গেল। তবে বাবর আর দেরি করলেন না—মাস দু'-তিনের মধ্যেই দিল্লীর পথে অগ্রসর হতে লাগলেন।

ইব্রালিম লোদীও অবশ্য ঠিক চুপ ক'রে বসে ছিলেন না। কিন্তু যারা আপন হ'তে পারত, যারা তাঁকে সাহায্য করতে পারত—তারা সকলেই এ বিপদে বরং মজা দেখতে লাগল। ব্যক্তিগত অসূয়া ও বিদ্বেষ এমনই জিনিস! একথা তারা একবারও ভাবল না যে, যে ব্যক্তি দিল্লীর রাজশক্তি নষ্ট করতে পারে সে পরে তাদের অধিকারও ক্ষুণ্ণ করতে চাইবে—এবং তখন তার সামনে দাঁড়ানো অত সহজ হবে না।

যাই হোক—ইব্রাহিম কোনওমতে প্রায় লাখখানেক সৈন্য সংগ্রহ ক'রে বাবরকে বাধা দেবার জন্য কিছুদূর এগিয়ে এলেন। কুরুক্ষেত্রের কাছে পাণিপথের প্রান্তরে উভয় সৈন্যের দেখা হ'ল।

সে বড় মজার যুদ্ধ। একদিকে অশিক্ষিত এবং অপ্রস্তুত এক লক্ষ সৈন্য, অপরদিকে মাত্র বারো হাজার সৈন্য এবং কয়েকটা কামান। এর আগে কামান-বারুদের ব্যবহার ভারতে বিশেষ হয় নি, তার সঙ্গে এদের পরিচয় ছিল না বললেই হয়। ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যরা তো জানতই না। অকস্মাৎ মহা গর্জন ক'রে এক একটা লোহার বল যখন জ্বলতে জ্বলতে এসে ফাটতে লাগল তখন ওদের বিস্ময় ও আতঙ্কের শেষ রইল না। এ আবার কি সর্বনেশে জিনিস? শয়তানের কল নয় তো? এর ভেতর কি ভূত আছে? একে তো এই ভয়, তারপর ইব্রাহিমের সৈন্যদের মধ্যে কোনও শৃঙ্খলা ছিল না। তাড়াতাড়ি ক'রে এখান-ওখান থেকে তাদের সংগ্রহ করা হয়েছে। কোনও দলগত ঐক্য, পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া বা প্রীতির সম্পর্ক নেই। বাবর নিজেই তাঁর শত্রু-সৈন্যদের সম্বন্ধে বড় চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'ওরা চলতে বললে থামে, থামতে বললে চলে। যখন প্রয়োজন নেই তখন হৈ হৈ ক'রে রুখে ওঠে, আর যখন তেড়ে আক্রমণ করা প্রয়োজন তখন স্থাণুর মতো স্থির থাকে। কাকে যুদ্ধ বলে তাই জানে না। কার হুকুম তাদের শুনতে হবে অনেকের তাও জানা নেই। যুদ্ধটা ওরা আগাগোড়া ইচ্ছা ও খেয়াল-মতো ক'রে গেল।'

এ রকম করলে কি আর দাঁড়ানো যায়? বিশেষ ক'রে বাবরের সামনে? যুদ্ধ ক'রে ক'রে পেকে গেছেন বাবর, আর চিরকালই তাঁকে প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়েছে সামান্য সম্বল নিয়ে। এ অবস্থায় বীর্যের চেয়ে কৌশলের ওপর তাঁকে ভরসা করতে হয়েছে বেশী।

সুতরাং ইব্রাহিম অত বেশী সৈন্য নিয়েও বাবরের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। ব্যূহ রচনা, কামান-সংস্থান প্রভৃতি ব্যাপারে যে অসাধারণ দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন বাবর, ইব্রাহিমের পক্ষে তা কল্পনাতীত। মুঘল সৈন্যরা অকস্মাৎ পাঠানদের ওপর দুইদিক থেকে আক্রমণ ক'রে চেপে ধরলো এবং সেই মুহূর্তে সমস্ত কামানগুলো একসঙ্গে গর্জন ক'রে উঠল। অবশ্য তখনকার দিনের কামান এখনকার দিনের তুলনায় ছেলেখেলা মাত্র। সে-সব যন্ত্র যাদুঘরে সাজিয়ে রাখলে এখনকার দিনের দর্শকদের হাসিই পাবে, তবু তখন

তাই ছিল আশ্চর্য, বিভীষিকার বস্তু। কেমন ক'রে ঐটুকু লোহার নলের ভেতর থেকে আগুনের গুলিগুলো বেরিয়ে আসছে ভেবে পায় না ওরা—কে ছুঁড়ছে, কি ক'রে ছুঁড়ছে অত জোরে? অতদূর থেকে এখানে এসে পৌঁছলই বা কি ক'রে? এসব কোনও প্রশ্নেরই জবাব পায় না—দিশাহারা, বিহ্বল, হতচকিত পাঠান সৈন্যরা। এ কি ভোজবাজী?

ফলে ওরা দলে দলে সেই নতুন আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে মরতে লাগল। তাছাড়া সুশিক্ষিত ও রণনিপুণ মুঘল সৈন্যের অব্যর্থ অস্ত্র তাদের চারিদিকে। দক্ষিণে বামে সামনে পিছনে সর্বত্র। ওরা কোথা দিয়ে কি ভাবে আসছে ও তাদের মারছে, ভেবেই পায় না পাঠানরা। মৃত্যু যেন চারিদিক থেকে ওদের ঘিরেছে। অব্যর্থ ও অমোঘ তার আক্রমণ—আজ আর রক্ষা নেই! হায় হায়, একজনও বুঝি আর বাঁচল না! এ বুঝি সাক্ষাৎ ঈশ্বরেরই ক্রোধ!

সকাল থেকে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। দ্বিপ্রহরের মধ্যেই যখন ইব্রাহিমের অর্ধলক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে শয্যা নিল তখন বাকী সৈন্যরা আর ভরসা ক'রে থাকতে পারল না, যে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে শুরু করল। তাতেই কি রক্ষা আছে? পিছন থেকে মুঘল সৈন্যরা যেন বিদ্যুৎবেগে এসে পড়ে আর তাদের অব্যর্থ আক্রমণে কারুরই প্রাণ থাকে না!

ইব্রাহিম নিজেও তখন আহত। তবু প্রাণপণে চেষ্টা করলেন সৈন্যদের ফেরাবার, কিন্তু কে কার কথা শোনে, সকলেই আতঙ্কে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য।

সুলতান বুঝলেন ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ। ইব্রাহিম নৃপতি হিসাবে অক্ষম ছিলেন হয়ত কিন্তু সাহস তাঁর কম ছিল না। তিনি যখন দেখলেন যে আর কোনও উপায় নেই তখন অল্প কয়েকজন সাহসী বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে নিজেই রুখে দাঁড়ালেন।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ! শেষ পাঠান নৃপতি পাণিপথের সেই রক্তপিছল ধূলিধূসর প্রান্তরে আল্লার নাম নিয়ে শেষ-শয্যা পাতলেন শীগগিরই।

পাঠানদের নক্ষত্র অস্ত গেল চিরতরে, মুঘলদের নক্ষত্র তখন পূর্বগগনে।

কান্‌ওয়ার যুদ্ধ

বাবর পাণিপথের যুদ্ধে জয়ী হলেন কিন্তু নিষ্কণ্টক হ'তে পারলেন না। তাঁর শান্তিতে রাজত্ব করার পথে বাধা অনেক। প্রথমত আফগান জমিদাররা—তারা এখনও তেমনি প্রবল তেমনি উদ্ধতই আছে।

আর তাদের সামলাবার চেষ্টা করার আগেই আর এক শত্রু, ঢের বেশী প্রবল, ঢের ঢের বেশী দুর্ধর্ষ—বাবরের বিজয়-উল্লাসে বাধা দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি মেবারের মহারাণা মহাবীর সংগ্রামসিংহ বা সঙ্গ।

সংগ্রামসিংহও আগে মনে করেছিলেন যে, বাবর অন্যান্য আক্রমণকারীদের মতো লুঠতরাজ ক'রে, দিল্লীর সামরিক বল চূর্ণ ক'রে চলে যাবেন এবং ইব্রাহিম লোদীর সেই দুর্বলতার সুযোগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্থাপনের উচ্চাশা পূর্ণ হবে। কিন্তু যখন দেখলেন

যে বাবর ভারতে চেপে বসতে চান তখন তিনি রীতিমতো চিন্তিত হয়ে উঠলেন। এক বৈদেশিক শাসন গিয়ে আর এক বৈদেশিক শাসন কায়েম্ হোক্—এ তো তাঁরা চান নি! তিনি স্থির করলেন যে প্রবল শত্রুকে গুছিয়ে নিয়ে বসবার সুযোগ দিলে চলবে না, তার আগেই তাকে উচ্ছেদ করতে হবে, নইলে এদেশের রক্ষা নেই।

সংগ্রামসিংহ দ্রুত সমরায়োজনে মন দিলেন। তাঁর আহ্বানে আরও বহু রাজপুত রাজা সসৈন্যে এগিয়ে এলেন তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে। দু'একজন আফগান সর্দারও এলেন। কিন্তু সেই দুর্দিনেও সব আফগান সর্দার নিজেদের ছোট ছোট ঈর্ষা-দ্বেষ ভুলে এই দুর্দান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হতে পারলেন না। তা যদি পারতেন তাহ'লে ভারতের ইতিহাস আজ অন্যরূপ লিখিত হ'ত। মুঘলদের সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা কোনওদিনই সফল হ'ত না।

সংগ্রামসিংহ অগ্রসর হচ্ছেন সংবাদ পেয়ে বাবরও তাড়াতাড়ি আগ্রা থেকে সসৈন্যে রওনা হলেন। তবে বেশিদূর তাঁকে যেতে হ'ল না—বর্তমান ফতেপুরসিক্রীর কাছাকাছি এসেই সংগ্রামসিংহের বাহিনীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। তখন তাড়াতাড়ি ক'রে খানুয়া বা কান্‌ওয়া প্রান্তরে বাবর তাঁর শিবির সংস্থাপন করলেন। কিন্তু সংগ্রামসিংহের সমরায়োজন দেখে বাবরের সৈন্য ও সেনানীদের মুখ শুকিয়ে গেল—হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হ'ল। মেওয়ার ছাড়াও মারওয়াড়, অম্বর, গোয়ালিয়র, আজমীর, চন্দেরী প্রভৃতি দেশের সমস্ত শক্তি একত্র হয়েছিল। তার সঙ্গে সসৈন্যে যোগ দিয়েছিলেন সুলতান মাহ্‌মুদ লোদী (সিকান্দার লোদীর এক পুত্র)—অর্থাৎ বিপুল বাহিনী। বাবর আন্দাজ করেছিলেন প্রায় আট লক্ষ অশ্বারোহী, শতাধিক সেনাপতি এবং কয়েকশত রণহস্তী ছিল এদের দলে। তবে খুব সম্ভব তিনি শত্রুপক্ষের সম্বল একটু বেশী ক'রে ধরেছিলেন, কারণ তাতে শেষপর্যন্ত তাঁরই গৌরববৃদ্ধি তো!

তবে মোটামুটি সংগ্রামসিংহের বাহিনী যে বিপুলই ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। তার ওপর রাজপুতজাতির শৌর্যবীর্যের, পরাক্রমের কাহিনী প্রায় প্রবাদের মতোই ভারতের বাইরে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। মরতে ও মারতে তারা কখনই কুণ্ঠিত নয়, স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জন দেওয়া তারা পুণ্য কাজ বলেই মনে করে। স্বদেশ ও যুদ্ধবিদ্যা শেখে তারা শৈশব থেকে। এমন শত্রুর সম্মুখীন হতে যে-কোনও বাহিনীর বুক কাঁপার কথা। তার ওপর বাবরের সৈন্যসংখ্যা ছিল এদের তুলনায় নিতান্তই মুষ্টিমেয়। ভরসার মধ্যে ঐ কয়েকটি কামান কিন্তু তা দিয়ে যে রাজপুতদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে এমন ভরসা বাবরের বিশেষ ছিল না।

আবার এই বিপক্ষদলের অধিনায়ক হলেন সংগ্রামসিংহ। তিনি এতদিন সর্বত্র সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে এসেছেন। সেই কাহিনীই একটা ইতিহাস হতে পারে। তিনি যখন বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন তার পূর্বেই বিভিন্ন যুদ্ধে একটি হাত, একটি পা ও একটি চোখ হারিয়েছেন এবং দেহের বিভিন্ন স্থানে আশিটি ক্ষত-চিহ্ন তাঁর সেই বিচিত্র যোদ্ধাজীবনের গৌরব বহন করছে। এ-হেন সেনাপতির অধীনে যে সৈন্যদল যুদ্ধ করবে তাদের আরও কতটা শক্তি বৃদ্ধি হবে!

যাই হোক—বাবর ব্যাপারটা বোঝবার জন্য তাঁর সবচেয়ে সুশিক্ষিত দেড় হাজার তাতার সৈন্যকে মূল দলের অনেক আগে পাঠালেন। কিন্তু তারা সংগ্রামসিংহের শিবিরের কাছাকাছি আসতেই অবস্থাটা যা হ'ল! একটা প্রবল ঘূর্ণি হাওয়ার মুখে ঝরা শুকনো পাতা যেমন কোথায় উড়ে যায়, তেমনি ভাবেই সেই তাতাররা কোথায় মিলিয়ে গেল। অল্প দু'একজন যারা প্রাণ নিয়ে পালাতে পারল তারা কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে স্খলিত কণ্ঠে সেই কাহিনী বিবৃত করল।

এই বিবরণ পেয়ে বাবরের সৈন্যরা একেবারে ঘাবড়ে গেল। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, এ রকম শত্রুর সম্মুখীন হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করতে তারা প্রস্তুত নয়। তারা দিনরাত পরিশ্রম ক'রে নিজেদের শিবিরের চারপাশে বিরাট পরিখা খুঁড়ে তারই ভেতরে বসে ঈশ্বরের নাম জপ করতে লাগল।

বাবর দেখলেন বিপদ। প্রথম প্রথম অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু তারা অটল। যে-যুদ্ধ কোনওমতে জিততে পারবে না তারা—সে-যুদ্ধে গিয়ে লাভ কি? তার চেয়ে বাবর যে কোনও উপায়ে হোক একটা সন্ধি ক'রে ফেলুন।

বাবর ইতিমধ্যে চারিদিকে লোকজন পাঠিয়ে আরও কিছু সৈন্য আনিয়ে দল ভারী করলেন। আর একদল লোককে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে উৎসাহিত ক'রে পাঠালেন অতর্কিতে একটা আক্রমণ ক'রে দেখতে শত্রুর অবস্থা কি—কিন্তু সে দলেরও বিশেষ কেউ ফিরল না। বিরাট শিলাবৃষ্টিতে পরিপক্ক ধানের শীষগুলি যেমন শুয়ে পড়ে, তেমনি করেই সকলে সেইখানে ভূমি আশ্রয় করলে।

এর ফলে বাবরের দলে আতঙ্ক আরও বেড়ে গেল। তারা সবাই বোধহয় সেই দিনই পালাত, যদি না বাবর কোনওমতে নিজেদের শিবিরের গড়খাইয়ের ধারে ধারে কামানগুলো সাজিয়ে কতকটা সুরক্ষিত ক'রে তুলতেন এবং ভয় দেখাতেন যে পালাবার চেষ্টা করলে এই কামান তিনি নিজের দলের ওপরই চালাবেন।

তাতে পালানো বন্ধ হ'ল বটে কিন্তু কাজ কিছু এগোল না।

বাবর প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে হেরে গেলেন। এই সময়টা তিনি নিজেই রোজনাম্‌চায় লিখেছেন ক্ষোভের সঙ্গে : 'হায়, এমন বন্ধু কি আমার কেউ নেই, যে এই বিষম বিপদে শুধু একটু উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করে!'

এই সময়ে সংগ্রামসিংহ যদি বাবরকে আক্রমণ করতেন তাহ'লে মুঘলবাহিনী চূর্ণ হয়ে যেত—আর কোনো শক্তিকে মাথাও তুলতে হ'ত না। কিন্তু বিপন্ন শত্রুকে আক্রমণ করা ক্ষাত্রধর্ম-বিরুদ্ধ ব'লে সংগ্রামসিংহ চুপ ক'রে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সম্মুখ-যুদ্ধে সম্পূর্ণ প্রস্তুত শত্রুকে জয় করাই গৌরবের—তার দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া যে কাপুরুষের কাজ!

বাবর এধারে প্রাণপণে শক্তিসঞ্চয় করতে লাগলেন এবং প্রতিদিনই নিজের সেনানায়ক বা সর্দারদের বোঝাতে লাগলেন।

বাবর নিজের আত্মচরিতেই এ সময়ের কথা লিখে গেছেন : 'কী সেনাপতি, কী সাধারণ

সৈন্য, সকলেই সে সময় ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কেউই প্রকৃত পুরুষের মতো কোনও কাজ করেন নি বা সেরকম কথা একটিও উচ্চারণ করেন নি। উজীররা কেউই সুমন্ত্রণা দেন নি, সেনাপতিরা কেউ উৎসাহ দিতে পারেন নি। সকলেই ভয়ে বিহ্বল।'

যাই হোক্—একটু একটু ক'রে তাঁদের সেই ভীতিবিহ্বল অবস্থাটা কাটতে বাবর একদিন সেনানীদের ডেকে এক প্রচণ্ড আবেগময়ী বক্তৃতা করলেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে মানুষ মাত্রেই মৃত্যুর অধীন, যুদ্ধে না মরলেই যে সকলে বেঁচে থাকবে, এরকম উপায় যখন নেই—এমন কি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে মরবে এমন ভরসাও যখন কেউ দিতে পারবে না, তখন যুদ্ধে যেতে এত ভয় কেন? মরতে তো হবেই—বীরের মতো, মানুষের মতো মরাই ভাল। কলঙ্ক ও অপযশের পাঁকে ডুবে কোনওমতে জীবনরক্ষা করার চেয়ে মরাই কি ভাল নয়? সে রকম ভাবে তো পশুরাই বেঁচে থাকে। সেই জন্যই কি ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন? বিশেষত এ যুদ্ধে যদি জিততে পারেন তো মুসলমানদের এবং ইসলামের গৌরব কত বাড়বে, সেটা তাঁরা ভেবে দেখেছেন কি?

তিনি আরও বললেন, যদি জয়লাভ নাও করতে পারি, মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মবলিদান তো দিতে পারব। এর চেয়ে মানুষের আর কি কাম্য আছে? এই বলে তিনি সেই দিনই তাঁর সঙ্গে যত মদ ছিল সব মাটিতে ঢেলে দিলেন এবং সোনা ও রূপার পাত্রগুলি ভেঙে ফকির দরবেশকে বিলিয়ে দিলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি যতদিন বাঁচবেন ততদিন আর কখনও মদ খাবেন না—দাড়িও কামাবেন না। তাঁর দেখাদেখি আরও অনেক সেনাপতি সর্দারও সেই প্রতিজ্ঞা করলেন। ঈশ্বরের নামে এবং সেই ভক্তির ভাবে সাধারণ সৈন্যদের মধ্যেও একটা উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গেল। বাবর দেখলেন এই সুযোগ, তিনি তখনই তাদের হাতে কোরাণ দিয়ে বললেন, 'এই কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথ করো যে, যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে এবং যতক্ষণ না শত্রু জয় হবে ততক্ষণ কেউ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করবে না বা পালাবার চেষ্টা করবে না!'

তবুও মেবারের ইতিহাস যে ভট্টগণ লিখে গেছেন—তাঁদের মতে, বাবর শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে ভরসা করেন নি। তিনি সন্ধির প্রস্তাবই ক'রে পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গও রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু সর্দার শিলাদিত্য নামে জনৈক তুয়ার রাজপুতকে সংগ্রামসিংহ খুব ভালবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন। তিনি সে সন্ধির প্রস্তাবে রাজী হতে দিলেন না, অথচ গোপনে বাবরকে ব'লে পাঠালেন যে, ভয় নেই যুদ্ধ বাধলে বিপুল একদল সৈন্য নিয়ে তিনি বাবরের দলে যোগ দেবেন। তার বদলে চাই মোটা কিছু টাকা এবং একটা বড় জমিদারী।

তবু যুদ্ধ যখন বাধল তখন বাবর খুবই বিব্রত হলেন। যে কামানের ওপর তাঁর ভরসা ছিল সে কামানও রাজপুতদের খুব বিব্রত করতে পারল না। তারা মরতে মরতে এগিয়ে যায় এবং শুধু তরবারি বা ভল্লের জোরেই কামান দখল করে, গোলন্দাজদের মেরে ফেলে। কামান কত মারবে? মৃত্যুভয় উপেক্ষা ক'রে অনেক লোক এগিয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত একদল তো গিয়ে পৌঁছবেই।

তবে সেনাপতি হিসাবে বাবর খুব পাকা ছিলেন তা আগেই বলেছি। আর এ পক্ষে বিভিন্ন রাজা ও সেনাপতির বিভিন্ন দল, তাদের না ছিল একতা না ছিল বোঝাপড়া। সকলেই স্ব-স্ব প্রধান। সকলেই চাইছে নিজের গৌরব—দলগত জয়ের দিকে লক্ষ্য নেই।

তবুও চলছিল, কিন্তু সহসা সকলে দেখল শিলাদিত্য বাবরের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। শিলাদিত্যের ওপরেই ছিল সেনাবাহিনীর অগ্রভাগের ভার। ফলে যেমন মুঘল সৈন্যদের উৎসাহ বাড়ল তেমনি রাজপুতরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। আর সেই সুযোগে বাবর তিন দিক থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ ক'রে রাজপুতব্যূহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে দিলেন। সে প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করতে পারলে না এরা, বিশেষত বহু বীর এবং খ্যাতনামা যোদ্ধা যুদ্ধের প্রথম দিকেই প্রাণ হারিয়েছিলেন।

এখনকার যুদ্ধ হয় কৌশলে, তখন হ'ত বীর্যের ওপর নির্ভর ক'রে। এখন সেনাপতিরা পিছনে, বহু দূরে বসে থাকেন—তখন তাঁরা সকলের পুরোভাগে যেতেন। সুতরাং মরতেনও আগে তাঁরাই।

এধারে কামানের গোলাতেও বহু লোক প্রতি মুহূর্তে প্রাণ হারাচ্ছিল। এক একটি গোলাতে কয়েকশো ক'রে ঘায়েল হয়।

এ অবস্থায় কতক্ষণ দাঁড়াতে পারে রাজপুতরা? একসময় সকলেই পালাতে শুরু করল। সংগ্রামসিংহ প্রাণে বাঁচলেন বটে কিন্তু চিতোরে আর ফিরে গেলেন না। লজ্জায় ক্ষোভে গভীর বনে গিয়ে আশ্রয় নিলেন তিনি। তাও তিনি আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে কী হ'ত বলা যায় না—হয়ত আর একবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনিও মারা গেলেন।

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ

সামান্য একজন দোকানদার হিমু। রেওয়ারীতে তাঁর বাবার মুদিখানার দোকান ছিল সত্যি সত্যিই। সেই অবস্থা থেকে যে তিনি একদিন আদিল শা শূরের প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠবেন, তা কে ভেবেছিল!

শুধু কি প্রধানমন্ত্রী! বলতে গেলে তিনিই আদিলের রাজ্য শাসন করতেন। শেরশাহের পুত্রের মৃত্যুর পর তাঁর শিশুপুত্রকে বধ ক'রে যে সূরবংশ রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করে তাদের মধ্যে সিকান্দার, ইব্রাহিম ও আদিল শা এই তিনজনে বলতে গেলে রাজ্যটা ভাগাভাগি ক'রে নিয়েছিলেন। তার মধ্যে পাঞ্জাবের সিকান্দার সূরকে পরাজিত ক'রেই হুমায়ুন দিল্লী পুনরধিকার করেন। বাকী দুজনকে পরাজিত করার ওঁর আর অবসরই হ'ল না—দিল্লী প্রাসাদে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে বেচারী মারা গেলেন।

এঁদের মধ্যে আদিল ছিলেন নামে রাজা কিন্তু তিনি একেবারেই অকর্মণ্য ছিলেন। হিমুই ছিলেন আসল শাসক। হয়ত হিমুর নিজেরও একটা উচ্চাশা ছিল—ভেবেছিলেন ভারতে

আবার হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা খুব অসম্ভব নয়। কিন্তু হুমায়ূনের আগমনে তাঁর দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। যদিও আকবর বালক কিন্তু তাঁর অভিভাবক বৈরাম পাকা লোক। সুখ-দুঃখে বহুকাল তিনি হুমায়ূনের অন্তরঙ্গ ও বিশ্বাসী অনুচর ছিলেন। দুঃখে পোড় খেয়ে খেয়ে বহু অভিজ্ঞতাই তিনি সঞ্চয় করেছেন। সেনাপতি হিসাবেও তাঁর খ্যাতি কম ছিল না। সুতরাং বৈরাম পাঞ্জাবে পাকাপাকি ভাবে বসতে পারলে তাঁকে হঠানো কঠিন হবে, বরং তিনিই হয়ত একদিন হিমুকে হারিয়ে দেবেন। অন্তত সে চেষ্টা তো নিশ্চয়ই করবেন—এই ভেবে হিমু আর বৈরামকে নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ দিলেন না, বিরাট এক বাহিনী সংগ্রহ ক'রে যুদ্ধযাত্রা করলেন।

হিমু প্রথমেই আগ্রা ও দিল্লী দখল করলেন। আকবর সে সময়ে থাকেন লাহোরে, সেখানেই তাঁকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়েছে, দিল্লীতে এসে বসবার তখনও অবসর পান নি। দিল্লীর শাসনভার ছিল তারদি বেগ বলে একজনের ওপর। তারদি হিমুর সেই বিপুল বাহিনীর সামনে দাঁড়াতে পারলেন না, দিল্লী ত্যাগ ক'রে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। দিল্লী রক্ষার ভার তাঁর ওপর ছিল অথচ তিনি তা রক্ষা করতে পারেন নি—কাজের এই গাফিলতির জন্য বৈরাম তাঁর প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন।

যাই হোক্—এধারে হিমু দিল্লী দখল ক'রে নিশ্চিন্ত হলেন না কিংবা বৈরামের তরফ থেকে আক্রমণের অপেক্ষাও করলেন না। তিনি সসৈন্যে এগিয়ে চললেন লাহোরের দিকে। তবে বেশী দূর তাঁকে যেতে হ'ল না, মাত্র কয়েক বৎসর আগে যে পাণিপথে বাবর ইব্রাহিম খাঁ লোদীর কাছ থেকে ভারতের সিংহাসন কেড়ে নিয়েছিলেন, সেই পাণিপথেই বাবরের পৌত্রের প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল।

বৈরাম খাঁ প্রস্তুত হবার বেশী সুযোগ পান নি এটা ঠিক—লোকবল নেই, অর্থবল নেই—তখনও পর্যন্ত চারিদিকেই বিশৃঙ্খলা। হুমায়ূন মারা গেছেন তখনও ছ'মাস হয় নি, এরই মধ্যে অতবড় শত্রুর সম্মুখীন হওয়া, প্রায় পরাজয় নিশ্চিত জেনেই এগিয়ে যাওয়া। তবু বৈরামের এত মনের জোর ছিল যে, তিনি এতটুকুও ইতস্তত করলেন না এবং হিমুকে এগিয়ে আসতেও অবসর দিলেন না। নিজেই এগিয়ে এসে হিমুর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন।

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধেও প্রথম যুদ্ধেরই পুনরাভিনয় হ'ল। হিমুর সৈন্যসংখ্যা অগণিত, সে তুলনায় বৈরামের শক্তি-সামর্থ্য নগণ্য। তার ওপর ইব্রাহিমের মতো দুর্বল সেনাপতি ছিলেন না হিমু, তাঁর সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও বেশ শিক্ষা ও শৃঙ্খলা ছিল। সুতরাং বৈরামের সেদিন যুদ্ধজয়ের কোনও আশাই ছিল না—ছিল শুধু ভাগ্যের ওপর ভরসা।

সেই ভাগ্যই সেদিন আকবরের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক অদ্ভুত খেলা খেলল। হিমু তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলবার উদ্দেশ্যে, মধ্যের ব্যূহ স্থির রেখে আর দুটি দল পাঠিয়ে দিলেন বিপক্ষদলের দুপাশ থেকে আক্রমণ করবার জন্য। সামনের দল তখনও আক্রমণ করল না এই জন্য যে, ওধারের আক্রমণে শত্রুপক্ষ যখন দুর্বল হয়ে আসবে, তখনও তাঁর বাহিনীর এই পুরোভাগ থাকবে অক্ষত ও অক্লান্ত, সেই সময় এদের একটা আক্রমণ হ'লেই শত্রু একেবারে অভিভূত হয়ে পড়বে, তাদের মনের বল যাবে হারিয়ে।

সেই হিসেবেই যুদ্ধ হচ্ছিল। হিমুর সঙ্গে কয়েকটা কামান ছিল আর ছিল দেড় হাজারের

ওপর রণহস্তী। প্রথমেই সেই হাতী ছেড়ে দেওয়া হ'ল আর এধার থেকে কামান গর্জন ক'রে উঠল—গুড়ুম, গুড়ুম, গুম! তার পেছনে অশ্বারোহী সৈন্য তো আছেই।

অবশ্য বৈরামের সৈন্যসংখ্যা কম থাকলেও তাঁর অধিকাংশই ছিল তাতারী ও ইরাণী সৈন্য। পাহাড় ও মরুভূমির লোক তারা, ভারতীয় সৈন্যের চেয়ে ঢের বেশী কষ্টসহিষ্ণু। তার ওপর বৈরাম নিজে ছিলেন যেন লোহার মানুষ। কিছুতে কোনও দুর্ভাগ্যই তাঁকে বিচলিত করতে পারত না। বোধহয় তাঁর দলের শেষ সৈন্যটি চলে গেলেও তিনি মনের বল হারাতেন না।

দ্বিপ্রহর পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল অবিরাম। সমস্ত আঘাত সহ্য করল বটে বৈরামের লোক, বিপদ ও মৃত্যুতে বিহ্বল হ'ল না এটা ঠিক, তবু শেষ পর্যন্ত একটু একটু ক'রে তারা যেন হারতেই লাগল। এই সময় হিমু তাঁর পুরোভাগের সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিন্তু এরা হয় নি—এরা তো এতক্ষণ বিশ্রামই করছিল বলতে গেলে। এবার আর বুঝি পারে না বৈরামের দল। অমন যে বৈরাম, তাঁরও মুখ উঠল শুকিয়ে, আর বুঝি আশা নেই। এবার হয়ত পিছু হঠতেই হবে। কিন্তু তিনি জানেন যে, একবার পিছু হঠলেই সর্বনাশ। তাই অন্তিমকালেও যেমন বৈদ্যরা ঔষধ দেয়, তেমনি ক'রে তিনি মুহুর্মুহু চারিদিকে লোক পাঠাতে লাগলেন সৈন্যদের উৎসাহিত করবার জন্য, নানা রকম আশার বাণী দিয়ে।

তবু যায় সব! উৎকণ্ঠিত বৈরাম একমনে তখন ঈশ্বরকে ডাকছেন।

ঈশ্বরও আকবরের উপর সুপ্রসন্ন। অকস্মাৎ কোথা থেকে একটি তীর এসে বিঁধল হিমুর চোখে, হিমু যন্ত্রণায় অধীর হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাঁর অনুচরেরা তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে তাড়াতাড়ি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। ব্যাস, এসব ক্ষেত্রে যা হয়—'রাজা বিক্রম সিংহ (হিমু) মারা গেছেন!' এই রব উঠে গেল চারিদিকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা আতঙ্ক, একটা বিশৃঙ্খলা। মুহূর্ত-পূর্বের বিজয়ী সেনারা হয়ে উঠল পলাতক, ভীত—ও বলতে গেলে পরাজিত। মুঘল সৈন্য বিজয়গর্বে তাদের পিছু পিছু ছুটল এবং নির্মমভাবে হত্যা করতে লাগল। হিমুর বিপুল বাহিনীর আর চিহ্নও রইল না।

এমনি ক'রে দৈব সেদিন অকস্মাৎ আকবরের ললাটে বিজয়টীকা এঁকে দিল—পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে মুঘলদের ভাগ্য নির্ণীত হয়ে গেল।

আর হিমু! হিমুকে স্বহস্তে বধ করলেন বৈরাম খাঁ। বৈরামের যেসব নিষ্ঠুরতার জন্য আকবর বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন তার মধ্যে এই হত্যাও অন্যতম।

গোণ্ডওয়ানার যুদ্ধ

বর্তমান মধ্য ভারতের উত্তরাংশ জব্বলপুরের কাছাকাছি ছোট্ট এতটুকু দেশ গাড়া কাটাঙ্গা—তার ওপরও আকবর বাদশার একদিন নজর পড়ল।

আকবর বলতেন, রাজ্য রাখতে হ'লে তার বিস্তার প্রয়োজন। তুমি যদি পরের রাজ্য আক্রমণ না করো, তাহ'লে পরে একদিন তোমার রাজ্য আক্রমণ করবে। অপরকে মোটে শক্তি সঞ্চয় করতে দেবে না।

আকবর, বলতে গেলে সারা জীবনই, এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর অভিভাবক বৈরাম খাঁর শাসন এবং ধাত্রীমাতা মাহম ও দুধভাই আদম খাঁর ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে যেদিন রাজ্যের শাসনরশ্মি নিজের হাতে নিলেন, সেইদিন থেকেই শুরু হ'ল তাঁর এই রাজ্য বিস্তার। বরং তার আগে থেকেই হয়েছিল—আদম খাঁ ও পীর মহম্মদ মালব জয় ক'রে সুলতান বাজবাহাদুরকে দমন করেছিলেন, তবে সে জয় স্থায়ী হয় নি, বাজবাহাদুর আবারও মাথা তুলেছিলেন, সুতরাং স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করার পর প্রথম যুদ্ধ এই গোণ্ডওয়ানারই।

তার কারণ অবশ্য অন্য কিছু নয়, আকবরের রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব সীমায় কারা প্রদেশের (এলাহাবাদ) ঠিক গায়েই এই রাজ্যটি। আকবর কারা প্রদেশের সুবাদারকেই আদেশ করলেন দেশটি জয় করতে।

কারুর কোনও অনিষ্ট করে নি বেচারীরা। দিল্লী-আগ্রার যুদ্ধবিগ্রহ থেকে অনেক দূরে নিজেদের শান্ত নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রায় সুখী ছিল। অকস্মাৎ সাম্রাজ্যলোলুপ মুঘলের শ্যেন দৃষ্টিতে সে তন্দ্রাতুর জীবনযাত্রা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

ওধারে রাজা বীরনারায়ণ তখন নাবালক। বারো-তেরো বছরের বালক মাত্র। তাঁর মা দুর্গাবতীই দেশের প্রকৃত শাসক ছিলেন। যেমন অসামান্য তাঁর রূপ, তেমনি অসাধারণ মনীষা। রাজ্যের প্রতিটি সংবাদ তাঁর নখদর্পণে, শাসনব্যবস্থার সমস্ত খুঁটিনাটিতে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কোনও পুরুষ রাজার পক্ষেও বোধহয় এমন শৃঙ্খলা ও নিয়মের ওপর শাসন করা সম্ভব ছিল না সেদিন।

রাণী দুর্গাবতীর কাছে যখন আসফ খাঁর দূত এসে বলল, 'শাহানশাহ্ দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করো, বার্ষিক কর দাও এবং যুদ্ধকালে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দাও'—তখন রাণী দুর্গাবতীর চোখে যে প্রলয়াগ্নি জ্বলে উঠবে, এ তো স্বাভাবিক।

তিনি শুধু বললেন, 'দূত অবধ্য, নইলে এ ধৃষ্টতার সমুচিত শাস্তি পেতে। যাও ফিরে গিয়ে তোমার মনিব আসফ খাঁকে এই কথা ব'লো।'

ফলে যুদ্ধ!

দিল্লীশ্বরের বিপুল বাহিনীর পদভরে গোণ্ডওয়ানার মাটি কেঁপে উঠল থর্থর ক'রে।

তাদের কামানবাহক গাড়ি নেমি-নির্ঘোষে আকাশের পাখিরা পর্যন্ত ভয়ার্ত হয়ে উঠল। আর তার কাছে দুর্গাবতীর বাহিনী? বেচারীরা কতকাল যুদ্ধ করে নি তার হিসেব নেই; অস্ত্রশস্ত্র সব মান্ধাতার আমলের। তরবারি ও ভল্ল অব্যবহারে ভোঁতা হয়ে উঠেছে—ঘোড়া ও পোশাক-পরিচ্ছদ তাদের নিতান্তই হাস্যকর!

আর সংখ্যা? সে কথা না বলাই ভাল। মুঘলবাহিনীর এক দশমাংশও নয়, আরও ঢের কম।

কিন্তু সে সমস্ত দৈন্য ঢেকে দিয়েছিল বীরাঙ্গনা দুর্গাবতীর অদম্য সাহস, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অবিচলিত সংকল্প এবং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। তিনি তখনকার দিনের সম্ভ্রান্ত মহিলার সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে নিজে বর্ম ও চর্মে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হলেন। সঙ্গে তাঁর কিশোর পুত্র বীরনারায়ণ। বীরা জননী একমাত্র সন্তানকে নিজে হাতে যুদ্ধসজ্জায় সাজিয়ে দিয়েছেন। স্বাধীনতা যদি না থাকে, পিতৃপুরুষের পৌরুষগর্ব যদি ধূলিসাৎ হয় তো সামান্য জীবন রেখে কি হবে?

সেদিন গাঢ়ার সমস্ত পুরুষ সেই অপূর্ব আদর্শের অসীম উন্মাদনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রাণ যায় যাক্—মরতে তো একদিন হবেই! জন্মভূমি ও রাণীমার জন্য প্রাণ দেওয়া, কলঙ্কিত ও অপমানিত জীবন বহন করার চেয়ে ঢের বেশী আনন্দের! তারা তখন যার যা সম্বল ছিল—বর্ষা বল্লম তরবারি—নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু একে তাতার সৈন্যরা সংখ্যায় বহুগুণ বেশি, তায় তাদের সঙ্গে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, সে অস্ত্রের গল্পমাত্র শুনেছে এরা, চোখে দেখে নি কখনও, জানে না যে তার এক একটি গোলকে একশো লোক নিমেষে নিহত হতে পারে। সে যেন সাক্ষাৎ কৃতান্তের যমদণ্ড।

সে সাংঘাতিক অস্ত্রের সামনে কতক্ষণ দাঁড়াবে এরা?

কিছুক্ষণ যুদ্ধ-করার পরেই দুর্গাবতী দেখলেন যে এ যুদ্ধ চালানো অসম্ভব। দেখতে দেখতে তাঁর সৈন্য-সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেল। তবু তিনি হাল ছাড়লেন না, সাক্ষাৎ চামুণ্ডার মতো অসংখ্য শত্রুবধ ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শত্রুর শোণিতে শুধু তাঁর তরবারি নয়, সমগ্র দেহই লাল হয়ে উঠল।

কিন্তু ক্রমশই চারিদিকে বন্ধু ও সহগামীর সংখ্যা দ্রুত কমে আসতে লাগল। দুর্গাবতী দেখলেন আর উপায় নেই। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন যে এই সময় দু-চারজন বিশ্বাসঘাতক দুর্গাবতীকে জীবিতাবস্থায় শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। সেই কারণেই হোক কিম্বা নিজেই চারিদিকের অবস্থা দেখে বন্দী হবার সম্ভাবনা আছে বুঝতে পেরেই হোক—দুর্গাবতী নিজের অসি নিজের বুকে বসিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

তবুও তাঁর বাকী সৈন্য পালাল না কিংবা আত্মসমর্পণ করল না। বালক বীরনারায়ণ তখনও যুদ্ধস্থলে আছেন—তাদের রাজা! রাজাকে ঘিরে তারা সমানে সেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। বীরনারায়ণ নিজেও নামের সার্থকতা রক্ষা ক'রে অক্লান্তভাবে শত্রুনিধন ক'রে যেতে লাগলেন।

কিন্তু মানুষের যা অসাধ্য তা তাঁরা কি ক'রে করবেন?

অকস্মাৎ একসময়ে কামানের এক গোলার আঘাতে বীরনারায়ণ প্রাণত্যাগ করলেন। বলতে গেলে তাঁর বাহিনীরও আর অবশিষ্ট কেউ রইল না। আসফ খাঁ তখন সেই শ্মশান-সদৃশ প্রাসাদদুর্গে বিজয়গর্বে প্রবেশ ক'রে বহুপুরুষের সঞ্চিত অগাধ ঐশ্বর্যরাশি যথেচ্ছ লুঠ করতে লাগলেন।

রাণী দুর্গাবতীর নশ্বর দেহ সেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হ'ল বটে কিন্তু তিনি আজও আমাদের স্মৃতিতে অজেয় ও অমর হয়ে বিরাজ করছেন।

চিতোরের যুদ্ধ

রাজস্থানের সমস্ত রাজারা যখন একে একে হেঁটমুণ্ডে মুঘল-সূর্য আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেন তখনও নিজেদের উদ্ধত শির সমুন্নত রেখে স্বতন্ত্র দাঁড়িয়ে রইলেন মেওয়ারের মহারাণা।

এ ধৃষ্টতা আকবরের সেদিন ভাল লাগে নি। রাজপুতদের মর্যাদা ও মূল্য তিনি বুঝতেন, বরং বলা যেতে পারে তাঁর চেয়ে কেউই অত ভাল বোঝে নি, সেজন্য বিহারীমল্ল প্রভৃতি যে-সব রাজপুত রাজা বিনা যুদ্ধে বা স্বল্প যুদ্ধে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন তাদের সকলের সঙ্গেই ভদ্র ও হৃদ্য ব্যবহার করেছিলেন আকবর, আর তার ফলেই সেদিন তাঁর রাজ্য বিস্তারের পক্ষে সবচেয়ে সহায় হয়েছিলেন এই সব রাজপুতরাই। কী মন্ত্রণায়, কী যুদ্ধে এবং কী রাজ্যশাসনে আকবর এদের উপরই সবচেয়ে বিশ্বাস করতেন এবং তাতে তিনি ঠকেন নি।

তাই ব'লে রাজপুতদের ওপর যত শ্রদ্ধাই থাক্ মেওয়ারের ঔদ্ধত্য তিনি তো ক্ষমা করতে পারেন না। বিশেষতঃ আগ্রা-দিল্লী-এলাহাবাদের মধ্যেকার বিস্তীর্ণ ও সম্পদশালী ভূমিখণ্ডের সঙ্গে পশ্চিম উপকূলের সিন্ধু, গুর্জর প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চলাচলের প্রধান রাস্তা হ'ল মেওয়ারের মধ্য দিয়ে। ওটাকে নিরাপদ না করতে পারলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয় না, ওপথে তাঁর রাজ্যজয়ের অভিযানও নিষ্কণ্টক হয় না।

তারও ওপর মালবের বিদ্রোহী সুলতান বাজবাহাদুরকে আশ্রয় দিয়ে মেওয়ার আরও অপ্রীতিভাজন হয়ে উঠল। আকবর নিজে মেওয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন।

রাণা সংগ্রামসিংহের অপদার্থ পুত্র, রাজপুত-কুলকলঙ্ক উদয়সিংহ তখন মেওয়ারের সিংহাসনে। তিনি আকবরের আগমনবার্তা পেয়েই চিতোরগড় ত্যাগ ক'রে সপরিবারে আরাবল্লীর গিরিগুহায় পলায়ন করলেন। কিন্তু তাই ব'লে আকবর অনায়াসে চিতোরগড় দখল করতে পারলেন না। মেওয়ারের সর্দাররা, বিশেষ ক'রে জয়মল্ল ও পুত্ত সেদিন আকবরের পক্ষেও বিভীষিকার কারণ হয়ে দাঁড়ালেন।

মেবারের ভট্টগ্রন্থে অবশ্য আছে যে, প্রথম একবার উদয়সিংহ যুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁর মনে ছিল বিষম আতঙ্ক; বিশেষ ক'রে, লোকলজ্জাতেই তিনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন, যুদ্ধে যাবার ইচ্ছা তাঁর আদৌ ছিল না। তাছাড়া কোনও সমর-কৌশল তাঁর

নিজের জানা ছিল না। সৈন্যদলেও ছিল না শৃঙ্খলা। এসব ক্ষেত্রে ফল যা হবার তাই হ'ল, উদয়সিংহ পরাজিত ও বন্দী হলেন।

চিতোরের পক্ষে এর চেয়ে অপমান ও কলঙ্কের কথা আর কিছুই হতে পারে না। চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেল। কিন্তু বিহ্বল সেনাপতিরা যখন কী করবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না তখন ওঁদের অন্তঃপুরের এক দাসী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এলেন। কেউ যদি না যায় তো তিনিই যাবেন, এই হ'ল তাঁর প্রতিজ্ঞা।

সেই মহিলার তেজ ও সাহস দেখে সর্দাররা লজ্জিত হলেন। তখন অনেকেই তাঁর সঙ্গে এগিয়ে গেলেন। মরণপণ ক'রে অমিতবিক্রমে অকস্মাৎ আকবরের শিবিরের ওপরে পড়ে উদয়সিংহকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলেন।

কিন্তু উদয়সিংহ দ্বিতীয়বার আর এ সাহস করলেন না। তিনি চিতোর থেকে যতদূর সম্ভব নিরাপদ গিরিগুহায় আশ্রয় নিলেন। কিন্তু তাই ব'লে চিতোর রক্ষার লোকের অভাব হয় নি সেদিন। চন্দাবৎ সর্দার সহিদাস, বেদনোরের রাজা জয়মল্ল, কৈলবারার ষোড়শবর্ষীয় রাজা পুত্ত—এছাড়া মাদেরিয়া, বৈদলা, কোটারিয়ো, গোয়ালিয়র প্রভৃতি বহু ছোটখাটো দেশের রাজা ও শাসন-কর্তা আপন আপন সেনাদল নিয়ে এগিয়ে এলেন। এঁদের মধ্যে কেউবা মেবারের অধীন সামন্ত, কেউবা তাও নয়। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের শক্তির এই চরম অবমাননার দিনে, হিন্দু সূর্যের এই বিষম বিপদে কে স্থির থাকতে পারে?

আকবর জানতেন যে, চিতোর সহজে হস্তগত করা যাবে না তাই তিনি নিজে এসেছিলেন। সঙ্গে এনেছিলেন অসংখ্য সৈন্য এবং কামান বন্দুক। তিনি ভীমবেগে আক্রমণ করলেন। চিতোরের প্রধান প্রবেশপথ সূর্যদ্বার। সেখানে ছিলেন সহিদাস নিজে। তিনি ও তাঁর চন্দাবৎ সৈন্যরা প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু অসম্ভব যুদ্ধ কতক্ষণ টেঁকে? কামানের গোলা এসে পড়ছে মুহুর্মুহু, এক এক গোলায় কতজন ক'রে মরছে তার ঠিক নেই। বন্দুকের গুলির এক-এক ঝাঁকে কয়েকশো ক'রে রাজপুত বীর ধরাশায়ী হচ্ছেন। আর সেখানে ওদের সেই তীর ধনুক তরবারি ভল্ল বর্শা! আগ্নেয়াস্ত্র বিদেশ থেকে বিধর্মীরা এনেছে, তার কথা ওঁরা জানতেনও না—জানলেও সহজে ব্যবহার করতেন না।

তবু এইরকম অসমযুদ্ধে কত যে মুঘল সৈন্য মারা গেল তার লেখাজোখা নেই। রাজপুত সৈন্যরা এক একটি যেন যমদূত। কয়েকজনকে না মেরে তারা মরতে জানে না। মুঘলরা সাগরের তরঙ্গের মতো বারবার এক একটা ধাক্কায় সূর্যতোরণে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আবার রাজপুতদের কঠিন বেলাভূমিতে ঘা খেয়ে পিছিয়ে আসে। কিন্তু রাজপুতদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। একসময় সহিদাস দেখলেন কয়েক গজের মধ্যে ওরা এসে পড়েছে, আর রক্ষা নেই। তাঁর পাশের লোক, সামনের লোক, এমন কি পিছনের লোকও গুলির আঘাতে মারা গেল। অবশেষে একসময় তিনিও মারা গেলেন।

তখন ষোল বছরের ছেলে পুত্ত সেনাপতির আসন গ্রহণ ক'রে সূর্য-তোরণ রক্ষা করতে লাগলেন। 'অসম্ভব' এবং 'ভয়'—এ দু'টি শব্দ যেন রাজপুতদের অভিধানে নেই।

পুত্ত বালক। বালক শুধু নয়, বিধবা জননীর একমাত্র পুত্র।

তবু ওর মা বাধা দিলেন না। বরং পুত্তের বালিকা বধূকে সমরসজ্জায় সাজিয়ে সঙ্গে

ক'রে নিজেও যুদ্ধ করতে বেরিয়ে এলেন। তাঁর দেখাদেখি আরও অনেক রাজপুত রমণী এলেন যুদ্ধ করতে। সে দৃশ্য রাজপুতদের কল্পনারও অতীত। তাঁদের অন্তঃপুরের মহিলারা কখনও কোনও কারণেই বাইরে আসতেন না—আজ তাঁরাই এলেন যুদ্ধ করতে মুসলমানদের সঙ্গে!

আবার দ্বিগুণ তেজে যুদ্ধ শুরু হ'ল। মহিলাদের হাতেও কম লোক মারা গেল না। পুত্ত বহুক্ষণ যুদ্ধ করলেন। সে যুদ্ধ দেখে আকবর বাদশা পর্যন্ত স্তম্ভিত। বস্তুত জয়মল্ল ও পুত্তের বীরত্বের কথা আকবর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি। আগ্রায় নিজের প্রাসাদে উচ্চ বেদীর উপর এই দুই বীরের পাষাণমূর্তি তৈরী করিয়ে রেখে দিয়েছিলেন।

তবে যত বড় বীরই হোন তাঁরা—সংখ্যায় বহুগুণ এবং শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত শত্রুর সঙ্গে কতক্ষণ যুদ্ধ করবেন? পুত্তও একসময়ে মারা গেলেন, জয়মল্লকে আকবর বাদশা দূর থেকে স্বহস্তে গুলি ক'রে মারলেন। জয়মল্ল যেখানে দাঁড়িয়ে তোরণ রক্ষা করছিলেন, সেইখানেই তিনি ঘোড়া থেকে গুলি খেয়ে মারা যান—সেই স্থানটিতে আকবর একটি স্মৃতিস্তম্ভও তৈরী করিয়েছিলেন। আর যে বন্দুকের গুলিতে তিনি মরেন তার নাম রেখেছিলেন 'সংগ্রাম'—সেটিকে আকবর চিরকাল রক্ষা করেছিলেন। এই থেকেই বুঝতে পারবে যে শত্রু হিসাবে কী দুর্ধর্ষ তাঁরা ছিলেন! নইলে জয় ক'রে এত গর্ব অনুভব করতেন না বাদশা!

জয়মল্ল ও পুত্ত যখন মারা গেলেন তখনই বোঝা গেল যে, চিতোর রক্ষা করা আর সম্ভব হবে না।

আকবর বলে পাঠালেন আত্মসমর্পণ করো।

আত্মসমর্পণ? হাসলেন রাজপুতেরা। বাকী যত পুরুষ ছিল চিতোরগড়ের মধ্যে, আট হাজারের বেশী হবে না—সকলে 'বীরা' চেয়ে নিলেন। 'বীরা' হ'ল বিদায়ের আগে শেষ পানের খিলি। তারপর চিরাচরিত প্রথায় জহরব্রত সম্পন্ন হ'ল। যত মহিলা—বৃদ্ধা, শিশু, বালিকা নির্বিশেষে সকলেই জ্বলন্ত চিতায় উঠলেন। পুরুষরা সকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখলেন। আর তাঁদের নিজেদের জীবনের কোনও মায়া রইল না—পিছনে রইল না কোনও বন্ধন—নিশ্চিন্ত হয়ে পাষাণে বুক বেঁধে তাঁরা সকলে একসঙ্গে চারিদিকের দুর্গদ্বার খুলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুর উপর।

যেন উদ্বেল সাগরের উপর এক পশলা বৃষ্টি পড়ল। দেখতে দেখতে তা কোথায় মিলিয়ে গেল। সাগরেরই জয় হ'ল।

আকবর শূন্য শ্মশান-সদৃশ চিতোরে প্রবেশ করলেন।

এইবার নিয়ে তিনবার চিতোর ধ্বংস হ'ল। এর আগে আর দুবার যে ধ্বংস হয় সে দুবারই কিছু কিছু পুনর্গঠন সম্ভব হয়েছিল কিন্তু এবারের 'তিজু শাক চিতোর'-এর পর আর নূতন চিতোর গড়া সম্ভব হয় নি।

চিতোরের রাজশক্তিকে যে তিনি চিরতরে দমন করেছেন এরই প্রমাণস্বরূপ ওখানকার বিখ্যাত নাকাড়া, যার শব্দ বহু শত মাইল দূর থেকেও শোনা যেত এবং চিতোরেশ্বরীর মন্দিরের বাতিদানের ঝাড়—আকবর সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন নিজের প্রাসাদে।

হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ

আকবর চিতোর ধ্বংস করলেন বটে কিন্তু মেবারের মহারাণাকে পোষ মানাতে পারলেন না। হয়ত উদয়সিংহ একা কর্তা হলে বহুদিনই এসব হাঙ্গামা মিটিয়ে ফেলতেন আকবরের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে কিন্তু তাঁর সামন্ত সর্দারেরা তা করতে দিলেন না। তিনি অবশ্য এর পর বেশী দিন আর বাঁচেনও নি—বছর চারেকের মধ্যেই মারা গিয়েছিলেন। যে কদিন ছিলেন চিতোর থেকে দূরে দূরেই কাটিয়েছিলেন।

উদয়সিংহের পর যিনি মহারাণার পদবী পেলেন তিনি শুধু ভারতের নন, সারা পৃথিবীরই নমস্য। স্বাধীনতার এই একনিষ্ঠ পূজারীর নাম আজ কে না জানে—মহারাণা প্রতাপ!

প্রতাপ বহু দুঃখ ভোগ করেছিলেন সারাজীবন। রাজত্ব পাবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একদিনও তিনি বিশ্রাম পান নি। তাঁর সহায় সম্বল কিছু নেই—লোক নেই, অর্থ নেই, শুধু আছে অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও স্বদেশপ্রেম। আর তাঁর বিপক্ষে যিনি দাঁড়িয়েছেন তিনি তখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী সম্রাট। সুতরাং সারাজীবন তাঁকে যে-ভাবে যুদ্ধ করতে হয়েছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

অথচ ইচ্ছা করলে তিনি সুখে-স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারতেন। আকবর বার বার সন্ধির প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছেন—যে-কোনও শর্তেই আকবর সন্ধি করতে পারতেন, শুধু একটু মৌখিক অধীনতা দেখানো। আকবরের যে স্বস্তি ছিল না এই একটি লোকের নমস্কার না-পাওয়া পর্যন্ত। কিন্তু সেটুকুতেও প্রতাপ রাজী হলেন না। 'ভারতের স্বাধীনতা-অপহরণকারীর সঙ্গে সন্ধি মানেই তো দাসত্ব বরণ করা! তা কখনই করব না—তাহ'লে মাতৃস্তন্য কলঙ্কিত হবে!' তাঁর এই এক কথা।

কিন্তু ঐ সামান্য সহায়-সম্বল নিয়ে তো আর আকবরের সঙ্গে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করা যায় না। তিনি সে চেষ্টাও করলেন না। কমল্‌মীর, গোগুণ্ডা প্রভৃতি পার্বত্য দুর্গগুলিকে সারিয়ে সুদৃঢ় ক'রে নিলেন এবং বেশীর ভাগ এই সব স্থানে থেকেই তিনি রাজ্যশাসন করতেন। তাঁর সৈন্য-সামন্তও কিছু কিছু এই সব দুর্গে, কিছু বা পার্বত্য গুহায় বাস করত। রাজ্যই বা কি! প্রতাপ প্রচার করলেন যে যাঁরা তাঁকে চায়, মহারাণা বলে স্বীকার করে—তারা যেন সকলে সমতলভূমি ছেড়ে পর্বত-কন্দরে অরণ্যে এসে আশ্রয় নেয়। দেখতে দেখতে সবাই চলে এল। যেসব সমতলভূমি একদিন সমৃদ্ধ জনপদ ছিল তা 'বে-চেরাগ' হয়ে পড়ে রইল। অর্থাৎ একটা আলো দেবারও কেউ রইল না। শিগ্‌গিরই তা অরণ্যে পরিণত হ'ল। একটি মাত্র মেষপালক একবার লোভ সামলাতে না পেরে ধালাম নদীর তীরে শ্যামল তৃণক্ষেত্রে মেষ চরাতে এসেছিল, প্রতাপের ভক্তেরা তাকে দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেইখানেই ফাঁসিতে লট্‌কে দিলে।

তবে এদের চলত কিসে?

আগেই বলেছি যে সমৃদ্ধ দোয়ার্ অঞ্চল (গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী অংশ) থেকে পশ্চিম উপকূলে বাণিজ্য করতে যাওয়ার পথটা মেওয়ারের মধ্য দিয়েই নিকট হ'ত। প্রতাপের অনুগত সামন্ত সর্দাররা সুযোগ-সুবিধা পেলেই, মেষ শাবকের ঘাড়ে যেমন বাঘ লাফিয়ে পড়ে, তেমনি অতর্কিতে লাফিয়ে পড়ে খাদ্য, বস্ত্র, সবই লুটে নিয়ে যেতেন। তাছাড়া মুঘল অধিকৃত সমৃদ্ধ জনপদগুলিতে এসে পড়তেন প্রতাপ মধ্যে মধ্যে সসৈন্যে। কেউ প্রস্তুত হবার কি কেউ বাধা দেবার আগেই তিনি নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে চলে যেতেন।

এমনি ক'রে তিনি মুঘলদের সঙ্গেও যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। অকস্মাৎ কোথাও এসে মুঘল সৈন্যদের আক্রমণ ক'রে তাদের বিপর্যস্ত ক'রে, তাদের সাহায্য এসে পৌঁছবার আগেই আবার ফিরে যেতেন। কখনও কখনও এর জন্য তাঁকে অনবরত পর্বতের একটা আশ্রয় থেকে অন্য আশ্রয়ে ঘুরে বেড়াতে হ'ত। মুহূর্তেও বিশ্রাম করার অবকাশ পেতেন না। এমন হয়েছে যে একই দিনে তিনবার রুটি তৈরী হয়েছে কিন্তু খাবার সময় হয় নি—পালাতে হয়েছে সেখান থেকে। কারণ মুঘলরাও প্রতিশাধ নেবার চেষ্টা করত বৈকি। কখনো কখনো হয়ত তাঁর সৈন্য ও অনুচর সংখ্যা মাত্র কয়েক-শ'তে এসে ঠেকেছে, তবু প্রতাপ হতাশ হন নি।

অবশ্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামন্ত সর্দাররাও বিস্তর দুঃখ ভোগ করেছেন। তাঁর অনেক মন্ত্রী ও সর্দার তাঁদের পূর্ব পুরুষপরম্পরায় সঞ্চিত বিপুল বিত্ত নিঃশেষ করে দিয়েছেন তাঁর প্রয়োজনে। প্রতাপের নিজের কঠোর তপস্যা বহু নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গকে আহ্বান করে এনেছে।

কিন্তু এই ভাবে চার পাঁচ বছর কাটাবার পর প্রতাপকে সম্মুখযুদ্ধে আকবরের সামনে দাঁড়াতে হ'ল।

তার কারণটাও খুব সামান্য। অম্বরের রাজা মানসিংহ শোলাপুর জয় ক'রে ফেরবার পথে প্রতাপের আতিথ্য প্রার্থনা করলেন। প্রতাপ তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন বটে খুব ঘটা ক'রেই—কমল্মীর থেকে বহুদূর এগিয়ে এসে পিশোলার (উদয় সাগরের) তীরে তাঁকে স্বাগত সম্বর্ধনা জানালেন এবং তাঁর ও তাঁর অনুচরদের আহারাদিরও বিপুল বন্দোবস্ত করলেন কিন্তু খাওয়ার সময়ে অতিথির সঙ্গে একত্রে বসে খেতে চাইলেন না কিছুতেই। বললেন, যে ব্যক্তি মুঘলদের সঙ্গে আত্মীয়তা করেছে তার সঙ্গে খেতে তাঁর ঘৃণা বোধ হয়।

এটা মানসিংহের পক্ষে চরম অপমানের কথা। তিনি তখনই প্রতিজ্ঞা করলেন যে প্রতাপের সর্বনাশ না ক'রে তিনি ছাড়বেন না। প্রতাপও সদম্ভে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে সেটা দেখা যাবে। এমনি বাক্-বিতণ্ডার মধ্যে কে একজন সর্দার আবার রসিকতা করলেন, 'দেখো আসবার সময় তোমার পিসেমশাই আকবরকেও আনতে ভুলো না।'

আকবর এই সুযোগই খুঁজছিলেন। মানসিংহের মতো সুদক্ষ সেনাপতি তখন ভারতে একটিও ছিল না। এর আগে রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তিনি রাজী হন নি। আকবর

জানতেন যে পীড়াপীড়ি করলেও লাভ হবে না। মন দিয়ে তিনি যুদ্ধ করবেন না। কিন্তু এখন মানসিংহেরই গরজ বেশী—প্রতিহিংসা নেবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। আকবর তাঁর সঙ্গে বিপুল একদল সৈন্য, কয়েকজন পাকা সেনানায়ক এবং যুবরাজ সেলিমকে পাঠালেন। অর্থাৎ আয়োজনে কোনও ত্রুটি না থাকে।

প্রতাপও আর স্থির থাকতে পারলেন না। মানসিংহের কাছে যে স্পর্ধা প্রকাশ করেছেন তারপর আর লুকিয়ে থাকা যায় না। তিনি কোনওমতে বাইশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ ক'রে পাহাড়ে-ঘেরা প্রান্তর হল্‌দিঘাটে অপেক্ষা করতে লাগলেন। হল্‌দিঘাটে থাকার উদ্দেশ্য যাতে শত্রু সংকীর্ণ পথে আসতে বাধ্য হয়, একসঙ্গে বেশী লোক না এসে পড়তে পারে এবং চারিদিক থেকে না ঘিরতে পারে।

মুঘল সৈন্য সংখ্যায় লক্ষাধিক, তাদের সঙ্গে কামান বন্দুক। আর প্রতাপের সঙ্গে রাজপুত সৈন্য বাইশ হাজার, এ ছাড়া স্থানীয় ভীল কিছু ছিল অবশ্য, এরা চিরকালই সুখে দুঃখে মেওয়ারের রাণার সহায়, এরাও মহারাণার এই বিপদে এগিয়ে এসেছিল সাহায্য করতে। অস্ত্রের মধ্যে রাজপুতদের সেই সনাতন তরবারি, ভল্ল, তীরধনুক আর ভীলদের তীরধনুক (তাও অধিকাংশই কাঠের তীর) ও পাথর—এই ভরসা।

তবু প্রতাপ সেদিন যে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, তা মানব-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রথমটা অনলবর্ষী কামান ও বন্দুকের সামনে এগোতে রাজপুতরা একটু ইতস্তত করেছিলেন। প্রতাপ নিমেষের মধ্যেই সেটা লক্ষ্য ক'রে ঘোড়া ছুটিয়ে সকলের আগে এগিয়ে গেলেন মুঘল ব্যূহের দিকে। সেই দেখাদেখি সমস্ত রাজপুত সেনানীরা মহারাণাকে রক্ষা করার জন্য ছুটে গেলেন, তাঁদের সঙ্গে অন্য সৈন্যরা।

ফলে মুঘলব্যূহ ভেদ ক'রে রাজপুতেরা ভেতরে ঢুকে পড়লেন। তারপর শুরু হ'ল কঠোর, নৃশংস ও বীভৎস রকমের হাতাহাতি যুদ্ধ। প্রতাপ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে পাগলের মতো মানসিংহকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। সে সময় যে কত লোক প্রতাপের হাতে নিহত হ'ল তার সীমাসংখ্যা নেই। মানসিংহ জানতেন যে সেদিন প্রতাপের সামনে পড়লে তাঁর আর রক্ষা নেই, তিনিও যতটা সাধ্য দূরে রইলেন।

এই ভাবে মানসিংহকে খুঁজতে খুঁজতে এক সময় প্রতাপ সেলিমের সামনে এসে পড়লেন। অমনি তিনি ভীম-বিক্রমে তাঁকে আক্রমণ করলেন। সেলিম ছিলেন হাতীর ওপর, হাতী তার শুঁড় ও থাবা দিয়ে প্রতাপের চৈতককে বাধা দেবার চেষ্টা করলে বটে কিন্তু চৈতক এক লাফে সামনের দুই পা হাতীর শুঁড়ের ওপর তুলে দিলে, সেই সুযোগে প্রতাপ সবেগে তাঁর বর্ষা নিক্ষেপ করলেন সেলিমের বুক লক্ষ্য ক'রে। কিন্তু সেলিমের চারিদিকে মজবুত লোহার হাওদা ছিল, বর্ষা সেই হাওদায় ঠেকে ফিরে এসে মাহুতকে বিনাশ করল।

অবশ্য ততক্ষণে সেলিমকে রক্ষা করার জন্য বহু লোক এসে ঘিরে ধরেছে প্রতাপকে। সেলিমের হাতী সেই অবসরে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে গেল।

প্রতাপও সমস্ত বাধা ঠেলে সেলিমের পিছনে পিছন যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তার

ফলে চারিদিক থেকে ভীষণ চাপ পড়ল তাঁর ওপর। বহু লোক মারা গেল তাঁর হাতে বটে কিন্তু তিনিও অনবরত আহত হ'তে লাগলেন। তিনটি বর্ষার আঘাত, তিনটি তরবারির এবং একটি গুলির—সর্বসমেত সাতটি ক্ষত তাঁর হয়ে গেছে তখন। এধারে মুঘল সৈন্য যতই মরুক, তাতে তাদের লোকসংখ্যা কমে না, কারণ পিছন থেকে অন্য অক্ষত ও অক্লান্ত সৈন্য এসে তাদের স্থান অধিকার করে। এধারে প্রতাপের তো গোনাগাঁথা সৈন্য, ক্রমেই তারা সংখ্যায় অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। রাজপুত সর্দাররা বুঝলেন যে এবারে ফেরা ছাড়া গত্যন্তর নেই, নইলে প্রতাপকে বাঁচানো যাবে না। আর প্রতাপ গেলে দেশের সব আশা-ভরসাও গেল।

কিন্তু তখন প্রতাপকে সে কথা বোঝাবে কে? তখনও তিনি পাগলের মতো সেলিম বা মানসিংহকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এধারে সেলিম ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন যে, জীবিত বা মৃত যে কেউ প্রতাপকে ধরতে পারবে সে একটা বিশাল জায়গীর পাবে। ফলে সমস্ত মুঘল আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে পড়লেন প্রতাপ স্বয়ং।

ক্রমে এমন হ'ল যে আর বুঝি প্রতাপকে বাঁচানো যায় না। শেষে ঝালা-সর্দার মান্না এক অদ্ভুত সাহস ও উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। প্রতাপের সঙ্গে রাজছত্র ও সোনার রাজচিহ্ন ছিল, তিনি জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে সেগুলি নিজের কাছে নিলেন এবং বললেন, 'মেওয়ারের দোহাই, আপনি নিজেকে বাঁচান, নইলে মেওয়ারের আজ সর্বনাশ!'

মুঘলরা কেউ তো প্রতাপকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনত না, তারা ঐ সব রাজচিহ্ন দেখে মান্নাকেই প্রতাপ মনে ক'রে তাঁকেই আক্রমণ করল। তিনি তাঁর নিজের মুষ্টিমেয় অনুচর নিয়ে যতক্ষণ পারলেন তাদের ঠেকিয়ে রাখলেন, অবশেষে একসময়ে শত্রুর গুলিতে প্রাণ দিলেন।

তাঁর এই অপূর্ব আত্মোৎসর্গের জন্য ঝালা-সর্দাররা আজও মেওয়ারের রাজচিহ্ন ব্যবহার করতে পারেন এবং রাজসভায় মহারাণার ঠিক দক্ষিণ পাশে ওঁদের বসতে দেওয়া হয়।

মান্না যতক্ষণ মুঘলদের ঠেকিয়ে রাখলেন ততক্ষণে ক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত প্রতাপকে নিয়ে চৈতক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একা বেরিয়ে পড়ল। কেউ তাঁকে লক্ষ্য করে নি, শুধু দুটি খোরাসানী ও মুলতানী সৈন্য ছাড়া। ওরা পুরস্কারের আশায় ওঁর পিছু পিছু ছুটেছিল কিন্তু প্রতাপের ভাই শক্তসিংহের হাতে তারা নিহত হ'ল। শক্তসিংহ এর আগে প্রতাপের ওপর রাগ ক'রে মুঘলপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে দাদার বীরত্ব দেখে তাঁর ধিক্কার এল নিজের ওপর। তিনি বিপন্ন প্রতাপের পিছু পিছু ঐ দুটি মুসলমান সৈন্যকে যেতে দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না, তিনিও তাদের পিছনে ছুটলেন।

এইভাবে চরম বিপদের মধ্যে আবার দুই ভাইয়ের মিলন হ'ল।

প্রতাপের সাধের ঘোড়া চৈতক কিন্তু আর বাঁচে নি, প্রভুকে কোনোমতে নিরাপদ স্থানে নিয়ে এসেই পড়ে গিয়েছিল। চৈতক যেখানে মারা যায় আজও সেখানে এক স্মৃতিস্তম্ভ আছে—চৈতক কি চবুতারা।

পলাশীর যুদ্ধ

"সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্য বিপণীর এক ধারে
নিঃশব্দচরণ।
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গ পথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন॥
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে।
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে॥"

—রবীন্দ্রনাথ

ইংরেজরা এসেছিল এদেশে বাণিজ্য করতে, ফরাসীরাও তাই। কিন্তু দৈবাৎ ফরাসী অধিনায়ক ডুপ্লের মাথায় গেল যে এই ষড়যন্ত্রপ্রিয়, অকর্মণ্য, কলহপরায়ণ অসংখ্য রাজা ও নবাবের দেশে একটু শক্তির খেলা দেখালে লাভ বই লোকসান নেই। ইউরোপীয় সৈন্যের যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, তা সেদিন ভারতীয় সৈন্যের ছিল না, অস্ত্রশস্ত্রও খুব আধুনিক ছিল বলে মনে হয় না। সুতরাং শীঘ্রই এই দুটি দেশের বণিকরা ভারতের ইতিহাসে ভাগ্যনিয়ন্তা সেজে বসলেন। কর্ণাটকের যুদ্ধে প্রথমে ফরাসী ও পরে ইংরেজ সৈন্যের শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। শক্তিতে হয়ত দু'দলই সমান কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ইংরেজের, তাই ফরাসীদের ভুলে ও দুর্ভাগ্যে ধীরে ধীরে ইংরেজেরই সুবিধা হ'তে লাগল।

তবে চরম কথা বলা হয়ে গেল ১৭৫৭ সালেই—পলাশীর যুদ্ধে। সেই যুদ্ধের জয়গৌরব ইংরেজদের ললাটে যে কলঙ্কের রাজটীকা এঁকে দিলে তা প্রায় দুশো বছর স্থায়ী হয়ে রইল। না মুসলমান না মারাঠা, না দিল্লী না হায়দ্রাবাদ, না পুনা না মহীশূর—কোনও শক্তিই আর তার অপ্রতিহত বিজয়যাত্রাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।

কলঙ্কের রাজটীকা বলছি এই জন্য যে, সত্যি-সত্যিই সেদিন ইংরেজরা যুদ্ধ ক'রে জেতে নি। হয়ত তাও জিততে পারত কিন্তু যুদ্ধ করার দরকার হয় নি, কয়েকটি বিশ্বাসঘাতক হিন্দু ও মুসলমান দেশকে স্বেচ্ছায় তুলে দিয়েছিল ইংরেজদের হাতে।

কিন্তু তার আগে সে ইতিহাসটা বলি। মুঘলদের শক্তি তখন স্তিমিত, নামেমাত্র সম্রাট আছেন দিল্লীতে।

"শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্ধ্বস্বর বীভৎস চিৎকারে
মুঘলমহিমা।
রচিল শ্মশান শয্যা, মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হ'ল তার সীমা॥"

সুতরাং বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবেদার নবাব-নাজিম আসলে স্বাধীন নৃপতি, মৌখিক একটা স্বীকৃতিমাত্র আছে মুঘল সম্রাটের অধীনতার। আসলে এটা হয়েছিল মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকেই, যাঁর নামে বাংলার তখনকার রাজধানী মুর্শিদাবাদের নাম। মুর্শিদকুলির দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর সেনাপতি আলীবর্দী খাঁ নবাব হন। আলিবর্দীর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা পরাজিত হন পলাশীর যুদ্ধে।

আলিবর্দীর পুত্রসন্তান ছিল না, ছিল তিনটি কন্যা। তিনটি মেয়েরই তিনি বিয়ে দেন তাঁর ভাইয়ের তিন ছেলের সঙ্গে। এক জামাই ছিলেন ঢাকার শাসনকর্তা, আর একজন পুর্ণিয়ার, ছোট মেয়ে আমিনা বেগমের ছেলে সিরাজ নবাবের কাছে কাছে থাকতেন এবং তাঁকেই তিনি উত্তরাধিকারী স্থির করেন। বলা বাহুল্য যে অন্য দুই জামাই এতে খুশী হ'তে পারেন নি। আলিবর্দীর মৃত্যুর পর ঢাকা থেকে ঘসেটি বেগম সৈন্যসামন্ত নিয়ে মুর্শিদাবাদে চলে এলেন এবং যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে লাগলেন (তাঁর স্বামী তখন বেঁচে নেই), আবার এধারে পুর্ণিয়ায় সওকৎজঙ্গও (সিরাজের মাসতুতো ভাই) প্রস্তুত। তার মধ্যে ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজবল্লভ ছিলেন পাকা লোক। সবাই ভেবেছিল যে বালক সিরাজ (সতেরো-আঠারো বছর মাত্র তাঁর বয়স তখন) এদের সঙ্গে পেরে উঠবেন না। ইংরেজরাও তাই ভেবেছিল।

কিন্তু সিরাজ বয়সে যতই নবীন হোন জ্ঞানে কারও চেয়ে কম ছিলেন না। তিনি ইংরেজদের আসল অভিপ্রায়টা এর মধ্যেই ধরে ফেলেছিলেন। তার ওপর তিনি যখন শুনলেন যে ইংরেজরা কলকাতার দুর্গ বেশ ভাল ক'রে সারাচ্ছে এবং প্রাচীরের ওপর কামান বসিয়ে পরিখা কেটে যতদূর সম্ভব সুদৃঢ় ক'রে তুলছে, তখন আর তাঁর বুঝতে কিছু বাকী রইল না। তিনি কড়া চিঠি লিখে কৈফিয়ৎ তলব ক'রে পাঠালেন।

ইংরেজরা তখনও জানে যে রাজবল্লভ জিতবেন। ওরা তাই গোপনে রাজবল্লভের সঙ্গে ষড়যন্ত্র চালাতে লাগল। নবাবের চিঠির কোনও জবাব দিল না। তার ওপর রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণদাস সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে চরম অসদ্ব্যবহার ক'রে যখন কলকাতাতে সপরিবারে পালিয়ে গেলেন, তখন ইংরেজরা তাঁকে সাদরে আশ্রয় দিল।

সিরাজ নবাব হবার সঙ্গে-সঙ্গেই এই।

তিনি কিন্তু রাজবল্লভের সমস্ত ষড়যন্ত্র নিষ্ফল ক'রে দিলেন। কৌশলে ঘসেটিকে নিজের প্রাসাদে এনে নজরবন্দী ক'রে রাখলেন। রইল শুধু সওকৎজঙ্গ, তাকে শাসন করতে খুব বেগ পেতে হবে না—সিরাজ তা জানতেন। কিন্তু তার আগে ইংরেজদের সায়েস্তা করা দরকার।

ঘসেটি বেগমের অবস্থা দেখেই অবশ্য ইংরেজদের চৈতন্য হয়েছিল, তারা বেশ মিষ্টি ক'রে একটা বিনত চিঠি লিখে পাঠালে। তবে মিষ্টি কথাতে ভোলবার লোক সিরাজ নন, তিনি পত্রপাঠ কলকাতার নূতন দুর্গপ্রাকার ভেঙে ফেলবার আদেশ দিয়ে পুর্ণিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সওকৎজঙ্গকে দমন ক'রে আসতে পারলে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে এদিকে মন দিতে পারেন। আলিবর্দী দক্ষ শাসনকর্তা হ'লেও সারা জীবন মারাঠার অত্যাচার

সামলাতে সামলাতেই কেটেছে তাঁর—তিনি নিজের রাজক্ষমতাকে খুব সুদৃঢ় করতে পারেন নি দেশে, দেশবাসীও বর্গীর হাঙ্গামায় পীড়িত, ক্লান্ত। রাজা কে হ'ল বা হবে—তার কী ফলাফল—এ নিয়ে প্রজাসাধারণ কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। সুতরাং সে দুর্দিনে সিরাজের ভরসা ও সহায় বলতে কিছু ছিল না, সেই সতেরো বছরের বালককে শুধুই নিজের বুদ্ধি ও শক্তির ওপর নির্ভর ক'রে চলতে হয়েছিল সেদিন প্রতি পদক্ষেপে!

সে যাই হোক্— পুর্ণিয়ায় পৌঁছবার আগেই সিরাজ রাজমহলে গিয়ে ইংরেজ গভর্নর ড্রেকের চিঠি পেলেন। চিঠির ভাষা যতই মার্জিত ও ভদ্র হোক্—আসল কথাটা হ'ল এই যে, যে দুর্গ ওরা বহু যত্নে সুদৃঢ় ক'রে তুলেছে তাকে ভাঙতে রাজী নয়।

সিরাজ বুঝলেন যে ইংরেজ বড় সহজে মাথা নোওয়াবে না, নুইয়ে দিতে হবে। সওকৎজঙ্গ এমন কিছু ভয়ঙ্কর শত্রু নয়, তাকে যে কোনও সময়েই শেষ করা যেতে পারে—তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী শত্রু হ'ল ইংরেজ। তিনি তখনই মন স্থির ক'রে ফেললেন। রাজমহল থেকে সেই দিনই তাঁবু গুটিয়ে সসৈন্যে রওনা হয়ে অতি অল্পদিনের মধ্যে কাশিমবাজার পৌঁছলেন এবং সেখানে ইংরেজের কুঠী দখল ক'রে আরও কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতায় হাজির হলেন।

এ রকম দ্রুতগতির জন্য ইংরেজরা প্রস্তুত ছিল না। কর্তাব্যক্তি যাঁরা, তাঁরা দুর্গ ও শহর ফেলে জাহাজে চেপে পলায়ন করলেন, যারা রইল অল্প-আয়াসেই তাদের হারিয়ে সিরাজ দুর্গ অধিকার করলেন।

ইতিমধ্যে সওকৎজঙ্গ দিল্লী থেকে সুবেদারীর ফর্মান আনিয়ে নিজেকে নবাব বলে ঘোষণা করেছেন। সিরাজ কলকাতা জয়ের পর বিন্দুমাত্র বিশ্রাম না নিয়ে পুর্ণিয়া চলে গেলেন এবং সেখানে সওকৎজঙ্গকে পরাজিত ও নিহত ক'রে নিজের রাজ্যকে মোটামুটি নিষ্কণ্টক করলেন। অত অল্পবয়সী এক বালকের পক্ষে এ বড় কম গৌরবের কথা নয়—সিরাজও বোধহয় এ সাফল্যে একটু গর্বিত এবং নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। হয়ত ভেবেছিলেন যে ইংরেজ আর সহজে মাথা তুলতে সাহস করবে না।

কিন্তু এইখানেই একটু ভুল হয়েছিল। প্রথমত ইংরেজরা অত সহজে এমন দেশটি ছাড়বার পাত্র নয়, তাছাড়া তাদের সুবিধাও ছিল ঢের। তখন ভারতবর্ষে নৌবহর বলতে কিছু ছিল না। বাণিজ্য জাহাজ ছিল, তারা বাণিজ্য করত—রাজা বা রাজশক্তির কোনও প্রয়োজন ছিল না নৌবাহিনী বহন করার। কারণ হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক, ভারতের কোনও রাজা কোনওদিন সাগর পেরিয়ে পরের দেশ জয় করতে যাবার ইচ্ছা করেন নি। ইউরোপীয় জাতিদের সাত সমুদ্র পেরিয়ে এদেশে আসতে হয়েছিল। তারা শুধু পণ্যই বয়ে আনেনি, নিজেদের রক্ষা করবার জন্য সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রও বয়ে এনেছিল। বিশেষ ক'রে শিবাজী ও অন্য মারাঠা রাজারা যেভাবে লুঠতরাজ করেছিলেন তাতে ওরা আরও সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। নৌবাহিনী নিজেদের হাতে থাকায় এবং সমুদ্রে ভয় না থাকায় ওরা অনায়াসে বিপদের সময় সমুদ্রে পালিয়ে যেতে পারত, যুদ্ধের সময় জলপথে অস্ত্র, লোক

ও রসদ আনাতে পারত ইচ্ছামত। অবরোধ ক'রে, খাদ্য বন্ধ ক'রে ওদের জব্দ করা যেত না। এই জন্যই ওরা এত সহজে ভারতে নিজেদের প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পেরেছিল।

কলকাতার দুর্গ যাবার পর ইংরেজরা ফল্‌তা দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলে। সেখান থেকে জোর ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। ওরা জানত মুর্শিদাবাদের ধনী শ্রেষ্ঠী জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, বিখ্যাত পাঞ্জাবী ধনী ব্যবসায়ী উমিচাঁদ প্রভৃতি ষড়যন্ত্র করছেন সওকৎজঙ্গের সঙ্গে—সুতরাং সওকৎজঙ্গই সিংহাসন পাবে। ওরা উৎসাহ দিয়ে একটা চিঠিও পাঠালে সওকৎজঙ্গকে। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা ষড়যন্ত্রটা ভাল করে পাকবার পূর্বেই সওকৎজঙ্গকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলেন। এতে করে ইংরেজরা একটু দমে গেলেও হাল ছাড়ল না। সিরাজদ্দৌলা কলকাতাতে তাঁর যে কর্মচারী রেখে এসেছিলেন—মানিকচাঁদ, তার সঙ্গে একটা ঘুষের বন্দোবস্ত ক'রে তাকে হাত ক'রে নিলে। মানিকচাঁদের মারফৎই ক্রমে ক্রমে জগৎশেঠ, সেনাপতি মীরজাফর, উমিচাঁদ প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হ'ল। বেশ পাকা রকমের একটা ষড়যন্ত্র চলল উভয়পক্ষে। এই সব প্রধানরা সিরাজের কাছে ইংরেজদের হয়ে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন যাতে কলকাতাটা ওরা ফিরে পায়। ওঁরা বললেন, ইংরেজরা আসলে খুবই নিরীহ, যেটুকু করতে গিয়েছিল ভয়ে পড়েই—এমন কাজ আর কখনও করবে না।

সিরাজও তাই বুঝলেন। তিনি রাজীও হলেন ওদের সমস্ত পূর্ব অধিকার ফিরিয়ে দিতে কিন্তু তার আগেই আর এক ঘটনা ঘটল। কলকাতার পতনের খবর মাদ্রাজ কুঠিতে পৌঁছতে মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তারা মন্ত্রণাসভা ডেকে স্থির করলেন যে যুদ্ধ ক'রেই কলকাতাটা দখল করতে হবে। এক বিরাট বাহিনী সজ্জিত ছিল ফরাসীদের বিরুদ্ধে যাবার জন্য, সেই বাহিনীই ক্লাইভ এবং ওয়াটসনের অধিনায়কত্বে কলকাতা যাত্রা করল।

সিরাজ এসব কিছুই জানতেন না। একেবারে ইংরেজরা যখন ফল্‌তায় নেমে কলকাতার দিকে রওনা হয়েছে তখন তিনি খবর পেলেন। তিনি বিস্মিতও হলেন খুব। যাকে সব দিতেই চাই, সে কেড়ে নিতে আসে কেন? যাই হোক্—মানিকচাঁদ একটা যুদ্ধের ভান করে কলকাতা ছেড়ে মুর্শিদাবাদে পালিয়ে গেলেন। ক্লাইভ নিরাপদে কলকাতা দখল করলেন এবং হুগলীর বহু ধনীর গৃহ লুঠ ক'রে, ভেঙেচুরে নিজের শক্তির পরিচয় দিলেন।

সিরাজ তবু ধৈর্য হারান নি। তিনি বরং ইংরেজদের সব দাবীই মিটিয়ে আলিনগরে এক সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করলেন। ইংরেজরা তাতে সব পুরনো অধিকার তো ফিরে পেলই কিছু ক্ষতিপূরণও পেল। এই সময়ে সিরাজ যে সহ্যশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। আলিনগরের সন্ধির কয়েকদিন আগেই ক্লাইভ এক রাত্রে হঠাৎ নবাবের শিবির আক্রমণ করেন এবং রীতিমতো লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসেন। তবু সিরাজ সন্ধি করতে অসম্মত হন নি।

এরপরে কিন্তু বিরোধ আরও ঘনিয়ে এল। চন্দননগরে ফরাসী বণিকরা বাণিজ্য করে ইংরেজরা এটা পছন্দ করত না। ওরা এইবার চেষ্টা করতে লাগল ওদের উচ্ছেদ করবার।

সিরাজ তাতে বাধা দিলেন। সবাই তাঁর প্রজা, একদল আর একদলকে পীড়ন করবে কেন? নবাবের আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়ে ফরাসীরা নিশ্চিন্ত হ'ল কিন্তু ইংরেজদের মুখ শুকিয়ে গেল। ফরাসীরা যদি নবাবের সাহায্য পায় তো ওদের তাড়াতে কতক্ষণ? ফরাসীদের শক্তি তো কম নয়, আর তারা ওদের দূর করতেই চায় বাংলা দেশ থেকে। সুতরাং এই নবাবকেই তাড়ানো দরকার। এমন নবাব থাকা দরকার যিনি ইংরেজের হাতে কলের পুতুল হয়ে থাকবেন।

সেরকম লোকও মিলল। সেনাপতি মীরজাফরকেই উপযুক্ত লোক বলে ষড়যন্ত্রকারীরা স্থির করলেন। ইংরেজ কোম্পানী লোকজন দিয়ে সাহায্য করবেন, সেজন্য মীরজাফর নবাবী পাবার পর তার মূল্য-স্বরূপ কি কি দেবেন তারও একটা তালিকা তৈরী হয়ে গেল।

এই সংকটকালে নবাবেরও বুদ্ধিভ্রংশ হ'ল। যে ফরাসীদের আশ্রয় দেবার জন্য তিনি ইংরেজের অপ্রিয় হলেন, মীরজাফর প্রভৃতির পরামর্শে সেই ফরাসীদেরও বিদায় দিলেন। অথচ তারা থাকলে যুদ্ধের সময় অনেক সাহায্য পেতেন নবাব। ফরাসীরা ওঁকে ইংরেজের এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সতর্ক ক'রেও দিয়েছিল কিন্তু নবাব কোনও কথা শুনলেন না। উল্‌টে যখন ষড়যন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলেন তখন মীরজাফর প্রভৃতিকে বন্দী করা বা সে সম্বন্ধে কোনও কঠোরতা অবলম্বন করা দূরে থাক তিনি ভয়ে বিহ্বল হয়ে গিয়ে মীরজাফরেরই শরণাপন্ন হলেন। আলিবর্দী মীরজাফরকে কত ভালবাসতেন, সে ভেবেও অন্তত আলিবর্দীর দৌহিত্রকে রক্ষা করা উচিত নয় কি? এমনি কাতর আবেদনে সিরাজ সেই বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের হৃদয় বিগলিত করার চেষ্টা করলেন—বিপুল রাজ্য ও ঐশ্বর্যের লোভ যাকে বিশ্বাসঘাতক করেছে!

মীরজাফরও বিস্তর আশ্বাস দিলেন বৈকি। সে কি কথা, তাঁর জান থাকতে নিমকহারামী হবে না—নবাব নিশ্চিন্ত থাকুন।

নবাবও সেই আশ্বাসে ভুলে মীরজাফরকেই প্রধান সেনাপতি করলেন।

যুদ্ধের তোড়জোড় হ'তে লাগল। সময়ও তখন বিশেষ ছিল না, ইংরেজরা ইতিমধ্যেই এগোতে শুরু করেছে। হুগলি ও কাটোয়াতে নবাবের যে ফৌজ ছিল তারা মীরজাফরের নির্দেশে বিনা বাধায় ইংরেজদের পথ ছেড়ে দিলে। যুদ্ধ করার একটা চেষ্টা-মাত্র করলে না।

নবাবও খানিকটা এগিয়ে এসে পলাশীর আমবাগানে ছাউনি ফেলেছেন। ইংরেজ ২২শে জুন রাত্রে এসে পলাশী পৌঁছল, ২৩শে জুন সকালে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। যুদ্ধ বলা অবশ্য তাকে বিড়ম্বনা। কারণ অধিকাংশ সৈন্যই মীরজাফর ও রায়দুর্লভের অধীনে—তারা কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। শুধু মীরমদন ও মোহনলালের অধীনে মুষ্টিমেয় কজন সৈন্য যুঝতে লাগল প্রাণপণে। কিন্তু তাইতেই ক্লাইভের দুশ্চিন্তার শেষ রইল না। মাত্র আধ-ঘণ্টাটাক লড়াই করার পরই ক্লাইভ তাঁর সৈন্যসামন্ত গুটিয়ে নিলেন—তাঁবুতে গিয়ে মন্ত্রণা করতে বসলেন। স্থির হ'ল যে এখন শুধু এক-আধটু তোপ দাগা চলবে, যুদ্ধ বন্ধ থাকবে, একবারে মধ্যরাত্রে আবার অতর্কিতভাবে আক্রমণ করা হবে। গোপনে

মীরজাফরকেও শাসানো হ'ল—এ তোমার কী ব্যবহার, মোহনলাল মীরমদনকে থামাতে পারছ না?

মীরজাফর অবশ্য সে চেষ্টাও করেছেন। তিনি সিরাজদ্দৌলাকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন অনেকক্ষণ থেকেই যে, যুদ্ধ আপাতত বন্ধ থাক, এখন বড় বেগতিক, বরং কাল সকালে উঠে আমরা প্রাণপণে লড়াই করব, কোনও ভয় নেই।

সিরাজ ইতস্তত করছেন এমন সময় খবর এল, একটা ছুটকো গুলিতে মীরমদন মারা গেছেন। সিরাজ আরও ঘাবড়ে গেলেন। মীরজাফরও সুযোগ বুঝে বললেন, 'দেখলেন তো, মিছিমিছি এভাবে বলক্ষয় করে লাভ কি, যুদ্ধ বন্ধ করতে বলুন।'

সিরাজ মোহনলালকে যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দিয়ে পাঠালেন। মোহনলাল তো অবাক! তিনি বলে পাঠালেন, 'যুদ্ধ ভালই হচ্ছে, জয় আমরা করবই, এখন যুদ্ধ বন্ধ করা কিছুতেই উচিত নয়। তাতে সৈন্যদের মন ভেঙে যাবে—ফল খুব খারাপ হবে।'

নবাব বিপন্ন মুখে মীরজাফরের দিকে চাইলেন। মীরজাফর উদাসীন ভাবে বললেন, 'আমার যা বলবার বলে দিয়েছি—এখন আপনার যা করবার করুন। তবে যদি কোনও বিপদ বাধে আমাকে দোষ দেবেন না!'

কণ্ঠস্বরে দস্তুরমত ভয় দেখানোর সুর।

নবাব একেবারেই হতাশ হয়ে পড়লেন। পাছে মীরজাফর চটে যান তিনি সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি জরুরী হুকুম পাঠালেন যুদ্ধ বন্ধ করার। অগত্যা মোহনলালকে সে কথা শুনতে হ'ল। সৈন্যরা যখন দেখল যে সেনাপতি যুদ্ধ বন্ধ করে ফিরে যাচ্ছেন তখন তারাও রীতিমত ঘাবড়ে গেল। একজন দু'জন করে পালাবার উপক্রম করতেই ভয়টা ছড়িয়ে গেল চারিদিকে। সবাই পালাতে আরম্ভ করলে। এমন কি মীরজাফর ও রায়দুর্লভের সৈন্যরা যারা মোটে যুদ্ধ করে নি—তারাও এখন যে যেদিকে পারল ছুট দিল। দেখতে দেখতে অত বড় শিবির শূন্য।

সিরাজ ব্যাকুল হয়ে সব দেখলেন। বুঝলেন এ দুর্দিনে ওঁর আর কোথাও কেউ সহায় নেই পাশে। তিনিও মনের বল হারিয়ে পালালেন রাজধানীর দিকে। পরের দিন ভোরে একটা শেষ চেষ্টা করলেন কিছু লোকজন সংগ্রহ করার—জলের মতো ঐশ্বর্য ছড়াতে লাগলেন কিন্তু কোথায় কি—চারিদিকেই বিশৃঙ্খলা, সবাই ভয়ে অচেতন। শেষ অবধি একটি মাত্র চাকর ও স্ত্রীকে নিয়ে সিরাজ গোপনে রাজধানী ত্যাগ ক'রে পালাতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু প্রাণটাও বাঁচল না। শেষ অবধি ধরা পড়ে মীরজাফরের ছেলে মীরণের আদেশে নিহত হলেন।

এই হ'ল পলাশীর যুদ্ধ। যুদ্ধটা নামেই—ছেলেখেলা, কিন্তু এই যুদ্ধের ফলটা বহুদূর-প্রসারী। এই যুদ্ধেই ইংরেজের শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হ'ল—বস্তুত ক্রমে ক্রমে শুধু বাংলা কেন সমগ্র ভারতই তাদের করায়ত্ত হ'ল।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

পেশোয়া প্রথম বাজীরাও এমন ভাবে তাঁর উচ্চাভিলাষের উপযুক্ত কর্মক্ষমতা অর্জন করেছিলেন যে আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে তাঁর 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' বা হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন হয়ত আদৌ দুরাশা বলে গণ্য হ'ত না। কিন্তু মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সেই যে তিনি মারা যাবেন তা কে ভেবেছিল? জীবনের মাঝামাঝি এসেই, যখন তাঁর প্রতিভাসূর্য সবে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মধ্যগগনে পৌঁচেছে—তাঁকে নিজের সকল কীর্তির ইতিহাসে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে চলে যেতে হ'ল; নইলে ইংরেজ হয়ত কোনওদিনই দিল্লীর তখ্‌তে বসতে পেত না।

এমন কি নাদির শাহের আগমনের সংবাদ পেয়ে বাজীরাও তার স্পর্ধাকেও চিরদিনের মতো চূর্ণ করার অভিপ্রায়ে নিজের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন, হয়ত তিনি বেঁচে থাকলে তা সম্ভবও হ'ত। ইতিপূর্বে তাঁর 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী'র ধূয়ায় অনেক হিন্দু রাজা সর্বস্ব পণ করেছেন—এবারেও করতেন নিশ্চয়। তাছাড়া বহু মুসলমান প্রধানও তাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্য-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, কেউ কেউ ভয়েও সাহায্য করতে বাধ্য হতেন।

কিন্তু বাজীরাও যখন মারা গেলেন তখন তাঁর ছেলে বালাজী বাজীরাও মাত্র আঠারো বছরের বালক— কিছু বিলাসী ও আরামপ্রিয়। তবুও তিনি সেই ভোগসুখের মোহ বিসর্জন দিয়ে নিজেকে কঠিন ভাবে রাজকার্যে নিয়োজিত করলেন। তখনকার দিনে কর্তব্যের ডাকে সাড়া দেওয়াটা মারাঠাদের রক্তমাংসের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল—কে জানে বালক আর কে জানে শিশু! তবে-বালাজী বাজীরাও পিতার মতো বুদ্ধিমান কূট রাজনীতিক ছিলেন না, পিতার মতো তাঁর দূরদৃষ্টিও ছিল না। তিনি দুটি বড় রকমের ভুল ক'রে ফেললেন, যার ফলে মারাঠা ক্ষমতা ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়ল। প্রথম ভুল হ'ল নতুনকালের সমরকৌশলে মারাঠী সেনাদের শিক্ষিত করবার চেষ্টায় নানা জাতের এবং নানা দেশের ভাড়াটে যোদ্ধাকে এনে ঢোকালেন মারাঠা বাহিনীর মধ্যে—তার ফলে শিবাজীর সময় থেকে মারাঠা বাহিনীতে যে জাতীয়তা বোধ ছিল, তা নষ্ট হয়ে গেল। অখণ্ড একতা এবং একই ভাবের উদ্দীপনা আর রইল না। বরং বিভিন্ন শিক্ষাদীক্ষা ও প্রকৃতির মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ল। আর একটি বড় রকমের ভুল হ'ল বাজীরাও-এর 'হিন্দুপাদপাদশাহী'র ধূয়া বিসর্জন দেওয়া। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে না হোক্— অনুপ্রাণিত ক'রে বাজীরাও ভারতের অন্যান্য হিন্দু রাজাদের মারাঠা-পতাকাতলে সমবেত করতে পেরেছিলেন কিন্তু বালাজীর নির্বুদ্ধিতায় মারাঠারা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই শত্রু ক'রে তুলতে লাগল। তারা মুসলমান নবাবদের কাছ থেকেও যেমন চৌথ নেয়, হিন্দু রাজাদের কাছ থেকেও তেমনি। ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধারূপে গণ্য না ক'রে ভারতবাসীরা ওদের হিন্দু মুসলমান সকলকারই শত্রু বলে মনে করতে লাগল।

তবুও বালাজী কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য চতুর্দিকে বিস্তৃত করতে পেরেছিলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মল্হর রাও হোলকার এবং ভ্রাতা রঘুনাথ রাওকে (বা রাঘবা) বিপুল একদল সৈন্য দিয়ে পাঠালেন উত্তরের দিকে। মারাঠারা সুকৌশলে ভরতপুরের জাঠদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রে আবার উত্তরাংশে নিজেদের শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে তুললে। এর কিছুদিন আগেই উত্তর-পশ্চিম ভারত দুরানীদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছে। যদিও তখন আহম্মদ শাহ্ আব্দালী দিল্লী থেকে চলে গিয়েছেন, সেখানে বাদশার উপর বাদশাহী করার জন্য নাজিবউদ্দৌলাকে রেখে গিয়েছেন—আর পাঞ্জাবে রেখে গিয়েছেন নিজের ছেলে তিমুর শাকে। মারাঠারা ১৭৫৬-তে দিল্লী আক্রমণ ক'রে নাজিবউদ্দৌলাকে পরাস্ত করল। তিনি সন্ধিভিক্ষা করতে বাধ্য হলেন। এর পর রঘুনাথ রাও পাঞ্জাবের দিকে মন দিলেন। পরের বছরে গোড়ার দিকেই ওঁরা পাঞ্জাব দখল করে সেখানে ওঁদের আশ্রিত আদিনা বেগ খাঁকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত ক'রে দীর্ঘকাল পরে দেশে ফিরে এলেন।

আপাতদৃষ্টিতে এ জয় বড় কম নয়। কারণ মারাঠা শক্তি ভারত আফগান সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ল। কিন্তু আসল লাভ বিশেষ কিছু হ'ল না। নগদ টাকা কিছু হাতে তো এলই না—বরং বিপুল ঋণের বোঝা ঘাড়ে চাপল। কারণ বারবার দস্যুর আক্রমণে দেশের ওসব অংশে সম্পদ বলতে আর কিছু ছিল না। এ ছাড়া আহম্মদ শা আব্দালীর আর একটি ভয়াবহ আক্রমণের সম্ভাবনাকেও অবশ্যম্ভাবী ক'রে তোলা হল—কেননা এ অপমান হজম করার লোক তিনি নন, আর সে আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো কোন ব্যবস্থাই রেখে আসা হ'ল না।

আহম্মদ শা আব্দালী এলেনও শীগগিরই।

তখন আদিনা বেগ মারা গেছেন, পাঞ্জাবে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা। দত্তাজী সিন্ধিয়ার অধীনে একটা বড় রকমের বাহিনী পৌঁচেছে বটে কিন্তু তিনিও কোনও সুব্যবস্থা করে উঠতে পারেন নি। ১৭৫৯ সালের শেষভাগে দুরানী সৈন্য যখন ভারতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন দত্তাজী সে আক্রমণ ঠেকাতে পারলেন না। থানেশ্বরের যুদ্ধে হেরে গিয়ে দিল্লীতে পালিয়ে এলেন—দুরানীরাও পিছু পিছু দিল্লীর দিকে রওনা হ'ল। শেষ পর্যন্ত দিল্লীর কয়েক মাইলের মধ্যে বাররী ঘাটের যুদ্ধে দত্তাজী নিহত হলেন এবং মারাঠা সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

এর পর তাদের আবার সংহত ও শক্তিশালী ক'রে তোলা প্রায় অসাধ্য হয়ে পড়ল। মল্হর রাও হোলকার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করলেন—পারলেন না। পেশোয়া তখন সুদক্ষ সেনাপতি সদাশিব রাও ভাও এবং নিজের বালকপুত্র বিশ্বাস রাওকে এক বিপুল বাহিনী দিয়ে পাঠালেন দিল্লী পুনরধিকার করতে।

কিন্তু ইতিমধ্যে বালাজীর বিষবৃক্ষে ফল ধরেছে। এধারে যে আহম্মদ শা রোহিলাদের ও অযোধ্যার নবাবের সাহায্য পেলেন তার মূলেও মারাঠাদের অত্যাচারই দায়ী। অথচ এঁরা কোনও হিন্দুরাজার সমর্থন বা সাহায্য পেলেন না। রাজপুতরা মারাঠা অত্যাচারে জর্জরিত। কেউই কোনও সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না, শিখরাও কেউ এ পক্ষে যোগ দিলে না, এমন কি স্থানীয় অধিবাসীরা পর্যন্ত কোনো সহানুভূতি দেখালে না মারাঠাদের দিকে।

ভারতের আরও বহুশক্তি তখন মারাঠার পতাকাতলে এসে জমতে পারত কিন্তু সে সম্ভাবনাকে তারাই বহু পূর্বে পদদলিত করেছে। শুধু তাই নয়, দিল্লী আক্রমণ করার পূর্বেই সদাশিব তাঁর নিজের সহকর্মীদেরই অনেককে বিদ্বিষ্ট করে তুললেন।

সদাশিব দিল্লী অধিকার করলেন বটে কিন্তু সেখানে তিনি না পেলেন রসদ, না পেলেন কোনও অস্ত্রশস্ত্র। কোথাও থেকে কোনও সাহায্যও পেলেন না। এইভাবে যখন তাঁর পক্ষের সৈন্যরা দুর্বল হয়ে পড়ছে তখন আহম্মদ শা নিজেকে একটু একটু ক'রে অপরাজেয় ক'রে তুলছেন। তিনি আলিগড়ের জাঠ রাজাকে পরাস্ত ক'রে তার কাছ থেকে নানা রকম সাহায্য আদায় করেছেন—সুজাউদ্দৌলা তো আছেনই। এক কথায় তাঁর না রসদ, না অর্থ—কিছুরই অভাব হ'ল না।

যাই হোক্—সদাশিব ১৭৬০ সালের শরৎকালে দিল্লী ত্যাগ করে পানিপথে এসে তাঁবু ফেললেন। আব্দালীও কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে পৌঁছলেন। এমনি ক'রে ইতিপূর্বে যে বিশেষ প্রান্তরটিতে দু-দুবার ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সেইখানেই দু'পক্ষ আবার এসে দাঁড়ালেন সামনাসামনি।

এই যুদ্ধে অবশ্য সবদিক দিয়েই আব্দালীর শক্তি বেশী ছিল। তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল মোট ষাট হাজার। তার মধ্যে ত্রিশ হাজার আফগান সৈন্য এবং ত্রিশ হাজার ভারতীয়। এই ত্রিশ হাজার ভারতীয়ের সবই হ'ল সুজাউদ্দৌলা প্রভৃতি তাঁর মিত্রপক্ষের প্রেরিত। তাঁর নিজের ত্রিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে তেইশ হাজারই ছিল অশ্বারোহী—তাদের ঘোড়াও যেমন মজবুত তেমনি তারা দুর্গম পাহাড়ে অরণ্যে যুদ্ধ ক'রে সর্বপ্রকার কষ্ট স্বীকারেই অভ্যস্ত। ওদের সামনে মারাঠা পক্ষের অশ্বারোহীদের দাঁড়ানো শক্ত। মারাঠাদের মোট সৈন্যসংখ্যাও কম—অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলিয়ে পঁয়তাল্লিশ হাজার। তা ছাড়া দুরানীদের অস্ত্রশস্ত্রও অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং বেশী শক্তিশালী। মারাঠাদের সেই মান্ধাতাআমলের কামান, তার গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে চালকরা মরে যায়, কামান ছোঁড়া আর হয়ে ওঠে না—অধিকাংশেরই এই অবস্থা। দুরানীদের অনেকেরই গায়ে এমন বর্ম ছিল যাতে সাধারণ লৌহাস্ত্র তো নয়ই, আগ্নেয়াস্ত্র বেঁধাও শক্ত। সেসব বর্ম মারাঠারা চোখেই দেখে নি।

এ ছাড়া সেনাবাহিনী গঠনেও ঢের তারতম্য ছিল উভয় দলের। আব্দালী নিজে সামান্য অবস্থা থেকে অত বড় এবং দুর্ধর্ষ সেনানায়ক হয়েছিলেন—তাঁর মনীষা, ব্যক্তিত্ব এবং দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ, যুদ্ধের প্রতিটি খুঁটিনাটি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী যন্ত্রের মতো চলত আর সে যন্ত্রটিও ছিল নিখুঁত। আব্দালী কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মানুষ ছিলেন, এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর দলের যে-কেউ কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করত সে-ই সামরিক নিয়মানুযায়ী কঠোর শাস্তি পেত, তা কে জানে আত্মীয় আর কে জানে সেনানায়ক! অবাধ্যতার কথা কেউ ভাবতেই পারত না। সাধারণ সেনার উপর ছোট ছোট সেনানী, তাদের কয়েকজনের উপর সহকারী সেনাপতি, তাদের উপর সেনাপতি, সেনাপতিদের উপর আব্দালী স্বয়ং—এমন ভাবে এই সুসম্বদ্ধ বাহিনী পরিচালিত হ'ত যে সর্বনিম্নের যে সাধারণ সৈনিক তার গতিবিধিও নিয়ন্ত্রিত করতেন আব্দালী স্বয়ং।

মারাঠা পক্ষেও এই শ্রেণীর নিয়মানুবর্তিতা চালাবার চেষ্টা করেছিলেন শিবাজী—কিন্তু সেটা নানা কারণে সম্ভব হয় নি। তবু বাজীরাওর আমল পর্যন্ত যেটুকু ছিল, বালাজীর নির্দেশে নানা জাতের ভাড়াটে সৈন্য ভর্তি করায় সেটুকুও গেছে। তাছাড়া বিভিন্ন সেনাপতিদের মধ্যেও মিল ছিল না। সদাশিব রাওর ঔদ্ধত্যে অনেক মিত্র বিমুখ হয়েছেন ইতিমধ্যেই—তার মধ্যে সূরযমল জাঠ ও মল্‌হর রাও হোল্‌কার প্রধান।

তবুও তখন-তখনই যুদ্ধ করলে কি হ'ত বলা যায় না। কারণ মারাঠা সৈন্য ইতিপূর্বে সংখ্যা ও শক্তিতে অনেক বেশী বলশালী শত্রুর সম্মুখীন হয়েও তাদের হারিয়ে দিয়েছে—ইতিহাসে সে দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু সদাশিব মিছিমিছি (বোধ হয় আব্‌দালীকে জব্দ করবার অভিপ্রায়েই) আড়াই মাস প্রায় বসে কাটালেন। ফলে জব্দ হলেন নিজেই—রসদ অভাবে উপবাস শুরু হ'ল, নানা রোগও দেখা দিল। তখন আর গত্যন্তর না দেখে সদাশিব রাও ১৭৬১ সালের ১৪ জানুয়ারী দুরানীদের আক্রমণ করবার আদেশ দিলেন। কিন্তু তখন আর মারাঠাদের না আছে দেহের জোর, না আছে মনের।

আব্‌দালী এধারে নিপুণভাবে ব্যূহ রচনা করেছেন। উজীর শা-ওয়ালী খাঁর নেতৃত্বে আঠারো হাজার আফগান সৈন্যকে মধ্যে দিয়ে—পাঁচ হাজার ক'রে সৈন্য পাঠালেন দক্ষিণ ও বাম দিক রক্ষা করার জন্য। এই দুই দলের মধ্যে ডাইনে ও বাঁয়ে রইল ভারতীয় সৈন্যরা, নাজিবউদ্দৌলা, সুজাউদ্দৌলা ও অন্যান্য রোহিলা রাজার নেতৃত্বে, অর্থাৎ ভারতীয়রা ইচ্ছা করলেও যাতে বিশ্বাসঘাতকতা না করতে পারে। আর কিছু সৈন্য রেখে দিলেন ব্যূহের বাইরে—প্রয়োজনমতো তাদের ব্যবহার করবেন বলে।

মারাঠাদের সৈন্যও তিন ভাগে সাজানো হ'ল। মধ্যের প্রধান দল পরিচালনা করবেন সদাশিব রাও নিজে—বামে থাকবেন ইব্রাহিম খাঁ গারদী এবং দক্ষিণে মল্‌হর রাও হোলকার ও জাঁকোজী সিন্ধিয়া।

মারাঠারা প্রথমে খুব বিক্রমের সঙ্গেই যুদ্ধ করেছিল। একা ইব্রাহিম খাঁর দলই প্রায় আট নয় হাজার রোহিলা নিঃশেষ করল। সদাশিব নিজেও মধ্যের দুরাণী সৈন্যকে এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন যে মনে হ'ল আব্‌দালীর ব্যূহ আর টিকবে না। কিন্তু ঠিক চরম মুহূর্তে আব্‌দালী তাঁর তের হাজার সংরক্ষিত সৈন্য এনে ফেললেন এদের সাহায্য করবার জন্য। এ আঘাত ক্লান্ত মারাঠা সৈন্যেরা সহ্য করতে পারলে না। যদিও সদাশিব রাও তাঁর দল নিয়ে সমানেই যুঝে যেতে লাগলেন, কতকটা মরীয়া হয়েই, তবুও বোঝা গেল যে আজ আর মারাঠাদের রক্ষা নেই।

বেলা দুটো নাগাদ বিশ্বাস রাও নিহত হলেন। তবু সদাশিব রাও নিজে হতাশ হন নি কিম্বা মারাঠারাও কেউ ছত্রভঙ্গ হয় নি। কিন্তু তারা যত সাহসীই হোক্—যা অসম্ভব তা কিছুতেই সম্ভব করা গেল না—অপরাহ্ণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মারাঠা বাহিনী যেন কর্পূরের মতো উবে গেল।

রাও নিজেও নিহত হলেন। কয়েকটি দুরানী সৈন্য শকুনের মতো তাঁর মৃতদেহের ওপর পড়ে তাঁর মূল্যবান পোশাক ও অলঙ্কার নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে লাগল। মারাঠাদের এই পরাজয়ের জন্য যদিও সদাশিব রাওয়ের নির্বুদ্ধিতা ও পরমতঅসহিষ্ণুতাই বহুলাংশে

দায়ী—তবু এটা মানতেই হবে যে তিনি কাপুরুষ ছিলেন না, এবং সমস্ত সাধ্য দিয়েই সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার চেষ্টা করেছেন। সহস্র সহস্র মারাঠার রক্তে সেদিন পরাজয় ঠেকানো না যাক্—কাপুরুষতার দুর্নামকে ঠেকানো গিয়েছে নিশ্চয়ই। মারাঠাদের ক্ষতির পরিমাণ শুনলে সত্যই স্তম্ভিত হ'তে হয়। ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে শুধু সৈন্যই নয়, এ ছাড়াও বহু নরনারী সেদিন নিহত হয়েছিল, তা ছাড়া ৫০,০০০ যুদ্ধের ঘোড়া, ২০০,০০০ গো-মেষ-মহিষ প্রভৃতি জন্তু, ৫০০ হাতী এবং কয়েক হাজার উটও নষ্ট হয়েছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক সার যদুনাথ বলেন যে সেদিন মারাঠার ঘরে এমন পরিবার ছিল না, যে পরিবারের কেউ না কেউ ঐ যুদ্ধে মারা গিয়েছে।

পেশোয়ার কাছে এই দুঃসংবাদ এল এক চিঠিতে—'দুটি মুক্তা (সদাশিব ও বিশ্বাস রাও) ভস্মীভূত হয়েছে, বাইশটি মোহর নষ্ট হয়েছে, রূপা ও তামা যে কত ক্ষোয়া গিয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই!'

বেচারী পেশোয়া! এই সংবাদের পর তিনি আর বেশীদিন বাঁচেনও নি—দুর্দান্ত ক্ষয় রোগে কয়েক মাসের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করলেন।

বক্সারের যুদ্ধ

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর নামে স্বাধীন নবাব হলেন বটে কিন্তু স্বাধীনভাবে কিছুই করবার উপায় রইল না তাঁর। ক্লাইভ ইংরেজ কোম্পানীর সামান্য একজন কর্মচারী ছিলেন, হলেন কলিকাতার কুঠীর গভর্ণর কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি নবাবের নবাব হয়ে বসে রইলেন। মীরজাফরের এ অবস্থাটা ভাল লাগল না। তিনি প্রতিবাদ করতে লাগলেন, অবশ্য মৃদুভাবে। তবে তাতে কোনও ফল হ'ল না। বিহারের সহকারী শাসনকর্তা রামনারায়ণ এবং দেওয়ান রায়দুর্লভের ধৃষ্টতা অসহ্য হওয়াতে তাদের সে পদ থেকে সরাতে যাবেন—তাতেও ক্লাইভ বাধা দিলেন। অথচ ক্লাইভকে উড়িয়ে দিতেও পারেন না। বিশেষ ক'রে সিংহাসনে বসবার বৎসর দেড়েকের মধ্যেই যখন দ্বিতীয় শাহ্ আলম বিহার আক্রমণ করলেন তখন ইংরেজের সাহায্য নিয়েই তাঁকে তাড়াতে হ'ল।

অর্থাৎ বোঝা গেল যে স্বাধীন নবাবের নিজের রাজ্যটুকুর স্বাধীনতা রক্ষা করবার ক্ষমতাও নেই।

এইবার মীরজাফর চেষ্টা করলেন গোপনে পর্তুগীজদের সঙ্গে মিতালি করবার। পর্তুগীজরাও তাতে রাজী হয়েছিল, কিন্তু ক্লাইভের চেষ্টায় সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হ'ল, বেদারার যুদ্ধে পর্তুগীজরা শোচনীয়ভাবে হেরে গিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হ'ল।

অবশেষে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফরের জীবনে দুটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটল। ক্লাইভ দেশে ফিরে গেলেন এবং মীরজাফরের একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হ'ল।

এবার প্রশ্ন উঠল, নবাবের উত্তরাধিকারী কে হবেন?

মীরজাফরের সম্বন্ধে মনোভাব ইংরেজদের মোটেই ভাল ছিল না—তার কারণ ওঁর বিশ্বাসঘাতকতা ও অকর্মণ্যতা। তাছাড়া কোম্পানীর বহু টাকা তখনও তিনি পরিশোধ করেন নি।

স্থির হ'ল ও বংশ আর নয়—বরং জামাতা মীরকাসিমকে নবাব করা যেতে পারে। মীরকাসিমের সঙ্গে গোপনে একটা সন্ধিও হ'ল। মীরকাসিমের নগদ টাকা অত ছিল না—তিনি নবাবীটা পেলে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা ইংরেজদের ছেড়ে দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। শ্বশুরের দেনাটা শুধু নগদ শোধ করবেন এই স্থির হ'ল।

কিন্তু সেনাপতি ভ্যান্‌সিটার্ট যখন মুর্শিদাবাদে গিয়ে নবাবের কাছে এই প্রস্তাব করলেন যে মীরকাসিমকে সহকারী সুবাদার করা হোক্ এবং ভাবী উত্তরাধিকারী করা হোক্—তখন মীরজাফর বেঁকে দাঁড়ালেন। অথচ উপায়ই বা কি? কোম্পানীর লোক অটল। এধারে পূর্বেকার ষড়যন্ত্রে যারা বন্ধু ছিল তাঁর, তারাই এখন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। কোনও দিকে কোনও অবলম্বন নেই। তবু মীরজাফরের কোথায় তখনও আত্মসম্মান ছিল একটু অবশিষ্ট—তিনি কোম্পানীর প্রস্তাবে রাজী হলেন না বরং সিংহাসন ছাড়তে রাজী হলেন।

এইভাবে বিনা রক্তপাতে মীরজাফরকে সরিয়ে মীরকাসিম সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব-নাজিমের গদীতে অভিষিক্ত হলেন।

কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে বনিবনাও হওয়া তাঁর পক্ষেও সম্ভব ছিল না।

মীরকাসিম ছিলেন সুদক্ষ শাসক—প্রজাদের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। এধারে ইংরেজদের অত্যাচারে বাঙালী তখন জর্জরিত।

সম্রাট-প্রদত্ত ফরমানে কোম্পানী বিনাশুল্কে বাণিজ্য করবার অধিকারী কিন্তু তাই বলে তো আর কর্মচারীরা নয়! অথচ তখন কোম্পানীর সব কর্মচারীই নিজস্ব বিপুল ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। তারাও কেউ শুল্ক দেয় না, সেজন্য তাদের লাভের অংশ মোটা হয়। প্রতিযোগিতায় এদের সঙ্গে পেরে ওঠে না বাঙালী বা হিন্দুস্থানী ব্যবসায়ীরা। এদের শুল্ক দিয়ে দাম বেশী পড়ে যায়, খদ্দেররা তা শুনবে কেন?

অবশ্য মীরজাফরও এ ব্যবস্থার একটা প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু কোনও ফল হয় নি। মীরকাসিম একটু কড়া প্রতিবাদ করলেন। তার ফলে মুঙ্গেরে ভ্যান্‌সিটার্টের সঙ্গে নবাবের একটা আপোষ বন্দোবস্ত হ'ল। কিন্তু কলিকাতা পরিষদ সে বন্দোবস্ত নাকচ ক'রে দিলেন। তখন মীরকাসিম সমস্ত প্রজাদের ওপর থেকেই শুল্ক উঠিয়ে নিলেন।

ইংরাজেরা পড়ল মহা ফাঁপরে। খোলাখুলি প্রতিযোগিতায় এ দেশের লোকের সঙ্গে ওদের পেরে ওঠা সম্ভব নয়। তারা পীড়াপীড়ি করতে লাগল পূর্বেকার সুবিধা ফিরে পাবার জন্য। এমন কি পাটনা-কুঠীর কর্তা এলিস সাহেব জোর ক'রে নিজেদের সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করলেন। মীরকাসিমের এতটা ধৃষ্টতা সহ্য হ'ল না। তিনি এলিসকে কঠোর হস্তে দমন করলেন। আর তার ফলেই ইংরেজদের সঙ্গে সোজাসুজি যুদ্ধ বাধল।

উভয় পক্ষেই প্রচুর আয়োজন ছিল। ইংরেজ পক্ষে সেনাপতি এ্যাডাম্‌স্ এক হাজার ইংরেজ সৈন্য এবং চার হাজার দেশী সিপাহী নিয়ে এগিয়ে এলেন। নবাবের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা ছিল ঢের বেশী—পনেরো হাজারের কম নয়। তার মধ্যে ইউরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যাও ছিল ঢের। তবু নবাব ইংরেজদের কাছে বার বার হেরেই যেতে লাগলেন, তার কারণ অবশ্য অনেকগুলি। প্রথমত নবাবের সৈন্যদের কোনও নৈতিক আদর্শ ছিল না, বার বার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ওরা যুদ্ধটাকে প্রহসন হিসাবেই ধরে নিয়েছিল। যুদ্ধটাকে যুদ্ধ বলে ভাবতে যেন ভুলেই গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত তারা ভাড়া করা সৈন্য—'দেশ রক্ষা করতে যাচ্ছি' এ কথা তারা কখনও ভাবে নি। ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে আসছে একথা কেউ তাদের বুঝিয়ে দেয় নি। আর সব চেয়ে বড় কারণ হ'ল— সেনানীদের এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্রমাগত ষড়যন্ত্র।

নবাব একটার পর একটা যুদ্ধে হারলেন। কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, সুতী, উদয়নালা, মুঙ্গের—কোথাও কোনওমতে দাঁড়াতে পারলেন না। এইবার তিনি বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলেন এবং বোধ হয় তার মূল কারণও। পিছু হটে পাটনায় গিয়ে সেখানকার কয়েকজন ইংরেজ ও তাঁর বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী ও মন্ত্রীকে বধ ক'রে অযোধ্যায় পালিয়ে গেলেন।

ততক্ষণে ইংরেজদের মূল অভিসন্ধি এবং কূটনীতি সম্বন্ধে প্রায় সবাই সচেতন হয়ে উঠেছেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মুঘলসম্রাট দ্বিতীয় শাহআলম সাগ্রহে ওঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন। তিনজনের মিলিত বাহিনী ইংরেজদের যুদ্ধ দেবার জন্য এগিয়ে বক্সারে এসে শত্রুর সম্মুখীন হ'ল।

কিন্তু এই বিপুল বাহিনীও কোনও সুবিধা করতে পারল না। তার কারণ মোটামুটি এক্ষেত্রেও সমান। তাছাড়াও নতুন কারণও ছিল কতকগুলি। অযোধ্যা, দিল্লী ও বাংলার সৈন্য—কারুর সঙ্গে কারুর যোগাযোগ নেই, বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষার ভাব আছে। যুদ্ধটাকে জিততে হবে, এরকম কোনও দৃঢ় সঙ্কল্প নেই কারুর মনে। সেনাপতিদের মধ্যে দলাদলি ও অর্থলোলুপতা। এক্ষেত্রে কখনও কোনও যুদ্ধ জেতা যায়? ইংরেজ সেনাপতি হেক্টর মন্‌রো এ সবই জানতেন, তাই তিনি উদ্বিগ্ন হন নি। বক্সারের প্রান্তরে স্বল্প আয়াসেই তিনি হারিয়ে দিলেন এদের।

তাও হয়ত শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করলে কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু দিন যখন বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়ে গেছে অথচ তখনও ইংরেজরা পিছু হটেনি বরং তিন দিক থেকে মিলিত বাহিনীকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করছে দেখা গেল, তখন মুঘলসম্রাট ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর পক্ষের সৈন্যরা যুদ্ধে ঢিল দিলে, তিনি গোপনে ইংরেজ দলে যোগ দেবার প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন।

এমনি ভাবে সামান্য যুদ্ধেই মীরকাসিম হেরে গেলেন। মীরকাসিম দক্ষ শাসনকর্তা, কূট রাজনীতিক এবং রণনিপুণ সেনাপতি ছিলেন—তবু যে তিনি কিছুতেই ইংরেজদের সঙ্গে পেরে উঠলেন না, তার প্রধান কারণ আগেই বলেছি, এদেশের সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার

কাঠামোটায় আগাগোড়া ঘুণ ধরে গিয়েছিল। সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা—সর্বত্রই অব্যবস্থা। কি সমর বিভাগ, কি শাসন বিভাগ, কোথাও কেউ এমন ছিল না যে দেশ বা রাষ্ট্রের মর্যাদা রাখতে চায়, যে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা যুদ্ধ না ক'রেই জিতেছিল। কিন্তু মীরকাসিমের সঙ্গে যে কটা যুদ্ধ হ'ল, বিশেষত বক্সারের যুদ্ধ, তাতে ইংরেজদের প্রাধান্য না মেনে উপায় রইল না। এই যুদ্ধের ফলেই ইংরেজদের প্রতিপত্তি বহুগুণ বেড়ে গেল। অন্য সমস্ত রাজারা নবাবরা সমীহ করে চলতে লাগলেন, মুঘলবাদশা তো একরকম আত্মসমর্পণই করলেন বলতে গেলে।

পাগলা ঠাকুর
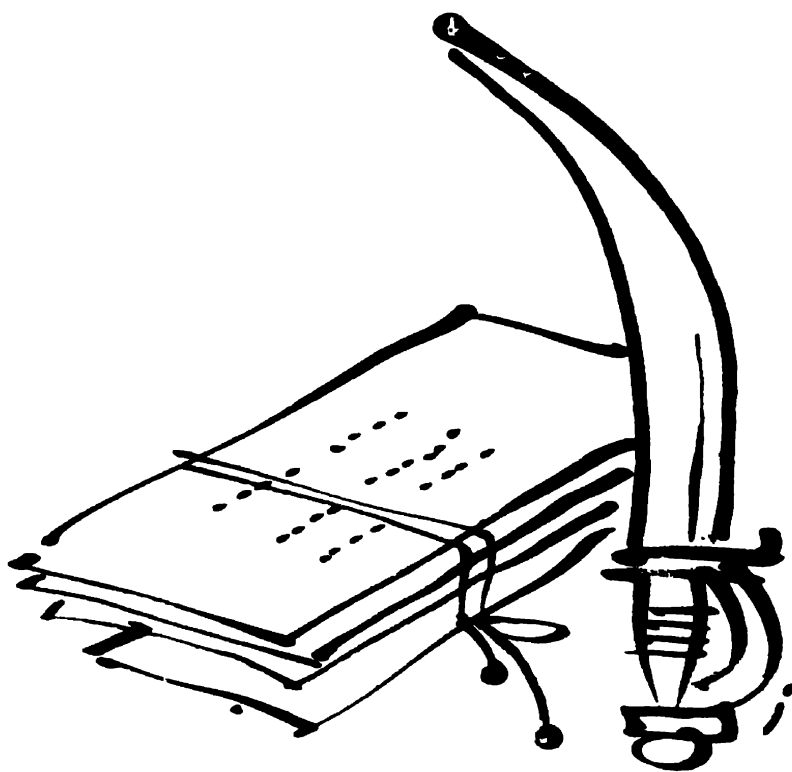
পাগলা ঠাকুর

সবাই বলত, পাগলা বামুন। আড়ালে হাসাহাসি করত সকলে। কিন্তু ভয়ও করতে হ'ত বৈকি।

পাগলার হাতে বিস্তর টাকা। সে-ই খেতে দেয়, বেতন দেয়। পাগলা কোথায় এত টাকা পায় তা কেউ জানে না—নিজে তো খায় সেই তৃতীয় প্রহরে খান-দুই যবের রুটি, কোনদিন শুধু দুটি ভাত। তবে টাকা বামুনটার আছে, এটা ঠিক। প্রতি মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সকলে তার প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে পায়। সে অর্থ কোথায় থাকে তাও কেউ জানে না। জানলেও যে সুবিধা হ'ত তাও নয়, কারণ এধারে ক্ষ্যাপাটেগোছের হ'লে কী হয়, পাগলার অদ্ভুত বুদ্ধি আর অসাধারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি। কোথা দিয়ে, কী ক'রে যে তাদের পেটের কথা টেনে বার করে তা কেউ জানে না। বন্ধঘরের মধ্যে বসে হয়ত দু'বন্ধুতে কী একটা সামান্য কথা কয়েছে—ও বামুন তাও শুনতে পায়, আর অন্যায় কিছু করলে এমন কি করবার উদ্যোগ করলে তো রক্ষে নেই, বামুন কঠিন শাস্তি দেবে।

যে-সে শাস্তিও নয়—একেবারে প্রাণদণ্ড।

বাতাসে যেন ওর কান পাতা থাকে— গাছের পাতাটাও যেন গুপ্তচর...ভয় না ক'রে ওকে উপায় নেই।

বামুন কিন্তু দেখতেও বেশ। দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ—আগুনের শিখার মত চেহারা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, এক নিমেষে সে দৃষ্টি মনের গহনে চলে যায়, তার কাছে কিছু গোপন করা সম্ভব হয় না।

তবে কেন ওকে সবাই পাগলা বলে? এ প্রশ্ন সহজেই মনে জাগে।

পাগলা নয় তো কি? বিন্ধ্যারণ্যের এই গভীর গহনে এসে পাহাড়ীদের সংগ্রহ ক'রে, এমন ক'রে এক সেনাদল গঠন করবার প্রয়োজন কি? জলের মত অর্থব্যয় ক'রে তাদের সাজসজ্জা সংগ্রহ হয়েছে, অশ্বারোহীদের অশ্ব এসেছে বহু দূর থেকে। সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র সংগ্রহ হয়েছে দেশ-দেশান্তর থেকে, যে-দেশের যেটি সেরা—বল্লম, বর্ষা, তীর, মায় গ্রীক যবনদের কাছ থেকে নতুন-শেখা আগুন ছোঁড়বার একটা অদ্ভুত যন্ত্র। প্রতিদিন বামুন নিজে সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষা দেন, কী ভাবে এগোবে, কী ভাবে গেলে বেড়াপাশে ঘেরা যায়, কোন্ হুকুমে বসবে, কোন্ হুকুমে দাঁড়াবে—যে-সব সমর-কৌশলে গ্রীকরা এই পৃথিবীর প্রায় গোটাটাই দখল ক'রে ব'সে আছে, তাও জানা আছে ব্রাহ্মণের, তার সঙ্গে ভারতীয় সমর-কৌশল, যার মধ্যে যতটুকু ভালো বেছে নিয়েছে।

অবশ্য এর ভেতর মাথা-খারাপের কিছু নেই এটা ঠিক, কিন্তু শত্রু কৈ? কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে? কবে?

এসব প্রশ্নের জবাব মেলে না যে!

একদিন একজন প্রশ্নই ক'রে বসল। বললে, 'দেখুন গুরুদেব, আমরা এমনভাবে শূন্যে ঝুলে থাকতে আর পারছি না। স্পষ্টভাবে জানতে চাই যে, আমাদের শত্রু কে, কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে?'

বিরক্তিতে বামুনের ললাটে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এলো, 'তোমাদের দলে ভর্তি করার সময় প্রথম শর্ত কী করিয়ে নিয়েছি, মনে নেই? কখনও কোন প্রশ্ন করবে না, কোন কৈফিয়ৎ চাইবে না, প্রতিবাদ করবে না কোন আদেশের, শুধু যা বলব তাই শুনবে—মনে আছে?'

'অপরাধ ক'রে থাকে শাস্তি দিন। কিন্তু ক'জনকে শাস্তি দেবেন গুরুদেব? এ বাহিনীর সকলেরই এই প্রশ্ন প্রধান।'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব্রাহ্মণ বললেন, 'শত্রু হ'ল বিদেশী গ্রীক যবনরা। শত্রু অত্যাচারী শাসকরা—এদের সকলেরই বিরুদ্ধে আমার অভিযান বৎস। আমি চাই শান্তিপূর্ণ এক অখণ্ড ভারত, যেখানে সবাই সুখী, সবাই নিশ্চিন্ত।'

'তাহলে আমাদের সে অভিযানের আর দেরি কি?'

'দেরি শুধু এই বিপুল বাহিনী পরিচালিত করার মত একজন উপযুক্ত নায়কের আবির্ভাবের—আর কিছু নয়।'

'পরিচালকের অভাব?' প্রশ্নকর্তা বিস্মিত হয়, 'কেন, আপনি?'

'উঁহু।' মাথা নেড়ে ব্রাহ্মণ বলেন, 'ব্রাহ্মণের কাজ নয়। ব্রাহ্মণ মস্তিষ্ক—সে যদি হাত-পায়ে কাজও করতে চায় তো বিপদ ঘটে। দক্ষিণ-পঞ্চনদের ব্রাহ্মণরা বিদ্রোহ করেছিল, সে-বিদ্রোহের মধ্যে আমিও ছিলাম বৎস, কিন্তু সেকেন্দার এক অঙ্গুলিহেলনে সে-বিদ্রোহ দমন করলে। সবই দেখলাম দাঁড়িয়ে। না, ক্ষত্রিয় চাই একজন, ক্ষত্রিয়ের শক্তি—ক্ষাত্রবীর্য ছাড়া এ সম্ভব হবে না। তা ছাড়া যে এই বিজয়-বাহিনী পরিচালনা করবে, সেই হবে ভারতের ভাবী সম্রাট—সে কাজ তো আমার নয়, আমার এই পর্ণকুটিরে, দিনান্তে শাকান্ন...এই-ই আমার ঢের! রাজৈশ্বর্য নিয়ে আমি কি করব?'

বিহ্বল সেনানী আবারও প্রশ্ন করে, 'কবে আসবেন সে ক্ষত্রবীর, কে তিনি?'

'কে তিনি তা জানি না। কবে আসবেন তাও জানি না। তবে আমি তাঁরই অপেক্ষা করছি। আসবেন বৈকি—না এলে যে চলবেই না।'...

সেই দিন থেকেই পাগলা বামুন নামটা পাকা হয়ে গেল সর্বত্র।

আরও দিনকতক পরে অরণ্যের উত্তর প্রান্ত থেকে গুপ্তচর এসে সংবাদ দিলে, 'আপনি যেমন চেয়েছিলেন গুরুদেব, তেমনি এক অদ্ভুত যুবা এসেছে, বনের মধ্যেই—'

'কে সে? কেমন দেখতে?' সাগ্রহে প্রশ্ন করেন ব্রাহ্মণ।

'দেখতে সুশ্রী। হিমালয়ের পাদদেশবাসী ব'লে মনে হয়। একহারা বলিষ্ঠ গঠন। চামড়ার পোশাক, একটিমাত্র ছোট খড়্গ হাতে বনের মধ্যে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খায় গাছের ফলমূল, হরিণ মেরে তার মাংস ঝল্‌সেও খায়—আর গাছের ডালে উঠে রাত কাটায়। বনের পশু বশ করার তার অদ্ভুত দক্ষতা দেখলাম। বুনো ঘোড়াকে অনায়াসে পোষ মানিয়ে চ'ড়ে বসে, আবার হেলায় ছেড়ে দেয় নতুন ঘোড়ার সন্ধান করে। ঐ সামান্য অস্ত্র হাতে

নিয়েই নির্ভীকভাবে হিংস্র পশুদের সামনে দাঁড়ায়—অদ্ভুত সাহস!'

উৎসাহে ব্রাহ্মণের চোখ জ্বলে উঠল। তবু তিনি মনের ভাব দমন ক'রে বললেন, 'আমার ঘোড়া আনো।'

ঘোড়া আসতে তিনি নিজের তীর-ধনুক পিঠে ঝুলিয়ে ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে বসলেন।

'আমরা কে কে যাবো সঙ্গে, গুরুদেব?'

'শুধু তুমি—পথ দেখিয়ে যাবে।'

'কিন্তু পথের বিপদ? আর কিছু না থাক— বন্যজন্তু তো আছে!'

কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন ব্রাহ্মণ, 'তোমায় ভয় করে তুমি থাকো। আমাকে শুধু পথ ব'লে দাও।'

লজ্জিত হয়ে সে লোকটি নিজের ঘোড়ায় চড়ে বসল।

সারাদিন পথ চলবার পর সন্ধ্যার কিছু আগে ওঁরা বনের একটা প্রান্তে এসে পড়লেন।

সহচরটি বললে, 'এমনি স্থানেও কাল তাকে দেখে গেছি, কিন্তু এখন যে ঠিক কোথায় আছে তা কেমন ক'রে জানব?'

'তা তো বটেই। নিদর্শন খোঁজ করতে হবে। দেখ তো বৎস, মনে হচ্ছে ঐ বাবলাগাছের নিচে সদ্য-নির্বাপিত আগুনের চিহ্ন—'

'আশ্চর্য আপনার দৃষ্টি গুরুদেব! ঠিকই দেখেছেন!'

'তাহ'লে দেখ—এখানেই কোথাও আছে সে। সাবধানে খোঁজ করো।'

দুজনেই ঘোড়া থেকে নামলেন। ঘোড়া দুটোকে ঘাস খাবার জন্য ছেড়ে দিয়ে ওঁরা বনপথে সন্তর্পণে এগোতে লাগলেন। সহচরটি কিছু আগে আগে সাবধানে দেখতে দেখতে যাচ্ছে, পিছনে পিছনে ব্রাহ্মণ ধনুর্বাণ উদ্যত রেখে চলেছেন। কারণ সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বনের এ-অঞ্চলটা জনবিরল—হিংস্র পশুর দেখা পাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকাই ভাল।

কিন্তু এ সতর্কতা বিশেষ কাজে লাগল না। অকস্মাৎ পাশের এক ঘন ঝোপ থেকে অতর্কিতে একটি সিংহ এসে লাফিয়ে পড়ল সহচরটির ওপর। সে লোকটি প্রস্তুত ছিল না বটে, তবুও সে যথেষ্ট বলশালী। সে খালিহাতেই প্রাণপণে যুঝতে লাগল সিংহের সঙ্গে। একবার সে সিংহের ওপরে পড়ে, পরক্ষণেই সিংহ ওকে নিচে ফেলে ওপরে ওঠে। এমনি ধস্তাধস্তি চলতে লাগল কয়েক মুহূর্ত ধ'রে। আক্রান্ত লোকটি চিৎকার করতে লাগল তারই ফাঁকে ফাঁকে— 'গুরুদেব, রক্ষা করুন গুরুদেব!...'

কিন্তু ব্রাহ্মণ তীর-ধনুক নিয়ে তৈরী থাকা সত্ত্বেও কিছু করতে পারলেন না, অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। কারণ ওরা এত মুহুর্মুহু ওলট্-পালট্ খাচ্ছে যে, কাকে মারতে কাকে মেরে বসবেন এই তাঁর ভাবনা। এধারে দিবালোক অস্পষ্ট, ঝাপ্সা হয়ে এসেছে—ভাল ক'রে চোখে দেখাও যায় না। কেউ এক মুহূর্তও স্থির নয়। ওঁর সঙ্গে রয়েছে তক্ষশীলার মিশ্রিত-ধাতুর তীর—একবার বিঁধলে আর রক্ষা নেই। ব্রাহ্মণের অনুতাপ হতে লাগল তরবারি সঙ্গে আনেন্ নি ব'লে।

এমন সময়ে এক অঘটন ঘটল। কোথা থেকে এক বুনো ঘোড়াকে তীরবেগে ছুটিয়ে

একটি লোক এসে পড়ল—বন-বাদাড় কাঁটা-গুল্ম মাড়িয়ে ডিঙিয়ে। চোখের নিমেষে সে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে পড়ল সিংহের ওপর। নিজের একমাত্র অস্ত্র, হাতখানেকের চেয়েও খর্ব একটি অসির সাহায্যে সেই সিংহের সমস্ত পিঠটা দ্বিখণ্ডিত ক'রে দিল—বিস্মিত ব্রাহ্মণের চোখের পলক পড়বার আগেই।

ততক্ষণে ব্রাহ্মণের সহচর লোকটি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। সামান্য যে দিনের আলোর আভাস তখনও ছিল, তাইতেই ব্রাহ্মণ বন থেকে কী সব লতাপাতা ছিঁড়ে আনলেন। আশেপাশে যেসব পাথর পড়েছিল তাইতে ছেঁচে সেই সব ঔষধির প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া হ'ল লোকটির ক্ষতে। দেখতে দেখতে ওর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

এতক্ষণ নবাগত যুবকটিও নিঃশব্দে ব্রাহ্মণকে সাহায্য করছিল। এইবার সে উঠে, ওঁকে ব্রাহ্মণ দেখে প্রণাম ক'রে উত্তর-ভারতীয় পার্বত্য-ভাষায় প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কে? এই বনের মধ্যে এমন সময়ে কেন এসেছেন?' ব্রাহ্মণ হাসলেন, তারপর সেই ভাষাতেই উত্তর দিলেন, 'যদি বলি, তোমার খোঁজে এসেছি!'

'তাহ'লে বিস্মিত হবো বৈকি।'

'বৎস, বিস্ময়ের কথা হলেও তা সত্য।'

'আমার খোঁজে? আমার কি পরিচয় জানেন? এখানে আছি কেমন ক'রে জানলেন?' যুবার কণ্ঠে ঈষৎ ভয়ের সুর ফুটে উঠল।

'বৎস, ভয় নেই, মাভৈঃ! তোমার পরিচয় তোমার শৌর্য। আমার গুপ্তচররা তোমার মত বুদ্ধিমান, কর্মঠ এবং নির্ভীক যুবা খুঁজে বেড়াচ্ছিল, এই লোকটি আজই প্রভাতে গিয়ে তোমার সন্ধান দেয়। এ আড়াল থেকে তোমার কার্যকলাপ সব লক্ষ্য করেছে—'

'কিন্তু কেন?' অসহিষ্ণুভাবে সে প্রশ্ন করে, 'আমাকে আপনার কি প্রয়োজন? কেন প্রতীক্ষা করছেন আমার মত যুবকের?'

'অখণ্ড ভারতের সিংহাসন দেবো ব'লে প্রতিজ্ঞা করছি ঃ ণ, প্রয়োজন—অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার।'

'সিংহাসন দেবেন? আপনি?...আপনি কি বাতুল?'

'অঘটনও কখনও কখনও ঘটে থাকে। অত উতলা হয়ো না, মন দিয়ে শোনো। বিদেশী যবনদের অধীনতা অসহ্য হওয়াতে, পঞ্চনদের দক্ষিণে দেশবাসীরা বিদ্রোহী হয়েছিল—তা জানো?'

'না, জানি না। তার বহু পূর্বে আমি পলাতক। বনে ও অরণ্যে আত্মগোপন ক'রে আছি।'

'সে বিদ্রোহ করেছিল ব্রাহ্মণরা। তারা পরাজিত হয়েছে। ব্রাহ্মণরা যে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী নয়, তা তারা ভুলে গিয়েছিল। আমিও সে-দলে ছিলাম, আমি সেখান থেকে আসি মগধে, নন্দবংশীয় মহারাজ-চক্রবর্তীকে ভারতের রাজন্য-সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানাতে—কিন্তু সে সম্ভাবনা বুঝিয়ে দেবার আগেই বাতুল বোধে সে আমাকে অপমান

ক'রে তাড়িয়ে দেয়। তারপর অসহ্য ক্রোধে দিশাহারা হয়ে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় ভগবান যেন হাত ধ'রে আমাকে টেনে আনলেন এই গহন অরণ্যে...বহুযুগ পূর্বেকার কোন অনার্য রাজার সঞ্চিত বিপুল গুপ্তসম্পদ খুঁজে পেলাম একরকম বিনা আয়াসেই। বুঝলাম এ তাঁরই নির্দেশ। সেই থেকেই অক্লান্ত চেষ্টায় এক বিপুল বাহিনী গড়ে তুলেছি, তাদের যথাসাধ্য শিক্ষাও দিয়েছি—যাবনিক-রণকৌশলও তাদের শিখিয়েছি। অস্ত্রসম্ভারও প্রস্তুত, প্রয়োজন ছিল শুধু নেতার। তুমি সেই নেতৃত্ব নাও বৎস। আমি মন্ত্রণা দিতে পারি, কিন্তু যুদ্ধ ব্রাহ্মণের জন্য নয়।'

'কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল এক যুবককে—'

'অজ্ঞাতকুলশীল হয়ত কিছু পূর্বেও ছিলে, কিন্তু এখন আর নও। তাছাড়া কুলশীল তুচ্ছ, মানুষের শৌর্যই তার আসল পরিচয়।'

'আপনি আমাকে চেনেন?' বিস্ময়ে যুবকের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

'চিনেছি। মৌর্যকুলে তোমার জন্ম, তুমি ক্ষত্রিয়। তোমার নাম—নামও বোধ হয় মনে আছে—চন্দ্রগুপ্ত, না?'

'তারপর?' ভীতবিহ্বল দৃষ্টিতে যুবক চায় ওঁর দিকে।

'তুমি ভাগ্যান্বেষণে এসে পড়েছিলে পুরুরাজ-সভায়। সেখান থেকে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে সেকেন্দারের কাছে যাও, না? তারপর কী একটা গর্হিত কাজ করায়—'

'গর্হিত কাজ নয় ঠাকুর, মদ্যপানের জন্য তাকে কঠোর তিরস্কার করেছিলাম।'

'তাই হবে হয়তো—সে তোমাকে প্রাণদণ্ড দেয়। তুমি তার কবল থেকে পালিয়ে যাও। কেমন, এই না?'

'হ্যাঁ, সবই ঠিক। কিন্তু আপনি কেমন ক'রে জানলেন এত কথা?'

'ভেবে দেখ—পুরুরাজ-সভায় যখন আম্ভীর-দূত আসে, আমিই তোমাকে উৎসাহিত করেছিলাম সেকেন্দারের কাছে যাবার জন্য!'

'মনে পড়েছে গুরুদেব। আপনি তক্ষশীলার ব্রাহ্মণ—চাণক্য।...অপরাধ ক্ষমা করবেন।'

'বিচিত্র আমাদের মিলন বার বার। এ বিধাতারই ইচ্ছা। চল বৎস, তোমার বাহিনী প্রস্তুত। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, সারা ভারত আজ এক বিজয়ী-বীরের পদধ্বনির দিকে কান পেতে আছে, ধরিত্রী আজ যবনের অত্যাচারে নিপীড়িত, তুমি জাগো, সকল অত্যাচার ও অবিচার থেকে ভারতবাসীকে রক্ষা করার দায়িত্ব যে তোমারই।...'

চন্দ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণকে প্রণাম ক'রে পদধূলি নিলেন।

অর্থের মূল্য

সে অনেক, অনেকদিন আগেকার কথা। এখন থেকে কয়েকশ’ বছর আগে যেতে হবে তোমাদের মনে মনে।

চেঙ্গিজ খাঁর নাম শুনেছ তো? কে না শুনেছে! সেই বর্বর এবং দুর্ধর্ষ তাতার যোদ্ধা এশিয়ার অনেকখানি ও ইউরোপের অর্ধেকের বেশী অংশ জয় ক’রেছিলেন নিজের বাহুবলে। যেখান দিয়ে তাঁর বিজয়বাহিনী গিয়েছে, রোলারের সামনে কাঁকরের মত সব দলে-পিষে সমান হয়ে গিয়েছে। হত্যা, অগ্নিকাণ্ড, লুণ্ঠন—অপরাজেয় তাঁর তাতার বাহিনী সর্বত্র এমন এক বীভৎস স্মৃতিচিহ্ন পেছনে ফেলে গেছে যা সহজে মিলোয় নি। বহুদিন পর্যন্ত লোকের মনে ভূতের ভয়ের মত চেপে বসেছিল।

সেই চেঙ্গিজ খাঁরই বংশধর হুলাগু খাঁ যখন বাগদাদের একেবারে কাছে এগিয়ে এলেন, দুর্দান্ত এবং বিরাট তাঁর তাতার বাহিনী নিয়ে—তখন সকলকারই মুখ গেল শুকিয়ে।

আজ পর্যন্ত কেউ হুলাগুকে বাধা দিতে পারে নি বটে, তাই বলে বাগদাদ? বিশ্বাসী মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান এবং ধর্মগুরু পরাজিত হবেন বর্বরদের* কাছে?

অনেকেই স্থির করলেন যে প্রাণপণে একটা বাধা দিতে হবে, শেষ চেষ্টা করতে হবে একবার। কিন্তু কি নিয়ে করবেন? কৃপণ সম্রাট সৈন্যদের মাইনে দেন নি বহুকাল, তাদের বেশভূষা ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্রের তেমনি শোচনীয় অবস্থা। যেখান থেকে যা টাকা আসে যক্ষের মত আগলে রাখেন। কোনদিন কোন কাজে এক পয়সা খরচ করতে চান না। প্রধান রাজপুরুষরা পর্যন্ত এতে বিরক্ত, উত্যক্ত। চারিদিকেই অসন্তোষ, চারিদিকেই বিশৃঙ্খলা।

তবু প্রধান নাগরিকরা একবার সম্রাটের কাছে গিয়ে পড়লেন, ‘এখনও সময় আছে হে বিশ্বাসীশ্রেষ্ঠ, হে সম্রাট! এখনও কিছু খরচ করুন! সৈন্যদের বেতন দিন, অস্ত্রশস্ত্র খরিদ করে দিন, আমরা শেষ চেষ্টা দেখি একবার।’

সম্রাটের মুখ শুকিয়ে উঠল, ‘সে কি! টাকা? টাকা কোথায় পাবো? আপনারা যা মনে করেন তা নয়—থাকলে কি আর ওদের দিই না? আমাকে অতিকষ্টে চালাতে হয়।’

তারপর একটু থেমে বললেন, ‘আমার বিশ্বাসী প্রজারা যদি আমাকে এবং তাঁদের দেশকে রক্ষা করতে বিনিময়ে অর্থ চান তো সে বড় লজ্জার কথা হবে—বড়ই লজ্জার কথা! এ তো তাঁদের কর্তব্য।’

সুতরাং কিছুই হ’ল না। খালিপেটে দেশের কাজ করতে বা রাজার প্রতি কর্তব্য পালন করতে বিশেষ কেউ উৎসাহ দেখাল না। অনাহারে যদিবা যুদ্ধ করা যায়, কি নিয়ে যুদ্ধ

---

* খাঁ পদবী দেখে ভেবো না যেন চেঙ্গিজ খাঁ মুসলমান ছিলেন। এঁরা মুসলমান হন অনেক পরে। হুলাগু খাঁও মুসলমান ছিলেন না।

করবে? আর দেশের নাগরিকদেরও এমনভাবে নিঃশেষে শুষে নিয়েছেন রাজা যে তাদেরও বিশেষ-কিছু হাতে নেই। চাঁদা দিতেও কেউ রাজী হ'ল না।

হুলাগু একরকম অনায়াসেই বাগদাদ জয় ক'রে বিজয়গর্বে প্রাসাদে ঢুকলেন। খলিফা ওঁর হাতে বন্দী হয়েছেন—কোন রকম বেগ পেতে হয় নি কোথাও, সেজন্যে মনটা খুব খুশী ছিল তাঁর। সম্রাট পালাতে পারতেন, কিন্তু সঞ্চিত ধনের মায়ায় তা পারেন নি।

প্রাসাদে ঘুরতে ঘুরতে কোষাগারে ঢুকে হুলাগু খাঁ স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

এ কি! এ যে কুবেরের ঐশ্বর্য! রাশি রাশি সোনা, হীরা, মুক্তা—নানান মূল্যের জহরৎ!

'সম্রাট, এত টাকা থাকতে আপনি রাজ্য রক্ষা করতে পারলেন না? আপনার সেনারা যুদ্ধ করল না?'

জিভ শুকিয়ে আসে সম্রাটের। টাকার নেশায় হাত- পা অবসন্ন। দুশ্চিন্তায় কথা কইতে পারেন না যেন, অনেক কষ্টে চেষ্টা করে হেসে বললেন, 'না না, এ আর এমন কি! এই তো মোটে যৎসামান্য। সব ওদের দিলে নিজে খেতুম কি?'

যে অর্থলোভ ওঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠল, কথাটা বলবার সময় তা হুলাগুর চোখ এড়াল না। তাঁর মুখের ভাব কঠিন হয়ে এল। তিনি শুধু বললেন, 'হুঁ, তা বটে। কতই বা—খেয়ে বাঁচতে হবে তো!'

তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এগুলি আপনার বড় প্রিয়, না?'

সাগ্রহে, দুরাশায় ঝুঁকে পড়ে বললেন সম্রাট, 'বড্ড প্রিয়, প্রাণের চেয়েও—'

'বেশ তাই হোক। এগুলো ছেড়ে থাকতে হবে না আপনাকে। আপনি এইখানেই থাকুন। খাবার জন্য তো এ সবই রইল। এই, কে আছিস রে—ওঁকে এই ঘরে পুরে রেখে দে। জল কিংবা খাবার দেবার দরকার নেই। খাওয়ার পাছে অভাব হয়, এই ভয়েই উনি যৎসামান্য এইসব জমিয়ে রেখেছেন।'

তাই হ'ল।

সেই বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে সম্রাট বন্ধ হয়ে রইলেন।

কিন্তু অত সম্পদও তাঁকে বাঁচাতে পারল না। সামান্য একখানা পোড়া রুটি আর এক পেয়ালা জলের অভাবে শুকিয়ে মারা গেলেন তিনি—তিন-চারদিনের মধ্যেই।

সামান্য ভুল

বিসমার্ক গত শতাব্দীর সব চেয়ে বড় রাজনীতিক ছিলেন, এমন কথাও কেউ কেউ বলেন। এখন আমরা জার্মানীর নাম করতে যা বুঝি, বিসমার্কই ছিলেন তার স্রষ্টা। আগে ঐখানে ছিল অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্য—তার কোন-কোনটা হয়ত একটু বড়, কয়েকশ' বর্গ-মাইল—আবার কোন-কোনটা এতটুকু, কয়েক বর্গ-মাইলের মধ্যেই তাদের যা-কিছু হাঁকাই-হোঁকাই—রাজক্ষমতা। আর ওখানকার যারা রাজা বা শাসক, আগেকার ভারতের দেশীয়

রাজাদের মতই কেবল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লড়াই আর রেষারেষি নিয়ে থাকত। এই অসংখ্য রাষ্ট্রগুলিকে এক এবং সংহত করে নিয়ে বিসমার্কই প্রুশিয়ার রাজার অধীনে এক বিরাট ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। সেই জার্মান সাম্রাজ্যই এই শতাব্দীতে এসে পৌঁছে পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে সারা পৃথিবীর ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল।

যাই হোক্— বিসমার্কের কথা হচ্ছিল।

আমরা যখনকার কথা বলতে বসেছি, বিসমার্ক তখন প্রুশিয়ার রাজদূতরূপে রুশ দেশে গেছেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার তখন রুশ দেশের সম্রাট— প্রবলপ্রতাপ জার। একদিন প্রাসাদের একটি ঘরে বসে দু'জনে গল্প করছেন, হঠাৎ বিসমার্কের নজরে পড়ল বাইরের একটা উঠোনের (ঘাস-ছাঁটা উঠোন—যাকে ইংরেজীতে 'লন' বলে) মাঝখানে একটি প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে—খাড়া পাহারায়। সেদিন দিনটাও ঠাণ্ডা, বাইরে অবিশ্রান্ত তুষারপাত হচ্ছে—তার মাঝখানে প্রহরীটি ঠায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ।

বিসমার্ক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। একবার, দু'বার।

তারপর সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, ওখানে ঐ মাঠের মাঝখানে একজন প্রহরী দাঁড়িয়ে কেন? ওখানে তো কিছুই নেই, সারা মাঠ বরফে ঢেকে গেছে—কী আছে ওখানে যে পাহারা দিচ্ছে ও?'

জারও মুখ বাড়িয়ে দেখলেন—তাই তো!

তিনিও কিন্তু ঠিক কিছু বলতে পারলেন না। বললেন, 'কারণটা তো ঠিক জানি না—তবে আমি তো বরাবরই দেখে আসছি—ওখানে একজন সান্ত্রী পাহারা থাকে।'

'কিন্তু কেন?' বিসমার্কের তীক্ষ্ণ সাধারণ বুদ্ধিওয়ালা মন এত সহজে কোন ব্যাপারকে শুধু শুধু ছেড়ে দিতে রাজী নয়।

জার তাঁর এ-ডি-কংকে ডেকে পাঠালেন।

'তুমি বলতে পারো, ওখানে ঐ সান্ত্রী পাহারা থাকে কেন?'

'তা তো জানি না, কিন্তু বরাবরই তো থাকে।'

বিসমার্ক হাসলেন একটু।

'কিন্তু বরাবর কেন থাকে? কারণ তো একটা থাকা চাই?'

জারের মুখ লাল হয়ে উঠল।

তিনি পাহারার সর্দারকে ডেকে পাঠালেন।

'তুমি জানো—ওখানে দিন-রাত একজন সান্ত্রী থাকে কেন?'

'মহানুভব সম্রাট—এইরকমই প্রথা। চিরদিন চলে আসছে।'

'কিন্তু সে-প্রথা শুরু হ'ল কবে? আর কেনই বা তা চালু হ'ল?'

'তা তো বলতে পারি না।'

'খোঁজ করো। কালই আমার জবাব চাই।'

বিরক্ত হয়ে উঠলেন জার এদের অজ্ঞতায়। নিজেকে কেমন যেন বিসমার্কের কাছে ছোট মনে হ'তে লাগল তাঁর।

জার বিরক্ত হয়েছেন—জার্মান রাজদূতকে তিনি প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি—এতে সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থারই অপমান। চারিদিকে হুলস্থূল পড়ে গেল।

খোঁজ, খোঁজ! খাতা ওলটা—দ্যাখ, কবে কি হুকুম জারি হয়েছিল। ধুলোর গাদা থেকে বেরোল সব কাগজপত্র দলিল-দস্তাবেজ—বিবর্ণ হয়ে যাওয়া খাতা। ভূষো কালির দাগ পড়াই কঠিন।

একদিনে হ'ল না, তিন দিন ধ'রে অসংখ্য কেরানী ধুলো ঘেঁটে অবশেষে বার করল খবরটা।

আশি বছর আগেকার কথা। তখন রাশিয়ায় সম্রাজ্ঞী ছিলেন ক্যাথারিন দি গ্রেট। জার্মানীর মেয়ে, কিন্তু তাঁর আধ-পাগলা স্বামী যখন জার্মানীর কাছে দেশটা বিকিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন এই মেয়েটিই বিক্ষুব্ধ প্রজাদের নেত্রী হয়ে স্বামীকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন রাজ্যের সমস্ত ভার। তারপর থেকে দীর্ঘকাল অপ্রতিহত প্রভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গেই শাসন করেন এই বিপুল সাম্রাজ্য। তাঁর আমলে রাশিয়া সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল বলেই তাঁর কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে 'মহিমময়ী' (the great) এই উপাধি দেয়। আজও পৃথিবীর ইতিহাসে সে উপাধি তাঁর অক্ষয় হয়ে আছে।

এমন শক্তিশালিনী হলেও ক্যাথারিন যে অন্তরে অন্তরে মেয়েছেলে ছিলেন সে প্রমাণ তাঁর জীবদ্দশায় বহু কাজের মধ্যেই পাওয়া গেছে। তিনি তাঁর নাতি-নাতনীদের পোশাকের জন্যে রীতিমত মাথা ঘামাতেন—নিজের হাতে তাদের পরিয়েও দিতেন অনেক সময়। রাত পাঁচটায় উঠে— ঝি-চাকরদের অত ভোরে উঠতে কষ্ট হবে বলে—নিজেই আগুন জ্বেলে চা তৈরী ক'রে খেয়ে কাজে বসে যেতেন। সেদিক দিয়ে সাধারণ মেয়ের সঙ্গে কোন তফাৎ ছিল না তাঁর।

তিনি যে মেয়েছেলেই—সে প্রমাণ আরও একবার পাওয়া গেল এই আশি বছর পরে ধুলোর নিচে ঢাকা-পড়ে-যাওয়া বিবর্ণ পুরাতন সরকারী নথিপত্র ঘেঁটে। আশি বছর আগেকার এক বসন্তদিনে, ভোরবেলায় তিনি জানলা দিয়ে বাইরে চাইতেই তাঁর নজরে পড়েছিল শীতের বরফ গলে গিয়ে মাঠের ঘাস আবার মাথা তুলছে একটু একটু করে, আর তার মধ্যেই ফুটে উঠেছে সামান্য একটি ঘাসের ফুল। সে বছরের সেই বসন্তের প্রথম ফুল।

ঐ ফুল পাছে কেউ ছিঁড়ে নষ্ট করে বা মাড়িয়ে যায়—তাই তিনি তখনই সান্ত্রী-সর্দারকে ডেকে হুকুম করেছিলেন সেখানে কাউকে পাহারা রাখতে।

পাহারা রাখবারই হুকুম হয়েছিল—কিন্তু কতদিন বা কতক্ষণ থাকবে সে পাহারা—সেটা বলে দেওয়া হয় নি—একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। কথাটা আর বোধ হয় তাঁর মনেও ছিল না— অথবা মাঠের দিকে আর কোনদিন তাকিয়ে দেখার অবসর পান নি।

সেই সামান্য ভুলের খেসারত দিতে কতগুলি লোক পালাক্রমে দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়েছে ঐখানে—ঝড়-জল-তুষারবৃষ্টির মধ্যে—গত আশি বছর ধরে!

অন্ন যোগায় কে?

শিবাজী আর তাঁর সন্ন্যাসী-গুরু সমর্থ রামদাসের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। রবীন্দ্রনাথের 'গৈরিক পতাকা' কবিতার দৌলতে (সেই যে—"বসিয়া প্রভাতকালে, সাতারার দুর্গভালে, শিবাজী হেরিলা একদিন"), রামদাস স্বামীর নাম অন্ততঃ বাঙালী ছেলেমেয়ের কাছে আর খুব অপরিচিত নেই।

রামদাস স্বামী শুধু একজন বড় সাধকই ছিলেন না—সংসার এবং রাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান ছিল খুব। শিবাজী নানা বিপদে-আপদে বহুবার তাঁর কাছে ছুটে গেছেন পরামর্শের জন্যে আর সৎ-পরামর্শই পেয়েছেন—একথা ইতিহাসে লেখা আছে। তবে শিবাজীর বহু অনুনয়েও তিনি কখনও লোকালয়ে বা রাজধানীতে এসে থাকতে রাজী হন নি। সমস্ত রকম ভোগ-সুখেই ছিল তাঁর বিতৃষ্ণা, কোন রকম সঞ্চয়ই তিনি পছন্দ করতেন না। প্রতিদিন ভিক্ষায় যা পেতেন—তা রাশীকৃত জিনিস পেলেও—সব বিলিয়ে দিতেন, নিজেদের খাওয়ার মতো সামান্য কিছু রেখে। পরের দিনের কথা ভাবতেন না। তাছাড়া বনে-জঙ্গলে নির্জনে ঘুরে বেড়ানোরই পক্ষপাতী ছিলেন তিনি—লোকালয় আদৌ পছন্দ করতেন না। এই রকম নিরন্তর ঘুরে বেড়ানোর ফলে—মধ্যে মধ্যে দরকারের সময় তাঁর সঙ্গে কিছুতেই যোগাযোগ করা যেত না। সেই কারণেই শিবাজী অনেক বলে-কয়ে পারালী দুর্গে একটি আশ্রম স্থাপন করতে রাজী করিয়েছিলেন। সাতারার তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে জঙ্গলের মধ্যে একটা নিচু পাহাড়ের ওপর এই ছোট্ট পুরনো দুর্গটা অব্যবহার্য হয়ে পড়ে ছিল, সেইটুকুই সারিয়ে-সুরিয়ে আশ্রমের মত করে দিয়েছিলেন এবং রামদাসের নির্দেশে একটি চমৎকার মন্দির করে দিয়েছিলেন মারুতি বা মহাবীরের। তাও প্রথম প্রথম সে আশ্রমেও কখনও বেশী দিন থাকেন নি রামদাস—একেবারে শেষের দিকে, শরীর অশক্ত হয়ে পড়াতে এই আশ্রমেই আশ্রয় নিয়েছিলেন, ঐখানেই তিনি দেহত্যাগও করেন।

কিন্তু সেসব পরের কথা। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন আশ্রম বা মন্দির কিছুই হয় নি, আপন-মনে ঘুরে বেড়ান রামদাস। ভাগ্যে যেদিন থাকে, সেদিন আপনিই এসে পড়েন কিংবা হঠাৎ দর্শন মিলে যায়—নয় তো কোথায় তিনি থাকেন, এক-এক সময় তাও জানা যায় না।

একবার এমনিই হঠাৎ এসে পড়লেন তিনি, শিবাজী তখন সামযানগড় দুর্গ তৈরী করাচ্ছেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। সে সময়টা ওদিকে একটু অন্নকষ্ট-মতো হয়েছিল, কতকটা তাদের কাজ দেবার জন্যই শিবাজী ঐ দুর্গ তৈরীতে হাত দিয়েছিলেন।

রামদাস যখন এলেন, তখন গোটা দুর্গেরই ভিত-গাড়া হয়ে গেছে, বহুলোক লেগেছে কাজে, একসঙ্গে চারিদিকের প্রাচীর উঠছে। এই সময় গুরুদেব আসতে শিবাজী নিজেকে কৃতার্থ বোধ করলেন। তিনি ওঁকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে চারদিকের কাজ দেখাতে লাগলেন।

indra

গুরুদেব যদি প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করেন, তাহলে কোনদিনই শত্রুপক্ষ এ-দুর্গের প্রাকার ভেঙে ঢুকতে পারবে না, তা তিনি জানেন। তাঁর পদধূলি চারিদিকেই পড়া দরকার।

ঘুরে দেখাতে দেখাতে এ দুর্গ তৈরীর মূল কারণটাও খুলে বললেন শিবাজী। আর তারই মধ্যে, ঈষৎ একটু গর্বের সঙ্গেই বললেন, 'আপনার আশীর্বাদে এই কাজে আমি এ অঞ্চলের প্রত্যেকটি কর্মক্ষম ব্যক্তিকেই লাগাতে পেরেছি। কেউ বেকার বা নিরন্ন আছে এখানে—তা আর বলবার জো নেই।'

'ও, তাই নাকি? বেশ বেশ। ভারী খুশী হলুম।' রামদাস বললেন, 'খুব ভাল করেছ। এই তো তোমার উপযুক্ত কাজ।'

তারপর ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড বড় পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার লোকজনকে দিয়ে এই পাথরটা একটু ভাঙাও তো আজ!'

ওঁর এই বিচিত্র খেয়ালের কোন মানেই বুঝতে পারলেন না শিবাজী, কিন্তু গুরু হুকুম করেছেন এই যথেষ্ট, অত মানে বোঝার প্রয়োজন কি? তখনই রাজার চোখের ইঙ্গিতে পাঁচ-সাতজন জোয়ান মজুর বড় বড় পাথর-ভাঙা হাতুড়ি নিয়ে এগিয়ে এল, আর দেখতে দেখতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অত বড় পাথরটা দু-তিন খণ্ডে ভেঙে ফেলল।

পাথরটা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ল সকলের। অত বড় কয়েক মণ ওজনের নিরেট ভারী পাথরের মধ্যে অনেকখানি ফাঁপা জায়গা—আর সেখানে একটি বেশ বড়সড় জ্যান্ত ব্যাঙ বাস করছিল। জল ছাড়া ব্যাঙ থাকা সম্ভব নয় বলেই বোধ হয় কোন এক অদৃশ্য জাদুকর সেই গর্তে বেশ খানিকটা জলও রেখে দিয়েছেন। পাথরটা খান খান হয়ে ভেঙে পড়তেই ব্যাঙটা সেই জল থেকে লাফিয়ে বাইরে পড়ে লাফাতে লাফাতে বনের দিকে চলে গেল।

কী আশ্চর্য! এ কি তারা সত্যিই চোখে দেখছে, না কোন জাদুকরের ভেল্‌কি?

এইবার গুরুদেবের ঐ দুর্বোধ্য আদেশের অর্থও সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। উনি অন্তর্যামী, সবই জানতেন, ঐ পাথরের মধ্যে জীবিত প্রাণী বন্দী হয়ে আছে বুঝেই পাথরটা ভাঙতে বলেছিলেন।

শিবাজীও গুরুদেবের এই দিব্যদৃষ্টির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ, অভিভূত। তিনি হাতজোড় করে বললেন, 'কিন্তু কী আশ্চর্য গুরুদেব, ঐ নিরস আর নিরেট পাথরের মধ্যে জল কোথা থেকে এল? অমন স্বচ্ছ, পরিষ্কার জল?'

গুরুদেব বেশ সহজ প্রসন্ন মুখেই জবাব দিলেন, 'এ তোমারই কাজ নিশ্চয় বৎস—নইলে এত বিবেচনা আর কার হবে!'

তখনও ওঁর কথাটার আসল অর্থ বুঝতে পারেন নি শিবাজী, তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'না-না—এ কী বলছেন, এ কি আর আমার দ্বারা সম্ভব! নিরেট পাথর, কোথাও এতটুকুও ফাঁক নেই, বাতাস ঢোকাই অসম্ভব, তার মধ্যে এতখানি জল—এ তো রীতিমতো অলৌকিক ব্যাপার!'

গুরুদেব আগের মতোই প্রসন্ন-মুখে উত্তর দিলেন, 'এ তুমি মিথ্যে বিনয় করছ রাজা,

ওর মধ্যে ঐ প্রাণীটা আছে জেনেই, পাছে সে উপবাসী থাকে বা জলাভাবে শুকিয়ে মারা যায়—তুমি অনেক ভেবে ঐখানে জলের আর হাওয়ার ব্যবস্থা করেছ, এ তো আমি বেশ বুঝতে পারছি। তুমি ছাড়া এতটা বিবেচনা কার পক্ষে সম্ভব বলো। আর তোমার রাজ্যে কোন প্রাণীরই তো না খেয়ে থাকার জো নেই। বিচক্ষণ প্রজাপালক তুমি, এটুকু না করলে তোমার মর্যাদা থাকে কই?'

এতক্ষণে কথাটা বুঝলেন শিবাজী। তাঁর অহঙ্কারের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন গুরুদেব। জগদ্বাসীকে বাঁচাবার দায়িত্ব জগৎপিতার—তাকে অন্ন যোগানোর চিন্তা অন্নপূর্ণার। মানুষের কী সাধ্য, আর কতটুকু সাধ্য! সেই শিক্ষাটুকুই দিয়ে তাঁর দর্প চূর্ণ করলেন সন্ন্যাসী রামদাস।

নতমস্তক শিবাজী সেইখানে ধুলো আর পাথরের ওপরেই বসে পড়ে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করুন গুরুদেব, আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। দয়া করে বলুন, এখন কী করলে আমার এ অহঙ্কারের প্রায়শ্চিত্ত হয়।'

রামদাস সুমধুর অভয়ের হাসি হেসে জোর করে তাঁকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

যুদ্ধ ও হত্যা

১৮৫৭ সালের কথা। ১০ই মে—মীরাটে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে।

ইংরেজ সেনানীরা তখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না কথাটা—এমনটা কখনও ভাবেন নি। এমন হবে তা তো জানতেনই না—দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না যেন। ভাবছেন এটা থাকবে না, কেটে যাবে এ ভাবটা। সিপাহীদের এত সাহস হবে? এ কখনও সম্ভব? হঠাৎ কয়েকজন লোকের মাথা-খারাপ হয়ে গেছে—তাই। এই প্রচণ্ড গরমে অনেক লোকেরই এমন মাথা গরম হয়।

সুতরাং যে ক'জন ইংরেজ ছিলেন ওখানে, মিলিতভাবে বাধা দেবেন কি দমন করবার চেষ্টা করবেন এ অভ্যুত্থান—অন্ততঃ একত্র হয়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করবেন, এ বুদ্ধিও সে-আপৎকালে কারুর মাথাতে গেল না। সকলেই অসহায় ভাবে যে যেদিকে পারলেন পালাবার চেষ্টা করলেন। ফলে মারা গেলেন অনেকেই। যাঁরা পালালেন তাঁরাও অনেকে শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচাতে পারলেন না—ওদের হাতে, নয়তো রোগে গরমে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মারা গেলেন, আর যে দু-একজন পালাতে পারলেন তাঁদেরও দুর্দশার শেষ রইল না।

অথচ সাবধান যে কেউ করে দেয় নি, তাও নয়।

আগের দিন থেকেই শুনেছেন কেউ কেউ যে ভারী একটা গোলমাল হবে।

কিন্তু ঐ যা বললুম, কেউ বিশ্বাস করেন নি। নিজের পা মাথার ওপর উঠে কর্তৃত্ব করতে চাইবে এটাও যেমন বিশ্বাস করে না কেউ সহজে—এঁরাও সিপাহী অভ্যুত্থানের কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন নি। যে দেশী সিপাহীদের বলতে গেলে ওঁরাই যুদ্ধ করতে শিখিয়েছেন, যারা 'হুজুর' 'খোদাবন্দ্' ছাড়া কথা বলে না, যারা ওঁদের চেয়ে অনেক কম

মাইনেতে বেশী কাজ ক'রে গর্ব বোধ করে—তারা করবে ওঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ছোঃ!

তরুণ সেনানী কর্পোরাল হিউ গাফও আগের দিন শুনেছিলেন কথাটা। ওঁর মুসলমান খিদমৎগার এসে চুপিচুপি হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু হিউ গাফও তেমন জোর দেন নি সে কথাতে। তিনি অবশ্য তাঁর ঠিক ওপরের 'ওপরওলা'কে খবরটা জানিয়েছিলেন, কিন্তু সে ওপরওলাও কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু শুনুন বা না-শুনুন—বিপদ একসময় একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল।

দিশাহারা হিউ গাফও পালালেন—অথবা পালানো ছাড়া কোন পথ রইল না। কোনমতে একটা ঘোড়া সংগ্রহ ক'রে অর্ধেক পোশাক পরা অবস্থাতেই ছুটলেন। আর্টিলারী লাইন বা গোলন্দাজ ব্যারাক এখনও ওঁদের হাতে আছে বোধ হয়, সেখানে পৌঁছতে পারলে অনেকটা নিরাপদ হ'তে পারবেন।

কিন্তু সেখানে যেতে গেলে বাজারের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

এ শহরের বাজার নয়—ছাউনির নিজস্ব বাজার।

কেউ স্থাপনা করে না এ বাজার, আপনিই গজিয়ে ওঠে। সিপাহীদের, সাহেবদের প্রয়োজন বুঝে আপনিই এসে বসে কারবারীরা, দোকানদাররা। কোনমতে চালা তুলে নেয় নিজেরাই, কারবার করে সেখানে। এসব দোকানে পাওয়া যায় না এমন কোন জিনিস নেই। পয়সা ফেললে সব কিছু মেলে।

সাহেবদের অনুগ্রহেই এরা টিঁকে থাকে। তাঁরা 'যাও' বললে একদিনও থাকার উপায় নেই। সুতরাং কতকটা তাঁদের আশ্রিত বৈকি।

সুতরাং হিউ ঠিক এ বাজারে অতটা বিপদের আশঙ্কা করেন নি। অবশ্য করলেও উপায় ছিল না, কারণ দ্বিতীয় পথ আর নেই। মাঠের মধ্যে দিয়ে বা বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া হয়তো আরও বিপজ্জনক। তবু কতকটা নির্ভয়েই যাচ্ছিলেন, এমন কি দূর থেকে হৈ-হল্লা হট্টগোল দেখেও অতটা ভয় পান নি। ভেবেছিলেন ঘটনার বিবরণ শুনেই জটলা হচ্ছে, আসলে এ খানিকটা উত্তেজনা ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু একেবারে কাছে আসতে মুখ শুকিয়ে উঠল তাঁর.

চারদিক থেকে তাঁকে যারা ঘিরে ধরল তাদের চেহারাটা ঠিক নিরীহ কৃপাপ্রার্থী দোকানদারদের মতো লাগল না। সকলের হাতেই যাহোক একটা অস্ত্র এবং মুখের চেহারাও ভয়ঙ্কর।

'মারো—মারো উসকো!' এ ছাড়া কোন কথাও শুনতে পেলেন না।

এরা সিপাহী নয় কেউই—দোকানদার, তাদের কর্মচারী—কিছু কিছু স্থানীয় লোক, আড়তদার, চাষী—এই সব। অথচ অস্ত্র সবরকমই আছে—তলোয়ার বর্শা থেকে শুরু ক'রে লাঠি সড়কি—সকলকার হাতেই।

এদেরই যদি এই মূর্তি হয় তো সিপাহীদের না জানি কী হয়েছে!

হিউ গাফ অন্তিম সময় আসন্ন জেনে ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কোন উদ্যত তলোয়ার বা বল্লম হিউ গাফের দেহ স্পর্শ করার

আগে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল একজন এদেশীয় হিন্দু অফিসার, আর তার সঙ্গে দু'জন সওয়ার। এ অফিসারকে হিউ চেনেন, তাঁর অধীনে ঠিক কাজ না করলেও বিশেষ পরিচিত।

অফিসারটি এসে একেবারে হিউয়ের ঘোড়ার লাগাম ধরলেন, তারপর জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেউ যেন না এর গায়ে হাত দেয়—আমার ওপর হুকুম আছে একে অক্ষত দেহে বন্দী ক'রে নিয়ে যাওয়ার।'

'হুকুম' শব্দটির এমনই মহিমা যে, শোনামাত্র প্রায় সকলেরই হাতের উদ্যত অস্ত্র নেমে গেল। সভয়ে ও সসম্ভ্রমে সকলে সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিলে। কে হুকুম দিলে, এমন হুকুম দেবার মালিক বা এরই মধ্যে কাকে সাব্যস্ত করা হ'ল, এরাই বা কে, আর সে হুকুমনামাই বা কৈ—এসব প্রশ্ন করার কথা কারুর মাথাতেই গেল না।

একে হুকুম—তায় সেটা বহন করছেন একজন সসজ্জিত 'আফ্‌সার', আর সঙ্গে দু'জন সশস্ত্র সওয়ার—এর চেয়ে বড় কথা আর কী আছে?

হিউও ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারলেন না।

কিন্তু তখন আর বোঝবার চেষ্টা ক'রেও লাভ নেই। রামে মারলেও মারবে রাবণে মারলেও মারবে—এই তো অবস্থা। আপাতত উদ্যত অস্ত্রটা মাথার ওপর থেকে সরে গেল, এইটুকুই লাভ।

তিনি নিঃশব্দেই চললেন সেই অফিসারের সঙ্গে।

বিপজ্জনক এলাকা পেরিয়ে একেবারে আর্টিলারী লাইনের ধারে এসে থমকে দাঁড়ালেন সেই অফিসারটি।

বললেন, 'সাহেব, চলে যান সোজা আপনার জাতভায়ের কাছে, তবে এমন সাহস আর করবেন না, একা এভাবে বেরোবেন না।'

কৃতজ্ঞতায় হিউ গাফের চোখে জল এসে গেল। তিনি ওঁর হাতটা চেপে ধরে বললেন, 'কিন্তু তুমি? তোমরাও এসো!'

ঘাড় নাড়লেন সে অফিসারটি, 'না সাহেব, আমার স্থান আমার সহকর্মীদের, আমার সিপাহী ভাইদের পাশে, আমার দেশের লোকের প্রতিই আমার কর্তব্য বড়। অকারণ একটা নিরস্ত্র লোককে এতগুলো লোক মিলে মারা নৃশংসতা করা ছাড়া কিছু নয়—তাই বাধা দিলুম। আমি এখন বিদ্রোহীদের মধ্যেই ফিরব।'

'কিন্তু—', ব্যাকুলভাবে বলেন হিউ, 'তুমি কি আশা করো, তোমরা আমাদের তাড়িয়ে রাজত্ব করতে পারবে সত্যি-সত্যিই।'

'না, একবারও না। জানি আমরাই মরব। তবু আমি আমার দেশবাসী ও সহকর্মীদের বিরুদ্ধে যেতে পারব না। সেলাম সাহেব।'

তিনি চলে গেলেন—সওয়ার দু'জনসুদ্ধ।

হিউ গাফ আর কখনও তাঁর দেখা পান নি। হয়ত মারাই গিয়েছিলেন ভদ্রলোক।

হিউ নিজেই এ কাহিনী লিখে রেখে গেছেন। কিন্তু সে অফিসারের নামটা লিখে যান নি—হয়তো জানতেনও না।

খুশ-খবর খাঁ

১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সম্রাট আলমগীরের বাহিনী জিঞ্জি দুর্গ অবরোধ করেছে। ছত্রপতি শিবাজীর বংশধর সম্রাটের হাতে বন্দী—মুঘল-শক্তি চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে মারাঠীদের। মারাঠা-শক্তির তখন জীবনমরণ সমস্যা। কিন্তু তারই মধ্যে—শত্রু যখন প্রায় দ্বারপ্রান্তে—তখন সর্বাধিক শক্তিশালী যে দুটি সেনাধ্যক্ষ, যাঁদের ওপর সব চেয়ে বেশী আশাভরসা, তাঁরাই ব্যক্তিগত বিবাদে মেতে উঠলেন।

কলহের কারণটা অতি পুরাতন, অতি তুচ্ছও বটে।

ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার প্রশ্নও নয়—নিতান্তই একটা পদবীর প্রশ্ন। দুজনেই বড় যোদ্ধা, বড় সর্দার, দুজনের অধীনেই বিশ-পঁচিশ হাজার সৈন্য। কেউ কারও ওপর হুকুম চালাবে এ কথাই ওঠে না। শুধু নামে একজন প্রধান সেনাপতি। ধনাজী যাদবের বিশ্বাস তিনিই সব দিক দিয়ে সে পদমর্যাদার উপযুক্ত, কিন্তু অল্প কিছুদিন আগে রাজ-অভিভাবক রাজারাম শান্তাজী ঘোড়পড়েকে প্রধান সেনানায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ধনাজীর বিশ্বাস এটা শুধু তার প্রতি ঘোরতর অবিচার নয়, তাঁর ব্যক্তিগত অপমানও বটে। আর যেহেতু রাজা মালিক—তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভব নয়—সেহেতু সব আক্রোশটা গিয়ে পড়ল শান্তাজী ঘোড়পড়ের ওপর। ফিরুজ জঙ্গের বিপুল মুঘলবাহিনী যখন শান্তাজী ঘোড়পড়ের প্রায় সামনাসামনি এসে পড়েছে—তখনই ধনাজী যাদব পিছন থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করলেন শান্তাজী ঘোড়পড়েকে।

ধনাজী যাদবকে অবশ্য খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না এর জন্য। এটা আমাদের জাতিগত স্বধর্ম, ভারতীয়দের চিরকালীন স্বভাব-দোষ এটা। শৌর্যেবীর্যে, আত্মত্যাগে, উদ্যমে, সহ্যশক্তিতে—কোন দিক দিয়েই ভারতীয়রা কারুর চেয়ে কম নয় কোন দিন, তবু যে চিরদিনই তারা বাইরের শত্রুর কাছে মার খেয়েছে তার প্রধান কারণ হ'ল এই মিথ্যা আত্মাভিমান, এই মিথ্যা প্রতিষ্ঠার ওপর লোভ। এর জন্যেই বার বার সর্বনাশ হয়ে গেছে—তবু আজও বোধ হয় কিছুমাত্র চোখ ফোটে নি আমাদের। এখনও দেশের স্বার্থ, জাতির স্বার্থ—এমন কি নিজেদের স্বার্থের চেয়েও সামান্য একটু ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার মূল্যই আমাদের কাছে বড়। আমি সকলের ওপরে থাকব, সকলে আমাকে খোশামোদ করবে—এইটুকুর জন্য আমরা যে কোন কাজ করতে রাজী আছি। অমুক লোকটা আমাকে কড়া কথা বলেছে, তার জন্যে আমি তার এমন অনিষ্ট করার কথা চিন্তা করি—যার দ্বারা তার সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু লোকের এবং হয়ত আমারও প্রভূত সর্বনাশ হতে পারে। তা হোক, ওকে তো জব্দ করতে পারলুম!... এই ধরনের মনোভাবই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

ধনাজী যাদব যখন ঘোড়পড়েকে আক্রমণ করলেন, তখন ঘোড়পড়েও খুব অসহায় নন। তাঁর অধীনে প্রায় পঁচিশ হাজার সৈন্য তখন। সুশিক্ষিত, রণনিপুণ, সাহসী যোদ্ধা তারা

প্রত্যেকেই। কিন্তু সেখানেও মারাঠী তথা ভারতীয়দের আর একটি পুরানো স্বভাব কাজ করল। ধনাজী যাদব আগেই গোপনে লোক পাঠিয়ে ঘোড়পড়ের লোকদের নানারকম লোভ দেখিয়েছিলেন। তাছাড়া শান্তাজী লোকটা ছিলেন খুব কড়া ধরনের—নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলার এতটুকু এদিক-ওদিক তিনি সইতে পারতেন না। সে রকম অপরাধের কোনও ক্ষমা ছিল না তাঁর কাছে। সাধারণ সৈন্য বা অধীনস্থ কোন সেনানায়ক কেউ এতটুকু শৃঙ্খলাভঙ্গ করলেও তাকে শাস্তি ভোগ করতে হ'ত। কোন কারণই সে সাজা রদ হ'ত না—হাজার সুপারিশ বা ধরপাকড়েও না।

এতটা বাড়াবাড়ি ভারতীয়দের ধাতে সইত না তখন। সৈন্যরা রীতিমত ভয় করত তাঁকে—মনে মনে বিরূপও হয়ে ছিল, তাই যে মুহূর্তে সুযোগ এল—অর্থাৎ ধনাজী যাদবের গুপ্তচর গিয়ে জানাল যে তারা ওপক্ষ ছেড়ে এপক্ষে এলে তাদের যেমন চাকরি তেমনই থাকবে, তন্‌খা কমবে না, নিয়মিত সেটা পাবেও—তখন মনস্থির করতে বা বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে প্রস্তুত হ'তে এতটুকু দেরি হ'ল না। লড়াই শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ভোজবাজীর মতো ওদিকের লোক এদিকে এসে গেল—বিনাযুদ্ধে পরাজিত হয়ে গেলেন শান্তাজী ঘোড়পড়ে।

শান্তাজীর কী অবস্থা তখন! মাত্র কয়েক দণ্ড পূর্বেও যিনি পঁচিশ হাজার সুশিক্ষিত বীর সৈন্যের দুর্ধর্ষ সর্বাধিনায়ক ছিলেন—তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব হয়ে পড়লেন। তাঁর একদিকে ধনাজীর প্রায় অর্ধলক্ষ লোক, অপরদিকে ফিরুজ জঙ্গের বিশ হাজার। ওঁর নিজের চারিদিকে তখন বন্ধু বা বিশ্বস্ত কর্মচারী বলতে শ'খানেকও বোধ হয় নেই।

যারা ছিল তাদেরও বিপন্ন করতে চাইলেন না শান্তাজী। তিনি মাত্র জনদশেক সবচেয়ে বিশ্বাসী লোক নিয়েই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন।

পালানো হয়ত সে অবস্থায় খুব সহজ ছিল না—কিন্তু পশ্চিমঘাটের জঙ্গলে-ভরা পার্বত্যপথ শান্তাজীর নখদর্পণে, তিনি অনায়াসেই শত্রুদের এড়িয়ে দুর্গম নির্জন অঞ্চলে গিয়ে পড়লেন। তবে তাঁর সঙ্গীরা কেউই বাঁচল না—বার বার বিশেষ বিপদের সময় তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে একটির পর একটি প্রাণ হারাল।

একেবারে জনহীন জঙ্গলে এসে পড়ে শান্তাজী অনেকটা নিরাপদ মনে করলেন নিজেকে। অনেকক্ষণ একা চলবার পরও পিছনে কোনও পদশব্দ না পেয়ে ভাবলেন যে তার শত্রুরা এবার হাল ছেড়ে দিয়েছে—অথবা ভুলপথে গিয়ে পড়েছে। তিনি কোন্‌দিকে এসেছেন বুঝতে পারেন নি।

বহুক্ষণ ধরে ছুটছেন তিনি—দুপ্রহরেরও বেশী সময় ঘোড়ার পিঠে রয়েছেন বলতে গেলে। তার ওপর লড়াইও কিছু কিছু করতে হয়েছে। পদে পদে মৃত্যু এসে সামনে দাঁড়িয়েছে, প্রতিমুহূর্তে সেই জীবনমরণ সমস্যার সঙ্গে যুঝতে হয়েছে। যতই সহ্যগুণ থাক—এতটা সহ্য করা কঠিন। এতক্ষণ সেই রকম বিপদ আশেপাশে চলছিল বলেই নিজের কথা ভাবতে পারেন নি—এখন একটু নিশ্চিন্ত বোধ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল শ্রান্তি এসে চেপে ধরল যেন—দেহ যে প্রায় ভেঙে পড়বার মুখে এসে পড়েছে—এতক্ষণে

টের পেলেন সেটা। ঘোড়াটার অবস্থাও চোখে পড়ল এবার, এখনই খানিকটা বিশ্রাম না দিলে হয়ত দু-চার মুহূর্তের মধ্যে পড়বে আর মরবে।

ঘোড়া থেকে নেমে জিন লাগাম খুলে তাকে ছেড়ে দিলেন প্রথমে, তারপর নিজে একটা গাছতলায় বসে পড়লেন অবসন্নভাবে। তাঁরও কিছুটা বিশ্রাম দরকার—চলা তো দূরের কথা, সোজা হয়ে বসবারও আর ক্ষমতা নেই দেহে।

তিনি মারাঠী—ভাগ্যের উত্থান-পতনে খুবই অভ্যস্ত। এমন বহুবারই দেখেছেন—জীবন-মৃত্যু তাঁদের পায়ের ভৃত্য। বেঁচে থাকলে আবারও একদিন বিপুল বাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়াতে পারবেন এ বিশ্বাস তাঁর আছে। সুতরাং দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছিলেন না তিনি, ভাবছিলেন যেসব বন্ধু এই ঘোর বিপদেও তাঁকে ত্যাগ করে নি, তাঁকে বাঁচাবার জন্য অনায়াসে প্রাণ দিল—তাদেরই কথা। সবাই চলে গেল। এই রকম বন্ধু হারিয়ে বেঁচে থাকা তো নিত্য বিড়ম্বনারই সামিল। অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্মান সবই আবার হয়ত একদিন হবে—কিন্তু পাশে যারা থাকবে তাদের কী আর এমনি বিশ্বাস করতে পারবেন কোন দিন? মানুষের ওপরই যে ঘৃণা হয়ে গেল—চিরকালের মতো।

তন্ময় হয়েই ভাবছিলেন, তাই কখন যে পিছনের বনপথে আর একটি মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে তা টের পান নি সদাসতর্ক মারাঠা সেনাপতি। যে লোকটি এসেছিল সে হ'ল নাগোজী মানে। মুঘল-পক্ষেই ছিল নাগোজী আর তার দল—কিন্তু রাজারামের চরম বিপদক্ষণে এই লোকটিই মুঘল-মনিবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তাকে নিরাপদে জিঞ্জি দুর্গ থেকে পালিয়ে আসতে সাহায্য করে। তারপর আর মুঘলপক্ষে তার থাকা সম্ভব নয়, থাকেও নি—ধনাজী যাদবের অধীনেই কাজ করছিল। শান্তাজী যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালান তখন যে মারাঠী দলটি তাঁর পিছু নেয় তাদের মধ্যে নাগোজীও ছিল। নাগোজী এই যুদ্ধের প্রথম থেকেই ওঁর ওপর নজর রেখেছিল, বস্তুতঃ আজও ওঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করার উদ্দেশ্যেই তার সেনাবাহিনীর পুরোভাগে এগিয়ে আসা।

ধনাজীর ঐ বিপুল বাহিনীর মধ্যে অনেকেরই হয়ত ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণ ছিল শান্তাজীর ওপর—কিন্তু তার জন্যে খুব বেশী মেহনৎ করার লোক তারা নয়। যারা পিছু নিয়েছিল শান্তাজীর—পুরস্কারের লোভই তাদের কাছে বড়। একমাত্র নাগোজীই এসেছিল প্রতিশোধের জন্যে, তাই সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে, তখনও সে নিবৃত্ত হয় নি, অতি সাবধানে জনবসতিশূন্য অরণ্যে মানুষের সামান্যমাত্র চিহ্ন দেখে দেখে এসেছে সে—শিক্ষিত কুকুর যেমন ক'রে গন্ধ শুঁকে শুঁকে আসে তেমনি ক'রে। কোথায় একটা ছোট পাথর সম্প্রতি স্থানচ্যুত হয়েছে, কোথায় একটা চারাগাছ পদদলিত হয়েছে তাই দেখে দেখে সে ঘোড়া যাওয়ার চিহ্ন আবিষ্কার করেছে। এত কষ্টের মূলে এতটাই বিদ্বেষ ছিল তার।

নাগোজী মানের দাদা কাজ করত শান্তাজী ঘোড়পড়ের অধীনে। কী একটা পাহারা-পালার সময় মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল -সে আর অধীনস্থ অন্য সিপাহীরাও। শত্রু অবশ্য কেউ আসে নি—কিন্তু এলে বিপদ ঘটতে পারত। এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, আদেশ লঙ্ঘন, কর্তব্যে অবহেলা এবং কর্তব্যরত অবস্থায় মদ্যপান—এতগুলি অভিযোগে তাদের

সকলেরই প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন শাস্তাজী ঘোড়পড়ে। তাও সাধারণ প্রাণদণ্ড নয়—হাতীর পায়ের তলায় পিষে মারবার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি। সে-সময় অনুনয়-বিনয় করে নাগোজী মানে ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন—কিন্তু ঐ যা আগেই বলেছি—শাস্তাজীর কাছে এসব অপরাধের ক্ষমা বলে কোন বস্তু ছিল না—যে যা অপরাধ করবে তাকে সেই অপরাধের জন্য প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করতে হবে—তা সে যে-ই হোক না কেন!

আরও ছিল।

নাগোজী মানের শ্বশুর অমৃতরাও নিম্বলকরও নিহত হয়েছিলেন শাস্তাজীর হাতেই। সে অবশ্য সম্মুখযুদ্ধেই—কিন্তু নাগোজীর বিশ্বাস সেটা ন্যায়যুদ্ধ নয়, অন্যায় যুদ্ধেই শাস্তাজী মেরেছিলেন নিম্বলকরকে।

এ দুটোর কোনটাই ভোলে নি নাগোজী। আসলে এই দুটি মৃত্যুর শোধ নিতেই তার ধনাজীর দলে আসা। যুদ্ধ তার পেশা নয়—তারা দেশমুখ, খাজনা আদায়ই তাদের কাজ। সব ছেড়ে লড়াই করতে এসেছে এবং প্রাণ তুচ্ছ ক'রে আজ সামনে এসেছে শুধু এই প্রতিশোধের জন্যেই।

একেবারে সামনে এসে দাঁড়াতে চমক ভাঙল শাস্তাজী ঘোড়পড়ের। তিনি তখন খানিক বিশ্রামের পর সামনেই স্নিগ্ধস্বচ্ছ ঝরণার জল দেখে জামা-কাপড় ছেড়ে স্নান করতে নেমেছিলেন। জল থেকে ওঠবার সময় এদিকে ফিরেই দেখতে পেলেন নাগোজীকে। হাতে খোলা তলোয়ার, একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জলের ধারে। তাঁর শুকনো জামা-কাপড় এবং হাতিয়ার সবই ওদিকে, অর্থাৎ নাগোজীর পিছনে।

এক নজরেই বুঝে নিলেন শাস্তাজী যে আজ আর পরিত্রাণের আশা নেই। তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, সামান্য কৌপীন মাত্র পরে জলে নেমেছেন—অস্ত্র-বস্ত্র সবই শত্রুর হাতে। কী নিয়ে যুঝবেন তিনি? তাছাড়া আর যেন যোঝবার ইচ্ছাও নেই তেমন, একটা সুগভীর ক্লান্তি আর বিতৃষ্ণা বোধ করছেন, জীবনে যেন আর কোন আসক্তিই নেই। তাছাড়া যে-শত্রু সামনে দাঁড়িয়ে, তার কাছে কোন দয়া-মায়া কি বিবেচনা আশা করা ভুল। যে দয়া-মায়া তিনি ওর আত্মীয়দের করেন নি কখনও—ওকে দেখান নি—সেটা আজ ওর কাছে আশা করাও অন্যায়।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে খুব একটা শান্তি বোধ করলেন তিনি। কারুর ওপর কোন রাগ কি বিদ্বেষও রইল না। তিনি বেশ শান্তকণ্ঠেই বললেন, 'একটু দাঁড়াও নাগোজী, ভগবান শঙ্করকে একটু ডেকে নিই। আশা করছি এটুকু সময় দিতে তোমার কোন আপত্তি হবে না। আমি বয়োজ্যেষ্ঠ—আমি তোমাকে আশীর্বাদ করতে করতে মরব তা'হলে।'

নাগোজী ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলল, 'তোমার শঙ্কর, ভবানী যাকে খুশি ডাকো গে—তবে চট্‌পট্‌। আর কোন চালাকি করবার চেষ্টা ক'রো না এবং এটাও আশা ক'রো না যে তোমার শঙ্কর তোমাকে রক্ষা করবার জন্যে আমার সঙ্গে লড়াই করতে আসবেন।'

শাস্তাজী সে কথার উত্তর দিলেন না, নীরবে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ইষ্টকে স্মরণ করলেন, তারপর বললেন, 'নাও নাগোজী, আমি প্রস্তুত।'

নাগোজী এগিয়ে এল, তরবারি তুললও—কিন্তু যে শিকার হাতের মধ্যে এসে গেছে সম্পূর্ণ, তাকে বধ করার খুব তাড়া ছিল না তো—তাই একটু তামাশা করার লোভ সামলাতে পারল না। হেসে বলল, 'কৈ আশীর্বাদ করলে না আমাকে?'

'আশীর্বাদ!' এক মুহূর্তের জন্যে তেজস্বী বীর যোদ্ধা শান্তাজী ঘোড়পড়ের চোখে অভ্যস্ত আগুন জ্বলে উঠল, একবার হাতদুটো মুষ্টিবদ্ধ হ'ল—কিন্তু সে ঐ এক মুহূর্তই—তারপরই শান্তকণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, আশীর্বাদ করব বৈকি। আমি—আমি আশীর্বাদ করছি—স্বজন-হত্যার কলঙ্ক না তোমাকে স্পর্শ করে।'

হা হা ক'রে হেসে উঠল নাগোজী, 'তুমি বড় চালাক, না? এই ক'রে আমার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে ভাবছ? কলঙ্কের কথা ব'লে আমাকে দুর্বল করা যাবে না ঘোড়পড়ে—ঘাতককে মারব, তার আবার কলঙ্ক কি!'

আবারও হেসে উঠল হা-হা ক'রে।

সেই হাসির শব্দ সেই নির্জন নদীতীর, সেই জনহীন পার্বত্য প্রদেশে যেন চতুর্গুণ ভয়াবহ শব্দ সৃষ্টি ক'রে বহুক্ষণ পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল। আর সেই ভয়ঙ্কর প্রবল শব্দ-তরঙ্গের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আর দুটি ছোট্ট শব্দ কোথায় মিলিয়ে গেল—একটি অনাবৃত কাঁধের ওপর তলোয়ার এসে পড়ার শব্দ, আর একটি মানুষের মাথা নিচের পাথরে গড়িয়ে পড়ার শব্দ!

কাজ শেষ হবার পর যেন জ্ঞান ফিরে এল নাগোজী মানের। এতক্ষণের উত্তেজনা শেষ হয়ে গেছে—এবার যেন একটু খারাপই লাগছে কাজটা।

সে বেশ খানিকটা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ঝরণার জলে নেমে নিজের হাত আর তলোয়ার ধুয়ে নিয়ে তলোয়ারটা খাপে পুরল। মুখে-হাতেও ঠাণ্ডা জল দিয়ে নিল খানিকটা।

যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ভালই হয়েছে—এখন এ থেকে কতটা কী লাভ করা যায় সেই চিন্তা। শান্তাজী ঘোড়পড়ে জীবিত থাকতে ধনাজী যাদবের শান্তি নেই। এরকম শত্রু নিশ্চিত মরেছে না জানলে কেউই শান্তি পায় না। সুতরাং নিশ্চিত প্রমাণটা দিতে পারলে প্রচুর পুরস্কার পাওয়া যাবে যাদবের কাছ থেকে, আর নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ ছাড়া নিশ্চিত প্রমাণ কী দেওয়া যেতে পারে হত্যাকাণ্ডের!

অগত্যা খুব একটা ইচ্ছা না থাকলেও শান্তাজীরই কুর্তাটায় জড়িয়ে তাঁর কাটা মুণ্ডটা তুলে নিতে হ'ল নাগোজীকে এবং সেটাকে নিজের ঘোড়ার পিঠেও বাঁধতে হ'ল পিছনদিক ক'রে। তারপর আর একবার ঝরণার জলে হাত ধুয়ে নিয়ে ইষ্টকে স্মরণ ক'রে ঘোড়ায় চড়ে বসল নাগোজী মানে।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই—ঘোড়া ছাড়বার আগে এক কাণ্ড ঘটে গেল। নাগোজীর মনে হ'ল—তার ঠিক পিছনদিকে কে যেন হেসে উঠল হা-হা করে, ঠিক যেমনভাবে একটু

আগে সে হেসেছিল। এ হাসিও ঠিক সেইভাবেই পর্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল। বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল তেমনি ক'রে।

চমকে ফিরে দাঁড়াল নাগোজী হাতিয়ারে হাত দিয়ে। কিন্তু কৈ, কেউ তো নেই!

শুধু কাছাকাছি যে কেউ নেই তাই নয়—যতদূর দৃষ্টি চলে—কোথাও কেউ নেই।

তবে কী রকম হ'ল এটা?

হাসির শব্দ যে সে শুনেছে তাতেও তো কোন ভুল নেই। পরিষ্কারই শুনেছে। এখনও যেন তা চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—অল্প অল্প।

তবে কি এ কোন অদৃশ্যচারী জন্তুর হাসি? হায়েনা বা ঐ ধরনের কোন জন্তুর?

তাই হবে হয়তো।

আবারও ভগবান গণপতিকে স্মরণ ক'রে ঘোড়ার মুখ ফেরাল নাগোজী, আর সঙ্গে সঙ্গে, ঘোড়া চলতে শুরু করার আগেই আবার সেই হাসি, ঠিক ওর পিছনে।

আর ফিরে চাইল না সে। চাইবার সাহস হ'ল না। কোনও দিকেই তাকাল না। প্রাণপণ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে পাগলের মতো।

তারই ফলে কখন যে ঘোড়ার পিছনে বাঁধা সেই জামার পুঁটুলি থেকে মাথাটা গড়িয়ে প'ড়ে গেল পথের ধারে তাও টের পেল না সে।

সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন তার পিছনে ধেয়ে আসছে—এই রকম ভাবেই ঘোড়া ছুটিয়ে চলল নাগোজী দিশাহারা হয়ে।

সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যখন শান্তাজী ঘোড়পড়ে বেরিয়ে আসেন তখন শুধু মারাঠীরাই নয়—মুঘল ফৌজেরও কেউ কেউ তাঁর পিছু নিয়েছিল। তারাও পাহাড়ী পথে অভ্যস্ত, বেছে বেছেই পাঠিয়েছিলেন ফিরুজ জঙ্গ—যারা এদিককার পথঘাট চেনে এবং চেনে শান্তাজী ঘোড়পড়েকেও।

কিন্তু তবু প্রথম দিকেই পথ ভুল ক'রে ফেলল তারা। তারপর থেকে অবশ্য সারাদিনই ঘুরেছে, এক মুহূর্তও থামে নি কি বিশ্রাম নেয় নি, কিন্তু তবু খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত যখন

ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে তখন কাজ শেষ—কবন্ধটাই প'ড়ে আছে শুধু, তার আগেই নাগোজী মানে রওনা হয়ে গেছে।

কবন্ধ দেখে মানুষকে সনাক্ত করা শক্ত। ওরাও পারল না। বিশেষ আসার পথে বহু জায়গাতেই মারাঠীদের মৃতদেহ দেখেছে ওরা, ঘোড়পড়ের বিশ্বস্ত সঙ্গীদের দেহ—একে একে তারা প্রাণ দিয়েছে, পথের মাঝে মাঝেই—শত্রুকে ঠেকাতে গিয়ে। নিজেরা লড়াই করে শান্তাজীকে পালাবার সুযোগ দিয়েছে তারা।

সুতরাং এ দেহ শান্তাজীর ব'লে চিনতে পারল না কেউ। এখান থেকে দু-তিন দিকেই মানুষের চিহ্ন গিয়েছে। আগেই বলেছি ওসব জায়গায় পথ ব'লে কিছু থাকে না, কাঠুরিয়াদের কাঠ কাটতে যাবার পায়ে-চলা বা পাক্‌দণ্ডী পথ। সেরকম পথ অসংখ্য। সে সংকীর্ণ পথে ঘোড়ার গা লেগে আশেপাশের গাছ থেকে পল্লব ভেঙে পড়ে, ক্ষুর লেগে শেওলা-ধরা নুড়িপাথর সরে যায়—সেই দেখেই লোকের গতিপথ বোঝা যায়। কিন্তু এখানে সেরকম চিহ্ন দু-তিন দিকের পথে দেখা গেল—অগত্যা যে দলটি এসে পৌঁছেছিল এখানে, তারা তিনজন তিন দিকের পথে ভাগ হয়ে গেল।

এর মধ্যে আলি আকবরের বরাতটাই ভাল। একটু গিয়েই তার নজরে পড়ল রক্তমাখা কুর্তায় জড়ানো কাটা মুণ্ডটা। এ পরিবেশে অস্বাভাবিক জিনিস—কৌতূহলী হয়ে নেমে তলোয়ারের ডগা দিয়ে কাপড়টা আলগা করতেই মুণ্ডটা বেরিয়ে পড়ল। তখনও সন্ধ্যা হয় নি ঠিক, পাহাড়ের ওপর সন্ধ্যা একটু দেরিতেই নামে—সুতরাং চিনতেও অসুবিধা হ'ল না মাথাটা কার!

আলি আকবর আর একটুও ইতস্ততঃ না ক'রে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রায় দুপুররাতে এসে হাজির হ'ল ফিরুজ জঙ্গের তাঁবুতে। ফিরুজ জঙ্গও আর তাকে বিশ্রাম করতে দিলেন না, ঘোড়া বদল ক'রে তার সঙ্গে আবার দুজন লোক পাঠিয়ে দিলেন বাদশার কাছে। বাদশা যে কী উৎকণ্ঠায় আছেন তা ফিরুজ জঙ্গ ভালমতোই জানেন।

বাদশা কাটা মুণ্ডটা দেখে—শান্তাজী ঘোড়পড়েরই মুণ্ড সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ আলি আকবরকে উপাধি দিলেন—'খুশ-খবর খাঁ'। এ ছাড়া দিলেন খেলাৎ, নূতন পোশাক, তরবারি ও এক হাজার মোহর।

তারপর খুশ-খবর খাঁকে হাতির ওপর বসিয়ে সামনে এক অশ্বারোহীর হাতে বর্শার ডগায় শান্তাজীর মাথাটাসুদ্ধ বসিয়ে লোকলস্কর সঙ্গে দিয়ে পথে এক 'জলুস' বা শোভাযাত্রা বার করা হ'ল।

খুবই আনন্দ হয়েছে বাদশার। কারণ শান্তাজী ঘোড়পড়ে ইদানীং মুঘলবাহিনীর কাছে আতঙ্ক হয়ে উঠেছিলেন। প্রবাদের মতোই হয়ে উঠেছিল তাঁর শৌর্য। কোন ঘোড়া জলে মুখ দিতে না চাইলে ফৌজী সিপাহীরা ঠাট্টা ক'রে বলত ওদের, 'জলে মুখ দিচ্ছিস না কেন—শান্তাজী ঘোড়পড়ের ছায়া দেখলি নাকি জলের ভেতর?'

সেই শত্রু এতদিনে আত্মীয়ের হাতেই নিপাত হ'ল—ওঁদের সেজন্যে কোন 'কৌসিস'ই

করতে হ'ল না—একটা লোক মরল না কিংবা একটা ঢেবুয়াও খরচ হ'ল না—এ কী কম আনন্দের কথা!

এধারে ধনাজীর তাঁবুতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে নাগোজীর সে অকারণ আতঙ্ক দূর হয়ে গেছে। মাথা বেশ ঠাণ্ডাও হয়েছে তখন—কিন্তু ওধারে সে পুঁটুলি তো নেই! কোথায় প'ড়ে গেছে তা তিনি টেরও পান নি! সব শুনে ধনাজী ওর সঙ্গে গোটাকতক মশাল এবং লোকজন দিলেন পথটা আবার খুঁজে দেখতে। খুঁজলও তারা, কিন্তু সে মুণ্ড আর কোথায় পাবে? সে তো তখন মুঘল দরবারে পৌঁছে গেছে!

একে তো এই আশাভঙ্গের জন্যে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েই ছিলেন—তারপর যখন পরের দিন মুঘল শিবিরের ঐ জলুসের খবর এসে পৌঁছল তখন বিষম বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন ধনাজী। সে ঝাঁজটার প্রায় সবটুকুই এসে পড়ল নাগোজীর ওপর। তিনি ওকে ডেকে প্রকাশ্যেই মিথ্যাবাদী বলে গালিগালাজ করলেন এবং চাকরি থেকে বরখাস্ত ক'রে তখনই নিজের শিবির থেকে বার ক'রে দিলেন।

শান্তাজীর আশীর্বাদটা অক্ষরে অক্ষরে ফলল—স্বজনহানির কলঙ্ক স্পর্শ করল না নাগোজীকে।

সিপাহী বিদ্রোহের গল্প

রক্তকমল

সিপাহী বিদ্রোহের আগুন যখন ভারতবর্ষের পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে তখনও শ্রীনানা ধুন্ধুপন্থ বা নানাসাহেব তাঁর মন স্থির করতে পারেননি। প্রথম আগুন জ্বলেছে বাংলা দেশে মার্চ মাসে। তারপর এপ্রিল গেছে, মে গেছে—তখনও নানাসাহেব ইংরেজদের বন্ধু সেজেই বসে আছেন। ১০ই মে মীরাটে, ১১ই মে দিল্লীতে আগুন জ্বলল—২১শে থেকে ২৩শে মে'র ভেতর বুলন্দশহর, এটোয়া, মৈনপুরী সর্বত্র সে আগুন লেলিহান শিখা মেলে ছড়িয়ে পড়ল—তবু অশীতিপর বৃদ্ধ সেনাপতি হুইলার ভাবছেন যে কানপুরে বিশেষ কিছু হবে না। আর হ'লেও—নানাসাহেব আছেন, ভয় কি! এতই নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি যে ৩রা জুন নিজের কাছ থেকে ৫০টি সৈন্য এবং দুজন সেনানী পাঠিয়ে দিলেন লক্ষ্ণৌতে, লরেন্সকে সাহায্য করার জন্য।

হুইলার সাহেবের এত বড় ভুল করার কোন কারণ ছিল না। কারণ তার দুদিন আগেই পয়লা তারিখে গঙ্গার বুকের ওপর এক নৌকোতে যে বৈঠক বসে তাতে নানাসাহেব বিদ্রোহীদের কথা দেন যে তিনি তাদের দলে যোগ দেবেন, তাদের অধিনায়কত্ব করবেন—এবং তার বদলে তারা তাঁকে পেশোয়া ব'লে স্বীকার করবে। এইটেই স্বাভাবিক—কারণ তাঁর প্রাপ্য গদি যে ইংরেজরা বলতে গেলে গায়ের জোরে কেড়ে নিয়েছে, নানাসাহেব তা ভুলবেন কি ক'রে? বাজীরাও গদিচ্যুত হয়েও আট লাখ টাকা করে বার্ষিক ভাতা পেতেন, সেটাও নানার অদৃষ্টে জোটেনি। সেজন্য তিনি আজিমুল্লা খাঁকে বিলাত পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন সেখানে নালিশ করতে, এবং সে লোকটি ওঁর সত্তর লাখ টাকা খরচা ক'রে 'শুধু-হাতে' ফিরে এসেছে। এসব কোন কথাই নানাসাহেবের বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁর বাইরের মিষ্ট আচরণে ভোলা ইংরেজের কোনমতেই উচিত হয় নি। অবশ্য ওঁদের সে ভুল ভাঙল শিগ্‌গীরই।

নানা প্রকাশ্যেই এবার বিদ্রোহীদের দিকে যোগ দিলেন। তাও প্রথমটা মনে করা গিয়েছিল বিপদের হাওয়াটা পশ্চিমমুখোই যাবে—কারণ সিপাহীরা সকলেই দিল্লীর পথ ধরেছিল, নানাও হয়ত সেদিকেই যেতেন। কিন্তু আজিমুল্লা খাঁ প্রভৃতি সবাই বোঝালেন যে দিল্লীতে বাহাদুর শা সম্রাট, সেখানে নানাসাহেবের স্থান কোথায়? তাঁবেদার সেনাপতি মাত্র, তার চেয়ে এখানেই তিনি রাজা হয়ে বসুন—স্বাধীন পেশোয়ারূপে পেশোয়া বংশের সমস্ত গৌরব আবার ফিরিয়ে আনতে পারবেন। কথাটা নানাসাহেবের মনে লাগল। তিনি সিপাহীদের অনেক বুঝিয়ে, শেষ পর্যন্ত সবাইকে একটা করে সোনার বালা গড়িয়ে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কানপুরে ফিরে এলেন এবং ৬ই জুন রাত্রেই হুইলারের ব্যূহ লক্ষ্য করে প্রথম গোলা ছুঁড়লেন। ৭ই থেকে শুরু হ'ল রীতিমত আক্রমণ।

হুইলার সাহেব কি একটা বোকামি করেছিলেন! তিনি ইংরেজদের কোষাগার এবং

অস্ত্রাগার—তোষাখানা আর তোপখানা সব কিছু ছেড়ে এক ফাঁকা মাঠে এসে মাত্র দুহাত উঁচু মাটির দেওয়াল তুলে এক অদ্ভুত গড় বানিয়েছিলেন। ঐ দুটি অত্যন্ত মূল্যবান গুদাম রক্ষকগণের ভয়ে তুলে দিয়েছিলেন পরম মিত্র নানাসাহেবের ওপর। ফলে কয়েক লক্ষ টাকা এবং গোলাবারুদ সমস্ত গিয়ে পড়ল সিপাহীদের হাতে। এদের না আছে তেমন অস্ত্র, না আছে খাদ্য, না আছে পিছন দিয়ে পালাবার কোন পথ। একটি মাত্র কূয়া—তাও ফাঁকা জায়গায়। জল আনতে গেলেই শত্রুর কামান থেকে 'পুষ্পবৃষ্টি' হয়।

তবু হুইলার হতাশ হন নি। প্রতিদিন অসংখ্য লোক মরতে লাগল, নারী শিশু কেউ বাদ গেল না। খাদ্য আসতে লাগল ফুরিয়ে, একটু পরিষ্কার জল মেলে না—তবুও হার মানবেন না তাঁরা, এই প্রতিজ্ঞা।

প্রথমটা নানা ভেবেছিলেন এই দু'শ' আড়াইশ' লোক তাঁদের তোপের সামনে ফুঁয়ে উড়ে যাবে। কিন্তু অত সহজে কাম ফতে হ'ল না। তখন বিপদ বুঝে তিনি অন্য চাল চাললেন। লোক দিয়ে বলে পাঠালেন যে টাকাকড়ি ও অস্ত্রশস্ত্র যদি ওঁরা সিপাহীদের হাতে সঁপে দিতে রাজী থাকেন এবং আত্মসমর্পণ করেন, তাহ'লে ওঁদের নির্বিঘ্নে এলাহাবাদ পর্যন্ত পৌঁছবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

ইংরেজদের তখন সঙ্গীন অবস্থা। ওঁর সেই শর্তই মেনে নিলেন। ২৭শে জুন উভয়পক্ষের কামানই নীরব হ'ল। কথা হ'ল ২৭শে ভোরবেলা ইংরেজরা এই অবরোধ ত্যাগ ক'রে নৌকোয় চাপবেন। কতকগুলি নৌকোও ভাড়া করা হ'ল, ওঁদের দেখিয়ে দেখিয়ে তাতে কিছু কিছু রসদও ভরা হ'ল। কতকগুলো নৌকোয় কোন আচ্ছাদন ছিল না—তাতেও খড় এবং ঘাস দিয়ে অস্থায়ী চালা তোলা শুরু হয়ে গেল। তিনজন ইংরেজ সেনানী গিয়ে নিজে চোখে এসব দেখে এলেন। ওধারে নানাসাহেব তাঁর তিনজন বিশ্বস্ত অনুচর এঁদের এখানে পাঠিয়ে দিলেন, তারা রইল জামিন হয়ে—নানাসাহেবের সদাচরণের। তার বদলে হুইলার সাহেব সেই রাত্রেই তাঁর অবশিষ্ট কামান এবং টাকাকড়ি যা ছিল সব নানাসাহেবের লোকের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

এ পর্যন্ত বেশ সহজেই কাটল।

কিন্তু গোল বাধল যখন শেষরাত্রিতে কর্তাদের আসল মতলবটা সিপাহীদের কাছে জানানো হ'ল।

কথা ছিল কানপুরের কাছে সতীচৌরা ঘাট থেকে ইংরেজরা নৌকোয় উঠবেন। এই ঘাটটিই কাছে পড়ে। কিন্তু সে সুবিধা নানাসাহেব দেখেননি, তিনি দেখেছিলেন যে এ ঘাটের দুদিকে উঁচু পাড় আছে আর সে পাড়ে আছে অসংখ্য ঝোপ-ঝাড়। ঘাটের ওপরে এক শিবের মন্দিরও আছে, সে মন্দিরেও লুকিয়ে থাকা যায়। নানা হুকুম দিলেন দু'দল সিপাহী গিয়ে এইসব ঝোপ-ঝাঁড়ে লুকিয়ে থাকবে, দু'একটা হালকা কামানও বসানো হ'ল জায়গা বুঝে। এছাড়া নদীর ওপারে বহুদূর পর্যন্ত—যেখানে যেখানে হতভাগ্য অসহায়ের দল আশ্রয়ের জন্য যেতে পারে—সর্বত্রই সিপাহী এবং কামান সাজানো হ'ল।

সিপাহীদের কিন্তু যখন জানানো হ'ল যে কাল সাহেবরা নৌকোয় চাপলেই তাদের

ইঙ্গিত করা হবে এবং ইঙ্গিত মাত্র তারা কামান এবং বন্দুক চালাবে ঐসব অসহায় শরণাগত পলাতকদের ওপর—তখন বেশ একদল সিপাহী, বিশেষত ব্রাহ্মণরা বেঁকে বসল।

তারা বললে, 'এ যে বিশ্বাসঘাতকতা! এর ভেতর আমরা নেই।'

প্রথমটা কর্তারা খুব হম্বিতম্বি করলেন, ভয় দেখালেন—কিন্তু তারা অটল। সাহেবদের কথা দেওয়া হয়েছে যে নিরাপদে নৌকোয় চড়ে এলাহাবাদ পর্যন্ত যেতে দেওয়া হবে—সে কথা রাখতেই হবে। তারা সিপাহী, লড়াই করতেই শিখেছে—খুন করতে নয়।

তখন নানাসাহেব নিজে এলেন।

বুঝিয়ে বললেন যে শত্রুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করায় দোষ নেই। তা ছাড়া ওরা বিধর্মী, ওদের সম্বন্ধে আমাদের ধর্মের শাস্ত্রবাক্য প্রয়োগ করারও কোন কারণ নেই। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে!'—এই কথাটাই সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার।

তার পরও যখন দেখলেন যে সিপাহীরা যথেষ্ট গলল না, তখন মোক্ষম অস্ত্রটি ছাড়লেন, নিজের গলার পৈতে দেখিয়ে বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণ এবং রাজা, আমি তোমাদের বলছি এতে কোন পাপ হবে না, যদি হয় তো সে পাপের ভার আমি বহন করব! তোমাদের ভয় কি?'

এবার সিপাহীরা নিশ্চিন্ত হ'ল।

ইতিহাস বলছে যে, এরপর আর কোন সিপাহী প্রতিবাদ করেনি। পরের দিন প্রত্যুষে নিরস্ত্র, আহত শরণার্থীদের ওপর নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করেছে তারা, আগুন ছুঁড়ে ছুঁড়ে নৌকো জ্বালিয়ে দিয়েছে—এমন কি যারা সাঁতরে পার হয়ে যাচ্ছিল তাদেরও পিছু পিছু গিয়ে গুলি চালিয়েছে, জলের ভেতরেই।

অতগুলি লোকের ভেতর মাত্র তিন-চার জন ইংরেজ শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পেরেছিল।

কিন্তু এ কথা কি ঠিক বিশ্বাস হল?

ভারতীয়—যারা রাজা বা নবাব নয়, যাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সামান্যই—তাদের মধ্যে কি এমন কেউ ছিল না যে প্রতিবাদ করে এই নিষ্ঠুরতার, শেষ পর্যন্ত বেঁকে দাঁড়ায়?

আমার তো এ কথা বিশ্বাস হয় না।

আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একজন ব্রাহ্মণ—দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ সিপাহী একজন মানল না ব্রাহ্মণরাজার এ অনুশাসন। সে প্রথমটা বোঝাবার চেষ্টা করল তার সহকর্মীদের—তারপর একসময় হতাশ হয়ে তার হাতের অস্ত্র নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দলের মধ্য থেকে এবং নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে বাইরের জনারণ্যে মিশে গেল।

তার নাম?

তার নাম ধরা যাক্—দেবকীনন্দন।

দেবকীনন্দন অতিকষ্টে সিপাহী ও নাগরিকদের ভীড় থেকে বেরিয়ে এল। অপেক্ষাকৃত নির্জন একটা স্থানে গিয়ে এক শিবমন্দিরের বাঁধানো চত্বরে বসে পড়ল।

আজ তার মন বড় বেশি নাড়া পেয়েছে।

আজ মনে পড়ছে ওর ছেলেবেলার কথা। ওর বাবা গঙ্গানন্দন ছিলেন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, নিত্য হোম-পূজা না ক'রে জল খেতেন না। পৈতের হোমের আগুন নেভেনি কখনও—সেই আগুনেই চিতা জ্বলেছে তাঁর। তিনি কখনও মিছে কথা বলতেন না—শত বিপদে পড়লেও না। ওকে বলতেন, 'বেটা আমাদের এই কলির ব্রাহ্মণদের সবই গেছে—আছে শুধু সত্য। এইটেকে বজায় রেখো। বাইরের লোকের সঙ্গে তো নয়ই—নিজের মনের সঙ্গেও কখনও কোন প্রতারণা ক'রো না—সে আরও বেশি মিথ্যাচরণ।'

গঙ্গানন্দন পূজাপাঠ আর ক্ষেতি নিয়ে থাকতেন। কিন্তু দেবকীনন্দনের সে জীবন ভাল লাগেনি। সে বাড়ি থেকে চলে এসে ফৌজে যোগ দিয়েছিল।

সেই থেকেই সে সিপাহী।

সত্যনিষ্ঠ এবং নির্ভীক ব'লে চিরকাল সে ইংরেজ অফিসারদের প্রিয়পাত্র ছিল। কোন কোন ইংরেজ পরিবারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল এই দীর্ঘদিনে।

আজ তার চল্লিশ বছর বয়স। সে ফৌজে ঢুকেছে ষোল বছরে।

দু'যুগ হয়ে গেল সে ইংরেজদের চাকরি করছে।

বিদ্রোহ করেছিল? হ্যাঁ—বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়েছিল ঠিকই।

তার কারণও ছিল কিছু কিছু।

প্রথমত ধর্মের কথা। তাকে বোঝানো হয়েছিল যে ইংরেজ কৌশলে তাদের ধর্ম নষ্ট করতে চায়। এই কৌশলের কথাটাতেই ঘৃণা বোধ হয়েছিল তার। দেবকীনন্দন ইংরেজদের শ্রদ্ধা করত—ওরা সহজে মিছে কথা ব'লে না দেখে। আজ সে শ্রদ্ধা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তবু তো ওরা—ওদের দল শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

ওদের ৫৩নং রেজিমেন্ট শেষ অবধি হুইলার সাহেবের ঐ মাটির গড় ঘিরে রেখেছিল—সেবা দিয়ে, বিশ্বস্ততা দিয়ে। অকস্মাৎ মতিচ্ছন্ন হল হুইলারের—একমাত্র যে সিপাহী দল বিশ্বস্ত ছিল, তাদের ওপরই গুলি চালাবার হুকুম দিলেন। ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে তখন রুটি পাকাতে ব্যস্ত, কেউবা সবে আহারে বসেছে—শুরু হ'ল গুলি।

সেদিন ঘৃণা—হ্যাঁ ঘৃণাই বোধ হয়েছিল দেবকীনন্দনের। এমন বিশ্বাসঘাতকতা যারা করতে পারে, তাদের পক্ষে সবই সম্ভব। তারা কৌশলে ধর্ম নেবার চেষ্টা করবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে!

সেদিন তাই সে অপর সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরেজদের কোষাগার লুঠ করতে বা তাদের ওপর গুলি চালাতে দ্বিধা করেনি।

কিন্তু আজ এ কি হচ্ছে?

স্বাধীনতার স্বপ্ন দেবকীনন্দনের ঘুচেছে অনেক দিনই, সে বুঝেছে যে এইভাবে লুঠতরাজ ক'রে কোন দল কখনও দেশ শাসন শিখতে পারে না। শুধু তো ইংরেজ নয়—সে লুঠের মোহ তাদের দিয়ে নিরীহ স্বদেশবাসীদেরও যে সর্বনাশ করাচ্ছে! তা ছাড়া পরে সে বুঝেছে

যে চারিদিকের বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্‌ভ্রান্ত বৃদ্ধ হুইলার ভুল খবর পেয়েই তাদের ওপর গুলি চালাবার হুকুম দিয়েছিলেন, ইচ্ছা করে অনিষ্ট করেন নি। এ ক'দিন ওরা যে বীরত্ব, যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে তাতে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী দেবকীনন্দনের শ্রদ্ধা বেড়েই গেছে। হ্যাঁ—রাজত্ব করার মত গুণ দিয়েই ভগবান ওদের পাঠিয়েছেন।

সেই লোকদের কাছে শপথ ক'রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে এই রকম বিশ্বাসঘাতকতা করা?

না, শুধু সিপাহী কেন—যে কোন জোয়ান হাতিয়ার ধরতে পারে—তার পক্ষেই এ কাজ চরম লজ্জার। হাত থেকে তার আগে হাতিয়ার ফেলে দেওয়া উচিত।

দেবকীনন্দন অনেকক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে বসে রইল। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ল।

এর কি কোন প্রতিকার করা যায় না?

হ্যাঁ,—করবে সে, অন্তত চেষ্টা করবে। বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিকার করবে সে বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে। পাপ? এতে কোন পাপ আছে বলে সে মনে করে না।

দেবকীনন্দনের পরনে তখনও সিপাহীর বেশ। সুতরাং হুইলারের অবরোধে ঢোকবার কোন অসুবিধাই হ'ল না। লক্ষ্য ক'রে দেখলে যে জন-দুই এদেশী লোক, খুব সম্ভব কোন সাহেবের প্রাক্তন খানসামা হবে—আমিনুউদ্দীনের খোসামোদ করছে ভেতরে যাবার জন্য। ওকে কেউ কোন প্রশ্নই করলে না। আজ সন্ধির সুযোগ পেয়ে বহু সিপাহীই ভেতরে এসেছে, খোঁজখবর নিচ্ছে পুরানো মনিবদের। স্বয়ং আজিমুল্লা এখানে রয়েছেন—নানার বিশ্বস্ততার প্রত্যক্ষ প্রতিভূ।

তখন ভোরের বেশী দেরী নেই। মুক্তির প্রত্যাশায় অধীর হয়ে উঠেছে সকলে। গোছগাছ শুরু হয়ে গেছে।

একজন অপরিচিত সাহেবকে সামনে পাওয়া গেল। তাঁর কাছেই খোঁজ চাইলে দেবকীনন্দন। কর্ণেল উইলিয়াম্‌স্? কে জানে তিনি কোথায়—তাঁর মেমসাহেব ঐ যে, ঐ সামনের ঘরটাতে আছেন।

ঘরে ঢুকতে গিয়েও খানিক ইতস্তত করলে দেবকীনন্দন। তারপর মনে জোর এনে একরকম মরীয়া হয়েই ঢুকে পড়ল।

'মেমসাহেব চিনতে পারেন?'

'কে— দেওকীনন্দন না? এসো এসো!'

মিসেস্ উইলিয়াম্‌স্ হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, 'কেমন আছ দেওকীনন্দন?'

এঁর কাছে বিশেষ ক'রে আসার কারণ আছে বৈকি।

দেবকীনন্দন তখন এঁদের দলেই অর্থাৎ ৫৬নং রেজিমেণ্টে ছিল। একদিন দেশ থেকে খবর এল যে ওর মেয়ে ভীষণভাবে পুড়ে গেছে—বাঁচার কোন আশাই নেই। গাঁয়ে ছিল একজন বৈদ্য—তাঁর হাতুড়ে চিকিৎসায় আরও খারাপ হয়েছে। বড় মেয়ে, আমাদের প্রথম সন্তান। দেবকীনন্দন রোকা পেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ব্যারাকের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, দূর থেকে দেখতে পেয়ে এই উইলিয়াম্‌স্ সাহেবই তাকে ডেকে পাঠান।

'কী হয়েছে বলো তো দেওকীনন্দন? চোখ ছলছল করছে তোমার, পাগলের মত হাবভাব—ব্যাপার কি?'

উত্তরে দেবকীনন্দন কেঁদে ফেলেছিল।

ওর মুখ থেকে সব শুনে উইলিয়াম্‌স্ ব্যারাকের সাহেব ডাক্তারকে খুঁজে বার করেন। তাঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে ব'লে অনুরোধ করেন দেবকীনন্দনের গ্রামে যেতে একবার। উইলিয়াম্‌স্-এর অনুরোধ এড়াতে না পেরে সে সাহেব ডাক্তার ঘোড়ায় চেপে কাঠফাটা রোদের মধ্যে ষোল ক্রোশ রাস্তা পেরিয়ে দেবকীনন্দনের গাঁয়ে গিয়েছিলেন। তাই সেযাত্রা ওর মেয়ে বেঁচেছিল—নইলে বাঁচবার কোন আশাই ছিল না।

সে কৃতজ্ঞতা দেবকীনন্দন আজও ভোলেনি।

কিন্তু এখন আর কুশল প্রশ্নের সময় নেই। সে মিসেস্ উইলিয়াম্‌স্-এর কথার জবাব না দিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে গলা নামিয়ে বললে, 'মেমসাহেব দোহাই আপনার, হুইলার সাহেবকে বুঝিয়ে বলুন যেন উনি নানাসাহেবের ফাঁদে পা না দেন। নানাসাহেবের মতলব ভাল নয়—ঝোপ-ঝাড়ে উনি কামান সাজাচ্ছেন, কাল আপনারা যে মুহূর্তে নৌকোয় পা দেবেন সেই মুহূর্তে শুরু হবে গোলা আর গুলি। এ কাজ করবেন না মেমসাহেব।'

মিসেস্ উইলিয়াম্‌স্ স্থিরভাবে বসে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, 'এখন আর কোন উপায় নেই দেওকীনন্দন। আমাদের নতুন কামানগুলো, টাকাকড়ি সব নানাসাহেবের লোকের হাতে দেওয়া হয়ে গেছে। এখন এখানে থাকা মানে নিশ্চিত মৃত্যু। তা ছাড়া আমরা এমনিও আর পারছিলাম না। এভাবে আর কিছুদিন চললে হয়ত আমাদের আত্মহত্যাই করতে হ'ত। কিন্তু তুমি যে আমাদের সত্যিকার উপকার করতে এসেছিলে তা আমরা ভুলব না কখনও—তুমি যা বলছ তাই যদি সত্যি হয় তো মৃত্যুর সময় এই আশ্বাস নিয়েই চোখ বুজব যে পৃথিবীতে সবাই বিশ্বাসঘাতক নয়—এখনও এখানে মানুষ আছে।'

দেবকীনন্দন ঘাড় হেঁট ক'রে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বহুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবারও মিসেস্ উইলিয়াম্‌স্‌কে একটা সেলাম জানাল। সে হয়ত তারপর তেমনি নিঃশব্দেই বেরিয়ে আসত যদি না মিসেস্ উইলিয়াম্‌স্ ওকে একটু দাঁড়াতে বলতেন।

'একটু দাঁড়াও দেওকী—এক মিনিট!'

দেবকীনন্দন ঘুরে দাঁড়াল, ওর মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়েও রইল কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না।

মিসেস্ উইলিয়াম্‌স্‌ও ওকে আর কোন কথা না ব'লে ডেস্কের কাছে গিয়ে একটা কাগজে খস্‌খস্ ক'রে দু'লাইন কি লিখলেন—তারপর কাগজটা এনে ওর হাতে দিয়ে বললেন, 'দেওকীনন্দন, আমরা মরব এটা হয়ত ঠিকই—কিন্তু ইংরেজের হাত থেকে তোমার নানাসাহেব অব্যাহতি পাবে না। এ বিশ্বাসঘাতকতার দাম তাকে বা তার দলের লোককে শোধ করতেই হবে। সে দিনটা তোমাদের বড় দুর্দিন। তেমন দিন যদি আসে এবং তুমি কখনও কোন ইংরেজের হাতে বিপদে পড়ো তো এই কাগজখানা দেখিও, অবশ্য ছাড়া পাবে। ভাল ক'রে রেখে দাও এখানা। বেঁচে থাকলে তোমার ঋণ শোধ করবার চেষ্টা করতাম কিন্তু সে আশা তো প্রায় নেই-ই।'

ম্লান একটু হাসলেন মিসেস্ উইলিয়াম্‌স্।

দেবকীনন্দন ওখান থেকে বেরিয়ে এল।

দু'একজন পরিচিত সিপাহীর সঙ্গে দেখা হ'ল, তারা দু'একটি রসিকতা করারও চেষ্টা করলে, দেবকীনন্দনের তরফ থেকে কোন জবাব এল না। সে যেন কেমন অন্যমনস্ক, কী যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

তেমনি আপনমনে ভাবতে ভাবতেই হুইলার সাহেবের গড় থেকে বেরিয়ে এল সে। গড়ই বটে। মনে আছে এটা যখন তৈরী হয় আজিমুল্লা ঠাট্টা ক'রে বলেছিল—'এটার কী নাম দিচ্ছ সাহেব—ন-উমীদ গড়, না নাচার গড়?' যে সাহেবকে বলা হয়েছিল তিনি বলেছিলেন, 'না—বিজয়গড়। ফতেগড়ও বলতে পারো।' হায় রে, গড়ের দেওয়াল পার হবার সময় কথাটা মনে পড়ে এই দুঃখের মধ্যেও দেবকীনন্দনের মুখে ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল—আজিমুল্লার কথাটাই ঠিক হ'ল তাহ'লে!

হুইলার সাহেবের নাচার গড় থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়েও দেবকীনন্দন নিশ্চিন্ত হতে পারল না। পথে অত্যধিক ভীড়। কৌতূহলী জনতা। সাহেব-মেমদের পরিণতি দেখবার জন্য উৎসুক। তাদের কানে হয়ত তখনও আসল খবর পৌঁছয়নি, তারা শুধু জানে যে সাহেবরা এইবার পালাচ্ছে। তবু যারা এত দীর্ঘকাল এতগুলো লোকের সঙ্গে লড়াই করেছে না খেয়ে না ঘুমিয়ে—তারা না জানি কী ধরণের মানুষ। তাদের একবার কাছাকাছি থেকে দেখা দরকার।

এদের সাহচর্য, ভেসে-আসা এদের কথাবার্তার টুকরো—কিছুই ভাল লাগল না দেবকীর। শেষে কোনমতে ভীড় ঠেলে অপেক্ষাকৃত জনবিরল একটা পথে এসে পড়ল। তারপর সেই পথ ধরেই আর একটু এগিয়ে গিয়ে পৌঁছল গঙ্গার ধারে। এখানটা আরও নির্জন। এদিক দিয়ে বিশেষ লোকজন আনাগোনা করে না। দেবকীনন্দন শান্তিতে একটা নিমগাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে মাটির ওপরই বসে পড়ল।

অন্ধকার তামসী রাত্রি। এপার ওপার কিছুই বোঝা যায় না। এমন কি গঙ্গাও বোঝা যেত না—যদি না চলতি দু'একটা নৌকোর আলো দেখা যেত। সেই আলো নৌকোর গতিবেগে আন্দোলিত ঈষৎ তরঙ্গিত গঙ্গার জলে প্রতিবিম্ব জাগিয়েছে—তাইতে বোঝা যাচ্ছে শুধু যে সবটাই অন্ধকার সীমাহীন শূন্যতা নয়। দেবকীনন্দন যেখানে বসে আছে তার নিচে দিয়ে বয়ে চলেছেন পুণ্যসলিলা, সকল কলুষনিবারিণী, শান্তিদায়িনী জাহ্নবী...

এ জীবন শেষ করার এ অপূর্ব সুযোগ।

লোভ? লোভ হয় বৈ কি!

দেবকীনন্দনেরও লোভ জাগল বহুবার। কিন্তু সে লোভ সে শেষ পর্যন্ত সম্বরণ করল। এতে হয়তো নিজের মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সে তো কেবল নিজেই পালাতে চায় না—সে চায় তার সহকর্মীদের হয়ে, তার জাতির হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে। এখন এভাবে মরলে তার চলবে না।

দেবকীনন্দন সেইখানেই স্থিরভাবে বসে রইল।

ক্রমে ভোর হ'ল। দূরে সতীচৌরা ঘাটের কর্মব্যস্ততা এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে। সারারাতই সেখানে কাজ হয়েছে, তার আভাস পেয়েছে দেবকীনন্দন। এখন আরও বেশী। কতকগুলো নৌকোতে ছই ছিল না—ঘাস-পাতা দিয়ে ছই ক'রে দেওয়া হচ্ছে, পাছে মেমসাহেবদের রোদে কষ্ট হয়। তোলা হচ্ছে জলের কলসী ও আটার বস্তা, চিনি, মাখন আরও কত কি!

অর্থাৎ ছলনার আয়োজনে যেন কোথাও কোন খুঁৎ না থাকে। কলে পড়বার আগের মুহূর্তেও মূষিক না বুঝতে পারে যে ওটা জাঁতিকল—এখনই তার পা চিরকালের মত লৌহ-কঠিন নির্মম দাঁতে আটকে পড়বে।

বাহবা আজিমুল্লা খাঁ!

এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্যের দিকে আজিমুল্লা ছাড়া কারুর সাধ্য নেই যে নজর রাখে।

দেবকীনন্দনের মুখে একটা বিচিত্র ম্লান হাসি ফুটে উঠল।

এই বুদ্ধি যদি তুমি কাজের মত কাজে খরচ করতে, তাহ'লে তোমার সত্যিকার উন্নতি হ'ত।...

একটু একটু ক'রে বেলা বাড়তে লাগল।

সতীচৌরা ঘাটে ভীড় জমছে ক্রমশ।

সাহেব-মেমরা এসে পৌঁছতে লাগলেন।

কেউবা ডুলিতে, কেউবা পাল্‌কিতে, কেউ কেউ বয়েল গাড়িতে।

সুস্থ সবল খুব কম লোকই আছে, যারা আছে তারা হেঁটে আসছে।

অতদূর থেকে মুখভাব ঠাওর হয় না—তবে ওদের কর্মব্যস্ততা দেখে বুঝতে পারে দেবকীনন্দন যে ওদের বেশীর ভাগ লোকই নিশ্চিন্ত, মুক্তির আনন্দে মশগুল। যেন কয়েক ঘণ্টা পরে ওরা সতিই পাবে মুক্তি, পাবে নিরাপদ জীবনযাত্রার সুযোগ সুবিধা।...

তারপর—

তারপর শুরু হ'ল আসল নাটকটা।

দেবকীনন্দন শিউরে উঠে চোখ বুজলে, দু'হাতে ঢাকলে কান। তবু তার মধ্যে দিয়েই মুহুর্মুহুঃ গুলির শব্দ এবং অসহায় নরনারীর আর্তনাদ কানে আসতে লাগল্। তার সঙ্গে কিছু কিছু পৈশাচিক উল্লাসের বিকট হুহুঙ্কার।

চোখের পাতা বোজা আছে। কিন্তু জ্বলন্ত নৌকোর তাপ মুখে এসে লাগতে বাধা কি? তাতেই তো বোঝা যায় কী হচ্ছে সেখানে!

হে গুরু! হে দয়াল! হে শিবশঙ্কর!

এ পাপের না জানি কী ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হবে—দেশকে ও জাতিকে!

সারাদিনই একভাবে বসে রইল দেবকীনন্দন, তারপর সন্ধ্যার কিছু আগে গিয়ে নামল গঙ্গায়।

ততক্ষণে কোলাহল ও আর্তনাদ দুইই স্তিমিত হয়ে এসেছে।

আবার গঙ্গার বুকে নেমে আসছে অন্ধকার—শান্তির ছায়া।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল দেবকীনন্দন।

জলে দাঁড়িয়ে ইষ্টদেবকে স্মরণ করবার চেষ্টা করল—কিন্তু সে ছবি মনে জাগল না। গায়ত্রী পড়তে গেল, তাও যেন ভুলে গেছে আজ।

শুধু চোখের জলে সব ত্রুটি ধুয়ে গেল ওর।

মাথায় ঠাণ্ডা জল পড়তে চোখের শুষ্কতাও কেটেছে।

দুই চোখের কোল বেয়ে উষ্ণ জল গড়িয়ে পড়ছে শীতল আর্দ্র কপোলে।

মা গঙ্গা—এ কী করলি মা!

তোর জলেই এই এতবড় অনাচার ঘটল?...

অনেক, অনেকক্ষণ পরে দেবকীনন্দন উঠে এল। তারপর এগিয়ে চলল ব্যারাকের দিকে নয়, এলাহাবাদ যাবার পাকা সড়কটার দিকে—

কাশী ও এলাহাবাদ কঠোর নিষ্ঠুর হাতে শাসন ক'রে বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য আসছে কানপুরের দিকে। চোখে তাদের জিঘাংসা, ওষ্ঠের কঠিন ভঙ্গীতে প্রতিহিংসা। কানপুরের কাহিনী ইতিমধ্যেই কানে পৌঁছেছে বৈকি।

তাদের পথের দু'ধারে বহুদূর অবধি লোকালয় শূন্য করে ভারতবাসীরা পালিয়ে গেছে। ইংরেজের সামনে সেদিন কেউ পড়লে রক্ষা পাওয়া মুশকিল।

এমন সময় ও কি?

একজন সিপাহী আসছে না?

শিকারের দিকে ধাবমান ক্ষুধিত নেকড়ের মতই ছুটে এগিয়ে এল জনা-আষ্টেক ইংরেজ।

'তুমি সিপাহী?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি নানাসাহেবের লোক?'

'হ্যাঁ।'

'কানপুরের খবর কি? সত্যি বলো, নইলে—'

'নইলে কি তা আমি জানি সাহেব। কিন্তু সত্যিই বলছি, বোধ হয় একজনও বেঁচে নেই সাহেব-মেমরা। আমরাই বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে মেরেছি।'

আর শোনবার সময় হ'ল না।

এমন কি পৈশাচিক কোন দণ্ড দেবার জন্য অপেক্ষা করার মত ধৈর্যও রইল না। নিমেষে ঝল্সে উঠল একজনের তরবারি।

একটি শব্দ না ক'রে পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল সিপাহীর দেহ। লালরক্তে ডেলা পাকিয়ে গেল খানিকটা ধুলো।

ততক্ষণে জেনারেল সাহেব নিজেও পৌঁচেছে।

'একি করলে তোমরা?'

'এ যে সিপাহী!'

'কিন্তু সিপাহী যদি, ও লোকটা পালাবার চেষ্টা না ক'রে তোমাদের হাতে এসে ধরা দিলে কেন?'

তাও তো বটে। সকলে পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

কে একজন বললে, 'ও নিজে স্বীকার করেছে ওর অপরাধ, কানপুরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথাও স্বীকার করেছে।'

কঠিন হয়ে উঠল জেনারেলের কণ্ঠস্বর, 'মূর্খের দল! তখনই বোঝা উচিত ছিল যে এ লোকটি সাধারণ সিপাই থেকে কিছু ভিন্ন! মৃত্যু নিশ্চিত জেনে এত সহজে কেউ স্বীকার করে? দ্যাখো তো ওর কাগজপত্র!'

পকেটে ছিল মিসেস উইলিয়াম্‌স্‌-এর চিঠি। জলে বা ঘামে ভিজে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। তবু তার মর্ম কিছুটা উদ্ধার করা গেল বৈকি!

জেনারেল সাহেব নীরবে টুপি খুললেন।

সামান্য ক'খানি রুটি

এই মাত্র কিছুদিন আগে—গত জুনমাসের মাঝামাঝি—খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চোখে পড়ল, বিহার সরকার সিপাহী-যুদ্ধের অন্যতম নায়ক কুঁয়ার সিংয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। স্থির হয়েছে—জগদীশপুরে ওঁর যে প্রাসাদ এবং প্রাসাদের সংলগ্ন আমবাগান প্রভৃতি—যেখানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল একদা—আপাতত সেই সম্পত্তির সমস্তটাই বর্তমান মালিকদের কাছ থেকে কিনে নেওয়া হবে, যাতে সারা ভারতের লোক ঐ জগদীশপুরের সূত্রে চিরদিন কুঁয়ার সিংয়ের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

সত্যিই—কুঁয়ার সিং, তাত্যা টোপী, ঝাঁসীর রাণী, আজিমুল্লা খাঁ—এঁরাই তো সেদিন যথার্থ নেতা ছিলেন। এঁদেরই চক্রান্তে, এঁদেরই সুচতুর ব্যবস্থায় একদিন ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত আগুন জ্বলে উঠেছিল! নানাসাহেব ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রথম দিকটা প্রকাশ্যে কোন কাজ করতে পারেন নি—শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দু-দিক বজায় রাখতে হয়েছিল তাঁকে। আর যাঁরা এসেছিলেন—তাঁদেরও টেনে আনতে হয়েছিল।... জালে জড়াতে হয়েছিল সুকৌশলে। সে জাল বিস্তার করেছিলেন এঁরা, আর এঁদের বিশ্বস্ত দু-একজন সঙ্গী।

ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত আহ্বান গিয়েছিল এঁদের! পাঞ্জাব আর রাজপুতানা বাদে সারা উত্তর ভারত সেদিন উত্তর দিয়েছিল সে আহ্বানে। সমিধ্‌ বোধহয় প্রস্তুতই ছিল, বারুদের স্তূপ ছিল তৈরী—শুধু আগুনের ফুল্‌কি গিয়ে পড়বার অপেক্ষা। কিন্তু সে আগুনের ফুল্‌কিও বড় অদ্ভুত। যে আহ্বান গিয়েছিল এই বিশাল অর্ধ মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে—তার লিপি বড় বিচিত্র! গ্রাম থেকে গ্রামে—শহর থেকে শহরে কী এমন লিপি গিয়েছিল যা পড়তে যে-কোন ভাষা-ভাষী, এমন কি সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোকেরও কোন অসুবিধা হয়নি?

সামান্য ক'খানি রুটি বা চাপাটি!

এ-গ্রামের একজন দু'খানি রুটি নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল ও-গ্রামে। যার হাতে দেওয়া হ'ল সে কী দেখলে সে রুটির মধ্যে কে জানে—নিশীথরাতের অন্ধকারে চুপি চুপি ছড়িয়ে

দিয়ে এলো সে বার্তা—আবার হয়ত পরের দিন সকালেই ক'খানি রুটি চ'লে গেল আশে-পাশের সমস্ত গ্রামে। পুকুরের মাঝখানে একটা ঢিল ফেললে যেমন তার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে, তেমনি ভাবে দেখতে দেখতে অল্প ক-দিনের মধ্যে খবর চলে গেল বন-মাঠ ডিঙিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল!.. এসেছে আদেশ, বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ।'

প্রায় একশো বছর আগের কথা।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের একেবারে শেষের দিক। পৌষ মাসের শীত উত্তর-ভারতের গ্রামাঞ্চলে যেন টুঁটি টিপে ধরেছে সবাইকার।

বিহারের আরা শহর বিখ্যাত। আজও বিখ্যাত। হাওড়া থেকে বেরিয়ে ইস্টার্ন রেলপথের যে প্রধান লাইনটা পাটনা হয়ে এলাহাবাদের দিকে এগিয়ে গেছে, তার ওপরই পড়ে 'আরা' স্টেশন। আর তার কাছে 'জগদীশপুর' গ্রাম, বৃদ্ধ জমিদার কুঁয়ার সিংয়ের জমিদারী। সেদিন ঐ জগদীশপুরেরই রাজবাড়ির একান্তে একটা বড় ঘরে মন্ত্রণা-সভা বসেছিল, সন্ধ্যার কিছু পরে। আধো-অন্ধকার ঘর। বাইরের দিকে কোন জানলা নেই—বিহারের কোন বাড়িতেই তখন জানলা থাকতো না। ভেতরের দিকের একমাত্র দরজাও শীতের ভয়ে বন্ধ। অবশ্য ঝাড়ের অভাব নেই ঘরে, কিন্তু তাতেও তো রেড়ির তেলের বাতি, তাছাড়া ইচ্ছে ক'রেই বোধহয় ঝাড়ের সব আলোগুলো জ্বালা হয়নি।

দামী ফরাস পাতা ঘরে। তামাকের ব্যবস্থাও ঢালা। হিন্দু ও মুসলমান হুঁকাবরদাররা ঘন ঘন কল্‌কে পালটে দিয়ে যাচ্ছে। সামনে থালায় পান আর সুপারি-এলাচ। কিমামও আছে। সুগন্ধি তামাক আর পানমশলার গন্ধে ঘর মৌ-মৌ করছে। তামাক আর রেড়ির তেলের ধোঁয়ায় ঘরের অধিবাসীদের মুখগুলো আবছা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কথা চলছে ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে। ষড়যন্ত্রের আভাস সকলকার ভাব-ভঙ্গীতেই।

বহুরাত্রি পর্যন্ত চলল বৈঠক। নিশ্বাস আর ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে, সেইসঙ্গে সকলের মনও। তারই মধ্যে অকস্মাৎ প্রবীণ কুঁয়ার সিং উত্তেজনায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন একবার—'ভাই সব, মিছিমিছি তোমরা ভাবছো। সব তৈরী আছে—আগুন জ্বাল্‌লেই দেখবে যে বারুদের স্তূপ জমে আছে সামনে। শুধু এখন—আমরাও যে তৈরী, এই খবরটা দেশের ভেতর পৌঁছে দিতে হবে। জানিয়ে দিতে হবে যে, তোমরা প্রস্তুত থাকো।... কোথাও আগুন জ্বলেছে এই খবরটা পেলেই যাতে তোমরাও জ্বালাতে পারো তোমাদের আগুন!'

উত্তেজনায় গড়গড়ার নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন কুঁয়ার সিং। আবার হাঁপাতে হাঁপাতে হাত বাড়িয়ে খুঁজতে লাগলেন ফেলে-দেওয়া সেই নলটা।

আজিমুল্লা খাঁ সামনেই বসে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। এখন সট্‌কাটা মুখ থেকে সরিয়ে একটু হাসলেন ঃ

'কিন্তু খবরটা পাঠাবেন কী ক'রে রাজাসাহেব! গ্রামে গ্রামে ছড়াবার বহু আগেই ঐ শয়তান আংরেজগুলো জেনে যাবে যে!'

কুঁয়ার সিং বললেন, 'সাংকেতিক-লিপি ব্যবহার করতে হবে।'

'কিন্তু সাংকেতিক-লিপি বোঝাবার জন্য আবার লোক চাই যে! গাঁয়ের লোকে বুঝবে কি ক'রে?'

'মুখে-মুখেই খবর পাঠাতে হবে।'

'এত লোক পাওয়া যাবে কি ক'রে?'

'তাহ'লে এমন একটা কিছু সংকেত ব্যবহার করতে হবে, যা এমনি কিছু বোঝা যাবে না, কিন্তু তার ইঙ্গিতটা সবাই বুঝবে।'

'কিন্তু এমন কী জিনিস আছে যা সবচেয়ে সাধারণ, অথচ সবচেয়ে নিরাপদ—যার ইঙ্গিত সবাই বুঝবে?' প্রশ্ন করলেন ফৈজাবাদের বিখ্যাত নেতা মৌলভী আহ্‌মদউল্লা।

ও-পাশের আব্‌ছা-অন্ধকারের ভেতর থেকে কে যেন ফিস্‌ফিসিয়ে ব'লে উঠল—'চাপাটি।'

'চাপাটি!' বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকালেন আজিমুল্লা খাঁ।

'কে, কে ওখানে কথা কইলে?'

ধোঁয়ার মধ্যে চোখ মেলে ভালো ক'রে তাকাবার চেষ্টা করলেন কুঁয়ার সিং। কেমন একটা অস্পষ্ট সংশয়ের অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি।...কে ও লোক? কোথা থেকে এলো? পরিচিত কেউ তো নয়, গুপ্তচর নয় তো শত্রুর?

'আজ্ঞে আমি।'

যে ওপাশ থেকে কথা বলেছিল সে এবার এগিয়ে এল। দীর্ঘদেহ গৌরকান্তি ব্রাহ্মণ একজন। খাটো বেনিয়ান-কোর্তার মধ্য দিয়ে শুভ্র পৈতার গোছা দেখা যাচ্ছে। কাঁধে একটি গামছা উত্তরীয়ের মত ফেলা, তার একপ্রান্তে কী-একটা বাঁধা। ললাটে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা, তার ওপর বিভূতি-লেপা—একদিক থেকে আর-একদিক পর্যন্ত। বিপুল শিখা কাঁধ পর্যন্ত লতিয়ে এসেছে, তার ডগায় একটি ধুতরোর ফুল বাঁধা।

একবারে সামনে এসে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে দাঁড়ালেন তিনি।

'কে, কে আপনি? এর ভেতর কেমন ক'রে এলেন?'

'আমি ব্রাহ্মণ—এই আমার পরিচয় জেনে রাখুন। এর বেশী কিছু জানতে চাইবেন না। আপনারা যা সন্দেহ করছেন তা নয়—আমি শত্রুর গুপ্তচর নই। তাছাড়া গুপ্তচর তারা পাঠাবে কেন? এ তারা কোনদিন স্বপ্নেও দেখবে না যে, তাদের উচ্ছেদের জন্য এতগুলি প্রতাপশালী লোক ষড়যন্ত্র করছেন। তারা নিশ্চিন্ত আছে।... তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় তো—আমি ব্রাহ্মণ, নিত্য শিবপূজা ক'রে জলগ্রহণ করি, নিত্য যজ্ঞ করি, এই যজ্ঞ-বিভূতি আমার ললাটে, শিবের প্রসাদীফুল আমার শিখায়, আর হাতে এই উপবীত—আমি শপথ ক'রে বলছি—আমি মনে-প্রাণে আপনাদের দিকেই। এদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্রত। সেই উদ্দেশ্যে নিজের গরজে খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছি। এই একাগ্রতা ও আমার তপস্যাবলেই আপনাদের সতর্ক প্রহরীদের এড়িয়ে অনায়াসে এই মন্ত্রণাসভায় ঢুকতে পেরেছি। আমাকে আপনারা বিশ্বাস করুন।'

তিনি তাঁর যজ্ঞোপবীত হাতে জড়িয়েই হাতজোড় ক'রে দাঁড়ালেন।

এ শপথ যে হিন্দুর কাছে কতখানি ছিল, তা সেকালে মুসলমানরাও জানতেন আর তাঁরা বিশ্বাসও করতেন। তাই আহ্‌মেদউল্লা তাড়াতাড়ি বললেন, 'বসুন, বসুন। আপনি স্থির হোন। আপনাকে আমরা বিশ্বাস করছি।'

ব্রাহ্মণ বসলেন।

কুঁয়ার সিং বললেন, 'তারপর? আপনি চাপাটির কথা কি বলছিলেন?'

'কিছুই না—ধরুন গ্রাম থেকে গ্রামে যদি কেউ দু'খানা ক'রে রুটি পৌঁছে দেয়, কে কি ভাববে? কে কি বুঝবে? অথচ এমনি ক'রে আমাদের আহ্বান অব্যর্থভাবে পৌঁছোবে লোকের কানে—সবাই প্রস্তুত হয়ে থাকবে।'

'কিন্তু ঠাকুর—' আজিমুল্লা একটু কৌতুকের ভঙ্গীতেই বললেন, 'কিন্তু ঠাকুর—আংরেজ যেমন বুঝবে না, তেমনি দেশের লোকও তো বুঝবে না! তারা অবাক হয়ে ভাববে, এ আবার কি? এর মানে কি?'

'তাছাড়া—' অযোধ্যার বিখ্যাত তালুকদার ঠাকুর সিং বললেন, 'তাছাড়া মুসলমানের রুটি হিন্দুর কাছে অস্পৃশ্য, ছোটজাতের রুটি ব্রাহ্মণ ছোঁবে না—রুটি পাঠানোর বিপদও আছে। কেউ কেউ হয়তো এটাকে অপমান বলেই মনে করবেন।'

'না।' ব্রাহ্মণের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'সে ভয় নেই। খাঁ সাহেব, আপনার কথা ঠিকই· ঠাকুর সিংজীও কিছু অন্যায় বলেন নি, কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন—সে-কথাও আমি ভেবেছি বৈকি।'

তারপর একটু থেমে, কেমন একরকম চাপা-গলায় বললেন, 'আমার এই তপস্যা, এই সাধনা আজ থেকে শুরু হয়নি—হয়েছে ঠিক দু-বছর আগে থেকে। আজিমুল্লা খাঁ—আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আজ ভারতের এমন গ্রাম খুব কমই আছে, যেখানে এই খবর পৌঁছোয়নি যে ইংরেজদের এখান থেকে তাড়াবার জন্য একটা বিপুল আয়োজন চলছে। সময় যখন কাছে এগিয়ে আসবে, তখন তোমাদের গ্রামে কোথাও থেকে এসে পৌঁছোবে দু-খানি রুটি। সেই চিহ্নই হচ্ছে সাংকেতিক-লিপি—যুদ্ধের আহ্বান। সেই রুটি পেলেই তোমাদের গ্রামের লোকেরা চারিদিকের অন্যান্য গ্রামে আ[illegible]ব সেই রুটি পৌঁছে দেবে—আর প্রস্তুত হবে যার যতটুকু সাধ্য নিয়ে।'

সকলে স্তম্ভিত—কারুর মুখে কোন কথা নেই। এই সবচেয়ে শক্ত কাজটিই তাহ'লে হয়ে গেছে? কিন্তু কী ক'রে হ'ল? কে করলে?

সকলের মনের প্রশ্ন মুখে ফুটে করলেন কুঁয়ার সিং: 'কিন্তু এ কে করলে? কারা করলে?'

'কারা নয় সিংজী—বলুন কে? পাঁচ কান হ'লে আর কোন কথা গোপন থাকে না। আমিই করেছি এই কাজ, অসম্ভব সম্ভব করেছি। আমি একা সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছি এই দু-বছর ধরে। গাছতলায় ঘুমিয়েছি, ভিক্ষান্ন নি[illegible] ক'রে দিয়েছি ইষ্টদেবতাকে, ঝড় জল হিম রৌদ্র কিছু গ্রাহ্য করিনি। কারণ এ যে আমার তপস্যা! হ্যাঁ—দু-এক জায়গায় আমার মত দু-একজনকে পেয়েছি বৈকি, [illegible]রা আমারই মত ইংরেজকে ঘৃণা করে। তারাও আমার কাজের ভার কিছু কিছু তুলে নিয়েছে নিজেদের হাতে—নইলে কি কাজ শেষ হ'ত এর ভেতর!'

'কিন্তু এ-কথা আপনার মনে গেল কি ক'রে?' কে যেন প্রশ্ন করলেন।

'লর্ড ডালহাউসী যা করেছেন, তা থেকে অসন্তোষের আগুন জ্বলতে আর বেশী দেরী নেই—এ-কথা কে না জানে মৌলভীজী! আমি শুধু তার অগ্রদূত হয়ে খবরটা পৌঁছে দিয়েছি মাত্র।'

'আপনার কি স্বার্থ—জানতে পারি কি?'

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন ব্রাহ্মণ। তারপর গামছাটি টেনে কোলে নামিয়ে, খুললেন তাঁর সেই কোণে-বাঁধা পুঁটুলিটি। তা থেকে কী দুটো বস্তু নিয়ে ফেলে দিলেন সকলের সামনে। সকলে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখলেন, একখানি বহুদিনের শুক্‌নো, প্রায় গুঁড়িয়ে-যাওয়া বিবর্ণ রুটি, আর একটি শুষ্ক অরবিন্দ অর্থাৎ শুক্‌নো পদ্মফুল।

সকলে চেয়েই আছেন, কিন্তু বুঝতে পারছেন না।

ব্রাহ্মণ নীচুগলায় গাঢ়স্বরে বললেন, 'দু-বছর আগে চলেছিলাম চন্দ্রনাথ—প্রভুজীকে দর্শন করবো ব'লে। মানসিক ছিল যে ভিক্ষা করবো না, সঙ্গেও কিছু নেবো না—যদি কেউ ডেকে কিছু দেয় তো খাবো, নইলে খাবো না। বাড়ি আমার গোরখপুর—সেখান থেকে বেরিয়ে মুঙ্গের পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম নির্বিঘ্নেই। কিন্তু মুঙ্গেরে গিয়েই এই আগুন জ্বললো—'

বলতে বলতে থেমে ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন। বোধহয় বলতে কষ্টই হচ্ছিল সেদিনের সে কাহিনী। একটু পরে সামলে নিয়ে আবার বললেন, 'দু-দিন ভাগ্যে কিছু জোটেনি—তিনদিনের দিন চারটি আটা দিয়েছিল এক দোকানদার, কিছু জ্বালানি কাঠও। গঙ্গাতীরে এক গাছতলায় বসে রুটি তৈরী ক'রে ইষ্টদেবকে নিবেদন করতে যাবো—এমন সময় এক বিঘ্ন। ওধার থেকে ঘোড়ায় চেপে এক সাহেব আর মেম আসছিলেন—সঙ্গে ছিল তাঁদের প্রকাণ্ড এক কুকুর। কুকুরটা আমাকে দেখতে পেয়েই অকস্মাৎ লাফাতে লাফাতে আমার দিকে তেড়ে এল। আমি প্রমাদ গণলাম। সামনেই পাতাতে রুটিগুলো সাজানো, পথে পেয়েছিলাম একটা পদ্মফুল—সেই ফুল আর লোটার গঙ্গাজল নিয়ে সবে তখন ইষ্টকে স্মরণ করেছি—ঐ ফুল আর জল দিয়ে রুটিগুলো তাঁকে নিবেদন করবো—হায়, শুধু যদি সেটাও পারতাম। নিজের ক্ষুধার জন্য ভাবি না—কিন্তু দেবতাও যে দু-দিন অনাহারে!... আমি সাহেবের দিকে হাত-জোড় ক'রে চেঁচিয়ে বললাম—সাহেব ফেরাও ফেরাও—কুকুরকে সামলাও! কিন্তু সাহেব আর মেম হি-হি করে হাসতে লাগল আমার কাতর প্রার্থনায়। দেখতে দেখতে কুকুরটা এসে মুখ দিল রুটিতে... একটা পায়ে ক'রে পদ্মফুলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে—দেবতার পায়ে দেবার ফুল কুকুরের পায়ে লাগল।'

রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে ব্রাহ্মণের মুখ রাঙা হয়ে উঠল, চোখের কোলে কোলে ভ'রে এল জল। একটু থেমে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, 'এতখানি রাগ সাম্‌লাতে পারলাম না। যে-তিনটে পাথর দিয়ে উনুনের মত করেছিলাম, তারই একটা তুলে ছুঁড়ে মারলাম কুকুরটাকে সজোরে। একবার আওয়াজ ক'রে উঠেই কুকুরটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল... সাহেবের পেয়ারের কুকুর—ঐ অবস্থা দেখেই সাহেব ছুটে এসে হাতের চাবুকের বাড়ি এলোপাতাড়ি মারতে লাগলেন আমাকে। বুটসুদ্ধ লাথি মারলেন সজোরে... মুখ কেটে চামড়া ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। এখনও সে দাগ আছে। তারপর মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়েই হোক

কিংবা কুকুরটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বেশি দরকার বলেই হোক—একসময় সাহেব থামলেন, ঘোড়া থেকে নেমে কুকুরটাকে কোলে ক'রে নিয়ে চ'লে গেলেন, আমি সেই রক্তাক্ত দেহে অশুচি রুটিগুলোর মধ্যে প'ড়ে রইলাম।'

'আর কেউ ছিল না সেখানে?' সক্রোধে গর্জন ক'রে উঠলেন কুঁয়ার সিং, 'মানুষ ছিল না কেউ সেখানে?'

'ছিল, ভিড়ও হয়েছিল, কিন্তু সাহেব দেখে কেউই এগোয়নি, বরং দু-একজন এসে আমাকেই দোষ দিল। সিংজী! খাঁ সাহেব! এ-ই সেই রুটি, আর এ-ই সেই পদ্ম। সেদিন সন্ধ্যায় গায়ের জ্বালা জুড়োতে গঙ্গায় নেমে শপথ করেছিলাম যে, এই দুটি জিনিস দিয়েই আমি এর শোধ নেবো। এমন আগুন জ্বালাবো এই সামান্য দুটি তুচ্ছ জিনিস দিয়ে—যে আগুন নিভোতে লাগবে হাজার হাজার ইংরেজের রক্ত।... তারপর সেইদিন থেকে আর বাড়ি ফিরিনি। জানতাম যে বড়লাট ডালহাউসি যা কাণ্ডকারখানা করছেন তাতে আগুন জ্বলবেই—তাই বেরিয়ে পড়লাম শুধু সেই খবরের জন্য প্রস্তুত রাখতে দেশকে। সাধুর ছদ্মবেশে ঐ রুটির কথাই ব'লে বেড়িয়েছি এতদিন। আর একটা কথা—ব্যারাকে ব্যারাকে যখন খবর দেবেন—একটি ক'রে পদ্ম পাঠাবেন, সে-ব্যবস্থাও আমি ক'রে এসেছি।'

কুঁয়ার সিং উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ব্রাহ্মণ, আপনি একা যা করেছেন, আমরা হাজার লোক লাগিয়েও তা করতে পারতাম না। আপনি আমাদের মহৎ উপকার করেছেন।... আপনি ক্লান্ত, যদি দয়া ক'রে ক-টা দিন এ-গরীবের আতিথ্য গ্রহণ করেন তো বাধিত হই।'

'ধন্যবাদ সিংজী।' ব্রাহ্মণও উঠে দাঁড়ালেন। হাতজোড় করে বললেন, 'আপনি আমাকে বিদায় দিন, আমার কাজ এখনও কিছু বাকি আছে।'

তিনি আর দাঁড়ালেন না। নিঃশব্দে সেই নিশীথ অন্ধকারে যেন ছায়ার মতই নিমেষে মিলিয়ে গেলেন।

সেই ব্রাহ্মণ তিনদিনের পথ হেঁটে এসে গঙ্গাতীরে পৌঁছলেন। তাঁর গামছায় তখনও বাঁধা আছে সেই রুটি আর পদ্ম। ও দুটি বস্তু আসবার স- কুড়িয়ে আনতে তাঁর ভুল হয়নি।

গঙ্গার তীরে পৌঁছে সেই চাপাটি আর পদ্ম আগে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন, তারপর স্নান ক'রে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়েই পিতৃপুরুষের তর্পণ করলেন—আর করলেন ইষ্টপূজা। সেই থেকে আজ পর্যন্ত উনি ইষ্টপূজা করেন নি। আজ প্রায়শ্চিত্ত শেষ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে পূজা করলেন। তারপর আস্তে আস্তে গঙ্গার জলেই আরও নেমে গেলেন—আর উঠলেন না। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেছে।*

---

* ইতিহাসে আছে, চাপাটি আর পদ্ম পাঠিয়ে সিপাহী বিদ্রোহের আসন্ন আভাস জানানো হয়েছিল। কিন্তু কেন এই দুটি বস্তুই পাঠানো হয়েছিল, আর কে তাদের ব'লে দিয়েছিল এই সাঙ্কেতিক জিনিস দুটির অর্থ, সে-সম্বন্ধে ইতিহাসে কোনো উল্লেখ নেই। যেখানে ইতিহাস নীরব, সেখানেই কল্পনার খেলা।

প্রাণের মূল্য

১২৬৪ বঙ্গাব্দের হেমন্তকাল—কার্তিকের শেষ। উত্তর ভারতে এই সময়টা দিনের বেলা যথেষ্ট শীত বোধ না হ'লেও সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বাতাস রীতিমত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। প্রথম শীতের সে কামড় সাধারণ জামা-কাপড় ভেদ ক'রে যেন হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলে।

আমরা যেদিনের কথা বলছি, সেদিন দুপুরের পর থেকেই আকাশে মেঘ দেখা দিয়ে বিকেল নাগাদ গুঁড়ি গুঁড়ি জল হয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে, ফলে ঠাণ্ডাটা যেন আরও জাঁকিয়ে পড়েছে। বেলা চারটের সময়ই চারিদিক ঝুপ্‌সি হয়ে নেমেছে অন্ধকার, যদিও মেঘটা মনে হচ্ছে এবার কেটেই যাবে, কারণ জল থামবার সঙ্গে সঙ্গেই হাড়-কাঁপানো উত্তুরে বাতাস উঠেছে, এ হাওয়ার মুখে মেঘ বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবে না।

এরই মধ্যে একেবারে গোমতী নদীর জলের কিনারা দিয়ে একটি তরুণী মেয়ে যথাসাধ্য নিঃশব্দ অথচ দ্রুতপদে হেঁটে যাচ্ছিল। ওর অপেক্ষাকৃত পাতলা শাড়ির ওপর আরও পাতলা একটি সাদা ওড়না জড়ানো—তাও সম্ভবত কিছুক্ষণ আগেকার বৃষ্টিতে অনেক আগেই ভিজে গেছে, ফলে সে সামান্য বস্ত্রে শীত নিবারিত হওয়া তো দূরের কথা—আর্দ্রবস্ত্রে বাতাস লেগে তা শীতবৃদ্ধিরই কারণ হয়ে উঠেছে।

এই সময় এই জনবিরল অংশে এই মেয়েটির আবির্ভাব একটু বিস্ময়কর বৈকি!

লক্ষ্ণৌয়ের অবস্থা গত কয়েক মাস যাবতই বড় গোলমেলে হয়ে রয়েছে। দেশী সিপাইরা বিদ্রোহ করেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে। ইংরেজ মসীজীবী ও অসিজীবী দুই দলেরই লোক প্রাণভয়ে এসে রেসিডেন্সীর বাগানে আশ্রয় নিয়েছে। সেখান থেকে তাদের উৎখাত করবার যে চেষ্টা চলেনি তা নয়—গত কয়েকমাস ধরে অহোরাত্রই সে চেষ্টা চলেছে বলতে গেলে—কিন্তু সুবিধে হয়নি বিশেষ, মুষ্টিমেয় ইংরেজ নারী-বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে জীবনরক্ষার জন্য যে অদ্ভুত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, ইতিহাসে তা স্মরণীয়। ওদিকে এদের উদ্ধার করার জন্য ইংরেজদেরও চেষ্টার ত্রুটি নেই, মধ্যে মধ্যে বেশ ভাল রকমই আশা জেগেছে এখানের অবরুদ্ধ এই ক'টি প্রাণীর মনে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সুবিধা হয়নি। বার বার ফিরে যেতে হয়েছে উদ্ধারকামী দলকে। শত্রুর শৌর্যের কাছে না হোক, সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছে হার মানতে হয়েছে শেষ অবধি।

কিন্তু এবারের হাওয়া অন্যরকম। দুর্ধর্ষ হাইল্যাণ্ডার বা স্কচ্ সৈন্যরা এসে পৌঁছেছে, তাদের সেনাপতিরূপে এসেছেন স্যার কলিন ক্যাম্পবেল। বালাক্লাভা যুদ্ধের গৌরব-মুকুট এখনও তাঁর শিরে অম্লান। কোন শত্রুর কাছে মাথা নোয়াতে শেখেনি এই হাইল্যাণ্ডাররা—এখানকার সিপাহীরা এদের গতি রোধ করতে পারবে, সে আশা খুবই কম।

আমরা যেদিনের কথা বলছি সেদিন সিপাহীদের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল ঐ কারণেই।

হাইল্যাণ্ডাররা একেবারে শহরের উপকণ্ঠে বসে পড়েছে। আলমবাগ পর্যন্ত পৌঁছেছে তারা। আজই নাকি দুপুরে জালালাবাদের মাটির কেল্লাও তাদের পদানত হয়েছে—অভ্রভেদী দুর্গপ্রাকার মাটিতে এসে মিশেছে। কেল্লা বিজয়ের পর আবার তারা আলমবাগে ফিরে গেছে বটে কিন্তু এমন অবস্থাই ক'রে রেখে গেছে যে, সে কেল্লা দখল ক'রে সিপাইদের আর কোন লাভ হবে না, এতটুকু আশ্রয় বা আড়াল আর সেখানে অবশিষ্ট নেই।

সংবাদটা যথাসময়েই শহরে এসে পৌঁছেছে। থমথম করছে সিপাহীদের শিবির। আরও উগ্র হয়ে উঠেছে বিদ্বেষ। যদি কোনমতে এখনও ঐ রেসিডেন্সীর ভাঙ্গা পাঁচিলের আড়াল থেকে ঐ কটা ইংরেজের মুর্দাকে টেনে এনে গোমতীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া যেত! ঐ ক'টা প্রাণের জন্যেই তো এদের এত জেদ, এত আগ্রহ!

অবশ্য এটাও ঠিক যে, সিপাহীদের আনাগোনা ছাড়া লক্ষ্ণৌতে আর কোন প্রাণলক্ষণই যেন নেই। অধিকাংশ নাগরিক—যাদের একটু অবস্থা ভাল অথবা দেহাতে কিছুমাত্র আশ্রয় আছে—তারাই ঘরবাড়িতে তালা দিয়ে দূর গ্রামে কোথাও পালিয়েছে। যারা একান্ত যেতে পারেনি, তারা দরজা জানালা বন্ধ ক'রে যতদূর সম্ভব অস্তিত্বের প্রমাণ লোপ করার চেষ্টা করেছে। কেউ কেউ বাইরের দোরে ভারি তালা লাগিয়ে পিছনের দোর দিয়ে ঢুকেছে বাড়ির মধ্যে। রাস্তার দিকের ঘরে সাধ্যমত আলো জ্বালায় না কেউ। কেন তা অবশ্য কেউ জানে না, কিসের একটা আতঙ্ক সকলকেই যেন শশকবৃত্তি অবলম্বন করিয়েছে। কোনমতে মুখটা লুকিয়ে রেখে সবাই নিজেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করছে। এমন কি লুটেরা বদমাইসের দল যারা—এই শ্রেণীর হাঙ্গামা বা বিপ্লবেরই পথ চেয়ে কাল গোনে, তারাও যতদূর সম্ভব প্রকাশ্যে চলাফেরাটা পরিহার ক'রে চলেছে। সুযোগের অপেক্ষায় ইঁদুরের মত কোন আড়ালে-আবডালে আত্মগোপন ক'রে ওৎ পেতে বসে আছে।

এ হেন দুঃসময়ে এবং অরাজক অবস্থায় তরুণী মেয়ের পক্ষে ঘরের বার হওয়াই যথেষ্ট দুঃসাহসের কাজ, তার ওপর এই রকম স্থানে আসাটা খুবই অসমসাহসিকতা বলতে হবে। যেখানে আশেপাশে চারিদিকেই সিপাহীদের ঘাঁটি—তারা হয়ত সবাই রক্তপিপাসু নয়, কিন্তু নারী-বুভুক্ষু প্রায় সব ক-জনই। এবং সে কথাটা হিন্দুস্থানের কোনও মেয়েরই আজ না জানবার কথা নয়।...

মেয়েটি অবশ্য এইসব বিপদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে একেবারে অনবহিত নয়, কারণ সম্ভবত সেই সম্ভাবনা এড়াবার জন্যই সে একেবারে জলের কিনারা দিয়ে যাচ্ছিল, উঁচু পাড়ের আড়ালে আড়ালে। এবং তৎসত্ত্বেও ঘন ঘন ওপরের রাস্তাটার দিকে, বিশেষত নদীর অপর পাড়ে, সভয়ে তাকাচ্ছিল। তবে বর্ষার জন্যই হোক্ আর এই দুর্দান্ত উত্তুরে বাতাসের জন্যই হোক্—এদিকটা আপাতত একেবারেই জনবিরল। ক্বচিৎ দু'একটা কুকুর এবং খরগোশ ভিন্ন অপর কোন প্রাণীও তার নজরে পড়ল না।

কৈসারবাগের কাছাকাছি এসে মেয়েটি কিন্তু এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। নিজের কাঁকলির মধ্য থেকে একটি পুরোনো আমের আঁটি বার করলে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা যেভাবে আমের আঁটিকে ভেঁপুতে রূপান্তরিত করে—কতকটা সেই রকমই সেটার চেহারা। মেয়েটি এদিক

ওদিক আরও বারকয়েক ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে একটা কাশঝোপের আড়ালে সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন ক'রে অকস্মাৎ সেই আম-আঁটির ভেঁপুতে চারটে ফুঁ দিলে, পর পর—দ্রুত। দুবার খুব টানা, একবার সামান্য একটু, আবার একটা টানা—অর্থাৎ রীতিমত কোন সঙ্কেত।

শব্দটা ক'রেই যতটা সম্ভব একটা কাশঝোপের মধ্যে মাথা লুকিয়ে মেয়েটি দুরু দুরু বক্ষে কারো অপেক্ষা করতে লাগল।

বাঁশীতে সঙ্কেত জানাবার সময় মেয়েটি দুদিকের নদীতীর যতটা জনহীন ভেবেছিল ততটা কিন্তু সত্যিই নয়। সে ডাক, যাকে ডাকা হয়েছিল সে ছাড়াও, আরও কয়েকজনের কানে পৌঁছল। তার মধ্যে দুজন সম্পূর্ণ বিদেশী ও বিজাতীয়—কর্পোরাল বিল মিচেল আর সার্জেণ্ট জন প্যাটন।

ক্যাভানাঘ নামে একজন ইউরোপীয় কেরানী এবং কনৌজীলাল মিশির নামে আর একটি হিন্দু সিপাহী মাত্র দুদিন আগেই রেসিডেন্সী থেকে বেরিয়ে বিচিত্র ও বিপজ্জনক পথে স্যার কলিনের শিবিরে এসে পৌঁছেছে। তাদের কাছে পাওয়া গেছে লক্ষ্ণৌ প্রবেশের নিরাপদ পথের সন্ধান আর তার সঙ্গে শত্রু-শিবিরের অনেক রহস্য। তার ফলে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে, সকলেই এই দুটি লোককে দেখতে উৎসুক, সবাই এদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

সেই প্রশংসা শিবিরের বহু তরুণের প্রাণেই নতুন নেশা ধরিয়েছে। সকলেই নতুন-কিছু করবার জন্য, জাতির এবং মহারাণীর কোন কাজে লাগার জন্য উৎসুক। জীবন বিপন্ন ক'রে জীবনের মূল্য বাড়াতে চায় সকলেই। এমন একটা কিছু করতে চায়—যাতে ভিক্টোরিয়া ক্রশ যদি না-ও জোটে তো অন্তত সেনাপতি ও সহকর্মীদের প্রশংসা ও ঈর্ষা লাভ করতে পারে!

সেই নেশাই আজ এই দুটি তরুণকে এই বিপদ ও শত্রুসঙ্কুল এলাকায় টেনে এনেছে। তারা বিশ্রামের দুর্লভ অবসর উপেক্ষা ক'রে সকলের অগোচরে বেরিয়ে পড়েছে—নতুন কোন খবর তাদের সেনাপতির জন্য সংগ্রহ করতে পারে কিনা, নতুন কোন পথের সন্ধান দিতে পারে কিনা এই আশায়। একটা কিছু করতেই হবে—সাধারণ আর পাঁচজনের থেকে পৃথক কিছু, অসাধারণ কিছু!

পথে বেরিয়ে পড়েছে ঝোঁকের মাথায়, কিন্তু তাই ব'লে পথের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন নয় ওরা—এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। অথবা বিপদ তুচ্ছ করেছে ব'লে প্রাণটাও তুচ্ছ করবে—এত নির্বোধ ওরা নয়। ওরাও অতি সাবধানে এবং সন্তর্পণে চলছিল, এবং সকলের দৃষ্টি এড়াবার জন্য নদীতীর ধরে—জলের কিনারা দিয়েই চলছিল। নিজেদের আশেপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে রাখতে কাশঝোপ ও অসমান পাড়ের আড়ালে আড়ালে চলছিল বলে ওরা ওদের অগ্রবর্তিনীকে লক্ষ্য করেনি এতক্ষণ, এখন অকস্মাৎ অনতিদূরে ভেঁপুর এই সুনিশ্চিত সঙ্কেতে চমকে উঠে সভয়ে একটা বড় কাশঝোপের আড়ালে বসে পড়ল দুজনেই। ভয়ে দুজনেরই মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে—সেই কনকনে শীতেও কপালে ঘামের বিন্দু দেখা দিয়েছে।

সঙ্কেত—তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু কিসের।

তবে কি ওদেরই উপস্থিতি কেউ টের পেয়েছে এবং অপরকে জানিয়ে দিচ্ছে?

মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়ালে কেমন মনোভাব হয়—মুহূর্তে যেন তার আস্বাদ পায় এই দুটি স্কচ্ যুবক।

প্যাটন পিস্তলটা আরও জোরে মুঠো ক'রে ধরে অস্ফুটকণ্ঠে একটা গালাগালি দিয়ে ওঠে—

সঙ্গে সঙ্গে বিল মিচেল তার মুখের ওপর নিজের বাঁ হাতটা চেপে ধরে।

স্তব্ধ শান্ত আবহাওয়ায় সামান্য শব্দও বহুদূর যায়।

প্রথম ভয়ের মুহূর্ত ক-টা কেটে যেতে আবার নিঃশ্বাস সহজ হয়ে এল। এইবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দুজনেই চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, যতদূর সম্ভব সন্তর্পণে। বেশী ক'রে ঘাড় ঘুরোতেও যেন ভরসা হয় না, পাছে সামান্য একটু শব্দও হয়—কিংবা ওদের অবস্থিতি কারুর চোখে পড়ে।

ঝাপ্‌সা মেঘমেদুর অপরাহ্ন। পাত্‌লা কুয়াশার একটা আস্তরণ এরই মধ্যে নেমে এসেছে গোমতীর জলে। বেশী দূর সেই অস্পষ্ট আলোতে নজরও চলে না—তবু চোখ অভ্যস্ত হতে দুজনেই প্রায় একসঙ্গে দেখতে পেলে এবং বিস্ময়ে দুজনেই সামান্য একটা শব্দ ক'রে উঠল। নিজেরা সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সতর্ক হবার আগেই শব্দটা বেরিয়ে গেল গলা দিয়ে।

তাদের ঝোপটা থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরেই আর একটা ঝোপের আড়ালে, প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে তাদেরই মত আত্মগোপন ক'রে রয়েছে আর একটি প্রাণী। মেয়েছেলে একটি—এবং সম্ভবত তরুণী!

'বাই জোভ্!' প্যাটন ব'লে উঠল—প্রায় নিঃশ্বাসের সঙ্গে গলা মিশিয়ে।

'ও গড!' বলে উঠল বিল, 'এ গ্যাল্!'

মেয়েটি সে শব্দ শুনতে পেলে না। সে এদিকে ফেরেও নি। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে ছিল তার সামনের দিকে—অর্থাৎ সেই দিক থেকে কাউকে আশা করছে সে।

আরও একবার একটা আশঙ্কার হাওয়া যেন ওদের মনের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। মেয়েটা ভারতীয়, সুতরাং ওদের শত্রু—সে-ই ওদের উপস্থিতি জানতে পেরে সংকেতে জানিয়ে দিলে না তো কাউকে? এবং পাছে ওরা সেটা সন্দেহ করে—তাই কিছুতে এদিকে তাকাচ্ছে না?

শুকনো আড়ষ্ট জিভটা তার আরও শুষ্ক ঠোঁট দুটোর ওপর বুলিয়ে নিল একবার।

কিন্তু বেশিক্ষণ তাদের এ সংশয়ের মধ্যে থাকতে হ'ল না। আরও একটু দূর সামনে থেকে অস্পষ্ট একটা আহ্বান কানে এল—'গঙ্গু?'

চাপা গলায়—প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে মেয়েটা উত্তর দিলে, 'মোহন ভাইয়া?'

ওদেরই মত ভীত ও সন্ত্রস্ত ভাবে, দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এল একটি কুড়ি বাইশ বছরের ছোকরা। সিপাহী নয়, সাধারণ নাগরিকের বেশ ওর পরনে—ধুতি ও কুর্তা। পায়ে জুতো নেই, সম্ভবত শব্দ হবার ভয়েই তা ছেড়ে এসেছে কোথাও। তবে জুতো পরবার

অভ্যাস আছে তা বোঝা যায়—কারণ এই সামান্য জায়গাটুকু আসতে আসতেই দুবার হেঁট হয়ে পা থেকে কাঁটা না কাঁকর কী ছাড়ালে ছোক্‌রা।

মোহন কাছে আসতেই গঙ্গু সব সতর্কতা ভুলে উঠে দাঁড়াল। সাগ্রহে এগিয়েও গেল খানিকটা। মোহনও এবার বেশ একটু নিশ্চিন্ত ভাবেই চলে এল বাকী পথটা, তারপর দুজনে দাঁড়িয়ে দ্রুত অথচ নিম্নকণ্ঠে কথা কইতে লাগল।

কী কথা তা শোনা গেল না এতদূর থেকে, মৃদু গুঞ্জনের বেশী শব্দ উঠছিল না। শুধু ওদের দ্রুত ঠোঁট নাড়ার ভঙ্গী দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, কথাটা দুজনেই একটু তাড়াতাড়ি সারতে চাইছে। ওরা যে খুব নিরাপদ নয় সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোন কারণ কাছাকাছি না থাকলেও দুজনেই খুব সচেতন। কারণ দুজনেই সভয়ে বার বার চারদিকে তাকাচ্ছিল।

মোহন কথা কইতে কইতেই কুর্তার সামনের দিকটা একটু তুলে কোমরে জড়ানো কোঁচার খাঁজ থেকে একটা কি বার করল। বস্তুটা গঙ্গুর প্রসারিত হাতে পড়তে বোঝা গেল—কয়েকটা টাকা। খুব কম নয়, অন্তত পনেরোটা টাকা তো বটেই।

টাকাটা নিয়ে গঙ্গু তার শাড়ির আঁচলে বাঁধতে যাবে—এমন সময় এক অঘটন ঘটল। এবং সে ঘটনায় শুধু ঐ দুটি তরুণ-তরুণীই নয়—এরা দুজনও রীতিমত চমকে উঠল।

ঘটনাটা যেমন অভাবনীয়, তেমনি অকল্পিত।

বোঝা গেল যে এরা ছাড়াও তৃতীয় পক্ষ আর একজন কাছেই ছিল।

ওপরের উঁচু রাস্তা থেকে, ঢালু পাড় বেয়ে মোহন ও গঙ্গুর ওপর প্রায় লাফ দিয়ে পড়ল আর একটি স্কচ্ সৈনিক। প্যাটন ও বিল দেখামাত্র চিনতে পারলে—দুজনেই প্রায় একসঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে ব'লে উঠল—'স্মিথ!'

বোঝা গেল যে ওদের মতই স্মিথও বেরিয়ে পড়েছে—একই উচ্চাশার তাড়নায়। সে সম্ভবত সাহস ক'রে ওপরের রাস্তা ধরেই এসেছে—এবং গঙ্গুর ভেঁপুর আওয়াজ না পেলে নদীর কিনারায় নামবার কথা তার মনেই হ'ত না। সে ঐ শব্দ পেয়েই হয়ত এতক্ষণ ওপরের কোন গাছের আড়াল থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে, এখন সুযোগ পেয়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই দুটি ভয়ার্ত নরনারীর ওপর।

স্মিথের গলা দিয়ে এমন একটা চাপা অথচ হিংস্র উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে এসেছিল যে তাইতেই এরা দুজন ভয়ে কাট হয়ে গেল। আতঙ্কে পাণ্ডুর হয়ে উঠল এদের মুখ। পালাবার চেষ্টাও করতে পারলে না—সাপের উদ্যত ফণার দিকে চেয়ে মানুষ যেমন অনড়, জড় হয়ে যায়, মৃত্যু আসন্ন বুঝেও নড়তে পারে না—তেমনি ভাবেই এরা দুজন এই আকস্মিক ভয়ঙ্কর আবির্ভাবের দিকে চেয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

অবশ্য সে সময়টাও কয়েকটি নিমেষকালের বেশী নয়।

স্মিথ পিস্তলের ওপর ভরসা ক'রে বেরোয়নি—রীতিমত রাইফ্‌ল্ নিয়েই বেরিয়েছে এবং সেটা হাতেই ধরা ছিল। বিদ্যুৎগতিতে নেমে এসে সোজা বেয়নেটটা মোহনের বুকে লাগিয়ে ধরে আর একবার তেমনি চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠল। নির্জন নিস্তব্ধ নদীপ্রান্তরে সে শব্দটা এমনই পৈশাচিক ব'লে মনে হ'ল যে গঙ্গু একেবারে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে

স্মিথ আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বন্দুকটা শুধু বাঁ-হাতে বদলে নিয়ে ডান হাতে গঙ্গুর একখানা হাত একেবারে মুচ্‌কে ধরে উগ্রকণ্ঠে ব'লে উঠল, 'চুপ রহো কুত্তি—চুপ! নেহি তো—'

গঙ্গু যন্ত্রণায় একটা অব্যক্ত আর্তনাদ ক'রে উঠল বটে—কিন্তু সম্ভবত ভয়েই—তার কান্না থেমে গেল।

জন আর বিল দুজনেরই বিস্ময়ের প্রথম বিহ্বলতা ততক্ষণে কেটে গেছে। এবার তারা এক লাফে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

'এনাফ্‌ স্মিথ, ছেড়ে দাও!' বিল স্মিথের হাতটায় মৃদু টান দিয়ে বলল।

'ছেড়ে দেব! ইস, বড় যে সোহাগ দেখছি!' কণ্ঠে কটু বিদ্রূপের সুর স্মিথের—'এ বদমাসটা নিশ্চয়ই সিপাহীদের লোক—আর মেয়েটা গুপ্তচর। মেয়েটার কাছ থেকে টাকা দিয়ে খবর সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে লোকটা।... এদের ছাড়ব? আগে কি খবর জানব, তারপর লোকটাকে বেয়নেট করব মেয়েটার সামনে—'

এদের আকস্মিক আবির্ভাবে প্রথমটা মোহন আর গঙ্গু দুজনেই ভেবেছিল—এরাও স্মিথের দলের লোক। যমদূতের সহচর যমদূত! একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর! ভেবে জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিল, কিন্তু এখন ইংরেজী কথার অর্থ না বুঝলেও মিচেলের হাতে ভঙ্গীতে এবং কণ্ঠস্বরে সহানুভূতির আভাস পেতে দেরী হ'ল না। গঙ্গু এক হাতেই মিচেলের একটা হাত জড়িয়ে ধরল, 'বাঁচান, বাঁচান মালিক—এবারের মত ছেড়ে দিন!'

হু-হু ক'রে কাঁদতে লাগল সে। বুকফাটা কান্না।

জন প্যাটন এগিয়ে এসে একটু যেন জোর ক'রেই স্মিথের বন্দুকসুদ্ধ হাতটা নামিয়ে দিয়ে বললে, 'আচ্ছা শোনাই যাক্‌ না এদের কি বলবার আছে। ওরা নিরস্ত্র, এখানে আমরা তিনজন হাতিয়ারসুদ্ধ লোক—পালাবে কোথায়?'

স্মিথ ক্রুদ্ধভাবে একটা চাপা গর্জন ক'রে বলল, 'দ্যাখো, তোমরা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। এটা তোমাদের সম্পূর্ণ অকারণ নাক-গলানো, অনধিকার-চর্চা।... এরা আমার ভাগে, আমিই এদের সঙ্গে বোঝাপড়া করব, তোমরা তোমাদের পথে যাও—'

বিল মিচেল ততক্ষণে গঙ্গুর হাতখানা স্মিথের থাবা থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। বেচারীর সুগৌর কোমল হাতে নীলাভ কালশিরা পড়ে গেছে ঐটুকুর মধ্যেই। রক্ত জমে ফুলেও উঠেছে খানিকটা।

স্মিথ প্যাটনকে ছেড়ে মিচেলের দিকে ফিরল, অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর-কণ্ঠে বললে—'তার মানে? এর মানে কি?'

অবিচলিত ভাবে মিচেল বলল, 'পথের মাঝে অসহায় মেয়েদের ওপর অত্যাচার করবার জন্যে আমরা হাতিয়ার ধরিনি স্মিথ—অত্যাচার থেকে বাঁচাতেই ধরেছি!'

'উঃ, বড্ড যে দরদ দেখছি!... দিব্যি মাল—অ্যাঁ? তা বাপু আমরাও ভোগ করতে জানি!' স্মিথের মুখখানা খেঁকি কুকুরের মত বিকৃত হয়ে উঠল।

'না, আমাদের রুচিটা ঠিক অত নিচে নামেনি সার্জেন্ট স্মিথ। আমাদের প্রয়োজনও এত জরুরী নয়।'

'তবে কি নিছক দয়া?... বলি, এরা আমাদের মেয়েছেলেদের ওপর এতটা দয়া করেছিল কি কানপুরে?'

'তুমি কি আমাদেরও ঐ ওদেরই স্তরে নেমে আসতে বলো? বাগে পেয়ে যদি আমরাও ওদের মত পাশবিক আচরণ করি তো ওদের দোষ দেব কোন্ অধিকারে?... এনাফ্—যথেষ্ট হয়েছে!'

মিচেল আর বাদানুবাদের অবসর না দিয়েই গঙ্গুর দিকে ফিরে উগ্রকণ্ঠে বললে, 'তোমরা এখানে কী করছিলে? এর কাছ থেকে টাকা নিচ্ছিলে কেন? তোমরা থাকো কোথায়?'

মিচেল ক-মাসের মধ্যেই মোটামুটি উর্দু আর হিন্দী রপ্ত করে নিয়েছিল।

গঙ্গু এবার একেবারে মিচেলের পায়ের কাছে বসে পড়ে ওর দুই পা জড়িয়ে ধরল, 'সাহেব, তুমি আমার মা-বাপ, তোমার কাছে মিছে কথা বলব না। এ আমার ভগ্নিপতি, শহরেই থাকতুম আমরা, হাঙ্গামার ভয়ে দেহাতে গিয়ে আছি, এদের বাড়িতেই। আমার বোনের খুব অসুখ, খেতি-উতির কাজ তো বন্ধ, গেঁহু বাজরা কিছুই বিক্রী হচ্ছে না, মাল বার করারই উপায় নেই। তার ওপর, যা ছিল গত মাসে সিপাইরা জোর ক'রে নিয়ে গেছে, দামও দেয়নি। টাকা না পেলে চলবে না। তাই অনেক কষ্ট ক'রে ভয়ে ভয়ে এখানে আসি—এই মোহন ভাইয়া কিছু কিছু টাকা জোগাড় ক'রে দেয়। হপ্তায় এই মঙ্গলবার ঠিক করা আছে, এইখানে এসে আমি ইশারা করি। সব দিন মোহন ভাইয়া আসতে পারে না, এত কষ্ট ক'রে আসা—তাও ফিরে যেতে হয়। আবার সাত দিন পরে। গত হপ্তায় ফিরে গেছি—ঘরে কিছু নেই, আজ দেখা না পেলে সাত দিন উপোস করতে হ'ত।'

'তোমাদের আর কেউ নেই?' মিচেলই প্রশ্ন করে। প্যাটন হিন্দী বোঝে, কিন্তু ভাল বলতে পারে না।

'আমার ভেইয়া ছিল। সে ফৌজেই কাজ করত, আজ তিন মাস তার কোন পাত্তা নেই। বোধ হয় মরেই গেছে—'

আবারও হু-হু ক'রে কেঁদে ওঠে গঙ্গু।

'তুমি কি করো?' মিচেল মোহনকে প্রশ্ন করে এবার, 'তুমিও কি সিপাই?'

'আমার একটা ছোট্ট দোকান ছিল হুজুর। চার মাস আগে লুঠ হয়ে যায়। বেকার বসেছিলাম, সিপাইরা জোর ক'রে ধরে নিয়ে গেছে। ওদের বাজার করা, রসুই করা—এই সব করিয়ে নেয়। এক কথায় ওদের নোক্‌রী করি।'

'মাইনে দেয়?'

'কে দেবে সাহেব? ওদের আছে কি? বেগমের তহ্‌বিলে আর এক পয়সাও নেই।'

'তবে এ টাকা কোথা থেকে পেলে?'

'ওরা লুঠতরাজ ক'রে আনে। আমি ওদের টাকা চুরি করি। বাজার করতে দেয়, তা থেকে সরিয়ে রাখি এক আধ টাকা। নইলে বাঁচব কেমন করে সাহেব? মা আছে, জরু আছে, এরা আছে—এদের দেব কি?'

'তুমি ঠিক বলছ? সচ্?'

'ভগবানের কশম বাবুজী, গঙ্গামায়ীর কশম। যদি মিছে বলি তো জিভ্ আমার খসে যাবে।'

'তারপর? তোমাকে যদি ছেড়ে দিই তো এখনই গিয়ে সিপাহীদের খবর দেবে তো? আমাদের ধরিয়ে দিলে তোমাদের বেগম আর মৌলবী অনেক টাকা ইনাম দেবে!'

'সে টাকা ছোঁবার আগে এই গোমতীতে ডুবে মরতে পারব সাহেব—সে টাকা আমার গোমাংস।'

মিচেল ফিরে দাঁড়িয়ে প্যাটনকে ইংরেজীতে প্রশ্ন করল, 'ওদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে সত্যি কথাই বলছে। কী বলো সার্জেণ্ট প্যাটন?'

'কখনও না—' সার্জেণ্ট স্মিথ আবারও চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠল। অনেকক্ষণের নিরুদ্ধ বহ্নি ওর দৃষ্টি ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইল যেন। বললে, 'এরা সবাই মিথ্যেবাদী—মিথ্যেবাদীর জাত। এই নেটিভদের মত মিথ্যেবাদী পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। এদের ছেড়ে দেওয়া চলতেই পারে না। আগে ঐ ছোঁড়াটাকে মারব—তারপর ঐ মেয়েটাকে দেখব!'

'ছিঃ স্মিথ! আমরা হাইল্যাণ্ডার যুদ্ধ ব্যবসায়ী, কসাই নই! তাছাড়া এরা কেউই সিপাই নয়—সিপাইরা আমাদের শত্রু!'

'কি ক'রে জানলে সিপাই নয়? ও যে আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যেই পোশাক খুলে রেখে আসেনি তার প্রমাণ কি?... তাছাড়া ভারতীয় মাত্রেই এখন আমাদের শত্রু। আর অত কথারই বা কি আছে! আমি ওদের প্রথম ধরেছি, আমারই অধিকার—আমি ছাড়ব না!'

ঘাড় গোঁজ ক'রে বলে স্মিথ।

বিল মিচেলের নীল চোখে অদ্ভুত একটা ঔজ্জ্বল্য দেখা দেয়। সে দীপ্তি—তার পাশে দাঁড়িয়ে যারা লড়াই করেছে—তারা অনেকবার দেখেছে। যারা জানে তাকে, তারা এটাও জানে, এ চাহনি পৃথিবীর কাউকেই, কিছুকেই পরোয়া করে না।

সে সোজা মোহন আর গঙ্গুর দিকে ফিরে বলল, 'যাও তোমরা—পালাও। এবারের মত ছেড়ে দিলাম। আশা করছি আজ যে দয়া পেলে—এ দয়া তোমরা অপরকেও দেখাবে!'

'কখনও না! স্টপ্!' বাঘের মত লাফিয়ে ওঠে স্মিথ। বোধহয় মুহূর্তের মধ্যেই বেয়নেটটা বসিয়ে দিত মোহনের পাঁজরে, কিন্তু সে বন্দুক তোলার আগেই—চোখের পলক পড়তে না পড়তে বিল মিচেল আর জন প্যাটন দুদিক থেকে পিস্তলের নল দুটো ওর বুকে এবং পিঠে চেপে ধরলে। বিল মিচেল এবার রীতিমত উগ্র কণ্ঠেই বললে, 'হাত নামাও সার্জেণ্ট স্মিথ! আমি এদের প্রাণ দিয়েছি, আমার সামনে তা তুমি নিতে পারবে না!'

স্মিথ আবারও তেমনি খেঁকি কুকুরের মত মুখ ক'রে বলল, 'আমি কিন্তু ওপরওলাদের কাছে রিপোর্ট করব কর্পোরাল ফরবেস মিচেল!'

'স্বচ্ছন্দে। আমি সুখীই হবো তাহ'লে। নইলে আমার হয়ত তাঁদের কাছে জানাতে সঙ্কোচ হ'ত—তোমার আচরণের কথা..'

ততক্ষণে—ব্যাপারটা চোখের নিমেষে অনুমান ক'রে নিয়ে মোহন এবং গঙ্গু ছুটতে শুরু

করেছে। কে জানে মত বদলাতে কতক্ষণ? অথবা যদি ঐ যমদূতটাই জিতে যায় শেষ পর্যন্ত?

ছুট ছুট! খানাখন্দ ডিঙিয়ে, মাটিপাথরে আছাড় খেয়ে, কুশ ও কাশঝোপের আড়ালে আড়ালে ওরা দেখতে দেখতে চোখের বাইরে চলে গেল। গঙ্গুর পা কেটে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল, কাঁটাঝোপে ওড়না গেল ছিঁড়ে, সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। পা থেকে কাঁটা ছাড়াবার জন্যও দাঁড়াল না ওরা। একটা দুর্নিবার আতঙ্ক— প্রবল একটা প্রাণের ভয় বহুক্ষণ অবধি ওদের অকারণেই ছুটিয়ে নিয়ে চলল। শত্রুরা ওদের চোখের আড়ালে চলে গেছে কিনা—তা দেখবার জন্যও একবার থামল না ওরা। অনেক, অনেকক্ষণ পরে থামল দুজন। গোমতী ওদের অনেক পিছনে পড়ে— বহুদূর পিছনে সিকান্দার বাগ, কদম-রসুল ছত্তরমঞ্জিল! লোকালয় থেকেও দূরে চলে এসেছে। সামনে অবারিত চাষের মাঠ, দূর দিগন্তে ছায়ার মত গ্রামের চিহ্ন। সুনিবিড় শান্তির ও আশ্বাসের স্বপ্ন সেখানে—সেখানে সুপ্তি আর বিশ্রাম।

দুজনেই এবার ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ল। এতক্ষণ যে আতঙ্ক ওদের ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল সে আতঙ্ক দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শক্তিও যেন নিঃশেষ হয়ে গেল—ধপ্ ক'রে মাটিতে বসে পড়ল ওরা। এবং কিছুক্ষণ দুজনের কারুরই কথা কইবার শক্তি রইল না, চোখ বুজে হাঁ ক'রে নিঃশ্বাস নিতে লাগল শুধু।

বহুক্ষণ পরে মোহনই কথা কইল, বলল, 'গঙ্গু বহন, এবার আমি যাই? এতক্ষণ ছাউনির বাইরে আছি, হৈ-চৈ পড়ে গেছে হয়ত!'

'যাও ভাইয়া। কিন্তু—'

কেমন এক রকম উৎসুক মুখ ক'রে তাকায় গঙ্গু।

'কিন্তু কি? বলো—?'

'না—বলছিলুম ঐ যমদূতটা ওদের কোন অনিষ্ট করবে না তো? বিশেষত ঐ যে ঢ্যাঙ্গা ছেলেমানুষ ছেলেটি, যে হিন্দুস্থানীতে কথা কইছিল—ওর ওপর বড্ড রাগ লোকটার। তুমি, তুমি একটু নজর রাখবে ভাইয়া?'

মোহন হাসল। বলল, 'খুবসুরৎ জোয়ান সাহেব—বড্ড মায়া পড়ে গেছে, না বহন?'

'যাও! প্রাণ দিলে আমাদের, সে কৃতজ্ঞতা নেই? ওর জন্যেই বেঁচে চলে আসতে পেরেছ। আর আমার প্রাণের চেয়েও বেশী—ইজ্জৎই চলে যেত হয়ত!'

'তা ঠিক।' নিমেষে গম্ভীর হয়ে ওঠে মোহন, 'আমি এমনি তামাসা করছিলুম। কিন্তু বোন—আমরা ওদের দুশমন, খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। খবর নিতে গেলে কাছাকাছি যেতে হয়—আর কাছাকাছি গেলে—বুঝতেই পারছ! সবাই তোমার এই সাহেবের মত নয়। ওদের কোন কাজে আসবার আগেই আমার কম্ম যাবে নিকেশ হয়ে—!'

সেই সুদূরতম সম্ভাবনার ইঙ্গিতেই শিউরে ওঠে গঙ্গু, মোহনের একটা হাত ধরে ফেলে বলে, 'না না—তাহ'লে কাজ নেই। কিন্তু যদি তেমন কোন সুযোগ আসে, ওদের কোন উপকারে লাগতে পারো—তাহ'লে তো—'

'নিশ্চয়। আমি কি মানুষ নই?'

ক্লান্ত শিথিল পা টেনে টেনে তোলে গঙ্গু, বলে, 'যাই এবার। এখনও কম ক'রেও তিন কোশ রাস্তা হাঁটতে হবে। কখন পৌঁছব কে জানে! আরও খানিকটা উজিয়ে এসে পড়লাম তো! পথ বেড়ে গেল।... ওরা হয়ত এখনই ভাবছে!'

'যেতে পারবে তো? পথ চিনতে পারবে? না সঙ্গে যাব একটু?'

'না না। তাহ'লে আর তোমার নোক্‌রি থাকবে না। সে না থাকলেও ক্ষতি নেই—কিন্তু হয়ত দুশমন মনে ক'রে ধরে এনে ফাঁসি দেবে। তুমি যাও, আমি যখন হোক পৌঁছব।'

দুজনে দুদিকের পথ ধরল। গঙ্গুর দেহ টলছে তখনও শ্রান্তিতে। তবু যেতেই হবে।

১৬ই নভেম্বর ১৮৫৭। বিল মিচেলের জীবনে স্মরণীয় দিন বৈকি।

পর পর দুটো দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে কেটেছে। আগের দিন সেকেন্দার বাগের যুদ্ধে প্রায় তিন হাজার সিপাহী প্রাণ হারিয়েছে বটে—ইংরেজ পক্ষেরও খুব কম ক্ষতি হয়নি! তাছাড়া ক-দিন বেচারীদের কাপড়-জামা বদলানো তো দূরের কথা—একটু মুখে-হাতে জল দেবারই অবসর হয়নি। কিন্তু তবু স্যার কলিন বিশ্রাম নিলেন না—নিতে দিলেনও না। ষোল তারিখ ভোরেই শাহ্‌নজফ্ আক্রমণ করলেন। শাহ্‌নজফ্ কেল্লা নয়, ছাউনি তো নয়ই। অযোধ্যার দ্বিতীয় নবাবের সমাধি। কিন্তু আপাতত এই সমাধি ও পাশের কদম-রসুল মসজিদ—দুই-ই সিপাহীদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। বিশেষ ক'রে সিকান্দার বাগের পতনের পর সেদিন রাত্রে এইখানেই তারা সমস্ত শক্তি সংহত করেছে।

শাহ্‌নজফ্ দখল করা যতটা শক্ত হবে ভেবেছিলেন স্যার কলিন, কার্যত দেখা গেল তার চেয়ে ঢের বেশি শক্ত। আশপাশের আরও বহু ইমারৎ শত্রুদের দখলে। সেখানে তারা অনেকটা নিরাপদ দেওয়ালের আড়ালে। তারা বাইরের মাঠে শত্রুদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কিন্তু এরা দেখতে পাচ্ছে না। তারা শুধু কামান বন্দুক নয়—তীরধনুকও চালাচ্ছে, তার সঙ্গে আছে জ্বলন্ত মশাল। ছেঁড়া ন্যাকড়ায় তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে তীরের ফলকে জড়িয়ে ছুঁড়ছে। সেসব বাড়ির পাঁচিল বেয়ে উঠতে গেলে গরম ফুটন্ত তেল ঢেলে দিচ্ছে। এক কথায় তাদের জোর বেশী। শুধু তীরধনুকেই কত লোক মারা গেলে তার ইয়ত্তা নেই। এরা তো অবাক! ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কেউ তীরধনুক নিয়ে লড়াই করে, তা এদের জানা ছিল না। ফলে বারবার এরা প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করছে—কিন্তু বারবারই পিছিয়ে আসতে হচ্ছে। বহু সৈন্য মরছে, বহু অভিজ্ঞ সেনানায়কও। চিন্তায় স্যার কলিনের ললাটে গভীর রেখা ফুটে উঠেছে। বার বার তিনি রুমাল বার ক'রে ললাটের ঘাম মুছছেন এবং উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত ভাবে তাকাচ্ছেন চারিদিকে।

সার্জেন্ট জন প্যাটনের নানা কারণে মন খারাপ। আজই ভোরে প্রাতঃরাশ খাবার সময় তার গ্রামের একটি ছেলে হঠাৎ বলে বসল, 'কে জানে—এই খাওয়াই হয়ত আমাদের অনেকের শেষ খাওয়া!... যদি আমার কিছু হয় তো—সার্জেন্ট, দয়া ক'রে আমার মাকে একটা খবর দিও!'

তখন অতটা গুরুত্ব তারা কেউই দেয়নি ছোকরার কথায়। কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে, প্যাটনেরই চোখের সামনে একটা গোলা এসে ফাট্‌ল ছেলেটির ঠিক পাশেই। খানিকটা জ্বলন্ত লোহার টুকরো লেগে পেট ফেটে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ল। একটা কথা কইবারও অবকাশ পেলে না ছেলেটা। মোটে আঠারো বছর বয়স, মায়ের এক ছেলে—কী বলবে ওর মাকে, কি করে খবর দেবে সে?

তারপর, ওর গাঁয়ের আর একটি ছেলের একটা পা গেল উড়ে। বেচারীর সেই কাটা উরু দিয়ে জলপ্রপাতের মত রক্ত পড়তে লাগল। ছেলেটা আর্তনাদ করলে না, অনুযোগ করলে না—সেইখানে বসে পড়ে ম্লান হেসে শুধু বললে, 'ভাই সব—মনে রেখো কানপুর! এগিয়ে যাও।' তারপরই, কোন লোক এগিয়ে এসে ওর ক্ষতস্থান বেঁধে দেবার বা কোনরকম সাহায্য করার আগেই তার প্রাণহীন দেহটা এলিয়ে পড়ল ওদের চোখের সামনে।... প্যাটনের সেদিকে মন দেবার অবসর ছিল না, এগিয়ে যেতে যেতে শুধু একবার ফিরে দেখলে—তখনও ম্লান হাসিটুকু তার মুখে লেগে রয়েছে, মৃত্যু এতটুকুও মুছে দিতে পারেনি সে হাসির।

কিন্তু এতেই শেষ নয়—ওর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু একজন—এইমাত্র—সুদ্ধ নিজের নির্বুদ্ধিতায় প্রাণ হারাল! ওরা একটা ভাঙ্গা পাঁচিলের আড়াল থেকে যুদ্ধ করছিল—একটু আগেই ড্যান হোয়াইট্, শত্রুরা কতদূরে আছে জানবার জন্যে, বেয়োনেটের ডগায় নিজের টুপিটা চড়িয়ে উঁচু ক'রে ধরেছিল—সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক তীর—অন্তত আটটা নটা হবে—এসে বিঁধল ওদের টুপিতে। অস্ফুটকণ্ঠে একটা গালাগালি দিয়ে ড্যান বন্দুকটা নামিয়ে নিলে। এ দেখেও ওর বন্ধু পেনী—ঠিক কোথা থেকে ওরা তীর ছুঁড়েছে দেখবার জন্য কৌতূহলে গলাটি বাড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেল—ব্যস, ব্যাপারটা কি বোঝবার আগেই একটা তীর পেনীর মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে হাতকতক দূরে গিয়ে পড়ল।

একটার পর একটা! প্যাটনের মন একটা প্রতিকারহীন ক্ষোভে এবং ব্যর্থ উষ্মায় ভরে যায়! যুদ্ধ করতে এসেছে ঠিকই, আর মৃত্যু তো যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল, বরং বলা চলে নিত্য-সহচর—কিন্তু তাই বলে এই অকারণ প্রাণক্ষয়! তাজা সুস্থসবল ছেলেগুলো—বংশের আশাভরসা—এমন ভাবে প্রাণ হারাবে!... এই অকারণ প্রাণক্ষয়ের প্রতিবাদ করতেই তো সেদিন হাতে পেয়েও তারা ছেড়ে দিলে সেই নেটিভটাকে।... না, শয়তানের ঝাড় সব! স্মিথের কথাই ঠিক, অমন ক'রে দয়া দেখানো ঠিক হয়নি ওদের!

সে একসময় মরীয়া হয়ে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার হোপকে বললে, 'দেখুন কিছু কিছু ক'রে তো মরছিই আমরা, তার চেয়ে চলুন সবাই একসঙ্গে ওদের পাঁচিল ভাঙবার চেষ্টা করি। কত আর মরবে? মরতে মরতেও যে কজন থাকবে—কাজ ফতে করতে পারবে! আপনি হুকুম দিন।'

হোপ বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি। আর দেরি করা উচিত নয়। এতে শুধু অকারণ বলক্ষয়।... দেখি স্যার কলিনকে একবার জিজ্ঞাসা করি—'

ব্রিগেডিয়ার হোপ চলে গেলেন স্যার কলিনের খোঁজে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে এক

অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। প্যাটন হোপের সঙ্গে দেখা করবে ব'লে খুঁজতে খুঁজতে বহু পিছনে এসে পড়েছিল—গুলি ও তীরের সীমানার বাইরে এসে পড়েছে ভেবেই সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে প্রকাশ্য জায়গায় ঘোরাঘুরি করছিল। অকস্মাৎ অত দূরেই—একটি তীর এসে পৌঁছল। কিন্তু প্যাটনের গায়ে নয়—তীরটা ওর পায়ের কাছে মাটিতে এসে বিঁধল। ইচ্ছা ক'রে তীরের মুখ নিচু ক'রে না ছুঁড়লে এভাবে এসে বেঁধে না। এতদূরে যার তীর আসে সে শক্তিমান এবং কুশলী তীরন্দাজ। এমন হাত নিচু ক'রে সে ছুঁড়বে না—যাতে এতটা হিসেবের ভুল হয়ে তীর মাটিতে এসে বেঁধে!

কৌতূহলী হয়ে প্যাটন তীরটা মাটি থেকে টেনে তুলল।

তীরের গায়ে খুব পাতলা একটি কাগজ জড়ানো—সূক্ষ্ম সুতো দিয়ে বাঁধা।

কৌতূহল প্রবলতর হয়ে ওঠে। ব্যগ্র আগ্রহে কাগজটা খোলে প্যাটন। একটা পাতলা কাগজে আনাড়ী হাতে একটা নক্সা আঁকা—তাতে আর কিছু লেখা নেই। দেশি কালি দিয়ে নক্সা এঁকে বালি দিয়ে শুকোনো হয়েছে। কোন হিন্দুস্থানীর কাজ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর অর্থ কি?

ততক্ষণে আরও দু'চারজন কৌতূহলী হয়ে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওকে। কেউ কিছু বুঝতে পারল না! কেউ বললে, 'বোগাস!' কেউ বললে, 'বদমাইসী করেছে—আমরা আকাশপাতাল ভেবে মরব, সেই জন্যেই একটা রহস্যময় কিছু করতে চেয়েছে!' কেউ বললে, 'তামাসা!'

বিল মিচেলও এসে দাঁড়িয়েছিল। সে অনেকক্ষণ নক্সাটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'প্যাটন, আমার মনে হচ্ছে এটা শাহ্‌নজফেরই নক্সা—আর পিছনের এটা কদম-রসুল!... কনৌজীলাল কোথায়, তাকে ডাকো না কেউ—সে তো চেনে এধারের বাড়িঘর!'

কে একজন ছুটে গেল কনৌজীলালকে ডাকতে। কিন্তু সে ঠিক তখন কোথায়—তা কেউ বলতে পারলে না।

মিচেল আরও একটু দেখে দেখে বলল, 'দ্যাখো, এর ভেতর দিয়ে পরিষ্কার কোন খবর দিতে চেয়েছে কেউ—তা যে যা-ই বলুক!'

ওরা দু'তিনজনে আরও ভাল ক'রে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। পাশাপাশি দুটি ইমারতের নক্সা। হ'তে পারে কদম-রসুল আর শাহ্‌নজফ্, কিন্তু তার মানে কি?... আরও একটু ভাল ক'রে দেখতে দেখা গেল—এক জায়গায়, পাঁচিলের রেখার গায়ে একটা চিকে কাটা। ঐ স্থানটার দিকে কেউ কোনও ইঙ্গিত করতে চেয়েছে!...

মিচেল বললে, 'সামনের এটা যদি শাহ্‌নজফ্ হয় তো পিছনের এটা কদম-রসুল।... মাঝে এই দ্যাখো পগারটাও দেখানো হয়েছে' তাহ'লে এটা হ'ল শাহ্‌নজফের পাঁচিল—পিছনের দিককার মানে রসুলের দিকের পাঁচিল।'

অকস্মাৎ প্যাটন একটা অস্ফুট চিৎকার ক'রে উঠল—'দ্যাখো দ্যাখো বিল, এপাশে একটা নাম সই করা আছে, উর্দুতে। তোমরা উর্দু জানো কেউ?'

কাছাকাছি একজন শিখ ছিল, সে এসে অতিকষ্টে পড়ল, 'মোহন।'

'মোহন!'

বিল ও প্যাটন্ দুজনেই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলে খানিকটা।

সেই মোহন কি?

তাহ'লে কি, অতদূর থেকে দেখতে পেয়েই প্যাটনকে কোন সংবাদ দিতে চেয়েছে সে? কৃতজ্ঞতা না চরম বিশ্বাসঘাতকতা?

প্যাটন হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখাই যাক্ না. আমি ঘুরে দেখে আসছি—ওধারের পাঁচিলে কি আছে!'

ক্যাপ্টেন ডসন ডাক্তারের সহকারীরূপে আহতদের সেবা ক'রে বেড়াচ্ছিলেন, তিনি এসে বললেন, 'অত দুঃসাহস ভাল নয় সার্জেণ্ট জন প্যাটন। এ নিশ্চয়ই ঐ শয়তান-ব্যাটাদের ফাঁদ।'

'দেখাই যাক্ না। না হয় আমি একাই মরব।... এমনিও তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও কত লোক মরছে।'

প্যাটন আর দাঁড়াল না। বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরে গুঁড়ি মেরে মেরে লোকজন-কামানের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলল সে, কোথাও বা বুকে-হেঁটেই যেতে হ'ল। অবশেষে এক সময় গিয়ে পড়ল শাহ্নজফের পিছনদিকের গভীর পরিখায়। খাড়া পাহাড়ের মত মাটি উঠে গেছে, তার ওপর পাঁচিল—কতকটা দুর্গের মতই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেদিকটায় তখন কেউ নেই! তবু মনে মনে ঈশ্বরকে একবার স্মরণ করলে প্যাটন। যদি সত্যিই সবটা ফাঁদ হয়!

খানিকটা ওঠবার পরই ওপরদিক থেকে খুব চাপা-গলায় কে যেন ব'লে উঠল, 'সাহেব—আর একটু বাঁদিকে—তাকিয়ে দেখুন পাঁচিলটা!'

কণ্ঠস্বরটাও যেন পরিচিত মনে হ'ল। সেদিনের মত ভয়বিকৃত নয়, তবু চেনা যায় বৈকি। মোহনেরই গলা।

প্যাটন তাকিয়ে দেখল।

কখন ওদেরই একটা ন-পাউণ্ড গোলা শাহ্নজফের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ডিঙিয়ে এধারের পাঁচিলে এসে পড়েছে। অনেকখানি ভেঙে গেছে পাঁচিলটা—বেশ বড় রকমের একটা গর্ত হয়েছে তাতে, একটা মাঝারি দরজার মতই।

যতদূর দেখা যাচ্ছে এখানে কোন পাহারা রাখারও প্রয়োজন মনে করেনি সিপাহীরা। এদিক থেকে শত্রুর আশঙ্কা একেবারেই করে নি ওরা।

মাটি দিয়ে গড়িয়ে সাপের মতই মাথা নিচু ক'রে এগিয়ে এল মোহন, খানিকটা কাছে এসে চুপি চুপি বললে—'দশ-বারোজন লোক এসে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ুন সাহেব। বাঁ দিকের পাঁচিল ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে ফটকটা খুলে দিন, তাহ'লেই আপনাদের জয় অনিবার্য।'

তারপর একটু থেমে ম্লান হেসে বললে, 'নিজের জাতভাইয়ের সঙ্গে একরকম

বিশ্বাসঘাতকতাই করলুম।... কিন্তু কী করব—প্রাণের দাম শোধ করতে হবে তো!'

সে আবার তেমনি নিঃশব্দে এঁকেবেঁকে সরীসৃপের মতই উঠে চলে গেল।

*

* *

শাহ্‌নজফ্ ইংরেজদের হস্তগত হয়েছে। অকস্মাৎ সামনে-পিছনে দুদিক থেকে শত্রুর আক্রমণে বিভ্রান্ত সিপাহীর দল পালাবারও অবকাশ পায়নি। বিরাট সমাধি মন্দিরের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ অসংখ্য মৃতদেহে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—বোধহয় দু হাজারেরও বেশি লোক মারা গেছে আজ। হোক্ শত্রু—তবু এতগুলি মৃতদেহ দেখে মিচেলের মনটা কেমন যেন ভারী হ'য়ে উঠল।

তবু সে জন প্যাটনের সঙ্গে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। বিস্তৃত সমাধি ভবনের প্রাচীরের গায়ে লাগা সারি সারি ঘর চারিদিকের গোটা পাঁচিলটা জুড়ে। এগুলো তৈরী হয়েছিল একদা রাহী বা যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য—এ ক-দিন সিপাহীরা ব্যারাকে পরিণত করেছিল ঘরগুলোকে। কি আছে ঘরগুলোয়, কে কী ফেলে গেছে, কেউ এখনও লুকিয়ে আছে কিনা কোথাও—এই কৌতূহলে ওরা দুজন সব ঘরগুলোই ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

তার ফলে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'ল ওদের। দেখা গেল এই পরাজয়ের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না ওরা। বরং নিশ্চিন্ত হয়ে রসুইয়ের আয়োজন করছিল। দু-তিন জায়গায় নৈশ আহার প্রস্তুতের ব্যবস্থা চোখে পড়ল। এক জায়গায় বিরাট আটার তাল এক পেতলের পরাতে, ডাল উনুনে চাপানো—সে ডাল পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। আর এক জায়গায় ডাল তখনও ফুটছে—কাঠ পুড়ে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আঙরার আঁচই যথেষ্ট। একটা ঘরে গোছা-করা চাপাটি প্রস্তুত, তার সঙ্গে হাণ্ডাভর্তি ডাল।

একটা ঘরে আরও এক বিস্ময় ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ঘরের কুলুঙ্গীতে পূজার আয়োজন। চন্দনমাখা নুড়ি গোটাকতক—ফুলে ঢাকা। তার পাশে তখনও একটা চিরাগ জ্বলছে। অর্থাৎ কোন ভক্ত হিন্দু সিপাহী তার দেবতাকে ফেলে আসতে পারেনি এবং এখানেও নিত্যপূজা অব্যাহত রেখেছিল!

মুসলমানের সমাধি-মন্দিরে হিন্দু দেবতার পূজা!

প্যাটন এবং মিচেল ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলে।

ঘরগুলোর বসতির চিহ্ন প্রচুর থাকলেও বাসিন্দা আর একটিও নেই। কোথাও হয়ত ক্ষীণ আশা একটা ওদের ছিল যে কোন লুকিয়ে থাকা ভীত শত্রুকে আবিষ্কার ক'রে কর্তৃপক্ষের কাছে বাহবা নেবে, কিন্তু সেদিক দিয়ে একেবারেই হতাশ হ'তে হ'ল। বোঝা গেল যে ঘরে লুকিয়ে আত্মরক্ষার কথা কেউই ভাবেনি, পালাবারই চেষ্টা করেছে সকলে এবং তার ফলে বেশীর ভাগই মরেছে।

ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে খুঁটি পুঁতে গোটাকতক মশাল বেঁধে দিয়েছে এরা। তাতে আলোর চেয়ে ধোঁয়া বেশী। তবু তারই ক্ষীণ আলোকে মৃতদেহগুলো দেখে দেখে বেড়াতে লাগল প্যাটন আর মিচেল। এদের মধ্যে যে দু-একজন

স্কচ্ বা ইংরেজদের দেহ ছিল তা অবশ্য এর মধ্যেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে—তবু এখনও এক-আধটা অবশিষ্ট আছে কিনা—সেইটিই দেখছিল ওরা।

কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে অকস্মাৎ এক জায়গায় এসে দুজনে যেন একই সঙ্গে একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে থম্‌কে দাঁড়াল।

সিপাইদের মৃতদেহের মধ্যে সাধারণ নাগরিকের মত সাদা জামাকাপড় পরা একটা দেহ—

এ-দেশীয় কেউ তো বটেই—যদিচ মুখটা ঠিক দেখা যাচ্ছে না, উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোতে মশালের আলো মিশে যেন আব্‌ছায়ারই সৃষ্টি করেছে, তবু তারই মধ্যে হেঁট হয়ে দেখবার চেষ্টা করে ওরা। শেষে প্যাটন আস্তে আস্তে দেহটা উল্‌টে দেয়—

ওদের মনের মধ্যে যে সন্দেহটা অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল সেইটেই সত্য হয়ে ওঠে।

মোহন!

বেচারী মোহন!...

প্যাটন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ায় এবার।

'জীবনের দাম শোধ করতে গিয়েছিল বেচারী, কিন্তু সে জীবন কতটুকু?'

বিল আর কথা কইলে না। বোধ হয় কথা কইবার ক্ষমতাও ছিল না ওর। আশ্চর্য, দেশ থেকে বহুদূরে এই বিদেশে এসে ঘৃণিত শত্রুদেরই একজনের জন্য তার মন এমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে তা কে জানত,

নিজের মনোভাবে নিজেই যেন বিস্মিত বোধ করে সে।

আর ঘুরতে ইচ্ছা করে না কারুরই। যে ক্লান্তি বহুপূর্বেই বোধ করা উচিত ছিল ওদের, সেই ক্লান্তিতে এবার পা যেন ভেঙে আসে।

ওদের দলবল বেশীর ভাগই ততক্ষণে এক জায়গায় একটা আগুন জ্বেলে গোল হয়ে বসেছে বিশ্রামের জন্যে। কোনমতে পা-দুটো টেনে টেনে ওরা সেইখানে এসে পৌঁছয়।

সেন্ট্রি-গার্ডের হুকুম বেরিয়ে গেছে তখন—পেট্রোল গার্ডেরও।

প্যাটনের ওপর পাঁচিল পাহারা দেবার ভার—৬টা থেকে ৮টা। মিচেলের পড়েছে পেট্রোল ডিউটি, আটটা থেকে দশটা। প্রত্যেকেরই দুঘণ্টা ক'রে। বাকী সময়টা বিশ্রাম। প্যাটন ছুট্‌তে ছুট্‌তে চলে গেল...ছটা বাজতে তখন মাত্র দুটি মিনিট বাকী। মনে মনে এই অবসরটুকুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে মিচেল মাঠের ওপরই এলিয়ে পড়ল।

আটটার সময় যখন একজন অফিসার ওকে জাগিয়ে দিলে তখন রীতিমত শীত বোধ হচ্ছে ওর। দিনের বেলা গরমে গ্রেট কোটটা বওয়া অসহ্য বোধ হচ্ছিল, তার ওপর এক সিপাহীর তলোয়ারে অনেকখানিই কেটে গিয়ে ঝলঝল্ করে ঝুলছিল দেখে সেটা সেসময় টান মেরেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সে। কিন্তু এখন কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া যেন হাড়ের মধ্যে অবধি কাঁপিয়ে তুলছে। আশ্চর্য, নভেম্বরেই এত শীত এখানে! অথচ দিনের বেলায় অত

গরম! এদেশের সবই অদ্ভুত! সেই ছেঁড়া গ্রেট কোটটার জন্যেই এখন আফ্‌সোস হচ্ছে, যদি সেটাও থাকত!

বিল মিচেল শীত তাড়াবার জন্যে জোরে জোরে হাঁটতে লাগল—ভাগ্যিস সেন্ট্রি ডিউটি পড়েনি ওর! পেট্রোল ডিউটিতে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ আছে তবু।...

সকলেই ঘুমন্ত—শুধু পাহারাদাররা ছাড়া। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি।

ঘুম এবং শীত দুই-ই দূর করতে মিচেল তার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে মনকে সচেতন ক'রে তোলে।

বিরাট সমাধি-গৃহটার দিকে তাকায়।

প্রকাণ্ড গম্বুজ—মস্‌জিদের ধরণে। তার নিচে উঁচু পোতার ওপর সমাধি বেদী। কিন্তু সেটা আসল সমাধি নয়। এদেশের এই এক মজার নিয়ম। ওপরে প্রায় একতলা কি দেড়তলা সমান উঁচু জায়গায় বাহারী নকল সমাধি একটা। অথচ তারই বেশী জাঁকজমক—বেশী রূপসজ্জা। তার নীচে অব্যবহার্য একতলাটায় মাটিতে আসল সমাধি—সম্পূর্ণ আড়ম্বর ও সাজসজ্জা বর্জিত। সেটাতেও ঢোকা যায়, কিন্তু দেখবার কিছু নেই ব'লেই কেউ ঢোকে না। রক্ষকরা সন্ধ্যার সময় একটা ক'রে চিরাগ জ্বেলে দিয়ে যায় এই মাত্র। বিদ্‌রীর কাজ করা বড় লণ্ঠনটাও জ্বলে ওপরের নকল সমাধিতে, সেইখানেই দর্শকরা ফুল দিয়ে যায় আলো দিয়ে যায়—সিন্নির পয়সা ফেলে। বেশীর ভাগ দর্শক এবং যাত্রীই ঐ সমাধিটা দেখে ফিরে যায়, নিচের তলার কথা কারুর মনেও পড়ে না।

এসবই এই ক'মাসে মিচেল জেনেছে। এদেশ সম্বন্ধে মোটামুটি অনেক অভিজ্ঞতাই হয়েছে ওর।

সে ঘুরতে ঘুরতে সেই নিচের তলার অন্ধকার বিরাট মূল সমাধি-গৃহটার প্রবেশপথে এসে থমকে দাঁড়ায়। অন্ধকারে ভেতরটা থমথম করছে। আরও বেশী ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে পাথরের ঐ ঘরটা।...

কী অদ্ভুত এদের নিয়ম!

ভাবতে ভাবতেই আবার এগিয়ে যায় বিল মিচেল। কিন্তু ঠিক কোণে গিয়ে যেমন বাঁ-হাতি ঘুরতে যাবে, হঠাৎ একেবারে ঘাড়ে পড়ে যায় একজনের। কে একজন গুঁড়ি মেরে দেওয়ালের আড়ালে বসে আছে—

অস্ফুটকণ্ঠে একটা গালি দিয়ে উঠে নিমেষে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে মিচেল।

'কে, কে এখানে?'

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে দাঁত বার ক'রে হাসে। বহুদূরে মশালের আলো—তবু চিনতে খুব অসুবিধে হয় না—সার্জেন্ট স্মিথ!

'এখানে এভাবে বসে কি করছিলে?'

বেশ রূঢ়কণ্ঠেই প্রশ্ন করে মিচেল।

'তোমাদের প্রণয়লীলা দেখছিলুম কর্পোরাল বিল মিচেল! কেন, ব্যাঘাত করলুম নাকি? আমার অস্তিত্ব টের পেয়েই মাল ছেড়ে চলে এলে নাকি?'

'তোমার রসিকথা বোঝা কঠিন সার্জেন্ট স্মিথ। প্রণয় করব কার সঙ্গে—তোমার সঙ্গে না ঐ নেটিভদের মৃতদেহগুলোর সঙ্গে?'

'কেন—সেদিন যার চাঁদমুখ দেখে মোহিত হয়েছিলে, যাকে চুপি চুপি ঐ অন্ধকার ঘরে অপেক্ষা করতে বলেছ! দ্যাখো বিল আমার বয়স হয়েছে—আমি কচি খোকা নই—অত সহজে আমাকে ধাপ্পা দিতে এসো না।'

'তার মানে?' বিল মিচেলের কণ্ঠস্বর ভীষণ শোনায়।

'তার মানে—সেদিনকার সেই মেয়েটা। একটু আগেই নিচের ঐ গোরটার মধ্যে ঢুকেছে।'

'মিছে কথা। সে এখানে কী ক'রে আসবে?'

'গিয়ে দ্যাখো। আমি যে কোন শপথ করতে রাজী আছি। মিছে কথা বলা আমার অভ্যাস নেই, তোমার মন দারুণ উত্তেজিত হয়েছে বলে জানি তাই—অপরে মিথ্যাবাদী বললে সহজে ক্ষমা করতুম না।... আচ্ছা আসি, গুড্ নাইট।'

খুব চাপা গলায় শিস্ দিতে দিতে চলে যায় সে।

সম্ভবত এইবার ওর ডিউটি পড়বে কোথাও—কিম্বা বিশ্রামের কথাই মনে পড়ে এতক্ষণে।

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বিল মিচেল।

কথাটা কি সত্যি? না না, এই যুদ্ধক্ষেত্রে, এই মৃত্যুপুরীতে সে কোথা থেকে আসবে?

কিন্তু স্মিথ যেভাবে বললে—

যদি সত্যিই হয়—মেয়েটাকে তার কয়েদ করা উচিত।

শত্রুর গুপ্তচর হ'তে পারে—এদের বিশ্বাস নেই!...

গিয়ে দেখতে দোষ কি?

এদিক ওদিক চেয়ে একটা খুঁটি থেকে জ্বলন্ত মশাল তুলে নেয় বিল মিচেল। তারপর সেটা বাঁহাতে বাগিয়ে ধরে ডানহাতে বেয়নেটসুদ্ধ বন্দুকটা উঁচিয়ে সাবধানে এগিয়ে যায় সে সমাধি-মন্দিরের গর্ভগৃহের দিকে।

ঠিক দরজাটার সামনে গিয়ে মুহূর্তকাল বোধহয় ইতস্তত করে সে। ওর মনে হয় খুব দূরে পিছনে কে যেন চাপা গলায় হাসছে—বিদ্রূপের হাসি। এত মৃদু যে ঠিক শুনেছে কিনা তাও বুঝতে পারে না, মনে হয় বুঝি কল্পনা।

সে মন দৃঢ় ক'রে সোজা ঢুকে যায় ঘরের মধ্যে।

'সাহেব সাহেব, এগিও না, সর্বনাশ ক'রো না—'

পরিষ্কার হিন্দুস্থানীতে চাপা অথচ আকুলকণ্ঠে কে যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে। মশালের আলোটা নিজের হাতে ধরা ব'লে সহজে কিছু নজরে পড়ে না, শুধু চকিতে যেন দেখে ঘরের মেঝেতে মাঝখানে স্তূপাকার করা কালো মত কী একটা চূর্ণ পদার্থ—এবং তার সামনে শাড়িপরা বিবর্ণমুখী একটি মেয়ে!

তারপর হতভম্ব স্তম্ভিত বিল মিচেল ব্যাপারটা কি বোঝবার আগেই সেই মেয়েটি ছুটে এসে দু'হাত দিয়ে জ্বলন্ত মশালের মাথাটা চেপে ধরে।

'একি একি, এ কী করছ?'—বলতে বলতেই মিচেল মশালটা ধরে টানাটানি করে।

'আঃ সাহেব, ছেলেমানুষী করো না। মশালটা আগে নিভোতে দাও, তারপর যা খুশী। ক'রো। আমাকে মেরে ফেলো, আমি একটা কথাও কইব না।'...

'কিন্তু আমি যে কিছুই—'

'সাহেব তোমার পায়ের তলায় বারুদ—কয়েক গাড়ি বারুদ—একটু আগুনের ফুল্‌কি লাগলে তুমি আমি, ঐ-সব সাহেব, এই ইমারত কিছু থাকবে না—সব উড়ে যাবে!'

'বারুদ!' স্পষ্ট অবিশ্বাসের সুর মিচেলের কণ্ঠে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে যায় ঝাপ্‌সা-দেখা একটা কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ পদার্থের রাশি—

ততক্ষণে মশাল নিভে গেছে। ভেতরটা গাঢ় অন্ধকার। প্রবেশপথ দিয়ে বাইরের স্বল্প কয়েকটি আলোর ক্ষীণ আভা মাত্র এসে পড়েছে।

তারই মধ্যে মেয়েটাকে সরিয়ে বিল আন্দাজে এগিয়ে গিয়ে একটুখানি সেই গুঁড়ো তুলে নেয় হাতে ক'রে। নাকের কাছে ধরতেই আর সন্দেহ থাকে না বিন্দুমাত্রও। বারুদ—এবং এই স্তূপাকার বারুদে একটিমাত্রও আগুনের ফুল্‌কি লাগলে এতগুলি প্রাণীর কারও রক্ষা থাকত না।

'কিন্তু তুমি যে—কৈ চলো তো দেখি!'

বিল মিচেল মেয়েটার হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে বেরিয়ে আসে।

'দেখি তোমার হাত!'

গঙ্গু কোন বাধাই দেয় না। তার চোখের কোলে সদ্য-বিসর্জিত অশ্রুর আভাস থাকলেও মুখে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা। বিল তাকে আরও খানিকটা টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে একটা মশালের সামনে দাঁড় করিয়ে তার দুটো হাত আলোর সামনে উঁচু ক'রে ধরে—'ইস্‌, যা ভেবেছি তাই—দুটো হাতই যে একেবারে পুড়ে গেছে! এ কী করলে গঙ্গু?'

'নইলে তোমাকে বাঁচাবার যে আর কোন উপায় ছিল না সাহেব। আমি তো খুশিমনেই মরতে পারতাম—সে হ'ত আমার সুখের মৃত্যু।'

'আমাকে বললে না কেন মুখে?—ছি ছি, দুটো হাতই কী ভাবে পুড়ল বলো তো!'

'তোমাকে বলে বুঝিয়ে বাইরে আনতে গেলে যে সময় যেত—হয়ত তুমি ধস্তাধস্তি করতে টানাটানি করতে মশাল নিয়ে—হয়ত হেঁট হয়ে দেখতেই যেতে—তার মধ্যে একটি ফুল্‌কি খসে পড়লে কি হ'ত—কিম্বা জ্বলন্ত এক ফোঁটা তেল!'

'বুঝেছি গঙ্গু—তুমি আমার আজ প্রাণদান করেছ। সেদিন আমি যা করেছি তা সামান্যই, তুমি আজ তার অনেক বেশী দিলে!'

'না সাহেব, সে কথা নয়। তোমার প্রাণ বেঁচেছে, এইজন্যই গঙ্গামাঈকে ধন্যবাদ। আমাদের এ প্রাণের কী মূল্য—তোমাদের মত লোক বাঁচলে বহুলোকের উপকার হবে।'

'কিন্তু—কিন্তু তুমি এই মৃত্যুপুরীতে কেমন ক'রে এলে গঙ্গু?'

গঙ্গুর দুই চোখের কোল বেয়ে এবার জল গড়িয়ে পড়ল ঝরঝর ক'রে। অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে কোনমতে বললে, 'মোহন ভাইয়াকে খুঁজতে এসেছিলাম। আমি অভাগীই সেদিন তাকে

বলেছিলাম তোমাদের ওপর নজর রাখতে, সাধ্যমত তোমাদের উপকার করতে—তাই সে এদের সঙ্গে এখানে এসেছিল, নইলে কৈশোরবাগে তার থাকবার কথা। ওকে এইখানে পাঠিয়েও স্থির থাকতে পারিনি, নিজে এসে কদম-রসুলে লুকিয়ে ছিলুম। ছেলেবেলায় আমার বাবা এই পাড়ায় থাকতেন, এইখানেই খেলা করেছি, এখানকার পথঘাট সব আমার চেনা। কদম-রসুল আর এখানের মধ্যে একটা গুপ্তপথও আছে। সন্ধ্যাবেলা যখন দেখলুম আমাদের সেপাইরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—আর কেউ নেই, তখন আর স্থির থাকতে পারলুম না—এখানে চলে এলুম। আঁধারে আঁধারে গোপনে গোপনে ঘুরছিলুম, তারপর একসময় মোহনকেও পেলুম।'

কান্নার আবেগে গঙ্গুর গলা একেবারেই বুজে এল। খানিক পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললে, 'আমার জন্যই এই কাণ্ডটি হ'ল। মনে হ'ল অসংখ্য সঙীন্ পড়ে রয়েছে আশেপাশে, একটা তুলে বসিয়ে দিই বুকে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাক্। কিন্তু তারপরই মনে পড়ল, ওর বৌ-ছেলের কথা, আমার বুড়ো মায়ের কথা। তাদের যে আর কেউ রইল না। তাই চোখের জল মুছে আবার উঠে দাঁড়ালাম। সেই মুহূর্তে সেদিনকার সেই যমদূতের মত সাহেবটা কোথা থেকে এসে পড়ল। ভাবলাম বুঝি আজও অপমান করবে কি ধরিয়ে দেবে! কিন্তু কিছুই করল না, বললে শুধু, আমি বড়ই দুঃখিত, তোমার আত্মীয় মারা গেছে। তা ও শেষ অবধি আমাদের উপকারই করেছিল, সেজন্য তোমাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তোমার সেদিনকার সেই সাহেব, সে-ই তোমাকে দেখেছে আগে। সে ঐ ঘরটার মধ্যে অপেক্ষা করছে, তুমি একবার দেখা ক'রে যেও। আমি তার মিষ্টি কথায় ভুললাম। সত্যিই তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা হয়েছিল মনে মনে—তা স্বীকার করছি। সব ভুলে এই ফাঁদে পা বাড়ালুম। অন্ধকারে ঢুকে তোমাকে চুপি চুপি ডাকলুম—মনে হ'ল কে যেন সাড়া দিলে। ...এখন বুঝছি সেটা প্রতিধ্বনি। তখন তা মনে হয়নি, অন্ধভাবে এগিয়ে গিছলাম। ...হঠাৎ পায়ে লাগল ঐগুলো, পড়েও গেলাম পা বেধে—তখনই গন্ধটা নাকে এল। সারাদিন এইখানে রয়েছি বলতে গেলে—বারুদের গন্ধ চিনতে ভুল হয়নি, বেরিয়ে আসতে যাবো, দেখি তুমিও ঢুকছ!'

থেমে থেমে থতিয়ে থতিয়ে এতগুলা কথা ব'লে যেন শ্রান্তিতেই চুপ করে গঙ্গু। তারপর আবার বলে, 'এখন বুঝছি ঐ লোকটারই শয়তানী, তোমার আমার দুজনের ওপরই শোধ তুলতে চেয়েছিল!'

মিচেল বলে, 'ঐখানে ডাক্তার আছেন, চলো গঙ্গু—তোমার হাতে ওষুধ লাগিয়ে দিই গে—'

'না না, মাপ করো সাহেব। আমাকে ছেড়ে দাও। ও কিছু না। তুমি যেন শান্তিতে থাকো, নিরাপদে থাকো—এইটুকুই আমি প্রতিদিন জানাবো ভগবানকে। কিন্তু আর আমাকে নিয়ে বিব্রত হ'তে হবে না সাহেব, আমি চললুম—'

'চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই—নইলে যদি কেউ ধরে আবার!'

'দরকার হবে না সাহেব। আমি সেই গুপ্তপথেই ফিরে যাবো, যে পথে এসেছি। আর ধরে, এবার উপায় রেখেছি সঙ্গেই।'

সে কোমরের মধ্যে থেকে একটা ছোরা বার ক'রে দেখায়।

'কিন্তু গঙ্গু, আমি কি তোমার কোন উপকারে লাগতে পারি না? টাকাকড়ি— ? তোমার ঠিকানাটাও তো আমাকে জানালে না! এ লড়াই মিটে গেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতুম!'

গঙ্গু একবার মুখ তুলে তাকায় ওর দিকে। কেমন যেন উৎসুক, লুব্ধ দৃষ্টিতে চায়, ইতস্তত করে খানিকটা, বোধহয় কি বলতেও চেষ্টা করে, তারপর হঠাৎ একসময়ে সে বক্তব্য অসম্পূর্ণ রেখেই, মিচেল আর কিছু বলবার বা বাধা দেবার আগেই, সে ছুটে সেই অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিশে যায়।

বিল স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে বহুক্ষণ ধরে। ওর গলার কাছে কী যেন একটা ঠেলে উঠতে চাইছে। এ মনোভাবের সঙ্গে ওর এর আগে কখনও আর পরিচয় হয়নি। অবস্থাটা একেবারে অভূতপূর্ব!

সিপাহী বিদ্রোহ

সিপাহী বিদ্রোহে দেশে যে আগুন জ্বলেছিল, তার ইন্ধন সঞ্চিত হচ্ছিল বহুদিন আগে থেকেই। দেশবাসীর অসন্তোষের কারণ অনেকগুলি, তবে তার মুখ্য কারণের কথা পরে বলছি, গৌণ কারণগুলোই আগে দেখা যাক্।

যদিও লর্ড ডালহৌসীর নামই এ ব্যাপারে বেশী বিখ্যাত তবু গভর্ণর জেনারেল উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের সময় থেকেই দেশীয় রাজাদের রাজ্য আত্মসাৎ করা শুরু হয়। তাঁর ওপর কর্তাদের এ হুকুম ছিল না কিন্তু তিনি কার্যক্ষেত্রে নেমে তাঁদের কথা শুনতে পারলেন না। ১৮৩১ সালে মহীশূরের গদি থেকে শুরু হ'ল, কুশাসনের অজুহাতে তিনি রাজা কৃষ্ণ উদয়রকে গদি থেকে নামিয়ে রাজ্য খাসে আনলেন (১৮৮১ আবার মহীশূরে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়)। তারপর গেল জয়ন্তীয়া ও কুর্গ। লর্ড অকল্যাণ্ড আফগান যুদ্ধে ব্যস্ত থাকলেও ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট মনোভাব পোষণ করার জন্য কর্ণালের নবাবকেও গদিচ্যুত করলেন। লর্ড এলেনবরার আমলে সিন্ধিয়া নখদন্তহীন আশ্রিত রাজা-রূপে গণ্য হলেন— যদিও তার জন্য এলেনবরাকে বেগ পেতে হয়েছিল বেশ।

এর পর এলেন ডালহৌসী। এইবার সেই বিখ্যাত স্বত্বভ্রংশ নীতি বা ডকট্রিন্ অব ল্যাপস্ প্রয়োগ শুরু হ'ল। এ আইনটা আগেই তৈরী হয়েছিল। যারা আশ্রিত বা করদরাজ্য কিংবা যেসব রাজ্য ইংরাজদেরই তৈরী—তাদের কোনও রাজার যদি সন্তানাদি না থাকত সে রাজ্যের গদি ইংরেজদের (তখন ভারতের সার্বভৌম শক্তি—মুঘলদের কাছ থেকে এটা তাঁরা পেয়েছেন) খাসে চলে আসবে—এই হ'ল সে আইন। কিন্তু যেগুলি মিত্ররাজ্য, তার এ আইনে পড়বে না। অবশ্য মিত্ররাজ্য ও আশ্রিত রাজ্যের তফাতটা এতই সূক্ষ্ম যে সেটা স্থির করা হ'ত অনেক সময় কর্তাদের খেয়াল-খুশি-মতো। এ নীতির প্রয়োগ এর আগেও

করা হয়েছে বটে (মণ্ডভী, কোলাবা, জলাউন্ এবং সুরাটে) কিন্তু ডালহৌসীর মতো এত কঠোরভাবে কেউই তা প্রয়োগ করে নি। এ নীতি প্রয়োগ করার বাহ্য অজুহাত হ'ল প্রজাদের কুশাসন থেকে রক্ষা করা, দেশের অরাজকতা দূর করা এবং প্রজাদের ধারণায় বৃটিশ-শক্তির সার্বভৌমত্ব দৃঢ়বদ্ধ করা। কিন্তু দেশের মধ্যে বাণিজ্যের অধিকতর সুবিধা করা এবং আয়-বৃদ্ধিই ছিল এর আসল কারণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সুগঠিত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করা তো বটেই।

যাই হোক্ এ নীতিতে বহু রাজ্যই গেল—সাতারা, সম্বলপুর বাঘাট, উদয়পুর, নাগপুর, ঝাঁসী, তাঞ্জোর ইত্যাদি। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও বার্ষিক আট লক্ষ টাকা পেন্‌সন্ পাচ্ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেটা বন্ধ হয়ে গেল—তাঁর দত্তকপুত্র নানা ধুন্ধুপন্থ বা নানাসাহেব সে আয় থেকে বঞ্চিত হলেন। নিজামের কাছ থেকে বেরার কেড়ে নেওয়া হ'ল। কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যার নবাবকেও গদি থেকে সরিয়ে দেওয়া হ'ল। এটা একদিক দিয়ে খুবই অন্যায় হয়েছিল, কারণ অযোধ্যার নবাবরা দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে ইংরেজদের তাঁবেদারী করে আসছিলেন।

এ ছাড়া বহু জমিদারও তাঁদের জমিদারী থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, বহু নিষ্কর স্বত্বের উপর কর ধার্য করা হয়েছিল। ডালহৌসী ইনাম কমিশন বসিয়ে একা দাক্ষিণাত্যেই প্রায় বিশ হাজার তালুক বাজেয়াপ্ত করেন। এর ফলও হ'ল সাংঘাতিক। ভূতপূর্ব রাজাদের এবং জমিদারদের আশ্রিত বহু কর্মচারী ও আত্মীয়স্বজন বেকার হয়ে পড়ল। বহু সৈন্যেরও চাকরি গেল। যেসব জমিদার ক্ষতিগ্রস্ত হলেন তাঁরাও বৈরীভাবাপন্ন হয়ে রইলেন।

এমনি ক'রে দেশের সর্বত্রই অশান্তির আগুন ধূমায়িত হচ্ছিল অনেকদিন থেকে। সাধারণ প্রজাদের মধ্যেও কিছু কিছু বিক্ষোভ দেখা দিল। বহু প্রচলিত সামাজিক প্রথার যখন সংস্কার সাধন হয় (সে প্রথা যত খারাপই হোক এবং সংস্কার যত ভালই হোক) তখন সব দেশেই এমনি প্রতিবাদ ওঠে। রেল টেলিগ্রাফের বিস্তার, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রচলন, বিধবা বিবাহ বিল, সতীদাহ প্রথা নিবারণ—এ সবের মধ্যেই তারা ধর্মচ্যুতির আশঙ্কা করতে লাগল। হিন্দুধর্ম বুঝি যায়!

এই ধর্মনাশের ভয়টা সিপাহীদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল। সিপাহীদের অবশ্য অসন্তোষের অন্য কারণও ছিল। বহু দূর দেশে যুদ্ধ করবার জন্য ওদের পাঠানো হ'ত—অনেক সময় বিপজ্জনক এবং অস্বাস্থ্যকর স্থানেও—তার জন্য কোনও বাড়তি ভাতার ব্যবস্থা ছিল না। তারা বহুদিন থেকেই এই ভাতা দাবী করে আসছে কিন্তু কোনও ফল হয় নি। তার ওপর তাদের প্রতি হুকুম হ'ল ভারতীয় সৈন্যদের ভারতের বাইরেও যুদ্ধ করতে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সাগর পার হলেই জাত যাবে, তখন এইরকম একটা সংস্কার ছিল। আর ঠিক সেই সময়টায় এল নতুন এন্‌ফিল্ড্ কার্তুজ, তাতে ছিল চর্বি—টোটা দাঁতে কেটে পরাবার সময় সে চর্বি মুখেও যাবে। কে যেন রটিয়ে দিলে, ও চর্বি শুয়োরের—হিন্দু মুসলমান উভয়েরই অখাদ্য!

ব্যাস্, আর যায় কোথা। ইন্ধন প্রস্তুত, আগুন দেবার লোকেরও অভাব হ'ল না।

মুসলমানরাও নানা কারণে ক্ষেপে ছিল, অযোধ্যার নবাবের পদচ্যুতি, মুঘলসম্রাটের নির্বাসন (প্রাসাদ থেকে সরিয়ে তাঁকে কুতবে রাখতে আদেশ করা হয়েছিল)—এইগুলি প্রধান কিছুদিন ধরেই পদচ্যুত রাজা ও নবাবদের একটা ষড়যন্ত্র চলছিল—অযোধ্যার নবাবের মন্ত্রী আহ্‌মদ উল্লা, নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপী নামে একজন সম্ভ্রান্ত মারাঠী ব্রাহ্মণ, ঝাঁন্সির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, জগদীশপুরের রাজা কুন্‌ওয়ার সিং এবং সম্রাট বাহাদুর শার আত্মীয় ফিরুজশাঃ তার মধ্যে প্রধান। এঁরা এই সময় এগিয়ে এসে সিপাহীদর ক্ষেপিয়ে তুললেন। তখন এদেশে ইংরেজ সৈন্য ছিল মাত্র ৪৫৩২২ এবং দেশীয় সিপাহী ২৩৩০০০—সে কথাটাও তাদের জানিয়ে দেওয়া হ'ল!

সিপাহী বিদ্রোহকে অনেকে জাতীয় জাগরণ বলে মনে করেন, কিন্তু কথাটা ঠিক সত্য নয়। জনসাধারণ এ বিদ্রোহে কোনও অংশ নেয় নি, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজদের সাহায্য করেছে। তার কারণ বহুদিন ধরে নানা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সহ্য ক'রে ইংরেজদের আমলে সবে তারা শান্তি ও শৃঙ্খলার মুখ দেখেছে। তারা জানত যে ইংরেজরা রাজা থাকলেই এই শান্তি বজায় থাকবে। এ ছাড়া রাজপুত রাজারা দাক্ষিণাত্যের রাজারা কেউই সিপাহীদের সাহায্য করেন নি, শিখেরাও না। বরং গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, নেপাল এবং শিখ রাজাদের কাছ থেকে ইংরেজরা প্রচুর সাহায্য পেয়েছে—সে সাহায্য না পেলে হয়ত ইংরেজদের এ বিদ্রোহদমন সম্ভবই হ'ত না।

প্রথম বিদ্রোহ শুরু হ'ল বাঙ্গলায়। বহরমপুর এবং বারাকপুর ছাউনীতে ১৮৫৭ সালের প্রথম দিকেই গোলমাল বাধল। সে বিদ্রোহ কিন্তু বেশীদূর যায় নি—খুব কঠোর হস্তে তাদের দমন করা হয়েছিল। তবে মে মাসের দশ তারিখে মীরাটে যা শুরু হ'ল তা খুব সামান্য নয়। সিপাহীরা কয়েদখানা ভেঙে বন্দী সিপাহীদের বার ক'রে নিজেদের দল ভারী করলে, তারপর স্থানীয় ইউরোপীয়ানদের বধ ক'রে তারা দিল্লীর দিকে যাত্রা করলে। তখন দিল্লীতে কোনও ইউরোপীয়ান সৈন্য ছিল না, বরং ছি মীরাটেই, জেনারেল হিউইট্‌ দু'হাজারেরও বেশী সৈন্য নিয়ে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তিনি কিছুই করতে পারলেন না। সিপাহীরা দিল্লী দখল ক'রে বাহাদুর শাকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলে ঘোষণা করলে এবং স্থানীয় বহু ইউরোপীয়ানকে বধ করলে। দিল্লী দুর্গের বারুদখানাটা কিন্তু ওদের হাতফস্‌কে গেল। লেফ্‌টেনাণ্ট উইলোবী ছিলেন ভারপ্রাপ্ত অফিসার, তিনি যখন দেখলেন যে কিছুতেই আর রক্ষা করা যাবে না তখন নিজ হাতে আগুন লাগিয়ে উড়িয়ে দিলেন—বারুদের সঙ্গে নিজেকেও। এতগুলি বারুদ শত্রুর হাতে পড়লে ওদের শক্তিবৃদ্ধি হবে আর নিজেদের জয়লাভ করা সুদূরপরাহত হয়ে পড়বে—এই ভেবে তিনি নিজের প্রাণের মায়া করলেন না একবারও।

দিল্লী দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ভারতের বহু স্থানে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল—রাজপুতানার একাংশে, কাশী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরিলী ও আরায়। আরা বিদ্রোহের নেতা ছিলেন কুন্‌ওয়ার সিং, তিনি পাটনার কমিশনার উইলিয়ম টেলরের কাছে পরাজিত হলেন।

কর্ণেল নীল কাশীকে ঠাণ্ডা করলেন। এসব স্থানেই সামরিক আইন জারি করা হ'ল এবং বিদ্রোহী, তাদের আত্মীয়স্বজন, সাহায্যকারী—এমন কি যাদের ওপর বিন্দুমাত্র সন্দেহ হ'ল—বালক বৃদ্ধ নির্বিচারে তাদের হত্যা ক'রে এই স্পর্ধার প্রতিশোধ নেওয়া হ'ল। জোয়ান ছেলেদের শুধু তারা জোয়ান বলেই—অনেককে হত্যা করা হ'ল। বহু শ্বেতাঙ্গ অফিসার স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ফাঁসুড়ের কাজ করতে লাগলেন। নীল সাহেব এলাহাবাদের বিদ্রোহকেও অল্প চেষ্টাতেই আয়ত্তে এনেছিলেন।

অত সহজে মিটল না দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ও কানপুরে।

কানপুরের কাছেই বিঠুরে থাকতেন নানাসাহেব, তিনি নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করলেন এবং কানপুর বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ওখানকার ইউরোপীয় সৈন্যরা সংখ্যায় ছিল নগণ্য, সমস্ত শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী মিলিয়ে কয়েকশো হবে কিনা সন্দেহ। তবু তারা অশীতিপর বৃদ্ধ হুইলার সাহেবের নেতৃত্বে বহুদিন ধরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে। প্রায় আঠারো দিন ধরে অবরুদ্ধ থেকে, অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা এবং অনাহার স্বীকার ক'রে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'ল। তবু শর্ত করিয়ে নিলে যে তাদের নিরাপদে এলাহাবাদ চলে যেতে দেওয়া হবে। কিন্তু এলাহাবাদ ও কাশীতে ইংরেজ আর শিখ সৈন্যরা এদেশবাসীর উপরে যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছে তার সংবাদ এসে পৌঁচেছে এখানে। সকলেই প্রতিশোধের বাসনায় ক্ষিপ্ত—কে কার কথা শোনে! ইংরেজ সৈন্যরা একে একে নৌকোয় উঠে যেমন নৌকা ছেড়েছে—শুরু হ'ল তীর থেকে গোলাবর্ষণ। চারজন ছাড়া সকলেই সেই অসহায় অবস্থায় প্রাণ হারাল, কোনও কোনও ক্ষেত্রে নৌকাকে-নৌকা ডুবে গেল গোলার আঘাতে। দুই শতাধিক স্ত্রীলোক ও শিশু বিবিগড় প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছিল—তাদেরও একদিন নির্মমভাবে হত্যা করা হ'ল। সেই মৃতদেহগুলি বিরাট্ একটি শুক্‌নো কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল—আজও সে কুয়া মানুষের জিঘাংসা ও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির স্বাক্ষ্য-স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু হিংসাতে হিংসাই বাড়ে শুধু। এদের প্রতিশোধ বাসনার ফলে ওদের প্রতিশোধ প্রবৃত্তি আরও শানিত হয়ে উঠল।

নীল ও হ্যাভেলক এই ঘটনার পরেই কানপুরে এসে পৌঁছলেন। তারপর যে প্রতিশোধ-লীলা চলল তা সহজেই অনুমান করা যায়! এর পর অবশ্য আর একবার গোয়ালিয়র দলের সিপাহীরা কানপুর দখল করেছিল (২৭শে নভেম্বর), কিন্তু বেশীদিন ধরে রাখতে পারে নি। ক্যাম্পবেল ডিসেম্বরের গোড়ার দিকেই আবার তা পুনরাধিকার করলেন।

দিল্লী দখল করাটাই কিন্তু আসল সমস্যা। দিল্লীর বিদ্রোহীদের দমন করতে না পারলে ইংরেজদের মানসম্ভ্রম থাকে না।

৮ই জুন আম্বালা ও মীরাটের ইংরেজ সেনাদল মিলিত হয়ে দিল্লী পৌঁছল। বাদ্‌লী সরাইতে একদল বিদ্রোহীকে পরাজিত ক'রে ওরা দিল্লীর 'রিজ' (প্রাচীরের মতো পাহাড় একটি) দখল ক'রে বসল। এর মধ্যে স্যার জন লরেন্স পাঞ্জাব থেকে নিকলসনের নেতৃত্বে একদল শিখ সৈন্য পাঠালেন। বিদ্রোহীরা নিকলসনকে পথে আট্‌কাবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা

করেছিল কিন্তু কিছুতেই ঠেকাতে পারলে না। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি 'কাশ্মীরী দরওয়াজা ভেঙে উড়িয়ে দিয়ে ওঁরা দিল্লী প্রবেশ করলেন এবং ছদিন ধরে প্রাণপণ যুদ্ধ ক'রে দুর্গও দখল ক'রে নিলেন। এর পর শুরু হ'ল প্রতিহিংসার তাণ্ডব। শহরের মধ্যে ঢুকে ইংরেজ সৈন্যরা যাকে সামনে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে। বাড়ির মধ্যে ঢুকে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে বধ করেছে। আরও যেসব অত্যাচার হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরীহ শহরবাসীর ওপর—বর্ণনা দিলে বইয়ের পাতাকে কলুষিত করা হয়। বহু নির্দোষ লোক শুধু বেত খেতে খেতেই মারা গেছে।

মুঘলসম্রাট বাহাদুর শা' ভয়ে দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে পূর্বপুরুষ হুমায়ুনের সমাধিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন—সেখান থেকে তাঁকে টেনে বার করা হ'ল। বৃদ্ধ ও প্রায়-অন্ধ বাহাদুর শাকে হত্যা করা হ'ল না বটে কিন্তু রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হ'ল। সেখানে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আরও পাঁচ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। ওঁকে যিনি বন্দী করেন—লেফ্‌টেনাণ্ট হডসন বলে একজন ইংরেজ অফিসার—তাঁর হুকুমে বাহাদুর শার পুত্র ও পৌত্র এবং অন্যান্য বহু রাজকুমার যারা তাঁর সঙ্গে বন্দী হয়েছিল, তাদের তখনই গুলি ক'রে মেরে ফেলা হ'ল। ইংরেজ ঐতিহাসিকরাও এই জঘন্য এবং অকারণ আচরণের জন্য হডসনকে নিন্দা করেছেন। প্রয়োজন তো ছিলই না—কোনও কারণও ছিল না। সে বেচারীদের বিরুদ্ধে আনবার মতো একটা অভিযোগও হডসন খুঁজে পান নি পরে।

লক্ষ্ণৌতে যখন বিদ্রোহ শুরু হয় (৩০শে মে) তখন স্যার হেন্‌রী লরেন্স ওখানকার চীফ কমিশনার। তিনি প্রথম প্রথম বিদ্রোহ দমনের চেষ্টাই করেছিলেন, তারপর যখন ব্যাপারটা খুব গুরুতর আকার ধারণ করল তখন তিনি শহরের সমস্ত ইংরেজ ও খ্রীষ্টান পরিবার ও অফিসারদের এনে রেসিডেন্সীতে (রেসিডেণ্ট এবং পরে কমিশনারের প্রাসাদ) আশ্রয় দিলেন। তারপর তিনি ওখানে যে সাতশো বিশ্বস্ত সিপাহী ও অল্প কয়েকজন ইংরেজ সক্ষম পুরুষ ছিল তাদের নিয়ে প্রাণপণে বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগলেন। লা মার্টিনিয়ের স্কুলের বালক ছাত্ররাও এই সময় এঁদের সঙ্গে সমান যুদ্ধ করেছে। হেন্‌রী লরেন্স কয়েকদিনের মধ্যেই গোলার আঘাতে মারা গেলেন। তখন রেসিডেন্সী রক্ষার ভার পড়ল ইংলিশ সাহেবের ওপর। লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীর অল্পসংখ্যক অধিবাসী সে-সময় অসাধ্যসাধনই করেছিলেন। এঁরা বাইরে থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করেছেন—ভেতরে সহ্য করেছেন অনাহার ও অন্যান্য কষ্ট। যাই হোক্ আউটরাম ও হ্যাভেলক এসে পড়ায় (সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে) এঁরা অনেকটা সামলে নিতে পেরেছিলেন, তারপর একেবারে নভেম্বরের মাঝামাঝি লর্ড ক্লাইভ এসে এঁদের রক্ষা করলেন।

লর্ড ক্লাইভকে (তখন স্যার কলিন ক্যাম্পবেল) ইংল্যাণ্ড থেকে প্রধান সেনাপতি করে পাঠানো হয়েছিল এই বিদ্রোহ দমনের জন্যই। অবশ্য লক্ষ্ণৌ তথা অযোধ্যা এবং রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহ দমন করা ক্লাইভের পক্ষেও শক্ত হ'ত, যদি না নেপালের বিখ্যাত মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর সসৈন্যে ওঁকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসতেন। তবুও অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের তালুকদার এবং প্রজারা প্রায় এক বৎসর ধরে 'গরিলা যুদ্ধ' চালিয়ে

এঁদের দারুণ বিব্রত করে তুলেছিল। এদের পরিণাম কিন্তু একান্ত শোচনীয়। এখানে যারা ধরা পড়ল তারা তো প্রাণ দিলই, যারা পালিয়ে নেপালের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিলে তাদেরও দুঃখদুর্দশার সীমা রইল না।

১৮৫৭ সালের শেষভাগে সবচেয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ এল মধ্যভারত থেকে।

তাঁতিয়া টোপীর কথা আগেই বলেছি, গোয়ালিয়র রেজিমেণ্টের ২০,০০০ সৈন্য তাঁতিয়া টোপীর নেতৃত্বে যমুনা পার হয়ে কানপুর দখল করল। কিন্তু শীগগিরই লর্ড ক্লাইভ এসে তাঁকে কানপুর থেকে বিতাড়িত করলেন। তখন তাঁতিয়া ঝাঁসীর রাণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মধ্যভারতে সাক্ষাৎ কৃতান্তের মতো যুদ্ধ করে বেড়াতে লাগলেন। স্যার হিউ রোজ সে সময়ে বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন, তিনিই এগিয়ে এলেন তাঁতিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। ১৮৫৮ সালের বসন্তকালে তিনি কয়েকটি ছোটখাট যুদ্ধ জয় করার পর বেত্রবতীর ধারে তাঁতিয়াকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দিলেন এবং ঝাঁসীর দুর্গ অবরোধ করলেন। অতঃপর লক্ষ্মীবাই ঝাঁসী থেকে পলায়ন ক'রে তাঁতিয়ার হতাবশিষ্ট বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন ও গোয়ালিয়রের দিকে রওনা হলেন। সিন্ধিয়া ইংরেজদের দিকে ছিলেন কিন্তু তাঁর সৈন্যরা নানাসাহেবকে পেশোয়া বলে স্বীকার ক'রে নিয়েছে—তারা বিদ্রোহীদেরই দিকে। অগত্যা সিন্ধিয়াকে রাজ্য ছেড়ে আগ্রায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হ'ল।

অবশ্য এ আশ্রয়ও রাণী বা তাঁতিয়ার বেশীদিন রইল না। পাছে আবার পেশোয়ার নামে অন্য মারাঠারাও বিদ্রোহ করে এই ভয়ে হিউ রোজ সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে গোয়ালিয়র আক্রমণ করলেন। মোরার ও কোটার যুদ্ধে তাঁতিয়ার দলকে পরাস্ত ক'রে জুন মাসের মাঝামাঝি গোয়ালিয়র পুনরাধিকার করলেন।

ঝাঁসীর রাণী যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতেই নিহত হলেন। তাঁতিয়া নানাস্থানে পালিয়ে পালিয়ে প্রায় এক বৎসর ধরে আত্মগোপন করেছিলেন কিন্তু পরে ধরা পড়েন এবং তাঁর ফাঁসি হয়। নানাসাহেব অন্যান্য অনেকের মতোই নেপালের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেন, তারপর তাঁর কী হ'ল আর জানা যায় নি।

এইভাবে সিপাহী বিদ্রোহের যবনিকাপাত হ'ল।